লেখকের অন্যান্য বই

থ্রিলার সপ্তক
স্বর্ণচাঁপার উপাখ্যান
রূপবতী
বেদবতী
হাওয়া সাপ
জনপদ জনপথ
গোপন সত্য
অলীক মানুষ
বসন্ততৃষ্ণা
রাজপুত্র মন্ত্রীপুত্র
স্বপ্নের মতো
আনন্দমেলা
নিশিলতা
মায়ামৃদঙ্গ
কর্নেল সমগ্র (১ম-১২)
কঙ্কগড়ের কঙ্কাল
কোকোদ্বীপের বিভীষিকা
কাগজে রক্তের দাগ
খরোষ্ঠীলিপিতে রক্ত
কিশোর রোমাঞ্চ অমনিবাস
রহস্য রোমাঞ্চ
সবুজবনের ভয়ঙ্কর
হাট্টিম রহস্য
সমুদ্রে মৃত্যুর ঘ্রাণ
রোড সাহেব ও পুনর্বাসন
জিরো জিরো নাইন
কালোমানুষ নীল চোখ
ভয়-ভুতুড়ে
টোরাদ্বীপের ভয়ঙ্কর
নিঝুমরাতের আতঙ্ক
বনের আসর
মাকাসিকোর ছায়ামানুষ
কালোবাক্সের রহস্য
শ্রেষ্ঠগল্প
ডমরুডিহির ভূত
সন্ধ্যানীড়ে অন্ধকার
ছায়ার আড়ালে
কুয়াশার রঙ নীল
নাগমিথুন
তৃণভূমি
প্রেতাত্মা ও ভালুক রহস্য

সূচিপত্র

তখন কুয়াশা ছিল

পড়ন্ত শীতঋতুর এক কুয়াশাঢাকা সকালবেলায় অখিলবন্ধু আমাদের বাড়িতে এলেন। খুব ব্যস্ততা দেখিয়ে খাতির করে ওঁকে বসাতে চাইলাম। উনি বসলেন না। গম্ভীর মুখে বললেন, তোমার সঙ্গে আমার একটা জরুরি কথা আছে, জয়।

বেশ তো স্যার! বলুন।

অখিলবন্ধু ঘরের ভেতরটা কেন যেন চোখ বুলিয়ে দেখে মাথাটা একটু নেড়ে বললেন, নাঃ! কথাটা এখানে বলা যাবে না। চল, আমরা বাইরে কোথাও গিয়ে বসি।

খুব অবাক হয়েছিলাম ওঁর কথা শুনে। ইদানিং কিছুদিন ওঁর কাছে যাওয়া হয়নি—কতকটা ইচ্ছে করেই যাইনি। কিছুদিন থেকে আমার মনে হচ্ছিল, পৃথিবীর সব কিছুর প্রতি একটা নিরাসক্তি আমাকে পেয়ে বসছে এবং কোন ঘটনাই আমার মধ্যে একটুও যেন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে না, এর কারণ হয়তো ওই বুড়োমানুষটির একটানা সংসর্গ।

সত্যি বলতে কী, নিজের বয়সী ছেলেদের সঙ্গে চিরদিন আমার মেলামেশাটা খুবই কম। সত্যিকার বন্ধুতার জন্য যতখানি মাখামাখি দরকার, কারুর সঙ্গে তেমন ছিল না। একানড়ে ভোঁদামার্কা স্বভাবের জন্য আমার সঙ্গে তত মিশতেও কেউ আগ্রহী ছিল না। বরং একটু বয়স্ক বা বউদি-টাইপ মেয়েদের সান্নিধ্য আমার ভালই লেগেছে এবং তারাও আড্ডা বা ফাইফরমাসের ব্যাপারে আমাকে পছন্দ করেছে। তার ফলে মেয়েদের মধ্যেই আমার বেশ খানিকটা খাতির রয়ে গেছে। যদিও তা কোনও হুলো বেড়ালের যথার্থ প্রাপ্য। তবে অখিলস্যার সেই স্কুলজীবন থেকে আমার কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয় মানুষ। উনিও রিটায়ার্ড, আর আমিও নিষ্কর্মা এক বেকার। তার চেয়ে বড় কথা—ওঁর বাড়িটা একেবারে পাড়ার শেষদিকটায় নিরিবিলি জায়গায়। চারপাশে প্রচুর গাছপালা। আগাছার বন। পেছনে একটা জলনিকাশি গভীর খাল। সেই খালের ওপর একটা কাঠের পুরনো সাঁকোও আছে। মাঝেমাঝে দুজনে সেখানে দাঁড়িয়ে কথা বলতে ভালই লাগে। এবং তাঁর মেয়ে মউ কখনও-সখনও আমাদের সঙ্গী। এসব মিলিয়ে অখিলস্যারের সঙ্গে আমার একটা গভীর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। সকাল বিকেল সন্ধ্যা, কখনও রাত অব্দি ওঁর কাছে আড্ডা দিয়েছি। ওঁর কথকের স্বভাব। এবং বলতেও পারেন ভারি চমৎকার। মানুষটিকে অধুনালুপ্ত ফিলসফার প্রজাতির শেষ নিদর্শন ভেবে শ্রদ্ধার মাত্রা শেষ দিকটায় এত বাড়িয়ে দিয়েছিলাম যে চুপচাপ মুগ্ধদৃষ্টে ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতাম। একটু ফোড়ন পর্যন্ত আর কাটতাম না।

তারপর একদিন হঠাৎ লক্ষ্য করেছিলাম, অখিলস্যারের কণ্ঠস্বর বদলে যাচ্ছে। বক্তব্যও বদলাতে শুরু করেছে। মুখের সেই শান্তসৌম ঋষিসুলভ ভাবটিও আর নেই। বেঁকেচুরে কেমন যেন তিতকুটে হয়ে যাচ্ছে। সবকিছুর নিন্দামন্দ শুরু করেছেন জোরাল গলায়। এরপর অনেক অদ্ভুত কথা উনি বলতে চাইছেন, যাতে আমার ভীষণ অস্বস্তি হচ্ছে। পৃথিবীর সবকিছু নাকি পচেহেজে গেছে, দ্বিপদ প্রাণীদের চতুষ্পদ হওয়ার লক্ষণ সুস্পষ্ট, এমন কী অমুক-অমুক লোকের পেছনের কাপড় সরালে গাছের ফ্যাকড়ার মত লেজের আঁকুরও দেখা যাবে—এইসব কথা শুনতে শুনতে আমার মধ্যে একটা বিশ্বাস-অবিশ্বাসের হুটোপুটি বেধে যাচ্ছিল।

দিনের পর দিন এ ধরনের তেতো বিদঘুটে কথাবার্তা শুনে আমারও মনে হচ্ছিল, সত্যিই পৃথিবীটা আর বাসযোগ্য হয়ে নেই। ডাইনোসরপ্রজাতির প্রাণীর মতই দ্বিপদ প্রাণীরা লুপ্ত হয়ে যাবে এবং পঞ্চম হিমযুগ আসতেও দেরি নেই। জরাজীর্ণ দোতালা বাড়ির ভেতর বসে অখিলস্যার দাড়ি নেড়ে যত

চেতাবনী আওড়াচ্ছেন, জানালা দিয়ে ভয়ের চোখে তাকিয়ে দেখছি তত ওইসব সবুজ জাঁকাল গাছপালা ন্যাড়া কঙ্কাল হয়ে যাচ্ছে, খালের ময়লাকালো জলটাও হয়ে উঠছে শাদা বরফ, চারদিকে শুধু ধু ধু খাঁ খাঁ বরফে, কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়ায় ঘুরে বেড়াচ্ছে ক্ষুধার্ত নেকড়ের পাল। লক্ষকোটি সাপের খোলসের মত পেঁচিয়ে উঠে সে এক ভয়াল কুয়াশা ঘিরে ধরেছে পৃথিবীকে। অখিলস্যার একটু চুপ করে চোখ বুজে থাকার পর হঠাৎ বাঁকা হেসে বলেছেন, বারীনকে লক্ষ্য করেছ কি? কী মনে হয় তোমার?

বারীন, মানে—বারীনদার কথা বলছেন স্যার?

হ্যাঁঃ। তোমার মনে হয় না পূর্বজন্মে ও একটা রামছাগল ছিল?

আপনি তাহলে পূর্বজন্ম মানেন স্যার!

অখিলবন্ধু অভ্যাসমত পটাৎ করে শাদা দাড়ির ভেতর থেকে না দেখেও একটা কালো দাড়ি ছিঁড়ে বলেছেন, আগে মানতাম না। এখন মানি। না মানলে এসবের ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না।

তারপর আবার চোখ বুজেছেন এবং খোলার পরই তেমনি বিদঘুটে হেসে বলেছেন, আর ওই রমেন—ওটা ছিল একটা ছুঁচো। ওর মুখখানা লক্ষ্য করেছ? দেখবে অবিকল ছুঁচোর গড়ন।

হাসবার চেষ্টা করে বলেছি, আপনার স্যার দারুণ অবজার্ভেশান!

অখিলস্যার সিরিয়াস ভঙ্গিতে বলেছেন, তুমি নিশ্চয় লক্ষ্য করেছ আর শেয়ালের ডাক শোনা যায় না। খালের ওপারে একসময় প্রহরে-প্রহরে শেয়াল ডাকত। শুধু শেয়াল কেন, কত সব জন্তুজানোয়ার লুপ্ত হয়ে গেল দেশ থেকে। কেন এমন হল বুঝতে পেরেছ তো?

কেন স্যার?

খালের ওপারে রেশমকুঠির জঙ্গল তুমি নিশ্চয় দেখনি। আমাদের ছেলেবেলায় ওখানে বাঘ থাকত। শেষ বাঘটা মারা পড়েছিল রেনবো সায়েবের গুলিতে। এসডিও ছিলেন ভদ্রলোক। যুদ্ধফেরত আমেরিকান তো। যেমন বাঘা তেঁতুল, তেমনি বুনো ওল। বাঘটার পায়ে ঘা ছিল। খোঁড়াতে খোঁড়াতে এসে নন্দীদের বাগানে ঢুকেছিল। হাজার লোক জড় হল। কিন্তু যেই পা বাড়ায়, হাঁকড়ানি শুনে পালাতে শুরু করে। শেষে, রেনবো সায়েব রিভলভারের গুলিতে তাকে মারলেন। আর মরার সময় বাঘটা এমন হাঁক ছাড়ল যে নন্দীর বউ অকালপ্রসবিনী হল। ট্যাপাকে লক্ষ্য করলেই টের পাবে, অকালজাত, অপরিণত মস্তিষ্ক বলতে কী বোঝায়।

বাঘটা স্যার? বাঘটা এ জন্মে নিশ্চয়—

সেই কথাই তো বলতে যাচ্ছিলাম। গুলিয়ে গেল। অখিলস্যার একটু ঝুঁকে চাপা গলায় বলেছেন, একটা বইতে সেদিন পড়ছিলাম মানুষ যে হারে জন্মাচ্ছে, আর বিশবছর পরে পৃথিবীর লোকসংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে যাবে। পড়তে পড়তে হঠাৎ মাথায় এল, তাহলে এত আত্মা পাওয়া যাবে কোথায়? প্রতি মানুষের যখন জন্মান্তর বরাদ্দ, তখন বাড়তি আত্মা চাই প্রচুর। তাই রাজ্যের সব জন্তুজানোয়ারের আত্মা মাতৃগর্ভে চালান করে—

সেদিন মউ—মহুয়া একটু তফাতে বসে উল বুনছিল। হঠাৎ বলে উঠেছিল বাবা! এটা তো গল্পের বইতে আছে। সেদিন তুমি বইটা পড়তে নিয়েছিলে না?

মউ হাসছিল। অখিলস্যার হকচকিয়ে গিয়ে বলেছিলেন, হবে। আজকাল আমার কিছু মনে থাকে না। কিন্তু কথাটা সত্যি দাঁড়াচ্ছে কি না?

সেই শেষ বাঘটা কার মধ্যে জন্মাল স্যার?

অখিলস্যার মুখটা আমার কানের কাছে নিয়ে এসেছিলেন, এত কাছে যে ওঁর দাড়ি প্রচণ্ড সুড়সুড়ি দিচ্ছিল। ফিসফিস করে বলেছিলেন, পোড়া বেম্ম।

ব্রহ্মপদবাবু স্যার?

অখিলবন্ধু ফ্যাসফেঁসে গলায় ভেংচি কেটেছিলেন, বেম্ম, আবার পদ, আবার বাবু! ওর মুখের একটা পাশ পুড়ে গিয়েছিল কেন জান? লোভে। ওর সর্বাঙ্গে লোভ। উনোনে পায়েস চাপানো আছে, ওর তর সইছিল না। খেতে গিয়ে একেবারে জ্বলন্ত উনোনে পড়ে—

শ্বাস টেনে ফের বলেছিলেন, ওর ছেলে রুদোর সঙ্গে তোমার ভাব আছে নাকি?

না স্যার। আমার কারুর সঙ্গে তেমন ভাব নেই। আমি কারুর সঙ্গে মিশি না।

খুব ভাল, খুব ভাল, কারুর সঙ্গে মিশো না। কী দরকার? যখন খুশি আমার কাছে চলে এস। মন খুলে কথাবার্তা বলে তুমিও শান্তি পাবে, আমিও শান্তি পাব। ...

শান্তি পাই কি না বুঝতে পারি না। হয়তো পেয়েছি, তা না হলে যাব কেন অখিলস্যারের কাছে? খুঁটিয়ে ভেবে দেখলে নিরিবিলি গাছপালার ভেতর জরাজীর্ণ একটা বাড়ি, পাখিটাখিও প্রচুর ওদিকটায়, এবং মউ! আমার একটা চোখ মউকে খুঁজত। তখন হয়তো সে নিচে রান্নাঘরে কেদারবুড়োর সঙ্গে কথা বলছে। তাহলেও প্রকৃতির করতলগত একটা বাড়ির ভেতর তার থাকাটা আমার কাছে খুব অর্থপূর্ণ এবং আমার একানড়ে জীবনেরও একটা কিছু মানে আছে বলে ধারণা হয়েছে। কিন্তু না—শুধু মউয়ের জন্য, মউয়ের প্রেমিক হওয়ার আশায় আমি কখনও অখিলস্যারের কাছে যাতায়াত করিনি। মউ সম্পর্কে আমার তেমন কোনও তীব্র অনুভূতি ছিল না। অবশ্য আমার কখনও মনে হয়েছে, মউকে ভালবাসলে কেমন হয়? এটা বর্ষারাতের জোনাকির মত পিটপিট করে জ্বলতে-নিভতে এবং ঘোরাঘুরি করতে করতে দূরের আঁধারে মিলিয়ে গেছে। ভেবেছি, মউ যদি আমাকে ভালবাসতে চায়, তাহলে অন্য কথা। কিন্তু মউয়ের মধ্যে ঘুনাক্ষরে তেমন সন্দেহজনক বা আগ্রহোদ্দীপক কিছু দেখিনি। সে এত স্বাভাবিক চোখে তাকিয়েছে আমার দিকে এবং এমন স্বাভাবিক কণ্ঠস্বরে কথা বলেছে, সেটাই আমাকে ব্যাপারটা ধামাচাপা দেবার পক্ষে যথেষ্ট।

তবু মউ বাড়িতে থাকলে—যেখানেই থাক, ওপরে বা নিচে, এমন কী চৌহদ্দির ভেতর কোথাও কোনও গাছের তলায় দাঁড়িয়ে, অখিলস্যারের মুখোমুখি ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটানোর পক্ষে সেটাই অনেক বেশি।

ঠিক এই মানসিক অবস্থাকেই আমি দ্বিধান্বিতভাবে শান্তি পাওয়া বলেছি। কিন্তু ক্রমশ অখিলস্যারের দ্রুত পরিবর্তন এর আপাত-ভারসাম্য নষ্ট করে দিচ্ছিল। অপরকে কনভিন্স করে ফেলার ক্ষমতা ওঁর তুলনারহিত। অবাক হয়ে লক্ষ্য করছিলাম, চারদিকে প্রচণ্ড শাদা বরফ, নিষ্পত্র বৃক্ষের কঙ্কাল, ক্ষুধার্ত নেকড়ের পাল এবং সত্যিই পৃথিবীটা আর বাসযোগ্য হয়ে নেই। গুহার ভেতর আগুন জ্বালানোর মত মউ একটা হেরিকেন জ্বেলে দিয়ে যায় টেবিলে—এদিকটায় বিদ্যুৎ নেই এবং সেই হলুদ আলোয় মউকেও কেমন নীরক্ত মনে হয়। জন্ডিসে আক্রান্ত রোগিণীর মত, আর দিনে দিনে সেও কেমন চুপচাপ হয়ে উঠছে। আগের মত ফোড়ন কাটছে না। এদিকে অখিলস্যারের মুখে তেতোগেলার ভাবটা আরও ভয়াল হয়ে ঠিকরে পড়ছে।

আমার মনে হয়েছিল, এখানেই দাঁড়ি টেনে দেওয়া ভাল। এখানে গিয়ে যেন একটা অসহ্য খাঁচাকলে আটকে পড়ার অবস্থা। কিন্তু একদিন না গেলেই কেদার ডাকতে আসে। কেদার ছিল রানী বিরজাসুন্দরী বিদ্যাপীঠের বেয়ারা। সে বাইরের লোক। অখিলস্যারের বাড়ির নিচের একটা ঘরে বিনা ভাড়ায় থাকতে পেয়েছিল। রিটায়ার করেও সে দেশে ফিরে যায়নি, কেন জানি না। তবে অখিলবন্ধু তাকে খুব পছন্দ করতেন। এখন সে ওঁর খুব কাজের লোক হয়ে উঠেছে। বুড়ো হয়ে গেলেও তার স্বাস্থ্যটি মজবুত আছে। তার সাহস আর গায়ের জোরের প্রশংসাও শুনেছি স্যারের কাছে। ওই নিরালা বাড়িতে কেদার অবশ্যই এক সজাগ প্রহরী।

এই কেদার এসে বলে গিয়েছিল, মাস্টারমশাইয়ের জরুরি তলব। কিন্তু আমার আর যেতে ইচ্ছে করছিল না। দিন দশেক আগে সেই শেষবার গেছি এক বিকেলে। তখন শীতটা আরও তেজী ছিল। আকাশও ছিল মেঘলা। হাওয়া দিচ্ছিল কনকনে হাড়কাঁপানো। ভাবছিলাম যাচ্ছি তো, ফিরে আসব কেমন করে? অখিলস্যারের মুখোমুখি বসে আড্ডা দিতে দিতে বাইরে অন্ধকার গাঢ় হয়েছিল। এদিন কেন যেন মন দিয়ে বৃষ্টি চাইছিলাম। তাহলে স্যার নিশ্চয় আমাকে ফিরতে দেবেন না এবং এ বাড়িতে রাতটা কাটাতে পারলে যেন দারুণ একটা ব্যাপার হবে!

কী হবে, স্পষ্ট করে ভাবতে হয়তো অস্বস্তিই হচ্ছিল। মউ যখন নিঃশব্দে চায়ের গেলাস রেখে গেল (স্যার এটাই শীতের সময় আরামদায়ক ব্যবস্থা বলেন), তখন আমার বুকের ভেতরটা দুলে উঠল

চাপা আবেগে। যদি বৃষ্টি পড়ে, অখিলস্যার আমাকে যেতে না দেন, 'দুটো ডাল ভাত গরিবের বাড়ি' বলে আপ্যায়িত করেন—বিছানা যেমনই হোক, আমার আপত্তি হবে না. অন্তত একটা দারুণ রাতে মউ হয়ে উঠুক সত্যিকার উত্তাপ।

চায়ে চুমুক দিয়ে বলেছিলাম, বৃষ্টি হলে মন্দ হয় না। কী বলেন স্যার?

অখিলবন্ধু বলেছিলেন, হুঁ। এটা কী মাস?

ফেব্রুয়ারি।

না না—বাংলা কী মাস?

মাঘ-ফাল্গুন হবে।

একটু হেসেছিলেন অখিলস্যার। ...একটা অদ্ভুত ব্যাপার তুমি লক্ষ্য করেছ কি জয়?

কী স্যার?

ওই যে বললে মাঘ-ফাল্গুন। অথচ দেখ, আমাদের ঋতুগুলো অন্যজোড়ে বেঁধে দেওয়া হয়েছে। বোশেখ-জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়-শ্রাবণ, ভাদ্র-আশ্বিন, কার্তিক-অঘ্রাণ, পউষ-মাঘ, ফাল্গুন-চৈত্র। কেমন তো?

স্যারের মধ্যে আজ একটু অন্য সুর টের পাচ্ছিলাম। কেমন একটু নির্মলতা, একটু শান্ত ভাব—নাকি আমারই মানসিক অবস্থার নিছক প্রতিফলন? আমার চোখে চোখ রেখে ফিকফিক করে হেসে উঠেছিলেন উনি। ফের বলেছিলেন, গণ্ডগোলটা টের পাচ্ছ তাহলে? তুমি বললে মাঘ-ফাল্গুন। ঠিক তাই। এই নিয়মে আমরা বলে থাকি চোত-বোশেখ, জষ্ঠি-আষাঢ়, শ্রাবণ-ভাদ্র—

শাওন-ভাদো নামে একটা হিন্দি ফিল্ম এসেছিল স্যার!

ওয়েট, ওয়েট। আশ্বিন-কার্তিক, অঘ্রাণ-পউষ, তারপর তুমি যেমন বললে মাঘ-ফাল্গুন! অখিলবন্ধু চায়ে বড় করে চুমুক দিয়ে দাড়ি মুছে বলেছিলেন, এই জোড়গুলোই কিন্তু এদেশের সত্যিকার ঋতু। ফাল্গুনেও দেখবে কী প্রচণ্ড শীত থাকে। ...

ঋতুর পরিবর্তন গ্রহ-নক্ষত্র, পঞ্জিকা, এইসব নিয়ে অনর্গল উনি কথা বলছিলেন আর আমি অবাক হয়ে ভাবছিলাম, এমন কেন ঘটল? যখন এ বাড়ি ঢুকি, উনি নিচের উঠোনে দাঁড়িয়ে ছিলেন যথারীতি গম্ভীর মুখে। নিচের বারান্দায় না বসে ওপরে নিয়ে এসেছেন, তখনও তেমনি প্রত্যাশিত গাম্ভীর্য ছিল। মউ প্রথমবার চা দিয়ে যায়, তখনও তাই। তারপর মউ আলো দিয়ে গেল। অখিলবন্ধুর ঠোঁট ফাঁক হতে দেখেছিলাম। কিন্তু কিছু বলেননি। আসলে আমি বৃষ্টির কথাটা তুলেছিলাম একঢিলে দুই পাখি বধের উদ্দেশ্যে। এই শীতকালীন বৃষ্টির যথেচ্ছ নিন্দামন্দ করবেন অখিলস্যার এবং অসুখবিসুখের কথা তুলে আমাকে থাকতে বলবেন। আর থাকতে বলামাত্র আমি রাজি হয়ে তো যাবই। আমি যদি কোনওদিন বাড়ি না ফিরি, আমার দাদা, বউদি বা পিসিমা—আমাদের ফ্যামিলির তাতে মাথাব্যথা হবে না, সেটা ভালই জানি। পিসিমা নিজে বিধবা এবং বাপের বাড়ি আশ্রিতা, তবু তিনিই আমাকে শুনিয়ে-শুনিয়ে বাঁকা হেসে বলেন, জয়া বলে ডেকো গো! ও তো জয়া—বেজার বিধবা বোন। ...

সত্যি সত্যি বৃষ্টির টিপটিপ মিঠে শব্দ শুনতে পেয়েছিলাম বাইরে এবং উঠে গিয়ে বন্ধ জানালা ফাঁক করে তদন্ত করব ভাবছি, অখিলস্যার হঠাৎ বলেছিলেন, তোমার বয়স কত হল, জয়?

অবাক হয়ে বলেছিলাম, এমাসে তিরিশ পেরিয়েছি। কেন স্যার?

আমার ছিয়াত্তর। কেদারের বাষট্টি। মউয়ের পঁচিশ।

হঠাৎ বয়সের কথা—

মুখটা একটু তুলে চোখ বুজে অখিলবন্ধু দাড়ি খামচে ধরে বলেছিলেন, তোমাদের সামনে বিপুল ভবিষ্যৎ। আমাদের সামনে অতলস্পর্শী গহ্বর।

গুরুগম্ভীর তৎসম শব্দে যেন গহ্বরের ভীষণতা বোঝাতে চাইছিলেন অখিলস্যার। কিন্তু হাসি পেল কথাটা শুনে। বলেছিলাম, আমাদের ভবিষ্যৎ কী তা তো দেখতেই পাচ্ছি। বরফের চাঙড়।

জোরে মাথা নেড়েছিলেন উনি। ...লড়তে লড়তে মরাই ভাল। লড়ে যাও জয়। সংগ্রাম কর।

স্যার! চারদিকে এত ছুঁচো, রামছাগল, ভোঁদড়, শেয়াল, বাঘ—

ও কিছু না। সম্প্রতি একটা বইতে পড়লাম, হোয়াট রিমেনস ইজ ম্যান।

স্যার! আপনিই তো বলে আসছেন—

অখিলবন্ধু শান্ত হেসে বলেছিলেন, সে তো আমার কথা। আমার কাছে যা সত্য। তোমাদের জীবনের এখনও কত বাকি। কত সম্ভাবনা ওত পেতে আছে চলার পথের বাঁকে বাঁকে।

কী বলছেন স্যার! চাকরি পাওয়ার বয়স পঁচিশ পর্যন্ত বাঁধা। আমি তিরিশ।

লড়ে যাও। কেউ তো বসে নেই, বাবা। বাল্যে আমরা একটা পদ্য পড়তাম, তোমাদের যুগে প্রাইমারি সিলেবাসে হয়তো নেই—পিপীলিকা পিপীলিকা—যাঃ! ভুলে গেছি।

আমি অবাক চোখে ওঁকে দেখছিলাম। স্যার কি হঠাৎ পূর্বপুরুষের গুপ্তধন পেয়ে গেছেন? নাকি লটারির টাকা? বাইরে গাছপালা জুড়ে ততক্ষণে শীতের বৃষ্টি আওয়াজ দিচ্ছে। নিচে কেদারের হেঁড়ে গলার হাঁকডাক শোনা যাচ্ছিল। পাশের ঘরে মউকে ঢুকতে দেখেছিলাম। সে কি চুপচাপ বসে আছে! কী ভাবছে সে? বৃষ্টির কথা —শীতের কথা? আরামদায়ক বিছানার চিন্তায় কি সে বুঁদ হয়ে আছে?

হ্যাঁ! অখিলস্যার নড়ে বলেছিলেন। ...মৌমাছি মৌমাছি কোথা যাও নাচি নাচি—

বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। শুনছেন?

যদি বর্ষে মাঘের শেষ, ধন্য রাজার পুণ্য দেশ!

এখন স্যার, বাড়ি ফেরাই প্রবলেম হল দেখছি।

কেদারকে বল, ছাতি দেবে।

ভীষণ অন্ধকার স্যার!

সাপের ভয় অন্তত নেই—এখন ওদের হাইবারনেটিং পিরিয়াড। দীর্ঘ নিদ্রার ঋতু।

উঠি স্যার!

আবার এস কিন্তু। কথা আছে। ...

শীতের বৃষ্টিতে ভিজে ঠাণ্ডা লাগার ভয় ছিল। কিন্তু আমার মনের মত শরীরটাও যেন কেমন হেদিয়ে গেছে। পাথরের মত ভারি আর নিঃসাড় কিছু বয়ে বেড়াচ্ছি। অসুখবিসুখ কতকাল আগে হয়েছে, মনেই পড়ে না।

তবে সে-রাতে আমি একটু হিংস্র হতে পেরেছিলাম বটে! রাতে টেবিলে রাখা কুকুরের কানের মত শক্ত রুটি আর পাঁকের মত দেখতে আলুকুমড়োর ঠাণ্ডাহিম ঘ্যাঁট হিংসামাখিয়ে খেতে মন্দ লাগেনি। হিংসা, রাগ উত্তেজনা—এসব জিনিস এত কমে গেছে আমার মধ্যে যে, অনেক টেপাটেপির পর একটুখানি বেরোয় এবং বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করার জন্য ওটুকুই যথেষ্ট। ভেবেছিলাম, রাতের ঘুমটা গণ্ডগোলে পড়বে। কিন্তু শেষপর্যন্ত কোনও ঝামেলা হয়নি। বৃষ্টিটা শিগগির ছেড়ে গিয়েছিল। সকালে দেখি, আকাশ ঝকমকে নীল। গাছগাছালি ঘরবাড়ির ওপর জবজবে রোদ। বউদি কোন ভাগ্যে চা দিতে এসে বলেছিল, রুদ্র তোমাকে খুঁজছিল কাল সন্ধ্যায়।

কেন?

বাঃ! কী অদ্ভুত বলছ তো! ন্যাকা!

হ্যাঁ—রুদ্র কোথায় যেন কন্ট্রাক্টারি করতে যাবে।

বউদি রাগ করে চলে যাবার পর দাদা বাইরে থেকে গর্জন করেছিল, পুঁটু! দেরি করিস নে। রুদো বলে গেছে, সাতটার মধ্যে যেন যায়। লিচুতলায় ওদের ট্রাক থাকবে। ...

ট্রাকটা ছিল না। হয়ত আমি যাবার আগেই চলে গিয়েছিল। দাঁড়িয়ে থেকে—ঠিক দাঁড়িয়ে নয়, শ্যামা সাইকেল স্টোর্সের বারান্দায় বেঞ্চিতে বসে দুটো বাচ্চার (বাচ্চাই বলা যায়, পরনে এই শীতে হাফপেন্টুল, গায়ে গেঞ্জি—অবশ্য স্যারের ভাষায় 'কর্ম ঘর্ম সৃষ্টি করে') সাইকেল মেরামতের দক্ষতা দেখতে দেখতে নটা বেজে গিয়েছিল। নটা—কারণ, সামনের মেয়েদের স্কুলে প্রাইমারি সেকশানের মর্নিং ক্লাস শেষ হওয়ায় বালিকার ঝাঁক পায়রার মত বেরিয়ে আসছিল। সেই ভোর ছটা থেকে নটা ক্লাস। এই হিমের দিনেও, রাতের বৃষ্টির পরও! সত্যি, মানুষ আর মানুষ হয়ে নেই।

আমাদের বাড়ির কাজের মেয়ে ন্যাড়ার মাকে দেখছিলাম, বিংকুকে ফেরত নিতে এসেছে। বুড়িকে ভাগিয়ে দিয়ে বিংকুকে একটু ঘুরপথে বাড়ি ফিরিয়ে আনার পর বউদি বলেছিল, রুদ্রের কথার কোনও দাম আছে? পোড়া বেম্মর ছেলে তো!

মেয়েরা পারে বটে। কোন ধাদ্ধাড়া-গোবিন্দপুরের মেয়ে, সেও এখন লোকাল হয়ে গেছে—কত সহজে এবং কত দ্রুত! অখিলস্যার বলেন, ফলের গাছের মত মেয়েদেরও দুবার পুঁততে হয় লক্ষ্য করেছ কি? নইলে টক আঁটি আম ফলবে।

দশদিন পরে ঠিক এই টক আঁটি আম এবং স্বাদু প্রকৃত আমের ব্যাপারটা আমার জীবনে এসে ধাক্কা দেবে, কল্পনাও করিনি। সেদিন সকালে চারদিকে প্রগাঢ়রকমের কুয়াশা ছিল। কিচেনের সামনে বসে বউদির সঙ্গে কথা বলতে বলতে তারিয়ে তারিয়ে চা খাচ্ছি, ন্যাড়ার মা এসে খবর দিয়ে গেল, বাইরে মাস্টারবাবু দাঁড়িয়ে আছেন।

বাইরের ঘরটার আমি থাকি। ব্যস্তভাবে দরজা খুলে খুব খাতির দেখিয়ে ওঁকে বসতে বললুম। কিন্তু উনি ঘরে ঢুকলেন বটে, বসলেন না। জরুরি কথা আছে এবং সেটা বাইরে কোথাও বলবেন বলে ডেকে নিয়ে গেলেন।

স্যারের মাথায় হনুমানটুপি, গলাবন্ধ লম্বা খসড়া পশমের কোট—সম্ভবত টুইড, তার ওপর বেরঙা আলোয়ান, হাতে খেঁটে বাঁশের মত লাঠি। খাকিরঙের পশমি মোজার সঙ্গে পাম্পসু পরেছেন। পালিশের নামগন্ধ নেই—তার ওপর ধুলো জমেছে। লাল ধুলো দেখেই বুঝলাম খালের সমান্তরাল সুরকি ঢাকা রাস্তাটা দিয়ে এসেছেন। অতটা ঘুরে আসার কারণ হয়ত, আগের মত মর্নিং ওয়াকে বেরিয়েছিলেন।

তাহলে সেদিন গিয়ে যা ভেবেছিলাম, ঠিক তাই। রুগ্‌ণ এবং জরাগ্রস্ত এই বৃদ্ধ হঠাৎ ক্ষমতা ফিরে পেয়েছেন। তা না হলে মর্নিং ওয়াক এবং এতখানি রাস্তা হাঁটতে পারার ব্যাখ্যা হয় না। গলিরাস্তায় পা বাড়িয়ে বললাম, আবার মর্নিং ওয়াক শুরু করেছেন! খুব ভাল—

নাঃ! অখিলবন্ধু গলার ভেতর বললেন। ... আজই বেরিয়েছিলাম। আসলে আমি নিরিবিলি ভাবতে চাইছিলাম ঠাণ্ডা মাথায়—ক্লিয়ার ব্রেনে। জান তো মর্নিংয়ে ব্রেন একেবারে ক্লিয়ার থাকে?

কথার সঙ্গে ভাব বেরুচ্ছিল গলগল করে। গলিপথ এখনও প্রায় জনহীন। এত ঘন কুয়াশা যে সামনে কয়েকগজ দূরে কিছু দেখা যাচ্ছে না। ঘন্টি বাজিয়ে রুটিবোঝাই একটা সাইকেলভ্যান আমাদের ওপর এসে পড়েছিল আর কী! অখিলস্যার যুবকের মত আমাকে টেনে নিলেন। তারপর কাঁধ বেড় দিয়ে রাস্তার বাঁদিক ঘেঁষে হাঁটতে থাকলেন।

আড়ষ্ট হয়ে পড়ছিলাম ক্রমশ। কী এমন কথা যে যেখানে-সেখানে বলা যায় না—এমনি করে ঠাণ্ডাহিম কুয়াশায় অন্য রাস্তায় হাঁটতে হয়? এরপর বসতির শেষ। শহরের ময়লাফেলার মাঠ। রেলের শান্টিং ইয়ার্ড। এমন শক্ত করে আমাকে ধরে কোথায় নিয়ে চলেছেন অখিলবন্ধু?

এপথে ওঁর বাড়ি দূরে পড়ে যাচ্ছে। রিকশও চলে না এদিকে। বাড়ি ফিরতে পারবেন কীভাবে? গত এক বছরে এতখানি ওঁকে হাঁটতে দেখিনি। বাড়ি থেকে বেরিয়ে বড়জোর পেছনদিকের খালের ধারে, কাঠের সাঁকো পর্যন্ত—অথবা উল্টোদিকে সদর রাস্তার মোড়। এই ছিল ওঁর গড় গতিবিধি। গত একটা মাসে ওঁর শরীর আরও স্থবির হতেও লক্ষ্য করেছি। পঁচাত্তর বছর বয়সে এভাবে ঝুঁকি নিয়ে হাঁটা কি উচিত হচ্ছে?

আমার মধ্যে এতসব প্রশ্ন বুদবুদ হয়ে ভেসে উঠছিল। ভেঙে যাচ্ছিল। অথচ মুখ ফুটে বলতে কেমন একটা সাহসের অভাবই যেন। ময়লাফেলার মাঠের কাছে আসঁতেই রেলইয়ার্ডে কুয়াশার ওপর হলুদ ছোপ এবং তার ওধারে চেরা গলায় চেঁচিয়ে উঠল একটা ইঞ্জিন। তারপর ট্রেনের শব্দ। অখিলবন্ধু আপনমনে বললেন, কামরূপ এক্সপ্রেস আধঘণ্টা লেট।

এবার আস্তে বললাম, আমরা কোথায় যাচ্ছি, স্যার?

তুমি কি ভয় পাচ্ছ? থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন অখিলবন্ধু। দাড়ির ওপর একরাশ কুয়াশা নাচতে লাগল।

পাশের মাঠে নাইটসয়েলবোঝাই প্রকাণ্ড ড্রামের মত গাড়িগুলো কালো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একপাল শুওর ঘুরঘুর করছে আনাচে-কানাচে। আবছা দুর্গন্ধ চারদিকে। রুমাল বের করে নাক ঢেকে বললাম, না—না। ও কী বলছেন! ভয়-টয় নয়—আমি বলছিলাম, এদিকে না গিয়ে—

এস তো! থাবা হাঁকড়ে অখিলস্যার আমার বাকস্বাধীনতাটুকুও যেন কেড়ে নিলেন।

আমার কাঁধ ছাড়লেন না উনি। দারোগার হাতে আসামির মত আমাকে এমন ধরা ধরেছেন যেন আমি পালিয়ে যাব। রাস্তাটা শেষ হয়ে গেল আগাছার জঙ্গলের মুখে। তারপর একফালি পায়েচলার পথ। দুধারে প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড ঝোপ ঝুঁকে এসে ভিজিয়ে দিচ্ছে দুজনকে। শিশিরে পথটাও ভিজে কালচে হয়ে আছে। বাঁদিকে ঘুরতে ঘুরতে সেই পথটা অবশেষে খালের কাছে পৌঁছে দিল। ডাইনে খালের ওপারে রেলইয়ার্ডের বেড়াদেওয়া বিশাল জমিতে লোহা-লক্কড়ের স্তূপ আসন্ন বিস্ফোরণের আগে যেন ধোঁয়া ছাড়ছে। কুয়াশার এমন সব ছবি দিকে দিকে। বুঝতে পারছিলাম, অখিলস্যার আর হাঁটতে পারছেন না। গতি কমে যাচ্ছিল ক্রমশ। মনে মনে চাইলাম, কুয়াশাটা সরে যাক। এসময় খানিকটা রোদ খুব দরকার। রোদের আভাও কুয়াশার গায়ে স্পষ্ট এবং গাছের মাথায় আবছা হলুদ গোলাকার কিছু দেখা যাচ্ছিল। হনুমানজীর মত কুয়াশার সূর্যটাকে বগলদাবা করে রেখেছে। আর না বলে পারলাম না, এখানে কোথাও বসা যেতে পারে। খালের ধারে ওই যে একটা কাঠের গুঁড়ি—চলুন স্যার! খামোকা হাঁটাহাঁটি করার চাইতে জায়গাটা মন্দ না।

অখিলবন্ধু মাথা নেড়ে ঘড়ঘড়ে গলায় বললেন, তুমি ইয়ং ম্যান—তুমি এমন করছ কেন?

কিন্তু আপনার যে কষ্ট হচ্ছে!

না। এস। বলে সামনে কালো বিশাল টিলার মত জিনিসটার দিকে লাঠিটা তুললেন অখিলবন্ধু। ... আমরা ওখানে যাব।

চেনা জায়গাও এই গুরুতর সকালবেলায় অচেনা ঠেকছিল। জিগ্যেস করলাম, ওখানে কী আছে স্যার?

অখিলবন্ধু রহস্যময়ভঙ্গিতে বললেন, অনেককিছুই আছে। খুব ভাল জায়গা।

হাসবার চেষ্টা করে বললাম, কথা বলার জন্য এতদূরে!

অখিলবন্ধু আবার ঘড়ঘড়ে গলায় বললেন, চল তো! বলছি।—

আরও কয়েকপা এগিয়ে গিয়ে দেখি, কালো টিলার মত জিনিসটা বটগাছ এবং আমরা অবশেষে মা মুক্তকেশীর মন্দিরতলায় এসে পড়েছি। মন্দিরটা কবে ভেঙেচুরে তার ওপরই ওই গাছটা গজিয়ে উঠেছে। অজস্র ঝুরির তলায় লাইমকংক্রিট আর পাথরের চাঙড় পড়ে আছে। পেছনদিকটায় কল্কেফুলের জঙ্গল। তারপরই খালের ধারে শ্মশান।

সাবধানে পা ফেলে এস। হোঁচট খাবে, বলে অখিলবন্ধু আমাকে ছেড়ে দিলেন এতক্ষণে। তারপর সামনে ঝুঁকে শুকনো পাতা কুড়োতে শুরু করলেন। চাপা গলায় হাঁসফাঁস করে বললেন ফের, দাঁড়িয়ে আছ কেন? কুড়োও, কুড়োও!

আমিও ব্যস্তভাবে শুকনোপাতা কুড়িয়ে জড় করতে থাকলাম। বেশ দশাসই একটা স্তূপ হয়ে গেলে অখিলবন্ধু একটা চাঙড়ে বসে বললেন, দারুণ জমবে। এনাফ! আর দরকার নেই, বসে পড়!

শুকনোপাতার স্তূপের অন্যধারে মুখোমুখি আমিও একটা চাঙড়ে বসে পড়লাম। তারপর তাকিয়ে রইলাম ওঁর দিকে।

অখিলস্যার একটু হাসলেন। ... এবার একটু আগুনের দরকার। তাই না?

ইশারা বুঝতে পেরে পকেট থেকে দেশলাই বের করতে হল। স্যারের সামনে সিগারেট খাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। ওঁর সঙ্গে চিরদিন এমন শ্রদ্ধাভক্তির সম্পর্ক যে কাছে দেশলাই থাকাটাও অসৌজন্য বলে মনে হত। এখন পরিবেশ এবং সময় ভিন্নরকম। এতখানি হেঁটে কিছু উষ্ণতার আশা করা যেত শরীরের ভেতর। কিন্তু উল্টোটাই হয়েছে। ঠাণ্ডায় হাড় অব্দি কনকন করছিল। শুকনো পাতা দাউ দাউ জ্বলে উঠলে স্যার হাত দুটো বাড়িয়ে বারকতক আঃ আঃ করলেন।

এবং আমিও। আগুনটা যথেচ্ছ ধোঁয়াও ছড়াচ্ছিল। একটা কাঠি কুড়িয়ে পাতাগুলো ঠেলে দিয়ে জ্বালিয়ে দিচ্ছিলাম। কিন্তু আমার দৃষ্টি ছিল স্যারের দিকে। মুখ একটু তুলে এবং পিছিয়ে রেখে ভুরু কুঁচকে উনি আগুন দেখছিলেন। দাড়িতে ছাইয়ের কুচি উড়ে পড়ছিল। তারপর পাতাগুলো জ্বলে ফুরিয়ে গেলে আবার পাতা কুড়োনর জন্য উঠতে যাচ্ছি, স্যার ডাকলেন, জয়!

গলার স্বরটা আমার কানে খচ করে বিঁধল। বললাম, কী স্যার?

তুমি বড় ভাল ছেলে। তোমার মত মহৎপ্রাণ ছেলে আজকাল আর দেখি না। অখিলবন্ধুর কণ্ঠস্বর ছেৎরে যাচ্ছিল। শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বললেন ফের, তোমার হাত দুটো দাও তো, জয়!

চিড়বিড় করে জ্বলতে থাকা লাল অঙ্গারের ওপর দিয়ে বশীভূতের মত হাত দুটো বাড়িয়ে দিলাম। এই সব কথা বলার জন্যই কি কুয়াশা আর শীতে পাড়ি দেওয়া? বিস্মিত হওয়ার অনুভূতিটা আর রইল না আমার চেতনায়। আমার হাত দুটো নিজের দুটো হাতে আঁকড়ে ধরলেন অখিলবন্ধু। ওঁর কণ্ঠরোধ হয়ে এসেছে যেন। ঢোক গিলে চোখ বুজে বললেন, এ বড় পবিত্র স্থান, বুঝলে জয়? হঠাৎ আমার মাথায় এসে গিয়েছিল—বলতে যখন হবে, এমন কোনও জায়গায় বলাই ভাল—যেখানে আশেপাশে কোথাও দুপেয়ে জানোয়ারগুলো নেই। মন খুলে বলা যাবে। সংকোচ দ্বিধা দ্বন্দ্ব বলতে কিছু থাকবে না।

অখিলস্যার চোখ খুললেন। চোখের কোনায় জল। কিন্তু ঠোঁটের কোনায় একচিলতে হাসি। আমার হাত দুটো আরও শক্ত করে ধরেছেন। আমি ভ্যাবলার মত তাকিয়ে আছি। বুক দুরুদুরু কাঁপছে। কী বলবেন অখিলস্যার?

আমার একটা কথা রাখতে হবে, বাবা! বল, রাখবে? কাঁপা-কাঁপা স্বরে বললেন অখিলবন্ধু।

ঝটপট বললাম, কেন রাখব না? নিশ্চয় রাখব।

জয়, এটা ঈশ্বরের মাটি। তোমার হাতদুটো আগুনের ওপর। তুমি আমাকে ছুঁয়ে আছ।

বলুন স্যার, বলুন।

তুমি তাহলে প্রতিজ্ঞা করলে, জয়!

করলাম।

করলে তো?

একশোবার।

তুমি মউকে বিবাহ কর।

স্যার! আমি প্রায় চেঁচিয়ে উঠলাম। আমার শরীরের ভেতরটা ফেটে গরম রক্ত শিরা-উপশিরায় ছ্যাঁক ছ্যাঁক করে জ্বালা দিতে দিতে ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

তুমি প্রতিজ্ঞা করেছ, জয়! অখিলবন্ধু বলির পাঁঠার মত আমাকে হাড়িকাঠে আটকে জোরাল কণ্ঠস্বরে বললেন। তুমি মউকে নাও। মউয়ের উপযুক্ত জীবনসঙ্গী বহু চিন্তাভাবনার পর আমি বাছাই করেছি। আর ভেবে দেখ জয়, এমন মেয়েও তো দুর্লভ! রূপে গুণে সর্ববিষয়ে তোমার জুটি কি না, তুমিই বল!

অখিলবন্ধু হয়ত জয়ের আনন্দে এতক্ষণে আমার হাত দুটো ছেড়ে দিলেন। আমি মুখ নামিয়ে গলার ভেতর বললাম, কিন্তু আমি যে স্যার বেকার। আমি ওকে কোথায় রাখব? খেতেপরতেই বা দেব কী? তাছাড়া আমার দাদাকে তো আপনি ভালই জানেন।

অখিলস্যার একটু হাসলেন। ভেব না! সব ঠিক হয়ে যাবে। তোমাকে একটা সত্যিকারের লড়াইয়ের চান্স দিলাম।

স্যার, আমাকে একটু ভাবতে সময় দিন!

জয়, এইমাত্র তুমি প্রতিজ্ঞা করেছ!

এ যে একটা বিরাট দায়িত্ব!

অখিলস্যার উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, ঠিক এই কথাটাই শুনতে চেয়েছিলাম তোমার মুখে—বিরাট দায়িত্ব। হ্যাঁ একটি মেয়ের জীবন পুরুষমানুষের কাছে একটি সত্যিকার বড় দায়িত্ব। তুমিই সেটা

বোঝ। বোঝ বলেই আমি গত এক সপ্তাহ ধরে ভেবে তোমাকেই সিলেক্ট করেছিলাম। এবার আমার ছুটি, জয়।

আনন্দ আর আতঙ্ক, আশা আর নিরাশার মাঝখানে চক্কর খেতে খেতে মরিয়া হয়ে বললাম, বরং একবার দাদাকে আপনি বলুন না স্যার! দাদাই তো আমার গার্জেন। এসব ব্যাপারে গার্জেনদের—

অখিলবন্ধু চোখ কটমট করে ধমক দিলেন, প্রতিজ্ঞা করেছ! বল, করনি?

করেছি। কিন্তু—

আর কোনও কথা নয়। অখিলবন্ধু আবার আমার কাঁধে থাবা হাঁকড়ালেন। ...

এমন সুখের দিন আর কখনও কি আমার জীবনে এসেছে? সম্ভবত না। কী একটা দিন ছিল সেই দিনটা! কুয়াশার ভেতর থেকে ঝলমল করতে করতে বেরিয়ে এসেছিল তাজা একটা সূর্য। আমাদের এই পুরনো শহরের খাঁজে-খাঁজে গড়িয়ে পড়ছিল আরামদায়ক উষ্ণতা। গাছপালার ভেতর কুহুডাক ডাকতে ডাকতে একশ কোকিলের গলা ভেঙে যাচ্ছিল। পোড়ো খ্রিস্টান কবরখানার দিকে তাকিয়ে সেই প্রথম দেখলাম একটা বিশাল শিমুলের লালটুকটুকে মাথা—ওই গাছটা ওখানে ছিল এবং শেষ শীতে এমন করে ফুল ফোটায়, লক্ষ্যও করিনি। মোহনলাল পাটোয়ারির আড়ত আর পেট্রলপাম্পের চত্বরে পর্যন্ত আবিষ্কার করলাম তাগড়াই ডালিয়া আর পেল্লায় গড়নের চন্দ্রমল্লিকা। গার্লস কলেজের প্রাঙ্গণ থেকে হাসিখুশি একদঙ্গল মেয়ে বেরিয়ে কি আমাকে দেখিয়েই কিছু বলাবলি করল? আমি খুব তেড়ে পা ফেলছিলাম। রাস্তার ধারে ঘেঁটুফুলের জঙ্গলটাতেও আজ এত প্রজাপতির ঝাঁক! স্টেশনরোড ধরে সেজেগুজে কোথায় চলেছে এত মানুষজন—কোথাও উৎসব! ব্যারাকের মাঠে খাটানো হচ্ছে রঙবেরঙের প্যান্ডেল। নবাবী আমলের ঘড়িঘরের দেউড়িতে বাজছে বিসমিল্লা খাঁর সানাই। একজন দেহাতী মানুষ মাথা তুলে ঘাড় ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে উঁচুতে কী দেখতে দেখতে আসছিল—আমার সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে একরাশ হলুদ দাঁতে হেসে বলল, লাগল বাবুমশাই? বাবুমশাইয়ের একটুও লাগেনি। তোমার লাগেনি তো ভাই? কোথাও বাজছিল ড্রামের বাজনা। বাঁক ঘুরতেই থমকে দাঁড়ালাম। কোথায় চলে এসেছি শেষ পর্যন্ত? এর পর কাঠগোলা, ইটখোলা, টালির ভাটা—ভুসকালো প্রকাণ্ড চিমনি হুশ হুশ করে ধোঁয়া ওগরাচ্ছে নীল ধূসর আকাশ জুড়ে। এটাই শহরের শেষ প্রান্ত। এভাবে চক্কর মেরে বেড়ানোর চাইতে মাথাটা ঠাণ্ডা রাখা দরকার।

যতবার ভাবছিলাম মউ আমার বউ হবে, চোখ বুজে ততবার তাকে দেখার চেষ্টা করছিলাম। কেমন দেখাবে ওকে চেলি পরে? উজ্জ্বল বেনারসিতে মোড়া ছিপছিপে এক কনেবউ। ওর চোখে কি দুষ্টুদুষ্টু একটা হাসি থাকবে? ওকে আমি খুলেই বলব, নিজেও জানতাম না যে তোমাকে এমন ভীষণভাবে ভালবাসি। ওকে বলতে দোষ কী, সেই বৃষ্টির রাতে অনেক আশা নিয়ে তোমাদের বাড়ি গিয়েছিলাম। দুমুঠো ডালভাত আর যেমনতেমন একটা বিছানাই যথেষ্ট ছিল।

হাসিদির কাছে চলে গেলাম। হাসিদি গার্লস স্কুলের টিচার। ছুটির দিনে বাড়িতেই ছিলেন। আমাকে দেখে বললেন, কী? অনেকদিন দেখি না যে? কোথায় ডুবে ডুবে জল খেয়ে বেড়াচ্ছ আজকাল?

তা খাচ্ছি। অকপটে বললাম।

হাসিদি চোখ বড় করে তাকিয়ে হেসে ফেললেন। বাঃ। খুব উন্নতি হয়েছে।

হয়েছে। এদিকওদিক দেখে নিয়ে চাপা গলায় বললাম, একটা জরুরি ব্যাপারে কনসাল্ট করতে এলাম, হাসিদি!

হাসিদির কেন কে জানে মুখের হাসি নিভে গেল। ভুরু কুঁচকে বললেন, কী ব্যাপার?

আচ্ছা হাসিদি, মউকে যদি বিয়ে করি, কেমন হয়?

কাকে?

অখিলস্যারের মেয়েকে।

হাসিদি মোড়া টেনে বসে বললেন, তুমি মহুয়াকে বিয়ে করবে?

হাসিদি মুখ নামিয়ে চোখে হাসি রেখে বললেন, তুমি মউকে গিয়ে ডিরেক্ট চার্জ কর না! শুধু বলবে, বরুণ কম্পাউন্ডারকে কেন পালাতে হয়েছিল। দেখবে ওর রি-অ্যাকশানটা কী হয়।

আস্তে বললাম, অখিলস্যার তেমন কিছু তো বলেননি কোনদিন। এমন কিছু ঘটলে আমাকে বলবেন না, এটা হতে পারে?

বাণীদা প্রকাণ্ড পা নাচাতে নাচাতে বললেন, বুড়ো যখ মাথাটি খেয়ে বসে আছে! যাও ভাই, যা ইচ্ছে কর। আমাদের কিছু বলার নেই। তবে পরে যেন বলতে এস না কিছু। ওক্কে!

চায়ের কাপ পড়ে রইল। আমি কোনও কথা না বলে বেরিয়ে এলাম। বাইরে গিয়ে মনে হল, এ ছাড়া আর কীভাবেই বা প্রতিবাদ জানান যেত? ...

আমার আরও কতিপয় দিদি-বউদি এ শহরে ছিল। একজন মাসিমাও ছিলেন। হাসিদির বাড়ি ধাক্কা খেয়ে আর কারুর কাছে যেতে ইচ্ছে করছিল না। এদিকে সেই একশ কোকিল ডেকে-ডেকে মুখে রক্ত ওঠার দাখিল। ঘনিয়ে আসা রাতের আগে এ শহরের সব ফুল আরও ফুলেফেঁপে অস্থির। আরও সানাই, আরও ব্যাঙের বাজনা। ইচ্ছে করছিল উঁচু ওয়াটারট্যাংকের ওপর দাঁড়িয়ে চেঁচামেচি করে বলি, মউকে আমি বিয়ে করছি। মউ হবে আমার বউ!

পাশ দিয়ে যত লোক যাচ্ছিল, আমার শরীরের রোমকূপ থেকে তাদের দিকে ওই চেঁচামেচি ছুটে যাবার তাল করছিল। ইচ্ছে করছিল, জনে জনে ডেকে এই সুখবর দিই। সব্বাইকে বলি, আপনারা আসবেন যেন। আমাদের আশীর্বাদ করবেন। বাবারা, মায়েরা, দাদারা, দিদিরা আপনাদের সবার নেমন্তন্ন রইল। খোকাকুকুরা, তোমরাও যেতে ভুলো না!

লিচুতলার কাছে আসতেই কেউ খপ করে আমার কাঁধ ধরল। ঘুরে দেখি, রুদ্র। ফিক করে হেসে বললাম, তোর কাছেই আসছিলাম রুদো! জরুরি কথা আছে।

রুদ্র বলল, তোর খুব গরজ হয়েছে রে পুঁটে!

ওর হাত চেপে ধরে বললাম, কী বলছিস! আমি তো সেদিন নটা অব্দি এখানে—

বাজে বলিসনে। ঠিক সাতটায় আমি ট্রাক নিয়ে বেরিয়ে গেছি। সাড়ে ছটা থেকে ওখানে দাঁড়িয়ে ছিল ট্রাক। রুদ্র পানের পিক ফেলল। তারপর ঠোঁট মুছে ফের বলল, তুই কাজ করবি?

আলবৎ করব। আমি সেজন্যই তো—

আয়। ব্যাপারটা তোকে খুলে বলি।

একটু দূরে মেন রোডের ধারে খোলামেলা জায়গায় ওদের পেট্রলপাম্প আর গ্যারেজ। গ্যারেজের পাশে একটা ঘরে রুদ্র আপিস খুলেছে। তালা খুলে বাতি জ্বেলে বলল, বস। চা খাবি তো?

না। এইমাত্র হাসিদির ওখানে চা খেয়ে এলাম।

রুদ্র চোখ নাচিয়ে মুখের ভেতর সড়াক করে লালা টেনে বলল, চাঁদু! হাসিদি! তোর মাইরি বরাবর দেখছি উদ্ভট-উদ্ভুট সব জিনিসের প্রতি লোভ। হ্যাঁ রে, আজকাল আর সুলেখা বউদির মাথা টিপতে যাস নে? ডাকে না বুঝি?

খ্যা খ্যা খি খি করে বিকট হাসতে লাগল রুদ্র। তারপর টেবিলের ড্রয়ার থেকে দামী সিগারেটের প্যাকেট বের করল। বললাম, রুদো, আমার কাজ করা দরকার। যে কোনও একটা কাজ।

রুদ্র সিগারেট দিয়ে বলল, কাজ তো শালা আমি হাতে করে নিয়ে ঘুরছি তোমার জন্য। তুমিই তো আসছ না। আজকের দিনটা দেখে কাল আমি কাউকে বলতাম।

প্লিজ রুদো! আমি এসে গেছি।

রুদ্র সিরিয়াস হয়ে বলল, রূপতলা পর্যন্ত তিন কিমি রাস্তার টেন্ডার পেয়েছি। আর্থওয়ার্ক প্রায় কমপ্লিট। কাল থেকে শেলিং শুরু হবে। ভুজঙ্গবাবুর ব্রিক ফিল্ড থেকে ইটপাটকেল যাবে। তুই ভোর ছটার মধ্যে চলে আয়। ব্রিকব্যাটমের স্ট্যাক মেপে কিউবিকফুট হিসেব করবি। কত মাল উঠছে গাড়িতে নোট করবি। ব্যাপারটা বুঝতে পারলি? দাঁড়া—এঁকে দেখাই। জাস্ট অঙ্কের ব্যাপার।

ও কাগজে চারকোনা বাক্স এঁকে দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতা বোঝাতে থাকল। আমার মন নিচ্ছিল না। একসময় বললাম, রুদো! আমি মাথায় করে ইটপাটকেল বইতেও রাজি। বড্ড এমার্জেন্সি!

রুদ্র আনমনে বলল, কিসের?

আমি মউকে বিয়ে করছি, রুদো!

করেছিস? রুদ্র একহাত চেয়ারছাড়া হয়ে ধপাস করে বসল। গোল চোখে তাকাল সে।

করিনি। করতে যাচ্ছি!

মউ—মানে মহুয়াকে?

হ্যাঁ।

অখিলমাস্টারের মেয়েকে—দাঁড়া, দাঁড়া, বুঝতে দে। বলে সিগারেটে অনেকগুলো টান দিয়ে নিল। তারপর হাত নেড়ে ধোঁয়া সরাতে থাকল। কী বললি, আরেকবার বল্ তো!

বললাম তো মউকে আমি শিগগির বিয়ে করছি। কথা পাকা হয়ে গেছে।

তোর দাদা বিয়ে দিচ্ছে?

না।

তাহলে কে দিচ্ছে?

কে দেবে? আমি নিজে করছি। অখিলস্যার প্রোপোজ করেছেন নিজে থেকে। আমিও কথা দিয়েছি।

রুদ্র চেয়ারে চিত হয়ে গেল। সিলিংয়ের দিকে চোখ রেখে ঠোঁটদুটো ছুঁচোর মুখের মত চোঙা করে ধোঁয়া ওগরাতে থাকল। তারপর বলল, তুই গাড়ল। গাড়ল না হলে ফাঁদে পা দিতিস না।

শান্তভাবে একটু হেসে বললাম, ফাঁদটা কিসের রে?

রুদ্র সোজা হয়ে বসে তেজী গলায় বলল, অখিলমাস্টার ধরে ধরে একশটা ছেলের কাছে প্রপোজ করেছে এ পর্যন্ত, তুই জানিস? ওর ট্যাকটিসটাই হল এই। আমাকে পর্যন্ত। গার্জেনদের কাছে যাবার কিন্তু মুখ নেই। কাজেই সরাসরি ট্র্যাপ করতে এসেছে। একটা রামঘুঘু!

সে যাই হোক, আমি যখন কথা দিয়েছি, তখন আর করার কিছু নেই আমার।

রুদ্র চোখ কুঁচকে বলল, হ্যাঁ রে রামছাগল, মউ যদি তোকে বিয়ে করতে না চায়?

ভেতরে ধাক্কা খেয়ে নড়ে বসলাম। তাই তো! এদিকটা তো এখনও মাথায় আসেনি। মউ যদি আমাকে বিয়ে করতে না চায়? পঁচিশবছর বয়সের মেয়ের পক্ষে নিজের একটা মতামত বেশি করেই থাকা স্বাভাবিক। আমার মাথার ভেতর আবার ঘূর্ণিঝড় বইতে শুরু করল। তাকিয়ে রইলাম রুদ্রের দিকে। রুদ্রের মোটা নাকের নিচে গোঁফটা তিরতির করে কাঁপছে। ডোরাকাটা পুরু পুলওভারের ভেতর ওর শরীরটা ফুলে-ফুলে উঠছে। পলাবসানো আংটি ওর মোটা-মোটা আঙুলে নড়ে নড়ে উঠছে। গোল চোখদুটো ভীষণ চকচক করছে। অখিলস্যার বলেছিলেন, কুঠির জঙ্গলের শেষ বাঘটার জন্ম হয়েছে পোড়া বেম্মোর মধ্যে। কাজেই একটা বাঘের বাচ্চা বসে আছে আমার সামনে। অদ্ভুত একটা অস্বস্তি আমাকে পেয়ে বসল। মউয়ের ব্যাপারটা তুলে ও হয়তো ঠিকই করেছে। হ্যাঁ, এটা ভেবে দেখা উচিত ছিল। মন্দিরতলায় কথাটা কেন যে মাথায় আসেনি ছাই!

রুদ্র যেন মজা দেখছিল। আবার খ্যা খ্যা খি খি করে অনেকটা হেসে বুড়ো আঙুল নেড়ে বলল, দেখবি, টোপর পরে তুইও গেছিস, মালও ভাগলবা হয়ে গেছে। ও জিনিস তোমার জন্য নয়, মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড!

আমি কাল কখন আসব?

ভোর ছটা।

বেরিয়ে এলাম। রুদ্র পেছন পেছন এসে কাউকে চড়া গলায় কিছু বলার পর আমাকে ডাকল, পুঁটু, শোন।

আমি ঘুরে দাঁড়ালে সে এসে আগের মত কাঁধে হাত রেখে চাপা গলায় বলল, মহুয়া একটা প্রস—আপন গড। তোর স্বার্থেই বলছি। ওকে ভোগ করেনি, এমন ছেলে খুব কম আছে। বিশ্বাস করা-

না-করা তোর ইচ্ছা। যাই হোক, কাল আসছিস তাহলে। জাস্ট ছটায় সোজা আমার অফিসে চলে আসবি। লাস্ট চান্স। ...

জেলখানার পাশ দিয়ে শর্টকার্ট করে মোটামুটি নির্জন একটা রাস্তায় পা দিলে জেলখানার ঘড়ি আটবার বাজল। কান্নার সুরে বাঁধা ওই ঘণ্টার শব্দটা। দূরে-দূরে একটা করে আলো জ্বলছে। নিঝুম হয়ে আসছে রাতের শহর শেষ মাঘের দুরন্ত শীতে। এরোনটিকাল কমিউনিকেশন সেন্টারের উঁচু টাওয়ারে লাল বাতি জুগ জুগ করছে। খেলার মাঠের পাশ দিয়ে খুব আস্তে আমি হাঁটছিলাম। ভীষণ ক্লান্তি এতক্ষণে সারদিনের উত্তেজনাব পর। সেই কোকিলগুলো চুপ করেছে। ছায়ায় ঝিমোচ্ছে অসংখ্য ফুল। প্রজাপতির ঝাঁকটা কবরখানার মৃতদের শিয়রে ঘুমোতে গেছে। কাছে-দূরে আলোর গায়ে গা মিশিয়ে রাতের কুয়াশা ভুতের মত দাঁড়িয়ে আছে। মনে হচ্ছিল হিমযুগের দিকে খুব শিগগির পৌছে যাচ্ছে পৃথিবী। নিষ্পত্র বৃক্ষের কঙ্কাল আর ক্ষুধার্ত নেকড়েরা হানা দেবার আগে বেঁচেবর্তে থাকতে থাকতেই আমি কি মউয়ের কাছে যাব? ক্লান্তি আর হিম আমাকে জড়িয়ে ধরছিল। ওদের বাড়ির সামান্য দূরে পৌছে থমকে দাঁড়ালাম। ওদিকটা ঘন অন্ধকারে তলিয়ে আছে। ওপরের ঘরে কোন-কোন রাতে বাতির আলো দেখেছি। আজ সব জানালা বুঝি বন্ধ করা। চলে যাবার সময় শীতটা খুব জানিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। তাই এ রাতে বাড়িটা নিজের মধ্যে গুটিয়ে গেছে কান্নার মত।

মউয়ের কাছে যাওয়া উচিত হবে কি? আবার প্রশ্ন করলাম নিজেকে। ভীষণ একটা অস্বস্তি আমাকে অস্থির করল। মউয়ের কাছে তো কখনও আমি যাইনি। আমার চিরদিনের সব যাওয়া অখিলস্যারের কাছে। আমি শুধু জানতাম মউ আছে সারাক্ষণ, ওই বাড়িটার সবকিছুর সঙ্গে জড়ান অবিচ্ছেদ্য এক অংশের মত মউয়ের থাকা।

আমার পা দুটো কষ্টকরভাবে হাঁটছিল। হাঁটতে হাঁটতে আমাকে নিজের বাড়িতে অবশেষে ভেতর নিয়ে এল। আসলে মউকে আমি মুখোমুখি কিছুতেই জিগ্যেস করতে পারব না, এ বিয়েতে তার মত আছে কি না। অখিলস্যারকেই বরং বলব কথাটা। দায়িত্ব তো ওঁরই। তবে সুবিবেচক আর ক্রান্তদর্শী ওই মানুষ কি এদিকটা না ভেবেই আমার কাছে ছুটে এসেছিলেন? মনে হয় না। আর হাসিদিরা বললেন মউয়ের চরিত্র খারাপ। বরুণ কম্পাউন্ডারের সঙ্গে নাকি কী সব ঘটেছিল। আর রুদ্র বলল, মউ প্রস এবং সব ছেলেই তার সঙ্গে শুয়েছে। সত্য হোক, মিথ্যা হোক, আমার কিছু আসে-যায় না। মউ যাই হোক, আমি গ্রাহ্য করি না। আসলে অখিলস্যার ঠিক বলেছেন, রাজ্যের সাপ ব্যাঙ ছুঁচো ভোঁদড় প্যাঁচা বাঁদর শেয়াল যে উজাড় হয়ে যাচ্ছে, তার চমৎকার ব্যাখ্যা করা যায়। হাসিদি ছিল হাতি নয়, জলহস্তী, তার বর ছিল গণ্ডার এবং রুদ্র ছিল একটা শুওর—ওর বাবার আত্মা আর ওর আত্মা তো আলাদা। হুঁ, আমাদের প্রত্যেকের আত্মা আলাদা। আমার যদি রামছাগলের আত্মা হয়, রুদ্রের আত্মা ধেড়ে শুওরের।

মনটা শান্ত হল এতক্ষণে। শ্বাস ছেড়ে দরজার কড়া নাড়লাম। বউদি দরজা খুলে আমাকে দেখেই বলে উঠল, এই যে! এস তুমি ভেতরে—তোমার হচ্ছে!

ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেখি বউদি অদৃশ্য। তারপর দাদার গলা শুনতে পেলাম। পুঁটে এসেছে? অ্যাই পুঁটে! এদিকে আয়। কাম অন!

ভেতরের বারান্দায় যেতেই পিসিমা থামের কাছ থেকে ভেংচি কাটার মত মুখ করে বললেন, "কৈ এস। একবার চাঁদমুখখানা দেখি!"

দাদার গলায় মাফলার জড়ান ছিল। একটানে খুলে বললে, তুই গরু না ছাগল না গাধা রে?

কী ব্যাপার?

বউদি বলল, আহা! ন্যাকার শিরোমণি! ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না!

দাদা দু'পা এগিয়ে চাপা গলায় হাঁসফাঁস করে বলল, তুই আমাদের মানসম্মান আর রাখবিনে? ছি ছি ছি ছিঃ! তোর যদি সেই ইচ্ছেই হয়েছে, আমাকে লজ্জায় না বললি, তোর বউদিকেও তো জাস্ট একটু আভাস দিতে পারতিস! চাকরি নেই—বেকার। ঠিক আছে! ছেলে। মেয়ে তো নয়। তাছাড়া এ বাজারে তোর মত একজন গ্র্যাজুয়েট ছেলে, দেখতে ভাল, স্বাস্থ্য ভাল, সদ্বংশের সন্তান—এক কাঁড়ি

ক্যাশকে ক্যাশ ... দাদা আঙুল গুনতে থাকল। ফ্রিজ, আলমারি, রিলেসেন্টার বসেছে—সুতরাং টিভি, একটা মোটর সাইকেল পর্যন্ত। খাট-ফাটের কথা, ফার্নিচার-টার ছেড়েই দিচ্ছি।

দম নিয়ে দাদা গর্জে উঠল, ধিক তোকে। শতধিক!

এসব কথা হঠাৎ উঠছে কেন?

বউদি কিল তুলে বলল, শাট্ আপ! জান না কেন উঠছে! তুমি কচি খোকা? বয়স হিসেব করেছ? চুল পাকতে চলল এদিকে।

বউদি, বড্ড বাড়াবাড়ি করছ তোমরা! দুঃখ করে বললাম। আমি মানুষ না কী?

তুই অমানুষ। দাদা ঘোষণা করল।

ঘোষণাটা জোরেই হয়েছিল। পিসিমা ধমক দিলেন। আঃ! আস্তে! চারদিকে শুনছে। হাসাহাসি করবে সে খেয়াল আছে?

বউদি ফোড়ন কাটল। হাসাহাসির বাকি আছে কিছু? এরই মধ্যে চারদিকে ঢিঢি পড়ে গেছে। একটু আগে কোবরেজমশাইয়ের মেয়ে কেন হঠাৎ এসেছিল বুঝতে পারেননি?

পিসিমা বললেন, তাই বটে! মৌসুমী তো কখনও এমন অসময়ে আসে না। এসে পুঁটুর খোঁজ করার কারণ কী?

দাদা গুম হয়ে নিষ্পলক চোখে সামনের থামে পিসিমার টাঙানো মা কালীর ছবি দেখছিল। আমার দিকে ঘুরে হঠাৎ আমার একটা হাত ধরে হিড় হিড় করে নিজের ঘরে নিয়ে গেল। ড্রেসিং টেবিলের সামনেকার টুলে বসিয়ে দিয়ে নিজে খাটের ওপর বসল। বিংকি খাটের ওপর উপুড় হয়ে ছবির বই দেখছিল। আমাকে কেন কে জানে ভেংচি কাটল। বউদি ঢুকে দরজা বন্ধ করে একটা চেয়ার সাবধানে টেনে প্রায় নিঃশব্দে বসল। দু'জোড়া নিষ্পলক চোখের সামনে কেঁচো হয়ে বসে রইলাম। একটা অস্বাভাবিক নীরবতা। তারপর দরজা ঠেলে পিসিমা ঢুকে খাটে দাদার সামান্য তফাতে বসলেন। বউদি উঠে দরজা আগের মত ভেজিয়ে দিল।

এইসব ক্রিয়াকলাপের মধ্যে তিনটি নাকের শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ কানে আসছিল শুধু। তারপর দাদা ফোঁস করে সাংঘাতিক একটা শ্বাস ছেড়ে বলল, অফিস থেকে ফিরেই তোকে খোঁজাখুঁজি করে হন্যে। শোনা অব্দি আমার মাথায় আগুন ধরে গেছে। যাই হোক ফ্র্যাংকলি বলছি। মা-বাবার অবর্তমানে আমি তোর গার্জেন। স্বীকার করিস কি না?

কেন করব না?

তাই যদি করিস, দাদা গলায় এবার মাখন মাখিয়ে বলল, তাহলে প্রথম যেদিন ওই অখিলমাস্টার ফুসমন্তর দিল, সেদিনই এসে বললিনে কেন, দাদা, মাস্টার আমাকে সাচ অ্যান্ড সাচ বলেছে? আমি তক্ষুনি তোকে অঙ্ক কষে বুঝিয়ে দিতাম, গণ্ডগোলটা কোথায়।

এতক্ষণে আমি সব বোঝবার ভান করে হাসলাম, যদিও বউদি ফুট কাটল, হাসতে লজ্জা করে না তোমার? হাসতে হাসতে আমি বললাম, ও! এই ব্যাপার? এরই জন্য তোমরা আমাকে চারদিক থেকে খামচাতে শুরু করেছ?

বিংকি হি হি করে হেসে উঠল। বউদি খেঁকিয়ে উঠল, বিংকি! দাদা বলল, বিংকি! ঘুমোও। তারপর আমার দিকে ঘুরে আবার ফিসফিসে কণ্ঠস্বরে বলল, অফিস থেকে আসছি—কেদারের সঙ্গে দেখা। কেদার আমাকে হঠাৎ আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলল এই ব্যাপার।

কী ব্যাপার?

দাদা উত্তেজনা দমন করে বলল, বলল যে তুই অখিলমাস্টারের মেয়েকে বিয়ে করছিস। সব পাকা হয়ে গেছে। কাল-পরশুর মধ্যে চুপচাপ রেজিস্ট্রি হয়ে যাবে। তারপর সবাইকে জানিয়ে-টানিয়ে আনুষ্ঠানিক কাজকর্ম হবে। শুনে আমার তো মাথা ঘুরে উঠল। উঃ!

আস্তে বললাম, এতে তোমাদের এত আপত্তির কারণ কী?

দাদা হুংকার দিয়ে বলল, গাড়ল আর কাকে বলে? মাস্টারের মেয়ে কী তুই জানিস না?

কী?

দাদা হতাশভঙ্গিতে বউদিকে বলল, ওগো! তুমি ওকে বুঝিয়ে দিও একসময়। তবে শোন পুঁটু, তুই আমার ছোটভাই। তোকে আমি একরকম নিজের হাতে মানুষ করেছি। বিন্দুমাত্র কৃতজ্ঞতা যদি তোর থাকে, এ কাজ তুই করবি না। আর যদি করিস, এ বাড়িতে ঢুকতে দেব না মনে রাখিস।

আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, এ বাড়িতে আমার শেয়ার নেই?

না।

বউদি আগুনের হল্কা বের করে দিল। শেয়ার দেখাচ্ছ? বাড়ি ভেঙে বাড়ি তৈরির জন্য বিশ হাজার টাকার লোন আছে তোমার দাদার নামে। তিনমাস অন্তর কাঁড়িকাঁড়ি সুদের টাকা গুনতেই অস্থির। দেবে? দাও—দিয়ে তবে শেয়ার দাবি কর। তারপর নতুন ফার্নিচার, আলো, পাখা, এসব তো আছেই। আগে হিসেব করে সেগুলো মেটাও। তারপরে না!

উঠে দাঁড়ালাম। চোখগুলো তিনদিক থেকে আমাকে পোড়াতে থাকল। দরজা খুলে বারান্দায় গেলে দাদা বলল, তাহলে তুই বিয়ে করবি?

কথা দিয়েছি।

পুঁটে!

নিজের ঘরে গিয়ে শান্তভাবে বসলাম। সিগারেট ধরিয়ে ব্যাপারটা ভাবতে থাকলাম। নিছক একটি মেয়ের জন্য সারা শহর উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। সমস্ত মানুষজন জীবনপণ করে বসে আছে, কিছুতেই তাকে কোনও পুরুষের পাশে শুতে দেবে না। তাকে একলা করে রাখার জন্য এবং আমৃত্যু নির্বাসনদণ্ড দেবার জন্য চারদিকে এত চক্রান্ত ছিল, ভাবতে ভাবতে আতঙ্কে কাঠ হয়ে গেলাম। যদি মউকে বিয়ে করি, আমাকে ওরা শাস্তি দেবে। হিমযুগের নিষ্পত্র বৃক্ষের কঙ্কালের আনাচে-কানাচে নেকড়েগুলো চকচকে চোখে তাকিয়ে জিভ চাটছে। কনকন করে হাওয়া বইছে। তার মধ্যে একটা সাদা বরফে ঢাকা বাড়ি। বাড়িটা মউ হয়ে নিষ্পলক হিমচোখে তাকিয়ে আছে আমার দিকে।

বাইরে কেউ বলল, হয়ত পিসিমাই, পুঁটুর খাবারটা? তারপর ফের সব চুপচাপ শুনশান ঠাণ্ডাহিম। উঠে গিয়ে ভেতর দিকের দরজা ভেজিয়ে দিলাম। আশা করেছিলাম, রাতের খাবারটা কেউ অন্যরাতের মত রেখে যাবে। ...

জানালার রডে মুখ রেখে বাঘটা ডাকছিল, জয়ঢাক! জয়ঢাক! জয়ঢাক! তড়াক করে উঠে বসলাম। ঘুরঘুট্টে আঁধার। বাঘটা ডেকেই চলেছে, জয়ঢাক! জয়ঢাক! জয়ঢাক! পলকের জন্য রামপ্রসন্ন স্যারের চিন্তা ঝিলিক মেরে গেল। ছেলেবেলায় একটু মোটাসোটা ছিলাম বলে কেউ কেউ আমাকে জয়ঢাক বলে ঠাট্টা করত। কিন্তু কথাটা চালু করেছিলেন অঙ্কের স্যার রামপ্রসন্ন রক্ষিত। লেংচে হাঁটতেন বলে তাঁরও নেপথ্যনাম ছিল ল্যাংচারাম। এই বাঘটাই যদি হয় কুঠির জঙ্গলের সেই রেনবোসায়ের গুলিখাওয়া শেষ বাঘ, সে পোড়া বেম্ম হওয়াই উচিত। কিন্তু রামপ্রসন্ন স্যারের চিন্তা ঝিলিক দেওয়ায় বাঘটা হয়ে গেছেন তিনিই এবং আমি ভুসকালো আঁধারে বসে ল্যাংচারাম বলে শোধ নেওয়ার চেষ্টা করলুম। গলা দিয়ে সেটা বেরুল না। এদিকে বাঘটা এবার খর খর করে নখের আঁচড় কাটতে কাটতে থাবা মারতে থাকল, জয়ঢাক! জয়ঢাক! জয়ঢাক!

ভয়টাই আমাকে পুরো জাগিয়ে দিল। এবার শুনলাম, বাইরের দরজার কপাটে কেউ ধাক্কা দিচ্ছে আর চাপা গলায় ডাকছে, জয়দা! জয়দা! জয়দা!

ঘরের ভেতর আবছা আঁধার। অপরিসর ডিভানে আমার বিছানা। অন্যপাশে চলনসই সোফাসেট। বউদি কাল রাতে যে 'নতুন ফার্নিচারে'র হিসেব দিচ্ছিল, সেই সব। ধাক্কা খেতে খেতে এগিয়ে দরজা খুলেই নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলাম না।

বাইরে সংকীর্ণ খোলামেলা রোয়াকের মাথায় দাঁড়িয়ে আছে অবিশ্বাস্য মউ। খুব হাল্কা ছাই-রঙা আলোয় ছেয়ে আছে চারদিক। কালকের মত কুয়াশা জড়িয়ে আছে ঘন হয়ে। গলিরাস্তার মোড়ের ল্যাম্পপোস্টটা এখনও জুগজুগ করছে। গায়ে জড়ান কালো চাদরটার দিকে চোখ রেখে শুধু বললাম মউ!

অলীক কোকিলের ঝাঁক ভাঙাগলায় কুহুডাক ডাকবার চেষ্টা করেই কেন কে জানে থেমে গেল। প্রজাপতিরা একবার নড়ে উঠে আবার মৃতদের বুকে ঘুমিয়ে পড়ল। ফুলগুলো কুয়াশার ভেতর শিশিরে ভিজে ভারি হয়ে মুখ নামিয়ে রইল। আমি আবার বললাম, মউ?

মউ আস্তে বলল, জয়দা, তোমার সঙ্গে কথা আছে।

বেশ তো! এস, ভেতরে এস। স্বাভাবিক কণ্ঠস্বরে আমি বললাম।

মউ বলল, ভেতরে যাব না। এখান থেকেই বলে চলে যাব।

সে কী! আমি জড়ান গলায় বললাম।... কী প্রচণ্ড কুয়াশা দেখছ? ঠাণ্ডাটাও জব্বর পড়েছে, তাই না? কাল স্যারের সঙ্গে এমনি কুয়াশার ভেতর কতদূর ঘুরতে গিয়েছিলাম। সে একটা এক্সপিডিশান। মউ, তুমি ভেতরে এস। আগে স্যারের কথা শুনি। কাল যেতে পারিনি আর। আমার ধারণা, স্যার অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। না না মউ, তোমারও শরীর খারাপ হয়ে যাবে ঠাণ্ডা লেগে। ভেতরে এস বসে। আগে বল, স্যার কেমন আছেন?

মউ নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে ছিল আমার দিকে। সেজন্য এইভাবে আমি গলার আঠা দিয়ে কথা জুড়ে-জুড়ে স্মার্ট থাকার চেষ্টা করছিলাম। মউ আরও সেকেন্ড কতক চুপ থাকার পর শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বলল, জয়দা! বাবা তোমাকে কী বলেছে, জানি না। যদি—যদি বিয়ে-টিয়ের কথা বলে থাকে, তা হয় না। হবে না।

জেলখানার ঘড়িটা ঢঙ ঢঙ করে বাজতে বাজতে ফুরিয়ে গেল। কুয়াশার ভেতর উঁচু পাঁচিলটার দিকে দৃষ্টি রেখে বললাম, মউ, মন্দিরতলায় আগুন ছুঁয়ে আমি প্রতিজ্ঞা করেছি—

কী প্রতিজ্ঞা করেছ? ওসব প্রতিজ্ঞা-ট্রতিজ্ঞা আমি বুঝি না।

কেন মউ? প্রতিজ্ঞা খুব সামান্য ব্যাপার নয়।

মউ হিসহিস করে একরাশ ধোঁয়ার মত ভাপ বের করতে করতে বলল, যে কারণেই হোক, এ বিয়ে হবে না।

বেশ তো! হবে না! আমি কেমন একটু হাসলাম। হবে না, তাতে কী? আসলে স্যার নিজে থেকেই যখন বললেন অমন করে, তখন—

অমন অসংখ্য লোককে বলেছেন। তারা তো রাজি হয়নি। তুমি রাজি হতে গেলে কেন জয়দা?

মউয়ের কণ্ঠস্বরে এবার একটু কান্নার কোমলতা ছিল। আমার কষ্ট হল। বললাম, বাধাটা কিসের, একটু আভাস অন্তত দেবে মউ? বেশ তো, বিয়ে না হয় হলই না। তবু যদি জানতে পারি, স্যারকে আমি বলব।

মউয়ের চোখ জ্বলে উঠল।... থাক্। তোমাকে ভালমানুষি করতে হবে না। আমি যাই!

সে ঘুরে নিচের ধাপে পা নামালে দ্রুত বললাম, বরুণবাবুর জন্যই কি?

মউ ঘুরে ভুরু কুঁচকে তাকাল।...কার জন্য?

সেই কম্পাউন্ডার ভদ্রলোক।

মউয়ের মুখে হিংস্রতা ফুটে উঠল। তোমাকে খুব সরল ভাবতাম জয়দা! ভেতর-ভেতর তুমি এমন নীচ জানতাম না। বলে সে রাস্তায় গিয়ে নামল।

তাকে অনুসরণ করলাম। মউ, শোন!

কী?

তোমার সম্পর্কে লোকের এত খারাপ ধারণা আছে, আমি কাল অব্দি জানতাম না। আজ সারাদিন যার কাছে গেছি, সেই তোমার বদনাম করেছে। কেন মউ?

মউ আমার কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে হাঁটতে শুরু করেছিল। তার সঙ্গ ধরার জন্য খালি পায়েই ঠাণ্ডা, কঠিন, এবড়োখেবড়ো পিচের ওপর খোঁড়ামানুষের মত হাঁটতে-হাঁটতে আবার বললাম, কেন তোমাকে সবাই এমন ভাবে, মউ? কেন প্রত্যেকে আমাকে নিষেধ করে, তোমাকে যেন বিয়ে না করি? মউ, এসব কথা কেন ওঠে? আমি তো তোমাকে চিরদিন খুব ভাল মেয়ে বলে বিশ্বাস করি। অখিলস্যারের মেয়ে তুমি। কখনও খারাপ হতে পার না। আর মউ, তবু আমার আপত্তি ছিল না।

এখনও নেই। যদি তুমি সত্যিই খারাপ হও, তাতেও কিছু যায়-আসে না আমার। আসলে আমি চিরদিন তোমাকে মনে মনে ভালবেসেছি, মউ। এখনও ভালবাসি। মউ! মউ! মউ!

ড্রেন ডিঙিয়ে বাঁদিকে আগাছার জঙ্গলের ভেতর দিয়ে মউ মিলিয়ে গেল। আমি ড্রেনের এধারে দাঁড়িয়ে কুয়াশামাখা জঙ্গলটার দিকে তাকিয়ে রইলাম। স্বপ্ন, নাকি সত্যি সত্যি? সত্যিসত্যি, নাকি স্বপ্ন? পায়ের তলার ঠাণ্ডা পিচ তিনসত্যি করছিল। খালি পায়ে রামপ্রসন্ন স্যারের মত ল্যাংচারাম হয়ে ফিরে দেখি, দরজায় উঁকি মেরে পিসিমা দাঁড়িয়ে আছেন। আমাকে দেখে ষড়যন্ত্রসঙ্কুল ভঙ্গিতে ফিসফিস করে বলে উঠলেন, মাস্টারের মেয়ে এসেছিল না?

ভেতরে ঢুকে কাঁপতে-কাঁপতে গায়ে চাদর জড়ালাম। পিসিমা আবার তেমনি ফিসফিস করে বললেন, কাল সারারাত ঘুমতে পারিনি রে! তোর কথা ভেবে-ভেবে খালি কেঁদেছি। খাবারটুকু যে দেওয়া দরকার, ওই নিষ্ঠুর মেয়ের সে কর্তব্যজ্ঞান কি হল? কিচেনে দিব্যি তালা এঁটে দিয়ে শুয়ে পড়ল। পুটু! আজ যদি দাদা বেঁচে থাকতেন! ... পিসিমা চোখ মুছে নাক ঝেড়ে আমার মাথায় হাত রাখলেন। ... মন শক্ত করে ফ্যাল, বাবা! বাপঠাকুর্দার ভিটে। বেজা বললেই হল? যদি বিয়ে করে সংসারি হওয়ার ইচ্ছে হয়ে থাকে, কারুর কথা কানে নিসনে। করে ফ্যাল। মাস্টারের মেয়েকেই যখন পছন্দ, তাকেই কর্। লোকের কথায় কী আসে যায় রে? তাছাড়া মাস্টারেরও তো আর কেউ নেই। ওঁর যেটুকু আছে, সবেরই তুই মালিক হবি।

পিসিমা আমার মাথায় খুব স্নেহ মাখাচ্ছিলেন। ষড়যন্ত্র করার ভঙ্গিতে আরও কী সব কথা বলছিলেন। আমার চারদিকে কুয়াশা। আর সেই কুয়াশার ভেতর পিসিমার কণ্ঠস্বর। একসময় মনে হল, মাস্টারের মেয়ের প্রশংসা করছেন। বেশি বয়স অব্দি আইবুড়ো থাকলে তার নামে কুৎসা রটানো মানুষের চিরদিনের অভ্যাস। খুব ভাল মেয়ে, খুবই ভাল। সাতচড়ে রা নেই, বড়ফট্টাই নেই, এমন মেয়ে। কারুর সঙ্গে মেশে না। বাপে-ঝিয়ে একটেরে থাকে বলেই লোকের এত নিন্দেমন্দ। কারুর কথায় কান দিতে নেই। ইচ্ছে যখন হয়েইছে, তখন আর—

ভেতরদিকে দরজা খোলার শব্দ শুনে পিসিমা থামলেন। ওই রাজার মেয়ের ঘুম ভাঙল বুঝি! বলে নড়বড় করতে-করতে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

রুদ্রের অফিসে যাওয়ার দরকার আছে কি আর? ঘড়ি দেখে হাই তুলে সিগারেট ধরালাম। সাড়ে ছটা। রাস্তায় মোহনগয়লা দুধের পাত্র নিয়ে হুম হুম করে কী বলতে বলতে হেঁটে গেল। রুটির কারখানা থেকে সাইকেলভ্যান ঘন্টি বাজাতে বাজাতে ঢঙাস ঢঙাস শব্দ করতে করতে চলে গেল একের পর এক। খঞ্জনি আর খোল বাজাতে বাজাতে রাধুবাবুর দলটা চলেছে সাধুবাবার আশ্রমে। ভজ গৌরাঙ্গ জপ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গের নাম রে!

মউ এসেছিল!

চমকে উঠলাম। সত্যি? একি সত্যি? মউ যা বলে গেল, তাও কি ...

আমি পূর্বজন্মে কী ছিলাম? গাড়ল, না গাধা, না রামছাগল? যা হোক একটা কিছু ছিলাম কিন্তু আসল কথাটা হচ্ছে, আমার মানুষ হওয়াটা খুব দরকার হয়ে পড়েছে। অখিলস্যার বলেন, মানুষ জন্মায় দ্বি-পদ প্রাণী হয়ে। অনেক সাধনায় নাকি তাকে মানুষ হতে হয়। হুঁ, এই কথাটা এমন করে কখনও বুঝিনি দেখছি। মানুষ হওয়ার জন্য সাধনার দরকার। আমাকে শিগগির মানুষ হয়ে উঠতে হবে।

কিছুক্ষণ পরে যখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলাম, তখন মনে হল মানুষ হবার জন্যই বেরিয়ে পড়েছি। শ্লেটের লেখা মোছার মত করে এতদিনকার পুটুকে ঘষতে ঘষতে স্রেফ মুছে ফেললাম। কাল ভোরে অখিলস্যার আমাকে ডাকতে যাননি। তাঁর মেয়েকে বিয়ে করতেও বলেননি। বাদবাকি সবকিছু এবং মউয়ের আসা থেকে পিসিমা পর্যন্ত সব ডাহা মিথ্যা। পরিষ্কার শ্লেট নিয়ে হনহন করে আমি হাঁটছিলাম। ...

নীলা রেস্তোরাঁয় জম্পেশ করে দুটো মাখনটোস্ট, একটা ওমলেট আর চা খেয়ে ভানুদাকে খাতা চাইলাম। ভানুদা খাতা দেবার সময় ঘড়ঘড় করে বলল, ডেট পেরিয়ে গেল, জয়। সাতাশ টাকার ওপর হয়ে গেছে।

খাতায় আইটেম লিখলে দাম বসানোর দায়িত্ব ভানুদার। লিখতে লিখতে বললাম, ঘাবড়াও মাৎ ভানুদা! তুম প্রেমসে খিলাতা, হাম ভি প্রেমসে দে দেগা!

ভানুদা হাঁ করে তাকিয়ে রইল। রাস্তায় গিয়ে ভাবলাম, হঠাৎ হিন্দি বললাম কেন ভানুদাকে? তাছাড়া ওইরকম মাস্তানি ভঙ্গি করে কথা বলা! ফিরে গিয়ে আগের মত ন্যাকা মুখ করে বলব নাকি, ও কিছু না, তুমি শিগগির পেয়ে যাবে ভানুদা?

সাইকেলে আসতে আসতে ব্রেক করে আমার সামনে দাঁড়িয়ে গেল কেউ। পেছনে কুয়াশাচিরে সূর্য বেরুচ্ছে। তাই হঠাৎ করে চিনতে পারিনি। কথা শুনেই বুঝলাম বাপী। বাপী চোখ নামিয়ে বলল, খুব যে! অ্যাঁ? ব্যাপার কী? খুব উন্নতি হয়েছে। অ্যাঁ?

কী রে?

আবার কী? বলে হ্যান্ডেলধরা ঠাণ্ডা আঙুলে বাপী আমার চিবুক খামচে দিল। নেকু! খুব যে ভেতর-ভেতর—অ্যাঁ।

ভেতর-ভেতর কী, বাপী?

বাপী দাড়ি চুলকে হ্যা হ্যা করে হেসে বলল, দেখালি জয়ঢাক! উঁচু হয়ে ছুঁচ হয়ে ঢুকে ফাল হয়ে—অ্যাঁ? তবে ও জিনিসে আর কিস্যু নেই! সে বুড়ো আঙুল নাড়ল। ...স্রেফ তলানিটুকু। সেই ফ্রকপরা বয়স থেকে—বুঝলি তো? অ্যাঁ? কী রে জয়ঢাক? অ্যাঁ?

আমি ঠিক ওর মত করে অ্যাঁ বললে বাপী তেমনি হঠাৎ জোরে বেরিয়ে গেল। এই বাপী ডব্লিউ বি সি এস পাশ করে খুব দামি চাকরি পেয়েছে কোথায়। আমার কিছুই হল না। শ্বাস ছেড়ে সূর্যের দিকে হাঁটতে থাকলাম। কালো সিল্যুট সব মূর্তি কাঁপছে সোজা রাস্তার ওপর। মনে হল, আবার কেউ হঠাৎ থেমে কিছু বলে যাবে। ফ্রকপরা বয়স থেকে—কী? কে ফ্রকপরা বয়স থেকে ...? এই রাস্তায় যত এগিয়ে যাব, তত একজন করে লোক একটা ফ্রকের কাহিনী নিয়ে অপেক্ষা করছে দেখব। তারপর একটা শাড়ির কাহিনী বলার জন্য আরও লোক এই শহরের আনাচে-কানাচে ওত পেতে থাকবে।

কেউ যেন আমাকে ডাকছিল। ঝটপট ডানদিকের গলিতে ঢুকে গেলাম। গলিটা বাঁক নিতে নিতে একটি বস্তি, বস্তির পাশ দিয়ে এগিয়ে পুরনো খ্রিস্টান কবরখানা—সেখানে দাঁড়িয়ে শিমুল গাছটার দিকে তাকালাম। আজ নতুন কিছু চোখে পড়ল না। গাছটা আবার গাছ হয়ে গেছে। গেট দিয়ে ঢুকে প্রাচীনকালের কবরের ভেতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে উল্টোদিকের গেটে গিয়ে দেখি তালা বন্ধ। নিচু পাঁচিলে হাঁচড়-পাঁচড় করে উঠে পোড়ো একটা জমিতে ঝাঁপ দিলাম। একদঙ্গল শুয়োর আমার দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টে তাকাল। তাদের পাশ কাটিয়ে ঘাসের জমিটা পেরিয়ে যেতেই কেদারের মুখোমুখি।

কেদার গাইগরুটা রোদে বাঁধতে এসেছিল। কোমরে একটা হাত, অন্যহাতের দুরমুষ—সে আমাকে দেখছিল। তার কালো মুখের দাঁতগুলো বিকট দেখাচ্ছিল।

কিন্তু সে হাসছিল। ...পুঁটুবাবু, এদিক দিয়ে যে? ইশ্! চোরকাঁটায় কী অবস্থা করেছ প্যান্টের?

বেড়াচ্ছি, কেদারদা!

দাও, একটা সিগারেট খাই! ...সিগারেট ধরিয়ে দিলে সে জোরে টান মেরে খকখক করে কাসতে লাগল। তারপর আকাশ দেখে বলল, আজ সকাল-সকাল রোদ্দুরটা বেশ ফুটেছে! কালকে এতক্ষণ কী অবস্থা! রেলফটকে একটা অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে, শোননি?

না কেদারদা।

উঃ ভীষণ অ্যাকসিডেন্ট! ইঞ্জিনের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে অতবড় একটা ট্রাক ছাতু। তবে ড্রাইভার বেঁচে গেছে। কী করে বাঁচল, সেই জানে! এদিকে পেছনে চারজন ছিল। দুজন অক্কা, দুজন হাসপাতালে ধুঁকছে।

কেদারদা, মাস্টারমশাই কি করছেন?

কেদার আরও গম্ভীর হয়ে গেল। ...কী জানি বাবু, কী হয়েছে বাবা-মেয়ের। কাল সারারাত ঝগড়া করছে শুনছিলাম। আজও সকাল থেকে তক্কাতক্কি। ঝগড়া। আমি জিগ্যেস করতে গেলাম তো মাস্টারবাবু লাঠি তুলে বললে, গেট আউট! ...কেদার আবার কাসতে লাগল। কাসির চোটে যেন রাগ

করেই সিগারেটটা দুরমুষে ঘষে নেভাল সে। তারপর একটু হাসল। ...অবশ্যি এ নতুন কিছু না। বরাবর দুজনে এরকম। তক্কাতক্কি, চ্যাঁচামেচি। আবার দেখি সামনাসামনি বসে চা খাচ্ছে আর হাসিতামাসা করছে। আসলে মা-হারা মেয়ে তো! নিজের জোরে বড় হয়েছে। একটু জেদী তো হবেই।

বাইরে থেকে দেখে বোঝা যায় না কিন্তু।

হুঁ, তা যায় না। বেশি কথা বলে না যে! কেদার ঘুরে গাছপালার ভেতর বাড়িটা দেখে নিল। ...আজ এমন রেগে আছে, দুধ দুইতে বসলাম তো বাছুর ধরতে এল না। তখন মাস্টারবাবু নিজেই এসে বাছুর ধরলে। পঁচাত্তরের ওপর বয়স হয়েছে। বাছুরটাও খুব তেজী। মাস্টারবাবু পড়ে গিয়ে পা ভাঙার দাখিল। তখন এসে বললে, ছাড়!

কেদার হাসতে লাগল। বাছুরটা এখন মায়ের গায়ে ঢুঁ মারছে। মা ঘুরে শিঙ নেড়ে গুঁতোবার ভান করছে। একটা সাদা প্রজাপতি তাদের পিঠের ওপর দিয়ে পতপত করে উড়ে কেদার ও আমার মাঝখান দিয়ে চলে গেল। কেদার সস্নেহে গরুদুটোকে দেখছিল। প্রজাপতি সে বোঝে না। আমি বুঝি। বুঝি বলেই হঠাৎ আমার শ্লেটে আগের সব ঘটনা ফুটে উঠল. যেন প্রজাপতিটার পায়ের আঁচড় কাটার ফলেই। বললাম, কেদারদা, মউয়ের সঙ্গে আমার বিয়ের কথা তুমি দাদাকে বলতে গেলে কেন?

কেদার কাঁচুমাচু মুখে বলল, আমি অত কী জানি? কাল সকালে মাস্টারবাবু আমাকে চুপি চুপি ডেকে কথাটা বললে। আমি ভাবলাম, এ তো খুব ভাল খবর। বিকেলে বাজারের কাছে তোমার দাদার সঙ্গে দেখা। নতুন কুটুম্ব হতে চলেছে ভেবে বড়মুখ করে বলতে গিয়েই বোকা বনে গেলাম। তোমার দাদা আমাকে মারতে বাকি রাখল। ফিরে গিয়ে মাস্টারবাবুর কাছে আবার বকুনি খেলাম। আমার হয়েছে জ্বালা। ...কেদার ফোঁস করে শ্বাস ছেড়ে ফের বলল, সেজন্যেই তো—এই যে দেখছ, তোমার সঙ্গে দেখা হল। এত কথাবার্তা বলছি। ওই কথাটা বলছি না। বলছি কি?

বল কেদারদা, শুনি!

কী?

আমার আর মউয়ের বিয়ের কথা।

কেদার খি খি করে হাসতে গিয়ে দারুণ কেসে ফেলল। তারপর বলল, ভালই তো! আপনি একা একা ঘুরছেন, মেয়েটাও একা-একা ঘুরছে। দুজনে মিলে ঘরসংসার করবেন। ছেলেপুলে হবে। এই তো নিয়ম পুটুবাবু! কেউ উল্টো রাস্তায় হাঁটতে চাইলে ভুল করবে।

কে উল্টো রাস্তায় হাঁটতে চাইছে, কেদারদা?

কেদার আবার বাড়ির দিকটা দেখে নিয়ে চাপা গলায় বলল, ও বাড়িতে এতকাল ধরে আছি—তা ধর, বছর পাঁচ-সাত হয়ে গেল। মউ যখন কলেজে পড়ে, তখন ঢুকেছি। কলেজে পাশ দিলে। বছর দুই হারাধনবাবুদের মহিলাসমিতিতে চাকরি করলে। তারপর কী গণ্ডগোল হল জানি না। ওরা ডিসমিস করলে, না নিজেই রিজাইন দিয়ে এল—তারপর ধর—দুটো বছর চুপচাপ বসে আছে। কিন্তু এর মধ্যিখানে একটা চেঞ্জ হয়ে গেছে। বুঝলে?

হুঁ, চেঞ্জ! পরিবর্তন।

পরিবর্তন। প্রতিধ্বনি করল কেদার। ...মাস্টারবাবু তো আমার কাছে প্রাইভেট করে না কিছু। সব কথা বলে। কনসালও করে। তা ওঁর মত এড়ুকেটেড বিদ্বানকে আমি কী কনসাল দেব? ক্লাস থ্রি অব্দি বিদ্যা।

কেদারদা, তুমি মউয়ের পরিবর্তনের কথা বলছিলে।

হ্যাঁ—একেবারে উল্টো হয়ে গেছে মেয়েটা। হাসিখুশি না, বেশি কথাবার্তা না—কেমন যেন ভেতর-ভেতর শুকিয়ে যাচ্ছে। আর মাস্টারবাবু যতবার বিয়ের ঠিকঠাক করেছেন, ততবার ঝগড়া। কিছু ভেবে পাই না। মাস্টারবাবুও দুঃখ করে বলেছেন, ও এমন কেন করছে কেদার? যে কোনও মোমেন্টে আমার ডেথ হয়ে যাবে, তখন ওর কী হবে? তুইও বুড়ো হয়ে গেছিস। এই বাড়িতে ও কী করে থাকবে?

আস্তে বললাম, কেদারদা, বরুণ কম্পাউন্ডারকে তুমি চিনতে?

কেদার একটু চমকাল যেন। গলার ভেতর বলল, হুঁ—ভোলাডাক্তারের ডিসপেন্সারিতে থাকত।

মউয়ের সঙ্গে তার কি—হঠাৎ থেমে গেলাম আমি। হয়ত উচিত হয়নি কথাটা বলা।

কেদার আমার দিকে তাকিয়ে মুখ নামাল। একটু মাথা নেড়ে হাসল সে। ...মহা চিটিংবাজ। তবে জিগ্যেস করলে যখন, সে হিসট্রি শোন। বলে দুরমুযটা ধপাস করে ফেলে রোদে পিঠ দিয়ে বসল কেদার। আমাকেও ইশারায় বসতে বলল।

ঘাসে তখনও শিশির। একটু ইতস্তত করার পর আবার তার হাত নাড়া দেখে ভিজে ঘাসেই বসলাম। কেদারের মুখ দেখে মনে হচ্ছিল সে, জম্পেশ করে হিসট্রি আওড়াবে বলে তৈরি। ওর গোঁফ তিরতির করে কাঁপছে। ঘোলাটে চোখ দুটো পিটপিট করছে। ভাঙা দাঁতের ফাঁকে জিভটা জবজব করছে। হঠাৎ বিকট গলা ঝেড়ে থুথু ফেলে সে বলল, একের নম্বর চিটিংবাজ।

বরুণ তো?

বরুণ। কেদার নরম গলায় বলল। মেয়েটাকে তো জান—বাড়ির আনাচে-কানাচে সবসময় ঘুরে বেড়ায়। কী করে কে জানে। একদিন দেখি, বিষপিঁপড়ের সার যাচ্ছে। কাছে বসে তাকিয়ে আছে। নালার কাছে কেয়াঝোপটা দেখেছ কি? একদিন দেখি, কাঠি দিয়ে সাপের খোলস টানাটানি করছে।

বরুণের কথা বলছিলে কেদারদা!

হুঁ, চিটিংবাজ। দেশে খোঁজ নিতে পাঠিয়েছিল মাস্টারবাবু। গিয়ে শুনি, তিনটে কাচ্চাবাচ্চার বাবা। দস্তুর মত বউ আছে। এদিকে মউয়ের সঙ্গে বিয়ের কথাবার্তা প্রায় পাকা। দিনক্ষণ ঠিক হতেই যা বাকি। তবে গোড়ার হিসট্রিটা না শুনলে কিচ্ছু বুঝবে না। কেদার ফিকফিক করে হাসতে লাগল। ...হুঁ, আগে মউয়ের কীর্তি শোন। পায়ে কাঁটা ফুটে শেষে পা ফুলে ঢোল। সেপটিক হয়ে একাকার। জ্বর। ভোলা ডাক্তার এসে দেখে বলে গেলেন, পনেরখানা ইঞ্জেকশান লাগবে। তখন বরুণ কম্পাউন্ডার রোজ তিনবেলা এসে ইঞ্জেকশান দিয়ে যায়। দিনে তিনটে করে পাঁচদিনে পনেরখানা। কী সাংঘাতিক অবস্থা, বোঝ তাহলে।

সাবধানে বললাম, প্রেম-ট্রেম নাকি এইভাবেই হয়।

কেদার দ্রুত সায় দিল, হয়। হবে না কেন?

হয়েছিল!

কেদার নড়ে বসল। তুমিও যেমন! ও মেয়ের মন পেতে বরুণকে সাতবার জন্মাতে হবে। মউ সহজ মেয়ে নয়।

প্রেম হয় নি?

লা, লা। কেদারের হাসি দন্ত্য ন-কে ল করে দিল। তোমার মাথা খারাপ পুঁটুবাবু? আসলে বরুণটা ছিল বেজায় ড্যামনা। ইঞ্জেকশান শেষ হল। মউ আবার হাঁটাচলা করতে লাগল। কিন্তু বরুণ তবু বাড়ি ছাড়ে না। মাস্টারবাবুকে তো জান—তোমাকে যেমন করে ভূতে ধরার মত ধরেছে, বল সত্যি কি না?

সত্যি। খুব সত্যি।

বরুণকে ঠিক সেইরকম ধরেছিল মাস্টারবাবু। একবেলা বরুণ না এলে আমাকে ডাকতে পাঠায়। এই করে হঠাৎ একদিন শুনি, বিয়ের কথাবার্তা পাকা হয়ে গেছে।

মউ রাজি হয়েছিল?

বোঝা যাচ্ছিল না। তবে মুখখানা কেমন যেন ভার করে বেড়াত। যখন-তখন দেখতাম, নালার ধারে ব্রিজের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। ...কেদার আড়ামোড়া দিয়ে হাই তুলে বলল, ইতিমধ্যে একদিন হঠাৎ ভোলাডাক্তার এলেন। মাস্টারবাবুর সঙ্গে প্রাইভেটে কী সব কথাবার্তা হল। তারপর মাস্টারবাবু আমাকে ডেকে বললেন, একবার কেয়াতলা ঘুরে আয় তো কেদার। কেয়াতলা কি এখানে? বাসে চাপলে পাঁচটা ঘণ্টা লেগে যায়। সেই পদ্মার ধারে বর্ডার মুল্লুকে। অসভ্য জায়গা—লোকজনের কথাবার্তার যা ছিরি—আর ...

তারপর কী হল কেদারদা?

আমার খুব রাগ হয়েছিল, পুঁটুবাবু! মাস্টারবাবু বলেছিলেন, চেপে যা। আমি চাপি নি। আর একটু হলেই হতভাগা মেয়েটার কী সর্বনাশ হয়ে যেত, আর আমি ঢ্যামনাটাকে ছেড়ে দেব? গিয়ে ডিসপেন্সারিতে ঢুকে ওর জামার কলার ধরে রাস্তায় নিয়ে গেলাম। আমাকে তো জান।

খুব খুশি হয়ে বললাম, জানি কেদারদা! তুমি—তুমি একজন...

কেদার আমার প্রশংসা নিল না। বলল, ছাড়! চিটিংবাজকে জন্মের মত টাউন ছাড়িয়ে তবে শান্তি হয়েছিল মনের। রাস্তায় লোকও জড় হয়েছিল খুব। পাড়ার ছেলেরাও খুব সুখ মিটিয়ে নিয়েছিল হাতের। ...সে খিক খিক করে হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়াল। গরুটা একটা ঝোপের সঙ্গে দড়ি আটকে সমস্যায় পড়েছিল। যত্ন করে ছাড়াতে থাকল সে।

আমিও উঠে দাঁড়ালাম। সেদিন কোথায় ছিলাম আমি? আগের বছর মাসছয়েকের মত দুর্গাপুরে মাসতুতো ভাই মহাদেবের কাছে ছিলাম। চাকরির আশায় যাওয়া। হন্যে হয়ে ফিরে এসেছিলাম। একে সাদাসিধে বি এ পাশ, ওদিকে নাকি 'সন অফ সয়েল'দের লড়াই চলছিল, তার ওপর ইউনিয়নের ডাকে ধর্মঘটও শুরু হয়ে যায়। মহাদেব বলেছিল, খামোখা বসে থেকে বয়স বাড়ানো ঠিক নয়, পুঁটু। সব মিটে যাক, আবার খবর দেব। আর খবর দেয় নি মহাদেব।

পা বাড়াচ্ছি, তখন কেদার ডেকে বলল, মনে কোনও কিন্তু রেখ না পুঁটুবাবু।

রাখিনি কেদারদা!

বুড়ো মানুষটা তোমাকে বড্ড ভালবাসে। মনে শান্তি পাবে। মেয়েটারও শান্তি হবে।

মউয়ের মনে কিসের অশান্তি, কেদারদা?

কেদার কপালে হাত রেখে চোখে রোদ বাঁচিয়ে বলল, ও একটা কথার কথা।

গাছপালার ভেতর দিয়ে একফালি পায়ে চলা রাস্তা। ঘনছায়ার ভেতর শুকনো পাতার স্তূপে একঝাঁক খঞ্জনা পোকা খুঁজে হন্যে হচ্ছিল। আমাকে গ্রাহ্য করল না তারা। ঝোপের ভেতর হুমড়ি খেয়ে হাড়কুড়োনি সাঁওতাল মেয়েটা কী একটা করছিল। আমার পায়ের শব্দে মুখ ঘুরিয়ে দেখে একটু হাসল। আমি কি তাকে বকাবকি করব ভেবেছে? আমি পৃথিবীর সব চেয়ে শান্ত এক প্রাণী। সবচেয়ে ন্যালাভোলা। আমাকে দেখে কেউ ভয় পায় না। আমার পায়ের কাছ দিয়ে অকুতোভয়ে হেঁটে গেল একটা কাঠবেড়ালি। দোতালা জরাজীর্ণ কালো বাড়িটার গেটের সামনে পৌঁছে ঠেকাদেওয়া অর্ধবৃত্তাকার বুগানভিলিয়ার ঝাঁপিতে লাল নকশার মত ফুলগুলোর দিকে তাকালাম। কোথাও একটা উৎসব হবার কথা ছিল—অনিবার্য কারণবশত হয়নি বলে খুব ম্রিয়মান। তাতে কী? এমন তো হয়েই থাকে। হবে আবার কোনও একদিন। ওদের খুব কাছে বাঁধা হবে মাইকের চোঙ এবং বিসমিল্লা খাঁর সানাই এখনও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এখানেই এসে দাঁড়াবেন সম্মানিত বরযাত্রীরা। পুরনারীরা উলুধ্বনি দেবেন এবং শাঁখ বাজাবেন। ভেব না সব ঠিক হয়ে যাবে।

খুব চাপা আর চিড়খাওয়া গলায় কেউ ডাকল, জয়! জয়!

দোতালার জানালার রডে নাক ঠেকিয়ে অখিলবন্ধু বসে আছেন। আমি খুব হকচকিয়ে গেলাম। চুরির দায়ে ধরাপড়ার মত অবস্থা আমার। এভাবে আসা কি উচিত হয়েছে? মউ যদি আমাকে আবার বকাবকি করে!

অখিলবন্ধুর একটা হাত বেরিয়ে এল। হাতটা নাড়তে লাগল খুব। তখন সাবধানে পা পেলে মুখ নিচু করে আলকাতরামাখানো কাঠের বেড়াটা আস্তে ঠেলে ভেতরে ঢুকে গেলাম। কোনও দিকে না তাকিয়ে বারান্দায়, বারান্দা থেকে সিঁড়িতে, সিঁড়ি থেকে অখিলস্যারের ঘরে ঢুকতে বুকে দুমদাম ঢাকের বাজনা। স্যার বললেন, কেদার এলে ওকে দিয়ে ডাকতে পাঠাতাম। বস জয়। ওই চেয়ারটা নিয়ে এস। আর শোন, দরজাটা আগে বন্ধ করে দাও।

অখিলস্যার জানালার ধারে বিছানার ওপর বসে আছেন। বিছানা জুড়ে বইপত্তর, ছোট্ট টিনের সুটকেস—যার ঢাকনা নেই এবং ভেতরে ছুরি কাঁচি কলম আয়না আর অসংখ্য জিনিস। পায়ের দিকটায় লেপ চাপানো ছিল। সরিয়ে দেয়ালে বালিশ ঠেলে দিয়ে পিঠ রেখে সোজা হলেন। ফের বললেন, দরজার ছিটকিনি এঁটে দাও!

কিছু না বুঝে হুকুম তামিল করলাম। চেয়ারটাও কাছাকাছি আনলাম। কিন্তু অখিলস্যার বললেন, আরও কাছে নিয়ে এস। হুঁ, ঠিক হয়েছে। বস!

বসে মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। অখিলস্যার নিজের দু'হাতের খসখসে আঙুল দেখতে দেখতে বললেন ফের, নিচে মহুয়াকে দেখলে?

না তো!

কেদার বড্ড দেরি করছে গরু বাঁধতে গিয়ে। ওর জন্য পথ তাকাচ্ছিলাম।

কেদারের সঙ্গে দেখা হয়েছে, স্যার। ওখানে খাসজমিতে গরু বাঁধছে।

তোমার সঙ্গে কোনও কথাবার্তা হল নাকি?

হ্যাঁ। অনেকক্ষণ দুজনে গল্প করলাম।

মউয়ের ব্যাপারে কিছু বলল নাকি কেদার?

বলছিল।

কী?

বরুণ কম্পাউন্ডারের কথা।

অখিলস্যার নিষ্পলক হিমচোখে তাকিয়ে থাকার পর বললেন, আর কিছু?

না তো!

অখিলবন্ধু অভ্যাসমত সাদা দাড়ি থেকে পটাৎ করে কালো একটা দাড়ি ছিঁড়ে সেটা খুঁটিয়ে দেখলেন কিছুক্ষণ। তারপর জানালার বাইরে সেটা ফেলে দিয়ে শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বললেন, তুমি মউকে অপহরণ কর।

অপহরণ স্যার?

হুঁ। আমাদের ভারতীয় ঐতিহ্যে এটা আছে। অর্জুন সুভদ্রাকে হরণ করেছিলেন। কৃষ্ণ রুক্মিণীকে, তাঁর পুত্র শাম্ব দুর্যোধনকন্যা লক্ষণাকে, তাঁর পৌত্র অনিরুদ্ধ দৈত্যরাজ বাণের কন্যা উষাকে। আমি তোমাকে অনুমতি দিচ্ছি জয়, তুমি মউকে হরণ কর।

স্যার! আমি আর্তনাদ করলাম।

অখিলস্যার ঝুঁকে এলেন আমার দিকে। ... বাধা দেবার কেউ যদি থাকে, সে ওই গোঁয়ারগোবিন্দ কেদার। ওকে আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। ও অত্যন্ত আনপ্রেডিক্টেবল এলিমেন্ট। জাস্ট লাইক অ্যানিম্যাল। বুঝলে কি কিছু?

হ্যাঁ, স্যার।

বোঝ নি। কেদার ডেঞ্জারাস। ওর জোরেই মউয়ের জোর—এতদিনে বুঝতে পেরেছি। ...অখিলস্যার হঠাৎ ফোঁস ফোঁস করে নাক ঝাড়তে থাকলেন। তারপর তোষকের কোনা থেকে নোংরা একটা রুমাল নিয়ে নাক এবং চোখ মুছতে মুছতে ভাঙা গলায় ঘড়ঘড় করে বললেন, তুমি ওকে বলপূর্বক বিবাহ কর, জয়!

বলপূর্বক স্যার?

বাই ফোর্স! তুমি কি জান বহু নারী হৃতা হবার অপেক্ষায় থাকে?

জানি না। কাকুতিমিনতি করে বললাম। সত্যিই আমি জানি না। আসলে মেয়েদের সম্পর্কে আমার কোনও ধারণা নেই।

তোমার নেই, আমার আছে। আমার ছিয়াত্তর বছর বয়স হল। ...অখিলবন্ধু সেই ভাঙা টিনের সুটকেস ব্যস্তভাবে হাতড়ে কলম বের করলেন। তারপর একটা গাবদা নোটবই নিয়ে খসখস করে কিছু লিখলেন কাঁপা-কাঁপা হাতে। লিখে পাতাটা ছিঁড়ে বললেন, নাও। ধর। যত্ন করে রেখে দিও। এটা তোমার লিগাল ডকুমেন্ট।

কাগজটা নিয়ে দেখি, আঁকাবাঁকা হরফে লেখা আছে : 'আমি সুস্থ শরীরে বিনা প্ররোচনায় আমার কন্যাকে বলপূর্বক বিবাহ করিবার অধিকার দিলাম।' তলায় নামসই এবং তারিখ। কাগজটা দেখছি এবং আবার একশ কোকিল গর্জাতে শুরু করেছে। ফুলগুলো বেলুনের মত ফুলছে, প্রজাপতির ঝাঁক পঙ্গপালের মত পাখনা মেলে উড়ে আসছে, বিসমিল্লা খাঁর সানাই পোঁ ধরেছে, এবং ...

স্যার খপ করে কাগজটা কেড়ে নিতেই আবার স্ট্যাটাস কু। মরিয়া হয়ে বললাম, কী হল স্যার?

স্যার বললেন, তোমার নামটাই যে লেখা হয়নি। বলে খ্যা খ্যা করে হাসতে হাসতে আমার নামটা জায়গামত বসিয়ে দিলেন। ...হুঁ, নাও। সাবধানে রেখ। হারিয়ে ফেল না। তবে আশা করি, দরকার হবে না। বললাম না? বহু নারী হৃতা হবার জন্য জন্মায়। নতুবা তাদের আর পতিভাগ্য হয় না। যাও, দরজা খুলে দাও। ক্লোজডোর মিটিং ইজ কনক্লুডেড।

দরজা খুলে দিয়ে এসে বললাম, আমার কিছু বলার ছিল। বলব বলেই এসেছি।

অখিলবন্ধু চমকে উঠলেন। তোমার কী কথা? মাইন্ড দ্যাট, পবিত্র স্থানে অগ্নি স্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা করেছ। জয়, তুমি কি প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করতে এসেছ তাহলে?

না স্যার। ...একটু ইতস্তত করে বললাম, আজ ভোরে মউ আমার কাছে গিয়েছিল।

অখিলস্যার চোখ বড় করে তাকালেন। অ—তারপর?

মউ শাসাল আমাকে, তাকে যেন বিয়ে না করি।

নির্লজ্জা! অখিলবন্ধু নড়েচড়ে বসলেন। ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বরে বললেন, তোমার তাতে রাগ হল না?

না স্যার।

না? জয়! তুমি পুরুষ! তোমার রক্তমাংসের শরীর! অখিলস্যার আমাকে চোখের আগুনে জ্বালিয়ে দিতে দিতে বললেন, তুমি পূর্বজন্মে কী ছিলে জান? কচ্ছপ। কাছিম। বরাবর দেখছি, তুমি খোলের মধ্যে ঘাড় গুঁজে আছ। সেজন্যই তোমাকে টেনে বের করার চেষ্টা করেছি এতদিন। সব চেষ্টা বৃথা হল দেখছি।

বলে হঠাৎ আবার ফুঁপিয়ে উঠলেন। বুড়োমানুষ এমন করলে বড় বিচ্ছিরি লাগে। আমি ওঁর হাতদুটো আঁকড়ে ধরে বললাম, স্যার! স্যার! আমি আর খোলের মধ্যে নেই। বেরিয়ে পড়েছি। তার ওপর স্যার, এই অথরিটি লেটার পেয়ে গেছি। ওয়েট অ্যান্ড সি—আপনি চুপচাপ বসে দেখে যান, আমি কী করি!

নিচে কেদারের সাড়া পাওয়া গেল। অখিলবন্ধু ঝটপট চোখ নাক মুছে ঠোঁটে আঙুল রেখে ইশারা করলেন, কেদার যেন ঘুনাক্ষরে কিছু টের না পায়। তারপর ফিসফিস করে বললেন, তুমি রেডি হয়ে আমাকে জানিয়ে যেও, কবে আসছ। আমি কেদারকে কোথাও পাঠিয়ে অল ক্লিয়ার রাখব। তবে দেরি কোরো না। শিগগির। ...

গরজ বড় বালাই। দুপুরে বউদিকে খেতে চাইলে তুম্বো মুখ করে দিচ্ছি বলল এবং বরাবর যেমন খাই, তেমনি করেই খেলাম। কিন্তু আরও বেশি খাওয়ার দরকার। প্রচুর শক্তি চাই শরীরে, প্রচুর ভিটামিন। আমার আরও মোটা তাজা হওয়া দরকার। মউকে কাঁধে তুলে নিয়ে আসতে হবে—বলপূর্বক! এইসব ভাবতে ভাবতে যা খেলাম, সঙ্গে সঙ্গে হজম হয়ে গেল। সিগারেট টানতে টানতে অবাক হয়ে টের পেলাম, পেটে কিচ্ছু নেই। বললেই পারতাম, কাল রাতেরটা পাওনা আছে। এবেলা উসুল করে দাও বউদি!

আসলে বউদির মুখ দেখে সাহস হয়নি। আমাকে সাহস করতেই হবে। বউদির মুখের দিকে বরং তাকাব না। মনে মনে এই জল্পনা করছি, পিসিমা ট্যাঙস ট্যাঙস করে বকের মত এসে দরজায় উঁকি দিলেন। ভেতরে পা বাড়ানোর আগে ঘুরে পরিস্থিতিটা হয়ত বুঝেও নিলেন। তারপর ফিসফিস করে বললেন, কোবরেজমশাইয়ের মেয়ে আবার এসেছিল। ও পুঁটু, কী হয়েছে খুলে বল তো বাবা! আমার এসব ভাল ঠেকছে না। এত মেয়ে কেন আসবে তোর কাছে? কখনও তো কাউকে আসতে দেখিনি!

পিসিমা! তোমার কি মনে হয় না এবার এই পুঁটের দাম বাড়ছে? তাকে পাত্তা দিতে শুরু করেছে লোকেরা?

পিসিমা হাসলেন। ফক্কুরি করিসনে। তোর দাম বরাবরই ছিল। এখনও আছে। এমন চেহারা, এমন স্বাস্থ্য, কতগুলো ছেলের আছে পাড়ায়? তুই ওদের মত সেজেগুজে হইচই করে ফুর্তি মেরে বেড়াস নে, ন্যাদাগোবিন্দ সেজে থাকিস বলেই না—

তুমি বলছ?

বাজে কথা রাখ। শোন। সকালে তুই বেরিয়ে যাওয়ার পর বেজা বউয়ের সঙ্গে কীসব পরামর্শ করছিল। আমার মনে হচ্ছে, তোকে ওরা আলাদা খেতে বলবে।

খাব। সে তুমি ভেব না।

তোর রোজগার কোথায়, পুঁটু?

পিসিমার উদ্বিগ্ন মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম, বাবা আমার অ্যাকাউন্টে কিছু টাকাকড়ি রেখেছিলেন ব্যাঙ্কে। এবার বুঝতে পারছ তো আমার জোরটা কোথায়?

পিসিমা অস্থির হয়ে বললেন, পুঁটু! তুই আলাদা হলে আমাকে ফেলিস না সোনা! যতদিন তোর বউ না হচ্ছে, আমি রেঁধেবেড়ে দেব। খোঁটা খেতে খেতে আমি মরে গেলাম বাবা!

কিচ্ছু ভেব না, আমি আছি।

পিসিমা আরও উৎসাহে মন্ত্রণা দিলেন, মাস্টারের মেয়েকে বিয়ে করে ওদের বাড়ি গিয়ে থাকতেই হবে তোকে। বেজা সহজে বাড়ির ভাগ দেবে না। তখন আমাকেও ছলছুতো করে নিয়ে যাবি শ্বশুরবাড়িতে। মাস্টারমশাই মাটির মানুষ। মেয়েটাও খুব ভাল। দেখা হলেই পায়ে হাত দিয়ে—

বউদি চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে দরজার সামনে এসে বলল, কী বোঝাচ্ছেন ভাইপোকে?

পিসিমা গুম হয়ে বললেন, বোঝালেও কি ও বুঝবে মা? দেখ, তুমি যদি পার। বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

বললাম, এস বউদি। গপ্প করি।

বউদি দরজার কাছ থেকে উঁকি মেরে ঘরের ভেতরটা দেখে বলল, ঠাকুরপো! কাল মনুরা সব আসবে কলকাতা থেকে। মা-ও আসতে পারেন। আর তো ঘর নেই যে শুতে দেব? শীত না হলে বারান্দায় সব ব্যবস্থা করা যেত।

ঠিক আছে। আমি মুরলীর কাছে গিয়ে শোব। ওঁদের কোন অসুবিধে হবে না। একরাশ হেসে বললাম। আগেও তো শুয়েছি। মুরলীর ঘরে অনেক জায়গা। শুতে গেলে বরং ও খুব খুশি হয়। কেন জান বউদি? ওর যা ভূতের ভয়!

বউদিকে হাসানো গেল না। ওর দৃষ্টি ঘরের ভেতরটায় তন্নতন্ন কী যেন খুঁজছে। সন্দেহজনক কিছু কি চোখে পড়েছে? একটু পরে বলল, তাহলে তুমি মাস্টারের মেয়েকেই বিয়ে করছ?

হুঁউ। করছি।

কবে?

একটু দেরি আছে।

আমি যদি ভাল মেয়ে দিই, করবে? মাস্টারের মেয়ের চেয়ে থাউজ্যান্ড টাইমস সুন্দরী। এডুকেটেড। বল, করবে?

হঠাৎ আমার মাথায় এল, শরীরে প্রচুর ভিটামিন দরকার। আরও বেশি খাদ্য চাই। ফিক করে হেসে বললাম, যাঃ! খালি জোক করছ!

বউদি গম্ভীর চালে বলল, জোক করার মেজাজ তুমি নষ্ট করে দিয়েছ, ঠাকুরপো। জোক-টোক নয়।

মেয়েটি কে? কোথায় থাকে বল না বউদি?

আগে বল, করবে কি না। তারপর সে-সব কথা। আমি তোমাকে গ্যারান্টি দিচ্ছি। মেয়ে দেখলেই তোমার মুণ্ডু ঘুরে যাবে। দেওয়া-থোওয়াতেও তারা পিছুপা হবে না। বড় ঘর।

বেশ তো! তুমি যখন বলছ, তখন—

দেখ, আমাদের যেন অপ্রস্তুত কর না। ওরা নামী লোক।

তোমার মাথা খারাপ বউদি? তুমি বলছ—আর আমি তোমার অবাধ্য হব?

বউদি বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। তখন একটু চিন্তায় পড়লাম। বড্ড বেশি ঝুঁকি নিয়ে ফেললাম না তো?

পেটপুরে ওইসব হাবিজাবি খাওয়ার লোভে শেষপর্যন্ত ফাঁদে আটকে যাই যদি? পাঞ্জাবির পকেট থেকে অথরিটি লেটারটা বের করে একবার পড়ে নিলাম। আমার প্রচুর ভিটামিন দরকার। আপাতত আর কিছু ভাবব না। হাম হুম করে যথেচ্ছ খেয়ে যাব। দুবার বাড়তি ভাত কিংবা গোটা দুত্তিন রুটি চাইতে একটুও ভড়কাব না। বউদি না দিয়ে পারবে না। ওরে বাবা, বউদির গ্যারান্টি দেওয়া মেয়ে!

বিকেল গড়িয়ে একটু মাঞ্জা দিয়ে বেরিয়েছিলুম। শিলিগুড়ি থেকে মামার পাঠানো পুরনো তাগড়াই পুলওভার পরে। কোবরেজমশাইয়ের বাড়ির সামনে গিয়ে দেখি, ভেতরে তাকিয়া ঠেস দিয়ে যথারীতি জ্যোতিষচর্চা হচ্ছে। ইচ্ছে করছিল ভাগ্যটা একবার দেখাব নাকি। কিন্তু এখন ভবিতব্য আগেভাগে জেনে ফেললে চলবে না। মনের জোরটা বাড়াবার বদলে চুপসে দেওয়ার মত কিছু ঘোষণা করলেই বিপদ। ঝুঁকির সংখ্যা বাড়ানো ঠিক নয়।

পাশের দিকে দরজার সামনে রোয়াক। রোয়াকে মৌসুমীর বোন মঞ্জু একটা বাচ্চা কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। গম্ভীর চালে বললাম, তোর দিদি কোথায় রে মঞ্জু?

মঞ্জু বলল, পুঁটুদা! তোমার সোয়েটারটা কে বুনেছে গো?

মামা। মৌসুমীকে ডেকে দে।

মঞ্জু খিলখিল করে হেসে উঠল। ওমা! মামা, না মামী বুনেছে?

ঠিক আছে। মামী। তুই মৌসুমীকে ডাক।

দিদি এখন থাকে নাকি? আনন্দমে গান শিখতে যায় না এখন?

আনন্দম? সে আবার কী জিনিস?

নাচ-গানের ক্লাব। ওই মোড়ে গঞ্জুবাবুর ওপরতলায়। মঞ্জু চোখ টিপে হাসল। কিন্তু তোমাকে তো ঢুকতেই দেবে না। ওখানে শুধু মেয়েরা যায়।

চোখ নাচিয়ে বললাম, জয় মেয়েদের কাছে কত পপুলার খবর রাখিস?

জয়? সে আবার কে?

মঞ্জু, তুই জানিস না আমার নাম জয়? পুঁটু আমার ছেলেবেলার ডাকনাম। এবার থেকে জয়দা বলে ডাকবি যেন।

মঞ্জু তাকিয়ে রইল। রাস্তায় কয়েক পা হেঁটেছি, কোবরেজমশায়ের ঘর থেকে বাজখাঁই গলায় কেউ ডাক দিল, পুঁটু! শুনে যাও। অ পুঁটু!

মঞ্জু হি হি করে হাসতে লাগল। এইসব মুহূর্তে আমার বরাবর মনে হয়েছে, আমি কি লোকেদের কাছে হাস্যকর পদার্থবিশেষ? আমাকে নিয়ে ছোট-বড় সবাই যেন হাসিতামাশা করে। কেন? আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের চেহারার কোনও খুঁত আজ পর্যন্ত আবিষ্কার করতে তো পারিনি। আমার ভাবভঙ্গিতে—কিংবা পুঁটু নামটার মধ্যেই কি কিছু থেকে গেছে—যা অস্বাভাবিক এবং হাসির উদ্রেক করে?

কোবরেজমশাই ডাকছিলেন। তাকালে হাত নাড়তে থাকলেন প্রচণ্ডভাবে। কাছে গেলে বললেন, আহা! ভেতরে এস না হে! রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথাবার্তা হয় না। এস, এস।

ঘরের ভেতরে মিঠেকড়া কী এক গন্ধ। কালিঝুলিমাখা কয়েকটা আলমারি। একটা টেবিলে কয়েকটা নানা সাইজের হামনদিস্তা। বয়োম, শিশি। আলমারির ফাটা কাচে কাগজ সাঁটা। মিটমিটে বাতি জ্বলছে। সেই আলোয় বসে আছেন পাড়ার প্রবীণ জনাদুই ভদ্রলোক। দুতিনটে তক্তাপোষ জড় করে তোষক বিছিয়ে সাদা চাদর পাতা হয়েছে। কতকাল কাচা হয় নি কে জানে! সামনে গাবদা দুটো পাঁজি নিয়ে ঝুঁকে বসেছিলেন কান্তিবাবু আর ধনেশবাবু। মুখ তুলে আমাকে দেখে দুজনেই বললেন, এই যে!

কোবরেজমশাই গদিতে থাপ্পড় মেরে ধুলো উড়িয়ে বললেন, বস হে!

বৃদ্ধদের প্রতি চিরদিন আমার সম্ভ্রমবোধটা বেশি। ভাল ছেলে হয়ে বসলাম। ধনেশবাবু ফের পাঁজির দিকে ঝুঁকে বললেন, ওর রাশি কী জিজ্ঞেস করুন তো?

এই রে! একেই কি ভবিতব্য বলে? যেখানে বাঘের ভয়, সেখানে ঠিক এমনি করেই নিশ্চয় সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। ঝটপট বললাম, জ্যোতিষে-টোতিষে আমার বিশ্বাস নেই জ্যাঠামশাই!

কান্তিবাবু ভুরু কুঁচকে চশমার ভেতর দিয়ে আমাকে দেখছিলেন। বললেন, মেষরাশি বলেই ধারণা হচ্ছে। জন্মতারিখ কত হে পুঁটু?

কোবরেজমশাই বললেন, সিংহরাশি! সিংহরাশি! লগ্ন কর্কটই হবে। ওর জন্মপত্রিকা আমারই করা।

ধনেশবাবু একটু হেসে বললেন, মাস্টারের মেয়ের রাশি-ফাশি পেলে মিলিয়ে দেখা যেত।

কোবরেজমশাই বললেন, কোনও দরকার নেই। আমার স্পষ্ট মনে আছে—পুঁটু, টোয়েন্টি ফাইভ চলছে, না সিক্স?

বললাম, থার্টি পেরুচ্ছি এমাসে।

হয়েছে! কোবরেজমশাই নড়ে বসলেন। কাঁটায়-কাঁটায় মিলে যাচ্ছে প্রেডিকশান। আমার স্পষ্ট মনে আছে—আজ সকালেই তো বিজয়ের সঙ্গে বাজারে দেখা হল। বললাম, ভাইকে একবার পাঠিয়ে দিও। যা সব শুনছি, মনে হচ্ছে, সেই ক্রিটিকাল টাইম এসে গেছে সামনে।

কান্তিবাবু ফ্যাঁচ করে হেসে বললেন, বিষকন্যা নাকি হে কোবরেজ?

কোবরেজমশাই আমার কাঁধে থপ করে হাত রেখে বললেন, তুমি বাপু ইচ্ছে করে ফাঁদে পা দিতে যাচ্ছ। এখনও ফের। পরে পস্তে কূল পাবে না। তোমার বাবা কালিকেশ ছিল আমাদের বন্ধুরও বেশি। সে নেই, আমরা তো আছি। এ কী অদ্ভুত কথা! দেশে কি উপযুক্ত পাত্রীর অভাব আছে?

ধনেশবাবু পাঁজিতে চোখ রেখে বললেন, একটা নয়, পঞ্চাশটা আছে।

কান্তিবাবু বললেন, বিজয় দুঃখ করে বলছিল, ভাই কথা কানে নিচ্ছে না। মাস্টার ওকে কী খাইয়ে-টাইয়ে দিয়েছে।

ধনেশবাবু বললেন, কিচ্ছু বলা যায় না। অখিলমাস্টার গুপ্তবিদ্যাব চর্চা করে। আমি জানি। তা না হলে বুঝতে পারছ না? ওই জঙ্গলের ভেতর একটেরে সারাজীবন পড়ে রইল! ছেলেবেলায় দেখেছি, পুরো এরিয়া ছিল জমিদারের কাছারি। কর্মচারিদের জন্য কত বাড়ি ছিল। সবাই কে কোথায় চলে গেল, মাস্টার একা পড়ে রইল। কেন পড়ে রইল? খ্যাঁক করে হেসে ফের বললেন. গুপ্তবিদ্যা বলতে কী মিন করছি, আশা করি—

থামুন! আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল। এমনভাবে বেরুল যে নিজেই অবাক হয়ে গেলাম। তিনজোড়া ঘোলাটে পলকহীন চোখের সামনে দিয়ে বেরিয়ে এলাম। রাস্তায় নেমে ফের বললাম, আমার খুশি! সাধ্য থাকে, ঠেকাবেন আপনারা।

তারপর চমকে গেলাম। আরও কথা বলতে ইচ্ছে করছে—গরম গরম কথা, সাংঘাতিক কথা, পাথরের মত ওজনদার সব কথা। আমার কান দিয়ে গরম ভাব বেরুচ্ছে। আমার দুটো হাত মুঠো পাকিয়ে শক্ত হয়ে যাচ্ছে।

বেগতিক দেখে হনহন করে হাঁটতে থাকলাম। অনেকটা গিয়ে ঘুরে দাঁড়ালাম, কেউ তাড়া করে আসছে কি না দেখার জন্য। সন্ধ্যার মুখে এ রাস্তায় ভিড় থাকে। পাঁচটা বাজতে না বাজতে আলো জ্বলে যায়। ভিড়ে কিছু ঠাহর করা গেল না। তবু মাঝে মাঝে পিছু ফিরে দেখছিলাম। সামনের চৌমাথায় পৌঁছে ফোঁস করে একটা শ্বাস বেরিয়ে গেল। রেলিংঘেরা নেতাজির মূর্তির কাছে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরালাম। কীর্তির প্রথম স্তম্ভ স্থাপন করে এলাম কি? 'থামুন' বলে একখানা সিংহগর্জন কী করে ঝাড়তে পারলাম, ভেবেই পেলাম না! মনে মনে বললাম, এই এই তো শুরু, জয়! এই সবে তুমি মুখ খুলেছ। সিংহ হও বা কাছিম হও. এই প্রথম তোমার খোঁদল থেকে মুখ বের করা। এবার একটু-একটু করে পুরোটা বেরিয়ে আসতে হবে। ...

মুরলী বলল, এস পুঁটু! আসা তো ছেড়েই দিয়েছ।

মুরলী লোকটি বড় ভাল। সাদাসিধে সরল মনের মানুষ। স্কুলে পড়ার সময় দেখেছি, সে বিস্কুট-

কেক-লজেন্স বিক্রি করত গেটের মুখে। সাইকেল ভ্যানে বোঝাই থাকত কত রকমের বিস্কুট। আমাদের বাড়ির কাছাকাছি একতলা একটা পুরনো বাড়ি ছিল ওদের। এখন বাড়িটা প্রায় নতুন করে ফেলেছে। ওর ফুটফুটে ফর্সা একটি বউও ছিল—বয়সে ওর অর্ধেক তো বটেই। বউটি আগুনে পুড়ে মারা যায়। দৈবাৎ দুর্ঘটনা, অথবা আত্মহত্যা এ নিয়ে মতান্তর আছে। সেও বছর দশ আগের কথা। তারপর আর মুরলী বিয়ে করেনি। মাথায় লম্বা সন্নেসী চুল, গলায় তুলসিকাঠের মালা, গায়ে ফতুয়া আর যেমনতেমন ধুতি পরে থাকে। বাড়ির বাইরের ঘরের বারান্দায় তার আগের ব্যবসাটা সুন্দর পেতেছে। আর সাইকেলভ্যানে ফিরি করে বেড়ায় না। বয়সও হয়েছে মুরলীর।

বারান্দার একপাশে ফাঁকা জায়গায় সতরঞ্জি বিছিয়ে যত্ন করে আমায় বসাল সে। বলল, চা খাবে তো?

খাব।

সে কেটলি নিয়ে গলির মোড়ে গেল চা আনতে। আমাদের পাড়ার এই গলিটা সন্ধ্যা হতে না হতে নিঝুম হয়ে ওঠে। মুরলী তবু যে সাড়ে সাতটা অব্দি দোকান খুলে বসে আছে, তার কারণ আমি জানি। বাড়ির ভেতরে যেতে অনিচ্ছা। যতক্ষণ পারে বাইরে কাটাতে, ততক্ষণ তার স্বস্তি। মুরলী দুঃখ করে বলেছিল, বাড়িটা আমাকে কামড়ে-কামড়ে খায়, পুঁটু! রাতটা যে কী ভাবে যায়, সে আমিই জানি। কিন্তু বিয়ের কথা তুললে সে জিভ কেটে বলেছিল, পাগল না মাথা খারাপ?

চা এনে মুরলী বলল, বাইরে ঠাণ্ডা। বরং বন্ধ-ছন্দ করে ভেতরে গিয়ে বসি চল!

ভেতরে গিয়ে ও বিছানায় বসল পা মুড়ে। মাটির ভাঁড়ে চা ঢেলে ওকে দিলাম। চায়ে চুমুক দিয়ে মিটিমিটি হেসে বলল, কী? এতদিনে ইচ্ছে হয়েছে?

কিসের ইচ্ছে বল তো?

মুরলী আপনমনে হাসল। হেসে বলল, ভাল। রাধেমাধব বলে ঝুলে পড়। যৌবনকাল বেশিদিন তো থাকে না মানুষের। সময় থাকতে থাকতে ইউজ করাই উচিত।

বুঝলাম মুরলীরও কানে গেছে কথাটা। দুটোদিনের মধ্যে কী করে এত রটল কে জানে! সবাই কি মউয়ের দিকে তাকিয়ে বসেছিল? বললাম, তুমি কোথায় শুনলে মুরলী?

তোমার পিসিমা এসে বলছিলেন।

মুরলী, কাল থেকে রাতে তোমার কাছে শুতে আসতে হবে। কুটুম্ব আসবে বাড়িতে।

মুরলী খুশি হয়ে বলল, কাল কেন? আজ থেকেই থাক। খাওয়াদাওয়া কর। আমার তো নিরিমিষ। তবে দুটো ভাত নইলে চলে না দুবেলা। কুকারে দুমুঠো বেশি করে চাল চড়িয়ে দিচ্ছি! আলুকপির তরকারি আছে। ডাল আছে। বেগুন ভেজে দেব ক'পিস। পাঁপর চাইলে তাও আছে।

তাহলে বিছানাটা নিয়ে আসি।

কী দরকার? বাড়তি দু'খানা কম্বল আছে। সতরঞ্জি তো দেখলে। তোষক, চাদর বালিশ কী নেই ভাবছ?

খুব জমিয়ে বসলাম এবার। মুরলী পরপর দু'ভাঁড় চা খেয়ে বিড়ি বের করল। বিড়ি জ্বেলে টানতে টানতে হঠাৎ ফিক করে হাসল আমার দিকে তাকিয়ে। বললাম, হাসছ যে?

যৌবনের কথা ভেবে। যৌবন বড় ডেঞ্জার জিনিস, পুঁটু! মুরলী তার ফর্মে আসতে থাকল ক্রমশ। এই যে আমাকে দেখছ, বয়স কত হল বল তো? ফিফ্‌টি। এখনও মাঝেমাঝে কি চিমটি কাটে না ভাবছ? খুব কাটে।

তখন কী কর?

ইউজ করি।

বুঝিয়ে বল!

তুমি মাইরি এখনও নাবালক থেকে গেলে! বুঝলে না? মুরলী চোখ টিপে কী একটা ইশারা করে বলল, বাগানপাড়ার দিকে গেছ কখনও? গেছ বললে আর যেই বিশ্বাস করুক, আমি করব না।

ছ্যা ছ্যা! তুমি বেশ্যাপাড়ায় যাও, এতদিন তো বল নি মুরলী?

মুরলীর ভাঙা দাঁত আরও বেরিয়ে গেল। নেকু! ডুডুবাটু খাচ্ছ?

এই! তুমি আজ বড্ড অসভ্যতা করছ মুরলী!

মুরলী একটু দমে গেল আমার ভাবভঙ্গি দেখে। বলল, মাস্টারমশাইয়ের মেয়েকে বিয়ে করতে যাচ্ছ। তাই করলামই বা একটু ফুক্কুরি?

তার সঙ্গে এসবের কী সম্পর্ক মুরলী?

মুরলী ভীষণ অবাক হয়ে গেল। অভিমান দেখিয়ে বলল, কতকাল কত খারাপ-খারাপ কথা বলেছি, তুমি কান করে শুনেছ। বল সত্যি কী না? রাত জেগে কত নস্টিফস্টি করেছি। এমন সব কথা বলেছি, যা শুধু হাজব্যাং-ওইফের মধ্যে হয়। এই যে তুমি বিয়ে করবে, বিয়ের পর হাজব্যাং-ওইফের মধ্যে কীভাবে কী জেশ্চার-পশ্চার, কীভাবে কী...ঢোক গিলে সে সিরিয়াসভঙ্গিতে ফের বলল, তুমি তো নামেই পুরুষমানুষ। কিছু জান না। তোমাকে শিখতে হবে না?

মুরলীর ঘরে রাতে শুতে এলে সে অসংখ্য অশ্লীল-অশ্লীল কথাবার্তা বলেছে। ঘুমিয়ে পড়েছি কিনা জানার জন্য হাত বাড়িয়ে চুল টেনে দিয়েছে। তবু আমার ঘুমোতে অসুবিধে হয়নি। বরাবর আমার ঘুমটা বেশ গাঢ়। কিন্তু তার জঘন্য ওইসব কথাবার্তা আমার মনে কোনও দাগ কাটেনি কখনও। আমি নির্বিকার শুনে গেছি। ভুলেও গেছি তার ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে।

আজ মাথায় চুড়োবাঁধা চুল, গলায় তুলসিকাঠের মালা, নিরামিষভোজী বয়স্ক লোকটির জন্য আমার করুণা জাগছিল। তাকে আঘাত করার কোনও মানে হয় না। হেসে উড়িয়ে দিয়ে বললাম, ওসব কথা পরে হবে মুরলী। এস, আমরা অন্য কথা বলি। কাজের কথা।

নিভে যাওয়া বিড়ি জ্বেলে মুরলী অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে বলল, বেশ। তাই বল।

তোমার মত কী মুরলী?

কিসে?

অখিলস্যারের মেয়েকে বিয়ে করার ব্যাপারে।

করে ফেল।

মেয়ের নামে বদনাম আছে জান কি?

মুরলী গাল চুলকে বলল, তা সত্যি বলতে গেলে, আছে।

সত্যিই কি ওর চরিত্র খারাপ?

তা সত্যি বলতে গেলে, খারাপ।

খারাপ?

হুঁউ।

তুমি কী করে জানলে?

মুরলী হাসল। ... বললে তুমি বিয়ে করতে চাইবে না। মেয়েটার বিয়ে হওয়া দরকার। আর কতকাল কষ্ট করে থাকবে? যৌবন বড় ডেঞ্জার জিনিস, পুঁটু! খুব ডেঞ্জার।

বিয়ে যখন করব বলেছি, তখন করবই। খারাপ হোক আর যাই হোক।

তাহলে আর জিগ্যেস করছ কেন?

তাই-ই তো! তাহলে আর জিগ্যেস করছি কেন ওকে? নিজের ওপর বিরক্ত হয়ে চুপ করে থাকলাম। মুরলী অবাক চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর হাই তুলে বলল, কুকার জ্বেলে ভাতের জল চড়াই। দুধ টকে গেছে আজ। ফেলে দিতে হয়েছিল। নইলে চা করে খাওয়াতাম আবার।...

অনেক রাতে মুরলী ডাকল, পুঁটু, ঘুমলে নাকি?

না। কেন?

ঘুম আসবে না আমি জানি। মুরলী খুকখুক করে হাসতে লাগল। মনে খটকা বেধে আছে। সেই খটকা যতক্ষণ না ছাড়বে, তুমি ঘুমতে পারবে না।

সে তক্তাপোসে এবং আমি তার সমান্তরালে একটা খাটিয়ায়। মধ্যে হাতদুয়েক ব্যবধান। মুরলীর ঘরে কখনও মশার উপদ্রব দেখিনি। তার ব্যাখ্যাটা হল, ঘরে মানুষের বসবাস বেশি হলে মশা হবে। মানুষ না থাকলে মশাও নেই। এ ঘরে তো সে রাতটুকু ছাড়া থাকে না। তাই মশাও হন্যে হয়ে ফিরে গেছে। আর আসতেই চায় না। অবশ্য অনেক মানুষের চামড়াও খুব পুরু থাকে। মুরলী বলেছিল নিজের সম্পর্কে।

মুরলী পাশ ফিরে আছে আমার দিকে। কাত হয়ে তার দিকে ঘুরে সেটা টের পেলাম। তার শ্বাসপ্রশ্বাস ঝাপটা মারল নাকের ওপর। লোকটার মুখে দুর্গন্ধ। চিত হয়ে গেলাম ফের। পছন্দসই লোকের মুখে দুর্গন্ধ টের পেলে খারাপ লাগে। মুরলীকে আজ খারাপ লাগছে ক্রমাগত। তার অশ্লীল কথাবার্তার সূত্রপাত থেকে মনটা বিষিয়ে গেছে যেন। খালি মনে হচ্ছে, এতদিন এই লোকটার সঙ্গে যতটুকু মিশেছি, আমার ভেতরের দিকে নিজের অজান্তে ততটাই দূষিত হয়ে গেছে।

চুপ করে আছি দেখে মুরলী বলল, খটকাটা ছাড়িয়ে নাও—ভালর জন্যেই বলছি, পুঁটু। ভেবে দেখলাম, এতে তোমার উব্‌কার করা হবে।

তবু চুপ করে থাকলাম। সারা শহর চেঁচামেচি করে বলছে, মউ খারাপ! মউ খারাপ! মউয়ের চরিত্র ভাল না। একটা মেয়ের জন্য রাজ্যের লোকের এত মাথাব্যথা। এমন কী এই বিস্কুট-লজেন্স বিক্রেতাও মউয়ের বিরুদ্ধে মধ্যরাতে উত্তেজিত হয়ে উঠেছে।

মুরলী হঠাৎ ফিসফিস করে উঠল। ঘনাবাবুর ছেলে পারুকে মনে আছে, পুঁটু? অপঘাতে মরেছিল।

চমকে উঠলাম। পারু তো রেললাইনে স্যুইসাইড করেছিল।

না। মুরলীর দুর্গন্ধ শ্বাসপ্রশ্বাস ঘরের অন্ধকারে কটু ঝাপটা মারল। সুসাইড নয় কো। মাডার! মাডার!

মার্ডার? খুন?

মুরলী আস্তে বলল, ওকে যখন মাডার করছে, তখন আমি হাতবিশেক তফাতে ভাঙা ওয়াগংয়ের পেছনে বসে আছি। তারপর ওকে যখন তুলে নিয়ে রেললাইনে শুইয়ে দিচ্ছে, তখনও আমি কিলিয়ার দেখতে পাচ্ছি। তখন রাত্তি আটটা-টাটটা হবে। গয়া পেসেঞ্জার আসবার সময় হয়েছে। ওখানে আমিও একটা কম্ম করতে গিয়েছিলাম। রোজই যেতাম। সীতুর বউয়ের সঙ্গে কিছুদিন আমার ভাব-ভালবাসা ছিল। কিন্তু সেদিন সীতু সকাল-সকাল বাড়ি ফিরেছে, মানদার আসার পথ বন্ধ—আমি কেমন করে জানব? আসবে বলে বসে আছি। সেইসময় হঠাৎ গোঙানির শব্দ। উঁকি মেরে দেখামাত্র ভয়ে কাঠ হয়ে গেলাম।

কে মার্ডার করল পারুকে?

শচীন। মুরলী আতঙ্কজড়ানো গলায় নামটা উচ্চারণ করল। তারপর অন্ধকারে একটা হাত বাড়িয়ে দিল। হাতটা আমার মুখের ওপর পড়লে সরিয়ে দিলাম। মুরলী বলল, তোমার হাতে ধরে বলছি পুঁটু, জানতে পারলে শচীন আমাকেও মাডার করবে। একা বসবাস করি। ভগবানেরও সাধ্যি নেই, বাঁচান।

বলব না। কিন্তু শচীন তো মনে হয় বাইরে কোথাও আছে। অনেকদিন ওকে দেখছি না।

পালিয়ে বেড়াচ্ছে। ফেরারি আসামি যে! ওর নামে হুলিয়া লটকে দিয়েছে।

তাহলে আর তোমার ভয় কিসের?

আছে। মুরলী আবার ফিসফিস করল। মাসখানেক আগে একদিন মাস্টারবাবুর বাড়ি থেকে ওকে বেরুতে দেখেছি। তখন আমি বাড়ি-বাড়ি রুটি সাপ্লাই করতাম। পড়তা হয় না, তা ছাড়া, গুচ্চের বাকি পড়ে যায়—ঝকমারি বলে ছেড়ে দিয়েছিলাম।

ভোরে গিয়ে শচীনকে বেরুতে দেখেছিলে স্যারের বাড়ি থেকে?

মা কালীর দিব্যি। তবে আসল কথাটা তো এখনও বলাই হয়নি।

তোমার কথা বিশ্বাস করছি না, মুরলী!

মুরলী একই সুরে বলল, বিশ্বাস করা না-করা তোমার ইচ্ছে। আমি যখন মুখ খুলেছি, তখন বলাই আমার ডিউটি। শচীন যখন পারুর বুকের ওপর বসে শ্বাসনালী কাটছিল, তখন মাস্টারবাবুর মেয়ে তফাতে দাঁড়িয়ে ছিল। রেলের আলোয় কিলিয়ার দেখেছিলাম। তারপর সে দৌড়ে লাইন ডিঙিয়ে পালিয়ে গেল। একটু পরে শচীনশালা পারুকে লাইনে শুইয়ে রেখে মাস্টারবাবুর মেয়েকে খুঁজতে এল। না পেয়ে স্টেশনের দিকে চলে গেল। তারপর এসে গেল গয়া প্যাসেঞ্জার। হুইসিলের সাউন্ড দিচ্ছে আর মনে হচ্ছে আমার গলা পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে কাটছে। ...

মুরলী কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর ডাকল, অ পুঁটু!

ফ্যাঁসফেঁসে গলায় সাড়া দিলাম, কী বলছ?

শুনলে না কী বললাম এতক্ষণ?

চুপ করে থাকলাম। অথরিটি লেটারটাকে কলসির দৈত্য ভেবেছিলাম। আরশোলার বাচ্চা হয়ে বুকপকেটে নেতিয়ে আছে। সকাল হতে হতে চেপ্টে মরে থাকবে।

মুরলী হাত বাড়িয়ে খুঁচিয়ে দিল আমাকে। ...ঘুমলে, নাকি সব শুনলে? গলাকাটা শচীন—

হুঁ, শচীন!

শচীন গেঁড়াকল বাধিয়ে বেড়ায় সবখানে।

হুঁ, গলাকাটা শচীন!

শচীন! মুরলী ফোঁস করে শ্বাস ছেড়ে থেমে গেল। আর সাড়াশব্দ নেই। ...

সকালে একটা হেভি ব্রেকফাস্ট আদায় করে বেরুনোর সময় মুরলী বলেছিল, যা ভাল মনে হয় কর পুঁটু! কাজটা যখন করতেই যাচ্ছ, করা দরকারও বটে, কারণ কি না যৌবন বড় ডেঞ্জার জিনিস—তবে কথা হচ্ছে, শচীন—

হুঁ, শচীন।

চারদিকে ঘন কুয়াশার ভেতর শচীন পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে একের পর এক শ্বাসনালী কেটে দিচ্ছিল। যতবার অখিলস্যারের বাড়ির দিকে পা বাড়াই, ততবার শ্বাসনালী ফ্যাঁস করে ওঠে এবং নেতিয়ে পড়ি। ঘেঁটুবন ভেঙে কয়েক পা এগিয়ে যাই। বাড়িটার দিকে তাকাই। কুয়াশার ভেতর বাড়িটা কালো হয়ে থেকে ফিসফিস করে বলতে থাকে, আসিস না। মারা পড়বি।

তিনবারের বার মরিয়া হয়ে ঝুপসি ডুমুরগাছটার তলা অবধি গেলাম। সেখানে কাছারি বাড়ির ধ্বংসস্তূপ। ইটের চাবড়া ঘিরে ঘেঁটুবন, পেত্নীঝোপ, কচুর ঝাড় যথেচ্ছ। হিলহিল করছে গুলঞ্চলতা আর সোমলতার ঝালর। থির চোখে তাকিয়ে জলনিকাশী নালার ওপর কাঠের সাঁকোয় মউকে আবিষ্কার করলাম। কাঠের রেলিঙে হেলান দিয়ে মুখ তুলে কী দেখছিল সে। তারপর হঠাৎ ওদিকে হাঁটতে হাঁটতে কুয়াশায় মুছে গেল। কুয়াশার ভেতর নিশ্চয় শচীন দাঁড়িয়ে আছে এবং কুয়াশার ভেতর এই শীতল সকালে অনেক কিছুই ঘটতে পারে।

চলে আসার জন্য পা তুলেছি, বাজখাঁই গলায় কেউ হাঁক দিল, কে রে ওটা? ঘুরে দেখি, মাথায় হনুমানটুপি, গায়ে আলোয়ান, হাতে খেঁটে নিয়ে অখিলস্যার কাঠের সাঁকোর দিক থেকে আসছেন। উপর্যুপরি গর্জাতে গর্জাতে এগিয়ে আসছিলেন তিনি—কে ওখানে? ওখানে কী হচ্ছে? কে তুমি? দাঁড়াও বলছি!

দাঁড়িয়েই আছি। তবু দাঁড়াও বলে শাসাতে-শাসাতে অখিলবন্ধু আমার দিকে স্টিমরোলারের মত গড়িয়ে আসছেন।

স্যার, আমি—পুঁটু!

কে পুঁটু? রোজ তুমি এখানে ঘুরঘুর করতে আসো। কী চাই এখানে? থামো—কেদারকে ডাকি।

স্যার, আমি জয়! আমি জয়!

অখিলস্যার থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন। তারপর খ্যা খ্যা করে হাসলেন। ...ও! জয়! যা কুজ্ঝটিকা—একহাত দূরে দৃষ্টি যায় না। ও জয়, তুমি এখানে কী করছ? পোকামাকড় থাকতে পারে। সরে এস, সরে এস।

ঘেঁটুবনের ভেতর থেকে বেরিয়ে গিয়ে বললাম, এখন ওদের হাইবারনেটিং পিরিয়ড না স্যার?

তাহলেও সাবধান থাকা উচিত। বলে অখিলবন্ধু সস্নেহে হাত বাড়ালেন।

কাঁধ চাইছেন আমার। সঙ্গে সঙ্গে কাঁধ দিলাম। উনি পুরো ঘাড় জড়িয়ে হাঁটতে থাকলেন। বললাম, মর্নিংওয়াকে বেরিয়েছিলেন স্যার?

হ্যাঁ। মউকে নিয়ে বেরিয়েছিলাম। ও গেল স্টেশনে খবরের কাগজ আনতে। অখিলস্যার লাঠির ডগায় খুঁচিয়ে একটা শুকনো ডাল সরিয়ে দিলেন পথ থেকে। ...ভেন্টু ব্যাটাচ্ছেলের কাছে কাগজ নিতাম। কাগজ সেই সাড়ে ছ'টায় পৌঁছে যায় স্টেশনে। ভেন্টু আমাকে দিয়ে যায় দশটার পরে। ছাড়িয়ে দিয়েছি।

কাঠের গেট ঠেলে দুজনে ঢুকলাম। স্যার ডাকলেন, কেদার আছ নাকি? ও কেদার?

কেদারের সাড়া পাওয়া গেল না। ওপরের ঘরে গিয়ে পুবের জানালা খুলে দিলেন অখিলস্যার। তারপর আমাকে চেয়ারে বসতে ইশারা করে নিজে বসলেন বিছানায়। বললেন, কতদূর কী করলে?

কিসের স্যার?

অখিলবন্ধু বিরক্ত হয়ে বললেন, তুমি ওয়ার্থলেস! তোমাকে একটা দায়িত্ব দিলাম, আর তুমি নিশ্চিন্তে ঘুরে বেড়াচ্ছ। হঠাৎ যেকোনও মুহূর্তে আমার স্ট্রোক হলে কী হবে ভেবে দেখেছ?

মুখ নামিয়ে আঙুল খুঁটতে থাকলাম।

কী হয়েছে তোমার? তোমাকে অমন দেখাচ্ছে কেন? শরীর খারাপ?

না স্যার।

উঁহু। তোমার শরীর ভাল মনে হচ্ছে না। অখিলবন্ধু সন্দিগ্ধ দৃষ্টে তাকালেন আমার দিকে। —ঘেঁটুবনে ঢুকেছিলে কেন? সোজা আমার এখানে চলে এলেই পারতে। রাতে কী খেয়েছিলে? ভোলার ডিসপেন্সারিতে চলে যাও। একটা কড়াপাকের হজমি মিক্সচার খেলেই ফিট হয়ে যাবে।

স্যার, শচীন—

কী? অখিলবন্ধু স্থির হয়ে গেলেন।

শচীন, স্যার—

শচীন মানে?

আর গাঁইগুঁই না করে কাছিমের খোল থেকে গলা বাড়িয়ে দিলাম। ...স্যার, আপনি আমাকে শচীনের সঙ্গে লড়িয়ে দিতে চাইছেন কেন? আপনাকে আমি ভগবানের চাইতে বেশি শ্রদ্ধাভক্তি করি। আপনি আর যার সঙ্গে লড়তে বলবেন, আমি লড়ে যাব। কিন্তু শচীন বড় সাংঘাতিক। ঘনশ্যামবাবুর ছেলে পারুকে নিশ্চয় চিনতেন? শচীন পারুর শ্বাসনালী কেটে দিয়েছিল। সেই গলাকাটা শচীনের সঙ্গে আমার লড়া কি সম্ভব? আপনি কোন আক্কেলে আমার হাতে একখানা চোতা ধরিয়ে দিলেন, স্যার?

অখিলস্যার টেরাকোটা হয়ে দেয়ালে সেঁটে গেছেন দেখে আমার গলা আরও খুলে গেল। ... শচীন গোখরোর মত আপনার বাড়িতে লুকিয়ে থেকে মউকে পাহারা দিচ্ছে। আর আপনি প্ররোচনা দিচ্ছেন, মউকে বিবাহ কর। মউকে হরণ কর। এই কর, তাই কর। করতে গিয়ে ফোঁস করে ছোবল দিক আর আমি নেতিয়ে কালো হয়ে আপনার পায়ের তলায় পড়ে ছটফট করি। আমার জীবনের কি কোনও মূল্য নেই। এ কী বিচ্ছিরি খেলা খেলতে চাইছেন আমাকে দিয়ে, স্যার? আপনি জ্ঞানী মানুষ। সত্যদ্রষ্টা। ঋষিতুল্য ক্রান্তদর্শী। আপনি—

ঢোক গিলে বললাম, আপনি ফিলসফার। আপনি আমাকে সাপের মুখে ঠেলে দিতে পারছেন?

বেরোও!

আজ্ঞে?

বেরিয়ে যাও! জরাজীর্ণ বাড়ি কেঁপে উঠল। ঝরঝর করে বালি খসে পড়ল কোথাও। নড়বড় করতে করতে হাত বাড়িয়ে লাঠিটা নিয়ে ফের চেঁচালেন অখিলস্যার, কাওয়ার্ড! অপদার্থ! জরোদ্‌গব! বেরিয়ে যাও!

তড়াক করে উঠে দরজার কাছে চলে গেলাম। তারপর যেই অখিলস্যার লাঠিটা তুলে বিছানা থেকে নেমেছেন, আমিও সিঁড়ির মাথায় পৌঁছেছি। বাড়িটা ভীষণ দুলছে। চুনবালি খসে পড়ছে।

উনি লাঠিটাও ছুঁড়েছেন, আমিও সিঁড়ি দিয়ে পিছলে চলেছি নিচের দিকে। লাঠিটা খটমট করতে করতে আমাকে তাড়া করেছে। নিচের বারান্দায় এসে লাঠিটা খটাস করে থেমে গেল।

গেট খুলে বেরিয়ে যাবার সময় কেদারের সঙ্গে দেখা হল। হাতে দুরমুষটা নিয়ে সে হাঁ করে তাকিয়ে রইল। আমি ঘেঁটুবন ভেঙেই চারপায়ে গিরগিটির মত দৌড়ে কুয়াশার ভেতরে চলে গেলাম। ...

মুরলী বলেছিল, যৌবন বড় ডেঞ্জার জিনিস। ভাগ্যিস তখন কুয়াশা ছিল। কুয়াশার ভেতর 'ডেঞ্জার জিনিসটা' লুকিয়ে ফেলতে পেরেছিলাম। কিন্তু আমার মুখে চোরের হাবভাব। পেছনে পায়ের শব্দ হলেই বুকটা ধড়াস করে ওঠে। শচীন তাক করে আছে। মউ তাকে নিশ্চয় বলেছে আমি তাকে বিয়ে করতে চেয়েছি এবং এমন কী মুখ ফুটে ভালবাসি পর্যন্ত বলেছি। এই শুনে শচীনের মনে কতটা রাগ হওয়া সম্ভব, আলগোছে মাপতে গিয়েই রক্ত হিম হয়ে যায়। মউ যা মেয়ে, ওকে হয়ত আমার পিছনে লেলিয়ে না দিয়ে ছাড়ে নি। এ কী বিপদে ফেলে দিলেন আমাকে অখিলস্যার! সব সময় চোরের দায়ে ধরাপড়ার অবস্থা। বুক ছ্যাঁৎ। মৃত্যু ভয়।

জয়, তোমার এ কী চেহারা হয়েছে? বউদির ভাই মনু আমাকে দেখে প্রথমে না চেনার ভান করছিল। শেষে চিনতে পেরে সিগারেট অফার করে বলল, সত্যি! তোমাকে চিনতে কষ্ট হয়। কী হয়েছিল বল তো?

বউদি মুখ টিপে হেসে বলল, ওর মাথায় বিয়ে চড়েছিল।

মনু অট্টহাসি হাসতে লাগল। মনুর বউ আমাকে প্যাটপ্যাট করে দেখছিল। এই প্রথম মনুর বউয়ের সঙ্গে আলাপ। কারণ, খুব সদ্য বিয়ে করেছে সে। নববধূর আদল এখনও ঝলমল করছে সর্বাঙ্গে। কেমন একটা ঝাঁঝাল সুগন্ধও টের পাচ্ছিলাম। মউয়ের মুখটা ওর মুখে এবং ওই সুগন্ধটা মউয়ের শরীরে রেখে একবার তাকানমাত্র কুয়াশার ভেতর শচীনের কাসি শুনলাম। ঢোক গিলে বললাম, বউদি! এটা কি উচিত হচ্ছে?

বউদি চোখ পাকিয়ে বলল, থাম! মনু, ঠাকুরপো কী কেলেঙ্কারি করতে যাচ্ছিল জানিস?

বলার আগে বউদির মা বাথরুম থেকে বেরিয়ে বললেন, অনু, একবার এদিকে এস। বউদি হন্তদন্ত চলে গেল। মনু চোখে ঝিলিক তুলে বলল, ব্যাপারটা কী, জয়?

মনুর বউ মিষ্টি গলায় আধফোটা বুলিতে বলল, আলাপ করিয়ে দিলে না এখনও!

মনু সরি বলে ঝটপট আলাপ করিয়ে দিল। আভাসে জানিয়েও দিল, নীলাঞ্জনার সঙ্গে তার প্রেম করে বিয়ে হয়েছে। আমি তারপর বারবার আড়চোখে নীলাঞ্জনাকে দেখতে থাকলাম। কিন্তু যতবার তাকাই, ওর প্যাটপেটে চোখের ওপর চোখ পড়ে এবং পিছলে সরে যাই। মনু আবার চোখ টিপে বলল, কী হয়েছিল, জয়?

কী হবে? কিচ্ছু না।

নীলাঞ্জনা পাখির ঠোঁটে বলল, আহা, বলুন না শুনি।

মনু বলল, নীলার সামনে বলতে হেজিটেট করছ তো? নীলা ভীষণ মডার্ন। তুমি ফ্র্যাঙ্কলি বলতে পার, জয়! উই আর ফ্রেন্ডস।

নীলাঞ্জনার চোখের দিকে তাকিয়ে আমার পুরো জীবনী শোনাতে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু মনুটা একটা বাধা। মনুকে এই নিয়ে দ্বিতীয়বার দেখছি। ওর চেহারায় প্রেমের এবং চাকরি-বাকরির সাফল্য

ঠিকরে পড়ছে। ওকে দেখে এখন আমার ঈর্ষা হচ্ছে। কোন ধাদ্ধাড়া-গোবিন্দপুরের ছেলে কলকাতায় গিয়ে ঝটপট শেকড় গেড়ে বেশ ডালপালা মেলে দিয়েছে। এমন কী কলকাতার মেয়ের সঙ্গে প্রেম করে বিয়ে পর্যন্ত করে ফেলেছে। আর এ কী মেয়ে! সর্বাঙ্গে যেন চিনির দানা। নিজের ব্যর্থতায় মনমরা হয়ে বললাম, ও কিছু না। বউদির রসিকতা।

নীলাঞ্জনা ঠোঁট ফুলিয়ে বলল, বললেন না তো? ঠিক আছে। আমরা যথাস্থানে সব শুনব এবং তারপর কিন্তু আমরাও আপনাকে দিদির মত চিমটি কেটে অস্থির করব।

বললাম, আমি অস্থির হব না। আমার গায়ে কচ্ছপের খোল আছে।

তার মানে?

পূর্বজন্মে আমি কচ্ছপ ছিলাম। চিমটি কাটা যাবে না।

নীলাঞ্জনার হাসিতে চিনির দানা ঝরঝর করে ছড়িয়ে পড়ল। মনু চাপা স্বরে বলল, জয়, কোথায় প্রেম করছিলে?

নীলাঞ্জনা দ্রুত হাসি থামিয়ে প্যাটপেটে চোখে উদ্‌গ্রীব হয়ে তাকাল আমার দিকে। আমি চুপ করে থাকলাম। বলা না-বলার মাঝখানে অস্থির। মনু চোখ নাচিয়ে ফের ফিসফিসিয়ে উঠল, জয়!

বাঁচিয়ে দিল মৌসুমী এসে। পুঁটুদা পুঁটুদা বলে ডাকতে ডাকতে এসে সে দরজার কাছে থমকে দাঁড়াল। মনু ও নীলাঞ্জনাকে দেখে হকচকিয়ে গেল।

কী ব্যাপার? আমি উঠে দাঁড়ালাম।

তোমাকে ভীষণ খুঁজছি পুঁটুদা! মৌসুমী একচোখে নীলাঞ্জনাকে দেখতে দেখতে বলল। যখনই আসছি, তুমি নেই। কোথায়-কোথায় টো টো করে ঘোর বল তো?

চল! বলে রাস্তার দিকে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলাম। রাস্তায় নেমে মনে হল, মনুর বউ অভদ্রতা ভাবল নাকি? কিন্তু ততক্ষণে মৌসুমী হাঁটতে শুরু করেছে।

পড়ন্ত বেলার ঘরবাড়ি গাছ গাছালি ব্লটিং পেপারের মত রোদটুকু শুষে নিচ্ছে। কয়েকপা এগিয়ে মৌসুমী ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, ওরা কে গো পুঁটুদা?

বউদির ভাই আর তার বউ। কিন্তু তুমি যাচ্ছ কোথায়?

মৌসুমী হাসল। তোমাকে একজায়গায় নিয়ে যাচ্ছি।

কোথায়?

এস না বাবা! রাস্তায় সিনক্রিয়েট কর না।

হয়ত আর্তনাদ করে উঠেছিলাম কোথায় বলে। আস্তে বললাম, আজকাল যা কিছু করছি, সবেতেই সিনক্রিয়েট হবার দাখিল কিন্তু তুমি—মৌসুমী শোন, শোন!

মৌসুমী দাঁড়াল।

তুমি আবার অখিলস্যারের মত কোন ফাঁদে ফেলতে নিয়ে যাচ্ছ?

অখিলস্যারের মত? তার মানে কী গো পুঁটুদা? ...বলেই মৌসুমী ফিক করে হেসে ফেলল। চাপা স্বরে বলল, মউদিকে তো তুমি বিয়ে করছ শুনলাম।

সে কথা পরে হবে। তুমি কোথায় নিয়ে যাচ্ছ আমাকে?

গলা কাটতে।

কী বিপদ!

মৌসুমী আমার পাঁজরে গুঁতো মেরে বলল, আহা, চল না পুঁটুদা! এমন করছ কেন? ভ্যাট!

ডাইনে বড় রাস্তায় ভিড়ের ভেতর হাঁটতে হাঁটতে আর ওকে কিছু জিগ্যেস করার সুযোগ পেলাম না। বিকেলে এই রাস্তাটায় বড্ড বেশি লোকজন আর যানবাহনের উপদ্রব হয়। একটা হাইওয়ে কলকাতা থেকে এসে ফুঁড়ে বেরিয়ে গেছে। প্রকাণ্ড সব ট্রাকের আনাগোনা। কানফাটানো শব্দ। কোথায় নিয়ে চলেছে আমাকে মৌসুমী?

বাঁদিকে ঘুরে গলিরাস্তার ভেতর একটা একতলা বাড়ির সামনে থেমে সে আমার দিকে চেয়ে চোখে হাসল। তারপর কলিং বেল টিপতে থাকল পট পট করে।

দরজা খুলে এক প্রৌঢ়া মহিলা উঁকি দিলেন। মুখটা চেনা মনে হল। মৌসুমী বলল, পেয়ে গেছি মাসিমা! ধরে এনেছি।

এস জয়, ভেতরে এস।

অনেক অল্পচেনা মানুষ থাকে, খুব চেনা গলায় কথা বলে এবং তক্ষুণি একেবারে আপন হবার তালে থাকে। ইনি সেই মানুষ। ভেতরে গিয়ে মনে করার চেষ্টা করছিলাম। মৌসুমী বলল, পুঁটুদা, তুমি কী গো? মলি-মাসিমাকে বুঝি চিনতে পারছ না?

প্রৌঢ়া মহিলা গলা থেকে স্নেহ ঝরিয়ে বললেন, জয়কে আমি যতটা চিনি, ও আমাকে ততটা বোধ করি চিনবে না। বহু বছর আগে ওর মায়ের কাছে মাঝেমাঝে যেতাম আড্ডা দিতে। আমাদের বাপের বাড়ি ছিল একই পাড়ায়। ঘটনাচক্রে বিয়েও হয়েছিল একই জায়গায়।

মৌসুমী ক্ষুব্ধ ভঙ্গিতে বলল, আমাদের আনন্দমের ফাংশান দেখনি পুঁটুদা? বাজে বল না। তাছাড়া মলি মাসিমাকে চেনে না এমন কেউ থাকাটাই আশ্চর্য!

মলি মাসিমা বললেন, খুব হয়েছে মৌসুমী! তুমি জয়কে চটিয়ে দিও না।

একটু হেসে বললাম, চিনেছি। আসলে আমি বেলাইনে ঘুরে বেড়াই। তাছাড়া গানফান নাচটাচ একেবারে বুঝি না। তবু মাসিমাকে নিশ্চয় চিনি। বলুন মাসিমা!

চা আসা পর্যন্ত মলিমাসিমা আমার মায়ের গল্প করতে থাকলেন। মা মারা গেছেন আমার দশ বছর বয়সে। মার চেহারাও ভুলে গেছি প্রায়। মাঝেমাঝে ছবির দিকে তাকিয়ে চেহারা মুখস্থ করে নিই। আবার ভুলে যাই। ন্যালাভোলার পক্ষে এই এক সমস্যা।

মাসিমা কথার মধ্যে আলো জ্বেলে দিলেন সুইচ টিপে। চা খাবার শেষ হলে মৌসুমী ওঁকে মনে করিয়ে দিল। কাজের ব্যাপারটা হয়ে যাক মাসিমা। আমাকে শিগগির বাড়ি ফিরতে হবে।

বলি! মলি মাসিমা আমার দিকে চেয়ে মৃদু হাসলেন। জয়, তোমার সঙ্গে তো সুলেখা মিত্রের চেনাজানা আছে শুনলাম।

একটু অবাক হয়ে বললাম, খুব আছে। কেন বলুন তো?

গভমেন্ট থেকে ওঁদের উইমেন ওয়েলফেয়ার সেন্টারের জন্য একটা নতুন কমিউনিটি হল করে দিয়েছেন দেখেছ?

দিয়েছে বুঝি? আমি জানি না। দেখিনি।

মিসেস মিত্র তো চেয়ারপার্সন। আমরা ডিরেক্ট অ্যাপ্রোচ করতে পারতাম। কিন্তু অত টাকা দেবার ক্ষমতা নেই। ...মলিমাসিমা চিন্তিত মুখে বললেন। দুটো রাত্রি পরপর আমরা ফাংশান করতে চাইছি। এখন সমস্যাটা কী হয়েছে, খুলে বলি তোমাকে। ওঁদের একটা ফাংশানে গতবছর আমাদের ডেকেছিলেন। একটু ভুলবোঝাবুঝি হওয়ার জন্য উনি অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন আনন্দমের ওপর। হাসলেন মলিমাসিমা। ... ভদ্রমহিলা একটু তেজীও। একটুতেই চটে যান।

মৌসুমী ফোড়ন কাটল। ...ভীষণ বদমেজাজী। আর যা দেমাক!

মলিমাসিমা মিঠে গলায় বললেন, আমি শুনলাম তোমাকে উনি নাকি খুব পছন্দ-টছন্দ করেন। তুমি আমাদের হয়ে ওঁকে একটু বল, জয়। আড়াইশো ওঁদের হলের রেট। আমরা একশর বেশি একেবারেই পারব না। আনন্দমের ফান্ড কালেকশানের জন্য দুনাইট ফাংশান করতে চাইছি সরস্বতীপুজো উপলক্ষে। ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড?

মৌসুমী চোখে হেসে বলল, পুঁটুদা বললেই না করতে পারবে না। আমি জানি।

জান? ওর দিকে তাকিয়ে আস্তে বললাম।

মৌসুমী খি খি করে আরও হেসে বলল, জানি না বুঝি? কে জানে না?

জোক কর না মৌসুমী। মলিমাসিমা সিরিয়াস হয়ে বললেন। কিন্তু জয়, দেরি করলে অসুবিধে। তুমি শিগগির এসে আমাদের না জানালে হল পাওয়া মুশকিল হবে। সিনেমা হল পাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। মিউনিসিপ্যালিটির হল অল রেডি দুদিন কারা যাত্রার জন্য বুক করে রেখেছে। রেলের হলটা

আবার সেই স্টেশনের ওদিকে। বড্ড দূর হয়ে যাবে। কিন্তু সেও কি আর খালি থাকবে? তুমি কালকের মধ্যেই ব্যাপারটা সেটল করে এস, জয়!

মৌসুমী সংশয়ে দুলতে দুলতে বলল, মাসিমা! সেবারকার মত খোলামাঠে প্যান্ডেল খাটিয়ে করাই বরাতে আছে হয়ত। পুঁটুদা কেমন কোল্ড হয়ে আছে, দেখছেন?

মলিমাসিমা বললেন, কিছু কোল্ড নয়। প্যান্ডেল খাটাবে! চারদিক ঘিরতে কন্ট্রাক্টার কত নেবে জান তো? বাজে কথা বল না। জয় আমাদের আশাভরসা। কী বল জয়?

বললাম, ঠিক আছে। ভাববেন না। খালি থাকলে—

আছে। খবর জেনে বলছি। ওঁরা আজেবাজে কাউকে হল দেন না।

আমি তাহলে এখনই যাচ্ছি মাসিমা। ... উৎসাহে উঠে দাঁড়ালাম। মাঝে মাঝে কাজের উদ্দীপনা আমাকে পেয়ে বসে ভূতের মত। মৌসুমীও আমার সঙ্গে বেরিয়ে এল।

রাস্তায় সে আমার গা ঘেঁষে হাঁটছিল। বলল, মাসিমা তো হল পাবে না বলে মুখ চুন করে বেড়াচ্ছিল। হঠাৎ আমার মাথায় এল ব্যাপারটা।

বুঝতে পেরেছি। কিন্তু তুমি কেমন করে জানলে আমার সঙ্গে সুলেখাদির খাতির আছে?

মৌসুমী হাসল। দেখি নি বুঝি?

কী দেখেছ?

বাব্বা! কতদিন তোমাকে মিসেস মিত্রের গাড়িতে যেতে দেখেছি।

জীবনে মাত্র একবার।

ওঁর বাড়ির ছাদে তোমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি।

সেও মাত্র একবার।

মৌসুমী আমার কাঁধের কাছে খোঁচা মেরে বলল, সবতাতেই একবার। কেন মিথ্যে বলছ পুঁটুদা? আমাদের কলেজের ফাংশানের দিন সেবার মিসেস মিত্র যতক্ষণ ডায়াসে ছিল, ততক্ষণ আমাকে আর কাঞ্চীকে পঞ্চাশবার জিগ্যেস করছিলেন জয় চলে গেছে নাকি! আরও কত বলতে পারি জান?

অবাক হওয়ার সুরে বললাম, তুমি এতসব লক্ষ্য করেছ! তোমার চোখ তো অসাধারণ!

মৌসুমী গলা নামিয়ে বলল, হ্যাঁ গো পুঁটুদা, মিসেস মিত্রের স্বামী ভদ্রলোক আর আসা ছেড়ে দিয়েছেন, নাকি আসেন মাঝে মাঝে?

জানি না। সুলেখাদির কাছে অনেকদিন যাইনি। প্রায় একমাসেরও বেশি।

যাও নি, কারণ তুমি মউদির প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছ। অখিলমাস্টারের বাড়ি গিয়ে বসে থাকছ।

থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম। মৌসুমীর দিকে তাকিয়ে দেখলাম তার দুচোখে আলো ঝিকমিক করছে। ঠোঁটের কোনা দিয়ে কী একটা গড়াচ্ছে, সেটা দুষ্টুমিও হতে পারে, অশ্লীলতাও হতে পারে। আমার সঙ্গে এমন করে কোনদিন কথা বলেনি মৌসুমী। পাড়াতুতো দাদার সঙ্গে যেভাবে বলা উচিত, সেভাবেই বলে এসেছে। গম্ভীর হয়ে বললাম, খুব পেকে গেছ ভেতর-ভেতর, জানতাম না।

মৌসুমী পাত্তা দিল না। বড় রাস্তার ভিড়ের সুযোগে চিমটি কাটার মত করে বলতে থাকল তুমি যে অখিলমাস্টারের বাড়ি গিয়ে আড্ডা দাও, কেন দাও, এসব কে জানে না ভাবছ? পাড়ার সব্বাই জানে। বহুদিন থেকে জানে। হয়ত গিয়ে দেখবে, তোমার সুলেখাদি পর্যন্ত জেনে গেছে।

মৌসুমী আর যে জন্যই যাই ওখানে, মউয়ের সঙ্গে প্রেম করার জন্য যাই নি।

তাই মউদিকে বিয়ে করছ! ইশ! আমাকে খুকুমণি পেয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছ।

বিয়ে করাটা একটা জেদ, মৌসুমী।

মৌসুমী দাঁড়িয়ে গেল। ...জেদ মানে?

জেদ। আমার খুশি। ইচ্ছে। ...ব্যাপারটা বোঝবার জন্য আরও শব্দ খুঁজছিলাম।

মৌসুমী হাঁটতে হাঁটতে শাসানোর ভঙ্গিতে বলল, মউদিকে বলছি।

মউয়ের সঙ্গে তোমার ভাব আছে বুঝি?

একটু-একটু।

ফস করে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, মউয়ের সঙ্গে শচীনের গভীর প্রেম আছে, মৌসুমী। বাক্যটার সঙ্গে খানিকটা শ্বাস ভাপসমেত বেরিয়ে আমিও কেমন চুপসে গেলাম যেন।

মৌসুমী হঠাৎ রাস্তার ধারে একটা ঝুপসি অমলতাস গাছের তলায় দাঁড়িয়ে গেল আবার। এখানে ঘর বাড়ির একটুখানি বিরতি। রোডস দফতরের জমিয়ে রাখা পাথরকুচি আর ইটের স্ট্যাক। পাশে একটা স্টিমরোলার কালো হয়ে থেমে আছে। আলো কম। মৌসুমী চাপা স্বরে বলল, কে যেন বললে পুঁটুদা—শচীন না কী যেন?

হুঁ, শচীন।

তোমাকে একটু পরেই বলতাম কথাটা। মৌসুমী ফিসফিস করে বলতে লাগল। গত কালীপুজোর রাতে আমরা দলবেঁধে বেরিয়েছিলাম। ব্যারাকের মাঠের পাশ দিয়ে আসার সময় দেখি, উল্টোদিক থেকে মউদি আর গলাকাটা শচীন আসছে। গলাকাটাকে দেখে আমরা তো ভয়ে সারা। ওখানে বড়-বড় গাছ আছে রাস্তার ধারে, দেখেছ তো? দুজনে গাছের পেছন দিয়ে মাঠে চলে গেল। আমরা থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম। ওরা গেল, তবে আমরা আসতে পারলাম।'...মৌসুমী নিঃশ্বাস ফেলে একটু হাসল। ... বাড়ি ফিরে বাবাকে বলেছিলাম শচীনকে দেখার কথা। বাবা খুব বকলেন। মা তো ভয়ে সারা। গলাকাটার পাল্লায় পড়লেই হয়েছিল আর কী!

মউকে পরে জিগ্যেস করনি কিছু?

ওরে বাবা! ওসব কথা বলা যায় নাকি? শচীনকে যদি বলে দেয়, বাড়ি থেকে বেরুন বন্ধ করে দেবে। ওকে কিচ্ছু বিশ্বাস নেই। গলাকাটা নাম কেন হয়েছে জান না তুমি?

মৌসুমীকে তাতিয়ে দেবার জন্য বললাম, তোমরা পুলিশকে বলে দিলে পারতে। শচীন তো ফেরারি আসামি।

মৌসুমী হাঁসফাঁস করে বলল, বাবা বলছিলেন পুলিশ ওকে ধরবে না। ওর পেছনে ইনফ্লুয়েন্সিয়াল লোক আছে যে!

মৌসুমী, এবার বুঝলে তো কেন মউকে বিয়ে করার জন্য আমার এত জেদ? শচীনের সঙ্গে আমি লড়তে চাই।

কথাটা বলেই চারপাশটা দেখে নিলাম। আলোর পরে কুয়াশার দেয়াল দূরে এবং তার পেছনে শচীন যেন খুক করে কাসল। তক্ষুনি পা বাড়িয়ে ফের বললাম, এস। বেশি রাত্রি করা ঠিক নয়। সুলেখাদি আছেন নাকি দেখি।

মৌসুমী বলল, আমি তোমার সঙ্গে ওঁর কাছে যাচ্ছি না। তিতিদের বাড়িতে ওয়েট করছি তোমার জন্য। তুমি না এলে একা বাড়ি ফিরতে পারব না। কিন্তু।

দেরি হলে রিকশ করে চলে যেও!

মৌসুমী প্রায় আর্তনাদ করল। না! ভাল হবে না বলছি, পুঁটুদা! এমন করবে জানলে আসতাম না।

শচীনকে অত ভয় কিসের মৌসুমী?

যাঃ। ওকে ভয় কর তো তুমি করবে। ...কিন্তু মৌসুমী এবার যেন নিজের গলা বাঁচাতেই আমার গা ঘেঁষে বেড়ালের মত হাঁটতে থাকল। ...তুমি ওর প্রেমিকাকে ভাগিয়ে নিতে যাচ্ছ। তুমি সাবধান। আর শোন পুঁটুদা, মউদিকেও যেন সাবধান করে দিও।

একটু পরে ডানদিকের একটা বাড়ির দিকে দেখিয়ে মৌসুমী বলল, এইটে তিতিদের বাড়ি। আমাকে ডেকে নিয়ে যেও।

সে হঠাৎ পাখনা মেলে রাতের প্রজাপতির মত উধাও হয়ে গেল গেটের ভেতর। তক্ষুনি টের পেলাম ভয় জিনিসটা সংক্রামক।

সুলেখাদির কণ্ঠস্বর একটু ফ্যাঁসফেঁসে, পুরুষালি। কথাবার্তাও সেইরকম পুরুষোচিত। বহুক্ষেত্রে কয়েকমিনিটের মধ্যে তুমি থেকে তুইতোকারিতে নামতে দেরি হয় না। বাঘিনীর মত হুংকার দিয়ে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে গলার কাছটা খামচে ধরেছিল। তারপর বলাকওয়া নেই, হিড়হিড় করে

টানতে টানতে তিনতলার ঘরে। ডিভানে গুঁজে দিয়ে অসুরের দিকে মাদুর্গা যেমন করে তাকিয়ে থাকে, সেই চাউনিতে তাকিয়ে থেকে বলল, তোকে আজ বধ করব।

কী হল বলবে তো?

তুই একটা পাঁঠা। তোর পেটে-পেটে এত বুদ্ধি তো জানতাম না রে!

—ব্যাপারটা ...

ন্যাকামি করিস নে জয়। থাপ্পড় খাবি। সুলেখাদি আমার পাশে আলতোভাবে বসে চোখে চোখ রেখে বলল, হাসি আমাকে সব বলেছে। তুই হাসির কাছে কনসাল্ট করতে গিয়েছিলি! নেমকহারাম! তুমি হাসির সঙ্গে মনের কথা বলতে যেতে পার, আমার কথা তোমার মনে থাকে না!

সুলেখাদি খসখসে ফর্সা কাঠির মত আঙুলে আমাকে ক্রমাগত খোঁচাতে শুরু করল। আমি আঙুলটা ধরে ফেলে বললাম, এই তো এলাম লেখাদি।

আঙুল ছাড়। খুব জোর আছে তোর গায়ে, জানি। কিন্তু চেহারাখানা এমন বাসি মড়ার মত করে ফেলেছিস কেন? সুলেখাদি আমার চিবুক ঘষে দিল। ...দাড়ি কাটিস নি কেন? আজ বাদে কাল তোর বিয়ে না?

হুঁ, বিয়ে।

সুলেখাদি এবার সিরিয়াস হয়ে বলল, আমার যদি কিছু করার থাকে, বল্ করব। কী করতে হবে?

সিগারেট বের করে খুব যত্ন করে ধরালাম। সুলেখাদি অ্যাশট্রে এনে পাশে রাখল। তারপর আমার দিকে বড় চোখ করে তাকিয়ে রইল। চুপচাপ আছি দেখে সে ফের বলল, হাসি বলছিল মেয়েটার নাকি স্বভাবচরিত্র ভাল নয়। আমি কোনও মন্তব্য করিনি। চরিত্র-ফরিত্র আমি বুঝি না বাবা। আমার কথা হল, বিয়ের আগে আজকাল একটু-আধটু প্রেম সবাই করে থাকে। তা নিয়ে যারা মাথা ঘামায় তাদের বিয়ে করাই উচিত নয়।

আমিও ঘামাইনি, লেখাদি।

ঘামাস নে। সুলেখাদি উঠে দরজার কাছে সিঁড়ির মাথায় গিয়ে চিক্কুর ছাড়ল, চিত্রা। শুনে যা। তারপর চিত্রা নামে কাজের মেয়েটিকে কী সব ফরমাস করে ফিরে এল। মুখে জ্বলজ্বলে হাসি। সুলেখাদির চেহারায় যে পুরুষালি ছাঁদ আছে, সেটা মেমসায়েবদের মত। লালচে খসখসে চামড়ার রঙ। সবসময় রঙচঙ মেখে থাকার জন্যই হয়ত এই মেম-মেম ছিরি। এ শহরে একসময় নামকরা লোকজনের মধ্যে ছিলেন সুলেখাদির বাবা গগনেন্দু নারায়ণ। দুঁদে উকিল ছিলেন ভদ্রলোক। এমন বাবার একমাত্র মেয়ে হলে যা হয়। সুলেখাদি কাউকে পরোয়া করে চলে না। চুটিয়ে সমাজসেবা তো আছেই, তার সঙ্গে আছে সংস্কৃতি। সরকারি লোকেদের সঙ্গে খুব দহরম-মহরমও আছে দেখেছি। ওদিকে পিসতুতো না মাসতুতো দাদা এই এলাকার এম পি।

হঠাৎ আবিষ্কার করলাম, গলাকাটা শচীনকে টিট করার জন্য একটা শক্তপোক্ত মাটি আমার পায়ের তলায় আছে। অথচ খেয়াল ছিল না।

আসলে সুলেখাদিকে তার দিক থেকে কখনও বিচারবিশ্লেষণ করে দেখিনি। একজন বিচিত্র স্বভাবচরিত্রের স্ত্রীলোক না স্ত্রীলোক! এতক্ষণে আমার দেরিতে খোলা বুদ্ধির দরজা একটু ফাঁক হল। এবার বুক ঠুকে অনায়াসে এই তিনতলা থেকে হাঁক ছাড়তে পারব, চলে আয় শচীন! কাম অন!

সুলেখাদি আমার সামনে মোড়া টেনে বসে বলল, আগে থাম, তোর শাস্তি পাওনা আছে। তুই বহুকাল আসিস নি। দ্বিতীয় কথা, গত মাসে একজিবিশানের মেলায় তোকে একপলকের জন্য দেখলাম। তোকে খুঁজতে পাঠালাম, এমন কী তোর নাম অ্যানাউন্স করে ডাকা হল, তুই এলি না। এত ডাঁট কিসের রে পাঁঠা?

সুলেখাদির কাছে আসা মানে বারবার ওই কদাকার অশ্লীল প্রাণীতে রূপান্তর, এইটাই যা বিরক্তিকর। তবে ওই কথাটা সত্যি। মেলায় বারবার মাইকে বলা হচ্ছিল : জয়গোপাল! আপনি যেখানেই থাকুন, আমাদের অফিসে চলে আসুন। মিসেস সুলেখা মিত্তির আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।

জয়গোপাল এই ঢাউস গম্ভীর নামটা অনেকের জানা নেই। নিজেরও অনেকসময় মনে থাকে না। আমি এক জয়গোপাল। পুঁটু বললে সর্বসাধারণ যেমন, তেমনি নিজেও নিজেকে চিনতে অসুবিধে হয় না। তাছাড়া হাজার-হাজার লোকের ভিড়-ভাট্টার মধ্যে জয়গোপাল! জয়গোপাল! জয়গোপাল!

আমি শুনেছিলাম জয়ঢাক! জয়ঢাক! জয়ঢাক!

কাজেই রাগ করে যাইনি বলেই মনে হচ্ছে। অথবা এমনও হতে পারে নামটা আমার বলে মনে হয়নি। সুলেখাদিকে আর সে কৈফিয়ত দেওয়ার মানে হয় না। আস্তে বললাম, আমার কোনদিন কি ডাঁট দেখেছ লেখাদি? তবে ওসব কথা থাক। বড্ড প্রব্লেমে পড়ে গেছি।

হুঁ, বুঝেছি। বেড়াল কেন গাছে চড়েছে। সুলেখাদি চড়া গলায় বলল। তোকে কী বলব? সব্বাই তাই। কাজ পড়লেই মিসেস মিত্র অন্যসময় আর ধাক্কা লাগলেও চিনতে পারে না। এবার তুইও তাদের দলে চলে গেছিস। ঠিক আছে বাবা। বল, কী করতে হবে তোর জন্য?

বলছি। একটু ভেবে নিয়ে আস্তে বললাম, শচীন বোসকে কি চেন লেখাদি?

সুলেখাদি ভুরু কুঁচকে বললেন, শচীন মানে খোকা বোসের কথা বলছিস?

খোকা কি না জানি না, আমি গলাকাটা শচীন বলে জানি।

বুঝেছি। সে তো অ্যাবসকনড্ করে আছে। সে কী করল তোর?

বিয়েতে বাধা দিচ্ছে।

খোকা তোর বিয়েতে বাধা দেবে কেন? সুলেখাদি ঝুঁকে এল আমার দিকে। ওয়েট, ওয়েট! তুই তো অখিলমাস্টারের মেয়েকে বিয়ে করছিস? কী যেন নাম মেয়েটার—আমাদের সমিতিতে আসত-টাসত একসময়!

মউ-মহুয়া।

রোগা মত, দেখতে সুন্দর—

শচীনের সঙ্গে ওর সম্পর্ক ছিল। হয়ত এখনও আছে।

সুলেখাদি দপ করে নিভে মাথা দোলাল। ফোঁস করে শ্বাস ছেড়ে বলল, খোকা বোসের ব্যাপারে তুই নাগুদাকে গিয়ে ধর। ও নাগুদার লোক। নাগুদা'র সঙ্গে ইদানিং আমার চটাচটি হয়ে গেছে। আসলে কী জানিস জয়? পলিটিকস দেশটার বারোটা বাজিয়ে ছাড়ল। আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, আমার সঙ্গে আত্মীয়তা থাক, কী যদি সহোদরও হয়, পলিটিকাল লোকদের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রাখব না। আজ সকালে নাগুদার বউ এসেছিল, তার মুখের ওপর বলে দিয়েছি আমি সুলেখা মিত্তির। অন্য ধাতুতে গড়া।

চিত্রা ট্রে সাজিয়ে খাবারের প্লেট আর চায়ের সরঞ্জাম রেখে গেল। সুলেখাদি সুন্দর মুখখানা প্যাঁচার মত করে খাবারের প্লেট আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, খা।

খাওয়া খুব দরকার। প্রচুর ভিটামিন সংগ্রহের তালে আছি। কিন্তু সুলেখাদির কথা শুনে খুলির ভেতরটা ফাঁকা হয়ে গেছে। তাহলে নাগু মিত্তিরের পোষা লোক গলাকাটা শচীন ওরফে খোকা বোস! মনে পড়ে গেল, দাদা একবার আমাকে নাগুবাবুর কাছে নিয়ে গিয়েছিল। আমাকে দেখে নাগুবাবুর সে কী জিভ চুকচুক আর আক্ষেপ। আহা, এমন সব স্বাস্থ্যবান সোনার চাঁদ ছেলেদের জন্য কিছু করা যাচ্ছে না। চতুর্দিকে স্বজনপোষণ দুর্নীতি ধাপ্পাবাজি। এরা সব যাবে কোথায়? বুঝলে হে বিজয়, এরপর যদি তোমার ভাই হাতে বোমা পিস্তল তুলে নেয়, কী করে ঠেকাবে? তাই শুনে দাদা গদগদ হয়ে বলেছিল, সেজন্যেই তো আপনার কাছে নিয়ে আসা। তবে পুঁটু সে-লাইনের ছেলে নয়। ওকে দেখেই বুঝতে পারছেন, বড্ড মুখচোরা আর ভীতু। কারুর সঙ্গে মেশে না। কোনও ঝুটঝামেলায় নেই। আপনি যা হোক একটা কিছুতে ঢুকিয়ে দিন ওকে। নাগু মিত্তির ফোঁস করে প্রচণ্ড শ্বাস ছেড়েছিলেন। ...দেখা যাক। মাঝেমাঝে ওকে পাঠিয়ে দিও।

বার তিনেক গিয়ে একই হাহাকার শুনে এসেছিলাম। আরও বারকতক গেলে কি নাগু মিত্তিরের পুষ্যি হয়ে উঠতে পারতাম শচীনের মত? নিশ্চয় পারতাম না। ওঁদের সব জহুরির চোখ।

বললাম, শচীন তাহলে—

নাগুদার লোক। সুলেখাদি রাগী মুখে বলল।

তুমি কি দেখেছ কখনও শচীনকে?

সুলেখাদি মাথা নেড়ে তেড়ে এল। কী খালি শচীন-শচীন করছিস? খা না!

খাচ্ছি লেখাদি।

মাছভাজা খাবি? চিত্রা সন্ধ্যাবেলা কোত্থেকে টাটকা মাছ নিয়ে এল। এক গাদা মাছ। কে খাবে অত?

আমি খাব।

সুলেখাদি প্রায় একটা অট্টহাসি হেসে বাজখাঁই হাঁক ছাড়ল, চিত্রা। চিতু! মাছভাজা নিয়ে আয়। তারপর ওই পুরুষালি খসখসে গলায় মধু ঢালতে ঢালতে বলল, এতদিন পরে এলি, ডিনার খেয়ে যা।

খাব।

তাই খা না রে পাঁঠা! বলে সুলেখাদি আদরে আমার কান টেনে দিল।

এইসময় ফোন বাজল ক্রিং ক্রিং করে। সে দ্রুত উঠে গিয়ে ফোন ধরল। তারপর কাউকে খুব ধমক-ধামক দিয়ে চাপা গলায় একগুচ্ছের খসখসে কথাবার্তা ফোনের ভেতর ঠাসতে থাকল। মাঝেমাঝে আমার দিকে ঘুরছিল এবং লাল টুকটুকে ঠোঁটে হাসিও ঝিলমিল করতে দেখছিলাম। এসব সময় সুলেখাদিকে রহস্যময়ী নারী বলে মনে হয়। চিত্রা প্লেটভর্তি মাছভাজা রেখে গেল। তাকিয়ে দেখে সাবধানে নিরাসক্তির শ্বাস ছাড়লাম।

ফোন রেখে সুলেখাদি এসে বলল, হ্যাঁ, কী যেন বলছিলি?

শচীনের কথা।

শচীন তোকে শাসাচ্ছে?

ধর, তাই।

অখিলবাবুর মেয়ে কী বলছে?

থাম লেখাদি। ফার্স্ট রাউন্ড সেরে নিই। সেকেন্ড রাউন্ডের আগে জম্পেশ করে বলব। সুলেখাদি চা ঢালতে ঢালতে বলল, আজ তুই আসাতে খুব ভাল লাগছে, জয়! আজ রিল্যাক্সিং মুডে আছি। বিকেলটা গার্ডেনিং করে কাটিয়েছি। রাত্রি না হলে তোকে দেখাতাম, কী অসাধারণ একটা ডালিয়া হয়েছে এবার। দেড় ফুট ডায়ামিটার। অবিশ্বাস্য রে, মাথাখারাপ করে দেওয়া! অ্যাই রামপাঁঠা! ও মাসে তুই যে গোলাপ গাছের কাটিং নিয়ে যাব বললি? তোর জন্য যত্ন করে রাখলাম আর তোর পাত্তা নেই। প্রিন্স অ্যালবার্টের কাটিং মাইন্ড দ্যাট। এ মাল আর কারুর ঘরে নেই, ঢের দেখেছি বাবা! এই করেই জ্বালিয়ে দিচ্ছি চতুর্দিক। ...

সুলেখাদিকে আজ একটু অন্যরকম দেখাচ্ছিল। এতক্ষণে সেটা স্পষ্ট করে চোখে পড়ল। সাজগোজ ঠিকই আছে, গলার স্বর, হাম্বিতম্বি, আত্মপ্রশংসার ভাব সব ঠিকঠাক। কিন্তু দপ করে জ্বলে ওঠা এবং নিভে যাওয়া, আবার জ্বলে ওঠার চেষ্টা যেন বার বার তাল কেটে যাচ্ছে এবং আবার তাল মিলিয়ে নিচ্ছে। ওকে খুঁটিয়ে দেখছিলাম এবার।

ঘরটা বেশ চওড়া। দোতলার ছাদের ওপর এই ঘরটা সুলেখাদি নিজের খেয়ালে বানিয়েছিল। নিচের দুটো তলায় অসংখ্য ঘর। কোনও দরকার ছিল না আরেকটা ঘরের। দোতলার একটা ঘরে থাকতে দিয়েছে এক গরিব আত্মীয়কে। নিচের তলায় ওর বাবার চেম্বারটাকে করেছে নিজের কাজকর্মের অফিস। অন্য ঘরে দুই ভৃত্য আর গাড়ির ড্রাইভার থাকে। বাড়িটার ভেতর সে কারণে লোকজনের অভাব নেই। তেতলার এই ঘরটায় ঢুকলে কিন্তু মনে হয় সমুদ্রের মধ্যে একটা দ্বীপ। বইয়ের র‍্যাক, সোফাসেট, ডিভান, পুতুলের আলমারি, লেখাপড়ার টেবিলচেয়ার, একদিকটায় ঢাউস নিচু খাট—এত সবেও ঘরটা ভরে যায় নি। খুব একটা সাজান-গোছান, তাও নয়। তবু আমার মত হ্যাংলার চোখে এই এক স্বর্গ।

সেই স্বর্গে একটু যেন অসুখ-অসুখ ভাব। মুডটা হয়ত রিল্যাক্সিং, কিন্তু হঠাৎ-হঠাৎ টান হয়ে যাচ্ছে। কথা বলতে বলতে কেমন নেতিয়ে যাচ্ছে, আবার সামলে নিচ্ছে। মুখ নামিয়ে হঠাৎ বলতে লাগল, কত লোকের যে আমাকে হিংসে, আমার পেছনে লাগার চেষ্টা। তো ঠিক আছে বাবা। আমি

সুলেখা মিত্তির। তোরা তো আছিস আমার, আর কাউকে আমি চাইনে। আমার ওয়েলফেয়ার সেন্টার থেকে এই যে একগাদা মেয়েকে কতরকম কাজের ট্রেনিং নেবার সুযোগ করে দিচ্ছি, উল্টে তাদেরই বাবামায়েরা বা গার্জেনরা কী রটাচ্ছে শোন। রটাচ্ছে, আমি নাকি একটা দালালি ব্যবসা খুলেছি। কিসের ব্যবসা? না—সরকার প্রচুর টাকা দিচ্ছে আর আমি মাঝখানে নেপো হয়ে সব দই মেরে দিচ্ছি। এই নিয়েই তো নাগুদার সঙ্গে বেধেছে। ঠিক আছে বাবা! লড়ে যাও। আমিও সুলেখা মিত্তির।

বলেই চেঁচিয়ে উঠল, অ্যাই পাঁঠা! তুই আমার নামে রুদোকে কী যেন লাগিয়েছিলি—রুদো বলছিল!

কী বলছিল লেখাদি?

সুলেখাদি হাসল তক্ষুনি।... সে কি আর মনে আছে? কী যেন বলছিল।

তোমার একদিন মাথা টিপে দিয়েছিলাম। রুদো তাই নিয়ে ঠাট্টা করছিল আমাকে—জান?

সুলেখাদি আঙুল তুলে শাসানোর ভঙ্গিতে বলল, এবার পা টেপাব। রুদোকে দিয়েও টেপাব। আসুক বাঁদর ছেলে।

পায়ের দিকে হাত বাড়িয়ে বললাম, দাও। টিপে দিই।

সুলেখাদি গম্ভীর হয়ে গেল।...ছাড় ওসব। তোর বিয়ের কথা বল। কী যেন বলছিলি, খোকা বোস তোকে শাসিয়েছে না কী যেন?

সুলেখাদি এইরকম। মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়েছে, মাথায় ছিট তো আছেই এবং ভবিষ্যতে পাগল হয়েই যাবে। অথচ এখনও পাগল হয়নি। চমৎকার চালিয়ে যাচ্ছে সমাজসেবা এবং সংস্কৃতি। পান থেকে চুন খসার উপায় নেই। যত ফস্টিনস্টি করুক, নিজের জায়গায় ঠিক। অত্যন্ত গণ্যমান্য মহিলা।

বললাম, তোমার আজ কিছু শোনার মুড নেই লেখাদি, কী হয়েছে?

সুলেখাদি ঘষা চোখে তাকিয়ে বলল, কী হবে রে?

তোমাকে খুব আনমনা মনে হচ্ছে। কনসেন্ট্রেশন নেই।

শালুক চিনেছে গোপালঠাকুর!

চিনেছি।

সুলেখাদি হুংকার দিয়ে বলল, আমি কি তোর মত এই বয়সে প্রেম করে বেড়াচ্ছি রে ছাগল!

প্লিজ লেখাদি! ছাগল পাঁঠা আর নয়। বয়স হয়েছে, শুনতে কষ্ট হয়।

ছাগলে আপত্তি থাকলে বল কী বলব তোকে? তুই বল, তুই কী?

কচ্ছপ।

সুলেখাদি আবার অট্টহাসি হাসতে হাসতে ঝোঁকের বশে উঠে কয়েক পা চক্কর খেল তারপর ফিরে এসে সোফার কোনার দিকে ধপাস করে বসল। সেন্টারটেবিলে পা অনায়াসে তুলে দিয়ে বলল, এখানে চলে আয়। কী বলছিলি, ঠাণ্ডা মাথায় শুনি।...

মুরলীর কাছে রাত কাটানোর সময় তার সঙ্গে অনেক মনের কথা হত। একবার সুলেখাদির কথা শুনে বলেছিল, বড়লোকের নজরে যখন একবার পড়েছ পুঁটু, তখন তোমার উন্নতি হবে। তাতে মেয়েছেলে। শুনেছি গাগু উকিল ঘরজামাই রেখেছিল। সে বেচারা নাকি কাছে ঘেঁষতেই পারে নি। কলকাতায় ফিরে গিয়ে আবার বিয়ে করেছে। কাজেই পুঁটু সঙ্গ ছেড় না। যদি দু একখানা সুন্দর পায়ের লাথিও ঝাড়ে, খেও লাথি।

সুলেখাদির সত্যিই লাথি ঝাড়া স্বভাব আছে। বেশ কিছুক্ষণ একেবারে মাখামাখি, মধু ঢালাঢালি, আবার তারপরই হঠাৎ গম্ভীর হয়ে ঠিক আছে, এবার আয়—আর জ্বালাসনে, বলে প্রায় বের করে দিয়েছে। সেজন্যই খুব কম গেছি তার কাছে। এড়িয়ে থাকার চেষ্টা করেছি বরাবর। সে-রাতে অমন করে কাছে টানল। মন উজাড় করে দিলাম এবং অখিলস্যারের 'অথরিটি লেটার' পর্যন্ত দেখালাম। সুলেখাদি হাসতে হাসতে আমাকে খোঁচাখুঁচি করে কাতুকুতু দিয়ে কান টেনে এক কাণ্ড করল। মুখোমুখি বসে ডিনারও খাওয়া হল প্রচণ্ডরকমের। তারপর আরাম করে বসে যেই সিগারেট ধরিয়েছি, চেরা গলায় চিত্রাকে হেঁকে বলল, জয় যাচ্ছে। রতনকে গেটে তালা দিতে বল্ গে।

তখন প্রায় এগারটা বেজে গেছে। কথাটা বলেই সুলেখাদি চটি ফটফটিয়ে সংলগ্ন বাথরুমে গিয়ে ঢুকল। চিত্রা পর্দা ফাঁক করে ষড়যন্ত্রের গলায় ডাকল, আসুন দাদাবাবু!

এ বাড়ির লোকগুলো যেন যন্ত্র। রাস্তায় দাঁড়িয়ে রতনের গেট বন্ধ করার শব্দ শুনলাম। তারপর হঠাৎ মনে পড়ল, ওই যাঃ। মৌসুমীদের ব্যাপারটা তো বলা হয় নি সুলেখাদিকে!

যে বাড়িতে মৌসুমী ঢুকেছিল, সে বাড়ির সামনে গিয়ে দেখি দরজা-জানালা বন্ধ। মৌসুমী নিশ্চয় কখন চলে গেছে।

হলুদ আলোর ওপর কুয়াশার ছোপ চারদিকে। খাঁ খাঁ রাস্তা। ঘর-বাড়ি আর গাছপালার খাঁজে খাঁজে যে আঁধার কালো হয়ে আটকে আছে, সেখানেই শচীনকে টের পেতে পেতে আতঙ্কিত হতে হতে হঠাৎ একটা মুহূর্তে মরিয়া হয়ে গেলাম। পেছনে অসংখ্য শচীন আমাকে অনুসরণ করতে থাকল।

মুরলী দরজা খুলে দিয়ে বলল, এতক্ষণ বসে থেকে-থেকে এইমাত্র শুয়ে পড়েছিলাম। ভাবলাম তোমার তো জায়গার অভাব নেই টাউনে। ছিলে কোথায় এত রাত অবধি? খাওয়াদাওয়া হয়েছে তো?

গাগু উকিলের বজ্জাত মেয়েটার কাছে সেঁটে এলাম। তেমনি লাথিও খেলাম।

মুরলী এতটা জিভ বের করে বলল, ছি ছি! রাগ করতে নেই মেয়েছেলের ওপর। অমন মেয়েছেলের লাথি খেলেও সুখ। লাথি খেয়েছ তো কী হয়েছে। তোমাকে কী শিখিয়েছিলাম ভুলে গেছ?

বিছানা যত্ন করে রেখেছিল মুরলী। কম্বলে ঢুকে মাথা ঢেকে চিত হয়ে শুয়ে পড়লাম। মুরলী কয়েকবার ডেকে সাড়া না পেয়ে বলল, তোমাকে বলেছি পুঁটু, যৌবন বড় ডেঞ্জার জিনিস। ইউজ করতে না পারলে মনমেজাজ রাইট থাকে না। শুনেছি মেয়েটা টাউনের ভাল ভাল ছেলে ধরে নিয়ে গিয়ে বডি মালিশ করে। খি খি খি! পুঁটু, অ পুঁটু। তোমাকে কখনও—খি খি খি?

কম্বলের ভেতর বললাম, একবার মাথা টিপে দিয়েছিলাম।

মুরলী তার ফর্মে ফিরে আসছিল। তার অশ্লীল কথাবার্তায় ঘরটা কটু হয়ে যাচ্ছে দেখে কম্বল থেকে মুখ বের করে খেঁকিয়ে উঠলাম, কী মাইরি ভ্যানর-ভ্যানর কর! ঘুমোতে দাও। এমন করলে আর কখনও তোমার কাছে শুতে আসব না।

মুরলী ভড়কে গিয়ে বলল, ভাল কথা। ঘুমোও, ঘুমোও। ...

অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুমিয়ে যথারীতি মুরলীর কাছে ব্রেকফাস্ট আদায় করে বাড়ি ফিরে শুনলাম, দাদা তার শ্যালককে নিয়ে কোথায় বেরিয়েছে। বউদি তার মাকে নিয়ে গেছে কোবরেজমশাইয়ের বাড়ি। পিসিমা আর নীলাঞ্জনা রোদে বসে কথা বলছে। আমাকে দেখে নীলাঞ্জনা বলল, কী মশাই? কাল সেই যে গেলেন, আর পাত্তা নেই! ছিলেন কোথায়?

পিসিমা আমার হয়ে বললেন, ওর দুর্গতির শেষ নেই। হন্যে হয়ে ঘুরছে একটা কাজের জন্য, দেশের কী অবস্থা হয়েছে দেখছ তো? যতক্ষণ না একটা কিছু জুটছে, এমনি করে ঘুরতে হবে পুঁটুকে।

বাইরের ঘরে মউমউ করছিল মিঠে একটা গন্ধ। নীলাঞ্জনার গন্ধই হবে। পোশাক বদলে বেরিয়ে গিয়ে বললাম, পিসিমা! বেরুচ্ছি।

কথাটা বলার দরকার ছিল না। নীলাঞ্জনাকেই আবার একবার দেখার ইচ্ছে হয়েছিল। নীলাঞ্জনা বলল, কী? আমার সঙ্গে কথা বলছেন না যে?

তাই বুঝি? মনে হল যেন বলেছি।

নীলাঞ্জনা রোদ থেকে উঠে এল। কোথায় চললেন আবার?

ওই তো শুনলেন—কাজের খোঁজে।

চালাকি হচ্ছে? নীলাঞ্জনা চিনির দানা ছড়িয়ে হাসল। আপনি কত কাজের লোক, দিদির কাছে শুনেছি।

বলে সে দু পা এগিয়ে এল। চাপা গলায় ফের বলল, বরং আমাকে নিয়ে চলুন। চুপচাপ বসে থাকতে বিচ্ছিরি লাগছে। নতুন জায়গায় গিয়ে বসে থাকতে একেবারে ইচ্ছে করে না।

একটু হকচকিয়ে গিয়ে বললাম, কিন্তু এখানে তো দেখা-টেখা বা বেড়ানোর মত কিছু নেই। মফস্বল টাউন যা হয়। একটা ভাল পার্ক পর্যন্ত নেই।

ভ্যাট! পার্কের কথা কে বলেছে। এমনি যেখানে-সেখানে ঘুরব।

পিসিমা টের পেয়ে বললেন, ওকে বরং গির্জা দেখিয়ে নিয়ে আয় পুঁটু। নবাবী আমলের গির্জা—কত লোক দেখতে আসে কলকাতা থেকে।

বউদি এসে বকবে।

নীলাঞ্জনা ভুরু কুঁচকে গলার ভেতর বলল, কারুর বকাবকির ধার ধারি না। বেড়াতে নিয়ে এসে ঘরে চুপচাপ বসিয়ে রেখে কাজের তাল করে বেড়াবে—বাঃ! পেয়েছে ভাল আমাকে। চলুন!

আজও তেমনি কুয়াশা। তার সঙ্গে আকাশও সাদা হয়ে আছে মেঘে। উত্তরহাওয়ার সামান্য ঝাপটানি আছে। বেশ কনকনে ঠাণ্ডা। নীলাঞ্জনা গায়ে চাদরটা আঁটো করে জড়িয়ে নিল। বললাম, মফস্বলী শীত আপনারা কলকাতার মেয়েরা সহ্য করতে পারবেন না। না বেরুলেই পারতেন।

নীলাঞ্জনা ঝাঁঝাল স্বরে বলল, তার চেয়ে বলুন আমি আপনার কোনও মহৎ কাজ পণ্ড করে দিলাম।

আমার নিজের কোন কাজই নেই, নীলাঞ্জনা! এইসব কাজ ছাড়া।

কী সব কাজ?

মহিলাদের তাঁবেদারি।

ঠিক আছে। আপনাকে আসতে হবে না।

রাগ করবেন না, প্লিজ। আমাকে এক্সপ্লেন করার সুযোগটা অন্তত দিন।

কয়েক পা জোরে এগিয়ে থমকে দাঁড়িয়েছিল নীলাঞ্জনা। চোখে হেসে বলল, এমন করে বললেন যেন রাজ্যের মহিলারা আপনাকে সবসময় তাঁবেদারি করিয়ে নিচ্ছে।

চলুন, হাঁটতে হাঁটতে বলি। ...নীলাঞ্জনার পাশে গিয়ে গলায় দুঃখ ফুটিয়ে বললাম, জানেন? আমার মধ্যে যেন একজন দীনাতিদীন চাকর-বাকর আছে। চিরকালের ভৃত্য। না, না—আপনার সঙ্গে এর সম্পর্ক নেই। আপনি একেবারে নবাগত এ শহরে।

তাহলে বলুন, আমিও টের পেয়ে গেছি ব্যাপারটা।

অমন করে বলবেন না, দুঃখ পাব। তবে এটা ঠিকই, এ শহরের তাবৎ পুরুষের কাছে আমি নিষ্কর্মা, মেলামেশার অযোগ্য, প্রকৃতপক্ষে একটি রামছাগল। হাসবেন না। কথাটা খাঁটি। কিন্তু আমি রামছাগল হই বা আরও নিকৃষ্ট কোন প্রাণী হই, এ শহরের মহিলারা আমাকে কেন যেন কাজের লোক বলে মনে করে। তারা আমাকে দিয়ে কাজ করানোর জন্য সবসময় তাক করে থাকে। আপনি জানেন? এক মহিলা প্রায় কয়েকমাস ধরে আমাকে তার দুঁদে খচ্চর পুত্রের জিম্মা দিয়ে অফিস করতে যেত। শুধু তাই নয়, পাড়ার সব বাচ্চার একসময় এমন মামা হয়ে উঠেছিলাম যে ইচ্ছে করত হ্যামেলিনের সেই বাঁশিওলার মত সবগুলোকে নিয়ে—

দম নিয়ে ফের বললাম, আরও আছে। বাজার করে দেওয়া, রেশন আনা, দুধের বা কেরোসিনের ডিপোয় লাইনে দাঁড়ান, স্টেশনে কার লোকজন আসবে সেজন্য গিয়ে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়ান, এমন কী কখনও মাথা টেপার কাজ পর্যন্ত। ম্যাডাম, আমার অতীত জীবন হল এইরকম।

নীলাঞ্জনা কান করে শুনছিল। আস্তে বলল, পা টেপার কাজ?

তাও বাকি নেই। এই তো কাল রাত্তিরেও—

চেপে গেলাম নীলাঞ্জনা চাদরে মুখ গুঁজে ঝরঝরিয়ে চিনির দানা ঝরাচ্ছিল দেখে। একটু পরে সে মুখ বের করে আস্তে বলল, কালরাতের সেই ভাগ্যবতীর জন্য ঈর্ষা হচ্ছে।

ভাগ্যবতী? আমাকে সে পাঁঠা ছাড়া কথা বলে না। কথায়-কথায় পাঁঠা! করুণ মুখ করে এক খাবলা বিষাদ মাখিয়ে বললাম। ... আগের মত আর হয়ত তত বোকা নই। আফটার অল যথেষ্ট বয়স হয়েছে।

তাই ক্রমশ একটু করে নিজেকে কচ্ছপের মত খোলের ভেতর গুটিয়ে রাখতে শুরু করেছিলাম। বাড়িতে থাকলেই তলব আসত। নয়ত নিজেরা এসে চোখ পাকিয়ে বলত কী রে পুঁটে? খুব যে ডুমুরের ফুল হয়ে উঠেছিস? দাম বাড়াচ্ছিস বুঝি?

নীলাঞ্জনা চোখ বড় করে বলল, বলেন কী? আপনার দাদা-বউদির সামনেই নাকি?

হ্যাঁ। বউদি একটু রাগ-টাগ করেছে। কিন্তু দাদা আমাকে গোপনে পরামর্শ দিয়েছে, এই করেই তো পপুলারিটি হয়। লোকেদের কাছে নিজের যোগ্যতা প্রমাণিত হয়। পপুলার হলেই দেখবি চাকরি এসে তোকে সাধছে। এই যে লোকে এত ডাকাডাকি করছে, আর কাউকে তো করে না। এটা তোর একটা পাওয়ার, পুঁটে।

ভ্যাট! পুঁটে-পুঁটে করছেন কেন? শুনতে বিচ্ছিরি। নীলাঞ্জনা গলার স্বর বদলাল। ...কাল বিকেলে ওই মেয়েটি ডাকতে এল, ওর সঙ্গে বেরিয়ে গেলেন—কে ও?

যাদের কথা বলছি এতক্ষণ, তাদেরই রিপ্রেজেন্টেটিভ।

নাম কী?

মৌসুমী।

নীলাঞ্জনা কিছুক্ষণ চুপচাপ হাঁটতে লাগল। তারপর মুখ তুলে বলল, আমরা কোথায় যাচ্ছি?

গির্জা দেখতে। বলে সামান্য দূরে প্রাচীন কবরখানার পেছনে গাছপালার ভেতর গির্জার সূঁচলো চূড়া দেখিয়ে দিলাম। চাপ-চাপ কুয়াশা আলোয়ানের মত পড়ে আছে কবরখানার ওপর। বিশাল শিমুল গাছটা লাল জিভ দিয়ে কুয়াশা চাটছে। এদিকটা প্রায় নির্জন। বাঁ দিকে কিছুটা দূরে রেলইয়ার্ডের ওয়ার্কশপ কালো পাহাড় হয়ে ডুবে আছে কুয়াশায়। আবছা হুইসলের শব্দ কানে আসছিল।

নীলাঞ্জনা বলল, আপনাকে যে মহিলারা এত পছন্দ করে, আপনার তাতে আনন্দ হয় না?

কী হয়, ভেবে দেখিনি। হয়ত দুঃখই হয়।

সে কী! কেন দুঃখ হবে?

অকপট হতে ইচ্ছে করল। সামনে মৃতদের দেশ। এখানে সব কথা খোলাখুলি বলাই উচিত মনে হল। একটু কেসে বললাম, ফ্র্যাংকলি বলি, নীলাঞ্জনা। আপনি পরস্ত্রী। কাজেই আপনার এতে মনে করার কিছু নেই। আমি আজও কারুর—

থামবেন না, বলুন! আহা, বলুন না!

আমি আজ পর্যন্ত কারুর প্রেম-ট্রেম পাইনি। সিরিয়াসলি বলছি।

নীলাঞ্জনা হাসল না। হাসবে ভেবেছিলাম। একটু পরে বলল, কোন স্কুল টিচারের মেয়েকে যে বিয়ে করতে যাচ্ছেন, তার কাছে?

পাইনি।

তবু তাকে বিয়ে করতে যাচ্ছেন যে?

জেদ।

ভ্যাট। কিসের জেদ? বরং বলুন আপনি তাকে—বলব? নীলাঞ্জনা আস্তে ফের বলল, পাগলের মত ভালবাসেন। তাই না?

পাগলের মত মানে?

উপযুক্ত উপমা খুঁজে পেলাম না, তাই বললাম।

লক্ষ্য করলাম, নীলাঞ্জনার কণ্ঠস্বর খুব নরম হয়ে গেছে। মেয়েরা ভালবাসা শব্দটা উচ্চারণ করতে কি এমন নরম হয়ে যায়—তুলতুলে বেড়ালছানার মত? কোনও কথা না বলে কবরখানার ভাঙা গেটের ফাঁক দিয়ে ভেতরে গলিয়ে গেলাম। মিয়ানো ঘাসে সামান্য শিশির লেগে আছে। ঝোপের মাথায় দাগড়া-দাগড়া হলুদ ফুল। ঝরে পড়েছে ঘাসে বা কবরের বেদীতে। চারদিকে ভেঙে পড়া বা সোজা হয়ে থাকা শ্যাওলাধরা ক্রুসের সারি এগিয়ে গেছে যেন অনন্ত মৃত্যুর দিকে।

নীলাঞ্জনা পেছনে বলল, ভেতরে গেলে কেউ বকবে না তো?

কেউ নেই।

এই, আমার যেন ভয় করছে।

ভয় কিসের? এ তো মৃতদের জায়গা।

উঁহু, আমার ভয় জীবিতদের জন্য।

একটু অবাক হয়ে বললাম, তার মানে?

মানে-টানে নেই। নীলাঞ্জনা একটু ব্যস্তভাবে বলল। অন্যপথে গির্জায় যাওয়া যায় না?

হাসলাম। আপনি কি আমাকেই জীবিত ভাবছেন? আমাকে আপনি মৃতদের দলে ফেলতে পারেন, নীলাঞ্জনা। তাছাড়া আপনি আমার বউদির ভাইয়ের বউ।

নীলাঞ্জনা মুখে ছায়া টেনে বলল, ছিঃ কী যা তা বলছেন! আমি অন্যকথা ভেবে কী বলেছি, আর আপনি আজেবাজে মানে করে বসে আছেন। আমি ভাবছি ছিনতাই-টিনতাইয়ের কথা। একবার ভিক্টোরিয়ার মাঠে কী হয়েছিল জানেন?

মেয়েরা আসলে বড্ড প্র্যাকটিক্যাল। বরাবর দেখেছি, রিয়্যালিটির দিকে একটা চোখ রেখে হাঁটে মেয়েরা। হাসতে হাসতে বললাম, জীবনে কখনও মেয়েদের জন্য লড়ার চান্স পাইনি। দিন না একবার সে চান্স।

নীলাঞ্জনা দূরে কবরখানার ওদিকটা দেখিয়ে ভয় পাওয়া গলায় বলল, ওখানে কে যেন বসে আছে দেখলাম।

ঘুরে কাউকে দেখতে পেলাম না। বললাম, দেশে অসংখ্য ভবঘুরে আছে। তাদেরই কেউ হবে। আপনি আসুন না—আমি তো আছি। গির্জায় যেতে হলে এটাই শর্টকাট। নইলে জঙ্গল ভাঙতে হবে অনেকখানি। ওই ময়লাফেলার মাঠটা ঘুরে যেতে হবে। বড্ড নোংরা ওখানে।

অনিচ্ছা-অনিচ্ছা করে নীলাঞ্জনা আমাকে অনুসরণ করল। মধ্যিখান দিয়ে সোজা রাস্তায় ঘন ঘাস এবং তলায় এবড়োখেবড়ো ইট পাতা আছে। খানিকটা এগিয়ে শেষপ্রান্তে উঁচু কবরের ওপর ছাদবিহীন তিনটে পিলারের আড়ালে কাউকে সত্যি বসে থাকতে দেখছিলাম। ভাঙা পাঁচিলের বুকের ওপর আগাছার ঝাড়। একসার ঝাঁকড়া ফুলন্ত গাছ লাল সাদা হলুদ ফুলের ঝালর ঝুলিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়ায় কাঁপছে। পাশে নীলাঞ্জনাকে না দেখে দ্রুত ঘুরলাম। দেখি, সে নিচু হয়ে চোরকাঁটা ছাড়ানোর চেষ্টা করছে। বললাম, এই রে! খেয়েছে!

নীলাঞ্জনা কাঁচুমাচু মুখে হেসে উঠে দাঁড়াল। ...এজন্যেই আসতে চাইছিলাম না এখান দিয়ে। কী কেলেঙ্কারি হল দেখুন তো?

ভাববেন না। গির্জার ওখানে গিয়ে বসবেন কোথাও। ছাড়িয়ে দেব।

দেবেন কিন্তু!

নিশ্চয় দেব। আমার তো এগুলোই কাজ।

কথাটা বলে হনহন করে কয়েক পা এগিয়ে যেতেই পিলারের পেছন থেকে লোকটা উঠে দাঁড়াল। তারপর পা বাড়িয়ে হঠাৎ ঘুরল এবং থমকে দাঁড়িয়ে গেল। আমিও দাঁড়িয়ে গেলাম।

লোকটা শচীন।...

মাত্র কয়েক মিনিট আগে নীলাঞ্জনার কাছে মেয়েদের জন্য লড়ার একটা চান্স চাইছিলাম। এখন একান্তভাবে নিজের জন্য লড়ার চান্স এসে গেল।

কিন্তু তার চেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার, চব্বিশ ঘণ্টা আগেও যার কথা আমার ঘিলুর আনাচে-কানাচে ছিল না এবং থাকলেও যাকে পয়লানম্বর দুশমন ভাববার বিন্দুমাত্র কারণ ছিল না, এই চব্বিশ ঘণ্টা ধরে অর্থাৎ আগের রাতে মুরলীমোহনের কাছে শোনার পর থেকে তাকে একরকম আমিই যেন খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে গর্ত থেকে বের করেছি।

নিজেকে বললাম, এবার সামলাও তাহলে। কুয়াশার ভেতর থেকে গলাকাটা শচীন বেরিয়ে এসে ওই দ্যাখ, তোমার অপেক্ষা করছে। অখিলস্যারের ফুঁসলানিতে লেজে পা দিতে গেছ। ওই সে ফণা তুলে তাক করছে।

সত্যি শচীন তো? নাকি ছেঁড়া দড়িতে সাপ দেখছি? পিটপিট করে তাকিয়ে তাকে দেখতে থাকলাম। নীলাঞ্জনাও আমাকে দাঁড়াতে দেখে এবং হাবভাবে কিছু বিপদ আঁচ করে থমকে গিয়েছিল। ফিসফিস করে উঠল সে। ... এই চলুন আমরা ফিরে যাই। লোকটাকে দেখে ভাল মনে হচ্ছে না।

শচীন যদি ছুরি হাতে আমাকে তাড়া করে, ওকে ইঁট ছুঁড়ে ঠেকাতে হবে। এই কবরখানায় ইঁট তো প্রচুর! কিন্তু সবই ঘাসের তলায় মাটির সঙ্গে শক্ত হয়ে এঁটে আছে। তবে আমি যদি ছুটোছুটি করতে থাকি, কবরের পর কবর, ক্রুসের পর ক্রুস, তাদের আড়াল দিয়ে চক্কর মারতে মারতে পাঁচিলের ধারে পৌঁছুতে পারলে বেঁচে যাব। নিচু পাঁচিল। কোথাও-কোথাও পাঁচিলের বুকে ধস ছাড়িয়ে জঙ্গল গজিয়েছে। ঠেলে বেরিয়ে পড়তে পারলে শচীন আর আমার গলা কাটতে পারবে না। কবরের ভেতর দিয়ে আমাকে শচীন তাড়া করেছে ছুরি নিয়ে এবং আমি তার সঙ্গে লুকোচুরি খেলে বেড়াচ্ছি। কবরের পর কবর, ক্রুসের পর ক্রুস। গাঢ় কুয়াশা পেঁচিয়ে ধরেছে কবরখানাকে। কুয়াশা কবর এবং ক্রুসের মধ্যে স্লো মোশন সিনেমার দুই সিল্যুট হয়ে ওঠা চরিত্র। বাঃ! লড়ে যাও পুটু! সাদা দাড়িওলা সান্তা ক্রুসের মত অখিলস্যার ছ্যাৎরানো গলায় তাতিয়ে দিচ্ছেন, লড়ে যাও, লড়ে যাও!

নীলাঞ্জনার খোঁচা খেয়ে তাকিয়ে দেখলাম, লড়ছি না। শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। পিলারের গায়ে শচীন এবার হেলান দিয়ে সিগারেট টানছে। আমার দিকে চোখ।

নীলাঞ্জনা আবার ফিসফিস করল। ...বলছি ফিরে যাই। কী ভাবছেন অত? একটু কেসে বললাম, ভাবছি—

ভ্যাট! খালি ভাবছি আর ভাবছি! ভিক্টোরিয়ার মাঠে কী সাংঘাতিক ব্যাপার হয়েছিল, জানেন না!

এখানেও হোক। বলে এগিয়ে গেলাম। নীলাঞ্জনা বাধ্য হয়ে আমার পেছনে একটু দূরত্ব রেখে হাঁটছিল। কিছুই ঘটেনি কোথাও এমন নির্বিকার মুখ করে শচীনকে পাশ কাটিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সে আস্তে উঠল, তুমি বিজয়দার ভাই জয় না?

অমায়িক হাসি ওর মুখে। মাথাটা একটু নেড়ে দিলাম।

আমাকে চিনতে পারনি নিশ্চয়?

চিনেছি। তুমি শচীন।

অমন করে কথা বলছ কেন? এস, সিগারেট খাও। এদিকে কোথায় যাচ্ছ?

এই অমায়িকতা আর অন্তরঙ্গতা ওর একটা চাল ভেবে আগের মত মেজাজে বললাম, এঁকে গির্জা দেখাতে নিয়ে যাচ্ছি।

ঠিক আছে, বাবা। একটু দাঁড়িয়ে যাও না। কথা আছে।

বুকের ভেতরটা ধক করে উঠল। নীলাঞ্জনা প্যাটপ্যাট করে তাকিয়ে শচীনকে দেখছে। শচীনের চেহারা আগে কেমন দেখেছি মনে পড়ে না। হয়ত এরকমই ছিল। কালকুট্টে, বসা চোখ, খাড়া নাক, চোয়ালের হাড় ঠেলে ওঠা এবং খুঁটিয়ে কাটা চুল নিয়ে কাঠখোট্টা এক যুবকশরীর। এখন অবশ্য আর যুবক বলেও মনে হয় না। পরনে ছাইরঙা যেমনতেমন প্যান্ট আর গায়ে খাকি রঙের সোয়েটার। শিরাওলা হাত মুঠো করে সে সিগারেট টানছে।

শচীন সাদা দাঁত বের করল। তুমি চিরকালের গুড বয়, জয়। আমার মত ছেলের সঙ্গে তোমার মিশতে ঘেন্না হওয়ার কথা। তবে আমাকে যতটা খারাপ ভাবছ, ততটা কিন্তু নই। নাও, অন্তত একটা সিগারেট খেয়ে যাও।

এতক্ষণে দেখতে পেলাম, ওর পায়ের কাছে একটা বেঁটে আর চ্যাপ্টা বোতল রাখা আছে। এখানে এসে নিরিবিলিতে মদ খাচ্ছে শচীন। মদের নেশাই ওকে এমন গলিয়ে দিয়েছে তাহলে।

উঁচু বেদি থেকে নেমে সে আমাকে সিগারেট দিতে এল। তারপর নীলাঞ্জনাকে নমস্কার করে বলল, নমস্কার দিদি। আমার নাম শচীন বোস। খোকা বোস নামে সবাই চেনে। এক ডজন মার্ডার আর রায়টের মামলা ঝুলছে খোকা বোসের নামে। তবু দেখুন দিদিভাই, খোকা বোস কেমন বুক ফুলিয়ে এখানে বসে মাল—সরি, ভেরি সরি দিদিভাই! বেয়াদপি হচ্ছে।

সে জিভ কেটে ঠোঁটে আঙুল রাখল। তারপর সিগারেট বাড়িয়ে আমার কাঁধে হাত রাখল। তার মুখে মদের গন্ধ। ঝামেলা না বাড়িয়ে সিগারেটটা নিলাম। সে ফিসফিস করে বলল, সঙ্গে দিদিভাই আছে। তোমাকে মাল খেতে ডাকা ঠিক হবে না। কী বল?

আমি খাই না।

মাইরি? ওকে গুরু! যাও, যাও। দিদিভাইকে গির্জা দেখিয়ে আন। তারপর কথা হবে তোমার সঙ্গে। আমি কিন্তু এখানে বেশিক্ষণ থাকব না। যান দিদিভাই, দেখে আসুন। জয়, ওঁকে ঠিকমত—

সে হাতের ইশারায় গির্জা দেখানোর ভঙ্গি করল। কোটরগত চোখদুটো থেকে হাসি জ্বলজ্বল করছিল। সে আমাকে ঠেলতে ঠেলতে উল্টোদিকের গেটের কাছে পৌঁছে দিল। আবার নমস্কার করল নীলাঞ্জনাকে।

গেট পেরিয়ে গির্জার চত্বরে গিয়ে নীলাঞ্জনা বলল, ভদ্রলোক কে বলুন তো?

শুনলেন না কী বলল?

বিশ্বাস করিনি।

আমি বললেও বিশ্বাস করবেন না মনে হচ্ছে। ওকে এ শহরের লোকে গলাকাটা শচীন বলে। ঠাণ্ডা মাথায় চোখে চোখ রেখে ও লোকের শ্বাসনালী কাটে।

অসম্ভব। ওঁকে ভয় পাওয়ার মত কিচ্ছু দেখলাম না।

বেশ, তাই। ... শচীনের সিগারেটটা আমি চপ্পলের তলায় ফেলে ঘষে দিলাম। ফের বললাম, গত চব্বিশ ঘণ্টায় ওকে আমিও প্রচণ্ড ভয় করে বেড়িয়েছি—এমন কী কয়েক মিনিট আগেও আমার ভেতর প্রচণ্ড ভয় ছিল। কিন্তু এখন আর নেই। এখন আর ওকে ভয় হচ্ছে না। হয়ত ভবিষ্যতেও আর ওকে ভয় পাব না।

নীলাঞ্জনা একটু হাসল। ...গত চব্বিশ ঘণ্টা ওঁকে ভয় করেছেন? কেন?

যাকে বিয়ে করতে যাচ্ছি—মানে, করব ভাবছি, সে ওর প্রেমিকা।

মানে আপনার ফিঁয়াসের সঙ্গে এই ভদ্রলোকের—

গভীর প্রেম। অথচ দেখতে পেলেন, ও একটা মাতাল।

ভ্যাট। ড্রিঙ্ক করাটা দোষের কিছু নয়। আজকাল সবাই একটু আধটু ড্রিঙ্ক করে। আপনি করেন না? সত্যি?

হয়ত পয়সা নেই বলে।

নীলাঞ্জনা গির্জার চূড়া দেখতে দেখতে বলল, ইচ্ছে হলে করবেন। তাতে আপনার ফিঁয়াসে রাগ করবেন না। সে হঠাৎ ঘুরল আমার দিকে। একটু হাসল আবার। ...দাঁড়ান, দাঁড়ান। সব জট পাকিয়ে যাচ্ছে।

আপনি বললেন ওই ভদ্রলোকের সঙ্গে সেই ভদ্রমহিলার গভীর প্রেম আছে। তাই না?

ঠিক তাই।

তাহলে ওঁরা বিয়ে করেননি কেন? করছেন না কেন?

শুনলেন তো, শচীন একজন খুনের আসামি। ওর নামে অসংখ্য কেস ঝুলছে। পুলিশ ওকে পেলেই অ্যারেস্ট করবে।

নীলাঞ্জনা বিশ্বাস করল না। ... কী বলেন মিছিমিছি। তাহলে ভদ্রলোক এভাবে প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াতে পারেন?

নাণ্ড মিত্তির নামে এক পলিটিক্যাল লিডার ওকে গার্ড দিচ্ছেন।

নীলাঞ্জনা চত্বরে একটুকরো পাথরের ওপর বসে পড়ল। পায়ের কাছে শাড়ি একটু তুলে বলল, ওম্মা। কী সাংঘাতিক অবস্থা হয়েছে। জয়বাবু! আসুন না প্লিজ—একটু হেল্প করুন না আমাকে।

মেঘ কেটে একটুখানি রোদ্দুর গড়িয়ে পড়ছে এতক্ষণে। কবরখানার দিকটা গাছপালার আড়ালে পড়ে গেছে। গির্জার চত্বরের একদিকটায় প্রকাণ্ড সব লাইমকংক্রিটের চাবড়া জড় করা আছে। আর্মেনিয়ানদের এই পুরনো গির্জার বুকে প্রচুর ফাটল। চূড়ার নিচেও ফাটল ধরেছে। ভেতরে ঢোকা

বারন। পেছনদিকটায় একজন কেয়ারটেকার থাকে, দরমাবতার ঘরে। ঘরের টালির চাল ফুঁড়ে চাপ-চাপ ধোঁয়া উঠছে। সেদিক থেকে একদঙ্গল যুবকযুবতী হুলছুল খলখল করে বেরিয়ে এল ফোয়ারার মত। তারপর আমাদের দেখতে দেখতে আওয়াজ দিতে দিতে চলে গেল। হয়ত বাইরে থেকে এসেছিল গির্জা দেখতে। গির্জা দেখার হিড়িকটা থাকে ডিসেম্বরে বড়দিন থেকে। ক্রমশ লোক কমতে থাকে। ধসেপড়া একটা গির্জায় সত্যি আর এখন দেখার কিছু নেই। একসময় ছিল, যখন ভেতরে ঢোকা যেত। এখন বাইরে থেকে দেখে মনে হয়ত দাগ কাটে না।

নীলাঞ্জনার সামনে মাটিতে ঘাসের ওপর বসে পড়লাম। তারপর ওর শাড়ির নিচেটা ছুঁতেই নীলাঞ্জনা চমকে লাল হয়ে চারদিক দেখতে দেখতে বলল, এই! সত্যি কি তাই বলেছি?

ব্যস্ত হবেন না। এ আমার কাজ।

দারুণ একটা অ্যাডভেঞ্চার হল, তাই না?

হুঁ, হল। অন্তত আমার দিক থেকে।

জয়বাবু, একটা কথা বলব আপনাকে? নীলাঞ্জনা চাপা গলায় বলল। ভদ্রমহিলার সঙ্গে একবার আলাপ করতে চাই। পারবেন করিয়ে দিতে? না—মানে, মেজাজ-টেজাজ কেমন বা আলাপ করতে চাইবেন কি না, সে-কথাই জানতে চাইছি।

একটু ভেবে বললাম, মউ আলাপি মেয়ে। ভীষণ ভদ্র। শান্ত।

মউ? ডাকনাম তো?

হ্যাঁ—মহুয়া। মহুয়ার নেশা! নীলাঞ্জনা আস্তে বলল, ঘাটশিলার দিকে আমার দিদি জামাইবাবু থাকেন। জানেন একবার কী কীর্তি করেছিলাম? জামাইবাবু আমাকে মহুয়া খাইয়ে দিয়েছিলেন। তারপর না আমি তো—

খুব মাতলামি করেছিলেন বুঝি?

একদঙ্গল গরু নিয়ে ঢুকে পড়ল একটা তাগড়াই লোক। গরুগুলো আমাদের কাছাকাছি এলে নীলাঞ্জনা উঠে দাঁড়াল। ...এ কী! এখানে গরু ঢুকতে দেয়? ভ্যাট! চলুন—সব নষ্ট করে দিল মনমেজাজ।

কবরখানার পাশ দিয়ে যাবার সময় মনে পড়ল, শচীন বলেছিল কথা আছে। কী কথা থাকতে পারে, হয়ত জানি। কিন্তু ওর কথা শুনতে আর আমি রাজি নই। ওকে দেখার পর সব আতঙ্ক ঘুচে গেছে। গাছপালার ফাঁক দিয়ে দেখলাম, শচীন পিলারের সামনে কবরটার ওপর চিত হয়ে শুয়ে পড়েছে। নেশা বেশি হয়ে গেছে ওর। এখন আর গিয়ে লাভও নেই।

কিছুক্ষণ পরে নীলাঞ্জনা আবিষ্কার করল, গির্জায় আসার ভাল রাস্তা আছে এবং তাকে কবরখানা ঘুরিয়ে এনেছি অকারণে। সে আমার পিঠে আলতো থাপ্পড় মেরে বলল, কী ধুরন্ধর ছেলে আপনি! এই তো দিব্যি সুন্দর রাস্তা আছে। খামোকা কবর-টবরের ভেতর দিয়ে অতখানি ঘোরালেন। কাপড়টার বারোটা বাজল। বাড়িতে ওঁরা ভাববেন কী বলুন তো?

হয়ত আমার কোনও দুষ্টুবুদ্ধি ছিল মাথায়।

থামুন! আপনার দৌড় টের পেয়েছি।

পেয়ে গেছেন?

হুঁউ। নীলাঞ্জনা হঠাৎ জোরে হাঁটতে শুরু করল। ... সামনের মোড়ে রিকশ ধরতে হবে কিন্তু। এগারোটা বেজে গেছে। আপনার দাদারা এতক্ষণে এসে গেছে হয়ত। ...

শচীনের মুখোমুখি হওয়ার পর থেকে অখিলস্যারের বাড়িটা আবার আমাকে টানছিল। ডুমুরগাছের ঘেঁটুবন ভেঙে বারতিনেক গিয়ে দাঁড়িয়েছি। তক্কেতক্কে থেকেছি, অখিলস্যারকে দেখতে পেলেই দৌড়ে গিয়ে পায়ের ধুলো নেব এবং ক্ষমা চাইব। কেদার ডাকতে আসছে না। অতএব বুড়ো খচে আছে আমার ওপর। কিন্তু একবার একপলকের জন্য কেদারকেই শুধু দেখেছি, হন হন করে জঙ্গল ভেঙে কোথায় চলেছে। বাড়িটা একেবারে ঝিম মেরে আছে।

সন্ধ্যার মুখে জলনিকাশী নালার ওপর কাঠের সাঁকোতে একটা নড়াচড়া চোখে পড়ল। তারপর দেখি আবছা আঁধারে যে আসছে, সে মেয়ে। মরিয়া হয়ে একটু কাসলাম। অমনি মউয়ের গলা ভেসে এল, কেদারদা?

না-আমি।

মউ ফোঁস করে বলল, জয়দা?

হ্যাঁ, মউ।

অন্ধকারে ভূতের মত দাঁড়িয়ে কেন? বাবা তোমাকে খুঁজছিলেন।

মাস্টারমশাই কি অসুস্থ, মউ? দুদিন বেরুতে দেখছি না।

মউ অস্পষ্টভাবে কিছু বলল। হয়ত সায় দিল আমার কথায়।

তুমি ওদিকে কোথায় গিয়েছিলে?

মউ চলতে চলতে ঘুরে বলল, কেন?

এমনি জানতে চাইছি ওদিকটায়—

রোজই তো যাই। স্টেশনকোয়ার্টারে যাবার শর্টকাট রাস্তা ওটা।

ও। আমি ভাবি, শচীনের সঙ্গে দেখা করতে যাও।

মউ প্রায় চেঁচিয়ে উঠল। শচীনের সঙ্গে মানে? কী বলতে চাইছ তুমি?

তক্ষুনি নরম গলা করে বললাম, জান মউ? আজ সকালে শচীনের সঙ্গে দেখা হল গির্জার কবরখানায়। মদ খাচ্ছিল। আমাকে বলল, কথা আছে। আমি ওর কথা শুনিনি। আমি তো জানি ও কী বলবে। ও আমাকে শাসাবে, তোমার ছায়া যেন না মাড়াই। কিন্তু আমি শচীনকে ভয় করি না। দেখতেই পাচ্ছ, ভয় করলে তোমাদের বাড়ির দিকে পা বাড়াতাম না। আসলে কী জান মউ? ভূতকে দেখতে পায় না বলেই মানুষ ভয় পায়। ভূতকে সামনাসামনি দেখা হয়ে গেলে আর ভূতের ভয় থাকে না।

মউ চুপচাপ আমার আগে হাঁটছিল। গেটের কাছে গিয়ে বলল, ভূতটা তোমার মাথায় ঢুকে গেছে। মারা পড়বে জয়দা। তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি।

হঠাৎ সাহসে মরিয়া হয়ে ওর কাঁধে হাত রাখলাম। মউ, আমি তোমাকে ভালবাসি।

মউ কাঁধ ছাড়িয়ে গেটের বেড়া সরিয়ে ঢুকে গেল। ওপর থেকে অখিলস্যারের গলা শোনা গেল, কে কথা বলছে মউ? জয়ের গলা মনে হল যেন।

আশ্চর্য কান বুড়োর! অত চাপা স্বরে কথা বলেছি, ঠিক টের পেয়ে গেছে। অন্ধকারে জানলায় মুখ রেখে বসে আছে নিশ্চয়। ঝটপট সাড়া দিলাম, হ্যাঁ স্যার। আমি জয়।

গম্ভীর স্বরে অখিলবন্ধু ডাকলেন, এস।

ওপরের ঘরে এতক্ষণে আলো জ্বলল। অন্ধকার এ বাড়ির লোকেদের হয়ত সয়ে গেছে। কিংবা অন্ধকার ভাল লাগে। সিঁড়িতে ওঠার মুখে অখিলস্যার আবার বললেন, ওকে আলো দেখাও মউ। আছাড় খাবে।

আলো আনার আগেই দরজায় পৌঁছে বললাম, আপনি অসুস্থ নাকি স্যার? মউয়ের কাছে শুনলাম।

ভেতরে এস। মউ, চায়ের জন্যে কখন থেকে ছটফট করছি। কেদারকে ডেকে ডেকে সাড়া পেলাম না। হতভাগা রোজ এসময় কোথায় বেরোয় বলত? নেশা করতে শিখেছে নাকি বুড়োবয়সে?

মউ বেরিয়ে গেল চুপচাপ। হেরিকেনের আলোয় ওর পরনে দেখলাম নতুন একটা শাড়ি আর নীলচে কার্ডিগান। কপালে সূক্ষ্ম টিপ। মুখে আজ এত লাবণ্য ঝলমল করার কারণ কী?

অখিলস্যার আমাকে দেখছিলেন। বললেন, এস, জয়! আমার পাশে বস।

বিছানায় পা ঝুলিয়ে বসে বললাম, ক্ষমা চাইতে এসেছি, স্যার।

অখিলবন্ধু হাসলেন ...। পাগল ছেলে! দোষটা তো আমারই। আমি তোমাকে লাঠি ছুড়ে মারলাম। পরে খুব পস্তানি হল। মাথাটাথা ফেটে গেল নাকি?

আমার লাগেনি স্যার। লাগলেই বা কী হত? আপনার তো মারবার অধিকার আছে।

অখিলস্যার আমার কাঁধে একটা হাত রেখে বললেন, কাল থেকে শরীরটা ভাল না। একটু জ্বরজ্বালা

হয়েছে। মনটাও ভাল নেই। আজ তোমার কথা বারবার মনে হচ্ছিল। কেদারকে পাঠাব ভাবছিলাম। যাক গে, তুমি নিজেই এসে পড়েছ। আসবে, আমি জানতাম।

অখিলস্যার গলা নামিয়ে বললেন, তুমি সেদিন শচীনের কথা বলছিলে! কিন্তু এমনভাবে বললে—আচমকা পেছন থেকে ধাক্কা দেওয়ার মত। সেজন্যই একটু রাগ হয়েছিল। যাক গে, ভুলে যাও ওসব কথা।

আজ সকালে শচীনের সঙ্গে গির্জার কবরখানায় দেখা হল।

বল কী! ওখানে ও কী করছিল?

মদ খাচ্ছিল।

অখিলবন্ধু আমার চেয়েও মুখ তেতো করে বললেন, আমি ওকে মানুষ করবার চেষ্টা করেছিলাম। পারি নি। কিছুদিন আগেও একবার শেষ চেষ্টা করেছিলাম। ব্যর্থ হয়েছি। ও সবকিছুর বাইরে চলে গেছে। আর কারুর কিছু করার নেই। নাগু মিত্তির এভাবে যে কত ভাল ভাল ছেলের সর্বনাশ করেছে, তুমি জান না জয়। এ শহরের ভাল-ভাল ছেলে রিক্রুট করাই নাগুর কাজ। চাকরির লোভ দেখিয়ে টাকাপয়সা দিয়ে নানা ছলচাতুরি করে সে ওদের ফাঁদে ফেলেছে। এখনও ফেলছে। একমাত্র দেখছি, তোমার ওপর ওর চোখ পড়েনি। খুব বেঁচে গেছ, জয়!

শচীনের কথা বলুন, স্যার।

বলি। বলব বলেই তোমাকে খুঁজছিলাম। তুমি সেদিন বললে শচীনের সঙ্গে তোমাকে লড়িয়ে দিচ্ছি। কী ভেবে বললে, কেন বললে, আমার মাথায় আসছে না সেই থেকে। তবে—

স্যার, ওসব কথা ভুলে যেতে বলছিলেন!

অখিলবন্ধু বালিশে হেলান দিয়ে পা দুটো সোজা করে দিলেন। লেপটা টেনে কোমর অবধি ঢেকে বললেন, একটু দাঁড়াও। মউ আসুক। চা খেতে খেতে বলব। শচীনের হিসট্রি। সে হিসট্রি আমারও, জয়—আমারও! একটু অপেক্ষা কর।

উনি চোখ বন্ধ করে মুখ উঁচু করে তুলে দাড়ি টানতে থাকলেন। আজ হাবভাব এবং গলার স্বরে বুঝতে পারছিলাম, স্যারের মধ্যে বেশ একটা রদবদল ঘটে গেছে। কোথাও কিছু ওলটপালট একটা গুরুতর ধাক্কা। কিংবা খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসছেন। চোখে আর সেই সতত চক্রীসুলভ ঝিলিক নেই। তাতিয়ে দেবার মেজাজ নেই।

মউ চায়ের গেলাস নিয়ে এলে বললেন, বোস। কথা আছে।

মউ আমার গেলাসটা পাশের টেবিলে রেখে গলার ভেতর শুধু বলল, চা।

আমি বললাম, তুমি খাবে না?

না। বলে সে খানিকটা তফাতে চেয়ার টেনে বসল।

অখিলবন্ধু এক ঢোক চা সশব্দে টেনে একটু করুণ হাসলেন। ... জয় আজ শচীনকে গির্জার কবরখানায় বসে মদ খেতে দেখেছে। তাহলে তোর কথাটাই প্রমাণিত হল। বুঝলে জয়? কদিন আগে মউ বলছিল, গির্জার ওখানে শচীন লুকিয়ে আছে, আমি বিশ্বাস করি নি।

মউ আস্তে বলল, আমি নিজে দেখিনি। একজনের কাছে শুনেছিলাম।

একই কথা। অখিলস্যার বললেন। আমি বেশ বুঝতে পারছি এবার ও ধরা পড়বে।

কেন স্যার? নাগু মিত্তির ওকে প্রোটেকশান দিচ্ছেন। ওকে পুলিশ ধরবে কেন?

অখিলবন্ধু মাথা দুলিয়ে বললেন, নাগুর অবস্থা শোচনীয়। সামনের ইলেকশানে আর ওকে কেউ একটাও ভোট দেবে ভাবছ? ওর বিরুদ্ধে লোকের প্রচণ্ড অভিযোগ বরাবর ছিল। এখন তো ডিনামাইটের ওপর বসে আছে নাগু। এখন ওর হয়েছে চাচা আপন প্রাণ বাঁচা, এই অবস্থা। শচীনকে আর প্রোটেকশান দিচ্ছে না। সেজন্যই তো শচীন কিছুদিন ধরে নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে বেড়াচ্ছে। আগে নাগুমিত্তিরের বাড়িতেই লুকিয়ে থাকত। নাগু কোথাও বেরুলে সঙ্গে বডিগার্ড হয়ে যেত। কল্পনা কর, যার নামে অসংখ্য সাংঘাতিক সাংঘাতিক কেস ঝুলছে, সে প্রকাশ্যে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

নাগুবাবু আর আশ্রয় দিচ্ছেন না শচীনকে?

না। পাবলিক ফুঁসছে যে! লোকাল কাগজে তুলোধোনা করছে এসব নিয়ে। পড় না কিছু?

না তো।

অখিলস্যার সুড়ুৎ করে চা টেনে বললেন, মাঝে মাঝে পড়া উচিত।

শচীন নাকি আপনার এখানে লুকিয়ে থাকত?

অখিলবন্ধু চোখ বড় বড় করে তাকালেন। ... থাকত। কে বলল তোমাকে?

মুরলী, স্যার—রুটিওলা মুরলী।

গম্ভীর মুখে অখিলস্যার বললেন, হ্যাঁ—শচীন আমাকে বড্ড সমস্যায় ফেলেছিল। হঠাৎ যখনতখন এসে যেত। মউকে খেতে চাইত। কেদার এসব পছন্দ করত না। তুমি তো জান, কেদার গোঁয়ারগোবিন্দ লোক। কেদারের শাসানিতেই শচীন যাতায়াত বন্ধ করেছে।

মুখটা সাদা কাগজের মত বিশুদ্ধ করে মউকে বললাম, গত কালীপুজোর রাতে ব্যারাকের মাঠে শচীনের সঙ্গে তোমাকে যেতে দেখেছে লোকে।

অখিলস্যার নড়ে উঠলেন। মেয়ের দিকে প্যাটপ্যাট করে তাকিয়ে রইলেন। মউ আমাকে অবাক করে হাসল একটু। বলল, হ্যাঁ। খোকাদা আমাকে বাড়ি পৌঁছে দিতে আসছিল। রাজবাড়িতে পুজো দেখতে গিয়ে অত রাতে একা বাড়ি ফিরতে ভয় করছিল। হঠাৎ রাস্তায় খোকাদার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

বাগে পেয়ে আমি নেচে উঠলাম। আরও আছে, মউ। বলে অখিলস্যারের দিকে তাকালাম। ওঁর চোখদুটো দেখে একটু ভড়কে গিয়ে বললাম, থাক। বলব না।

মউ শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বলল, ন্যাকামির প্রয়োজন নেই। বলে ফেল জয়দা!

অখিলস্যার বললেন, বল, বল। মুখোমুখি মীমাংসা হয়ে যাক।

রেলইয়ার্ডের কাছে ঘনশ্যামবাবুর ছেলে পারুকে শচীন যখন মার্ডার করে, তখন মউ সেখানে ছিল।

কথাটা বলে দুজনের মুখ দেখে নিলাম। আমার ভেতর তখন কচ্ছপের নাচ চলেছে। খোল থেকে বেরিয়ে পড়েছি। এরপর যদি অখিলস্যার সেদিনকার মত লাঠি ছোঁড়েন, পালিয়ে যাব না। আমি তৈরি হয়েই এ বাড়ি এসেছি আজ।

কিন্তু অখিলস্যার নেতিয়ে গেলেন। দেয়ালের গায়ে প্রায় একটা মরা টিকটিকির মত সেঁটে রইলেন। মউয়ের নাসারন্ধ্র ফুলে উঠেছিল। তারপর সে আগের মতই একটু হাসল। জয়দা আমার পেছনে গোয়েন্দাগিরি করে বেড়িয়েছে এতকাল, জানা ছিল না।

দ্রুত বললাম, আমি কিছু দেখিনি। মুরলী দেখেছিল।

মউ মুখে হাসি রেখেই বলল, কিছুক্ষণ আগে তুমি বলছিলে, ওদিকে কোথায় গিয়েছিলাম। আমি বললাম, স্টেশন কোয়ার্টারে। গোয়েন্দাগিরি যখন কর, তখন আরও ভালভাবেই কর।

অখিলস্যার গলার ভেতর বললেন, স্টেশন কোয়ার্টারে ওর মাসতুতো বোন থাকে। ওর জামাইবাবু অ্যাসিস্ট্যান্ট স্টেশন মাস্টার হয়ে প্রায় বছরখানেক এখানে আছে। পরেশকে তুমি দেখেছ, পরিচয় নেই হয়ত।

মউ বলল, তোমার মুরলী রুটিওলা ঠিক যেভাবে ব্যাপারটা দেখেছিল, আমিও সেইভাবে দেখেছিলাম। মুরলীকে যদি আমিই ওখানে দেখতে পেতাম, আমিও তাকে এরসঙ্গে জড়াতাম। কিছু মিথ্যে কথাও জুড়ে দিতাম তার সঙ্গে।

অখিলস্যার বললেন, মউ ভয় পেয়ে পালিয়ে এসে আমাকে সব বলেছিল।

মউ একইভাবে হাসি ঠোঁটে রেখে বলল, জামাইবাবু সিগন্যালপোস্ট অবধি এগিয়ে দিতে এসেছিলেন। আরও খানিকটা এলে উনিও দেখতে পেতেন সব। আমি ওঁকে বলেছিলুম, আর আসতে হবে না। যেতে পারব এ পথটুকু।

মুখ নামিয়ে ঘাড় গোঁজ করে বসে আছি। পুঁটু! তাহলে হাওয়ার সঙ্গে লড়ে যাচ্ছিলি বাবা? তুই সত্যি একটা রামছাগল। পুঁটু তার ছাগলদাড়ি নেড়ে বলল, তাহলে শচীন তোর সঙ্গে কথা আছে বলল কেন?

অখিলবন্ধু সোজা হয়ে পা গুটিয়ে বসলেন। চায়ের গেলাস হাত বাড়িয়ে টেবিলে রেখে বললেন, শচীনের হিসট্রিটা এবার বলি। মউ, তুই শোন।

মউ উঠে দাঁড়াল। ... তোমার হিসট্রি শুনলে রুটি বেলা হবে না।

কেদার এসে করবে। তুই বস।

কেদারদার ফিরতে রাত দশটা, দেখে নিও। ... বলে মউ চলে গেল। অখিলস্যার একটু হাসলেন। ... যাক গে। তুমিই শোন, জয়। শচীন ঠিক তোমার মত আমার এক প্রিয় ছাত্র ছিল। তোমার বোধকরি সিনিয়ার ছিল?

হ্যাঁ, স্যার! একবছরের সিনিয়ার।

খুব গরিবঘরের ছেলে, জান তো? অখিলবন্ধু দুঃখিত মুখে বললেন। ওকে আমি সাহায্য করতাম। এমনকি কলেজেও ওকে ভর্তি করান থেকে শুরু করে মাসে-মাসে মাইনে, বইপত্র—সবেতেই যথাসাধ্য সাহায্য করতাম। কিন্তু নাগুমিত্তিরের চেলাদের পাল্লায় পড়ে ওর বুদ্ধিসুদ্ধি ঘুলিয়ে গিয়েছিল। শেষপর্যন্ত কলেজ ছেড়ে দিল। নাগুর জিপে ঘুরতে লাগল বডিগার্ড হয়ে। আমাকে দেখলে আর চিনতে পারত না। একদিন স্কুলের একটা ফাংশনে নাগু এল প্রধান অতিথি হয়ে। সোজাসুজি ওকে চার্জ করলাম। কেন ভাল-ভাল ছেলেদের এভাবে সর্বনাশ করছ ভাই নাগু? নাগু আমাকে যাচ্ছেতাই অপমান করল। কেউ আমার পক্ষে একটা কথাও বলল না। এমন কী শচীন এসে আমাকে টানতে টানতে বাইরে নিয়ে গিয়ে বলল, বাড়ি চলে যান স্যার! কেন ফালতু ঝামেলা করছেন? আপনি বুড়ো হয়েছেন। স্ট্রোক হয়ে যাবে!

অখিলবন্ধু ফোঁস করে শ্বাস ছাড়লেন। একটু চুপ করে থাকার পর বললেন, সেই শচীন মাসদুয়েক আগে এমনি এক সন্ধ্যাবেলায় এসে বলে কী, রাতে থাকব স্যার। ওর মুখ দেখে আর ঘৃণা করতে পারলাম না। সে-রাতে অনেক কথা হল। বুঝলাম, শচীনের অনুতাপ হয়েছে। ওকে বললাম, সারেন্ডার কর কোর্টে গিয়ে। প্রণবেন্দু মোক্তারকে বলে দিচ্ছি। শচীন বলল কী, তার আগে নাগুর গলা কেটে প্রমাণ করবে যে সে সত্যিই গলাকাটা শচীন। কী সাংঘাতিক কথা! শুনে আমার খুব ভয় করতে লাগল। সত্যি বলতে কী, ভয়েই ওকে আশ্রয় দিতাম। ওর মধ্যে তো আর মানুষের কিছু অবশিষ্ট নেই। নাগুমিত্তিররা ওর ব্রেনওয়াশ করে দিয়েছিল। তারপর যতটুকু মনুষ্যত্ব ছিল, ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে নষ্ট হয়ে গেছে। আমাকে ও জামা খুলে দেখিয়েছিল, দেহের সর্বত্র ক্ষতচিহ্ন। জয়, তুমি ওর দেহটা দেখলে শিউরে উঠতে। শেষে ও বলে কী, স্যার! মার খেতে না জানলে মার দেওয়া যায় না। ছুরির খোঁচা খেতে খেতে শিখে গেছি কী করে ছুরি চালাতে হয়।

অখিলবন্ধু চোখ বুজে কী ভাবতে থাকলেন। মুখে নানারকম চিহ্ন ফুটে উঠছিল। ডাকলাম, স্যার!

চোখ না খুলেই বললেন, একটা দৃশ্য দেখছি, বুঝলে? কুয়াশা নেই। ঝকঝকে রোদ ফুটেছে। ঘাসের ওপর চিত হয়ে শুয়ে আছে নাগু মিত্তির। শ্বাসনালী ফাঁক। চাপচাপ রক্ত, চাপচাপ।

অখিলস্যারের মুখটা ক্রমশ পৈশাচিক হয়ে উঠছিল। ডাকলাম, স্যার! স্যার!

চোখ খুলে একটু হাসলেন। ... শচীন বলেছিল, গলাকাটা ব্যাপারটা ওর সিগনেচার—দস্তখত।

বাপ্‌সস্! ওর দস্তখতের ভয়ে চব্বিশটে ঘণ্টা যা কাটিয়েছি, বলার নয়।

অখিলবন্ধু সিরিয়াস হয়ে বললেন, তুমি কেন ওকে ভয় করবে? আমিই বা কেন ভয় করব? ভয় করে তো ওই কেদার করবে। কেদার ওকে ধরিয়ে দেবে বলে শাসিয়েছে। এই যে এখনও কেদার ফিরছে না—রাতে যদি আর না ফেরে। ঠিক জেন, কাল সকালে কোথাও ও চিত হয়ে পড়ে থাকবে রক্ত মেখে।

এবং গলায় দস্তখত!

হ্যাঁ, গলায় দস্তখত। অখিলবন্ধু ক্রুদ্ধস্বরে বললেন।

একটু উসখুস করে বললাম, মউ নিচে একা আছে। কেদারের এতক্ষণ ফেরা উচিত ছিল। আমি বরং নিচে গিয়ে—

কথা কেড়ে অখিলস্যার বললেন, যাও, যাও। গিয়ে গল্পসপ্প কর। আমার এতক্ষণ খেয়াল হয়নি। আর শোন, মউকে গিয়ে বল, আর এক গেলাস চা খেতে ইচ্ছে করছে। আদা ছেঁচে কয়েকফোঁটা রস যেন দেয়। ... আহা, গেলাসদুটো নিয়ে যাও না!

নিচের দুটো ঘরের একটায় রান্নাঘর, অন্যটায় থাকে কেদার। কেদারের ঘরের লাগোয়া এবং বারান্দার একটা দিক ঘিরে টালিচাপান একটুকরো গোয়ালঘর। রান্নাঘরে হেরিকেন জ্বলছে। মেঝেয় বসে রুটি বেলছে মউ এবং একইসঙ্গে সেঁকে নিচ্ছে। কেরোসিনকুকারের ওপর কালো তাওয়া চাপান।

খুব কাজের ভঙ্গিতে ঢুকেই বললাম, স্যার চা খাবেন আরেক গ্লাস। আদার রস দিয়ে।

মউ তাকাল। মুখের আধখানায় হেরিকেনের হলদে আলো। বড় রহস্য ওই মুখে। ঠোঁট কামড়ে ধরেই ছেড়ে দিল। নিঃশ্বাসে মিশিয়ে বলল, করে দিচ্ছি বল গে!

আমিই নিয়ে যাব বরং! বলে চটাওঠা খরখরে মেঝেয় বসে পড়লাম।

মউ বলল, কালি লাগবে কাপড়ে। মেঝেয় কালি আছে।

লাগুক না। তোমারও তো লাগছে।

তুমি এত—

সে হঠাৎ থেমে গিয়ে রুটি ওল্টাতে থাকল। বললাম, আমি কী মউ?

নির্লজ্জ।

ভালবাসা মানুষকে নির্লজ্জ করে, জান না?

মউ খুন্তি দেখিয়ে বলল, এটা কিন্তু তেতে আছে ভীষণ।

হাত বাড়িয়ে বললাম, ছ্যাঁকা দেবে তো? দাও। স্যার বলছিলেন শচীন গলায় নাকি দস্তখত করে। তুমি যদি এভাবে দস্তখত করতে চাও, আপত্তি নেই। মনে করব ভালবাসার দস্তখত।

মউ সত্যিসত্যি গরম খুন্তিটা আমার হাতে চেপে ধরল। হাতের তালু পুড়ে যাচ্ছিল। প্রাণপণে সহ্য করতে করতে বললাম, বড় আরাম পাচ্ছি, মউ। তুলে নিও না। তোমার কাছ থেকে ভালবাসার প্রথম উপহার।

মউ অবাক হয়ে খুন্তিটা তুলে নিল। তারপর বলল, কৈ, দেখি হাতটা!

হাতের তালুর খানিকটা জায়গা টকটকে লাল হয়ে গেছে। ভীষণ জ্বালা করছিল। মউ হেরিকেনটা টেনে সেটা দেখে নিল। বললাম, কেমন দেখলে? দারুণ না?

সে পেছনে ঘুরে কাঠের ছোট্ট র‍্যাক থেকে একটা হলদে মলমের টিউব নিয়ে আমার সামনে ফেলে দিল। তারপর কুকার থেকে তাওয়া নামিয়ে কেটলি চাপাল। বলল, মলমটা লাগিয়ে নাও!

তুমিই জ্বালিয়ে দিয়েছ। ইচ্ছা হলে তুমিই নিভিয়ে দাও, মউ!

মউ ভুরু কুঁচকে বাঁকা হেসে বলল, তুমি তো কখনও এমন ন্যাকা ছিলে না জয়দা! তোমাকে সেই ছোটবেলা থেকে দেখে আসছি। আমার বড্ড অবাক লাগছে, সত্যি! তোমার হঠাৎ এ পাগলামি কেন?

ভালবাসা ঘুমিয়ে ছিল। জেগে উঠে হুলুস্থুলুস বাধিয়েছে।

সে খুন্তি তুলে বলল, আবার?

দাদার শ্যালকের বউ এসেছে কলকাতা থেকে। তাকে আজ সকালে গির্জা দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলাম। তোমার ব্যাপারটা বললাম তাকে। শুনে কী বলল জান? বলল, তাহলে আপনি পাগলের মত ভালবাসেন ভদ্রমহিলাকে। পাগলের মত—কী আশ্চর্য উপমা বল, মউ! কলকাতার মেয়েরা সত্যি অনেক কিছু জানে।

কলকাতার মেয়েরা পাগলকে ভালবাসে বুঝি?

বাসে। সেজন্যই তো জানে পাগলের মত ভালবাসা কাকে বলে!

আমি যে মফস্বলের মেয়ে।

আমিও মফস্বলের ছেলে। আমরাও চেষ্টা করে দেখলে ক্ষতি কী, বল?

চেষ্টা তো করছ। কী বুঝছ?

কিছু বুঝতে পারছি না।

মউ পেছনে ঘুরে কাঠের র‍্যাক থেকে একটুকরো আদা নিল। তারপর শিলে ছেঁচে কেটলির জলে ফেলে দিল। দিয়ে বলল, মলমটা লাগিয়ে নাও। সেপটিক হয়ে গেলে পরে হাতটা কেটে ফেলতে হবে কিন্তু!

জানব, ভালবাসা আমার হাত খেয়ে ফেলেছে!

মউ ধমক দিয়ে বলল, আর! কী হচ্ছে? মলমটা লাগিয়ে নাও, বলছি!

তুমিই জ্বালিয়ে দিয়েছ, তুমিই নেভাও।

মউ রাগতে গিয়ে হেসে ফেলল। ... তুমি বরাবরই অদ্ভুত প্রকৃতির জানি। কিন্তু এমন বদ্ধ পাগল তা জানতাম না। কৈ, হাত দেখি।

হাত বাড়ালে সে টিউবের ছিপি খুলে টিউবটা ঘষে দিল। কিন্তু নিজের হাত দিয়ে ছুঁল না আমাকে। হলুদ মলম দাগড়া হয়ে লেগে রইল। হাসতে হাসতে ফের বলল, বাবা দেখলে কী বলবে ভাবছ? আসল ব্যাপারটা তো বলতে পারবে না। বল, নিজের হাতে চা করতে গিয়ে অ্যাকসিডেন্ট!

কেটলির নল দিয়ে শোঁ শোঁ করে ভাব বেরুচ্ছিল। চায়ের পাতা দিয়ে কেটলি নামিয়ে আবার তাওয়াটা চাপাল। সারাক্ষণ ওর মুখের দিকে আমার চোখ। এতক্ষণে যেন সেটা টের পেয়ে একটু আড়ষ্ট হয়ে বলল, রুটি খাবে জয়দা?

রুটির মিঠে গন্ধ অনেক আগেই নাকে ঢুকেছে। খুশি হয়ে বললাম, খাব। খাওয়ার ব্যাপারেও আমি পাগল। অর্থাৎ পাগলের মত খাই। কাল রাতে সুলেখাদির কাছে—ওঃ! সে এক অসম্ভব খাওয়া, বুঝলে মউ? বড়লোকের বাড়ির ডিনার। তার ওপর সুলেখাদির ব্যাপার তো জানই।

জানি না। ... বলে মউ একটা থালায় দুটো রুটি আর একটু কী যেন ঘ্যাঁট তুলে দিল।

রুটি এমন সুস্বাদু হয়! চিবিয়ে অবাক হয়ে গেলাম। বউদির রুটি আর এই রুটি! পৃথিবীতে কত ভাল-ভাল রুটি করতেপারা মেয়ে আছে। অথচ আমি কী অখাদ্য রুটি খেয়ে এতকাল কাটাচ্ছি!

মউ গেলাসদুটো ধুয়ে চা ছাঁকল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বলল, তুমি খাও। আমি বাবাকে চা-টা দিয়ে আসি।

সে ধুপ ধুপ শব্দ করে দৌড়ে বেরিয়ে গেল এবং একমিনিটের মধ্যে ফিরে এসে তাওয়ায় চাপান রুটিটা উল্টে দিল। বললাম, অপূর্ব তোমার হাতের রুটি, মউ! ধন্য হয়ে গেলাম।

মউ হাসল। কিন্তু কিছু বলল না। সে তার কাজে মন দিল। দেখলাম, সে আরও খানিকটা আটা বের করে জল দিয়ে মাখতে ব্যস্ত হয়েছে। আমার খাওয়ার জন্য ভাগে কম পড়ে যাবে। তা যাক। আমাকে আরও রুটির নেশায় পেয়ে গেছে। পাতখালি দেখে সে বলল, চা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। চা খেয়ে নাও। তারপর আবার খাবে।

আবার?

তুমি তো কখনও খাওনি তোমার স্যারের বাড়ি। আজ খাও। খেয়ে দেখ তোমার স্যার কত গরিব।

আমিও প্রচণ্ড গরিব, মউ। চাকরি-বাকরি নেই। নিজের বাড়িটাও পরের বাড়ির মত।

জানি।

বাইরে পড়ন্ত ঋতুর শীত অন্ধকারে ঠাণ্ডাহিম থাবা চাটছে। গাছপালা আর পোড়ামাটি জুড়ে কুয়াশা ঘন হচ্ছে ক্রমশ। কোথাও কোনও শব্দ নেই। শুধু কুকারের দপ দপ শব্দ, আর ওপরের ঘরে অখিলস্যারের কাসির শব্দ মাঝেমাঝে। মউ কী ভেবে—হয়ত ঠাণ্ডা ঢুকছে বলেই হঠাৎ উঠে দরজাটা ভেজিয়ে দিল। তারপর দুলে-দুলে রুটি বেলতে বেলতে বলল, কালরাতে মিসেস মিত্রের কাছে নেমন্তন্ন খেলে তাহলে?

হ্যাঁ। তারপর যথারীতি লাথিও খেলাম।

লাথি মানে?

সুলেখাদির সঙ্গে তোমার আলাপ নেই?

খুব সামান্য। একসময় ওঁর সমিতিতে যেতাম-টেতাম। খুব বদমেজাজি মহিলা। খামখেয়ালি।

তাহলেই বুঝতে পারছ লাথি মানে কী।

চায়ে আদার গন্ধ পাচ্ছ?

ভীষণ।

মউ আনমনা হয়ে বলল, গন্ধ না হলে বাবা সে-বেলা আর কথাই বলবেন না।

তুমি তো বাবাকে গ্রাহ্যই কর না!

থাম! তোমাকে আর দালালি করতে হবে না।

চায়ের গ্লাস শেষ করে সিগারেট বের করলাম। কুকারের আগুনে ধরিয়ে মউয়ের মুখের দিকে তাকালাম। মুখ নামিয়ে ছন্দে-ছন্দে আনন্দে দুলে রুটি বেলছে সে। মুখের পুরোটায় আলো পড়েছে। হঠাৎ মুখ তুলে বলল, হাতের জ্বালা কমেছে?

জ্বলতে দাও। এ আমার প্রেমজ্বালা।

মউ অবাক চোখে তাকিয়ে বলল, তোমার পাগলামির কোনও তুলনা হয় না, সত্যি!

কী বলছ মউ? প্রেমিকরা পাগল হবে না? আমি ওকে বাগে পেয়ে গেছি ভেবে রাশভারি ভঙ্গিতে বলতে থাকলাম, তুমি জান না কদিন ধরে সারা শহর পাগল হয়ে চক্কর দিচ্ছি। পকেট ভর্তি মরা কোকিল আর প্রজাপতির ঝাঁক। দেখতে চাইলে দেখাতে পারি। বইয়ের ভেতর পোকার মত সেগুলো চেপ্টে গেছে। কারণ আমার ভবিষ্যৎ তুমি তৈরি করে রেখেছ, মউ। আমার ভবিষ্যৎ ঘাসে পিঠ দিয়ে শুয়ে থাকা। শ্বাসনালী ফাঁক। চাপ চাপ রক্ত। মুখে মাছি।

মউ হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। তারপর আস্তে বলল, কেদারদা আসছে!

একটু চমকে উঠলাম। ওর কি জন্তুদের ইন্দ্রিয়? বাইরে কেদারের সাড়া পাওয়া গেল। মউ ভেজান দরজা ফাঁক করে বলল, কোথায় থাকো গো কেদারদা? রুটি বেলতে বেলতে কোমর ধরে গেল।

কেদার ধুপ ধুপ শব্দে বারান্দায় উঠে বলল, একটু ওয়েট করলেই পারতে দিদিভাই! সাহাবাবুদের দোকানে তাস খেলতে খেলতে রাত হয়ে গেল। দাঁড়াও। কাপড় ছেড়ে আসি।

তারপর সে মউয়ের শরীরের ফাঁক দিয়ে আমাকে দেখতে পেয়ে দাঁড়িয়ে গেল। ...জয়দাদাবাবু না?

মউ বলল, হ্যাঁ।

অ। আচ্ছা! বলে সে হলুদ আলোর ওপর পিছলে চলে গেল গহন অন্ধকারে।

মউ ঘুরে দাঁড়িয়ে আমাকে বলল, তুমি বাবার সঙ্গে গপ্প কর গে জয়দা! চলে যেও না যেন।

না, না। খেয়ে যাব। তুমি আমাকে নেমন্তন্ন করেছ।

বেরিয়ে আসার মুখে মউয়ের মুখে যে হাসিটুকু দেখলাম, তা হয়ত করুণার। তা হোক। করুণা করতে করতে যদি করুণার টানে একটু প্রেমও বেরিয়ে আসে। এক জিনিসের টানে অন্য জিনিসও বেরিয়ে আসা খুব স্বাভাবিক নয় কি? অখিলস্যারের চোতাখানা হঠাৎ বুক পকেটের ভেতর স্পষ্ট একটু নড়ে উঠল। দরজার মুখে মউকে ছোঁবার ইচ্ছে জাগিয়ে দিল। কিন্তু মউ যেন টের পেয়েই সরে নিরাপদ দূরত্বে চলে গিয়েছিল।

ওপরে গেলে অখিলবন্ধু মুখে ধূর্ততা ফুটিয়ে ফিসফিস করে বললেন, কিছু কথাবার্তা হল?

হল স্যার! অনেক জরুরি কথাবার্তা হল।

খুব ভাল, খুব ভাল। অখিলস্যার একটু হাসলেন। তারপর আমি বসলে আপনমনে ফের বললেন, পিতা যাকে কন্যাসম্প্রদান করেন, কন্যা তারই।

স্যার, মউ আমাকে ডিনার খেয়ে যেতে বলল।

অখিলস্যার তাকালেন আমার দিকে। তারপর দাড়ি নেড়ে খ্যা খ্যা করে হাসতে হাসতে আবার বললেন, খুব ভাল, খুব ভাল। ...

মুরলীর ঘরে পিসিমার ডাকে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। মুরলী দরজা খুলে দিয়ে মগ হাতে সম্ভবত ল্যাট্রিনের দিকে ছুটে যাচ্ছিল। পিসিমার চোখে ঘরের আঁধার লেপ্টে গেছে। আমি ওঁকে দেখতে পাচ্ছিলাম অবশ্য। মুখ নিচু করে ভুরু কুঁচকে এদিক-ওদিক খুঁজে ডাকছিলেন, পুঁটু! অ পুঁটু! কোথায় তুই?

এ-রাতে মনে সুখশান্তি ছিল ঘুমটাও ভাল হয়েছে। পিসিমার সঙ্গে লুকোচুরি খেলার ইচ্ছেয় চুপ

করে থাকলাম। মুরলীর তক্তাপোসে ধাক্কা খেয়ে পিসিমা দুরছাই বলে ওর দুর্গন্ধ লেপে গুঁতো মারলেন। অ্যাই পুঁটে! বলে তারপর সেই লেপখানা একটানে সরিয়ে দিলেন।

হি হি করে হেসে ফেললাম। মুরলীর লেপ ছুঁয়েছেন টের পেলে পিসিমা এই প্রচণ্ড শীতের ভোরে স্নানের জন্য ধড়ফড় করে বেড়াবেন। খুব শীতকাতুরে মানুষ। স্নানের ভয়ে সাবধানে ছোঁয়া বাঁচিয়ে চলেন পৃথিবীর। গরম জলের জন্য বউদির পায়ে পড়তে বাকি রাখেন। শেষে ন্যাড়ার মাকে সাধাসাধি করতে থাকেন। আজ সেই দিনের পাল্লায় পড়ে গেছেন।

পিসিমা আমার সাড়া পেয়েই ডাইনে ঘুরে চোখদুটোতে আগুন জ্বালার ব্যর্থ চেষ্টা করে বললেন, হাসছিস! লজ্জা করে না হাসতে? কি তুই?

এই তো।

পিসিমা দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বললেন, শুয়ে আছিস নিশ্চিন্তে তা তো দেখতে পাচ্ছি—ওদিকে ...

কথা কেড়ে বললাম, দেখতে পাচ্ছ না, পিসিমা। মিথ্যে বল না।

বাঁদর! ওদিকে কী হচ্ছে জানিস না? পিসিমা ফিসফিসিয়ে উঠলেন। ...তোর চিরদিন এই রে? পৃথিবী ডুবলেও তোর হাঁটুজল? ওঠ, ওঠ। কেলেঙ্কারি হয়েছে।

বুকের ভেতরকার শান্তিটা আইসক্রিমের ডেলার মত গড়িয়ে গেল। উঠে বসলাম ধুড়মুড়িয়ে। ...কী হয়েছে?

পিসিমা তেমনি ফিসফিস করে বললেন, মনু তার বউকে নিয়ে চলে যাচ্ছে। কাল সারাদিন দুজনে ঝগড়া করেছে। সারারাত করেছে। এখন জিনিসপত্র গুছিয়ে চলে যাচ্ছে। ওদিকে বেজাকে কাল থেকে তার পাটরানী ভজিয়ে-ভজিয়ে খেপিয়ে দিয়েছে। বেজা বলছে, আসুক বাড়ি। তারপর ঘাড় ধরে বের না করি তো বাপের ঔরসে আমার জন্ম হয়নি। কী সাংঘাতিক কথা রে পুঁটু! তার ওপর স্বামী-স্ত্রী মিলে তোকে একশ লম্পট ব্যাডক্যারেক্টার এইসব বলছে ছি ছি! দুকানে আঙুল দিতে হয় শুনলে।

পিসিমা ফোঁস ফোঁস করে নাক ঝাড়তে থাকলেন। অবাক হয়ে বললাম, কেন? কী ব্যাপার বল তো?

পিসিমা এতক্ষণে আমাকে দেখতে পেয়েছেন। আমার গালে ঠাণ্ডা কাঠি-কাঠি হাতের গুঁতো মেরে বললেন, জানিস না? আর কতকাল ন্যাকা সেজে থাকবি? বয়সের তো গাছপাথর নেই এদিকে।

মুখ করুণ করে বললাম, সত্যি বুঝতে পারছি না, পিসিমা!

পিসিমা চাপাস্বরে বললেন, কাল মনুর বউকে গির্জা দেখাতে নিয়ে গেলি, তাতে কিছু দোষ ছিল না। কিন্তু ওই কেলেঙ্কারিটা না করলেই পারতিস। কলকাতার মেয়েরা একটু গায়েপড়া হয়, কে জানে না? ওদের লাজলজ্জাটা একটু কম থাকে। তাতে নাকি চাকরিকরা মেয়ে। মেম সেজে ঠোঁটে রঙ মেখে ম্যাক্সি পরে ঘোরে। তোর একটু সাবধান হওয়া উচিত ছিল।

কাঁদো-কাঁদো স্বরে বললাম, হুঁ, ছিল। মানে, সাবধান ছিলামও। কিন্তু কেলেঙ্কারি তো হয়নি কিছু। হতে পারত বটে, হতে দিই নি।

পিসিমা তেড়ে এলেন। ...বাঁদর! ন্যাড়ার মা মেথরপাড়ায় মেথর ডাকতে গিয়েছিল। দেখে এসে লাগিয়ে ভাঙিয়ে বেজার পাটরানীকে বলেছে। তাও যদি আড়ালে বলত, কথা ছিল। বেয়ানের সামনে বলেই যত ঝামেলা। বেয়ান ভদ্রমহিলা রুগি মানুষ হলে কী হবে? একেবারে শূর্পনখা।

কী দেখেছিল বলেছে ন্যাড়ার মা?

পিসিমা নির্বিকার মুখে বললেন, তুই মনুর বউয়ের পা ধরে টানাটানি করছিলি।

সে তো চোরকাঁটা ছাড়িয়ে দিচ্ছিলাম শাড়ি থেকে।

পিসিমা থাপ্পড় তুলে বললেন, মারব,—মারব তোকে। মনুর বউ ফিরে আসার পর আমি স্বচক্ষে দেখেছি চুল খুলে বাথরুমে যাচ্ছে, চুল থেকে শুকনো পাতা পড়ল।

চুল থেকে শুকনো পাতা পড়েছে তো কী হয়েছে? গাছ থেকে পড়েছে মাথায়।

পিসিমা ভেংচি কাটলেন। ওসব কথা অন্য কাউকে বোঝাস। চোরকাঁটা, তারপর শুকনো পাতা! বলে ঢ্যাঙস ঢ্যাঙস করে বকের মত পা ফেলে মুরলীর ঘর থেকে বেরিয়ে কুয়াশায় মিশে গেলেন।

বুঝতে পারলাম, একটা রিয়্যালিটির ঝাঁপি খুলে দিয়েই আর তিষ্ঠোতে পারলেন না। পিঠ টান

দিলেন। হাজার হলেও গুরুজন। ঘটনার গুরুত্ব বা কাঠিন্য টের পাইয়ে দেবার জন্যই এতটা করতে পেরেছেন। পেরে নিজেই রিয়্যালিটির ধাক্কা খেয়ে লজ্জায় পড়ে গেছেন। কবিগুরু সেজন্যই কি বলেছেন, 'সত্য যে কঠিন'? কিন্তু কঠিনকে সবাই তো ভালবাসতে পারে না।

মুরলী এসে বলল, পিসিমা চলে গেল নাকি পুঁটু? বিস্কুটগুঁড়ো চেয়ে রেখেছেন। দিতাম খানিকটা।

বললাম, আচ্ছা মুরলী, মেয়েদের চুল থেকে শুকনো পাতা খসে পড়লে কী জানা যায়?

মুরলী অবাক হয়ে বলল, চুল থেকে শুকনো পাতা?

হ্যাঁ। মাত্র একটা শুকনো পাতা।

মুরলী এবার ফিক করে হাসল। ...সামনের চুল থেকে, না পেছনের চুল থেকে?

তা জানি না।

সামনে থেকে পড়লে জানবে পথ চেয়ে গাছতলায় দাঁড়িয়ে ছিল। আর পেছন থেকে পড়লে খি খি ...

আর মুরলী, সেই সঙ্গে শাড়িতে চোরকাঁটাও যদি থাকে?

তাহলে তো হয়েই গেল। মুরলী হাসিমুখে বেজায় হাসতে লাগল।

কী হয়ে গেল মুরলী?

মুরলী বকে দিল এবার। ধুর মশাই! সক্কালবেলা মুখখানা মিছিমিছি নষ্ট করে দিও না। ওঠ, চা-ফা খাও। তারপরে সব শুনব।

উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, তুমি ঠিকই বলেছিলে মুরলী, যৌবন সত্যি ডেঞ্জার জিনিস। ...

কিছুক্ষণ পরে চা খেয়ে বেরুনোর সময় ডান হাতের তালুটা জ্বালা করে উঠল। গ্রাহ্য করছি না বটে, একটু ফোস্কা পড়েছে এবং হলদে মলমের রঙের ফাঁকে লালচে হয়ে আছে চামড়া। তবে এই আমার সত্যিকার প্রেমজ্বালা। ভেতরটা আবেগে সুখে ফুলে উঠল।

গলির রাস্তায় খানিকটা এগিয়ে বাড়ির দিকে চোখ মেলে দেখি, রোয়াকের মাথায় বউদি, বউদির মা আর পিসিমার সারি। দৃষ্টি উল্টোদিকে, যেদিকে বড় রাস্তার মোড়। তার একটাই মানে দাঁড়ায়। মনু তার বউকে নিয়ে সত্যি চলে গেছে স্টেশনে কিংবা এইমাত্র চলে যাচ্ছে, ওঁরা দেখতে পাচ্ছেন বেদনাবিধুর দৃষ্টিতে।

ওই বেদনার্ত দৃষ্টির সামনে গিয়ে পড়াটা এখন ঠিক নয় ভেবে আমি উল্টোদিকে হনহন করে হেঁটে চললাম। এক ভূগোল থেকে অন্য ভূগোলে চলে যাওয়াই এখন নিরাপদ। অখিলস্যার বলেছিলেন, প্রত্যেক মানুষের নিজের একটা করে ভূগোল আছে। বেগতিকে না পড়লে মানুষ কখনও ভূগোল বদলায় না। তবে এও জেন, ভূগোল বদলানো কি এতই সহজ? নতুনের ওপর হাঁটছ, ঘুরছ-ফিরছ, কিন্তু পুরনোটা তোমাকে ছাড়ছে না। নতুনের ওপর পুরনোর ছাপ পড়ে থাকছে। গণ্ডগোল ঘটে যাচ্ছে প্রতি পদে। শেষ পর্যন্ত কেউ-কেউ আর সহ্য করতে পারে না। ফিরে যায় সেই পুরনোতে। সে এক দুর্ভাগ্য। কারণ সভ্যতার ইতিহাস মানেই ভূগোল বদলের ইতিহাস। অতএব চরৈবেতি, চরৈবেতি। এগিয়ে চল।

যা ঘটে ঘটুক আমার ভাগ্যে, আমি আর ফিরব না। আমার নতুন ভূগোলে এখন কুয়াশার ভেতর বসন্তের গাছ। সময়ের ঘণ্টা বাজলেই কুয়াশা সরে সেইসব গাছে ফুল ফুটবে। কোকিলগুলো বেঁচে উঠে কুহু-কুহু ডেকে কানে তালা ধরিয়ে দেবে। হা রে রে করে দক্ষিণপবন বইবে। প্রজাপতিগুলো ফরফরিয়ে ডানা মেলবে। কত কিছু ঘটতে থাকবে। মউ আমার বউ হলে ভূগোল এমনিতেই বদলে যাবে। ততদিন থাক না দাঁড়িয়ে পুরনো ভূগোলের রোয়াকের ওপর বউদি, বউদির মা, পিসিমার, সারিবদ্ধ তিন বেদনাবিধুর ভাস্কর্য!

খ্রিস্টান কবরখানার ভাঙা গেট সরিয়ে ভেতরে গেলাম। খানিকটা এগিয়ে একটা চওড়া কবরের কিনারায় বসে সিগারেট ধরালাম। মারাপড়া সম্ভাবনার জন্য শোক করতে মারাপড়া মানুষদের বাসস্থানযোগ্য জায়গা। বেচারি নীলাঞ্জনা! কাল ওর চুলে শুকনো পাতা আটকে গিয়েছিল। ওকে বুঝি প্রকৃতিই আক্রমণ করেছিল চোরকাঁটার তীরের ঝাঁক বিঁধিয়ে। ফেরার সময় বলেছিল, আপনার দৌড় বোঝা গেছে।

প্রকৃতির ভেতরে গিয়ে মানুষের মধ্যে কী একটা হয়ে যায়। প্রকৃতি টানে। বেঁধায়। ইশারা দিতে থাকে ক্রমাগত। শুকনো পাতা আর চোরকাঁটার শিহরন। ছিনতাইয়ের আতঙ্ক আর দ্বিধা। কেউ ফিসফিস করে সাবধান করে দেয়। স্বাধীনতার স্রোতের সামনে দুদ্দাড় করে পড়তে থাকে প্রচণ্ড পাথর। স্বাধীনতা ফোঁসে।

নীলাঞ্জনার ছায়ামূর্তি কুয়াশা থেকে আবার বলল, আপনার দৌড় বোঝা গেছে।

আপনাকে আমি বলেছিলাম নীলাঞ্জনা, আমি কচ্ছপ ছিলাম পূর্বজন্মে। আমি খুব মৃদুগামী সে কারণে। কিন্তু এও তো ঠিক, কচ্ছপের কামড় বলে একটা কথা আছে। আমি সবে মুখ বের করতে শিখেছি। যখন কামড় দেব, তখন আর সহজে ছাড়ব না। আগামী বসন্তে দেখবেন আমি কামড় দেবই এবং বর্ষার মেঘ না ডাকলে সে-কামড় ছাড়ব না।

কচ্ছপের কামড় ঠিক এ ধরনের, নীলাঞ্জনা!

জয়ঢাক! জয়ঢাক! জয়ঢাক!

কবরখানার ভেতর থেকেই আওয়াজটা ভেসে এল যেন। আঁতকে উঠলাম। ভূতেরাও আমাকে ভ্যাংচায়! নাকি কাল মরে যাওয়া সেই সম্ভাবনা জয়গোপাল! জয়গোপাল! জয়গোপাল! বলে আমাকে উত্ত্যক্ত করতে চাইছে। জয়ঢাক বলছে, না জয়গোপাল বলে ভ্যাংচাচ্ছে ভাবতে ভাবতে ক্রসগুলোর এলোমেলো কাটাকুটি রেখাচিত্রের ভেতর দিয়ে কেউ এগিয়ে এসে সামনে দাঁড়াল। তারপর বসে পড়ল। তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম, শচীন! তাহলে তোমাকেই দেখছিলাম একটু আগে। ভেবেছিলাম—

আমাকে থামিয়ে শচীন হাসল। কাল এলে না জয়গোপাল! তোমার পথ তাকিয়ে বসে থাকলাম কতক্ষণ।

তুমি ঘুমিয়ে পড়েছ দেখে আর ডিসটার্ব করিনি!

শুয়ে ছিলাম। ঘুমোইনি। আমার ঘুমেও রিস্ক আছে। সবকিছুতেই বড় রিস্ক আমার।

তোমার জন্যই এসেছি, শচীন!

এসে এখানে বসে আছ! শচীন সিগারেট বের করে বলল। ... আমি কি কবরের তলায় চলে গেছি যে এখানে বসে খুঁজছ? নেকুরাম! তোমার চালাকি আমি বুঝি নে?

গম্ভীর হয়ে বললাম, কী কথা আছে বলছিলে, বল শচীন!

কাল আমি নেশার ঘোরে ছিলাম। শচীন সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়ার রিঙ পাকিয়ে বলল। নেশা ছুটলে একটু-একটু করে মনে পড়ল, জয়গোপালের সঙ্গে যেন দেখা হয়েছিল। তার সঙ্গে একটা মেয়েছেলে ছিল। খুব সুন্দর একটা মেয়েছেলে। ভাবলাম, জয়-টাও আজকাল সঙ্গে মেয়েছেলে নিয়ে ঘোরে! আমি শালা ওই কাজটা কিছুতেই পারলাম না।

শচীনের গলার স্বর আজ অন্যরকম। একটু অস্বস্তি হচ্ছিল। বললাম, কথাটা বল শচীন!

তুমি এমন করছ যেন, আমার কথা শুনতেই এসেছ!

তাই এসেছি, শচীন। সত্যি বলছি।

শচীন মুখটা ওপরে তুলে শুওরের মত গোল ঠোঁট করে ধোঁয়ার রিং বানাল কয়েকটা। তারপর থুথু ফেলে বলল, পরশু রুদোর সঙ্গে কনট্যাক্ট করতে গিয়েছিলাম। নাগুদার সঙ্গে আমার সেটল হয়ে যাচ্ছে।

কিছু না বুঝেই বললাম, ভালই তো। কতদিন এভাবে লুকিয়ে বেড়াবে? সেটল করে নাও।

শচীন নিষ্পলক কুতকুতে চোখে আমাকে দেখতে দেখতে বলল, আগে তোমার সঙ্গে সেটল হয়ে যাক। তারপর নাগুদা।

ও!

ও মানে? শচীন একটু ঝুঁকে এল।

হাসলাম। ... মানে তাহলে যা ভেবেছিলাম, তাই।

শচীন হাঁসফাঁস করতে করতে বলল, রুদোর মুখে কথাটা শুনে আমি থ! রুদো জানে না। কেউই জানে না ভেতরকার ব্যাপারটা। রুদোকে আমি কিচ্ছু বলি নি। অন্য কাউকে বলছি না এখনও। বলব

নাগুদার সঙ্গে মিটমাট হয়ে গেলে। তখন তো আমার নামে কেস থাকবে না। আমি ফ্রি হয়ে যাব তোমাদের মত। তখন সবাই জানবে। জানিয়ে দেব জনে-জনে ডেকে। নেমন্তন্ন করব। আরও কী কী করব, সব ঠিক হয়ে আছে। বঙ্কুবাবুর লালবাড়িটা ভাড়া করব। গেট সাজাব। মাচা বেঁধে দেব। নহবত বাজবে সেখানে। কত কী হবে—শালা!

ফোঁস করে শ্বাস ছেড়ে শচীন থামলে বললাম, বল শচীন!

আবার কী বলব? শচীন ফ্যাঁসফেঁসে গলায় বলল। আর বলার কী আছে? তুমি তো চিরকালের ন্যাকারাম, ভাজা মাছ উল্টে খেতে জান না। তোমার সাহস দেখে আমি মাইরি বোকা বনে গেছি, জয়গোপাল!

আমি চুপচাপ ঘাস ছিঁড়ছি দেখে সে ঘাড় বাঁকা করে টুঁ মারার ভঙ্গিতে ফের বলল, আমার নাম গলাকাটা শচীন!

জানি।

মউ আমার বউ।

সেটা অবশ্য জানি না।

জানতে না, জানলে। শচীন কী একটা বের করল প্যান্টের পেছনের পকেট থেকে। ছুরি নয়, চিরুনি। জোরে চুল আঁচড়াতে থাকল সে। আঁচড়ান হলে চিরুনি থেকে চুল বের করে আবার পেছনের পকেটে গুঁজে রাখল। মুখ নামিয়ে ফের বলল, মউয়ের সঙ্গে কিছুদিন যোগাযোগ হচ্ছে না। কেদারশালা এর মূলে। এ অবস্থায় না থাকলে অ্যাদ্দিন ঘাসে শুইয়ে দিতাম শালাকে।

মউ বিয়ের আগে কেমন করে তোমার বউ হল ভাই শচীন?

শচীন উঠে দাঁড়াল। ... তোমার অত এক্সপ্লানেশানের দরকার নেই। জানতে না। না জেনে সাপের গর্তে হাত দিতে যাচ্ছিলে। এবার জেনে গেলে। ব্যস!

সে পা বাড়িয়ে হঠাৎ ঘুরল। ... আমার সঙ্গে এখানে দেখা হয়েছিল, কাউকে বল না। বললে কী হবে জান? বলে সে নিজের গলার ওপর আঙুল ঘষে শ্‌শ্‌শিক্ করে একটা আওয়াজ দিল।

বললাম, জানি, জানি। অত করে তোমাকে বলতে হবে না।

কী ভেবে একটু হাসল। ... একটা সিগারেট খাবে নাকি?

খাব। সেট্‌ল যখন হয়েই গেল। বলে কচ্ছপের পায়ে আস্তে আস্তে তার কাছে গেলাম। সিগারেটটা হাতে নিয়ে নরম স্বরে ফের বললাম, মউকে কিছু বলতে হবে কি? বলার থাকলে বল, আমি ওকে বলব।

শচীন ভুরু কুঁচকে কিছু ভেবে নিয়ে বলল, এখানে আমাকে না পেলে—ওই যে দেখছ, কেয়ারটেকার নগেন বিশ্বাসের ঘর, ওখানে থাকব। নগেনকে চুপি চুপি জিগ্যেস করলে আমাকে খবর দেবে। কোনও অসুবিধে হবে না। আর একটা কথা বল। ওকে ভীষণ দরকার। আর ... আচ্ছা থাক। ওই বল। তাহলেই যথেষ্ট।

এখনই গিয়ে বলছি। তুমি ওয়েট কর বরং।

শচীন হাসল। ... তুমি বড্ড ভাল, মাইরি! তোমার ওপর সেজন্যই বিশেষ রাগ হয়নি। ধর—যদি অন্য কেউ হত, তাহলে—

নিজের গলায় আঙুল ঘষে ঝটপট শ্‌শ্‌শিক্ করে আওয়াজ দিলাম।

শচীন হিস হিস শব্দে হাসতে লাগল। আমিও হাসতে লাগলাম। কবর ফুঁড়ে-ওঠা ঢ্যাঙা শিমুলগাছটার লাল ফেট্টিবাঁধা মাথায় বসে একটা শীতকাতুরে কোকিল কুঁকুঁ করে মিনমিনে গলায় ডাকতে লাগল। কোকিলটা আমার নয়, শচীনের। ...

রোজ এই সময়টাতে মউ স্টেশনে যায় খবরের কাগজ আনতে। জলনিকাশী খালের কাঠের সাঁকোয় দাঁড়িয়ে গাছপালার ভেতর দিয়ে ওদের বাড়িটার দিকে নজর রেখেছিলাম। আমি জানি, এত সকালে কাগজের ট্রেন পৌঁছায় না স্টেশনে। কাজেই মউকে আমি পাব। একা-একাই পাব। কারণ অখিলস্যার অসুস্থ বলে তাঁর প্রাতঃভ্রমণ বন্ধ হওয়া স্বাভাবিক।

তাকিয়ে থাকতে থাকতে চোখে ব্যথা ধরে যাচ্ছিল। মউ আসছে না। কিছুতেই আসছে না। পেছনের দিকে কুঠিবাড়ির জঙ্গলের ওধারে রেলইয়ার্ডে খালি ইঞ্জিনের হুইস্‌ল্। কুয়াশার ভেতরে বুক তোলপাড় করার মত চাপা শব্দ করতে করতে কত ট্রেন স্টেশনের পর স্টেশন পেরিয়ে চলে গেল। মউয়ের অপেক্ষায় থাকতে থাকতে আমার আয়ুর তিরিশটে মিনিট গচ্চা গেল। মউ এল না।

বাড়িতে গিয়ে বলা যেত। কিন্তু কেদার আছে। সে মহা ধূর্ত। তার কান বাঁচিয়ে কিছু বলা যাবে না। মউকে বাইরে ডাকলে যে আসবে না, সেও ভাল জানি। ওপরে অখিলস্যার। তাঁর কানও খুব সজাগ। দৃষ্টিও প্রখর।

কুয়াশা কেটে রোদ না ফুটলে কেদার গরু বাঁধতে নিয়ে যাচ্ছে না। বারবার ঘুরে সূর্যের হালচাল লক্ষ্য করছিলাম। শেষবারের বার খুট খুট শব্দে চমকে উঠে দেখি, অখিলস্যার। সেই হনুমানটুপি, গলাবন্ধ কোটের ওপর আলোয়ান, পায়ে মোজাজুতো, হাতে আস্ত বাঁশ! রাতারাতি অসুখ সেরে গেছে কি? মুখখানা খুব টকটকে, দাড়িগুলোও ফর্সা। চোখ বড় করে দাঁড়িয়ে গেছেন।

এই যে স্যার! আমি দুপা এগিয়ে গেলাম। ...অসুস্থ অবস্থায় বেরিয়েছেন! এটা ঠিক হয়নি কিন্তু।

অখিলবন্ধু ভুরু কুঁচকে বললেন, তুমি এখানে কী করছ?

কী করছি বলা উচিত ভেবে না পেয়ে কাঁচুমাচু হাসলাম। ...এমনি স্যার, মানে জাস্ট একটু ...

তোমার বাপু এই চোরের ভাবভঙ্গিটা আমার আদৌ অপছন্দ। অখিলস্যার বললেন। তুমি ইদানিং দেখছি পেছনদিকে এসে দাঁড়িয়ে থাকছ! কেন? বরাবরকার মত সামনে দিয়ে আসতে বাধাটা কোথায়? কে তোমাকে বাধা দিচ্ছে? না-না। এটা মোটেও ভাল দেখায় না। তাছাড়া আমার বাড়িতে তোমার অবারিত দ্বার। তুমি এমন চোরের মত পেছনদিকে এসে ওত পেতে থাকবে কেন?

স্যার, ওত পাততে আসিনি!

আলবাৎ ওত পাততে এসেছ। কাল রাত্তিরে অতক্ষণ তুমি মউয়ের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করলে। খাওয়াদাওয়া হল। দিব্যি ভালছেলের মত চলে গেলে। আবার এখন দেখছি, তুমি এখানে এসে লুকিয়ে আছ। ...অখিলবন্ধু ক্ষুব্ধভাবে লাঠিটা ঠুকলেন মাটিতে। ...তাহলে মউ যা বলছিল, তাই ঠিক। তুমি ওর পেছনে গোয়েন্দাগিরি করে বেড়াচ্ছ।

বিশ্বাস করুন স্যার, ব্যাপারটা তা নয়। আমি লুকিয়ে থাকিনি। কাকুতিমিনতি করে বললাম। লুকিয়ে থাকলে আপনি আমাকে দেখতে পেতেন? ওই তো কত ঝোপ রয়েছে। লুকোনর মতলব থাকলে—

অখিলস্যার আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, তোমাকে আগেও বলেছি সন্দেহপ্রবণ স্বামীদের বরাতে অশেষ দুঃখ থাকে।

স্যার, আমি তো এখনও স্বামী হতে পারিনি।

সে প্রশ্নই ওঠে না। আমি অলরেডি তোমাকে কন্যাসম্প্রদান করেছি। বল করিনি?

করেছেন স্যার!

এবং লিখিতভাবে।

হ্যাঁ, লিখিতভাবে।

তাছাড়া তুমিও অগ্নিস্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা করেছ।

করেছি, স্যার।

অখিলস্যার লাঠির ডগা দিয়ে শিশিরভেজা মাটিতে দাগ টেনে বললেন, এরপর যেটুকু বাকি থাকে, তা খুব সামান্যই। তুমি সেদিকে না গিয়ে এখানে এসে—কতক্ষণ থেকে দেখছি, ঠিক শেয়ালের মত চোখমুখ করে আনাচেকানাচে ঘুরঘুর করছ। কেন? বল—কেন তুমি এমন করছ?

আর মুখ বন্ধ করে থাকা গেল না। খুক খুক করে কেসে আস্তে বললাম, স্যার শচীন—

লাঠি তুলে অখিলবন্ধু গর্জালেন, ফের শচীন? আবার সেই শচীনের কথা?

প্লিজ! দয়া করে আমাকে বলতে দিন এবার। দুপা পিছিয়ে গিয়ে হাত জোড় করলাম।

অখিলস্যার লাঠি নামিয়ে বললেন, বেশ, বল।

চাপা স্বরে বললাম, একটু আগে গির্জার কবরখানায় আজও শচীনের সঙ্গে দেখা হল। সে আমাকে শাসিয়ে বলল, শ্বাসনালী কেটে ঘাসের ওপর শুইয়ে দেবে। মুখে ভনভন করে মাছি বসবে।

শচীন তোমাকে তাই বলল? অখিলবন্ধুর চোখ দুটো ঠেলে বেরিলে এল।

সে আরও অনেক কথা বলল, স্যার! বলল, নাগু মিস্ত্রিরের সঙ্গে পোড়াবেম্মোর ছেলে রুদো তার মিটমাট করিয়ে দিচ্ছে। মিটমাট হয়ে গেলে সে আমাদের মত ফ্রি ম্যান হয়ে যাবে। তখন সে বঙ্কুবাবুর লালবাড়িটা ভাড়া করে গেটে ম্যারাপ বাঁধবে। নহবত বাজাবে। জনে জনে নেমন্তন্ন করবে।

ভিক্টরি সিলেব্রেশান!

না স্যার! আর্তনাদের সুরে বললাম। মউকে বিয়ে করবে!

অখিলবন্ধু দম বেরিয়ে যাওয়ার মত বলে উঠলেন, মউকে বিয়ে করবে শচীন?

তার চেয়ে একটা মিস্‌ট্রিয়াস কথা বলল স্যার! বলল, মউ আমার অলরেডি বউ!

অখিলস্যার গাছপালার দিকে তাকিয়ে অভিশাপ দেওয়ার ভঙ্গিতে বললেন, স্কাউন্ড্রেল! রাস্কেল! এত স্পর্ধা ওর, বলে কী—হঠাৎ ভেংচি কেটে তেড়ে এলেন আমার দিকে। ... আর তুমি, তুমি একটা গাড়ল হয়ে তা দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে শুনে এলে? ছি ছি ছি জয়! ধিক! ধিক তোমাকে! ওর মুখে একটা লাথি মারতে পারলে না?

কাতর স্বরে বললাম, আমাকে তো তাতাচ্ছেন স্যার! ওর নাম যে গলাকাটা শচীন!

তুমি পুরুষ নও? তুমি গলাকাটা হতে পার না মূর্খ?

অমন করে বললে আঁতে লাগছে স্যার! গলাকাটা হতে পারব না কেন? পারতাম—যদি মউ আমাকে বিয়ে করতে আপত্তি না করত।

অখিলবন্ধু একটু নরম হলেন এবার। ভাঙাগলায় বললেন, মেয়েরা অমন একটু আপত্তি করেই থাকে। তোমাকে তো বলেইছিলাম, ওকে জয় কর। প্রথমে ভালবাসার পথে—তাতে কাজ না হলে রাক্ষসমতে বলপূর্বক জয় কর। তাছাড়া কাল রাতে যা বললে বা আমি যেটুকু দেখলাম, মনে হল বেশ এগোচ্ছ। নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারলাম রাতে। আবার আজ সকালে এসে উল্টোপাল্টা বলছ। চোরের মত আচরণ করছ।

আসলে শচীনটাই গণ্ডগোলের মূলে। মউয়ের দোষ নেই, স্যার!

অখিলবন্ধু আবার লাঠি তুলে গর্জন করলেন, মগের মুল্লুক পেয়েছে শচীন হারামজাদা? জোর করে বিয়ে করবে আমার মেয়েকে? রোস, এখনই থানায় যাচ্ছি। দেশে এখনও আইন আছে কি না আমি পুলিশকে জিগ্যেস করতে চাই। থানা না শোনে, এসপির কাছে যাব। দরকার হলে কলকাতা যাব। রাইটার্সে গিয়ে মিনিস্টার ধরব।

ফোঁস ফোঁস করতে করতে অখিলস্যার উল্টোদিকে ঘুরলেন। নড়বড় করে এগিয়ে চললেন গাছের ভেতর দিয়ে। আমি কয়েকবার স্যার স্যার করলাম। কানে নিলেন না। এখন এগিয়ে গিয়ে সঙ্গ ধরে বললাম, সত্যি যদি যান, তাহলে বরং নাগুবাবুকেই খবর দিলে এখনও কাজ হবে। এখনও তো মিটমাট হয়নি। নাগুবাবু শোনামাত্র থানায় খবর দেবেন। আর একটা কথা স্যার! শচীন কবরখানা আর গির্জার কেয়ারটেকার নগেন বিশ্বাসের বাড়িতে আস্তানা করেছে। সবসময় কবরখানায় থাকে না কিন্তু। নগেনকে ধরলেই শচীনকে পাওয়া যাবে।

অখিলবন্ধু একবার ঘুরে আমার কথাগুলো গিলে নিলেন যেন। তারপর থপ থপ করে হেঁটে আগাছার জঙ্গলের ভেতর সংকীর্ণ রাস্তা দিয়ে কুয়াশার ভেতর হারিয়ে গেলেন।

বড় একটা কাজ করা গেল ভেবে শ্বাস ফেলে সিগারেট ধরালাম। তারপর ডাইনে ঘুরতেই মউয়ের মুখোমুখি।

মউ গেটের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। একটু তফাতে বাড়ির ভেতর কেদার কুয়ো থেকে জল তুলছে। তার দৃষ্টি নিজের কাজে। আমি মউকে দেখে একটু হাসবার চেষ্টা করলাম।

মউ এগিয়ে এসে বলল, কী হয়েছে জয়দা? বাবা অমন করে কোথায় গেলেন?

সঙ্গে সঙ্গে আমার চমক খেলে গেল মাথার ভেতরে। আমার ন্যালাভোলা বিবেকই হয়ত ঠাণ্ডাহিম তর্জনি দিয়ে ঘিলুকে খোঁচা মেরেছিল। দম আটকানো গলায় বললাম, মউ! সর্বনাশ হয়ে গেল হয়ত!

মউ চমকে উঠে বলল, কী? কী হয়েছে জয়দা?

কিছুক্ষণ আগে শচীনের সঙ্গে আমার দেখা হল গির্জার কবরখানায়।

মউ বিরক্ত হয়ে বলল, আবার পাগলামি? জিগ্যেস করছি, বাবা অমন করে কোথায় গেলেন?

শচীনকে ধরিয়ে দিতে। ব্যস্তভাবে বললাম। তুমি এক কাজ কর, মউ!

শচীন আমাকে বলল তোমাকে ডেকে দিতে—জরুরি দরকার। তুমি গিয়ে ওকে সাবধান করে দাও।

মউ থাপ্পড় তুলে বলল, তোমাকে একটা চড় মারতে ইচ্ছে করছে জয়দা!

মার। আমার বড্ড ভুল হয়ে গেছে। মুখ এগিয়ে দিয়ে বললাম। ...মার। মেরে এক্ষুনি চলে যাও। শচীন তোমার অপেক্ষা করছে। কবরখানায় না থাকলে কেয়ারটেকার নগেন বিশ্বাসের কাছে খোঁজ নেবে। সে ডেকে দেবে ওকে।

মউ চোখ থেকে আগুনের ফুলকি ঝরাতে ঝরাতে বলল, তুমি, তুমি কী জয়দা?

কচ্ছপ।

না। তুমি একটা—উপযুক্ত প্রাণী পছন্দ না হওয়াতে সে বলল, তুমি বাবাকে বুঝি এইসব বলে তাতিয়ে দিলে আর বাবা নিশ্চয় থানায় দৌড়ে গেলেন? তাই না?

আহা, আমি কি জানি স্যার অসুস্থ শরীরে থানায় দৌড়ুবেন? শচীন বলল, নাগুমিস্তিরের সঙ্গে মিটমাট হয়ে গেলে বঙ্কুবাবুর লালবাড়িটা ভাড়া করে ম্যারাপ বাঁধবে। নহবত বাজাবে। সবাইকে নেমন্তন্ন করে তবে বিয়ের পিঁড়িতে বসবে। কার সঙ্গে বিয়ে সে তো বুঝতেই পারছ। ...আমি মুখস্থ বলার মত করে আওড়াতে থাকলাম। ...তবে একটা কথার মানে বুঝতে পারলাম না। শচীন বলল, মউ আমার বউ। এর মানেটা কী, বলবে কি? বল না, প্লিজ!

নির্লজ্জ! যাও বলছি এখান থেকে!

বাঃ? শচীনকে তুমি নির্লজ্জ না বলে আমাকে বলছ? আশ্চর্য তো!

মউ হঠাৎ দুহাতে মুখ ঢেকে ভাঙা গলায় বলে উঠল, তোমরা সব কী পেয়েছ আমাকে? আমি কি রাস্তায় পড়ে আছি যে যা খুশি যে-কেউ এসে বলবে—যা ইচ্ছে তাই! ভেবেছ কী সব?

গেটের কাছে কেদারকে সাপের চোখে তাকিয়ে থাকতে দেখে দ্রুত বললাম, আঃ! কাঁদে না! তুমি কাঁদলে আমার কষ্ট হবে, মউ। প্লিজ! তুমি বাড়ি যাও। আমি গিয়ে শচীনকে সাবধান করে দিচ্ছি।

আর পিছু ফিরে দেখলাম না কিছু।

ভুলটা কী করে যে হয়ে গেল! অখিলস্যারকে অত কথা না বললেও পারতাম। শচীনকে যদি সত্যি ধরতে আসে পুলিশ, সে জানবে আমিই তাকে ধরিয়ে দিয়েছি। ছোট হোক, রোগা হোক, মিনমিনে বা ছিঁচকাঁদুনে হোক, আমার একটা বিবেক আছে। সেই বিবেক লিকলিকে ঠাণ্ডাহিম আঙুলে ঘিলুতে আঁচড় কাটছিল। অস্থির হয়ে আবার কবরখানায় গেলাম শচীনের খোঁজে।

ভাঙা পিলারে হেলান দিয়ে শচীন বসে ছিল। আমাকে দেখেই সে চমকে গেল। এদিক-ওদিক দেখে নিয়ে সে বলল, এত জায়গা থাকতে তুমি শালা খালি এখানে ঘুরঘুর করতে আসছ কেন? মউকে বলেছ আমার কথা?

তার পাশে কালকের মত বেঁটে একটা বোতল। বোতল থেকে ঢুক ঢুক করে একটু গিলে মুখ মুছে তাকাল আমার দিকে। ভারি গলায় বললাম, শচীন! তুমি আর এখানে থেক না! এখনই পুলিশ এসে যাবে।

মউ বলল?

সে কথার জবাব না দিয়ে ঢোক গিলে বললাম, অখিলস্যার থানায় গেছেন। তুমি শিগগির লুকিয়ে পড়, শচীন!

শচীন হ্যা হ্যা করে হেসে বলল, স্যার আমাকে খুব ভালবাসেন। তুমি যদি কেদারশালার নাম করতে, বিশ্বাস করতাম। যাক গে! মউ কী বলল?

মউ কাঁদছিল দেখে এলাম।

শচীন মুখ কালো করে বলল, মেয়েছেলেরা মাইরি বোঝে না কিছু! আর কয়েকটা দিনের মধ্যে

নাগুদার সঙ্গে মিটমাট হয়ে যাবে। আমিও ফ্রি হয়ে যাব। এই ঝামেলা পেছনে রেখে কোথাও কি যাওয়া ঠিক? সে বোম্বে যাই আর ম্যাড্রাস যাই, একদিন না একদিন আমাকে ফেস করতেই হবে। বরং এখানে থাকলে ফেস করা সোজা। নাগুদা যতই রাগ করে থাক, নেমকহারাম নয়। সে বুঝতে পেরেছে, আমি ট্রেচারি করিনি। কাজেই পালিয়ে যাবার দরকারটা কী?

সে আবার এক ঢোক খেল। বললাম, তুমি পালাও, শচীন!

শচীন চোখ পাকিয়ে বলল, চুপ শালা! শচীন তোর কথায় পালাবে! ভারি আমার লাটসায়েব এল রে!

শচীন, তোমার নেশা হয়েছে। এখন না পালালে আর পালাতে পারবে না।

শচীন আবার ঢুক করে একটু গিলে বলল, তুই শালা জয়ঢাক না? তোর কী সাহস মাইরি, আমার বিয়েকরা বউকে বিয়ে করতে হাত বাড়িয়েছিলি। এখানে বোস তাহলে। শোন!

শচীন, পালাও!

আবে শোন না শালা যা বলছি। সে কবরের ওপর থাপ্পড় মেরে বলল, বসে শোন। তুই আমার চেয়ে বয়সে ছোট। স্কুলে আমার জুনিয়ার ছিলিস। কলেজেও ছিলিস আমি যখন ইউনিয়ন করি, তুই তখনও হাফপেন্টুল পরে বেড়াতিস, মনে আছে? তুই আমার বিয়েকরা বউকে ধরতে হাত বাড়ালি কোন সাহসে? তুই জানিস মউয়ের সঙ্গে আমার রেজিস্ট্রি হয়ে আছে ছ'মাস আগে? বরুণকম্পাউন্ডার ভেগে গিয়ে মউয়ের মন ভেঙে গিয়েছিল। সেই সময় আমি তার ভাঙা মন জোড়া দিয়েছিলাম, তুই জানিস? নইলে মউ সুইসাইড করত জানিস? না জানিস তো জেনে নে। ... শচীন বেঁটে বোতলের তরল জিনিসটা তলায় ঠেকিয়ে ঠকাস করে রাখল। তারপর সিগারেট বের করে ধরাল। রিং বানাবার ব্যর্থ চেষ্টা করতে করতে বলল ফের, মউ নেমকহারাম মেয়ে নয়। খানকির বাচ্চা পারু ওর পেছনে লেগেছিল। পারুকে লাইনে শুইয়ে দিয়েছিলাম ওর খাতিরে। তখন তো মউ ফ্রেশ জিনিস। এখন তুই শালা জয়ঢাক আমার ভোগের জিনিসে হাত বাড়াচ্ছিস। রুদো না বললে জানতেও পারতাম না। উরে শালা! পারুকে লাইনে শুইয়েছিলাম, তোকে কবরে শোয়াব জানিস? এই কবরে—এই যে দেখছিস, নগেনচোট্টা মার্বেলগুলো উপড়ে বেচে দিয়েছে, তবু কেমন ঝকঝক করছে। বাবা সায়েবদের তৈরি জিনিস। এখানে শুয়েও সুখ পাবি রে বাঞ্চোত। তোর লাক ভাল।

ঝুঁকে তার একটা হাত ধরে বললাম, আর নয় শচীন! পালাও!

তার হাত টেনে তাকে ওঠানোর চেষ্টা করতেই সে আমার চোয়ালে ঘুসি মারল। মুখ দ্রুত ঘুরিয়ে নিলে ঘুসিটা কানের ওপরে লাগল। সে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, শালার মাথা না পাথর?

ঘুসি খেয়ে হাতটা ছেড়ে দিয়েছিলাম। দেখলাম, সে হেঁট হয়ে পায়ের কাছে প্যান্টের নিচেটা সরিয়ে কী একটা জিনিস বের করল। জিনিসটা ওখানেই বাঁধা ছিল। সে সেটা মুঠোয় ধরে চাপ দিতেই বেরিয়ে এল চকচকে একটা ফলা।

এতক্ষণে তাহলে সেই প্রত্যাশিত চরম মুহূর্ত এসে গেল। ঘাসের বদলে মার্বেলহারা লাইমকংক্রিটের চাবড়ার ওপর আমাকে শুয়ে থাকতে হবে। শ্বাসনালী ফাঁক। মুখে মাছি।

এটা কি উচিত হবে—এভাবে এখানে এসে শুয়ে থাকা? নিজেকে জিগ্যেস করলাম, পুঁটু, এবার তুমি সিদ্ধান্ত নাও কী করবে?

পুঁটু কী একটা বলল। আমি তবু শান্তভাবে বললাম, ছুরিটা ফেলে দাও, শচীন! তোমার ভালর জন্যই বলছি। তুমি মাতাল হয়ে গেছ। বরং নগেনবাবুকে ডেকে দিচ্ছি, তোমাকে লুকিয়ে রাখবেন কোথাও।

শচীন কী করবে যেন জানতাম। সে খ্যা খ্যা করে হেসে বলল, অ্যাই শালা জয়ঢাক! পেন্টুল খোল তো দেখি। ছুরিটা নাড়া দিয়ে সে দু'পা এগিয়ে এল এবং আমিও পিছিয়ে গেলাম। সে ফের বলল, খোল শালা পেন্টুল!

আমার পায়ের কাছে অনেক লাইম-কংক্রিটের টুকরো পড়ে ছিল। একটা বড় টুকরো তুলে তার মুখের ওপর মারলাম। শচীন দমাস করে পড়ে গেল একটা নিচু কবরের ওপর। সে চিত হয়ে পড়ে

গিয়েছিল। আবার একটা চাবড়া তুলে ওর মুখের ওপর মারলাম। গুঁড়ো হয়ে গেল চাবড়াটা। তার মুখটা রক্তে ইটের গুঁড়োয় বীভৎস দেখাচ্ছিল। গলার ভেতর থেকে অদ্ভুত শব্দ বেরিয়ে আসছিল। আবার একটা চাবড়া তুলে মারতে গিয়ে থমকে গেলাম। থাক। যথেষ্ট হয়েছে।

স্প্রিংয়ের ছুরিটা পড়ে আছে একটু তফাতে। সেটা কুড়িয়ে নিতেই এক অদ্ভুত ইচ্ছে আমার মাথার ভেতর গরগর করে উঠল। চিত হয়ে নিস্পন্দ পড়ে আছে শচীন। চোখ বন্ধ। শুধু গলায় কী একটা শব্দ। গলাটা দেখতে দেখতে মনে হল, ছুরিটা খুব তেতে যাচ্ছে।

সঙ্গে সঙ্গে আতঙ্কে ছুরিটা ফেলে দিলাম। তারপর এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখে তাড়া খাওয়া জন্তুর মত কবরখানার ভেতর দিয়ে ছুটে চললাম। সামনে পেছনে ডাইনে বাঁয়ে মুহুর্মুহু ক্রশ। ক্রশ আর কবর। কবর আর ক্রশ। আছাড় খেতে খেতে হাত-পা পড়ে যাচ্ছিল। একবারও পিছু ফিরে দেখার সাহস ছিল না। ...

নীলা রেস্তোরাঁয় খুব তারিয়ে তারিয়ে দুটো মাখন-টোস্ট একটা ওমলেট আর এক কাপ চা খেয়ে বেরুনোর সময় জ্ঞানদা আবার তাগিদ দিল। বললাম, আজই পেয়ে যাবে দাদু! ভাবছ কেন? ব্যাঙ্ক খুলতে দাও। সবে তো নটাও বাজেনি।

জ্ঞানদা খেঁকিয়ে উঠল, কী খালি রোজ ব্যাঙ্ক দেখাও হে!

কাছে গিয়ে চুপিচুপি বললাম, দাদার কানে যায় না যেন জ্ঞানদা। ব্যাঙ্কে আমার নামে বাবা একটা অ্যাকাউন্ট রেখে গেছেন। সেই দিয়েই তো চলছে। মাসে-মাসে তোমাকে যে পেমেন্ট করি, তা কোথা থেকে আসে ভেবেছ তুমি?

জ্ঞানদা চোখে ঝিলিক তুলে বলল, তোমার বাবা খুব বুদ্ধিমান লোক ছিলেন। লোকে বলত বটে সাদাসিধে বোকা বোকা বোকা—

কড়া চোখে বললাম, সক্কালবেলা পিতৃনিন্দা শোনা পাপ জ্ঞানদা!

জ্ঞানদা হাসতে থাকল। ... না, না। জাস্ট কথার কথা বলছি। মানে বিজয়কে তো জানি। বড্ড স্বার্থপর। বড্ড কুচুটে।

দাদা গুরুজন। তার নিন্দে শোনাও পাপ জ্ঞানদা।

তুমি মাইরি আজকাল কেমন যেন হয়ে গেছ, জয়! জোক করলেও বোঝ না। যাও, যাও। ব্যাঙ্কে যাও। ... বলে জ্ঞানদা চিক্কুর ছাড়লেন, ভুচু! দু নম্বর কেবিনে দুটো চা দিয়েছিস?

সিগারেট কিনে মনটা খারাপ হয়ে গেল। আর দু টাকা কিছু খুচরো পয়সা সম্বল। আগের মাসে হাসপাতালের এক নার্সভদ্রমহিলার ছেলেকে পড়িয়েছিলাম। একমাস পড়িয়েই বলেছিলেন, এপ্রিলে ফাইনাল পরীক্ষা। আর প্রায়ই কামাই করছেন জয়বাবু! থাক, আপনাকে আর আসতে হবে না। ওর ক্লাসটিচার পড়াতে চেয়েছেন।

টিউশানি আমার সয় না। ওই একমাস-দুমাস বড় জোর। আসলে লোকেরা আমাকে যেন পছন্দই করে না। বোকাবুদ্ধু ভাবে। কিন্তু নার্সভদ্রমহিলা অবশ্য সত্যিই ভদ্রমহিলা। পুরো চল্লিশটে টাকা মিটিয়ে দিয়েছিলেন। এতদিন সাবধানে খরচ করে চালানো গেল। আবার পিসিমার কাছে হাত পাততে হবে। বউদি বা দাদার কাছে এমনিতেই সহজে কিছু আদায় করা কঠিন, সেই পুজোর সময়টা এবং কালেভদ্রে জামাকাপড়-জুতো ছাড়া। তার ওপর সদ্য দুটো কেলেঙ্কারি হয়ে গেছে। একটা হল মউঘটিত। যদি বা তাও খানিকটা চাপা দেওয়া গেল এবং বউদি আমাকে দারুণ সুন্দরী মেয়ে দেখাবে বলল. আবার একটা কাণ্ড ঘটে গেল। নীলাঞ্জনার চুল থেকে শুকনো পাতা খসে পড়ল এবং শাড়িতে চোরকাঁটা বিঁধল। ন্যাড়ার মায়ের জন্য আবার এই সর্বনাশ। বুড়িকে কিছু বলাও বিপদ। একটুতেই এমন হইচই বাধিয়ে দেবে যে আবার আমার খাওয়া বন্ধ, বউদির মুখ কালো, দাদার তর্জনগর্জন—আজকাল কাজের লোকের পায়ে ধরে কাজ করাতে হয় জানিস হাঁদারাম? অনেক বলে কয়ে একজনকে পেয়েছি আর তুই তার পেছনে কাঠি দিতে যাচ্ছিস? কী বলব? যদি ছোট থাকতিস, চাবকে পিঠের ছাল ছাড়িয়ে শিক্ষা দিতাম। এখন লোকে বলবে, ভাইকে টলারেট করতে পারি না। সেজন্যেই হয়েছে প্রবলেম।

কিন্তু পিসিমার কাছে আর চাইব কোন মুখে? পরশুই তো বললাম, বাবা আমার নামে ব্যাঙ্কে টাকা রেখে গেছেন! ওই মিথ্যা কথাটা জ্ঞানদাকে বলে আসছি কিছুদিন থেকে, তাতে ক্ষতি নেই। বরং ব্যাঙ্কে টাকা আছে বলায় প্রেস্টিজ বেড়ে গেছে। কিন্তু পিসিমার কাছে কথাটা বলা উচিত হয়নি। সত্যি আমি এক রামছাগল। কদিন দাড়ি না কেটে মুখে বেশ খানিকটা দাড়ি হয়েছে। দাড়ি ধরার চেষ্টা করে নিজেকে বারবার গাল দিলাম, পুটু! তুই কচ্ছপ নোস। তুই প্রকৃতই রামছাগল। সবে তোর দাড়ি হচ্ছে। এরপর আরও কিছু গজাবে পুটু! সাবধান!

খুব দমে গেলাম। টেনেটুনে আর দিন তিনেক চালান যাবে। তারপর হরেনের সিগারেটের দোকানে ফের বাকিতে সিগারেট চাইতে গিয়ে এবার হয়ত মুখের ওপর অপমান করে বসবে। খুব নীচমনা লোক হরেন। অথচ তার কাছেই সিগারেট কেনা স্বভাব। কারণ, তাকে দেখিয়ে দিতে চাই যে আমি নগদেই সিগারেট কিনে খাই। ...

যাও! তোমাকে আর কথাই বলব না!

ল্যাম্পপোস্টের কাছে দাঁড়িয়ে টানছিলাম আর দুঃখিত হচ্ছিলাম। সেইসময় সামনে দিয়ে যেতে যেতে মৌসুমী দাঁড়িয়ে গেল। একটু হেসে বললাম, এই তো বলছ!

মৌসুমীর হাতে নীল কাপড়ের খাপে ঢাকা তানপুরা। পেটের কাছে ধরে ঘাড় দিয়ে মাথা পার করিয়ে রেখেছে। বলল, বলছি তোমাকে জানিয়ে দিতে যে হল আমরা পেয়েছি। মিসেস মিত্রই দিয়েছেন।

দেবেনই তো। আমার বলা ছিল না বুঝি?

শাট আপ! তুমি কিচ্ছু বলনি। তোমার জন্য তিতিদের বাড়িতে বসে থেকে-থেকে রাত দশটায় কীভাবে যে বাড়ি ফিরলাম আমিই জানি। একটা রিকশ পর্যন্ত পাওয়া যায় না অত রাতে। ঠাণ্ডায় একটা লোক পর্যন্ত রাস্তায় নেই। মৌসুমী শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বলল, তুমি কী জয়দা?

কচ্ছপ ছিলাম। আবার রামছাগল হয়ে গেছি। দাড়ি দেখে টের পাচ্ছ না?

মৌসুমী হেসে ফেলল। ...সার্কাসের জোকার। চিরকাল জোকারগিরি করে দিব্যি চালিয়ে গেলে কিন্তু! ঠিক আছে, চলি।

ওর সঙ্গ ধরে বললাম, আনন্দমে জোর রিহার্সাল চলছে বুঝি?

চলবে না? কদিন বাদে ফাংশান। মৌসুমী হঠাৎ গলা নামিয়ে বলল, সে রাতে মিসেস মিত্রের সঙ্গে কী এমন জমে গিয়েছিলে যে আমাদের কথাটা বলা হল না? সত্যি, তুমি এত ইরেসপন্সিবল কেন বল তো জয়দা? আমরা আবার হাসিদি ঝর্নাদি এদের সব সঙ্গে করে গিয়ে ওঁকে ধরলাম। সঙ্গে সঙ্গে ম্যানেজ হয়ে গেল। মিসেস মিত্রের মনটা আসলে খুবই ভাল। কিচ্ছু মনে থাকে না।

সুলেখাদি বদ্ধ পাগল, মৌসুমী!

বদ্ধ পাগল তুমি। ... মৌসুমী দাঁড়াল। তানপুরাটা এগিয়ে দিয়ে বলল, হাত ধরে গেল বাবা! নাও, একটু কাজ কর আমাদের। তার বদলে ফাংশানের কার্ড দেব।

তানপুরাটা নিতে গিয়ে টের পেলাম, আমার ডান হাতের তালুতে সেই পোড়া জায়গাটা থেকে ফোস্কা উঠে দগদগে হয়ে গেছে। শচীনকে মারতে ইটের চাবড়া তুলেছিলাম। জোর ঘষা লেগেছে।

মৌসুমী দেখতে পেয়ে চমকে উঠে বলল, হাতে কী হয়েছে পুটুদা?

পুড়ে গেছে একটু।

কিসে পোড়ালে?

প্রেমের আগুনে।

মৌসুমী ফুঁসে বলল, শাট আপ। খালি আজেবাজে কথাবার্তা। কী হয়েছে তোমার?

মাথায় বিয়ে চড়েছে যে?

মৌসুমী খি খি করে হাসতে লাগল। ...ও! ভুলেই গিয়েছিলাম। তুমি মউদিকে বিয়ে করছ।

করা আর হল না মৌসুমী!

কেন? ও পুটুদা, বল না—কেন? সে আমার গা ঘেঁষে হাঁটতে থাকল। ভিড়ের ভেতর ফুটপাতহীন

রাস্তায় যানবাহন বাঁচিয়ে এদিক-ওদিক করে দুজনে হাঁটছি। সে আমাকে বারবার খোঁচাচ্ছে আঙুল দিয়ে। পুটুদা, বল না গো কী হল?

মউয়ের বিয়ে অলরেডি হয়ে গেছে। কাউকে বল না কিন্তু—প্লিজ!

যাঃ! অসম্ভব! ওকে আবার কে বিয়ে করবে?

কেন—শচীন!

ও, হ্যাঁ। মৌসুমী এক সেকেন্ড থেমে আবার হাঁটতে লাগল। একটু পরে বলল ফের, যাঃ। শচীনের সঙ্গে ওর বিয়ে হতেই পারে না। শচীনের নিজেকে বাঁচানোই ঝামেলা। তাছাড়া মউদি কি এমন বোকা যে সত্যি ওকে বিয়ে করে বসবে? ওপর-ওপর একটু-আধটু অমন হয়েই থাকে। এ আমার বিশ্বাস হয় না। তোমাকে কে বলল বল তো শুনি?

শচীন।

শচীনকে কোথায় পেলে? সে তো অ্যাবস্কন্ড করে আছে।

আমার সঙ্গে তার দেখা হয়েছে। আমার গলা কাটবে বলে সে খুব শাসিয়েছে। শচীন বলল মউদিকে বিয়ে করেছে আর তুমি তাই বিশ্বাস করলে?

রেজেস্ট্রি হয়ে আছে বলল। কেস মিটে গেলে বঙ্কুবাবুর লালবাড়িটা ভাড়া নিয়ে ম্যারাপ বাঁধবে। নহবত বাজিয়ে বিয়ে করবে। সবাইকে নেমন্তন্ন করবে।

আঃ। দাঁড়াও। রেজেস্ট্রি হয়েছে বলল?

হ্যাঁ। বলে আকাশের দিকে তাকিয়ে নিঃশ্বাস ত্যাগ করলাম।

তুমি প্রমাণ চাইলে না কেন? বললে না কেন প্রমাণ দেখাও?

কেন চাইব?

মৌসুমী যুক্তি খুঁজে না-পেয়ে কোমল মুখে বলল, তোমাকে শাসাল যখন, তখন তুমি কী বললে ওকে?

আমি ওকে মারলাম। মেরে ফ্ল্যাট করে চলে এলাম। মুখে রক্ত মেখে পড়ে রইল শচীন।

যাঃ! মৌসুমী আবার হাসতে লাগল। গলাকাটা শচীনকে মেরেছে! স্বপ্নে।

গঞ্জুবাবুর দোকানের সামনে মৌসুমী আমার হাত থেকে তার তানপুরা ছিনিয়ে নিল। নিতে গিয়ে আবার আমার হাতের ক্ষতচিহ্ন তার চোখে পড়ল। সে সন্দিগ্ধ দৃষ্টে আমার মুখের দিকে তাকাল। বললাম, কী মৌসুমী?

সত্যি তুমি শচীনের সঙ্গে মারামারি করেছ?

স্বপ্নে।

মৌসুমী তার চোখে আমার ক্ষতচিহ্ন তুলে নিয়ে কেমন হেসে চলে গেল। ঘিঞ্জি করিডোরের ভেতর সে আর তার নীল তানপুরাকে দেখাচ্ছিল একটা জিজ্ঞাসার চিহ্ন।

গঞ্জুবাবু কাউন্টার থেকে আমাকে দেখে বললেন, এই যে!

আমিও বললাম, এই যে!

খুব যে শুনছি! গঞ্জুবাবু চোখ নাচিয়ে বললেন, ভাল, ভাল। কবে কার্ড পাচ্ছি ভাই জয়ঢাক?

আগামী বসন্তকালে।

গঞ্জুবাবু অট্টহাসি হাসতে লাগলেন। মনে হল সারা শহর হাসছে। ওঁকে যদি বলি, গলাকাটা শচীন বোস—যে আপনার দোকানে বোমা মেরে কাউন্টার উড়িয়ে দিয়েছিল, তাকে আজ ঠাণ্ডাহিম সকালে কুয়াশার ভেতর মেরে শুইয়ে দিয়েছি, ওঁর হাসি কি বন্ধ হবে না?

অথচ প্রবল ইচ্ছে আমাকে নাড়া দিচ্ছে। রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করা যেত যদি এ শহরের দুর্দান্ত সন্ত্রাস গলাকাটা খোকা বোসের নাক ফেটে ঘিলু বের করে দিয়েছি?

দম আটকে যাচ্ছিল। গাধার কানওয়ালা রাজা ও নাপিতের গল্পের সেই নাপিতের মত অবস্থা আমার। কিন্তু যাকেই বলব, সেই অবাক হয়ে যাবে। বিশ্বাস করবে না। আরও বেশি করে হাসবে। একানড়ে, মেয়েদের তাঁবেদার, সবসময় চোরের মত হাবভাব, নিচুগলায় কথা বলা, রামপ্রসন্ন স্যার

ছোটবেলায় যার পেটের গড়ন দেখে জয়ঢাক নাম চালু করেছিলেন এবং এখনও কেউ কেউ যাকে জয়ঢাক বলে থাকে, আচায্যিপাড়া লেনের বেজার ভাই সেই পুঁটু গলাকাটা শচীনকে মেরে শুইয়ে দিয়েছে। এ কি সত্যি? সত্যিই কি?

যাঃ। স্বপ্নে।...হ্যাঁ। স্বপ্নে ...

সুলেখাদির বাড়ির লনে তিনটে ছাতাদেবদারু দুটো পাম একটা পাইন গম্ভীরমুখে দাঁড়িয়ে বাড়িটাকে বেজায় গম্ভীর করেছে। গাগু উকিল খুব চতুর লোক ছিলেন। গাম্ভীর্য তৈরি করতে জানতেন। বুঝতেন এসব জিনিসের দাম লাখটাকা। একটু দূর থেকে তাকিয়ে যতবার দেখেছি, ততবার মনে হয়েছে ওই বাড়িতে সুলেখাদির থাকাটাই আশ্চর্য। অমন ছটফটে দুর্ধর্ষ এক মেয়ের ধাক্কায় বাড়িটার ফাটাফাটি হয়ে যাওয়া উচিত ছিল কবে।

আমাকে দেখে চড়া গলায় বললে, কী রে? পরনে খয়েরি রঙের ঝলমলে ড্রেসিং গাউন। ঠোঁট তেমনি লাল টুকটুকে, কপালে দাগড়া টিপ, তোল্লাই খোঁপা, প্লাক-করা ভুরুর ওপর ভীষণভাবে বাঁকান আঁকা ভুরু, আঁকা চোখ। মস্ত ব্রিফকেস গোছাতে-গোছাতে ফের বলল, কী খবর তোর?

কোথাও বেরুচ্ছ লেখাদি?

হু। বোস।

সাংঘাতিক দেখাচ্ছে তোমাকে, লেখাদি।

ভুরু কুঁচকে সুলেখাদি ঝুঁকে-পড়া অবস্থায় মুখ ঘোরাল। কী মতলব তোর?

লাঞ্চ খেতে এলাম। কিন্তু তুমি তো বেরুচ্ছ।

সুলেখাদি সোজা হয়ে বলল, খেয়ে বেরুব। কিন্তু তুই কি শুধু খেতেই আশিস আমার কাছে?

খেতে এবং আড্ডা দিতে। সোফায় আরাম করে বসে বললাম।...তুমি কোথায় বেরুচ্ছ গো? দূরে, না কাছাকাছি?

সুলেখাদি আনমনে বলল, দূরে। তারপর একটা বড় স্যুটকেস নিয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ সেটা গোছগাছ করে হঠাৎ ঘুরে পুরুষালি কণ্ঠস্বরে চেঁচিয়ে উঠল, অ্যাই পাঁঠা! তোকে আনন্দমের ভদ্রমহিলা আমাদের কমিউনিটি হলের জন্য বলতে পাঠিয়েছিলেন, তুই এতক্ষণ থাকলি, বললি না তো?

ধুস! আমার নিজের চিন্তায় মাথা খারাপ। অতসব মনে থাকে না।

তোর চিন্তা কিসের রে ছাগল? গিয়েছিলি নাগুদার কাছে?

নাঃ। সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়ার সঙ্গে বললাম। মানে, যাবার দরকার হল না। শচীনের সঙ্গে সেট্‌ল হয়ে গেল আর কী।

সুলেখাদি খাটের কোনায় আলতভাবে বসে বলল, ফাইন! বলে একটু হাসল।...কী বলল খোকা বোস? রাইট ছেড়ে দিল বুঝি? আসলে কী জানিস, তোকে বলেছিলাম—ওসব গুণ্ডামাস্তানদের নেচার ভারি অদ্ভুত। অনেক সময় ওরা দারুণ সরল। প্রাণ দেবে তোর জন্য। আবার গোঁ চাপলে তোর গলায় ছুরিও চালাবে। হুঁ, কী বলল তোকে?

বলল, অখিলস্যারের মেয়ে তার বউ। তার সঙ্গে ছ'মাস আগে রেজিস্ট্রি হয়ে গেছে। ... একটানে বলতে থাকলাম না থেমে, নিঃশ্বাস না ফেলে। ...বলল, নাগুবাবুর সঙ্গে গণ্ডগোল আছে। সেটা মিটে যাচ্ছে শিগগির। তখন সে ফ্রি ম্যান হয়ে যাবে এবং বঙ্কুবাবুর লালবাড়িটা ভাড়া করে ম্যারাপ বেঁধে নহবত বাজিয়ে সবাইকে নেমন্তন্ন করে তারপর—

সুলেখাদি ক্যানাস্তারা পেটানোর শব্দে অট্টহাসি হাসলে চুপ করলাম। তারপর বলল, পাঁঠা! পাঁঠা! ছাগল।

কচ্ছপ, লেখাদি।

সুলেখা মিত্র কচ্ছপে কান দিল না। বলল, তাহলে কী আর করবি তুই? আঙুল চোষ।

চুষিনি। শচীনকে মেরে শুইয়ে দিয়েছি। চিত হয়ে পড়ে আছে। নাক ফেটে ঘিলু বেরিয়ে গেছে।

সুলেখাদি চোখ বড় করে বলল, যাঃ। কী বলছিস!

তুমি বিশ্বাস করছ কী না আগে বল।

সুলেখাদি চঞ্চল হয়ে বলল, বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন নয়! আজকালকার ছেলেরা সব পারে। সেজন্যই তো তোদের কত তোয়াজ করে চলি দেখতে পাস। কিন্তু তুই খোকার মত সাংঘাতিক ছেলেকে মারতে পারলি? নিশ্চয় সে একা ছিল?

হ্যাঁ। ও তো ফেরারি আসামি। গির্জার কবরখানায় লুকিয়ে ছিল। আমি সেট্‌ল করতে গেলাম, তখন ও মদ খাচ্ছিল।

তাই বল্‌। একা মাতাল অবস্থায় থাকলে তো তুই কেন, একটা বাচ্চাও ওকে মারতে পারবে। সুলেখাদি উঠে পড়ল। আবার জিনিসপত্র গোছাতে গোছাতে বলল, খোকার গায়ে হাত তোলা সহজ নয়। নাগুদার কাছে ওর যা সব কীর্তিকলাপ শুনেছি! এখন তোর অবস্থা কিন্তু শোচনীয় হবে, জয়! খোকা এর শোধ না নিয়ে ছাড়বে না। তাছাড়া ওর গ্যাংয়ের ছেলেরা আছে। তোর এটা উচিত হয়নি রে! ওর গ্যাং তোকে রাস্তায় পিটিয়ে মারবে। কেউ তোকে বাঁচাতে পারবে না। কেন তুই ওকে ঘাঁটাতে গেলি বোকা কোথাকার? খুব ভুল করে ফেলেছিস।

সুলেখাদি আরও কয়েকবার ভুল শব্দটা নিয়ে যথেচ্ছ নাড়াচাড়া করল। তারপর আমার সামনে এসে আমাকে দেখতে দেখতে আস্তে বলল, তুই যাবি আমার সঙ্গে? চল না। কলকাতা যাচ্ছি। সেখান থেকে যাব সাউথ ইন্ডিয়া ঘুরতে। ফিরতে মাসখানেক হয়ে যাবে। ততদিনে ওদের রাগ পড়ে যেতেও পারে। যাবি?

না।

না? ভয় করছে না তোর?

করছে হয়ত।

হয়ত কী রে পাঁঠা? সুলেখাদি থাপ্পড় তুলে বলল। তোকে আমার একটা চড় মারতে ইচ্ছে করছে। একটা আজেবাজে মেয়ের জন্য তুই লড়তে গেলি মাস্তানগুণ্ডাদের সঙ্গে! এখন রক্ত মেখে পড়ে থাক গে রাস্তায়। সুলেখা মিত্তিরকে তো জানিস। তোর রক্তের ওপর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে চলে যাবে। তাকিয়েও দেখবে না।

জানি, লেখাদি।

হতাশ ভঙ্গিতে সুলেখাদি কাঁধ এবং হাতদুটো নেড়ে সরে গেল। ...মর গে বাবা! আমি কারুর ব্যাপারে নেই। আমার নিজেরই হাজারটা প্রবলেম। ...বলে চিক্কুর ছাড়ল। চিত্রা! চিতু!

চিত্রা পর্দা তুলে উঁকি দিল।

খেতে দে। আর শোন, জয়ও খাবে। আহা, যাসনে। শোন। লক্ষ্মণকে রেডি হতে বলে দে। লাগেজ রেডি। গাড়ি বের করেছে কি না উঁকি মেরে দ্যাখ তো। ...

শহরের একটা অংশ চিরে হাইওয়ে বেরিয়ে গেছে। স্টেশনের কাছে রেললাইন পেরিয়ে সমান্তরাল চলে গেছে কলকাতার দিকে। সুলেখাদির গাড়িতে স্টেশন অবধি গিয়ে নেমে পড়েছিলাম। হাত নেড়ে টা টা করেছিলাম। কতদূর সুলেখাদির ঝলমলে হাত নড়তে দেখেছিলাম চলমান কালো গাড়িটা থেকে।

দূরের এবং নিরাপত্তার হাতছানি। গেলেও পারতাম। উচিত ছিল যাওয়া। কিন্তু প্রাচীন গির্জার কবরখানা আমার বুকের ভেতর আটকে আছে। সেখানে থোঁতা মুখ ভোঁতা করে শচীন চিত হয়ে শুয়ে আছে। শচীনকে আমার দেখতে ইচ্ছে করছিল। শচীন সবার গলায় দস্তখত করত। আমি ওর মুখে দস্তখত করেছি। নিজের দস্তখত দেখার জন্য অস্থির হয়ে উঠছিলাম ক্রমশ।

কিন্তু ওর গ্যাঙের কথা মাথায় ছিল না। সুলেখাদি আমার ভেতর গ্যাঙের ভয় ঢুকিয়ে দিয়ে চলে গেছে। খুব সাবধানে বিকেল অবধি স্টেশনে এবং ওভারব্রিজে কাটিয়ে পড়ন্ত বেলায় রেলইয়ার্ড ঘুরে গির্জার কবরখানার দিকে হেঁটে গেলাম।

দূর থেকে তাকিয়ে দেখলাম কবরখানা তেমনি সুনসান নির্জন খাঁ খাঁ। নীলচে কুয়াশার তলায় ঢেকে যাচ্ছে গাছপালা, পোড়ো জমি, মেথরবস্তি, গির্জা, গোরস্থান। অন্যপাশ দিয়ে ঝোপঝাড় ভেঙে উঁকি দিলাম। বোমাবিধ্বস্ত নগরীর ধ্বংসাবশেষ যেন। এখনও ধোঁয়া উড়ছে। হতরা চাপা পড়ে আছে।

আহতদের নিয়ে গেছে হাসপাতালে। অনেক অ্যাম্বুলেন্স এসেছিল। চাকার দাগ রেখে গেছে নরম মাটিতে।

কেউ কোথাও নেই। একা এক পা এক পা করে এগিয়ে গুঁড়ি মেরে ভেতরে ঢুকলাম। ভাঙা পিলারের কাছে গিয়ে কাউকে দেখতে পেলাম না। একটা কবরে বসে রইলাম চুপচাপ।

তাহলে মৌসুমীর কথাই সত্য। সবই স্বপ্নে ঘটেছিল।

মুরলীর বিস্কুটের দোকানের সামনে যখন গেছি, তখন গলিরাস্তায় আলো জ্বলছে। মুরলী তুলোর কম্বল জড়িয়ে ফ্রকপরা একটা মেয়েকে চকোলেট বেচতে বেচতে ফস্টিনস্টি করছিল। আমাকে দেখে বলল, কোথায় ছিলে পুঁটু? কতবার তোমাদের বাড়িতে গিয়ে তোমাকে খুঁজেছি জান? পিসিমা উল্টে আমাকেই জিগ্যেস করলেন। আমি কি—এস, এস। চা খাই। অনেক কথা আছে।

সে ঘরে ঢুকে কুকার এনে উঁচু বারান্দায় তার দোকানের একটু তফাতে রাখল। কুকার জ্বেলে কেটলি চড়িয়ে খি খি করে হাসল। ... বলছি। আগে বল ছিলে কোথায়?

ঘুরছিলাম। কেন?

মুরলী তার জায়গায় এসে বসে বলল, সারা টাউন হুলস্থূল এদিকে। শুনে এলাম মিছিল বেরুবে। হাসপাতালে নাগু মিস্তির হাজার-হাজার লোক নিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মাইক-ফাইক সব রেডি। শচীন—

হ্যাঁ, হ্যাঁ। আবার কে? শচীনই। মুরলী খি খি করে ভাঙা দাঁত দেখিয়ে খুব হাসল। গির্জের ওখানে মার্ডার হয়ে গেছে শচীন। ওর তো শত্রুর শেষ নেই। যখন পাখনা উঠেছিল, তখনই জানতাম এবার মরবে। মরল।

মারা গেছে শচীন? ধরা গলায় বললাম।

বলছি কী তোমাকে? মুরলী চাপাস্বরে বলল। রক্তারক্তি হয়ে পড়েছিল। কারা দেখতে পেয়ে খবর দেয় থানায়। পুলিশ যায়। শেষে হাসপাতাল থেকে অ্যাম্বুলেন্স গেল। তখনও নাকি ধড়ে প্রাণটা ছিল। তবে কথাবার্তা বলতে পারেনি। ঘিলু বেরুলে মানুষ বাঁচবে কেন? অ্যাম্বুলেন্স হাসপাতালে যেতে যেতে সব শেষ।

দম নিয়ে মুরলী ফের বলল, যারা দেখেছে, তারা বলছে—সেই শচীন বলে নাকি আর চেনা যায় না। শুকনো চামচিকের মত হয়ে গেছে। রোগা একমুষ্ঠি হাড় নাকি। দেখলে কষ্ট হয়।

নাগু মিস্তিরের আশ্রয়চ্যুত শচীন দিনের পর দিন, রাতের পর রাত পুলিশের আতঙ্কে, উৎকণ্ঠায় ঘুরে বেড়িয়েছে। কোথাও আশ্রয় জোটেনি। ভাল করে খাওয়াও জোটেনি। হয়ত জুটত। কিন্তু মদ খেতেই তার টাকাকড়ি ঘুচে গেছে। আর তাকে কে যোগাবে মদ? বোঝা যায় ব্যাপারটা। একটু ভাবলেই বোঝা যায়।

কী পুঁটু? ভাল খবর দিলাম না? মুরলী চোখে ঝিলিক তুলে বলল। ...এখন তাহলে তোমার রাস্তা কিলিয়ার। মাস্টারের মেয়েকে নিয়ে এস। বাড়িতে জায়গা দেবে না তো কী হয়েছে? আমি দেব। এই তো পাশের ঘরটা খালি পড়ে আছে। যা পার, তাই দিও মাসে-মাসে। বাড়িখানা অনেক আশা নিয়ে করেছিলাম। কাউকে ভাড়া দিতে ইচ্ছে করে না। তবে তোমার কথা আলাদা। তোমরা এলে খালি বাড়িখানার বুক ভরবে। তাতেই আমার শান্তি, পুঁটু।

শ্বাস ছেড়ে মুরলী কেটলির কাছে গেল।

শচীন বলেছিল মিটমাট হয়ে গেলে সে ফ্রি ম্যান—স্বাধীন মানুষ। বঙ্কুবাবুর লালবাড়িটা ভাড়া করে ম্যারাপ বাঁধবে। মাইকে নহবত বাজবে। সবাইকে নেমন্তন্ন করবে।

পুঁটু! অমন চুপচাপ মুখে তালা এঁটে বসে রইলে যে? শরীর খারাপ?

জবাব না পেয়ে সে একটু দমে গেল। চা করতে থাকল ব্যস্তভাবে। তাহলে কি মউ সত্যি বিধবা হয়ে গেল? আমি কি সত্যি-ই তাকে বিধবা করে ফেলেছি?

না। স্বপ্ন। স্বপ্নে। ...

চা খেয়ে মুরলীর ভেতরের ঘরে শুয়ে ছিলাম। পিসিমার সাড়া পেলাম।

মুরলী বলল, কী জানি! শরীর খারাপ হয়েছে। শুয়ে আছে দেখুন গে।

ঘরে চল্লিশ বাতির আলো। পিসিমা ঢুকেই কপালে হাত রেখে বললেন, অসময়ে শুয়ে কেন? মাথা তো ঠাণ্ডা। ছিলিস কোথায় সারাদিন? খাওয়া হয়েছে?

খেয়েছি। শুধু খাওয়া নয়, হেভি খ্যাঁট।

পিসিমা আঁচলের খুঁটে চোখ মুছে খুঁ খুঁ বললেন, দুর্ভাগ্য যদি না হবে, অমন তাজা স্বাস্থ্যবান মানুষ হঠাৎ বুক গেল বুক গেল করে রাত-দুপুরে চোখ বুজবে আর তার আদরের পুঁটুর এ অবস্থা হবে! দুঃখ করিস নে বাবা। চেষ্টাচরিত্র কর। লেখাপড়া যখন জানিস, তখন একটা কিছু জুটে যাবে। কৈ সর, একটু বসি।

পিসিমা বসে আমার সোয়েটারে হাত বুলিয়ে দিতে থাকলেন। বললাম, বাড়ির অবস্থা কী পিসিমা?

ভাল না। বেজার বউ মায়ের সামনে তোর একশ কেলেঙ্কারির জট খুলছে সারাদিন। খালি মেয়েদের পেছনে ঘুরিস। মাস্টারের নষ্টমেয়েকে বিয়ে করেছিস। তারপর গাণ্ড উকিলের মেয়ের কথা, মুখে বলার নয় রে। ও কি ভদ্রলোকের মেয়ে? মাকে দেখলে মনে হয় যৌবনে বাইজিগিরি করত।

ছিঃ পিসিমা।

থাম তো। বলব না তো ছেড়ে দেব? বেজার যতখানি অধিকার, তোর ততখানি অধিকার। দেশে আইন নেই বুঝি? ...পিসিমার ফেমিনিন লজিক তোড়ে বেরিয়ে এল।

মনুরা চলে গেছে?

যাচ্ছিল। বেজা সাইকেলে চেপে মাঝপথে রিকশ থামিয়ে ফিরিয়ে এনেছে।

উঠে বসলাম সঙ্গে সঙ্গে। ...নীলাঞ্জনা ফিরে এসেছে?

পিসিমা আমার মাথায় চাঁটি মারলেন। ... চুপ নির্লজ্জ বাঁদর।

বল না পিসিমা, ওদের ভাব হয়ে গেছে, না এখনও কথা বন্ধ।

পিসিমা একটু হাসলেন। ...স্বামীস্ত্রীর মধ্যে একটু ভুল বোঝাবুঝি হয়েই থাকে। তাতে নতুন বিয়ে হয়েছে। তবে মনু ছেলেটা বউকে ভীষণ ভালবাসে। আমি বুঝিয়ে বললাম, পুঁটুর ব্যাপারটা তোমরা তো জান না। তাই গণ্ডগোল হচ্ছে। মেয়েদের জন্য ফাইফরমাস খাটা ওর স্বভাব। পা টিপে দিতে বললে টিপে দেবে। কাজেই চোরকাঁটা ছাড়িয়ে দিয়েছে তো কী হয়েছে? ন্যাড়ার মাও তখন বলল, হ্যাঁ—তাই তো দেখেছি। কখন বললাম পা ধরে টানাটানি করছিল ছোটবাবু? তবু দ্যাখ, বেজার পাটরানীর মুখ বন্ধ করে সাধ্য কার?

যখন ওইসব কথা হচ্ছিল, তখন নীলাঞ্জনা কী করছিল?

জোরে রেডিও বাজাচ্ছিল। মফস্বলের মেয়ে হলে তো লজ্জায়-ঘেন্নায় গায়ে কেরোসিন ঢেলে পুড়ে মরত। পিসিমা নাকের ডগা কুঁচকে বললেন। আপিসে চাকরিকরা মেয়ে। সবতাতে ডোন্ট কেয়ার ভাব।

পিসিমা মুরলী বা কেদারের মত ইচ্ছে করেই নয়, দৈবাৎ মুখ ফসকে দু-একটা ইংরেজি শব্দ বলে ফেলেন। আমাদের বংশে বাবা নাকি প্রথম ম্যাট্রিক পাস এবং দাদা প্রথম গ্র্যাজুয়েট। ঠাকুর্দার বিদ্যার কথা জানি না। এটুকু জানি, বুড়ো বয়স অবধি রেজিস্ট্রি অফিসে মুহুরিগিরি করতেন। মেয়েকে কিছুটা লেখাপড়া নিশ্চয় শিখিয়ে থাকবেন। কিন্তু পিসিমার কথাবার্তা থেকে সেটা বোঝা কঠিন।

নীলাঞ্জনার কথায় এসে যা সব বললেন, এমন পরস্পরবিরোধী যে বুঝতে পারছিলাম না নিন্দে করছেন, না প্রশংসা। শেষে আমাকে সাবধান করে দিলেন। ওরা কয়েকটা দিন থাকবে হয়ত। কারণ কুটুম্বিতা যথেষ্ট হয়নি বলে দাদার ধারণা। আজ তো একেবারে দধিমচ্ছব রকমের খাওয়াদাওয়া হয়েছে। তারপর বউদি তার মা আর ভ্রাতৃবধূকে নিয়ে ইভনিং শো সিনেমা দেখতে গেছে। দাদা আজও অফিস কামাই করেছে। কিছুক্ষণ আগে ঘুম থেকে উঠে নিজে হাতে চা করে খেয়ে রোয়াকে বসে আড্ডা দিচ্ছে কাদের সঙ্গে। কিন্তু মোদ্দা কথাটা হল, পারতপক্ষে দু-তিনটে দিন আমি যেন বাড়ি না ঢুকি। বেশ তো আছি মুরলীর ঘরে। জামাকাপড় এটা-ওটা যা যা দরকার, পিসিমা চুপিচুপি এনে দিয়ে যাবেন। ব্যাংক থেকে বাবার রাখা টাকা তুলে একদিন আমি মুরলীকে চাল-ডাল কিনে দিলেই চলবে। মুরলী লোকটা বড্ড ভালমানুষ।

মুরলী তার বারান্দার দোকান থেকে নিশ্চয় কান করে শুনছিল। ঠিক এই সময় কাগজের

ঠোঙাভর্তি বিস্কুটগুঁড়ো দিয়ে গেল পিসিমাকে। আশীর্বাদ খেয়ে মুরলীর ভাঙা দাঁত বেরিয়ে গেল। বারান্দার টাট থেকে সে পিসিমার সঙ্গে গল্প করতে থাকল।

শচীনকে পিসিমা জানেন না। খুব একটা কান করছিলেন না মুরলীর কথায়। আমার হাতটা নিয়ে স্নেহ মাখাচ্ছিলেন। এমনদিনে আমার হয়ত একটু স্নেহ দরকার ছিল। বেড়ালের মত একটা গরগর আওয়াজ বুকের ভেতর ঠেলে উঠছিল। হঠাৎ আমার ডানহাতের তালুতে পিসিমার খসখসে কাঠি কাঠি আঙুল পড়তেই আঃ করে উঠলাম। পিসিমা বললেন, কী হয়েছে হাতে! তারপর অনুজ্জ্বল আলোয় ঠাহর করে ফের বললেন, হাত কাটলি কিসে?

দেশলাই জ্বালতে পুড়ে গেছে!

পিসিমা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। বাইরে থেকে মুরলী বলল, আমারও মাঝেমধ্যে পোড়ে। আজকাল দেশলাই কাঠিগুলো বড় সাংঘাতিক। ফস করে এতটা জ্বলে—তো সেই কথাটা এবার বলি, পিসিমা।

পিসিমা আনমনে বললেন, উঁ?

মুরলীর চাপাস্বরে ভেসে এল। ...একটু আগে বলছিলাম পুঁটুকে। অসুবিধেটা কিসের—আমি আছি, আপনি আছেন। মাস্টারমশাইয়ের মেয়েকে বিয়ে করে আনুক। আমি ঘর দেব থাকার। মাসে মাসে যা পারে, তাই দেবে ভাড়াবাবদ। কী?

পিসিমা বললেন, তাহলে তো আর কথাই নেই! আমিও তো তাই বলছি রে বাবা! পুরুষমানুষ উপযুক্ত বয়সে বিয়ে না করলে চলে? টো টো করে বিবাগী হয়ে পুঁটু যে এমন বেড়াচ্ছে, আর কি বেড়াতে পারবে? দায়িত্ব চাপবে কাঁধে। দায়িত্ব চাপলে মরিয়া হয়ে কাজকর্ম খুঁজবে। খুঁজলেই পাবে।

ওটা কোনও কথাই নয়। মুরলী ঘোষণা করল। এত লোক কাজ করে খাচ্ছে—বসে তো থাকতে দেখি না কাউকে। আবার—বুঝলেন পিসিমা? বসে থাকতে যাদের দেখছেন, তারাও কিন্তু কাজ করে খাচ্ছে। ধরণীবাবুর রোয়াকে দিনরাত্তির একদল ছেলে আড্ডা মারে দেখছেন? কিছুক্ষণ আগে সরস্বতীপুজোর চাঁদা চাইতে এসেছিল। পঞ্চাশ টাকার রিসিট হাতে ধরিয়ে আবার শাসায়। মানে—বুঝলেন তো কী বলছি? মুরলী খুব হাসতে লাগল। কেউ বসে নেই। সবাই যেভাবে পারে পয়সা রোজগারের তালে আছে। যার সাহস বেশি, সে ড্যাগার দেখিয়ে ছিনতাই করছে। রেলইয়ার্ডে দেখুন গিয়ে—ওয়াগন ভেঙে মাল সরাচ্ছে। আবার ওদিকে শচীনের কথা ভাবুন। তারপর বেচু, খন্তা, তপন—আপনার গিয়ে লালু, পেটো, মেফুজ—কত নাম করব।

পিসিমা উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আসি রে। বেজার পাটরানী ময়দা মেখে রাখতে বলে গেছে। এসে কুটুম্বদের গরম গরম লুচি খাওয়াবে। বাবা মুরলী, পুঁটুর দায়িত্ব তোমার। নিজের দাদা পর—তুমিই ছিলে আগের জন্মের দাদা।

মুরলী হাসি টেনে বলল, পুঁটু কি আমার কাছে আজকে থেকে আসছে? কিছু ভাববেন না। দেখুন না ওর বিয়ে দিয়ে ঘরে ঢুকিয়ে তবে ছাড়ছি। যাবে কোথা পুঁটু?

পিসিমা বকের পা ফেলে বেরিয়ে গেলেন। বারান্দা থেকে একহাতে থাম আঁকড়ে এবং অন্যহাতটা পেটের কাছে কাপড়ের ভেতর লুকিয়ে রাস্তায় নামলেন। বুঝতে পারছি, বিস্কুটগুঁড়োর ঠোঙাটা বউদির চোখে পড়লে হাফিজ হবার আশঙ্কা আছে। কারণ বউদি মাঝে মাঝে ফিশচপ কিংবা কাটলেট নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করে।

পিসিমা চলে গেলে মুরলী তার দোকান গুটিয়ে ভেতরে এল। চোখে মিটিমিটি হাসি। বাইরের দরজা এঁটে সে তার তক্তাপোসে পা গুটিয়ে বসে বিড়ি জ্বালল। ফুক ফুক করে টেনে চোখদুটো নাচাল হঠাৎ।

বললাম, কী মুরলী?

তোমার পিসিমার তো মত আছে দেখলাম। তাহলে সব হয়েই গেল।

মুরলী, তুমি আমাকে গুণ্ডা-মাস্তান হতে বলছিলে। ছিনতাই করতে বলছিলে। ওয়াগনব্রেকার হতে বলছিলে।

মুরলীর হাসি মুছে গেল। ...আমার যদি তোমার মত বয়স থাকত পুঁটু, তাহলে আমি তাই হতাম। শচীন পর্যন্ত উঠতে না পারি, লালু-পেটো-স্বপনও হতাম। সে রাগীমুখে বলল। সরস্বতীপুজো করবে

মা সরস্বতীর বরপুত্তুররা। আমার কাছে পঞ্চাশ টাকা চাঁদা চাইতে এসেছিল। বড় পুজোয় নিয়েছে কুড়ি টাকা। এখন জিনিসের দর বেড়েছে। পুঁটু, আমি যদি তুমি হতাম। ওইরকম বয়স, ওই রকম গড়ন। ...

শচীন একা ছিল। সুলেখাদি দূর থেকে ফিসফিসিয়ে উঠল। একা এবং মাতাল। তাই তার সঙ্গে মারামারি করতে পেরেছিস পুঁটু।

দিনের পর দিন রাতের পর রাত আশ্রয়চ্যুত শচীন আতঙ্কে উৎকণ্ঠায় কাটিয়ে এবং সময়মত না খেতে পেয়ে এবং নিজেকে চাঙ্গা রাখার জন্য মদ খেয়ে-খেয়ে ওই জনহীন পোড়ো কবরখানার ভাঙা পিলারে হেলান দিয়ে প্রতীক্ষা করছিল একটা মিটমাটের।

মিটমাট হয়ে গেলে সে বঙ্কুবাবুর লালবাড়িটা ভাড়া করত। ম্যারাপ বাঁধত। নহবত বাজিয়ে সবাইকে নেমন্তন্ন করে মউকে ঘরে তুলত।

মউকে আমি বিধবা করে ফেলেছি। আর মউয়ের সামনে কেমন করে দাঁড়াব। আমি তো তাকে সত্যি ভালবাসতাম। তার ভাল চাওয়াই উচিত ছিল আমার। এখন যদি তাকে বলি, শচীন আমার শ্বাসনালী কাটার জন্য ছুরি বের না করলে আমি কিছুতেই তার মুখে ইটের চাবড়া ছুড়তাম না এবং সেটা আমার নেহাত আত্মরক্ষার সহজাত একটা প্রতিক্রিয়া, মউ কি মানবে?...

আস্তে বললাম, মুরলী তুমি আমি হলে কি সত্যিই কি তা পারতে? আমার মনে হয় না।

কেন মনে হয় না? মুরলী আমাকে তাতিয়ে দেবার সুরে বলল। ...ওরা আমাকে শাসিয়ে গেছে। আমি বলেছি পাঁচ টাকার এক পয়সা বেশি দেব না। এখন ওরা যদি আমার দোকানে বোম মারে, তুমি বসে-বসে তাই দেখবে? আমি তুমি হলে কিছুতেই দেখতাম না।

ওদের সঙ্গে মিটমাট করে নাও, মুরলী!

মুরলী ভেসে যাওয়া মানুষের মত বলল, পুঁটু, তুমি কী বলছ? তোমার ওই গড়ন—ওই হেলথখানা। একবার মুঠো পাকিয়ে দাঁড়ালে ওরা লেজ গুটিয়ে পালিয়ে যাবে।

আমি বোমা খেয়ে কাত হয়ে যাব!

মুরলী নড়ে উঠল। ফিসফিস করে বলল, বোমা চাই তোমার? তাও যোগাড় করে দিতে পারি। তপাকে চেন? ভেল্টুবাবুদের গ্যারেজে থাকে? পয়সা পেলেই সাপ্লাই দেবে।

বেশ তো! তুমি এনে রাখ। ওরা বোমা মারলে তুমিও মারবে। খুব জমে যাবে মুরলী! হাসতে হাসতে বললাম। চিরকালের ঝিমধরা আচায্যিপাড়া লেন এতকাল বাদে মুখ খুলবে। তোমার প্রেসটিজ বেড়ে যাবে।

মুরলী বেজার হয়ে বলল, তাই যদি পারব, তাহলে আর তোমাকে সাধব কেন? বোম মারতেও হাতের জোর লাগে। সেটুকু জোরও যে শালা আর গায়ে নেই। ভেতর-ভেতর ক্ষয়ে ফেলেছে ঘূণপোকা। চেহারা দেখতে পাচ্ছ না?

সে তার চূড়ো করে বাঁধা বৈরাগীর চুলগুলো খুলে আবার বাঁধতে থাকল। গলার তুলসীকাঠের মালাটা ঠিক করে নিল। নিভে যাওয়া বিড়িটা দেশলাই জ্বেলে ধরিয়ে আমাকে পিটপিটে চোখে দেখতে থাকল।

ওর চাউনি দেখে মায়া হল। বললাম, ঠিক আছে। চিন্তা কর না।

তখন সে একটু হাসল। ... মাইরি বলছি। তোমার দিব্যি! তপাকে বললেই—

হাত তুলে বললাম, ঠিক আছে। ভেব না। আমি একটু ঘুরে আসি।

এখন আবার কোথায় চললে?

শহিদমিছিল দেখতে।

মুরলী হাসতে লাগল। ...

হাসপাতালের দিক থেকে একটা হল্লার আওয়াজ ভেসে আসছিল। ওয়াটার ট্যাংকের কাছে আকাশিয়া গাছের তলায় ছায়ায় দাঁড়িয়ে দেখেছিলাম শহিদ মিছিল বেরিয়ে আসছিল হাসপাতালের গেট থেকে। একটা ট্রাকে চাপিয়ে ফুলেফুলে ঢেকে গলাকাটা শচীনকে ওরা নিয়ে আসছিল। 'খুনকা বদলা খুন!' রাতের শহর কেঁপে উঠছিল। নাগু মিস্তিরের লোকেরা গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছিল, 'খুনকা

বদলা খুন!' ... 'খোকা বোস জিন্দাবাদ!' ... 'শহিদ খোকা বোস অমর রহে!' ... 'রক্তের বদলে রক্ত চাই!'

গাছের গুঁড়িতে সেঁটে চোরের মত দাঁড়িয়েছিলাম। বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। মনে মনে বলছিলাম, স্বপ্ন। স্বপ্নে। মিছিলটা অলীক অজগরের মত লেজ আছড়াতে আছড়াতে এগিয়ে আসছিল। ট্রাকের হেডলাইট তার জ্বলন্ত দুই চোখ। চেরাগলায় মিছিল থেকে কেউ চেঁচিয়ে উঠছিল, 'খোকাদা তোমাকে ভুলব না!' প্রতিধ্বনির মত সারা মিছিল আওয়াজ দিচ্ছিল, 'ভুলছি না—ভুলব না!' ... 'খুনকা বদলা খুন চাই!' ... 'চাই চাই খুন চাই।' আমার বুকের ভেতর একটার পর একটা হিমশীতল ধস ছাড়ছিল। রক্ত উঠছিল ছলাৎ করে দুলে। তবু আমি প্যাট প্যাট করে তাকিয়ে মিছিলটা দেখছিলাম। কানে তালা ধরিয়ে বোমপটকা ফাটাতে শুরু করেছিল বড় রাস্তায় এসে। বারুদপোড়া কড়া গন্ধ রাতের কুয়াশায় ছড়িয়ে যাচ্ছিল। আলোছায়ার ভেতর একটা করে হিংস্র মুখ ভেসে উঠে গর্জন করছিল, 'খুনকা বদলা খুন চাই!' তারপর হঠাৎ রাস্তার দু'ধারে দাঁড়িয়ে থাকা লোকেরা পালাতে শুরু করেছিল। কিছু দোকান খোলা ছিল তখনও। তারা ঝাঁপ বন্ধ করছিল ঝটপট। কয়েকটা সাইকেলরিকশ উল্টে যেতে দেখেছিলাম। বন্ধ দোকানের ওপর ইট পড়ছিল। হিংস্র মিছিল ভাঙচুর শুরু করেছিল। দাউদাউ জ্বলে উঠেছিল রাস্তার ধারে দাঁড় করানো একটা ট্রাক। মুহুর্মুহু বোমার শব্দ, আগুন, দুমদাম দোকান ভাঙার আওয়াজ—ওদিকে গলাকাটা শচীনের মড়া নিয়ে ফুলে সাজানো ট্রাক তখন অনেক দূরে চলে গেছে এবং মিছিলের লেজের দিকে চলেছে এইসব উপদ্রব। আমার পাশ দিয়ে কারা সাঁৎ সাঁৎ করে উধাও হয়ে যেতেই মনে হয়েছিল, স্বপ্ন নয়। স্বপ্নে নয়।

তাহলে দেখছি দৈবাৎ সাতশ রাক্ষসের প্রাণভোমরাকে খুঁচিয়ে দেওয়ার মত একটা ব্যাপার ঘটে গেছে। এসব আমি ভাবিনি। কল্পনাও করতে পারিনি এমন কিছু ঘটবে। বুঝতে পারছিলাম না আমার ভয় পাওয়া উচিত, নাকি ভীষণ সাহসী হওয়া উচিত।

কিছুক্ষণ পরে ছায়ার আড়াল খুঁজে-খুঁজে যখন কচ্ছপের পায়ে হেঁটে চলেছি, তখন প্রচণ্ড হিম আমাকে পেয়ে বসেছে। ব্যারাকগ্রাউন্ড পেরিয়ে হাইওয়েতে পৌঁছে দেখি শিরীষগাছের তলায় নেতাজির মূর্তির পেছনে কারা শুকনো পাতা জড় করে আগুন জ্বেলেছে। তারা সব রাস্তার বাসিন্দা। তাদের ভিড়ে ঢুকে কিছুক্ষণ আগুনে হাতদুটো সেঁকে নিলাম। ধোঁয়া বাঁচিয়ে মুখ একপাশে কাত করে রেখে তারা বসে ছিল। দুটো বাচ্চা শুকনো পাতা কুড়িয়ে আনছিল পালা করে। একটু পরে তাদের একজন আমাকে দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে উঠেছিল ; এ মা! বাবু আগ লিয়ে লিচ্ছে! তাদের মা একটু হেসে বলেছিল, একটো সিগ্রেট মাং লে বাবুর কাছে। অতটুকু বাচ্চা হাত বাড়ালে তাকে সিগারেট না দিয়ে উপায় ছিল না। সে সিগারেটটা যত্ন করে ধরিয়ে দু'টান টেনে খুকখুক করে কেসে তার মাকে দিয়েছিল। তাদের মা সিগারেটটা টেনে বলেছিল, টাংকির ওধারে কী গোলমাল হচ্ছে বাবু? আমরা সেখান থেকে পালিয়ে এলাম। বহুত বোমা পড়ছে। আগ লাগাচ্ছে। কেন বাবু?

একজন খুন হয়েছে। তার বদলা নিচ্ছে।

কৈ বড়া আদমি থা। তার অতিবৃদ্ধ মরদ বলেছিল। কৈ লিডার-উডার হোগা!

শচীন একজন গুণ্ডা ছিল। লোকের গলা কাটত। বলে আমি শচীনের কাছে শেখা গলায়-আঙুল ঘষে শ্‌শিক্‌ করে শব্দ করতেই বাচ্চাদুটো খিলখিল করে হাসতে লাগল।

দূরে জেলখানার টাওয়ারে ঘড়ি বাজল ঢংঢং করে। বিষাদব্যঞ্জক আটটি গম্ভীর ধ্বনি। ওয়াটারব্যাংক এলাকা থেকে কোনও শব্দ শোনা যাচ্ছিল না আর। হয়ত পুলিশ এসে গেছে। কিংবা ওদের রাগ পড়ে গেছে।

আসলে আগুনের কাছে বসে আমি একটা সিদ্ধান্তে আসতে চাইছিলাম। কিছুক্ষণ পরে অখিলস্যারের নিঝুম বাড়িটার সামনে গিয়ে যখন দাঁড়ালাম, তখন কালো বাড়িটা একটা ছানিপড়া হলুদ চোখ দিয়ে আমাকে দেখার চেষ্টা করল। গেটের কাছে গিয়ে দেখলাম, নিচে অন্ধকার। ওপরে একটা জানালা একটু খোলা। সেখান দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছিল। গেটের কাঠের বেড়া ঠেলে আস্তে ডাকলাম, কেদারদা!

কোনও সাড়া এল না। ভেতরে ঢুকে আবার ডাকলাম, স্যার! স্যার!

অখিলস্যারের সাড়া পাওয়া গেল। জানালা পুরো খুলে উঁকি দিলেন। ... জয় নাকি?

হ্যাঁ, স্যার!

এস।

ওপরে গেলে দরজা খুলে আবার বললেন, এস। সারাদিন কোথায় ছিলে? তোমার জন্য অপেক্ষা করে-করে শেষে—বস।

ঘরের ভেতর কেউ নেই। মউ থাকবে ভেবেছিলাম। মউকে জবাবদিহি করতেই আসা। কোথায় গেল মউ? অখিলবন্ধুর মুখ প্রচণ্ড গম্ভীর। বিছানায় বসে পেছনে বালিস রেখে দেয়ালে হেলান দিয়ে দাড়ি আঁকড়ে ধরলেন। চোখ বন্ধ করে বললেন, বস, বলছি।

মউ কোথায় গেল?

অখিলবন্ধু জবাব দিলেন না। তখন আবার জিগ্যেস করলাম, কেদারদা কোথায়?

কেদার মউকে খুঁজতে গেছে। অখিলস্যার চোখ খুলে বললেন। মউ বেরিয়েছে সম্ভবত সেই দুপুরে। সঠিক কখন বেরিয়েছে তাও জানি না। রান্না করে রেখেই গেছে। একটু সকাল-সকাল খাওয়া অভ্যাস আমার। আজ দেরি করে খাব ঠিক করেছিলাম। কিছু খেতে ইচ্ছে করছিল না। এ-বয়সে উত্তেজনা হলে যা হয়। সকালে তোমার কথা শুনে খুব উত্তেজনা হয়েছিল। অভয় আশ্রম অবধি দিব্যি গেলাম। তারপর আর পারলাম না। চারদিকে আঁধার নেমে এল। নুটবিহারী আরও কারা সব অভয় আশ্রমে ছিল। বেরিয়ে এসে আমাকে ধরে নিয়ে গেল ভেতরে। তক্তাপোসে শুইয়ে দিল। একটু পরে সুস্থ হলাম। তারপর ওদের সব কথা খুলে বললাম। তোমরা সব একসময় স্বরাজ করেছ। চরকা কেটেছ। জেলও বোধ করি খেটেছ কেউ কেউ। তার বদলে এই তো অবস্থা। এইরকম জোর যার মুল্লুক তার রীতিনীতি। আমার মেয়েকে জোর করে বিয়ে করবে। তোমরা কিছু বলবে না? নুটু ঠাট্টা করে বলল, তোমারই তো স্নেহের ছাত্র ছিল। যেমন শিক্ষা দিয়েছ, তেমনি হয়েছে। নুটুর কথায় ব্যথা পেলাম। একটা রিকশ ডেকে দিতে বললাম। ওরা নিষেধ করল। পুলিশে গেলে উল্টে আরও ক্ষতি হবে। বরং শিগগির মেয়ের বিয়ে দিয়ে দাও।

অখিলস্যার দুঃখিত মুখে ঢোক গিললেন। বললাম, তারপর মউ আর বাড়ি ফেরেনি?

টেবিলঘড়ির দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করলেন, কটা বাজে দেখ তো?

সওয়া আটটা প্রায়।

অখিলবন্ধু ঘড়ঘড়ে গলায় বললেন, কোথাও গেলে না বলে তো যায় না। সে জন্যই ভাবনা হচ্ছে। কেদার বলছিল স্টেশন কোয়ার্টারে ছাড়া আর কোথাও যায়নি। ওখানে কী কাজে গিয়ে বোধ করি ওরা ছাড়েনি। খেয়েদেয়ে আড্ডা দিচ্ছে। সন্ধ্যাতেও যখন ফিরল না, তখন কেদারকে বললাম, তুই একবার যা বাবা! তো কেদার গিয়ে খোঁজ নিয়ে ফিরে এল। ওখানে যায়নি মউ। কেদার আবার বেরিয়েছে। মউ যেখানে-যেখানে যায় বা ওর চেনাজানা সব বাড়িতে খোঁজ নেবে কেদার। আমি কিছু বুঝতে পারছি না, জয়! আমার বড় ভাবনা হচ্ছে—

শচীন খুন হয়েছে জানেন কি?

অখিলস্যার চোখ বন্ধ করে রেখেছিলেন। সেই অবস্থায় অভ্যাসমত একটা কালো দাড়ি পটাৎ করে ছিঁড়ে বিছানার পাশ গলিয়ে ফেলে বললেন, দুপুরে মউ বেরিয়ে যাবার অনেক পরে কেদার আমাকে খেতে ডাকতে এল। তার মুখেই শুনলাম। শুনে আবার ভীষণ কষ্ট। খেতে পারলাম না।

কিন্তু মউয়ের আর সে-ভয় রইল না, স্যার! মউ এখন সেইফ।

হ্যাঁ, সেইফ। অখিলবন্ধু একবার চোখ খুললেন। তবু দুঃখ হয় ওর জন্য। ওকে স্নেহ করতাম।

একটু হেসে বললাম, কিন্তু শচীন মউকে জোর করে বিয়ে করতে চাইছিল! তাই তাকে আপনি ধরিয়ে দেবার জন্য পুলিশের কাছে ছুটে যাচ্ছিলেন!

তখন সে বেঁচে ছিল। অখিলস্যার ভর্ৎসনার সুরে বললেন। এখন সে মৃত। মৃতের ওপর রাগ করা উচিত কি, জয়? তাছাড়া সে যা হতে পারত, তা হতে পারেনি—শিব হতে গিয়ে বাঁদরে পরিণত হয়েছিল। এজন্য তো তার কোনও দোষ নেই। দোষ তো নাগু মিত্তিরের মত লোকেদের। তাই না?

ঠিক, ঠিক। সায় দিয়ে হেরিকেনের দমটা একটু কমিয়ে দিলাম। কালি জমছিল কাচে।

তোমার সঙ্গে মউয়ের দেখা হয়নি আজ?

না তো!

অখিলবন্ধু একটু অস্থির হয়ে বললেন, বরাবর এইরকম গোঁ-ধরা স্বভাব। এই জঙ্গুলে পরিবেশে একা বড় হয়েছে। মা-হারা মেয়ে বলে শাসনে ঢিলেমি করেছি। ইচ্ছেমত স্বাধীনভাবে চলাফেরা করেছে। কী আর বলব বল?

একটা কথা বলার জন্য ঠোঁট ফাঁক করলাম। কিন্তু বলতে পারলাম না। অন্য কথা বললাম। ... কিন্তু এভাবে নিপাত্তা হয়ে থাকবে কেন মউ? তার একটু দায়িত্বজ্ঞান থাকা উচিত। আপনি বুড়োমানুষ। কত অসুবিধে হতে পারে।

কেদার আছে জানে বলেই। কেদার না থাকলে এমন করত না। অখিলবন্ধু সোজা হয়ে বসলেন। বড় চা খেতে ইচ্ছে করছে। সকালে সেই উত্তেজনার পর আজ সারাদিন প্রায় শুয়ে কাটাচ্ছি। কেদার রান্নাঘরের চাবি রেখে গেছে। এই নাও! দেখ যদি একটু চা করতে পার। রাতে আজ আর কিছু খাওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। দাঁড়াও, টর্চ নিয়ে যাও।

রান্নাঘরে হেরিকেন-টেন আছে তো?

আছে। রোজ বিকেলে কাচ মুছে তেল পুরে ঝকঝকে করে রাখে মউ। আজ মোছা হয়নি। কী তেল হয়েছে বল তো আজকাল, খালি কালি পড়ে একগুচ্ছের? লাইন দিয়ে আনতে হয়। মাঝে মাঝে তাও মেলে না। তখন মোম এনে জ্বালতে হয়। সেজন্যই তো নুটুকে বলছিলাম, এত যে স্বরাজ করেছ তোমরা—

অখিলবন্ধুর কথা হঠাৎ না থামলে দাঁড়িয়ে থাকতে হত। পুরো না শুনলে উনি রাগ করেন। কথক মানুষের স্বভাব।

অন্ধকারে জরাজীর্ণ বাড়িটা আজ আমাকে মুহুর্মুহু চমকে দিচ্ছিল। টর্চের আলো ফেললাম উঠোনে, গেটে, বাইরে। থ্যাঁতলান রক্তাক্ত মুখ নিয়ে শচীন কবরখানা থেকে হামাগুড়ি দিয়ে এসে যদি ওত পেতে থাকে আনাচে কানাচে! ফাটা নাক থেকে জবজব করে রক্তের ছোপলাগা সাদা ঘিলু বেরুচ্ছে। হাতে গলাকাটা ছুরি। বারান্দার একপাশে দরমাবাতার গোয়ালঘরে গরুর ফোঁস ফোঁস শব্দ শুনে এমন লাফিয়ে উঠলাম যে নিজেরই অবাক লাগল। কিন্তু আবার ভয়। মুহুর্মুহু ভয়ে সারা শরীর শিউরে উঠছিল। রান্নাঘরের তালা খুলতে পারছিলাম না। পেছনে শচীন। মুখে দগদগে ঘিলুরক্ত।

ঝটপট হেরিকেন জ্বেলে তবে ভয়টা একটু ঘুচল। মউয়ের সংসার দেখতে থাকলাম। ভয়ঙ্কর ঝুল কালিমাখা এই ঘরে কাল সন্ধ্যারাতে স্বর্গ ছিল। উষ্ণতা ছিল। এইখানে মউ, তার কপালে টিপ, পরনে ফিকে নীল তাঁতের শাড়ি। ওইখানে আমি। আর ওই সেই খুন্তি, ওই সেই মলম শস্তা ঘুণধরা কাঠের র‍্যাকে।

কেরোসিন কুকারে দুঃখের নীল আগুন দপদপ করে জ্বলতে থাকল। সারা ঘরে মউয়ের গন্ধ মউমউ করছিল। সব কিছুতে তার আঙুলের ছাপ ফুটে উঠছিল। বুকের ভেতর থেকে আবেগ ঠেলে উঠলে ঢোক গিলে কেটলিতে চা ফেলে দিলাম। ...

চায়ে চুমুক দিয়ে অখিলস্যার বললেন, বাঃ! আদাও দিয়েছ দেখছি! ছিল বুঝি? দরজায় তালা এঁটে দিয়েছ তো? কেদারের ভয়ে এ তল্লাটে চোর আসে না। আর চোরও জানে, নেবার মত কিছু নেই।

কয়েকবার চুমুক দিয়ে ফের বললেন, নেই বলছি বটে, আছেও। গাইগরুটা আছে। কেদার আর আমার হাফ-হাফ শেয়ার। তারপরে ধর, খানিক কেরোসিন আছে। মউ লাইন দিয়ে এনেছে। সামান্য চালডাল আর কিছু বাসনপত্তর আছে। কেদার এখন নেই। চোরের পোয়াবারো। আজ চারদিকেই সঙ্কট।

আপনার কান খুব সজাগ স্যার!

ছিল। আজ নেই। বললাম না? সকালে এত উত্তেজনার পর সারাদিন শরীর যেন ভেঙেচুরে আছে। কটা বাজল দেখ তো?

প্রায় নটা।

কোথায় যেতে পারে মউ? অখিলস্যার চিন্তিত মুখে বললেন। খালি ভাবছি, কোনও আপদবিপদ ঘটেনি তো? বড় রাস্তায়—বিশেষ করে ওই রাস্তাটাকে হাইওয়ে করে দেওয়ার জন্য অ্যাকসিডেন্ট হরদম হচ্ছে—হরদম! সেদিনই ট্রেনের সঙ্গে ট্রাকের ধাক্কা—তারপর কালই কেদার বলছিল রিকশর সঙ্গে বাসের ধাক্কা লেগে নেতাজি রোডে সে এক সাংঘাদিক কাণ্ড। মউয়ের তো চলাফেরার ব্যাপারে দৃকপাত নেই।

অখিলবন্ধু চুপচাপ চা খেতে থাকলেন কিছুক্ষণ ধরে। আস্তে বললাম, শচীনের বডি নিয়ে মিছিল বের করেছে জানেন? শহিদ মিছিল!

সে আবার কী বস্তু?

নাগু মিত্তিরের পার্টির লোকেরা শচীনকে শহিদ ঘোষণা করেছে। বিশাল মিছিল বেরিয়ে এল হাসপাতাল থেকে। ওয়াটারট্যাঙ্কের কাছে দাঁড়িয়ে দেখে এলাম।

বল কী? সত্যিই?

হ্যাঁ, স্যার। তারপর শুনলাম শ্লোগান দিচ্ছে, খুনকা বদলা খুন! অমর শচীন বোস জিন্দা রহে! রক্তের বদলে রক্ত চাই! খোকাদা তোমাকে ভুলছি না ভুলব না!

ত্যাঁদড়ামি।

কী স্যার?

ইশ! অখিলস্যার ভেংচি-কাটা মুখ করে বললেন, দরদ উথলে উঠছে ব্যাটাদের! এতদিন ছিলিস কোথায় সব? এখন ভোঁদড়ের মত লম্ফঝম্ফ করছিস। বাঁচাতে তো পারিসনি ছেলেটাকে? অমন করে বেঘোরে খুনেরা এসে তাকে শেষ করে দিল, তখন তোদের ঘুম ভাঙেনি? নেমকহারামের দল! এ তড়পানির মানেটা কী?

ঠিক বলেছেন আপনি। সায় দিয়ে বললাম। এখন ওদের তড়পানি সত্যিই দেখার মত। করল কী জানেন? রিকশ উল্টে ট্রাকে আগুন ধরিয়ে দোকানপাট ভাঙচুর করে সে এক কাণ্ড করতে লাগল। তার সঙ্গে দমাদ্দম বোমা! বোমার আওয়াজে কান ফেটে যায়।

অখিলস্যার চোখ বড় করে শুনছিলেন। শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে বললেন, পুলিশ কিছু করল না?

পুলিশ তো দেখিনি, স্যার। এতক্ষণ হয়ত এসে গেছে।

মজা দেখতে।

অথচ এর আগেও দেখেছি এমন মিছিল হয়েছে। সঙ্গে পুলিশভ্যান থাকতে দেখেছি।

এবার ছিল না?

আমার তো চোখে পড়েনি।

অখিলস্যার মাথা নেড়ে বললেন, হয়ত আঁচ করতে পারেনি শচীনের জন্য এমন হবে। নাগুর সঙ্গে ওর বিবাদ চলছিল। তাছাড়া ওর পেছনে হুলিয়া ছিল। ভেবেছিল একটা ক্রিমিন্যালের জন্য কে আর গণ্ডগোল পাকাতে চাইবে। তাই পুলিশ গা করেনি।

সেটাই মনে হচ্ছে স্যার।

অথচ দেখ, নাগু মিত্তির শচীনের মড়া থেকে মুনাফা ওঠানোর তাল করল তাহলে! তোমার কী ধারণা?

ঠিক বলেছেন আপনি।

অখিলবন্ধু আবার সোজা হয়ে বসলেন। ... এবার কী হবে বুঝতে পারছ? সেবারকার মত আগুন জ্বলবে। খুনোখুনি শুরু হয়ে যাবে পাল্টাপাল্টি। কাজলের ব্যাপারে যেমন হয়েছিল। আবার যখন তখন বোমাবাজি। সন্ধ্যা হতে না হতে রাস্তাঘাট খাঁ-খাঁ। আবার—আবার সেই জিনিস। যাই হোক, তুমি সাবধানে চলাফেরা কর বাপু! গণ্ডগোল দেখলে সরে এস সঙ্গে সঙ্গে।

আমি তো কোনদিন কোনও ঝামেলায় থাকি না স্যার।

তা থাক না বটে! সেজন্যই তো তোমাকে এত পছন্দ করি।

মউকে আমি খুঁজতে যাব স্যার?

অখিলস্যারের মুখে অসহায় মানুষের ভাব ফুটে উঠল। ... আমি একা থাকব? যেতে চাইছ—সেটা ভালই। কিন্তু বাড়িটা আজ আমাকে একা পেয়ে গিলে খাচ্ছে, জয়! শরীরটাও ভেঙে পড়েছে যেন। তুমি থাক বরং। তাছাড়া তুমি কোথায় খুঁজবে ওকে? কেদার জানে মউয়ের গতিবিধি। তুমি তো জান না কিছু। কেদার আসুক। ...

কেদার এল, তখন রাত বারটা বেজে গেছে। অখিলস্যার ক্লান্তভাবে চোখ বুজে মাঝে মাঝে কিছু কথা বলছিলেন। অসংলগ্ন নানাবিধ কথা। আমার ঢুলুনি এসে যাচ্ছিল। স্যারের ডাকে চোখ খুলে সাড়া দিচ্ছিলাম। খাওয়ার মত ঘুমও আমাকে বড্ড বাগে পায়। ঘুমের টান চোখে নিয়েই স্যারের কথায় বাইরের বারান্দায় গেলাম। এতক্ষণে ফিকে একটু জ্যোৎস্না চুঁইয়ে পড়েছে আকাশ থেকে। চাপ-চাপ শীতল কুয়াশার ভেতর সেই মিহি জ্যোৎস্না কিলবিল করছে গাছপালার তলায়। গেট খুলে কেদার ঢুকছিল। ডেকে বললাম, কেদারদা নাকি?

কেদার আমার ওপর টর্চের আলো ছুঁড়ে বলল, হ্যাঁ।

মউকে পেলে?

এই তো। দেখতে পাচ্ছ না?

কেদারের পেছনে মউয়ের ছায়ামূর্তি দেখে ঘরে ঢুকে ঘোষণা করলাম, স্যার, মউ। কেদারদার সঙ্গে আসছে।

অখিলবন্ধু ডাকলেন, কেদার! অ কেদার! কোথায় ছিল মউ?

কেদারের সাড়া পাওয়া গেল না কিছুক্ষণ। নিচের উঠোনে কুয়োর ভেতর বালতি নামানোর শব্দ শোনা যাচ্ছিল। অখিলস্যারের ঠোঁটের কোনায় এতক্ষণে হাসি ফুটেছে। আরাম করে বসলেন পা গুটিয়ে।

কতক্ষণ পরে কেদার এল। নিচের কুয়োয় তখনও বালতি আর জলের শব্দ। কেদার ঘরে ঢুকে গুম হয়ে কোনার দিকে মেঝেয় বসে পড়ল। অখিলবন্ধু বললেন, কোথায় পেলি ওকে?

কেদার জবাব দিল না।

কী হল? কথা বলছিস না কেন?

কেদার আস্তে বলল, কী বলব? বাড়ি এসেছে তো!

তা তো এসেছে। ছিল কোথায় সে? অখিলবন্ধু রেগে যাচ্ছিলেন। ইরেসপন্সিবেল মেয়ে! বুড়ো বাপকে ফেলে কোথায় ছিল সারাটা দিন—এত রাত অবধি? রোস, দেখাচ্ছি মজা! মউ! অ্যাই মউ!

কেদার বলল, আঃ! খামোকা শরীর খারাপ করা। আসছে। চান করেছে—বোধ করি কাপড়চোপড় ছাড়ছে।

অখিলবন্ধু অবাক হয়ে গেলেন। ... চান করেছে? এই শীতের রাতে! কেন? কেদার নির্বিকার মুখে বলল, আমি পারলাম না বাপু! বুড়ো হাড়ে নিমুনি ধরে মরব শেষে? কাপড় বদলেছি। ওতেই নিয়মরক্ষে হবে।

অখিলস্যার আমার দিকে তাকালেন। তখন কেদারের দিকে ঘুরে বললাম, শ্মশানে গিয়েছিলে কেদারদা?

কেদার গলার ভেতর বলল, হুঃ!

বললাম, মউ শ্মশানে গিয়েছিল?

কেদার ফোঁস করে নাক ঝেড়ে বলল, কেলেঙ্কারির চূড়ান্ত। টাউনে ঢি-ঢি পড়ে গেছে। গোড়ায় জানলে তো আটকে দিতাম। গিয়ে শুনি সেই দুপুর থেকে হাসপাতালে থেকেছে। বডি বের করেছে যখন, তখন বডির সঙ্গে ট্রাকে চেপেছে।

আস্তে বললাম, আমি তো দেখলাম না তখন!

কেদার বলল, ট্রাকভর্তি লোক ছিল বডির চারদিকে। আমিও তো ছিলাম রাস্তায় দাঁড়িয়ে। আমিও তো দেখতে পাইনি। ভোলা বলল বলে তবে জানলাম। তবে কেলেঙ্কারিতে আর কাল সকালে কাউকে মুখ দেখান যাবে না। যা করার, ভালই করল হতভাগী!

অখিলবন্ধু বোঝবার চেষ্টা করছিলেন। একবার আমার দিকে একবার কেদারের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকাচ্ছিলেন। শেষে চোখের ঢ্যালা ঠেলে বেরুল। তখন বললাম, শচীনের সঙ্গে মউয়ের রেজেস্ট্রি করে বিয়ে হয়েছিল স্যার!

কী? কী হয়েছিল? অখিলবন্ধু পাথরের চোখে তাকালেন।

কেদার আবার নাক মুছল। ... টাউনসুদ্ধু দেখতে পেল, জানল, অখিল মাস্টারমশাইয়ের মেয়ে বিধবা হয়েছে। গলাকাটা শচীন ছিল তার বর। আমি ইশারায় বলিনি আপনাকে? বলিনি শচীনকে তাড়ান—জায়গা দেবেন না?

অখিলস্যার নড়বড় করে বিছানা থেকে নেমে বললেন, বিশ্বাস করি না আমি। আমি বিশ্বাস করি না। মউ! মউ! কোথায় তুই?

লাঠি টেনে নিয়ে থপথপ করে দরজার দিকে এগিয়ে গেলে বললাম, স্যার! উত্তেজিত হবেন না প্লিজ। শরীর খারাপ হবে। আপনি বসুন। যা হবার হয়ে গেছে, এবার—

অখিলবন্ধু লাঠি তুলে বললেন, থাম! তোমাকে ফোঁপরদালালি করতে হবে না।

সিঁড়ির মাথায় মউকে একপলক দেখা গেল। তারপর সে পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। অখিলস্যার গিয়ে তার দরজায় ডাকাডাকি করলেও সে দরজা খুলল না। তখন দরজায় লাঠির গুঁতো মারতে শুরু করলেন।

কেদার গিয়ে ধরল ওঁকে। টানতে টানতে নিয়ে এসে বিছানায় বসিয়ে দিল। তারপর আমার দিকে ঘুরে বলল, এবার তুমি এস দাদাবাবু! অনেক রাত হয়েছে।

অখিলস্যার ঘড়ঘড়ে গলায় ডাকলেন, জয়! কথা আছে। কেদার আমাকে হাত নেড়ে ইশারায় চলে যেতে নির্দেশ করে বলল, কথা দিনসবরে হবে।

জয়! কথা আছে। যেও না।

কেদার আমাকে প্রায় ঠেলেই বের করে দিল।

গাছপালার ভেতর জ্যোৎস্না আর কুয়াশার মাখামাখি। বহু দূরে এরোনটিক্যাল কমিউনিকেশন সেন্টারের উঁচু টাওয়ারে লাল জুগজুগে আলোর কয়েকমিটার ওপরে ফিকে হলুদ একটা জিনিস জ্বলছিল। বিশ্বাস হয় না ওটাই চাঁদ—সেই চাঁদ, যেখানে নীল আর্মস্ট্রং হেঁটে এসেছে। এত বেশি বদলে যাচ্ছে দিনকাল। বদলাচ্ছে ভূগোল।

মুরলী বোবায় ধরা গলায় ভেতর থেকে বলছিল, কে কে?

দরজা খোলার পর বউয়ের মত চুড়ো বাঁধা চুল ফের বাঁধতে বাঁদতে ঠোঁটে অভিমান ফুটিয়ে বলল, যাও! তুমি মাইরি যেন কী! খামোকা অতগুলো ভাত রান্না করালে!

খাব, মুরলী! খিদেয় পেট নেতিয়ে গেছে।

ছিলে কোথায় এতটা রাত্তির অব্দি? এদিকে ট্যাঙ্কি রোডে নাকি হাঙ্গামা। মুরলী বিড়ি ধরিয়ে বসল তার বিছানায়। ... আমি তো ভেবে-ভেবে সারা। গুলি-গালাজও নাকি খুব চলেছে।

শীতের রাতে ঘুম ভাঙার বিরক্তি পুষিয়ে নিতে মুরলী আরও কিছু চায় যেন।

গুলি-গালাজ শব্দে তার আভাস। তাই যদিও চুপচাপ খেয়ে শুয়ে পড়ব ভেবেছিলাম, অন্তত ওকে চাঙ্গা করার জন্য বলতেই হল, আরও একটা খবর আছে মুরলী!

মুরলী মুখিয়েই ছিল। বলল, জিতেন সাহার দোকান উড়িয়ে দিয়েছে বোম মেরে। কাল থেকে টাউন জ্বলবে সেবারকার মত। অনেকদিন শান্তি ছিল। শান্তি জিনিসটা মানুষকে সয় না।

মুরলী, আর একটা খবর আছে। শুনলে তোমার চোখ ট্যারা হয়ে যাবে।

কী, কী? মুরলী কান করল এবার।

অখিলমাস্টারের মেয়ে বিধবা হয়েছে।

যাঃ! বলে মুরলী হাসতে গিয়ে খকখক করে কাশতে শুরু করল। কাশির মধ্যে ফের বলল, তোমার মাইরি খালি—

হাত ধোয়ার কষ্ট স্বীকার না করে নগ্ন মেঝেয় ঢেকেরাখা ঠাণ্ডা ভাত-তরকারি গিলতে বসলাম।

মুরলী সত্যিই ট্যারা চোখে আমার খাওয়া দেখতে থাকল। বুঝতে পারছিলাম সে খুব ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে আছে। ...

অনেক বেলায় ঘুম থেকে উঠে দেখি, আকাশ মেঘে ঢেকে আছে। ফোঁটাফোঁটা বৃষ্টিও পড়ছে। মনে পড়ল শেষ রাতে অথবা ভোরের দিকে মেঘ ডাকছিল। ভেতর দিকটায় একটুকরো উঠোন আছে মুরলীর বাড়িতে। উঠোনের জলের কলে মুখ ধুতে গিয়ে আকাশ দেখে মন খারাপ হয়ে গেল।

মুরলী তার দোকানে বসে জম্পেশ করে কাল সন্ধ্যার ঘটনা নিয়ে আলোচনা করছিল কাদের সঙ্গে। আমাকে উঁকি মারতে দেখে বলল, কেটলি-ফেটলি সব রেডি করা হচ্ছে। কুকার জ্বেলে দাও। যাচ্ছি।

একটু পরে সে পাঁউরুটি নিয়ে ভেতরে এল। মুচকি হেসে বলল, যা বলছিলে কাঁটায় কাঁটায় মিলে গেল। মাস্টারের মেয়ে কাল শচীনকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফ্লাড করেছে। যাই বল, এমন দেখা যায় না কখনও। আজকাল কী হচ্ছে বল তো মাইরি?

সে খদ্দের সামলাতে চলে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরে বাইরে থেকে হাঁক দিল, পুটু! অ পুটু! তারপর কাউকে উদাত্ত গলায় বলল, যান, যান! ভেতরে যান। এইমাত্র ঘুম থেকে উঠে চা খাচ্ছে। চলে যান—অ পুটু!

ভেতরে যে ঢুকল, তাকে দেখে আমি হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম। কী বলব ভেবেই পেলাম না। অন্ধকারে কী করছেন? বলে সে দ্রুত এদিক-ওদিক ঘুরে দেওয়ালে সুইচ খুঁজে বাতি জ্বেলে দিল।

আপনার সাহস আছে বটে! প্রশংসা করে বললাম। ... কিন্তু আলো খারাপ লাগছে। আলো নেভান আগে।

নীলাঞ্জনা ঘরের ভেতরটা খুঁটিয়ে দেখে বলল, এখানে শুয়ে থাকেন বুঝি?

হ্যাঁ। কিন্তু আপনি এলেন কীভাবে?

পায়ে হেঁটে।

আহা, চিনলেন কী করে?

পিসিমার সঙ্গে এসেছি।

কই পিসিমা?

ওপাশে একটা বাড়িতে গেলেন। ফেরার সময় নিয়ে যাবেন ডেকে। বসছি এখানে।

সে মুরলীর বিছানায় বসতে যাচ্ছিল। আমার বিছানা দেখিয়ে দিলাম। সে পায়ের দিকটায় কম্বল সরিয়ে বসল। আমি মেঝেয় শতরঞ্জি ভাঁজ করে বসে কোয়ার্টার পাউন্ড শক্ত পাঁউরুটি তখনও চিবুচ্ছি। পিসিমাকে বোঝবার চেষ্টা করছি। নীলাঞ্জনাই আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছে, তাতে কোনও ভুল নেই। কিন্তু পিসিমা—

নীলাঞ্জনা তীক্ষ্ণদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল আমার দিকে। একটু হেসে বলল, ভীষণ নার্ভাস হয়ে গেলেন মনে হচ্ছে?

তা হয়েছি।

এ মা! আপনি না-সেঁকে রুটি খাচ্ছেন? কেরোসিনকুকারে তো চমৎকার রুটি সেঁকা যায়। এ ভদ্রলোক দোকানে মাখন রাখেন না? এভাবে রুটি খাওয়া ঠিক না। অ্যাসিডিটি হতে পারে।

সে-রাতে মউয়ের সামনে খেতে আমার লজ্জাসংকোচ ছিল না। নীলাঞ্জনার সামনে রুটি চিবুতে আমার খারাপ লাগছিল। সুন্দরীদের সামনে চা কিংবা সিগারেট স্বচ্ছন্দে খাওয়া চলে। কিন্তু মুখ নেড়ে রুটি চিবুনো বড় কদাকার ব্যাপার। কোনক্রমে শেষ করে ভদ্রতাবশে বললাম, একটু চা খাবেন?

নীলাঞ্জনা মাথা দোলাল। তারপর চোখে হেসে বলল, আপনি আজ ভীষণ অন্যরকম কিন্তু। সেদিন আপনাকে স্মার্ট লাগছিল। আজ একেবারে উল্টো। আপনি কি রাগ করেছেন আমার ওপর?

এক চুমুকে চা গিলে রুমালে মুখ মুছে সাবধানে ঢেকুর তুলে বললাম, রাগ করার কারণ নেই। বরং খুশি হয়েছি। কিন্তু—

কিন্তু কী?

আপনি এভাবে দেখা করতে এলেন! বউদিরা জানতে পারলে আবার একদফা কেলেঙ্কারি হবে, জানেন?

আপনাকে আমি নিতে এসেছি। নীলাঞ্জনা পা দোলাতে দোলাতে বলল। পিসিমা আসুন। তারপর আপনি আমাদের সঙ্গে বাড়ি ফিরবেন। না—না। কোনও কথা শুনব না। এর কোনও মানে হয় বলুন? আমার জন্য আপনি এভাবে নিজের বাড়ি ছেড়ে অন্যলোকের বাড়িতে পড়ে থাকবেন। এ কী অদ্ভুত ব্যাপার! আপনাকে আমি বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে তবে এখান থেকে কলকাতা ফিরব। তার আগে নয়।

হাসবার চেষ্টা করে বললাম, আপনি ভুল বুঝেছেন, নীলাঞ্জনা! বাড়ি ছাড়ার কোনও ব্যাপার নেই এতে। আমার জীবনযাপন চিরদিন এরকম। পিসিমাকে জিগ্যেস করলেই সব জানতে পারবেন।

জেনেছি। পিসিমা আমাকে সব বলেছেন।

আমি একমাস বাড়ির বাইরে কাটালেও কেউ আমার জন্য ভাবে না। ভাববার কোনও কারণই নেই।

নীলাঞ্জনা হাসল। আমার ননদিনীটি সত্যি এক জাঁদরেল মহিলা। দেখে শেখার মত। অনেকখানি শিখে গেলাম ওঁর কাছে।

সর্বনাশ! মনুবাবুর জন্য আমার ভাবনা হচ্ছে।

থামুন তো! বলে নীলাঞ্জনা উঠে দাঁড়াল। ভেতরদিকের বারান্দায় গিয়ে একটু দাঁড়াল। তারপর উঠোনে নেমে গেল। ডাকল, জয়! শুনে যান। উঠোনের কোনার দিকে দাঁড়িয়ে ওপাশে একটা গাছ দেখছিল সে। আমি গেলে বলল, ওটা কী গাছ বলুন তো?

আমগাছ।

আমগাছে তো মুকুল ধরার কথা। কোথায় মুকুল?

এখনই কী? বসন্তকাল আসতে দিন। অবশ্য অনেক গাছে আগাম মুকুল এসে যায়।

আপনাদের দেশে প্রচুর গাছপালা কিন্তু। নীলাঞ্জনা চারদিক দেখতে দেখতে বলল। এদিকটায় বস্তি এরিয়া—তাই না? ওই দোতালা নতুন বাড়িটা কাদের? বেশ মডার্ন ডিজাইনের বাড়ি না? আচ্ছা—ও জয়বাবু, আপনার সেই ফিঁয়াসের বাড়িটা কোথায়? দেখা যায় না এখান থেকে?

একটু হেসে বললাম, কালকের সাংঘাতিক ঘটনা শোনেন নি? আমার ফিঁয়াসে বিধবা হয়ে গেছে।

নীলাঞ্জনা দ্রুত ঘুরে আমার দিকে তাকিয়ে আস্তে বলল, ও, হ্যাঁ। কাল রাতে আপনার দাদা ইনিয়েবিনিয়ে কীসব বলছিলেন যেন। সিমেট্রিতে দেখা হয়েছিল—সেই ভদ্রলোককে নাকি মার্ডার করেছে।

আমার ফিঁয়াসের সঙ্গে তার অলরেডি বিয়ে হয়েছিল। গোপনে রেজেস্ট্রি করা ছিল। আবৃত্তির মত বললাম। গলাকাটা ভদ্রলোক অর্থাৎ শচীন বোসের ইচ্ছে ছিল, কেস মিটমাট হলে একটা লালবাড়ি ভাড়া করে ম্যারাপ বেঁধে নহবত বাজিয়ে সবাইকে নেমন্তন্ন করে তবে বউকে ঘরে তুলবে।

হ্যাঁ, হ্যাঁ। নীলাঞ্জনা সায় দিল। ...ওইরকম কীসব বলছিলেন যেন।

দাদার বা কারুর তা জানার কথা নয়!

নীলাঞ্জনা সিরিয়াস হয়ে বলল, না—মানে, ওইরকম কীসব যেন শুনছিলাম। হসপিটালে গিয়ে ডেডবডির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়া-টড়া—এইসব। আপনি বললেন বলে মানেটা অন্যরকম দাঁড়াচ্ছে। আপনি টের পাননি কিছু?

আমার জবাব না পেয়ে সে একটু হাসল।... তাতে কী? ভালবাসারও জন্মমৃত্যু আছে। সারাজীবন একজনকেই ভালবেসে যেতে হবে, তার মানে নেই। তাছাড়া মরে যাওয়া মানুষকে ভালবাসার আর প্রশ্নই ওঠে না। বরং নতুন করে মাথা তোলার একটা চান্স পাওয়া যায় কি না বলুন?

আমি জানি না।

নীলাঞ্জনা ভিজে উঠোনে পায়চারি করতে করতে বলল, বৃষ্টি দেখে খারাপ লাগছিল। এবার একটু রোদ ভীষণ দরকার। মেঘলা আর শীত—না, শীতটা ভালই। মেঘটাই বাজে। কলকাতায় এমনিতেই শীতটা কম। এবার তো একেবারেই নেই। অথচ এখানে কী দারুণ শীত! শুধু মেঘটা—জয়, আজ আপনার প্রোগ্রাম কী?

কিচ্ছু না।

আমার একেবারে মন টিকছে না। খালি আপনার দাদার টানাটানিতে থেকে গেলাম। বলে সে গলার স্বর একটু নামাল। ... আপনার দাদা তাঁর শ্যালককে খুব তাতাচ্ছেন জানেন? বলছেন, চাকরি ছেড়ে এখানে চলে এস। দুজনে মিলে ট্রান্সপোর্ট বিজনেসে নামব। ব্যাঙ্ক থেকে লোনটোনের ব্যবস্থা করে নেবে। ট্রাক কিনে ট্রান্সপোর্ট করবে। ভাবা যায়? আমি বাবা সোজা বলে দিয়েছি, তুমি এসে থাকবে একা। আমি এর মধ্যে নেই।

একটু চুপচাপ পায়চারি করে আবার বলল, আমি স্ট্রেটকাট বলে দিয়েছি। ওসব করতে হয় তো জয়বাবু আছেন। বিজয়দা তাকে নিয়ে এসব করুন। নিজের ভাইকে রেখে শ্যালককে ধরে টানাটানি কেন? ব্যাঙ্কে চাকরি করে বলেই তো! শ্যালকের স্কোপ আছে লোন পাওয়ার। সে কি বুঝি না?

নীলাঞ্জনা যাকে বলে খুব প্র্যাকটিক্যাল—সেদিন গির্জার কাছে ছিনতাইয়ের কথা তোলায় এবং আজ তার এইসব কথাবার্তায় সেটা স্পষ্ট হল। বেশ হিসেব করে চলে নীলাঞ্জনা। ওর সৌন্দর্যে বা সৌন্দর্যময় যৌবনের একটা জায়গায় এই কালো ছোপ—রিয়্যালিটির কলঙ্ক। অথচ ওকে প্রথম দেখার পর মনে হয়েছিল ওর মধ্যে অবাধ স্বাধীনতাস্রোত কুলকুল করে বয়ে যাচ্ছে। অথচ এতসব টুকরো পাথর ঝপাঝপ।

সে হঠাৎ বলল, এই! আপনার হাতে কী হয়েছে?

সেদিন বলিনি?

মনে নেই। কী হয়েছে? দেখি, দেখি।

সে জোর করে আমার হাতটা ধরে ফেলল। ওর হাতটা ভীষণ ঠাণ্ডা। ছাড়িয়ে নিলাম না। পরস্ত্রীর হাতের এই শীতলতার একটা প্রতিক্রিয়া আশা করছিলাম। অন্তত একটু রোমাঞ্চ। আমার কচ্ছপের শরীরে কিছুই ঘটবার নয়। এত কাছে জোরাল সেন্টের ঝাপটানি অবশেষে আমাকে কথা বলিয়ে ছাড়ল। ... দারুণ সেন্টটা তো!

হাত ছেড়ে নীলাঞ্জনা একটু পিছিয়ে বলল, এটি নেওয়া উচিত ছিল।

এটি কী?

অ্যান্টিটক্সিন—মানে অ্যান্টিটিটেনাস ইঞ্জেকশান। শিগগির নিয়ে নিন। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে নিলেও চলে।

তাহলে সময় পেরিয়ে গেছে। তাছাড়া এটা নিছক আগুনে পোড়া ফোস্কা।

মনে হচ্ছে না। নীলাঞ্জনা সন্দিগ্ধভাবে বলল। ... কারুর সঙ্গে মারামারি করেন নি তো?

ইচ্ছার বিরুদ্ধে একটা কনফেশানের ধাক্কা আমাকে নড়িয়ে দিল। কাল সকাল থেকে বুকের ভেতরটায় কী আটকে আছে। কিছুতেই নামছে না। মৌসুমীকে যখন বলি, সে-বলার মধ্যে কৃতিত্বের অহঙ্কার ছিল। সুলেখাদিকে যখন বলি, তখনও একটা পৌরুষ আমাকে তাতাচ্ছিল। কিন্তু তখন জানতাম না শচীন মরে গেছে। বিশ্বাস করতেই পারিনি ওই সামান্য আঘাতে শচীন মারা পড়বে। এখন আমি জানি, আমি একজন খুনি। কারুর কাছে কনফেশানের জন্য যেন অবচেতনে মাথা কুটছিলাম। কাল রাতে কতবার চেষ্টা করে অখিলস্যারের কাছে মুখ খুলতে পারি নি। এ মুহূর্তে সুযোগ ছাড়তে পারলাম না। ...

নীলাঞ্জনা নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে শুনছিল। ওর নাসারন্ধ্র কাঁপছিল উত্তেজনায়। আমার কথা শেষ হলে সে গাঢ় কণ্ঠস্বরে বলল, আর কাকে বলেছেন একথা?

তাও বললাম। শুনে সে উদ্বিগ্নমুখে বলল, ভাল করেননি। যা শুনলাম আপনার দাদার মুখে, তাতে মনে হল, জানতে পারলে আপনার বিপদ হবে। একজন তো বললেন বাইরে গেছেন—আপনি এখনই মৌসুমীর সঙ্গে যোগাযোগ করুন। আরও আগে যোগাযোগ করা উচিত ছিল। খুব ভুল করেছেন।

ওর কথা শুনে চমকে গিয়েছিলাম। সত্যিই তো, এ ব্যাপারটা মাথায় আসেনি। মৌসুমী যা পেটআলগা মেয়ে, এতক্ষণ নিশ্চয় কাউকে না কাউকে বলে ফেলেছে, শচীনের সঙ্গে আমার মারামারি হয়েছিল। তার মানেটা এই দাঁড়াতে বাধ্য যে, আমিই শচীনকে মেরেছি।

কিন্তু ওরা কি বিশ্বাস করবে একথা? বিজয়ের ভাই পুঁটুর এত সাহস হবে যে গলাকাটা শচীনের সঙ্গে মারামারি করবে?

তারপরই মনে হল, মউয়ের সঙ্গে শচীনের বিয়ে হয়েছিল। অথচ আমি·মউকে বিয়ে করছি বলে জোর রটে গিয়েছিল। কাজেই শচীনের সঙ্গে আমার একটা মারামারি হতেই পারে। সেই মারামারিতে দৈবাৎ আমি শচীনকে মোক্ষম একটা ঘা মারতেও পারি। ভাইটাল জায়গায় একটু আঘাতেই মানুষ মরে যেতে পারে। শচীন বেকায়দায় পড়ে মারা গেছে।

নীলাঞ্জনা আমার কাঁধ ধরে ঠেলে দিল। ... যা বলছি, করুন। আর কিছু ভাববার নেই। সত্যি, আপনি এত বোকা ছেলে ভাবতেই পারিনি। যান শিগগির!

প্যাঁচার মত মুখ করে বললাম, মৌসুমীকে এখন কোথায় পাব কে জানে! তাছাড়া এতক্ষণ সে বলতে বাকি রাখে নি হয়ত। ভীষণ কথাবলা স্বভাব ওর। যা হবার হোক না।

নীলাঞ্জনা আমাকে টানতে টানতে নিয়ে চলল। মুরলী পিটপিটে চোখে তাকিয়ে বলল, দুপুরে এসে খাবে কি না বলে যাও, পুঁটু!

নীলাঞ্জনা একটু হেসে বলল, ওকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি!

মুরলী ফ্যাঁচ করে হাসল। আজ্ঞে! খুব ভাল কথা। অ পুঁটু, রাত্তিরে কিন্তু এস যেন।

পিসিমা যে বাড়িতে ঢুকেছিলেন, নীলাঞ্জনা সোজা সেখানে গিয়ে কড়া নাড়ল। আমি গলিরাস্তায় কচ্ছপের পায়ে যেন উদ্দেশ্যহীন হাঁটছিলাম। মোড়ে গিয়ে মনে পড়ল মৌসুমীর এখন আনন্দমে রিহার্সাল দেবার কথা। কিন্তু সত্যিই কি মৌসুমীর কাছে যাওয়ার দরকার আছে?

বড় রাস্তায় কিছুটা এগিয়ে একটু অবাক হলাম। কাল সন্ধ্যার ভাঙচুরের আতঙ্ক সব হল্লাজেল্লা ভিড়ভাট্টাকে ঝেঁটিয়ে দূর করেছে হয়ত। রাস্তাঘাট কেমন খাঁ খাঁ করছে। বেশিরভাগ দোকানপাট বন্ধ। কোনও দোকানের সামনে সামান্য জটলা। একটা রিকশ পর্যন্ত চলছে না। গঞ্জুবাবুর দোকান অবধি একই ঝিমন্ত ঘুমঘুম দশা। মাকালী ভাণ্ডার বন্ধ। ওপরে আনন্দমের জানালাগুলো বন্ধ। গঞ্জুবাবু দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছিলেন। আমাকে দেখে চোখে ঝিলিক তুলে বললেন, কেস খুব গোলমেলে হয়ে গেল হে! না জেনে সাপের গর্তে হাত দিতে গিয়েছিল! খুব বেঁচে গেছ ভাই!

দোকানটোকান সব বন্ধ কেন গঞ্জুদা?

বন্‌ধ ডেকেছে জান না? থাক কোথায়? গঞ্জুবাবু গাল ফুলিয়ে গলায় ভল্যুম এনে বললেন, শহিদ গলাকাটার মৃত্যুতে ভোর ছটা থেকে সন্ধ্যা ছটা পর্যন্ত বন্‌ধ! তারপর খ্যাঁক করে হাসলেন। ... কী হচ্ছে দেখ তো মাইরি জগা! একটা গুণ্ডাফুণ্ডা মারা পড়লেও বন্‌ধ। এরপর নাণ্ড মিত্তির তার কুকুরের মৃত্যুতেও বন্‌ধ ডাকবে।

জগন্ময়বাবু ড্রেনে পানের পিক ফেলে বললেন, রাতারাতি কত পোস্টার সেঁটেছে দেখ। পারেও বটে!

গঞ্জুবাবু গলা চেপে বললেন, নেতাজি রোডে কে দোকান খুলে রেখেছিল, হাঙ্গামা করেছে। আর ওই দেখ—বারীনের বুকের পাটা। থাম, এ রাস্তায় এখনও আসেনি দেখতে।

জগন্ময়বাবু বললেন, বারীন কালোবাবুর পার্টির সাপোর্টার, জান না?

বল কী? ও তো নাগুমিত্তিরের সঙ্গে ঘুরতে দেখেছি।

জগন্ময়বাবু রাঙামুখে হেসে বললেন, কে কখন কোনদিকে যাচ্ছে, বোঝা কঠিন।

একটা রিকশ আসছিল সামনে-পেছনে পোস্টার এবং মাইক নিয়ে। 'বীর শহিদ খোকা বোসের নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে শহর বন্‌ধ!' ...'জনগণের উদ্দেশে আবেদন, এ বন্‌ধ সফল করে খুনীর হাত গুঁড়িয়ে দিন।' এক রিকশয় ছ-সাতজন কী কৌশলে চেপে আছে। ঘোষণার পর জগঝম্প তালে বলে উঠছে, 'শহর বন্‌ধ! শহর বন্‌ধ!' ... 'গুঁড়িয়ে দিন! গুঁড়িয়ে দিন!' 'খুনির কালো হাত! ভেঙে দিন, গুঁড়িয়ে দিন!'

দেখলাম জানালা-কপাটের ফাঁকে উঁকি দেওয়া মুখগুলো ক্রমশ বিবরে অদৃশ্য হচ্ছে। বারীনদার দোকানের সামনে গিয়ে রিকশটা থামলে গঞ্জুবাবু ব্যস্তভাবে ভয় পাওয়া গলায় বললেন, চল জগাই! কেটে পড়া যাক। গতিক ভাল নয়। জয়, এখানে দাঁড়িও না! বাড়ি চলে যাও অন্য পথে। ...

তাহলে শচীনের জন্য বন্ধ ডেকে বসে আছে। ঘুরতে ঘুরতে ব্যারাকের মাঠের পাশ দিয়ে ট্যাংক রোডে গেলাম। কাল রাতে এখানে হাঙ্গামা হয়েছিল। এখন যতদূর চোখ যায় খাঁ খাঁ রাস্তা। একটা পুলিশভ্যান চোখে পড়ল। কোথাও-কোথাও বেঞ্চে একদঙ্গল বন্দুকবাজ পুলিশ বসে আছে। কোলে বন্দুক, হাতে খৈনি।

হাসিদির বাড়ি যাব ভাবলাম। বন্ধে স্কুল তো বন্ধই। কিন্তু কিছুটা এগিয়ে গলিরাস্তা ধরে সুলেখাদির বাড়ির সামনে দিয়ে উদ্দেশ্যহীন যেতে যেতে নগেন মিত্রের বাড়িটা চোখে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে থমকে দাঁড়ালাম। তাহলে কি এখানেই আসছিলাম? আমার পা দুটো টেনে ধরেছে অদৃশ্য সাঁড়াশি বাড়িয়ে এই বাড়িটাই।

রাস্তার ওপর দোতালা বাড়ি। গেটের মুখ থেকে সিঁড়ি উঠে গেছে উঁচু বারান্দায়। দুধারে নিচের মাটিতে ফুলগাছ, ঝাউ, ক্যাকটাস। চওড়া বারান্দায় বেঞ্চ এবং চেয়ারে কয়েকজন লোক বসে আছে। ডানদিকের ঘরটা ওকালতির চেম্বার। বারকতক দাদার সঙ্গে এসেছিলাম চাকরি চাইতে। নাগু মিত্তিরের মনে পড়া উচিত।

চেনা মুখ খুঁজছিলাম। সামনে ঘরের দরজা খুলে কেউ বেরুলে দেখি, ঘরের ভেতর আরও কারা সব বসে গুজগুজ ফুসুর-ফুসুর করছে। কিংবা আমার দেখার ভুল। যে বেরুল, তাকে আধ-চেনা মনে হওয়াতে বললাম, মিত্তিরমশায়ের সঙ্গে একটু দেখা হবে দাদা?

হবে না। নাগুদা এখন ভীষণ ব্যস্ত। বলে তাগড়াই সেই লোক বারান্দায় দাঁড়িয়ে 'খেকো, খেকো' আওয়াজ দিয়ে কাউকে ডাকতে থাকল। খেকো নামের লোককে দেখার জন্য মিনিটখানেক অপেক্ষা করলাম। কিন্তু খেকো এল না। বারান্দার একজন বলল, খেকো এখন খাচ্ছে। সবাই হাসতে লাগল। আমিও তাদের দেখাদেখি হাসলাম। তাগড়াই জোয়ানও হাসল।

সামনের দরজায় উঁকি দিলাম। ভেতরের ছায়ামূর্তিগুলো থেমে গেল সঙ্গে সঙ্গে। ভুতুড়ে গলায় কেউ বলে উঠল, কী চাই?

মিত্তিরমশাই—

পাশের ঘরে, পাশের ঘরে।

কিন্তু পাশের ঘরের দরজার কাছে যেতেই আবার এক লোক। সে তাগড়াই নয়, খেঁকুটে ঝুল চেহারা। পরনে পাজামা-পাঞ্জাবি, জহর কোট, গলায় হলদে শাল। সেও বলল, কী চাই?

জননেতাদের সঙ্গে দেখা করার এত ঝামেলা আছে জানতাম না। অবশ্য আজ এ শহরে এমার্জেন্সি। দাদা নিয়ে আসত শান্তির দিনে। আগে থেকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে।

দেখা করতে চাই শুনে লোকটা কিন্তু মিঠে হেসে বলল, তুমি বিজয়ের ভাই না?

নেচে উঠলাম। ... হ্যাঁ দাদা, আমি জয়—জয়গোপাল। মিত্তিরমশাইয়ের সঙ্গে জরুরি দরকার।

আজ তো দেখা হবে না, ভাইটি! সস্নেহে বলল সে। বরং ঝামেলা-টামেলা চুকে যাক, তখন একদিন এস। কেমন?

প্লিজ দাদা, ভীষণ—ভীষণ দরকার ওঁর সঙ্গে।

বেশ তো, বল। আমাকে বলে যাও। নাগুদাকে বলে রাখব'খন। পরে এসে যোগাযোগ কর।

মিত্তিরমশাই কি ভেতরে আছেন?

আহা, ভীষণ ব্যস্ত এখন। কী অবস্থা কাল থেকে বুঝতে পারছ না?

পাশ দিয়ে ঠেলে পর্দা গলিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়লাম। সেই ঘর। সারবাঁধা আলমারি। আইনের বইয়ে ঠাসা। বিশাল সেক্রেটারিয়েট টেবিল। দু-দুটো ফোন। মেঝেয় কয়্যার ম্যাট্রেস। অসংখ্য গদিপরান চেয়ার হাঁ করে আছে। দুটো লোকের ওপারে দূরে সাদা গোলগাল নাগু মিত্তির বসে আছেন। সুলেখাদির কেমন যেন দাদা হন ভদ্রলোক। মাথায় টাক, চীনে মুখে একফালি কাঁচাপাকা গোঁফ। কিন্তু চোখ দুটি টানা-টানা, ধনুকের রেখায় আঁকা।

কী?

সামনে বসা লোক দুটো ঘুরে আমাকে দেখল। বললাম, আমি বিজয়বাবুর ভাই জয়। আমি বারকতক এখানে এসেছি স্যার! দাদার সঙ্গে এসেছি—আপনার মনে পড়তে পারে।

হাত নেড়ে জননেতা বললেন, পরে, পরে।

স্যার, খুব আর্জেন্ট এবং গোপন কথা আছে আপনার সঙ্গে।

আহা, পরে। বলেছি তো বিজয়কে, চেষ্টা করছি।

ততক্ষণে আমি গিয়ে সামনের একটা খালি চেয়ারে বসে পড়েছি।... স্যার, আমি একটা ভীষণ—সাংঘাতিক খবর নিয়ে এসেছি আপনার কাছে। এঁদের একটু বাইরে যেতে বলুন। প্লিজ! বেশি সময় নেব না। মাত্র একটা মিনিট।

বাইরে দেখা সেই খেঁকুটে চেহারার স্নেহপ্রবণ লোকটি দৌড়ে এসে আমার কাঁধ টানল। জননেতা ভুরু কুঁচকে মুখ তেতো করে তাকিয়ে আছেন। স্নেহদাতা আমাকে ওঠাতে না পেরে ডাকতে লাগল, সোনা! সোনা! এদিকে একবার এস তো!

সেই তাগড়াই জোয়ানকে ঢুকতে দেখলাম পাশের অন্য একটা দরজা দিয়ে। আমি আর্তনাদের সুরে বললাম, শচীন সম্পর্কে একটা সাংঘাতিক গোপন খবর আপনাকে দিতে এসেছি স্যার! এটা আপনার শোনা দরকার।

তখন জননেতা একটু নরম হলেন যেন। হাত নেড়ে প্রহরীদের চলে যেতে ইশারা করলেন। তারপর আমার পাশের দুজনকে বললেন, ঠিক আছে। বিকেলে মিউনিসিপ্যাল হলে দেখা হবে। ট্যাংকের মাঠে না করে বরং দেখি যদি ব্যারাক গ্রাউন্ডে করা যায়। লোক হবে মনে হচ্ছে—কাল যা দেখলাম। হবে না?

খুব হবে। লাখ লাখ লোক হবে। বলে দুজনে বেরিয়ে গেল। আমার দিকে রাগী চোখে তাকিয়েই গেল।

শচীনের জন্য শোকসভা হবে, স্যার?

আমার কথা শুনে নাগু মিত্তির কেন যেন একটু হাসলেন। তারপর তক্ষুনি গম্ভীর হয়ে বললেন, বল।

ঢোক গিলে বললাম, শচীন বোসকে কাল সকালে গির্জার সিমেট্রিতে আমিই খুন করেছি।

নাগু মিত্তিরের চোখে পলক পড়ল না। মুখের রেখা একটুও বদলাল না। শুধু বললেন, হুঁ! তারপর?

সত্যি বলছি—বিশ্বাস করুন। সিমেট্রিতে আমাকে সে স্ট্যাব করতে আসছিল, তখন ওর মুখে ইট মেরেছিলাম। দুবার দুটো প্রকাণ্ড ইটের চাঙড় খেয়ে শচীন চিত হয়ে কবরের ওপর পড়ে গিয়েছিল। ভুরুর নিচে নাকের গোড়াটা থেঁতলে মগজ বেরিয়ে গিয়েছিল।

কালো চৌধুরী তোমাকে পাঠিয়েছে?

অবাক হয়ে বললাম, কালো চৌধুরী? না—না। আমি নিজে থেকেই এসেছি।

নাগু মিত্তির মিটিমিটি হেসে সুন্দর টানা-টানা চোখে তাকিয়ে বললেন, বাড়ি যাও।

স্যার, খামোকা হাঙ্গামা খুনোখুনি হবে বলেই আমি সত্যি কথাটা আপনার কাছে বলতে এসেছি। আমার তো বিবেক আছে, স্যার! বিবেকের তাগিদেই ছুটে এসেছি আপনার কাছে। কেন মিছিমিছি আগুন জ্বলবে, নির্দোষ কিছু ছেলের প্রাণ যাবে।

বাড়ি যাও।

অখিল মাস্টারমশাইয়ের মেয়ে মহুয়ার জন্য শচীন আমাকে স্ট্যাব করতে আসছিল। আমি নেহাত প্রাণের ভয়ে—আপনি বিশ্বাস করুন, শুধু আত্মরক্ষার জন্য ওর মুখে ইট মেরে ওকে ঠেকাতে চেয়েছিলাম।

জননেতা বাঁকা হেসে বললেন, ভাল ছেলের মত বাড়ি চলে যাও। গিয়ে বিজয়কে বল, আর কিছুদিন পরে তোমার একটা যাহোক কিছু ব্যবস্থা করে ফেলব।

বিশ্বাস করলেন না স্যার?

রাস্তায় দাঁড়িয়ে বল গে না, দেখবে বাচ্চারা ঢিল ছুঁড়বে।

আমি না জেনে মউকে বিয়ে করতে চেয়েছিলাম বলে শচীন আমাকে—

জননেতা রেগে গেলেন। আমার কথা থামিয়ে টেবিল চাপড়ে বললেন, খুব হয়েছে। এবার ওঠ।

আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালাম। ভাঙা গলায় বললাম, কিন্তু আমি সত্যি শচীনকে মেরেছি। ও একেবারে মরে যাবে ভাবিনি। আসলে ও তখন মাতাল অবস্থায় ছিল। তাছাড়া দিনের পর দিন, রাতের পর রাত ঠিকমত খাওয়াদাওয়া হয়নি। পুলিশের ভয়ে লুকিয়ে থেকেছে। সবসময় আতঙ্ক আর উদ্বেগে অস্থির থেকেছে। ওর শরীরে শুধু হাড় কখানা মাত্র অবশিষ্ট ছিল। আমি কেন, একটা বাচ্চাও ওকে মেরে ফেলতে পারত। বলুন, পারত কি না? আপনি চুপ করে থাকবেন না স্যার, বলুন!

জননেতা সুন্দর চোখ দুটো ফাঁক করে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। আমি টেবিলের ওপর ওঁর দিকে ঝুঁকে আবার ফ্যাঁসফেঁসে গলায় বলুন বললে উনি এবার হাসলেন। ... আহা, সেজন্যই তো কালোর ছেলেরা ওকে খতম করতে পেরেছে। নইলে কি পারত ভেবেছ?

দেখলাম উনি আমার কথায় কান দিতে রাজি নন। তখন আমিও ওঁর কথায় কান দিলাম না। আসলে আমার চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসছিল। উত্তেজনায় উঠে দাঁড়িয়ে টেবিল আঁকড়ে ধরে বললাম, শচীন বলছিল—আপনার সঙ্গে মিটমাট হয়ে গেলে সে ফ্রি ম্যান হয়ে যাবে। তখন সে বঙ্কুবাবুর লালবাড়ি ভাড়া করে ম্যারাপ বেঁধে নহবত বাজিয়ে—

জননেতা হাঁক দিলেন, খোদাবক্স! সেই পাজামা-পাঞ্জাবি-জহরকোট-হলুদ শাল পরা খেঁকুটে লোকটি ছুটে এল। জননেতা বললেন, একে চেন? আচায্যিপাড়ার বিজয়ের ভাই।

খোদাবক্স দাঁত বের করে বলল, খুব চিনি, খুব চিনি।

আমি যেখানে থেমেছিলাম, সেখান থেকে শুরু করলাম। ... ম্যারাপ বেঁধে নহবত বাজিয়ে সবাইকে নেমন্তন্ন করে তবে মউকে ঘরে তুলবে। আমি তাকে মেরে ফেললাম। মউ বিধবা হয়ে গেল স্যার! সবাই দেখল শচীনের মড়ার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সে কাঁদছে। অথচ এই মউকে কিছু না জেনে অখিলস্যার আমার হাতে তুলে দিতে চেয়েছিলেন। আমাকে আগুন ছুঁইয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়েছিলেন। এমন কী লিখিতভাবে—সোয়েটারের ভেতর হাত চালিয়ে শার্টের বুকপকেট থেকে অখিলস্যারের চোতা বের করতে করতে বললাম, দেখাচ্ছি স্যার অথরিটি লেটারখানা। তাহলেই আপনার বিশ্বাস হবে। খোদাবক্সদা, আপনিও দেখুন।

খোদাবক্স এবং জননেতার মধ্যে চোখে-চোখে কিছু কথা হয়ে থাকতেও পারে। খোদাবক্স আমার ঘাড়ে হাত রেখে ঠেলতে ঠেলতে এবং আদর দিতে দিতে পাশের ঘরে নিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যের গন্ধ ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার ওপর। এ ঘরেই প্রথম উঁকি দিয়েছিলাম। মেঝেয় সতরঞ্চি বিছিয়ে একদঙ্গল নানা বয়সের লোক বসে আছে। দুটো টেবিল জোড়া দেওয়া এবং চারদিকে অনেকগুলো চেয়ার সাজানো। এসব চেয়ার যে কোনও ডেকরেটারের ঘর থেকে আনা, তাতে সন্দেহ নেই। হলুদ রঙের ছোট-ছোট ফোল্ডিং চেয়ার। কোনার দিকে প্রকাণ্ড সব প্লাস্টিকের বালতিতে বোঁদে, রসগোল্লা বোঝাই হয়ে আছে। বড়-বড় দুই ঝুড়িভর্তি লুচি। টুলের ওপর শোঁ শোঁ করে স্টোভ জ্বলছে। তার ওপর বিশাল কেটলিতে চা ফুটছে। খোদাবক্স আমাকে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে বলল, ন্যাপা, ভাইটিকে মিষ্টিমুখ করাও।

লুচিবোঁদের সুঘ্রাণে আমি একটু চঞ্চল হলাম। টেবিলে এঁটো শালপাতা এখনও পড়ে আছে। কিন্তু কিসের এই মিষ্টিমুখ, কেন এই ভোজের আয়োজন! ওপাশের একটা ঘরে তরকারির পাহাড় ঘিরে আরও কিছু লোক বসে আছে। তারা বেগুন কাটছে। কপি কুচোচ্ছে। খোদাবক্স তাড়া দিচ্ছিল, অ্যাই ন্যাপা!

ইতিমধ্যে সেই তাগড়াই জোয়ান লোকটা দুজনকে নিয়ে এসে খাওয়ার টেবিলের দিকে ঠেলে দিল। ন্যাপা শালপাতা ছিঁড়তে লাগল। আবার ভাবলাম, কেন এইসব খাওয়াদাওয়ার দানছত্র, বন্‌ধ, খুনের বদলা খুন, এবং বীর শহিদ হয়ে ওঠে গলাকাটা শচীন বোস, এবং কালো চৌধুরীর ছেলেদের হাতেই তার মারাপড়াটা হয়ে ওঠে খুব প্রয়োজনীয় ঘটনা?

পুঁটু শচীনকে মারলে বন্‌ধ ডাকা যায় না, মিছিল হয় না, ভাঙচুর হয় না, শোকসভা করা যায় না, কালো চৌধুরীদের টিট করা যায় না, এবং ভোট-ফোটে জেতা যায় না।

শচীনের মৃত্যুটা ভারি জরুরি ছিল। তাগড়াই জোয়ান আবার একজনকে টেবিলের সামনে রেখে গেল। ও কি রাস্তা থেকে লোক ধরে আনছে? ন্যাপা আপনমনে শালপাতা ছিঁড়ে পাত সাজাচ্ছে। মাটির

ভাঁড়ে জল রেখে গেল একটা হাফপেন্টুলপরা ছেলে। বোঁদে লুচি আর রসগোল্লার সুঘ্রাণে ঘরের ভেতরটা রোঁয়া ফুলিয়ে বেড়ালের মত গরগর করছে। আমার জিভে ক্রমাগত লালা আসছে। বাইরে বন্‌ধ-তদারককারী একটা দল ফিরে এল ওই। গেটের সামনে রিকশয় পতাকা আর ফেস্টুন। 'খুনকা বদলা খুন!' ... 'শহর বন্‌ধ!' 'বীর শহিদ খোকাদা, তোমাকে আমরা ভুলছি না—ভুলব না।' ...

তারপর ওরা চিক্কুর ছাড়ল, 'নগেন মিত্র জিন্দাবাদ/' ...'জনগণের নেতা নগেন মিত্র!' ...জগঝম্প বাজনার মত তালে তালে 'জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ' ... 'শচীন বোস জিন্দাবাদ!' ... 'খুনিদের কালো হাত—ভেঙে দাও, গুঁড়িয়ে দাও।' তাগড়াই জোয়ান দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করল, সেন্ট পার্সেন্টি বন্‌ধ! সাকসেসফুল বন্‌ধ।

ন্যাপা বলল, খাবেন না দাদা! চলে যাচ্ছেন কেন? সে আর্তনাদের সুরে খোদাদা খোদাদা বলে ডাকতে লাগল। তার ওপর খাওয়ানোর ভার। কেউ রাগ করে না খেলে ঝক্কি পোহাতে হবে হয়ত তাকেই।

রাস্তায় নেমেছি যখন, তখনও পেছনে লুচিবোঁদে রসগোল্লার সুঘ্রাণ আমাকে তাড়া করে আসছে। তখনও ব্লটিংপেপারের মত জিভ লালা শুষছে।

কিন্তু জীবনের এই প্রথম খাদ্যকে আমার ঘৃণা। এই প্রথম আমি ভাবতে পারলাম, শালপাতার পাতে পরিবেশিত চারটে লুচি এক খাবলা বোঁদে আর দুটো এতটুকু-এতটুকু রসগোল্লা কেন নাগু মিস্তিরের মুখে—ঠিক যেমন করে শচীনের মুখে ইটের চাবড়া মেরেছিলাম, তেমনি করে ছুঁড়ে মেরে এলাম না? ...

জরাজীর্ণ কালো দোতলা একলা-পড়ে-যাওয়া বাড়িটার দিকে যত এগিয়ে যাচ্ছিলাম, তত মনে হচ্ছিল পড়ন্ত শীতের এই মেঘলা দিন চারপাশে হাত বাড়িয়ে জীবনের সব চিহ্ন মুছে দিচ্ছে। গাছপালার সবুজ রঙটা আর সবুজ থাকছে না। ধোঁয়াটে, বিবর্ণ, ঝিমধরা আলোয় যেন চতুর্থ হিমযুগের আভাস। পায়ে চলা রাস্তায় পৌঁছুতে না পৌঁছুতে টিপটিপিয়ে বৃষ্টি পড়তে থাকল।

বিস্তৃত তুষারের ওপর অসংখ্য গাছের কংকাল। একটা রুগ্‌ণ দলছুট নেকড়ে ধুঁকে ধুঁকে এগিয়ে চলেছে অখিলস্যারের বাড়ির দিকে। তার চোখে চোরের চাউনি। বহু দূরে একটা মৃতদেহ ঘিরে একপাল নেকড়ে গর্জন করছে 'খুন কা বদলা খুন!'

বৃষ্টিটা বাড়ছিল। গেট খুলে চেঁচিয়ে ডাকলাম, স্যার! স্যার!

ওপরের জানালায় মউয়ের মুখ দেখলাম। মুখটা সরে গেল। দৌড়ে গিয়ে বারান্দায় উঠলাম। জানি না, মউয়ের মুখে কী দেখলাম। হয়ত এখন সব মুখেই হিমের সাদা রঙ মাখা। সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে আমি অখিলস্যারের মতই বুড়ো হয়ে গেলাম বুঝি। দরজার সামনে গিয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে বললাম, স্যার! আমি জয়।

ঘরের ভেতর আবছা আঁধার জমে আছে। অখিলস্যার চিত হয়ে শুয়ে আছেন। তাঁর গায়ে লেপ। পায়ের কাছে বসে আছে মউ। নিচে একটা গামলায় ঘুঁটের আগুন। ছেঁড়া কম্বলের টুকরো মুঠো করে অখিলস্যারের পায়ের তলায় সেঁক দিচ্ছে সে। বললাম, স্যারের কী হয়েছে, মউ?

মউ জবাব দিল না। অখিলবন্ধু চোখ খুলে বললেন, কেদার?

আমি জয়, স্যার!

ও। বলে একটু চুপ করে থাকার পর অখিলবন্ধু ফের বললেন, বস।

আপনি অসুস্থ, স্যার?

অখিলবন্ধু আস্তে বললেন, সকাল থেকে পা দুটো খালি জমে যাচ্ছে যেন।

একটু পরে খুক খুক করে কেশে বললাম, মউকে আমি একটা কথা বলতে এসেছি স্যার!

অখিলবন্ধু বললেন, বেশ তো।

মউ! আমি ডাকলাম। মউ আমার দিকে তাকাল। তাকিয়েই আবার নিচে-রাখা আগুনের গামলার দিকে ঝুঁকে রইল। বললাম, কথাটা আমি স্যারের সামনেই বলতে চাই। স্যারের শোনা দরকার। মউ, সেদিন ভোরে স্যার আমাকে যখন শ্মশানের ওখানে মন্দিরতলায় নিয়ে যান, উনি বা আমি কেউ

জানতাম না শচীনের সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়ে গেছে। জানলে আগুন ছুঁয়ে আমাকে প্রতিজ্ঞা করতে হত না কিংবা স্যার তোমাকে আমার হাতে সম্প্রদান করতে চাইতেন না। স্যার বারবার আমাকে বলেছেন, পিতা যাকে কন্যা সম্প্রদান করেন, সে-ই কন্যার স্বামী। না, না—তুমি অমন করে তাকিও না মউ! আমার কথা শোন।

অখিলস্যার বললেন, বল! বলুক জয়। মউ, শোন জয় কী বলছে।

মউ মুখ নামিয়ে বাবার পায়ে সেঁক দিতে থাকল। আর তার হাতে সেই বালাদুটোও নেই, কানও খালি। চুলের গোছা যেমনতেমন করে ঘাড়ের ওপর আটকান। বললাম, আমার একটা বিবেক হয়ত আছে, মউ। ছোটখাট হোক, ন্যালাভোলা হোক, মনে হয় আছে। তা না হলে আমি নাগু মিস্তিরের কাছে ছুটে যেতাম না। ওরা শহরে বন্‌ধ ডেকেছে। ওরা খুনের বদলে খুন চাইছে। ওরা শচীনকে বীর শহিদ করে ফেলেছে। কাল সন্ধ্যায় ওরা ট্যাঙ্ক রোডে আগুন জ্বালিয়ে ভাঙচুর করে শোধ নেবার ছল করেছে। তুমি কি ভাবছ এসব সত্যি? মনে করছ কি ওদের এই রাগ, এসব খ্যাপামি—এই বন্‌ধ, শোকমিছিল, শোকসভা—এগুলো শচীনের জন্য, শচীনকে ভালবাসত বলে! ডাহা মিথ্যা, মউ। নাগু মিস্তির শচীনকে বাঁচিয়ে রাখতে চায়নি। শচীনকে সে সামলাতে পারছিল না, বলেই তাকে ভাগিয়ে দিয়েছিল। নাগু মিস্তিরের অবস্থা হয়েছিল ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের মত। তাই সে এখন খুশি। এক ঢিলে দুই পাখি মারা পড়েছে বলেই সে ভীষণ আনন্দে অস্থির। তার বাড়িতে আজ মস্ত ভোজ দিয়েছে।

মউ ঠোঁট কামড়ে ধরেছিল। দাঁতের ফাঁকে হিসহিস করে বলল, কী বলতে চাইছ তুমি?

বলতে চাইছি যে, নাগু মিস্তিরকে এই সুযোগটা দিয়েছি আমি। আমার গলা ভেঙে গেল একবার। দম আটকে এল। বললাম, তোমাকে ডেকেছিল শচীন। তুমি গেলে না। তুমি যদি ওর কাছে যেতে, হয়ত এসব কিছু ঘটত না। আমি সরলমনে তোমাকে ডাকতে এসেছিলাম। তুমি এমন ভান করলে যেন সব মিথ্যা—আমারই বানানো।

অখিলস্যার বললেন, বোকা! নির্বোধ! গোঁয়ার! তা না হলে আমাকে এতটুকু আভাস অন্তত দিত।

দম নিয়ে বললাম, তার ফলে সব উল্টো হয়ে গেল। সত্যকে স্বীকার করার সাহস তোমার তখন ছিল না, মউ! তাই তুমি যখন গেলে না, আমাকেই যেতে হল—হয়ত একটা চরম বোঝাপড়া করতেই আবার শচীনের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। সে আমাকে কুৎসিত ব্যঙ্গবিদ্রূপ করতে লাগল নেশার ঘোরে। তারপর ছুরি বের করল। জঘন্য ভাষায় গালি দিতে দিতে সে তাড়া করল আমাকে। নিছক আত্মরক্ষার জন্য যতটা নয়, অপমানবোধের জন্যই—তাছাড়া চরম বোঝাপড়া করারও দরকার ছিল, আমি তার মুখে কংক্রিটের চাঙড় ছুড়ে মারলাম। শচীন চিত হয়ে পড়ে গেল। আবার একটা কংক্রিটের চাঙড় তুলে মারলাম ওর মুখে। ওর নাকের ওপরটা ফেটে ঘিলু বেরিয়ে গেল। তাই দেখে আমি ভয় পেয়ে পালিয়ে গেলাম।

ঘরের ভেতর ঠাণ্ডাহিম স্তব্ধতা। বাইরে বৃষ্টির টিপ টিপ শব্দও সেই স্তব্ধতার গায়ে সেঁটে যাচ্ছে রেখাচিত্রের মত। আমি মউয়ের দিকে তাকিয়ে কথা বলছিলাম। তার মুখের একটা পাশ দেখা যাচ্ছিল। ঠোঁট কামড়ানো। হাত বন্ধ। কম্বলের টুকরোটা হাতে থেমে আছে। পায়ের নিচে মেঝেয়-রাখা গামলার ঘুঁটের আগুন লাল রঙটা খুইয়ে ফেলেছে। ঘুরে অখিলস্যারের দিকে তাকালাম। ঘোলাটে চোখের পাতা ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। চোখে চোখ পড়তেই মনে হল এ চোখ আমার চেনা অখিলস্যারের নয়। ওই মুখটাও নয় সেই চেনা মুখ। আমার বর্ণনার বীভৎসতা লেপ্টে আছে ওই চোখে আর মুখে। হয়ত অমন করে বর্ণনাটা না দিলেও পারতাম। অথচ নিজেকে সংযত করতে পারছিলাম না। একটা চাপা ক্রূরতা আমাকে পেয়ে বসেছিল। ঘিলু বেরিয়ে যাওয়ার খবরটা দিয়ে সেই ক্রূরতা এখন পিছু হটেছে। এই ভয়ঙ্কর নৈশব্দের দিকে আমাকে ঠেলে দিয়ে সরে গেছে।

ভাঙা ছ্যাতরান গলায় ডাকলাম, মউ!

মউ চুপ করে রইল। তখন ডাকলাম, স্যার!

অখিলবন্ধু গলার ভেতর বললেন, কী!

আপনারা কেউ একটা কিছু বলুন! আপনারা চুপ করে আছেন কেন! নাগু মিস্তিরকে বলতে গেলাম। সে আমাকে পাত্তা দিল না। কারণ আমি শচীনকে মারলে তার বন্‌ধ ডাকা হয় না। মিছিল হয়

না। শোকসভা হয় না। কালোবরণ চৌধুরীর দলকে টিট করা যায় না। কিন্তু আপনারা—আপনি বা মউ কেউই কি আমাকে পাত্তা দেবেন না? বিশ্বাস করবেন না আমার কথা?

অখিলবন্ধুর চোখদুটো জ্বলে উঠল দাউদাউ করে। ...কী বলব, জয়? যদি সত্যি তাই করে থাক, তাহলে কেন বলতে এলে এখানে? তুমি নিজের বীরত্ব দেখাতে এসেছ? বড়াই করতে এসেছ গায়ের জোরের! ইশ! বড় বীর তুমি।

স্যার, আমার কথাটা শুনুন।

শুনেছি। এসব বলে তুমি ঠিক করনি। তোমার কথায় আমার মেয়ে ভয় পাবে না।

ভীষণ অবাক হয়ে বললাম, এ আপনি কী বলছেন? আমি এসেছি পাপ স্বীকার করতে। মউয়ের কাছে ক্ষমা চাইতে।

অখিলবন্ধু দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বললেন, ক্ষমা গাছের ফল! পেড়ে দেবে তোমাকে! উল্টে তোমার পেছনে কেদারকে লেলিয়ে দেবে। প্রাণে বাঁচতে চাও তো কেটে পড়। মউ, থাক। আর সেঁক দিতে হবে না। লেপ ঢেকে দে মা! আমার সারা শরীর জ্বলছে।

মউ ওঁর পা'দুটো ঢেকে দিল। তারপর চুপচাপ আঁচলের খুঁটে আগুনের গামলাটা ধরে সেটাকে ওঠাল এবং ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সিঁড়িতে তার পায়ের শব্দ তলিয়ে যেতে থাকল ক্রমশ। হয়ত সে খুব ধীরে নেমে যাচ্ছিল। অখিলবন্ধুর দিকে ঘুরে আস্তে ডাকলাম, স্যার!

অখিলস্যার পাশ ফিরে বললেন, নরহত্যা পাপ। তুমি নরঘাতক। নরকেও তোমার ঠাঁই হবে না। সারাজীবন এর প্রায়শ্চিত্ত করলেও তুমি মুক্তি পাবে না।

জানি স্যার! আমি জানি—

অখিলস্যার মুখটা ঘুরিয়ে বিষদৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, কচু জান তুমি। জান তুমি কী করেছ? শুধু হতভাগিনী মেয়েটাকেই স্বামীহারা করনি, তার পেটের বাচ্চাটাকেও বাবা-হারা করেছ।

আমার সারা শরীর ঝাঁকুনি দিয়ে হিমশীতল এক ধস নেমে গেল। মুখ দিয়ে কথা বেরুল না। মুখ নামিয়ে বসে রইলাম।

কিছুক্ষণ পরে অখিলবন্ধু আবার পাশ ফিরে আমাকে দেখতে পেলেন। ...এখনও বসে আছ কেন? কেদার ভোলাডাক্তারকে ডাকতে গেছে। বৃষ্টির জন্য দেরি হচ্ছে। কেদার এসে যদি জানতে পারে কী হবে জান মূর্খ? তোমারও ঘিলু বের করে এই জঙ্গুলে মাটিতে পুঁতে ফেলবে। কাকপক্ষীটিও টের পাবে না।

উঠে দুপা এগিয়েছি, অখিলস্যার ফিসফিস করে ডাকলেন, শোন! তোমাকে যে কাগজটা দিয়েছিলাম, কী করেছ?

পকেটেই আছে।

হাত বাড়িয়ে বললেন, ফেরত দিয়ে দাও।

অথরিটি লেটার ফেরত পেয়ে সেটা কুচিকুচি ছিঁড়ে খাটের তলায় দলা পাকিয়ে ফেলে দিলেন অখিলবন্ধু। তারপর হাত নেড়ে চলে যেতে ইশারা করে বললেন, যদি এদফা বেঁচে যাই, গোপনে দেখাসাক্ষাতের চান্স আছে। না হলে এই শেষ দেখা।

বলেই ঝটপট লেপ টেনে গুহার ভেতরে চলে গেলেন। ওঁর লেপঢাকা পা ছুঁয়ে প্রণাম করলাম। হয়ত টের পেলেন না। পেলেও এটা আশীর্বাদের সময় নয়। এ অভিশাপের দুঃসময়। অভিশাপ দেওয়া থেকে নিষ্কৃতি পেতেই বুঝি আত্মগোপন করলেন।

দরজার কাছে গেলে মউয়ের সঙ্গে দেখা হল। সে দ্রুত পাশের ঘরে ঢুকে দড়াম করে কপাট বন্ধ করে দিল। শব্দটা আমার মুখে এসে লাগল। আমার ঠাণ্ডাহিম মুখের ওপর মউয়ের ঘৃণা হিংস্র নখের আঁচড়ে মাথার ঘিলু খুবলে তুলতে থাকল। যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে সিঁড়ি বেয়ে টাল খেতে খেতে নেমে গেলাম। ...

অরূপ রতন

বসন্তপুর হল্ট থেকে পশ্চিমে ক্রোশ দুই গেলে মাঝারি আয়তনের একটি নদী পড়ে। নদীর নাম করালী। করালীর ওপারে কিছুদূর বিস্তৃত এক বনভূমি। তার ভেতর দেবী করালীর জীর্ণ প্রাচীন মন্দির। একসময় এই মন্দিরের চারপাশ ঘিরে পাঁচিল এবং ধর্মশালাও ছিল। কালক্রমে পাঁচিল ভেঙে পড়েছে। ধর্মশালার অবস্থাও তদ্রূপ। মেঝেয় ফাটল ধরেছে। ফাটলের ভেতর দিয়ে পেছনের বটগাছের শেকড় বাকড় এগিয়ে এসেছে। যেন মহাকাল তার নৈসর্গিক পাঞ্জায় মনুষ্যসৃষ্ট এক রম্যনিকেতনকে বেশি মাত্রায় শাসন করতে গিয়ে তাকে ধ্বংস করেই ফেলেছেন প্রায়।

বাংলা ১৩২২ সালের বৈশাখী পূর্ণিমার রাতে বাঁকা-শ্রীরামপুরের মথুরামোহন তাঁর মেয়ে কনককে নিয়ে করালীর মন্দিরে পুজো দিতে গিয়েছিলেন। মথুরামোহন ততকিছু পয়সাওলা মানুষ ছিলেন না। জমিদারী সেরেস্তায় নিছক হিসাবরক্ষকের কাজ করতেন। তাঁর পদটিকে বলা হত সেরেস্তাদার। মাসে সাড়ে সাত টাকা বেতন। সেরেস্তায় সার্বিকভাবে যে উপরি আয়ের গোপন চক্র ছিল, সেখান থেকে মাঝে-মধ্যে তাঁর ফতুয়ার পকেটে দুচারপয়সা নেহাত মুখচাপা দিতেই গুঁজে দেওয়া হত। সরল মানুষ মথুরামোহন নীতিবোধ সত্ত্বেও মুখ বুজে এই উপরি নিতেন। না নিয়ে উপায়ও ছিল না। কিন্তু পাপভয়ে সেই বাড়তি রোজগারের সবটাই নানাভাবে দান করে ফেলতেন। এই অভ্যাসের ফলে তাঁর বৈষয়িক অবস্থার উন্নতি ঘটেনি। এমন কী একালের মধ্যবিত্ত চাকুরেদের মত মাঝেমাঝে তিনি প্রচণ্ড অর্থাভাবে পড়তেন। করালীর মন্দিরে যাবার সময় তাঁর ওইরকম দৈন্যদশা চলছিল।

তাই বসন্তপুর হল্টে নেমে গরুর গাড়ি ভাড়া করার সামর্থ্য সেদিন তাঁর ছিল না। চোদ্দবছর বয়সের মেয়ে কনকের একটি পা জন্মাবধি বিকল। ওই বিকলাঙ্গ মেয়েকে দুক্রোশ দূরত্ব পেরিয়ে করালীর মন্দিরে নিয়ে যাওয়া বস্তুত কঠিন কর্ম। কিন্তু মথুরামোহনের শারীরিক সামর্থ্য ছিল প্রচুর। কনক একটি লাঠির সাহায্যে কিছুটা চলাফেরা করতে পারত। সেও বড়জোর বাড়ির সীমানার মধ্যে। করালীর মন্দিরে যাবার রাস্তায় কয়েক পা এগিয়ে সে ক্লান্ত হয়ে পড়ছিল। তখন মথুরামোহন মেয়েকে কাঁধে তুলে নিচ্ছিলেন। এই রাস্তায় এমন দৃশ্য নতুন কিছু ছিল না।

করালী নদীতে চৈত্রের গোড়ার দিকে চড়া পড়ে যায়। সোনালী বালির ভাঁজে ভাঁজে ঝিলমিল করে ক্ষীণ জলের ধারা বয়। বৈশাখী পূর্ণিমার দিন বাবা ও মেয়ে করালী নদীতে সেটুকু জলও দেখতে পেল না। তাদের তৃষ্ণা পেয়েছিল। নদী পেরিয়ে বনভূমির ভেতর সামান্য কিছুটা এগিয়ে যখন মন্দির দেখা গেল, তখন কনক মৃদুভাবে 'জল' শব্দটা উচ্চারণ করল।

মথুরামোহন শান্তভাবে হেসে বললেন, 'এখনই জল পেয়ে যাবি, মা। একটুখানি ধৈর্য ধর। প্রাঙ্গণে ইঁদারা আছে।'

ততক্ষণে বনভূমির ভেতর এই মন্দিরে শেষ বেলার ধূসরতা গাঢ় হয়েছে। ভাঙা তোরণের দুপাশে ইটের স্তূপে ক্ষয়াখর্বুটে গুল্ম জন্মেছে। মাথার ওপর বিশাল সব গাছের ডালপালা আর পুরু পাতার ছাউনি আকাশকে আড়াল করেছে। চারপাশে গভীর কোন অন্তরাল থেকে পাখিদের কলরব শোনা যাচ্ছে। হঠাৎ কখন বাতাস থেমে গেছে মথুরামোহন লক্ষ্য করেননি। পাখিদের ওই তুমুল অথচ চাপা চিৎকারও যেন একটা গুমোট স্তব্ধতারই অংশ হয়ে উঠেছে। নির্জন মন্দির প্রাঙ্গণে কনককে নামিয়ে রেখে মথুরামোহন একটু কেসে সাড়া দিলেন। তারপর ইঁদারার দিকে এগিয়ে গেলেন। ইঁদারার গোড়াটা গোল করে কালোপাথরে বাঁধানো। পাথর মসৃণ হয়ে আছে। একপাশে দড়ি ও বালতি যত্ন

করে রাখা আছে। বালতি নামাবার সময় মথুরামোহন মুখ ঘুরিয়ে দেখলেন, কনক তার লাঠির সাহায্যে একপা-একপা করে এগিয়ে আসছে। তার সুন্দর মুখে তৃষ্ণার রেখা ফুটে রয়েছে।

মথুরামোহন ইঁদারার ভেতর ঝুঁকে জল দেখার চেষ্টা করলেন। বালতিটা যেন অনন্তকাল ধরে নেমে চলেছে। এইসময় তিনি হঠাৎ একটা দুর্গন্ধ টের পেলেন। ইঁদারার ওপরে অবশ্য খানিকটা জায়গা ফাঁকা এবং আকাশ দেখা যাচ্ছে। তাই ইঁদারার তলায় মলিন কাচের মতো মসৃণ অর্ধবৃত্তাকার বস্তুটি যে জল, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু দুর্গন্ধটা কি জল থেকেই ভেসে আসছে? মথুরামোহন বিরক্ত হলেন। মন্দিরের একজন সেবায়েত আছেন। পাশের একটা গ্রামে তাঁর বাড়ি। এই মন্দিরের দেবোত্তর সম্পত্তি তিনিই ভোগদখল করেন। তাঁর কি উচিত নয় ইঁদারাটা পরিষ্কার রাখা? বিশেষ করে আজ বৈশাখী পূর্ণিমার দিনটা অনেক ভক্ত আসে এখানে। আগের মত ভিড় হয় না বটে, ধুমধামও কিছু হয় না—কালক্রমে যেন মা করালীর মাহাত্ম্য লোপ পেয়েছে, তাহলেও এরকম অব্যবস্থার কারণ কী?

বালতিকে জলস্পর্শ না করিয়ে মথুরামোহন এদিক-ওদিক তাকিয়ে সেবায়েতকে খুঁজলেন। শুনেছেন, বিশেষ তিথির দিনটা ছাড়া সেবায়েত সন্ধ্যার আগেই বাড়ি চলে যান, ফেরেন প্রত্যূষে। আজ বিশেষ তিথি। অথচ মন্দির সংলগ্ন ঘরের দরজা বন্ধ রয়েছে। ভারি আশ্চর্য তো!

মথুরামোহন মন্দিরের দিকে তাকালেন। মন্দিরের দরজা যথারীতি খোলা রয়েছে। মন্দিরের অবস্থাও জরাজীর্ণ। কতকাল সংস্কার করা হয়নি। চূড়ার ত্রিশূল হেলে রয়েছে। ফাটলে আগাছা গজিয়েছে। সামনের দেয়ালে জায়গায়-জায়গায় পলেস্তারা, বাকি সবটাই নোনাধরা ইটের থাক। দরজার সামনে উঁচু চত্বরটার অবস্থাও করুণ। তবে পরিষ্কার করার চিহ্ন রয়েছে। নিচের প্রাঙ্গণটাও পরিচ্ছন্ন। একদিকে শুকনো পাতা জড়ো করা আছে। মথুরামোহন মন্দিরের গর্ভবাসিনী দেবীর উদ্দেশে মনে মনে বললেন, 'ক্ষমা করো মা।'

কনক এগিয়ে এসে ইঁদারার ধারে পাথরের চত্বরে বসে ফের বলল, 'জল খাব, বাবা।'

মথুরামোহন উদ্বিগ্ন মুখে ইঁদারার ভেতর আবার ঝুঁকলেন। বালতিটা ছেড়ে দিলেন। দূরে গভীরে একটা শব্দ হল। যেন অন্য কোনো জগতের স্পন্দন ধ্বনিত হল। কিন্তু কী দুর্গন্ধ! মথুরামোহন ক্ষুণ্ণমনে মুখ তুলে মেয়ের উদ্দেশে বললেন, 'তাই তো কনক! বড় বিপদে পড়া গেল দেখছি।'

কনক অস্ফুটস্বরে প্রশ্ন করল, 'কেন বাবা? কী হয়েছে?'

'ইঁদারার জলটা বেজায় দুর্গন্ধ।'

বুদ্ধিমতী কনক একটু হাসবার চেষ্টা করে বলল, 'গাছের পাতা পড়েছে। সেই পচা পাতার গন্ধ।'

'না মা। খুব বিচ্ছিরি গন্ধটা। মনে হচ্ছে...' থেমে গেলেন মথুরামোহন। কথাটা বলতে বাধল। তিনি বলতে চাইলেন, জীবজন্তুর মড়ার পচা গন্ধের মতো কতকটা।

কনক শিশুর মতো জেদ করে বলল, 'হোক। ওই জলই খাব। আমার ভীষণ তেষ্টা পেয়েছে যে।'

মথুরামোহন বিব্রত বোধ করলেন। তাঁরও তেষ্টা পেয়েছে। মন্দিরে পৌঁছে জল খাবেন ভেবে বসন্তপুর হল্টে জল খাননি। কনকও খেতে চায়নি। ভুল হয়ে গেছে। মথুরামোহন আবার এদিক-ওদিক মুখ ঘুরিয়ে একটা কিছু হাতড়াচ্ছিলেন। হঠাৎ মাথায় এল, সেবায়েতের ঘরে জল থাকা সম্ভব। জলের অভাবে কষ্ট হচ্ছে বলে তো মড়াপচা জল খাওয়া যায় না! নিশ্চয় ইঁদারার ভেতর কাঠবেড়ালী হোক, কিংবা এই জঙ্গলের কোনো প্রাণী হোক, দৈবাৎ পড়ে গিয়ে মারা গেছে।

মথুরামোহন দড়িটা ইঁদারার মুখে লোহার আংটায় বেঁধে রেখে সেবায়েতের ঘরের দিকে এগিয়ে গেলেন। কনক অবাক হয়ে বলল, 'কী হয়েছে বাবা? কোথায় চললে হঠাৎ?'

মথুরামোহন যেতে যেতে বললেন, 'আসছি।' তারপর সেবায়েতের ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে দেখলেন, দরজাটা ঠেকা দেওয়া আছে। তাহলে কি সেবায়েত নেশার ঘোরে সন্ধ্যা অব্দি নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছেন? মথুরামোহন বিনীতভাবে একটু কেসে ডাকলেন, 'ঠাকুর মশাই আছেন নাকি? ঠাকুর মশাই!'

কোন সাড়া এল না। বনভূমির অভ্যন্তরে ততক্ষণে আবছা আঁধার ঘনিয়েছে। পা বাড়িয়ে দরজায় টোকা দিতে গিয়ে সেই অস্পষ্ট আলোতে পায়ের সামনে কালো কয়েকটা ছোপ দেখতে পেলেন

মথুরামোহন। বুকের ভেতরটা ধড়াস করে উঠল। তাঁর ষষ্ঠেন্দ্রিয় জেগে উঠল যেন। এগুলো কি রক্ত? কিসের রক্ত?

হেঁট হয়ে ঝুঁকে দেখে মথুরামোহন স্থির জানলেন, রক্তই বটে। তাঁর সারা শরীর থরথর করে কেঁপে উঠল। কিন্তু তিনি মরিয়া হয়ে দরজা জোরে ঠেলে দিলেন। ঘরের ভেতরটা আঁধার হয়ে আছে। স্খলিত স্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন মথুরামোহন, 'ঠাকুরমশাই! ঠাকুরমশাই!'

কোনো সাড়া এল না। তখন মথুরামোহন ছুটে গেলেন কনকের কাছে। করালীর মন্দিরে রাত্রিযাপন করতে হবে বলে পুঁটুলির ভেতর যথেষ্ট চিঁড়ে গুড় এবং একখানা ছোট সতরঞ্চি এনেছেন। একটা ঘটি আর বেঁটে চৌকোনা কাচের লণ্ঠনও এনেছেন। লণ্ঠনে দুর্মূল্য কেরোসিন ভরা রয়েছে। সেরেস্তার নায়েব মশাইয়ের সম্পত্তি এটি। অনুগ্রহ করে দিয়েছেন সজ্জন সেরেস্তাদারকে। সে আমলে কেরোসিন দামের জন্য নয়, বিলাসিতার জিনিস হিসেবেই গণ্য হত পাড়াগাঁয়ে। অধিকাংশ বাড়িতেই রেড়ির তেলের পিদিম জ্বলত। কদাচিৎ কোনো-কোনো বাড়িতে কেরোসিনের কুপি বা লণ্ঠন। আসলে গ্রামের মানুষ বড় বেশি ঐতিহ্য অনুগত। প্রথা ভাঙতে চায় না সহজে। তাছাড়া সাধারণভাবে সৌখিনতার প্রতি প্রচ্ছন্ন নিন্দার বাঁকা দৃষ্টিও পড়ত। মথুরামোহন ঐতিহ্য-অনুগত সাধারণ গেরস্থহিসেবেই জীবনযাপন করতেন। এমন কী দেশলাই কাঠিও কদাচিৎ ব্যবহার করতেন। চকমকি-পাথর আর একটুকরো শোলা ছিল তাঁর প্রিয় জিনিস। মাঝে মাঝে হুঁকো এবং বিড়ি টানার নেশা ছিল। তাই চকমকি সঙ্গে রাখতেন। একটা কৌটোর ভেতর যত্ন করেই রাখতেন।

কনকের প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে ব্যস্তভাবে তিনি চকমকি ঠুকে শোলাটা ধরিয়ে নিলেন। তারপর শুকনো নারকোল ছোবড়ার গুটি বের করে ফুঁ দিয়ে ধরালেন। শোলাটা নিভিয়ে রেখে ফুঁ দিতে থাকলেন ছোবড়ার গুটিতে। সেই সঙ্গে কনককে ফরমাস করলেন, 'ঝটপট ওই পাতাগুলো কুড়িয়ে দে তো মা!'

কনক যেখানে বসে ছিল, সেখানে ইঁদারার চত্বরের নিচের খাঁজে শুকনো পাতা বাতাসের টানে উড়ে এসে জমে আছে প্রচুর। কনক ভাবল, বাবা ঠিকই করেছেন। লণ্ঠন জ্বালার সময় হয়েছে। সে পাতাগুলো হাত বাড়িয়ে কুড়িয়ে সামনে রাখল। তখন মথুরামোহন জ্বলন্ত ছোবড়ার গুটিটা পাতাগুলোর তলায় রেখে ফুঁ দিতে শুরু করলেন। একটু পরেই পাতাগুলো জ্বলে উঠল।

এইভাবে অনেক পরিশ্রমে যখন লণ্ঠনটা ধরেছে, তখন গাছপালার আড়ালে পূর্ণ চাঁদও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। গাছের ছাউনির ফাঁকে চাঁদটাকে দেখতে পেয়ে কনক চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। আনমনা হয়ে গেল কিছুক্ষণের জন্য। গ্রাম্য বালিকাদের এই স্বভাব। সে তেষ্টার কথা সাময়িকভাবে ভুলে গেল।

মথুরামোহন ততক্ষণে সেবায়েতের ঘরের ভেতর উঁকি মেরে আবার থরথর করে কাঁপছেন। ঘরের ভেতর আসবাবপত্র তেমন কিছু নেই। একটা খাটিয়া, আলনায় একটা গামছা আর ফতুয়া ঝুলছে। খাটিয়া এবং মেঝেয় চাপ-চাপ কালচে রক্ত।

সবচেয়ে ভয়ংকর লাগল মথুরামোহনের, জলের কুঁজোটা উল্টে পড়ে রয়েছে।

দৃষ্টি আরও স্বচ্ছ হলে এবার লক্ষ্য করলেন, একটা কোনা খুঁড়ে চুনসুরকি আর মাটির চাবড়া স্তূপ করে রেখেছে কারা।

মুহূর্তে বুঝলেন মথুরামোহন, গোপন ধনসম্পদের লোভেই ডাকাতরা সম্ভবত সেবায়েতকে খুন করে ইঁদারার ভেতর ফেলে দিয়েছে।

কনকের বুঝি গা ছমছম করছিল। গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে মৃদু হলুদ জ্যোৎস্না মন্দিরপ্রাঙ্গণকে চিত্রিত করেছে। সে অস্বস্তিতে বাবাকে ডাকছিল। সেই ডাকে মথুরামোহনের সম্বিৎ ফিরল। এতক্ষণে তিনি অনুমান করতে পারছেন, আজ বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে কেন করালীর মন্দির এমন জনশূন্য। যারা পুজো দিতে এসেছিল, সম্ভবত এ ঘটনা চাক্ষুষ করে তারা তৎক্ষণাৎ স্থানত্যাগ করেছে।

মথুরামোহন ভারি পায়ে মেয়ের কাছে ফিরে এসে শুধু বললেন, 'জল নেই।' কনক ভয় পাবে বলে অন্যকথা গোপন রাখলেন।

কিন্তু কাছে জল না থাকলে মানুষের তৃষ্ণা বেড়ে যায় আরও। কনক বারবার অস্ফুটস্বরে জল শব্দ উচ্চারণ করতে থাকল। আর মথুরামোহনেরও ওই ভীষণ দৃশ্য দেখে কণ্ঠতালু আরও শুষ্ক হয়েছে।

শরীর প্রায় বিধ্বস্ত। মাথা ঘুরছে। এ অবস্থায় কনককে কাঁধে তুলে দুক্রোশ পথ হেঁটে বসন্তপুর হল্টে পৌঁছানোর কথা চিন্তা করাও বাতুলতা। হঠাৎ মথুরামোহনের মনে পড়ে গেল, পুজো দেবার আগে ভক্তরা করালীর দহে নাকি স্নান করে আসে। এই মন্দিরের দেবীমাহাত্ম্য যাদের কাছে শুনেছিলেন, তারাই বলেছিল একথা।

মথুরামোহন বললেন, 'মা কনক! শুনেছি নদীতে কোথাও একটা দহ আছে। সেখানে জল থাকা স্বাভাবিক। চল্, আমরা সেটা খুঁজে দেখি।'

কনক বলল, 'ঘটি নিয়ে তুমি যাও বরং। আমি এখানে থাকছি।'

'সে কী! এখানে একা থাকতে তোর ভয় করবে না তো মা?'

কনক বলল, 'না। আমাকে কি কখনও ভয় পেতে দেখেছ?'

সেকথা ঠিক। মথুরামোহন তবু ইতস্তত করছিলেন। কনককে কিছু না জানিয়ে এই ভয়ংকর নির্জন স্থানে একা রেখে যাওয়া কি ঠিক হবে? কিন্তু কনকের তাগিদে শেষ পর্যন্ত তিনি লণ্ঠন ওর কাছে রেখে ঘটি নিয়ে চলে গেলেন। যাবার সময় সাবধান করে গেলেন, যদি সে ভয় পায়, ... যেন বাবাকে চিৎকার করে ডাকে।

জনহীন বনভূমি পূর্ণিমার চাঁদের জ্যোৎস্নায় ঝলমল করছিল। নদীতে পৌঁছে প্রথম মথুরামোহন গেলেন কিছুদূর উত্তরে। কিন্তু সর্বত্র বালির চড়া জ্যোৎস্নায় ধু ধু করছে। তখন ফিরলেন দক্ষিণে। বেশ কিছুদূর চলার পর বনভূমির অন্যপ্রান্তে ছোট একটা দহ সত্যি দেখতে পেলেন। দহের জলও প্রায় শুকিয়ে এসেছে। হাঁটু জলে দাঁড়িয়ে প্রাণভরে জলপান করলেন মথুরামোহন। কাঁধে মুখে জল ছেটালেন। তারপর আরও একটু এগিয়ে ঘটি ডুবিয়ে জল নিলেন।

শরীরের ক্লান্তি দূর হবার ফলে আতংকটাও অনেক হ্রাস পেল। সাহস এল মনে। বিড়বিড় করে মা করালীর নাম উচ্চারণ করতে করতে পাড়ে উঠলেন মথুরামোহন। বনের ভেতর দিয়ে মন্দির অনুমান করে দ্রুত হাঁটতে থাকলেন।

একটু পরে মন্দির দেখতে পেলেন। তখন কনককে আশ্বস্ত করার জন্য মথুরামোহন গলা চড়িয়ে বললেন, 'পেয়েছি মা! যাচ্ছি। তুমি ভয় করো না।'

গাছের ফাঁকে স্থানে-স্থানে যথেষ্ট চাঁদের আলো এসে পড়েছে। তার ফলে মোটামুটি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে সব কিছু। শুধু কোথাও কোথাও লতাগুল্মের স্তূপ কালো হয়ে আছে। সেই ভাঙা তোরণের সামনে পৌঁছে থমকে দাঁড়ালেন মথুরামোহন। লণ্ঠন দেখা যাচ্ছে না কেন? ডাকলেন, 'কনক! কনক!'

কিন্তু কোন সাড়া এল না। কনক কি তাহলে মন্দিরে মাকে প্রণাম করতে ঢুকেছে? মথুরামোহন ব্যস্তভাবে মন্দিরের দিকে ছুটে গেলেন। কিন্তু মন্দির অন্ধকার। ফের ডাকলেন, 'কনক! কনক! তুই কোথায় গেলি?'

নির্জন মন্দির, বন এবং জ্যোৎস্না প্রৌঢ় পিতার ব্যাকুল চিৎকারে কেঁপে-কেঁপে উঠতে থাকল। তবু কোন সাড়া এল না। মথুরামোহন উন্মাদের মতন প্রাঙ্গণে একবার এদিকে একবার সেদিকে ছোটাছুটি করে বেড়ালেন। ইঁদারার মধ্যে মুখ ঢুকিয়ে আর্তনাদ করে ডাকলেন, 'কনক! কনকলতা!' পুরোহিতের প্রেতাত্মা যেন গভীর, দুর্গন্ধ, কালো জলের ভেতর থেকে প্রতিধ্বনিতে সাড়া দিল, 'কনকলতা!' কনকলতা!'

কনককে কি তাহলে বাঘে ধরে নিয়ে গেছে? অসহায় মথুরামোহন বিভ্রান্ত পদক্ষেপে প্রাঙ্গণে নেমে আসতেই তাঁর পায়ে লণ্ঠনটা ঠেকল। লণ্ঠনের কাচ চূর্ণ। কেরোসিনের গন্ধ ছড়াচ্ছে। আর তার পাশেই তাঁর বৃহৎ পোঁটলাটি পড়ে রয়েছে।

মথুরামোহনের হাত থেকে এতক্ষণে জলপূর্ণ ঘটি সশব্দে পড়ে গেল। দুহাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে কাঁদতে সেখানেই উন্মূল গাছের মত আছড়ে পড়লেন প্রৌঢ় সেরেস্তাদার। 'মা করালী! এ তুমি কী করলে? এই উদ্দেশ্যেই তুমি কি আমাকে স্বপ্নে দর্শন দিয়েছিলে রাক্ষুসী?'

১৩২২ সালের বৈশাখী পূর্ণিমার রাত্রে জনহীন দেবীকরালীর মন্দিরপ্রাঙ্গণে বলিপ্রদত্ত প্রাণীর মত ধড়ফড় করতে থাকলেন বাঁকা-শ্রীরামপুরের হতভাগ্য মানুষ মথুরামোহন সেরেস্তাদার।

ভাইবোন

বাংলার শীত বড় মধুর। মানুষের জীবনের মূল তিনটে ব্যাপার আহার-নিদ্রা-মৈথুনের কথা ভাবলে বাংলার শীতের মত রোমাঞ্চকর ও উদ্দীপনাময় আর কোন ঋতু দেখা যায় না। সতেজ টাটকা সবজির এত বেশি আমদানি আর কোন সময় চোখে পড়বে না। মাছ-মাংসেরও স্বাদ যেন এ সময়টাতে সুমিষ্ট হয়ে ওঠে। গ্রামাঞ্চলে প্রধান শস্য ধান এসময়ই উৎপন্ন হয়। তার ফলে লোকের হাতে টাকা আসে। রাতের বেলা লেপ-কাঁথা মুড়ি দিয়ে ঘুমের আরামটাও কি কম? তাছাড়া অন্যান্য প্রাণীর যেমন একটা করে মৈথুনঋতু থাকে, মানুষের বেলায় সম্ভবত এর অন্যথা নেই। মানুষ এবং মানুষীর এই শীতে শারীরিক ঘনিষ্ঠতা কামনা খুবই স্বাভাবিক। কথায় বলে না মাঘ মাসে যার মাগ নেই সে যাক না শ্মশানঘাট?

রতু ডাক্তার শতদ্রুকে এসব তত্ত্ব শুনিয়েছিলেন। রতুবাবু সুরসিক মানুষ। শতদ্রুকে সম্পর্কে নাতি বিবেচনা করেন। বলেছিলেন, 'ভায়া! মেমসায়েবদের দেশ থেকে যখন একা ফিরতে পেরেছ, তখন বোঝা যাচ্ছে, তুমি খাঁটি সাত্ত্বিক ভারতীয়। অতএব ভারত-ঐতিহ্যমতে ঝটপট একটি স্ত্রী-সংগ্রহ কর। আমার সন্ধানে এ বস্তুটির অভাব নেই।'

বিকেলে শতদ্রু হাইওয়েতে বেড়াতে বেরিয়ে রতুডাক্তারের রসিকতা মনে পড়ায় হঠাৎ খুক খুক করে হেসে ফেলল।

তার বোন বিপাশা বলল, 'কী রে দাদা?'

শতদ্রু বলল, 'কিছু না! আচ্ছা বিয়াস, কাল সন্ধ্যায় তোর ঘরে একটি মেয়েকে দেখছিলুম, সে কে রে?'

বিপাশা শতদ্রুর মুখের দিকে তাকিয়ে সন্দিগ্ধভাবে বলল, 'ওকে তোর চোখে ধরেছে বুঝি?'

'ভ্যাট! চোখে ধরেছে কী বলছিস?' শতদ্রু সংকোচের সঙ্গে হাসল। 'চোখে পড়েছে বলতে পারিস!'

ওই একই কথা।' বিপাশা কিন্তু গম্ভীরভাবে বলল। 'ওর নাম রঙ্গনা। তুই যখন স্টেটসে গেলি তখন ও অ্যাতোটুকুন ছিল। তাই লক্ষ্য করিসনি। রঙ্গনার দিদি অপরূপা আমার ক্লাসফ্রেন্ড ছিল। রঙ্গনার সঙ্গে আমার বয়সের কত তফাত!'

'কত?'

'পাঁচের কম হবে না।' বিপাশা প্রশ্ন করল। 'কিন্তু কেন ওর কথা জিগ্যেস করছিস?'

'এমনি। চেনা লাগছিল যেন।' শতদ্রু চুপচাপ হাল্কা পায়ে হাঁটতে থাকল। সে টের পেয়েছিল, বিপাশা রঙ্গনা সম্পর্কে কী এক বিধিনিষেধ আরোপ করতে চাইছে। আসলে এমনটা তার পক্ষে হয়ত স্বাভাবিক। দুমাসের লম্বা ছুটিতে শতদ্রু দেশে এসেছে। এই সুযোগে বাবা-মা তার জন্য ঝটপট একটা পাত্রী যোগাড় করতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। কলকাতার ইংরেজি কাগজে ইতিমধ্যে বিজ্ঞাপনও দেওয়া হয়েছে। আত্মীয়-স্বজনকে চিঠি লিখেও তৎপর করা হয়েছে। শতদ্রুর এতে আপত্তি নেই অবশ্য। মার্চে ফেরার সময় একজন সঙ্গিনী থাকা মন্দ হবে না। অন্তত একাকিত্ব তো দূর হবেই।

এই অবস্থায় বুঝি বিপাশা চাইছে না, দাদা যাকে-তাকে হুট করে জুটিয়ে নিক। শতদ্রু মনে মনে হাসতে লাগল। কিন্তু রঙ্গনা নামটা এতক্ষণে তার বেশ মনে পড়ে গেছে। মানুষের জীবনে কেন যেন কোন একটা দৃশ্য বহুদিন নিখুঁতভাবে স্মৃতিতে থেকে যায়।

কতবছর আগে, ঠিক মনে পড়ছে না। এই বসন্তপুর স্কুল (তখনও কলেজ হয়নি) কী একটা অনুষ্ঠান ছিল। শতদ্রু স্টেজের পেছনে ফ্রকপরা একটা মেয়েকে একান্তে একটা চেয়ারে বসে তন্ময়ভাবে বই পড়তে দেখেছিল। ওখানে একটা মিটমিটে বাল্ব জ্বলছিল মাথার ওপর। মেয়েটির বয়স তখন কত আর হবে? এগারো-বারোর বেশি নিশ্চয় ছিল না। স্টেজে তখন গান কিংবা নাচ চলছে। এখানে অমন করে কী বই পড়ছে মেয়েটি? শতদ্রু অবাক হয়েছিল। শুধু অবাক নয়, খুব ভালও লেগেছিল। মিষ্টি চেহারার মেয়ে, তার মুখের দুপাশে চুল এসে পড়েছে। আলতো হাতের আঙুলে চুলগুলো সরিয়ে দিচ্ছে। তারপর সে চোখ তুলতেই চোখ পড়েছিল শতদ্রুর চোখে। মুখে কিন্তু হাসি বা লজ্জা কিছুই

ছিল না। কেমন যেন উদাসীন চাহনি! ফের সে বইয়ের পাতায় চোখ নামিয়েছিল। শতদ্রুর শুধু এটুকুই মনে আছে, কেউ তাকে রঙ্গনা বলে ডাকছিল। তখন সে বলেছিল, 'যাই!' তারপর এতবছর ধরে হঠাৎ কখনও-কখনও দৃশ্যটা তার মনে পড়েছে। মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে এক অদ্ভুত আবেগময় অনুভূতিতে সে আচ্ছন্ন হয়েছে। একটা স্বপ্নের মত ঘটনা যেন। অথচ সে বুঝতে পারে না কেন ওই কিশোরীকে দেখে সে মুগ্ধ হয়েছিল। নাকি রঙ্গনা নামটাই এর মূলে?

এ ঘটনা তার একান্ত ব্যক্তিগত। তাই কাকেও জিগ্যেস করেনি শতদ্রু, কিশোরীটি কোথায় থাকে এবং কী তার পরিচয়। এতকাল পরে তাকে ফের দেখে সে মনে মনে খুব বিচলিত হলেও মুখ ফুটে বিপাশাকে জিগ্যেস করতে বেধেছিল।

এতক্ষণে জনপদের বাইরে এসে রতুডাক্তারের রসিকতা প্রসঙ্গে হঠাৎ মনে হয়েছে, বিপাশাকে জিগ্যেস করলে এমন কিছু মহাভারত অশুদ্ধ হবে না।

শতদ্রুর কাছে এখানকার শীত শীতই নয়। সে একটা চকরা-বকরা উজ্জ্বল রঙের গুরু পাঞ্জাবি, তার ওপর হাতাকাটা ভেলভেটের জ্যাকেট চড়িয়েছে। পরনে চুস্ত-ছাঁটের পাজামা। আসার সময় নিউইয়র্কে ব্রডওয়েতে ফুটপাতে সাজানো খ্রিস্টমাস সেলের পোশাকের স্তূপ হাতড়ে সস্তায় এগুলো কিনেছিল। সবসুদ্ধ মোট ডলার চারেক দাম। সে থাকে ইলিনয় স্টেটের আরবানা শহরে। এসব বিচিত্র পণ্য সেখানে মেলে না।

বিপাশার সাজগোজের স্বভাব নয়। হালকা সোনালী রঙের তাঁতের শাড়ির ওপর সে একটা ধূসর কার্ডিগান চাপিয়েছে. কথাবার্তা ও আচরণে সে একটু ধারালো, কিন্তু তার চেহারায় আবছা ধরনের বিষণ্ণতা আছে—সেটা তার চোখের তলায় এবং কপালের কয়েকটা সূক্ষ্ম ভাঁজে চোখে না পড়ে পারে না। শতদ্রু বিদেশে থাকার সময়ই জানতে পেরেছিল, হঠাৎ এক ঝড়বৃষ্টির সন্ধ্যায় চিলেকোঠায় ওঠার সিঁড়িতে কিছু দেখে প্রচণ্ড ভয় পেয়ে বিপাশা অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। তারপর থেকে তাকে একটা ভয়-পাওয়া রোগে ধরেছে।

তাদের বাড়িটা খুব পুরনো। ঠাকুরদারও ঠাকুরদার আমলে নাকি তৈরি। তবে পুরুষপরম্পরা সংস্কার করা হয়েছে। গায়ে অনেকগুলো ঘরও পরবর্তীকালে যুক্ত করা হয়েছে। সব মিলিয়ে বাড়িটা আয়তনে বিশাল হয়ে গেছে। সামনে পেছনে পাঁচিলঘেরা প্রচুর ফাঁকা জায়গায় ফুল-ফলের বাগান আছে। তারা বনেদী পরিবারের লোক। ঠাকুরদা অমরনাথ ছিলেন মাঝারি ধরনের জমিদার। অমরনাথের ছেলে কৃষ্ণনাথ জমিদারী উচ্ছেদের পর কন্ট্রাকটরি করতেন। প্রচুর টাকাকড়ি কামিয়ে এখন অবসর নিচ্ছেন। বয়স ষাট পেরিয়ে গেছে। বসন্তপুর এলাকায় কেষ্ট কন্ট্রাকটর নামে সবাই চেনে তাঁকে।

বিপাশা গাড়ি করে বেরুতে চেয়েছিল। কিন্তু শতদ্রুর তাতে ভীষণ আপত্তি। সে গাড়ির দেশ আমেরিকা থেকে এসেছে। পায়ে হেঁটে ঘুরতেই তার ভাল লাগছে। পাঁচবছর বিদেশে থাকার পর বসন্তপুরকে হাস্যকর রকমের নোংরা দেখালেও প্রাণ গেলে সে তা বলছে না। বরং ভাল লাগাবার চেষ্টা করছে মনে মনে। আশ্চর্য, একবার সিউক্সে একটা মাঠ পেরিয়ে যাবার সময় বসন্তপুরের এই উত্তরের মাঠটার কথা মনে পড়ে সে প্রায় কেঁদে ফেলেছিল।

তবে যেমন দেখে গিয়েছিল, তেমনটি আর নেই বসন্তপুর। সামান্য পাঁচটা বছরেই কী প্রচণ্ড বদলে গেছে। স্টেশনে ওভারব্রিজ হয়েছে। প্ল্যাটফর্মগুলো উঁচু হয়েছে। তেমনি ভিড়ও বেড়েছে। তার চোখের সামনেই ছেলেবেলার সমৃদ্ধ গ্রামকে সে শহরে রূপান্তরিত হতে দেখেছিল। এখন বসন্তপুর আরও যেন জটিল হয়েছে। বাস লরি টেম্পো রিকসা ট্যাকসি প্রাইভেটকার গিজ গিজ করছে!

এই হাইওয়ে স্টেশনের একটু তফাত দিয়ে রেললাইন ডিঙিয়ে সোজা পূর্বে এগিয়ে গেছে। রেললাইন পেরিয়ে ভাইবোন কয়েক পা এগোতেই কে ডাকল 'বিয়াস! বিয়াস!'

অমরনাথই নাতি-নাতনির নাম রেখেছিলেন শতদ্রু এবং বিপাশা। উনি রসিকতা করে এদের ইংরেজি প্রতিশব্দ 'সাটলেজ' এবং 'বিয়াস' নামে ডাকতেন। তার ফলে বসন্তপুরে সাটলেজ এবং বিয়াস নামেই ছোটবেলায় সবাই ডাকত ওদের।

বিপাশা ঘুরে দেখে বলল, 'দাদা! এই সেরেছে রে! অপরূপা আসছে।'

শতদ্রু বলল, 'রঙ্গনার দিদি?'

বিপাশা মাথা নাড়ল। স্টেশনের দিক থেকে লাইনের ধারে-ধারে সাবধানে কাপড় গুটিয়ে অপরূপা আসছিল। বিপাশা হাসিমুখে বলল, 'তুই কি ট্রেনে এলি? কোন ট্রেন? যা বাবা! কোন ট্রেন তো দেখলুম না।'

অপরূপা সে-কথার জবাব না দিয়ে নমস্কার করল শতদ্রুকে। 'আপনি এসেছেন খবর পেয়েছি। দেখা করতে যাওয়ার সময় পাইনি।' তারপর বিপাশার দিকে ঘুরে বলল, 'এসেছি তো অনেকক্ষণ। একজনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। কথায় কথায় দেরি। তোরা বেড়াতে বেরিয়েছিস?'

বিপাশা হাসিমুখেই মাথাটা দোলাল।

শতদ্রু বলল, 'ইচ্ছে করে তো আপনিও আসতে পারেন। খুব চমৎকার আবহাওয়া।'

অপরূপা বলল, 'ইচ্ছে নিশ্চয় করছে। কিন্তু উপায় নেই! ঠাকমা একলা আছে। রঙ্গনা যা মেয়ে!'

বিপাশা বলল, 'তুই গিয়েছিলি কোথায় রে?'

'কলকাতা।' বলে অপরূপা একটু চোখ নাচাল। 'জব্বর একটা ইন্টারভিউ দিয়ে এলুম জানিস?'

'তাই বুঝি? কিসে?'

'একটা বড় প্রাইভেট কোমপানি।' অপরূপা ফের শতদ্রুর দিকে তাকাল। 'আপনি একেবারে কিন্তু সায়েব হয়ে গেছেন। চেনা যাচ্ছে না।'

বিপাশা বলল, 'তাহলে আয় তুই। আমরা একটু ঘুরে আসি।'

অপরূপা চলে গেলে শতদ্রু বলল, 'তোর বন্ধুটিকে কি আমি চিনি? মনে পড়ছে না তো!'

বিপাশা বলল, 'দেখেছিস। মনে থাকার কথা না।'

শতদ্রুর কৈশোর থেকেই কলকাতায় কেটেছে। বাড়ি এসেছে বছরে দু'এক বার মাত্র। বসন্তপুর তার বারবার অপছন্দ ছিল। বাবা-মায়ের তাগিদে বাড়ি আসত বটে, ঝটপট কেটে পড়ত। কৃষ্ণনাথ বলতেন, 'ওর মামী ওকে তুক করেছে।'

চওড়া কংক্রিটে ঢাকা রাস্তার দুধারে আদিগন্ত ফাঁকা মাঠ। দূরে কোথাও আবছা হলুদ আর সবুজ রঙের ছোপ। সামনে অনেকটা দূরে একখানে সাদা ব্রিজের ওপর শেষ বেলার নরম রোদ পড়েছে। তার পেছনে কালচে এবং ধূসর একটা টিলার মত জিনিস দেখিয়ে শতদ্রু বলল, 'ওটা কি কোনো গ্রাম?'

'কোনটা?'

'ওই যে—ওখানে।'

বিপাশা দেখতে-দেখতে বলল, 'ও। ওটা করালীর মন্দির। লোকে বলে, মা করালীর ভিটে।'

'ওখানে গেলে মন্দ হত না রে!'

বিপাশা ব্যস্তভাবে বলল, 'তোর মাথাখারাপ? পাক্কা ছ কিলোমিটার ডিসট্যান্স। তাছাড়া ওখানে গিয়ে কী দেখবি? জঙ্গলে ভর্তি।'

বিপাশা করালীর মন্দিরের কথা বলতে থাকল। মন্দিরের আর কিছু অবশিষ্ট নেই। বটগাছ গজিয়ে সবটাই ঢেকে ফেলেছে। এপাশে-ওপাশে ইটের স্তূপ ছিল প্রচুর। আশেপাশের গ্রামের মুসলমানরা সব নিয়ে গেছে। ওরা তো ঠাকুরদেবতা মানে না। তবে এই রাস্তাটা করার সময় খুব গণ্ডগোল হয়েছিল। মন্দিরের প্রায় ওপর দিয়ে রাস্তার নকসা করেছিল কোন ইঞ্জিনিয়ার। সে মুখে রক্ত উঠে মারা পড়ে। পরে নকসা বদলান হল। কিন্তু কেউ মাটি কোপাতে চায় না। বলে, 'মা করালীর ভিটেয় কোপ বসাতে পারব না।' এসব কাণ্ডের পর রাস্তা জঙ্গলের পাশ দিয়ে ঘোরানো হল! জঙ্গলটা থেকে গেল। ওখানে কেউ গাছের ডাল পর্যন্ত কাটতে সাহস করে না। তবে মুসলমানদের কথা আলাদা।

শুনে শতদ্রু হাসতে হাসতে বলল, 'তুই বুঝি এসব বিশ্বাস করিস বিয়াস?'

'কী সব?'

'ওই যে বললি মুখে রক্ত উঠে কে মরেছিল।'

বিপাশা কথার জবাব না দিয়ে মুখে একটা হু হু শব্দ করে বলল, 'এই! আর না। বড্ড শীত করছে। কী বিচ্ছিরি হাওয়া এখানে!'

শতদ্রু ঘুরে বলল, 'ইলিনয় স্টেট একটু উত্তরঘেঁষে তো। তাই সেপ্টেম্বরেই কোন-কোন দিন বিচ্ছিরি ঠাণ্ডা পড়ে। তবে এই ওয়েদারকে তুই ঠাণ্ডা বলছিস? আমেরিকানরা যেদিন আকাশে মুখ তুলে 'আ! ফাইন! ভেরি প্লেজান্ট ওয়েদার' বলে ওঠে, তখন আমার বুক কেঁপে ওঠে।'

বিপাশা আনমনে বলল, 'কেন?'

'টের পাই, সেদিন ইন্ডিয়ানদের পক্ষে জঘন্য আবহাওয়া।' শতদ্রু হাঁটতে হাঁটতে বলল। 'একে তুই শীত বলছিস—আই মিন, ঠাণ্ডা? প্রকৃত শীত বা ঠাণ্ডা কাকে বলে কল্পনা করতে পারবিনে। নাকে গালে কামড়ে যেন মাংস তুলে নিচ্ছে মনে হবে।'

'ডিপফ্রিজের ভেতরকার মতো?'

শতদ্রু হো হো করে হাসল। 'থাক। তোকে বোঝাতে পারব না। বরং গেলে হাতে নাতে প্রমাণ পাবি।'

বিপাশা বলল, 'আমি যাব? যাচ্ছি। ইস্!'

'কেন? সায়েবদের দেশ দেখতে ইচ্ছে করে না?'

বিপাশা কিছু বলল না। চুপচাপ হাঁটতে থাকল। শতদ্রুর মনে হল, পাঁচবছর আগের বিপাশার সঙ্গে এ বিপাশার কোন মিল নেই। বড় খামখেয়ালী দেখাচ্ছে ওকে। রেলফটকের কাছে এসে ওরা দাঁড়াল। একটা মালগাড়ি আসছে। মালগাড়িটা চলে গেলে শতদ্রু বলল, 'তোর ওই বন্ধু—অপরূপাদের বাড়ি কোনটা রে?'

মালগাড়ির শব্দের জন্য স্পষ্ট শুনতে পেল না বিপাশা। ফটক পেরিয়ে গিয়ে বলল, 'কী বলছিলি যেন?'

'কিছু না।'

বিপাশা হাসল। 'অপরূপার কথা জিগ্যেস করছিলি। একটা কথা বলি শোন। ওদের ফ্যামিলিটা মোটেও ভাল না। এখানে কেউ ওদের সঙ্গে গা মাখা-মাখি করতে চায় না। অপরূপা নেহাত গায়ে পড়ে মেশে। তাই একটু পাত্তা দিই। তবে রঙ্গনাটা ভাল।'

'তাহলে খারাপ কে?'

'অপরূপার দাদাকে তুই দেখেছিস নিশ্চয়। তার নাম অনির্বাণ। অনি বলে ডাকে সবাই।'

'ওয়েল। তারপর?'

বিপাশা বলল, 'অনি ফেরারী আসামী। অনেকদিন হল লুকিয়ে বেড়াচ্ছে।'

'কেন?'

'শুনেছি কোথায় খুনটুন, নাকি ডাকাতি করেছিল।'

শতদ্রু বলল, 'বাড়ির একটা ছেলে অমন হতেই পারে। ধর, আমি যদি...'

কথা কেড়ে বিপাশা বলল, 'তুই বা আমি এমন হব না। ওটা বংশের দোষ। রক্তে থাকে।'

'মানলুম। কিন্তু ওর বাবাও কি তাই ছিলেন নাকি?'

বিপাশা জোরে মাথাটা দোলাল। 'না। ওর বাবা সোনাবাবুর গদিতে কাজ করতেন। কিন্তু অনিদার ঠাকুরদা...' বলে সে শতদ্রুর মুখের দিকে তাকাল। 'তুই কী ছেলে রে! মনে পড়ছে না—ওই কালুবাবু আসছে বললেই তুই ঘরে গিয়ে লুকোতিস?'

শতদ্রু বলল, 'তাই বুঝি? আমার কিছু মনে থাকে না।'

বিপাশা হাসতে হাসতে বলল, 'সায়েবরা তোর ব্রেনওয়াশ করে দিয়েছে।'

শতদ্রু মাথার বড়-বড় চুল আঁকড়ে বলল, 'যা বলেছিস!'

'কালুবাবু নাকি সাংঘাতিক ডাকাত ছিল। পুলিশের গুলিতে মারা যায়।'

শতদ্রু বোনকে পরিহাসের ছলে বলল, 'আর তুই তা দেখেছিলি বুঝি?'

একথার জবাবে বিপাশা কেন যেন নিস্তেজ হয়েগেল। আস্তে বলল, 'না। শুনেছি। তুইও শুনে থাকবি—মনে নেই।'

'তোর কি শরীর খারাপ করছে?'

'হঠাৎ মাথাটা কেমন ঘুরে উঠল।'

বিপাশাকে দাঁড়াতে দেখে শতদ্রু উদ্বিগ্ন হয়ে এদিক-ওদিক তাকাল। মায়ের চিঠিতে শুনেছে, বিপাশার মাথা-ঘোরা অসুখ আছে। হঠাৎ করে অজ্ঞান হয়ে যায়। শতদ্রু একটা সাইকেলরিকশ দাঁড় করাল। বিপাশা চোখ বুজে দাঁড়িয়ে ছিল। শতদ্রু তার হাত ধরে বলল, 'রিকশয় ওঠ্। আমারই ভুল হয়েছিল।'

বিপাশা চোখ খুলে রুগ্‌ণ হেসে দাদার সাহায্যে রিকশয় উঠল।...

কুড়ানি ঠাকরুনের জীবনকথা

শীতের দুপুরে রোদেভরা উঠোনে মাদুর পেতে বসে রঙ্গনা একটা রঙীন ইংরেজি পত্রিকা পড়ছিল। তার দিদি অপরূপা তাকে বলে বইপোকা। এবাড়ি ওবাড়ি ঘুরে বেড়ানোর অভ্যাসও আছে রঙ্গনার। তাই তার আরও একটা নাম দিয়েছে পাড়াবেড়ানী। রঙ্গনার কোনটাতেই আপত্তি নেই। ছোটবেলা থেকেই খানিকটা আত্মভোলা মেয়ে সে।

ইংরেজি পত্রিকাটা সিঙ্গিবাড়ির ছেলে আমেরিকা থেকে এনেছে। রঙ্গনা তার বোনের কাছে সেটা দেখতে পেয়ে চেয়ে এনেছিল। বসন্তপুরে শিক্ষিতা মেয়েদের মধ্যে রঙ্গনার মেধাবী বলে সুনাম ছিল। তার ইংরেজি জ্ঞানের খ্যাতি স্কুল থেকে। লাইব্রেরি হাতড়ে ইংরেজি বই নিয়ে যেত। সহ-পাঠিনীরা বলত ভড়ং। রঙ্গনার গ্রাহ্য ছিল না। দুঃখের বিষয়, স্থানীয় কো-এডুকেশনের কলেজে দুবছর পড়ার পর তাকে পড়া ছাড়তে হয়েছে। ভীষণ অর্থাভাব।

এমন মেয়েকে সাহায্য করতে অনেকেই রাজি ছিল। কলেজে ফ্রি-শিপেরও প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তার দাদা অনির্বাণের এক গোঁ। 'গরিব হতে পারি, ভিক্ষে নেব না কোনো শালার কাছে।' গোঁয়ার অর্ধশিক্ষিত অনির্বাণ ছোটবোনের পড়াশুনায় বাদ সেধেছিল। এদিকে রঙ্গনা তার দাদার ভীষণ ভক্ত।

অপরূপা ততদিনে বি. এ. পাস করেছে। সে দাদাকে ভক্তি করে না, ভয় করে। সে জানে, দাদার নিজের পড়াশুনা হয়নি বলে বোনেদের শিক্ষায় বাদ সেধেছে বরাবর। তার আক্ষেপ, বাবা বেঁচে থাকলে রঙ্গনাকে কলেজ ছাড়তে হত না। বাবার মৃত্যুর পর স্বভাবত অনির্বাণ তাদের গার্জেন হয়ে উঠেছিল।

বাড়িটা বসন্তপুরের শেষ প্রান্তে মাঠের সীমানায় অবস্থিত। এদিকটায় এখনও সেকালের বসন্তপুর কিছুটা টিকে আছে। বাঁশবন, আগাছার জঙ্গল, পচা ডোবা, শেয়ালের ডাক, গরুর হাম্বারব এই সব নিয়ে দুর্দশাগ্রস্ত সনাতন পাড়াগাঁ। অথচ একটুখানি পশ্চিমে এগিয়ে গেলেই প্রশস্ত পিচের পথ, বাজার বিদ্যুৎ, ভিড়, মোটরগাড়ি। এখানে এখনও সন্ধ্যায় লম্প জ্বলে। ভুতুড়ে অন্ধকারে শ্যাওড়াগাছে প্যাঁচা ডাকে। প্রেতনীরা ডোবার ধারে জোনাকির আলো নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। মধ্যরাতে হাড়ি-বাড়ির পিরিমল ওঝা ঘুম-ঘুম গলায় তার পোষা দুরন্ত প্রেতটিকে ধমক দিয়ে বলে, 'খুব হয়েছে! এবারে যা দিকিন!'

রঙ্গনাদের অবস্থা একসময় ভালই ছিল, তার প্রমাণ এখনও বাড়ির আনাচে-কানাচে ছড়ানো রয়েছে। চারদিকে ঘেরা দালানবাড়ি কালক্রমে ইটের স্তূপে পরিণত হয়েছিল। কিছুটা অনির বাবা গৌরমোহন এবং পরে বাকিটা তাঁর ছেলে অনির্বাণ বেচে দিয়েছে। সেকালের ইট-কাঠের ওপর অনেক লোকের একটা অদ্ভুত আকর্ষণ আছে। তবে ইটগুলো সত্যি মজবুত ছিল। শতদ্রুর বাবা কৃষ্ণনাথ কন্ট্রাকটর অনিদের ওইসব ইট, লাইম-কংক্রিটের চাবড়া, সুরকি ইত্যাদি রাস্তায় ব্যবহার করেছেন। ব্লক অফিসের বহু কাজেও লাগিয়েছেন। বাড়ির সেই সব শূন্যতা ঢেকে ফেলেছেন স্নেহময়ী প্রকৃতি।

চারপাশে আগাছা, ঢিবিজুড়ে ঘন জঙ্গল। মধ্যিখানে একটা জীর্ণ একতলা দুটো ঘরের একটা বাড়ি টিকে আছে কোনক্রমে। তার ছাদ থেকে বর্ষায় জল চুইয়ে পড়ে। আশংকা হয়, কবে হঠাৎ ধসে পড়বে হয়ত।

তবু এবাড়িতে যেন কী একটা শ্রীও আছে। উঠোনটুকু সবসময় ঝকঝকে। প্রাচীন ইঁদারার জল এখনও সুপেয়। উঠোনের একপ্রান্তে সুন্দর শিম, লাউ, শশার মাচান। কয়েকটা পেঁপেগাছ। কিছু ফুলফলের গাছও ঋতুভেদে ফুলফল দান করে। সংকীর্ণ খিড়কির পথের দুধারে জবাফুলের ঝাড়। ডোবার ঘাটের মাথায় কয়েকটা কলাগাছ ফলভারে এখন প্রায় অবনত। সত্যি বলতে কী, এইসব ফুলফল ও আনাজপত্র এ সংসারে ক্ষুধার অন্ন যোগায় আজকাল। লোকেরা এসে কিনে নিয়ে যায়। রঙ্গনার ঠাকমা, কুড়ানি ঠাকরুন বলে যিনি পরিচিত, দরাদরি করে বেচেন। এসব তাঁরই হাতে লাগানো। এবয়সেও ওই খঞ্জ বৃদ্ধা বগলে ক্রাচ ভর করে ডোবা থেকে জল এনে সেচন করেন। তাঁর বাঁ পা-খানি হাঁটুর নিচে থেকে কাঠির মত দেখতে এবং পায়ের পাতা দোমড়ানো।

শীতের দুপুরে স্নানাহার সেরে কুড়ানি ঠাকরুন ছোট্ট চাটাইয়ে বসে নাতনির দিকে তাকিয়ে ঝিমোচ্ছিলেন। হঠাৎ কী মনে হল, ঝিমুনি ভেঙে ডাকলেন, 'অ রনি! রনি রে!'

রঙ্গনা মন দিয়ে 'অবজারভাব' পত্রিকায় কিংবদন্তিখ্যাত আটলান্টা নগরী আবিষ্কারে এক পাগলা সায়েবের সাম্প্রতিক অভিযানকাহিনী পড়ছিল। বিরক্ত হয়ে বলল, 'কী!'

'রনি রে! আমায় একবারটি করালীর থানে নিয়ে যাবি?' বৃদ্ধা হঠাৎ কী কারণে চঞ্চল হয়ে উঠেছেন। 'অ রনি! তোর পায়ে পড়ি ভাই! একবারটি...'

রঙ্গনা পত্রিকা থেকে মুখ তুলে হাসিমুখে ঘুরল ঠাকমার দিকে। 'বলো, কী বলছ। তোমারটা শুনে নিই আগে।'

কুড়ানি ঠাকরুনের বয়স প্রায় বাহাত্তর হয়ে গেছে নিজের হিসেবে। তবু একটাও দাঁত ভাঙেনি, এটাই আশ্চর্য। সরু সরু মুক্তোর মত দাঁতে হেসে বললেন, 'বাসে চেপে যাব, বাসে চেপেই ফিরব। তুই শুধু বাসরাস্তা থেকে থান পর্যন্ত একটু ধরে নিয়ে যাবি। ব্যস্! আর তোকে কিছু কত্তে হবে না। অ রনি, যাবি না?'

রঙ্গনা ভুরুকুঁচকে বলল, 'কোথায়?'

'বললুম না? করালীর থানে।' বৃদ্ধা কাকুতিমিনতি করলেন। 'বড্ড মন কেমন করছে রে! কাল রাত্তির থেকে খালি স্বপন হচ্ছে। অ রনি, তোর পায়ে পড়ি!'

'আবার তুমি ওই ভূতের জঙ্গলে যাবে?' রঙ্গনা কপটভাবে ধমক দিল। কিন্তু সে মিটিমিটি হাসছিল দুচোখে। তার মত করে চোখে হাসতে খুব কম মেয়েই পারে। 'সেবারে গিয়ে কেমন ভিরমি খেয়ে আমাকে বিপদে ফেলেছিলে মনে নেই? আর আমি তোমার সঙ্গে কোথাও যাচ্ছিনে বাবা!'

কুড়ানি ঠাকরুন পাছা ঘষড়ে এবং ক্রাচটা নিয়ে ওর কাছে এলেন। 'আজ সন্ধে করব না। বুঝলি? দিন-সবরেই ফিরে আসব। দোহাই নক্ষি মেয়ে, আমার সোনা! মানিক!'

রঙ্গনা তার কাঁধ থেকে ঠাকমার হাত আলতোভাবে ছাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'যেতে পারি। একটা শর্তে।'

বৃদ্ধা করুণমুখে তার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তাই বল্ কী তোর শত্ত।'

'একখানা বই কিনে দেবে।'

বৃদ্ধা সভয়ে বললেন, 'বই? দাম কত রে?'

'বেশি না—মোটে ছটাকা।' রঙ্গনা চাপা গলায় বলল ফের, 'মধুরবাবুকে চেনো তো? এই যে ভট্টাচায্যিদের মধুরবাবু। ওদের বাড়িতে অনেক বই আছে। মধুরবাবু গাঁজার লোভে লুকিয়ে একটা করে বেচে দেয়। আমিই তিনখানা কিনেছি। মনে পড়ছে না মধুরবাবুকে?

কুড়ানি ঠাকরুনের মাথায় এসব ঢোকে না। তবু বললেন, 'বুঝিছি। সেই লোকটা।'

রঙ্গনা ফিসফিস করে বলল, 'মধুরবাবুর মামা জানতে পারলে বিপদ হবে। তুমি যেন মুখ ফসকে কাকেও বলে ফেলো না!'

বৃদ্ধা জোরে মাথা দোলালেন।

'তাহলে দিচ্ছ তো ছটাকা?' রঙ্গনা ঠাকুমার গলা জড়িয়ে আদুরে গলায় বলল, 'ও ঠাকমা!'

বৃদ্ধা শ্বাস ফেলে আস্তে বললেন, 'তাই তো!'

'তাই তো বলো না। তোমার আবার টাকার অভাব?' রঙ্গনা খিলখিল করে হেসে উঠল। 'ঠাকুরদার গুপ্তধনের খবর তুমিই তো জানো। অনেক টাকা পুঁতে রেখে গেছেন—না গো?'

কুড়ানি ঠাকরুন, ঘোলাটে চোখে নিষ্পলক তাকিয়ে রইলেন রঙ্গনার দিকে।

রঙ্গনা বলল, 'কী? বলছ না যে? তোমার কাছেই তো গল্প শুনেছি, ঠাকুরদা দুর্ধর্ষ ডাকাত ছিলেন। ডাকাতরা সোনাদানা টাকাপয়সা লুকিয়ে রাখে কে না জানে!'

বৃদ্ধার দু'চোখ দিয়ে টপটপ করে জল গড়াতে শুরু করল। রঙ্গনা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল ওঁর মুখের দিকে। একমুহূর্ত পরে কুড়ানি ঠাকুরুন, থানের আঁচলের খুঁটে চোখ মুছে ধরা গলায় বললেন, 'তাই যদি হত রে, এবয়সে খোঁড়া পায়ে কি ডোবার জল বয়ে এসব পালতুম?' সবজিমাচান, ফুলফলের গাছের দিকে জরাগ্রস্ত লোল একটা বাহু তুলে ঠাকরুন বললেন, 'এসব কিচ্ছু পালতুম না তাহলে। রানীর মতন পালংকে শুয়ে শেষবেলায় দাসদাসীর সেবা নিতুম। আমার খুব কষ্টের জেবন ভাই, সে সব কথা তোরা বুঝবিনে।'

কুড়ানি ঠাকরুন হঠাৎ ক্রাচটা তুলে শূন্যে নেড়ে কোন পাখি অথবা কুকুর-বেড়ালের উদ্দেশে বলে উঠলেন, 'যা! যা! দূর! দূর!'

বাড়িতে কেউ না থাকলেই মুশকিল। চোরে সব শেষ করে ফেলবে। তাই কতবার ইচ্ছে করে, তবু করালীর থানে যাওয়া হয় না। অপরূপা না ফিরলে তাই যাওয়া হবে না। সে আজকাল চাকরির জন্য ব্যস্ত হয়ে ছোটাছুটি করে বেড়াচ্ছে। এবেলা কোথায় গেছে বলে যায়নি। কখন ফিরবে তাও জানা নেই।

অপরূপা ফিরতে বেলা গড়িয়ে গেল। ঠাকমার করালীর থানে যাওয়ার কথা শুনে সে কোনরকম উচ্চবাচ্য করল না। ব্লকে কিছু স্থানীয় সমাজশিক্ষা সংগঠক নেবে—আজ তার তদ্বিরে মুরুব্বি ধরতে গিয়েছিল। আশ্বাস পেয়ে মনটা ভাল আছে অপরূপার। শুধু বলল, 'দেখো—যেন সেবারকার মতো কেলেংকারি বাধিও না। রনি তোমার মতো বুড়োহাড়-কাঁধে বইতে পারবে না।'

রিকশ করে বাসস্ট্যান্ডে, তারপর বাসে যখন চলেছেন কুড়ানি ঠাকরুন, তখনও মনের ভেতর অপুর কথাটা বাদুড়ের মত ঝটপট করে আঁচড় কাটছে। কাঁধে বইতে পারবে না....কাঁধে বইতে পারবে না...কাঁধে বইতে পারবে না।...

ব্রেক কষায় ঝাঁকুনিতে ফ্যালফ্যাল করে তাকাচ্ছিলেন বৃদ্ধা। কন্ডাকটর চেঁচাচ্ছে, 'ও দিদিমণি! করালীর ভিটে! করালীর ভিটে!'

এখানে স্টপ নেই। কালে-ভদ্রে কদাচিৎ কেউ ওই মন্দিরে এখনও আসে। তাদের খাতিরে বাস দাঁড় করাতে হয়। অন্য-যাত্রীরা খাপ্পা হয়ে চেঁচায়, 'ঘন্টি মারো! ঘন্টি মারো!' তাদের দোষ নেই। বাসটাকে দূর থেকে দেখায় একটা চলমান মৌচাকের মত। আষ্টেপৃষ্ঠে লোক গিজগিজ করছে ছাদে, পেছনে জানালা আঁকড়েও ঝুলছে কত লোক। ড্রাইভারের কোলেও জনাকতক। মফস্বলে বাস যত বেড়েছে যাত্রী বেড়েছে তার চৌগুণ। আজকাল গ্রামের লোকে এক পা পায়ে হাঁটতে রাজি নয়।

কন্ডাকটর ছোকরাটি সম্ভবত রঙ্গনার মুখ চেয়েই তার ঠাকমাকে দুহাতে তুলে যাত্রীদের মাথা ও কাঁধের ব্যূহ ভেদ করে নামিয়ে দিল। যাবার সময় হাত নেড়ে রঙ্গনার উদ্দেশে প্রেমিকের হাসি হেসে বলে গেল, 'টা টা দিদিমণি!' ফিরতি টিপেই নিয়ে যাব। ওয়েট করবেন।'

ব্রিজ পেরিয়ে এসে প্রকাণ্ড একটা বকুল গাছের কাছে বাসটা থেমেছিল। বাস চলে গেলে কুড়ানি ঠাকরুন ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে চারদিক দেখছেন। তখনও মাটিতে বসে উনি। রঙ্গনা জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এবার? এসে তো গেছি না হয়।'

বৃদ্ধা নড়বড় করে উঠে দাঁড়ালেন। ক্রাচে ভর করে বললেন, 'রনি! নদীটা কোন বাগে রে? চোখে কিছু সোজে না কেন?'

মাঝে মাঝে ঠাকমার মুখের কথায় অদ্ভুত একটা টান লক্ষ্য করে রঙ্গনা। বসন্তপুর এলাকায় লোকের কথায় এমন বেসুরো টান নেই বলে তার ধারণা। সে রসিকতা করে ঈষৎ ভেংচি কেটে বলল, 'সোজে না কেন—কী বলছ? পেরিয়ে এলে না নদী?'

'অ'—বৃদ্ধা একটু হাসলেন। 'বিরিজ হয়েচে বটে। তা অ লা মুখপুড়ি, তুই আমায় ভেঙাচ্ছিস যে বড়? জানিস, কার মাটিতে দাঁড়িয়ে আছিস এখন?'

রঙ্গনা চোখ কপালে তুলে বলল, 'হঠাৎ যে জোর বেড়ে গেল তোমার। ব্যাপারটা কী?'

কুড়ানি ঠাকরুন মিষ্টি হেসে হাত বাড়ালেন। 'নে—ধর। ঠুকুস ঠুকুস করে যাই।'

রাস্তা থেকে গড়ানে জায়গা। নিচে ঝোপঝাড়ের ভেতর সরু পায়ে চলা একফালি পথ গিয়ে জঙ্গলে ঢুকেছে। ডাইনে নদী। করালীর ভিটে উঁচু জায়গা বলে বাঁধ দেওয়া হয়নি এদিকটায়। সাবধানে ঠাকুমাকে ধরে নিচের পথে নামাল রঙ্গনা। তারপর বলল, 'তোমার জোর বেড়ে গেল কেন বললে না তো?'

আগে চলতে চলতে বৃদ্ধা বললেন, 'বাড়বেই তো। এ হল গে আমার মায়ের ভিটে।'

'মায়ের ভিটে!' রঙ্গনা হাসতে লাগল। 'দেবী করালী তো বিশ্বশুদ্ধু সবার মা।'

'ফককুরি করিস নে রনি।' বৃদ্ধা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন।

রঙ্গনার মনে পড়ল, কবছর আগে এমনি করে ঠাকমাকে নিয়ে এসেছিল। তখন কিন্তু ওঁর আচরণ ছিল অন্যরকম। ভীষণ কান্নাকাটি করছিলেন। শেষে মন্দিরতলায় ঘাড় গুঁজে পড়ে রইলেন। কোন সাড়া শব্দ নেই। রঙ্গনা খুব বিপদে পড়ে গিয়েছিল। ভাগ্যিস দৈবাৎ নদীর ওপারে ধানক্ষেতে কয়েকটা লোকের দেখা পেয়েছিল। রঙ্গনার ডাকে তারা ব্রিজ পেরিয়ে দৌড়ে এসেছিল। ধরাধরি করে তারাই বাসে তুলে দেয়। কুড়ানি ঠাকরুন তখনও আচ্ছন্ন অবস্থায় ছিলেন। বিড়বিড় করে কীসব বলছিলেন আর কান্নাকাটি করছিলেন। রঙ্গনার তখন বয়স কম। ভয়ে সারা।

তাই আজ রঙ্গনার সন্দিগ্ধতা ঘুচছে না। সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বৃদ্ধার দিকে লক্ষ্য রেখেছে—কোনরকম কুলক্ষণ দেখা যায় নাকি। বৃদ্ধা লাফিয়ে-লাফিয়ে এগোচ্ছেন। চোখদুটো গাছপালার ডগার দিকে। নিষ্পলক দৃষ্টি। মুখের গাম্ভীর্য আছে বটে, কিন্তু তাতে অপ্রকৃতিস্থতা নেই।

মন্দিরতলায় ফাঁকা জায়গা খুব কম। সর্বত্র বটের ঝুরি। প্রাচীন ইঁদারা ধসে একটা গর্তমত রয়েছে। তার চারদিকে গুল্ম-লতা। একটুকরো পাথর অবশিষ্ট নেই কোথাও। মন্দিরের একটা দেয়াল এবং ত্রিকোণ চূড়ার কিছু অংশ বটের কয়েকটা ঝুরির মধ্যে আটকে রয়েছে মাত্র। বেদীসহ কালোপাথরের ছোট মূর্তিটি কোন গ্রামে নিয়ে গিয়ে প্রতিষ্ঠার কথা শোনা যায়। কিন্তু সঠিকভাবে কেউ বলতে পারে না কোন গ্রামে। মন্দিরের মেঝেয় ঝোপঝাড় গজিয়ে রয়েছে। সেদিকে তাকিয়ে কুড়ানি ঠাকরুন চোখ বুজে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর আস্তে আস্তে বসে মাটিতে লুটিয়ে প্রণাম করলেন।

দেখাদেখি ভয়ে-ভয়ে রঙ্গনাও দাঁড়ানো অবস্থায় একটা প্রণাম করল। মধুরবাবুর কাছে ছ'টাকায় একটা মস্ত বড় ইংরেজি নভেল পাবে, এই তার আকাঙ্ক্ষা। প্রণামের সময় অবচেতন তাগিদে আকাঙ্ক্ষাটুকু ব্যক্ত হয়ে থাকবে।

বৃদ্ধা সেবারকার মত বিশ্রি রকম হাঁউমাউ করে কাঁদলেন না বটে, কিন্তু ফোঁস ফোঁস করলেন কিছুক্ষণ। গাছপালার ভেতর বলে এখানে বেশ খানিকটা ওম আছে। নদীর ওদিকে হাওয়া বেশ উত্তাল। বেলা গড়িয়ে এসেছে বলে সেই হাওয়া শীত ধরিয়ে দেয়। রঙ্গনা বলল, 'হল? আর কতক্ষণ?'

বৃদ্ধা বললেন, 'এটা কত সন চলছে রে রনি?'

রঙ্গনা বলল, 'ইংরেজিটা জানি। ১৯৭৩ সাল। বাংলা কে জানে কত!

'তেহাত্তর?' কাঁপা-কাঁপা গলায় বৃদ্ধা প্রশ্ন করলেন। ঘোলাটে চোখের ফ্যাকাসে তারা ফেটে বেরিয়ে আসছে যেন।

রঙ্গনা বলল, 'ইংরেজি! ইংরেজি তিয়াত্তর।'

'তেরশো বাইশ সনের বোশেখী-পুন্নিমেতে বাবা আমাকে কাঁধে করে এখেনে বয়ে এনেছিল।' বৃদ্ধা সেইরকম নিষ্পলক দৃষ্টে তাকিয়ে যেন গাছপালা আর শূন্য মন্দিরকে গল্প শোনাচ্ছেন। ...'ডাগরপানা

চাঁদখানা উঠেছিল ওইখেনে। বড় জল তেষ্টা পেয়েছিল। ইঁদারার জলটায় গন্ধ। তাই বাবা গেল নদী থেকে জল আনতে। আমি বসে আছি। পাশে লণ্ঠন জ্বলছে। কেউ কোথা নাই। তারপরে...'

রঙ্গনার গা ছমছম করছিল এই জনহীন বনের ভেতর। করালীর ভিটে নিয়ে অসংখ্য ভূতের গল্পও সে ছোটবেলা থেকে শুনেছে। যত শিগগির চলে যেতে পারে, তত ভাল। ঠাকমার কথা কেড়ে সে বলল, 'ও ঠাকুমা! বাড়ি গিয়ে শুনব। তুমি ওঠ এবার। বাসটা এক্ষুনি ফিরে আসবে।'

বৃদ্ধার চোখ থেকে জল পড়তে লাগল। 'অ। বাস আসবার সময় হল বুঝি?

'হবে না? তুমি এবার ওঠ।'

বৃদ্ধা করুণ মুখে বললেন, 'উঠি। আমায় ধরদিনি এট্টুখানি।' রঙ্গনার সাহায্যে উঠে দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক তাকিয়ে ফের বললেন, 'দুদণ্ড থাকতে বড় ইচ্ছে করে। তোর ঠাকুর্দা বেঁচে থাকতে পায়ে মাথা ভেঙিচি, ওগো, একবারটি আমার মায়ের থানে নিয়ে চলো! সে বড় পাষাণ মানুষ ছিল—তোর ঠাকুর্দা।'

রঙ্গনা পা বাড়িয়ে বলল, 'আমি দেখিনি।'

'তুই তখন কোথা যে দেখবি?' বৃদ্ধা একটু হাসলেন। 'তোর বাবাকে যদি বলতুম, ও গউর, আমায় একবার থানে নিয়ে যা বাবা! গউরের আর সময়ই হত না—মুখে বলত, যাব। রনি, তোর মনে বড় দয়া। তাই তুই কতকাল পরে মায়ের ভিটেতে আমায় এনেছিলি। আজ আবার নিয়ে এসিছিস! তোর ভাল হবে দেখবি। আশীর্বাদ কচ্ছি। ওই দ্যাখ, মাও কচ্ছেন, তোর খুব ভাল হবে। বড় ঘরে বে হবে। সোনার চাঁদ ছেলে প্রসব করবি।...'

রঙ্গনা রাগ করে বলল, 'নাও, শুরু হল! ফিরে গিয়ে ছটা টাকা দেবে, ব্যস!'

কুড়ানি ঠাকরুণ ক্রাচ ঠকঠক করে পা বাড়িয়ে বললেন, 'দোব। তুই নক্ষি মেয়ে।' তারপর হঠাৎ ঘুরে কান পেতে কিছু শোনার ভঙ্গিতে বললেন, 'অই! অই!'

রঙ্গনা ভড়কে গিয়ে বলল, 'কী? কী ঠাকুমা?'

বৃদ্ধা দুঃখিতভাবে একটু হাসলেন। 'এখানে আসাঅব্দি খালি কানে শব্দটা বাজছে—কনক! কনকলতা রে!'

বিস্মিত রঙ্গনা বলল, 'কনকলতা মানে? ও ঠাকুমা, কনকলতা মানে কী? কে সে?'

'আবার কে? বাবা ওই নামে ডাকতেন।'

'তোমার নাম কনকলতা নাকি?' রঙ্গনা হেসে উঠল। 'কী সুন্দর নাম গো তোমার! কিন্তু আমরা যে জানি কুড়ানি ঠাকরুন! ব্যাপারটা কী?'

'আমার শাউড়িঠাকরুন বড় হেনস্তা করতেন। তোর ঠাকুর্দার ভয়ে সামনে কিছু বলতেন না। আড়ালে কতরকম মাগী-টাগী গালমন্দ করতেন। বলতেন, অ কুড়ুনির বেটি কুড়ুনি! সেই থেকে ওই নামই বহাল হল।'

'ঠাকুর্দা কী নামে ডাকতেন?'

'সুলতা বলে ডাকতেন।'

দুজনে ফিরে যেতে-যেতে এইসব কথা হল। রঙ্গনা এবার ঠাকুমার কাঁধ ধরে হাঁটছিল। একটু তফাতে নিচে নদীর জলে এখন ছায়া পড়েছে। দূর থেকে পাম্পিং মেসিনের চাপা ধক ধক শব্দ ভেসে আসছে। নদীর ওপারে ঘন সবুজ গম-সরিষার ক্ষেত। এখানে-ওখানে লোকজন চোখে পড়ে।

পাকা রাস্তায় উঠতে খুব কষ্ট হল। ঠাকুমাকে প্রায় টেনে হিঁচড়ে রঙ্গনা রাস্তায় ওঠাল। রাস্তার কিনারায় কাঁচা অংশে ঘাসের ওপর বসে কুড়ানি ঠাকরুন হাঁফাচ্ছিলেন। রঙ্গনা জানে, বাস ফিরতে এখনও ঘণ্টাখানেক দেরি হবে। সদর শহর থেকে আসবে বাসটা। ততক্ষণে অন্ধকার হয়ে যাবে। এখনই সবখানে কুয়াসা জমে গেছে। তবে রাস্তা নির্জন নয়। মাঝে মাঝে রিকশ বা ট্রাক আনাগোনা করছে।

রঙ্গনা ঠাকমার গায়ে তাঁর চাদরটা ভাল করে জড়িয়ে দিয়ে বলল, 'এবার থেকে তাহলে তোমায় কনকঠাকুমা বলব।'

বৃদ্ধা জোরে মাথা নেড়ে বললেন, 'না না।'

'আচ্ছা ঠাকুমা! দিদি বা দাদা তোমার নাম জানে?'

'কেউ জানে না। কাকপক্ষীটিও না।' ...বৃদ্ধা আবার একটু হাসলেন। 'কাকেও বলিনি ভাই, কী দরকার? কেবল তোকেই বললুম।'

'ঠাকুমা, তোমার বাপের বাড়ি কোথায় ছিল গো?'

'বাপের বাড়ি? বাঁকা-ছিরামপুর চিনিস কোথা?'

'উঁহু। কোথায়?'

কুড়ানি ঠাকরুন মুখ নামিয়ে ঘাস ছিঁড়তে লাগলেন। মুখে একটা কালো ছায়া পড়েছে। রঙ্গনা ডাকলে আস্তে বললেন, 'শুনিছি নিমতিতের উদিকে কোথা যেন। কেউ সঠিক করে বলতে পারে না।'

রঙ্গনা স্তম্ভিত হয়ে গেল। এই বৃদ্ধার কোলে সে একরকম মানুষ হয়েছে। শৈশবে মায়ের মৃত্যুর পর ঠাকমাই ছিলেন তার মায়ের মত। অথচ আশ্চর্য, সে কোনদিন ঠাকমাকে তাঁর জীবন, তাঁর অতীত সম্পর্কে একটাও প্রশ্ন করেনি। একটু পরে রঙ্গনার মনে হল এটাই তো স্বাভাবিক। বাড়ির লোকেদের অতীত কথা কেই বা শুনতে চায়। ওঁরা নিজেরা যেটুকু বলেন নিজে থেকে, সেইটুকু। ঠাকুমা না ঠাকুমা। এত আপন, এত কাছের মানুষ—তার বাইরের অস্তিত্ব কেউ কল্পনা করতেও পারে না।

রঙ্গনা দুঃখিতভাবে বলল, 'সে কী! তুমি বুঝি বাপের বাড়ি বিয়ের পর আর যাওনি?'

'না। কেউ নিয়ে যায়নি। বললুম না, তোর ঠাকুর্দা ছিল পাষাণ মানুষ।'

'কী আশ্চর্য! তুমি লুকিয়ে গেলেও পারতে। আমি হলে তাই করতুম!'

'তোরা একালের মেয়ে। তোদের কত সাহস কত জোর! তাছাড়া আমি খোঁড়া-খঞ্জ মানুষ, ভাই।'

রঙ্গনা একটু চুপ করে থাকার পর বলল, 'তাই বলে তুমি এটুকুও জানবে না, বাঁকা-শ্রীরামপুর না কী বললে, সেটা ঠিক কোথায়?'

বৃদ্ধা হাসলেন। 'খোঁড়া হয়ে মায়ের পেট থেকে জন্মেছিলুম। বাড়ির বাইরে কি কখনও গেছি? তাছাড়া বাবা এই থানে যকন নিয়ে এল, তকন বয়সই বা কত? তেরো-চোদ্দর বেশি হবে না। খোঁড়া বলে বে হচ্ছিল না, তা জানিস?'

রঙ্গনা অবাক হয়ে বলল, 'তখন বুঝি অতটুকু মেয়ের বিয়ে হত?'

'আটবছর-দশবছর বয়েস হলেই বর খুঁজতে বেরুত লোকে।'

'বলো কী!' রঙ্গনা হাসতে লাগল। 'হ্যাঁ গো, তখন ঠাকুর্দার বয়স কত ছিল?'

বৃদ্ধা মুখ নামিয়ে দ্বিধাজড়িত গলায় বললেন, 'সে-হিসেব কি জানি? তকন সোমত্ত পুরুষ। পেল্লায় যোয়ান। তা আমার ডবল বয়েস তো হবেই।'

রঙ্গনা আরও হেসে বলল, 'তা যাই বলো—ঠাকুর্দাকে পাষাণটাষাণ করছ বটে, কিন্তু ওঁর উদারতার প্রশংসা করছ না। তোমার মতো প্রতিবন্ধী মেয়েকে বিয়ে করে ঠাকুর্দা খুব বড় মনের পরিচয় দিয়েছিলেন।'

বৃদ্ধা হাঁ করে কথাগুলো শুনলেন। কিন্তু কিছু বুঝতে পারলেন না। বললেন, 'আমার শাউড়ি ঠাকরুন আমায় অ-জাত কু-জাত বে-জাত বলে খোঁটা দিতেন। কেঁদে কেটে বলতুম, বিশ্বাস করো মা, আমি কায়েতের মেয়ে। অমনি মুড়ো ঝাঁটা তুলে বলতেন, বেরো, বেরো! বামুনের জাত মেরে আবার কথা হচ্ছে?'

রঙ্গনা চঞ্চল হয়ে হাততালি দিল। 'ঠাকুর্দা বেঁচে থাকলে কন্‌গ্রাচুলেশান জানাতুম! ভাবা যায়? অসবর্ণ বিয়ে করে গেছেন ভদ্রলোক!'

অন্যমনস্কভাবে কুড়ানি ঠাকরুন বললেন, 'অনিকে কতবার বলেছি—অপুকেও বলেছি, একবার বাঁকা-ছিরামপুর ঠিক কোথা একটু খোঁজখবর কর্। শোনে নি। বলেছে, সেখানে কী আছে? তবে আমারই দোষ, ভেতরের কথা খুলে তো বলিনি। বললে হয়তো খোঁজ করত।'

'বাবাকে বলো নি কেন?'

'গউর? তাকে বলতে নজ্জা হত ভাই। বড় নজ্জা হত।'

'সে কী! লজ্জা কিসের নিজের ছেলেকে?'

'রনি! জাতের খোঁটা বড় খোঁটা। গউর জানলে দুঃখু পেত। তাই কিছু বলিনি।'

রঙ্গনা রাগ দেখিয়ে বলল, 'বড় অদ্ভুত মানুষ তুমি! আজ হঠাৎ আমায় বললে যে?'

'বললুম।' বৃদ্ধা একটু চুপ করে থাকার পর ফের বললেন, 'মা বলালেন, তাই বললুম। আমার বোধ হয় ডাক এসেছে, তাই মা কাল রাত্তির থেকে স্বপন দিচ্ছেন খালি। তাই তোকে বলে গেলুম। রনি! তোর হাতে ধরে বলছি, এসব কথা কাকেও যেন বলবিনে ভাই।'

রঙ্গনা কী বলতে যাচ্ছে, একটু তফাতে ব্রিজের ওপর একটা মোটরগাড়ি এসে দাঁড়াল। আসন্ন সন্ধ্যায় ধূসরতা ক্রমশ ঘন হয়েছে। গাড়ির হেডলাইটে চোখ ধাঁধিয়ে গেল। কুড়ানি ঠাকরুন হকচকিয়ে বললেন, 'অই! বাস এল বুঝি?'

রঙ্গনা বলল, 'বাস ওদিক থেকে আসবে নাকি? ওদিকে তো বসন্তপুর। বাস আসবে এদিক থেকে।'

'লেট কল্লে তাহলে।'

মোটরগাড়িটা ফের স্টার্ট নিয়ে এগিয়ে এল। রঙ্গনাদের পাশে দাঁড়াল। রঙ্গনার বুকটা ধড়াস করে উঠল সঙ্গে সঙ্গে। সে বিহ্বল দৃষ্টে তাকাল গাড়িটার দিকে।

গাড়ি থেকে নেমে এল শতদ্রু। 'নমস্কার! আপনি রঙ্গনা না?'

রঙ্গনা চিনতে পেরে মুহূর্তে খুশি হয়ে বলল, 'বেড়াতে বেরিয়েছেন বুঝি? বিয়াসদি আসে নি?'

'ওর শরীরটা ভাল না।' শতদ্রু বলল। 'তা আপনারা এখানে কী করছেন সন্ধ্যাবেলা?'

'ঠাকুমাকে নিয়ে করালীর থানে এসেছিলুম। বাসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি।'

'আসুন।' বলে শতদ্রু কুড়ানি ঠাকরুনের দিকে তাকাল। 'ওঁকে ধরতে হবে বুঝি? আপনি উঠুন—আমি দেখছি।'

কুড়ানি ঠাকরুন হতবাক হয়ে গেছেন। রঙ্গনা বলল, 'বিয়াসদির দাদা। বিলেতে থাকেন...'

'স্টেটসে।' শুধরে দিল শতদ্রু।

রঙ্গনা হাসল। ...'ঠাকুমার কাছে বিলেতই এনাফ! ওঠ ঠাকুমা, তোমার কপাল! আসলে তোমার মা করালীই তোমার জন্য গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছেন।'

রঙ্গনার সাহায্যে বৃদ্ধা উঠলেন—তখনও হতচকিত অবস্থা। গাড়িতে ঢুকিয়ে দিলে সিঁটিয়ে বসে রইলেন। জীবনে বাসমোটরে দু'চারবার চেপেছেন। এমন গদিআঁটা গাড়িতে চাপেন নি। রঙ্গনা দেখল, তার ঠাকমা হাত বুলিয়ে গদি পরখ করছেন।

শতদ্রু বলল, 'আপনি সামনে আসুন না। কথা বলতে বলতে যাই!'

রঙ্গনা আস্তে বলল, 'থ্যাংকস। ঠাকুমা হয়ত অস্বস্তি বোধ করবেন একা।'

শতদ্রু বলল, 'তাই বটে! ঠিক আছে।'

গাড়ি সামনে এগোচ্ছে দেখে রঙ্গনা একটু চমকাল। আমরা উল্টোদিকে যাচ্ছি!'

'ভাববেন না। ঠিক পৌঁছে দেব।' শতদ্রু হাসতে হাসতে বলল। 'এই সুন্দর সন্ধ্যায় একটু চক্কর দিয়ে আসতে দোষ কী? বাসের আলো সামনে দেখলেই গাড়ি ঘোরাব।'

শেষ অব্দি ভালই লাগল রঙ্গনার। কিন্তু এমন প্রচণ্ড গতিতে গাড়ি চলেছে দেখে তার বুক টিপটিপ করছিল। মাঝে মাঝে লরি আসছে চোখে আলো ফেলে। পলকে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে। প্রতিবারই প্রাণের আশা ছেড়ে দিচ্ছে রঙ্গনা। শেষে বলল, 'ইস! ভীষণ জোরে গাড়ি চালাতে পারেন দেখছি!'

'আমেরিকার রাস্তা আরও চওড়া। একমুখো। তাছাড়া গাড়িগুলোও দারুণ! সেই অভ্যাস!' শতদ্রু আমেরিকার গল্প জুড়ে দিল। রঙ্গনাকে আকৃষ্ট করার ইচ্ছায় সে চঞ্চল হয়ে উঠেছে। আর এদিকে রঙ্গনারও ক্রমশ দ্বিধা কেটে যাচ্ছিল। সে অসংখ্য প্রশ্ন করতে থাকল। বইতে বড়া বিবরণের সঙ্গে মিলিয়ে নেবার ইচ্ছা। কুড়ানি ঠাকরুন কাঠ হয়ে বসে আছেন। কোন সাড়াশব্দ নেই।...

বইচোর

মধুরবাবু আজ খুব সমস্যায় পড়েছিলেন।

সারাদিন আকাশ মেঘলা ছিল। তারপর সন্ধ্যার দিকে হাওয়া উঠেছে কেঁপে। সেইসঙ্গে টিপ টিপ বৃষ্টি। উত্তরের হিম হাওয়ার সঙ্গে এই টিপ টিপ বৃষ্টিকে স্থানীয় লোকে বলে পউষে বাদলা। বসন্তপুরের বাজার এলাকা। তবু প্রায় জনশূন্য হয়ে গেছে। দোকানপাটের ঝাঁপ পড়ে গেছে সাত-তাড়াতাড়ি। শুধু

চায়ের আড্ডা, হোটেল, সিনেমাঘরের আনাচে-কানাচে আমুদে লোকেরা গুড়ে মাছি আটকে যাওয়ার মত্ত সেঁটে আছে। রাস্তায় সার হয়ে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকটা প্রকাণ্ড ট্রাক। সর্দারজীরা ট্রান্সপোর্ট কোম্পানির অফিসের চত্বরে আটচালার খাটিয়ায় বসে দারু পান করছে। পাত্রে গরম মাংসের ঝোল আর ইয়া মোটা চাপাটি।

মধুরবাবুর আগের দিনটা সুখের ছিল। আজ এমন দিনটা দুঃখের। পয়সাকড়ি ফুরিয়ে গেছে। হেমন্তের কামারশালে সন্ধ্যা নাগাদ গাঁজার আসর বসে। হেমন্ত আজ সন্ধ্যাতেই ঝাঁপ বন্ধ করে শুতে গেছে। মধুরবাবু শেয়ালভেজা হয়ে বাজারের এদিকে-ওদিকে ছোঁক-ছোঁক করে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। একটা ছাতি অবশ্য আছে। কিন্তু হাওয়ার দাপটে খালি উল্টে যায় সেটা।

আবগারির দোকানে আর ধার মেলে না। কুবের শা মধুরবাবুকে দেখলেই ট্যারা চোখে তাকিয়ে বলেন, 'পয়সাটা?' দেড় টাকা বাকি। 'পয়সা' বলেন এও মধুরবাবুর বাপের ভাগ্যি। পয়সা থাকলে হড্ডু মুচির মারফত মাল আনিয়ে নেন। টের পান না শা মশাই।

এই কাল-সন্ধ্যায় হড্ডু পেট্রোল পাম্পের পাশে তার ঝোপড়িতে ঢুকেছে। তেরপলের তাঁবুমত আস্তানা। হাওয়ায় থরথর করে কাঁপছে। মধুরবাবু টের পান, ফুটোয় চোখ রেখে হাওয়ার গতিক আঁচ করছে হড্ডু। তার জন্য মনে কষ্ট হয়। আহা, পৃথিবীতে কত মানুষের কত রকমের দুঃখদুর্দশা।

মধুরবাবুর হঠাৎ মাথায় এল সিঙ্গিবাড়ির শতদ্রুর কথা। ছোকরা তো মার্কিন মুল্লুকে থাকে। সেখানে নাকি হরেকরকম শুকনো নেশার ছড়াছড়ি। হেরোইন, মারিজুয়ানা, এল. এস. ডি। এদেশের বড়লোকের ছেলেরাও সেই রাস্তা ধরেছে। ধরবেই তো। সায়েব্রা মাথায় লম্বা চুল রাখলে নেটিবরাও রাখবে। ওরা সখ করে ছেঁড়া পাতলুন পরলে এরাও পরবে। আর ওই যে হিপি-হিপি করছে, আরে বাবা, হিপিই বল, লম্বা চুল বল, ছেঁড়া কাপড়চোপড় বল, ন্যাংটা-আধন্যাংটা হওয়া বল—সবই আগে ভারতে, তারপর সায়েবদের দেশে। কী বোকা এদেশের লোকেরা ভাবা যায় না।

মনে মনে শতদ্রুর সঙ্গে এইসব তর্কাতর্কি করতে-করতে সিঙ্গিবাড়ির গেটে পৌঁছে দেখলেন গেট বন্ধ। দারোয়ান জঙ্গ বাহাদুরও কোন গর্তে সেঁধিয়েছে। শতদ্রুকে ছেড়ে কেষ্ট কন্ট্রাকটরের মুণ্ডুপাত করতে-করতে মধুরবাবু হতাশ ও ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরলেন।

বাড়িটা বিরাট। বসন্তপুর বরাবর বনেদী বড়লোকের বাস। মধুরবাবু এ বাড়ির আশ্রিত। কমলাক্ষ ভটচায তাঁর অতি দূর সম্পর্কের মামা। ভটচাযরা পুরুষানুক্রমে সেবায়েতী এবং যজমানী বৃত্তি অবলম্বন করে এসেছেন, কমলাক্ষের আমলে তা পরিত্যক্ত হয়েছিল। কমলাক্ষের বয়স এখন প্রায় সত্তরের কাছাকাছি। এখনও খুব শক্তসমর্থ মানুষ। স্থানীয় স্কুলে জাঁদরেল হেডমাস্টার ছিলেন। বইপড়ার প্রচণ্ড নেশা। বাড়িতে বেশ বড় আকারে একটা পারিবারিক লাইব্রেরি গড়ে তুলেছিলেন। নিচের হলঘরে আলমারি ভর্তি বইয়ের যত্ন-আত্তি এখনও করেন। ক'মাস আগে একটা আলমারি ভেঙে অনেক বই চুরি গেছে। সেই থেকে হলঘরে কাকেও ঢুকতে দেন না। কড়া নজর রাখেন। তবু তাঁর অগোচরে প্রায়ই একটা করে বই চুরি হচ্ছে। চোর যে ঘরের মানুষ, তাঁর মাথায় এখনও ঢোকে নি।

বাড়ি যেমন বড়, লোকজনও প্রচুর। চার ছেলে, তাদের বউ, নাতি-নাতনি নিয়ে বৃহৎ একান্নবর্তী সংসার। এযুগে এমন সংসার দেখা যায় না। তবে কমলাক্ষের মৃত্যু হলে কী হবে, অনুমান করা সোজা।

খিড়কির দরজার পাশে যে পাঁচিল, তার ওদিকে খানিকটা আগাছাভরা পোড়ো জায়গা। কেউ জানে না, ঝোপের ভেতর একটা চাষবাসের ছোট্ট মই লুকোন আছে। মইটা মধুরবাবু চাষীপাড়া থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। বাড়ি ফিরতে রাত হলে মইটা কাজে লাগে। পাঁচিল থেকে জবাগাছের প্রকাণ্ড ঝাড়ে পা রেখে নামেন। তারপর দরজা খুলে বেরিয়ে মইটা যথাস্থানে রেখে আসেন।

খিড়কির দিকের উঠোনটুকু ঠাকুরদালানের। এ পরিবারের পূজ্য গৃহদেবতা সিংহবাহিনী আত্রেয়ী দেবী। এ অঞ্চলের সব দেবদেবীর ইনিই নাকি অধীশ্বরী। তাই ভটচাযদের অনেক অনেক স্থানীয় দেবীর পুজোআচ্চা এবং সেবায়েতীও করেছেন, বংশে দোষ ঢোকেনি কোনকালে। কিন্তু শোনা যায় ঈশানপুরের মাঠে নদীর ধারে প্রাচীনা এক দেবী করালীর সেবায়েতী করতে গিয়ে কমলাক্ষের জ্যাঠামশাই বেণীমাধব গৃহদেবীর কোপে পড়েন। তাঁর মুণ্ডহীন দেহ উদ্ধার করা হয় করালীর থানের

ইঁদারা থেকে। এ ঘটনা প্রায় ষাট বছর আগেকার। কমলাক্ষের তখন সবে হাঁটি-হাঁটি দশা। সঠিক কী ঘটেছিল কেউ বলতে পারে না। জনরব আছে, দেবী করালীর সামনে প্রণামরত বেণীমাধবের মুণ্ডচ্ছেদ করেন দেবী আত্রেয়ী এবং মুণ্ডটি নিজে গ্রহণ করে দেহটি অধীনস্থ করালীকে অনুকম্পাভরে দান করেন। দেবী করালীও কম নন। ঘৃণা ভরে সে-দেহ প্রত্যাখ্যান করেন এবং লাথি মেরে ইঁদারায় নিক্ষেপ করেন। তারপর মনের দুঃখে সেই দেবী করালী নিরুদ্দিষ্টা হয়ে যান। তাঁর বিগ্রহ আর কেউ থানে দেখেনি সেই থেকে।

জনরবের আর একটু গোপন অংশ আছে। বেণীমাধব নাকি দেবী করালীর ভিটেতে প্রচুর ধনরত্ন পেয়েছিলেন। সেই টাকায় রাতারাতি ভটচাযপরিবারের আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়েছিল। এত বড় বাড়িটা তিনিই রেখে গেছেন। কমলাক্ষর বাবা সত্যসুন্দর তো চির-রুগী মানুষ ছিলেন। খেঁটে কাষায় বস্ত্র পরে ঘুরতেন। ন্যাড়া মাথায় একটি দীর্ঘ শিখা, পেটের রোগের কারণে হাতে সবসময় গাড়ু। জমিদার সিঙ্গিদের ভাটার কাছে জৈবকর্মে যেতেন এবং নাকি প্রতিদিন একটা করে ইট হাতে বাড়ি ফিরতেন। একদিন সিঙ্গিরা হাতে-নাতে ধরে খুব অপমান করেছিলেন। তারপর সত্যসুন্দরের দাদা বেণীমাধব প্রতিজ্ঞা করেন, সিঙ্গিদের চেয়ে বড় দালানবাড়ি না বানিয়ে জলস্পর্শ করব না।

মধুরবাবু ওঁদের কাউকে দেখেন নি। তাঁর বয়স প্রায় বাহান্ন বছর। ধানবাদের ওদিকে রেলে টিকিটচেকার থাকার সময় তুচ্ছ কারণে চাকরি যায়। চিরকুমার মানুষ। এখানে-ওখানে হন্যে হয়ে শেষে বসন্তপুরে আশ্রয় নেন। কমলাক্ষ টের পেয়েছিলেন, এই ভাগ্নেবাবাজীর গতিক সুবিধের নয়। বাড়ির বাজার করা, সাংসারিক হাজারটা কাজে সহায়তা, কখনও কাচ্চা-বাচ্চাদের পড়ানো—এসব কাজে প্রচুর ফাঁকি দিতেন মধুরচন্দ্র। শেষে ত্যক্তবিরক্ত হয়ে তাঁকে রেহাই দেওয়া হয়েছে। এ বাড়ির লোকেরা এখন আড়ালে বলে, শিবের ষাঁড়। কানে এলেও হজম করতে হয় মধুরবাবুকে। বাইরে লোকের কাছে বলেন, 'আখায় ফুঁ, শাঁখে ফুঁ আর কানে ফুঁ দেওয়া বংশ তো। বরাবর সেবায়েতী সম্পত্তি হরেহম্মে খেয়ে ফুলে ঢাক হয়েছে। রোসো না, বুড়ো টেঁসে যাক—কী হয় দেখবে। তাসের ঘর হুড়মুড় করে ধসে যাবে—হুঁ বাবা!'

পউষে বাদলায় সাত-সন্ধেয় খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেছে টের পেলেন মধুরবাবু। ঠাকুরদালানে মিটমিটে বাল্ব জ্বলছিল। কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকলেন ঘাপটি মেরে। এমন একটা রাতে মৌতাত হল না—দুঃখে প্রাণটা কাতর হয়ে গেছে।

থামের আড়ালে চোখ বুজে ঘণ্টাখানেক পড়ে থাকার পর বাড়ি যখন সুনসান হয়ে গেল, তখন ছাতিটা বগলদাবা করে পা টিপে টিপে বেরুলেন।

টানা বারান্দার পর ভেতর বাড়ির দরজা। দরজা আটকানো আছে। বাঁয়ে হলঘর। খড়খড়ির জানালা। ছাতির ডগা দিয়ে খড়খড়ি তুলে ভাঙা জায়গাটা দিয়ে হাত ভরে একটা পাট সাবধানে খুললেন।

একটা মরচেধরা গরাদ অনেকদিন আগে থেকে আলগা করে রেখেছেন। ওপরে চৌকাঠটা রেখেছেন ফাটিয়ে। নিচের দিকটা ঠেলে তুলতেই সেটা উঠে গেল। তখন গরাদটা টেনে বের করে দিলেন। ওই পথেই একবার বাউরি পাড়ার বংকার সাহায্যে এক বস্তা বই চুরি করে বেচে এসেছিলেন কলকাতায়।

রোগা পাঁকাটি গড়ন। গলিয়ে যেতে অসুবিধা হয় না মধুরবাবুর। অন্ধকার হলঘরে ঢুকে কিছুক্ষণ শ্বাস চেপে দাঁড়িয়ে রইলেন। কদিন থেকে মফেজ হোসেন দপ্তরী এসে পুরনো বই আর মাসিক পত্রিকা বাঁধিয়ে দিচ্ছে। মেঝেয় হাতুড়ি, ছেনি, ময়দার লেই, সুতোর গুটি, শিরিস কাগজ, চামড়া এসব হরেক জিনিস পড়ে আছে। পায়ে লাগলে শব্দ হবে। পকেট থেকে দেশলাই বের করে জ্বালতে গিয়ে দেখলেন, ভিজে চুর হয়েছে। এদিকে নিজেরও হিমখাওয়া ভেজা শরীরে নিঃসাড় অবস্থা। ঘরের ওমে কিছুটা ধাতস্থ হয়েছেন মাত্র।

হাঁটু গেড়ে হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে গিয়ে বুকটা ধড়াস করে উঠল। একগাদা বই হাতে ঠেকেছে। হাত বুলিয়ে বুঝলেন, ভারি একটুকরো পাথর চাপিয়ে রেখে গেছে মফেজ দপ্তরী।

একখানা বইয়েরই ওজন কম নয়। তাই সই। কথায় বলে, চোরের কপনিটুকুও লাভ।...

কিছুক্ষণ পরে মধুরবাবু যখন আগাছার জঙ্গল থেকে বেরিয়ে পুরনোপাড়ার পথে হাঁটছেন, তখন পউষে বাদলার আরও জোর বেড়েছে। মাথার ওপর গাছপালা এবং ছাতিটা থাকায় তাঁকে ঘায়েল করতে পারছে না বাদলাটা।

কালু মুখুয্যের ভিটেয় ঢুকে দেখলেন, টিনের কপাটের ফাঁকে আলো নজর হচ্ছে। মৃদু ধাক্কা দিতে দিতে কাঁপা-কাঁপা গলায় ডাকলেন, 'রনি। অ রনি! রনি মা!'

অপরূপা পাশের ঘরে শুয়ে পড়েছে। অন্য ঘরের দরজা তখনও খোলা। কুড়ানি ঠাকরুনের শুতে অনেক দেরি হয়। কদিন থেকে রঙ্গনা তাঁর কাছ ঘেঁষে ঘুরছে। তাঁর কাছেই শুচ্ছে। কুপি জ্বলছে দরজার চৌকাঠের কাছে। কুড়ানি ঠাকরুন পাশে দু'পা ছড়িয়ে বসে বৃষ্টির শব্দ শুনছিলেন। রঙ্গনা সামান্য তফাতে বসেছে বিছানার পায়ের দিকটায়। মেঝেয় বিছানা করেই শোন ঠাকরুন। কুপির শিষ হাওয়ায় ঘুরে কেবল নাকে এসে ঢোকে। তাই রঙ্গনা কুপির একটু দূরে স্থান নিয়েছে। বিছানার পায়ের দিকে উপুড় হয়ে সে ভার্জিনিয়া উলফ পড়ছে। বইটার টাইটেলপেজ সুদ্ধু মলাট ছেঁড়া। এটাই মধুরবাবুর কাছে ছটাকায় দরাদরি করে কিনেছিল সে।

কুড়ানি ঠাকরুনের কান এখনও পাতলা। চমকে উঠে বললেন, 'অই! অই!'

রঙ্গনা বইয়ের পাতায় চোখ রেখেই বলল, 'উঁ?'

কুড়ানি ঠাকরুন নড়বড় করে ওঠার চেষ্টা করে গলা চেপে বললেন, 'অই গো! অনি এসেছে নাকি।'

রঙ্গনা চমকে উঠে তাকাল। 'দাদা? কই? কোথায়?'

'ডাকছে! ওই শোন্।' ঠাকরুন আরও গলা চেপে বললেন। চোখ বড় হয়ে গেছে। তারাদুটো ঠেলে বেরুচ্ছে যেন।

রঙ্গনা ধুড়মুড় করে উঠে পড়ল। পাশের ঘরের দরজায় দিদিকে ব্যস্তভাবে ডাকতে থাকল। কোন সাড়া পেল না। অপরূপা গভীর ঘুমে তলিয়ে গেছে। তখন রঙ্গনা দৌড়ে বৃষ্টির মধ্যে উঠোন পেরিয়ে টিনের দরজাটা যেই খুলেছে, মধুরবাবু ঢুকে পড়লেন।

রঙ্গনা তখনও চিনতে পারে নি! লম্পের আলো এতদূর পৌঁছয়নি—বারান্দার থামের আড়ালে রয়েছে। দরজা আটকে সে বলল, 'কোত্থেকে এলে এভাবে? কোথায় ছিলে অ্যাদ্দিন?'

মধুরবাবু বারান্দায় গিয়ে উঠেছেন বিনা বাক্যব্যয়ে। রঙ্গনা যথেষ্ট ভিজে এসে যখন দেখল মধুরবাবু—দাদা নয়, তখন সে প্রথমে বিরক্ত হয়ে পরমুহূর্তেই হাসিতে ভেঙে পড়ল।

মধুরবাবু কুড়ানি ঠাকুরুনকে প্রায় ডিঙিয়ে ঘরে ঢুকে রুদ্ধশ্বাসে বললেন, 'ক্লোজ দা ডোর! ক্লোজ দা ডোর—ইমিডিয়েটলি!'

বৃদ্ধা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে মধুরবাবুকে দেখছেন। রঙ্গনা দরজা বন্ধ করল না। বলল, 'বই এনেছেন মধুর কাকা? কী বই, দেখি—দেখি।' সে বইটা প্রায় ছিনিয়ে নিল। সুন্দর ও মজবুত বাঁধানো প্রকাণ্ড বইটার গন্ধ শুঁকল আগে। সদ্য বাঁধানো বলে গন্ধটা তার মনঃপূত হল না। বইয়ের গন্ধ তার কী যে ভাল লাগে। খুলে দেখল, প্রবাসী পত্রিকা।

মধুরবাবু মেঝেয় বসেছেন এবং হু হু হ্যা হ্যা শব্দে কাঁপছেন। রঙ্গনা লম্পের আলোয় ঝুঁকে পড়ল বইয়ের পাতায়। রবীন্দ্রনাথের রাশিয়ার চিঠির কিস্তি, আবার তাঁরই কবিতা। অভ্যাসমত দ্রুত চোখ বুলোচ্ছিল রঙ্গনা। মধুরবাবু অতিকষ্টে বললেন, 'বেশি চাইব না মা দুটো—মাত্তর দুটো টাকা এখন দে। পরে যা হয় কিছু দিবি। আর শোন, লুকিয়ে পড়বি। কেউ যেন না দেখতে পায়। আর মা রনি, যদি এক কাপ চা খাওয়াতে পারিস, প্রাণভরে আশীর্বাদ করব মা!'

রঙ্গনা বই বুজিয়ে রেখে হাসিমুখে তাকাল। '...চা? ঠাকুমা, একটু চা করা যায় না? উনুনে আঁচ নেই?'

কুড়ানি ঠাকরুন গুম হয়ে বললেন, আঁচ নিভে গেছে। দুধও নেই, বাছা!'

'অ।' নিরাশ গলায় মধুরবাবু বললেন, 'তা একটুখানি কাঠকুটো জ্বেলে চা কি করা যায় না? রনি,

টোটাল প্রাইস বরং একটা টাকা ধরেই দেব'খন। বড় ঠাণ্ডা, মাদার! শেয়ালভেজা ভিজেছি!'

রঙ্গনা বলল, 'দেখছি। তবে দুধ নেই যে!'

'র-টিই খাব। প্লিজ মাদার রঙ্গনা!' দুঃখিত মুখে হাসলেন মধুরকৃষ্ণ গোস্বামী।

বারান্দার শেষে রান্নাঘর। রঙ্গনা কুপি হাতে বেরুল। অন্ধকারে মধুরবাবু আর কুড়ানি ঠাকরুন চুপচাপ বসে আছে। একটু পরে বৃদ্ধা গলা ঝেড়ে নিয়ে ডাকলেন, 'বাবুমশাই!'

'বলুন বুড়িমা।'

কুড়ানি ঠাকরুন এই লোকটিকে কয়েকবার দেখেছেন। রঙ্গনাকে বই বেচে যান। তাই নামটাও শোনা আছে। খঞ্জ মানুষ—বিশেষ করে তাঁর মত স্ত্রীলোকের জীবনের গণ্ডী চিরদিন খুব সীমাবদ্ধ। বড়জোর বাড়ির আনাচ-কানাচটুকু খুঁটিয়ে জানা। তার বাইরে যাবার সুযোগও কম এবং গেলে পরে ফাঁপরে পড়ে যান। বললেন, 'একটা কথা বলতুম আপনাকে।'

মধুরবাবু টাকা এবং চায়ের স্বপ্নে আবিষ্ট। খুশি হয়ে বললেন, 'বলুন, বলুন।'

'রনির কাছে শুনিছি, আপনি রেলের লোক। রেল গাড়িতে টিকিট পরীক্ষে করতেন।'

'করতুম বটে।' মধুরবাবু আরও খুশি হয়ে বললেন।

'তা আপনি তো ঢের-ঢের দেশে ঘুরেছেন।'

'ঘুরেছি।'

'নিমতিতের উদিকে বাঁকা-ছিরামপুর চেনেন বাবুমশাই?'

রেলের লোক বলেই 'বাবুমশাই' এই সম্ভ্রমসূচক সম্বোধন কুড়ানি ঠাকরুনের। মধুরবাবু অনেকক্ষণ খোজাখুঁজি করে বললেন, 'নিমতিতের ওদিকে বাঁকাশ্রীরামপুর? মনে আসছে আবার আসছে না। একটু ধৈর্য ধরুন বুড়িমা। চা পেটে পড়লেই মেমরি খুলবে।'

বাইরে পউষে বাদলার সারাক্ষণ শোঁ শোঁ ঝির ঝির বিচিত্র শব্দ। বৃষ্টিটা বেশিক্ষণ চললে ছাদ চুঁইয়ে জল পড়বে। রঙ্গনা চা আনল গেলাসে। তারপর মিষ্টি হেসে বলল, 'মধুরকাকা, পত্রিকাটা আপনি নিয়ে যান।'

মধুরবাবুর গলায় চা আটকে গেল। কাসতে থাকলেন। লালচে চোখের ঢ্যালা বেরিয়ে এল। শিরাবহুল গলার ওপর ধুকধুকি নড়তে দেখা গেল কুপির আলোয়।

রঙ্গনা তেমনি হাসিমুখে বলল, 'প্রথম কথা, পত্রিকা-টত্রিকা আমার তত ভাল লাগে না।'

'অ।' মধুরবাবুর মুখ দিয়ে বেরুল। মনে মনে বললেন, হারামজাদী! এতক্ষণ রান্নাঘরে বসে ভেবে-টেবে এই ঠিক করেছ তাহলে? হায়! কোন মুখে যে চা খাব বললুম। ঝোঁকের মাথায় যা হবার হত।

রঙ্গনা বলল, 'দ্বিতীয় কথা, আমার কাছে এখন একটা পয়সাও নেই।'

মধুরবাবু ঝটপট বললেন, 'পরে দিবি। সকালে দিবি। একটু বেলা হলেই দিবি বরঞ্চ।'

রঙ্গনা নির্বিকারভাবে মাথাটা দুপাশে দোলাল। 'বিশ্বাস করুন, নেই!'

'সেদিন তো অতগুলো টাকা দেখলুম।' মরিয়া মধুরবাবু শেষ চেষ্টা করলেন।

'সে তো ঠাকুমার। তাই না ঠাকুমা?'

বৃদ্ধা ওর দিকে একবার তাকালেন মাত্র। মধুরবাবু মেঝেয় পাছা ঘষটে বৃদ্ধার কাছে এসে 'ইউরেকা' বলার সুরে বলে উঠলেন, 'অই-! মনে পড়েছে— বাঁকা-শ্রীরামপুর পাকুড় স্টেশনের কাছে।'

বৃদ্ধা সন্দিগ্ধ স্বরে অস্ফুট বললেন, 'পাকুড়! পাকুড়! নাম-শুনিছি।'

'ওদিকে পাকুড়, এদিকে নিমতিতে—তার মাঝামাঝি।'

'বড় গাঁ। জমিদারী কাছারি ছিল।' বৃদ্ধা বলতে থাকলেন। 'ঝুলনপুন্নিমেতে রাসের মেলা বসত কাছারি বাড়িতে। সে কী হুলস্থুলুস, সে কী ভিড়! বাবার কোলে চেপে মেলায় যেতুম। আর ছিল পেল্লায় পেতলের রথ। একশো লোকে টেনে নড়াতে পারত না। তখন ডাক পড়ত কৈলেসের। কৈলেস ছিল পাহাড় পুরুষ। গায়ে অসুরের শক্তি। মাথায় জটা গজিয়েছিল কৈলেসের। ভাং খেত একবালতি করে। সেই কৈলেস এসে বাবার নামে জয় হেঁকে যেই না দিয়েছে রশিতে হাত, চাকা গড় গড় করে গড়াতে নেগেছে।'

কুড়ানি ঠাকরুন শীর্ণ একটা হাত দুলিয়ে দিলেন দরজার দিকে—যেন চাকা গড়িয়ে দিলেন প্রাচীন এক রথের।...'আমার বাপের গাঁয়ে আর একটা হুলস্থুলুস ছিল পুণ্যার দিন। পুণ্যা কত্তে জমিদার আসতেন কোন মুল্লুক থেকে। শুনিছি, তিনি পদ্মাপারের লোক। হাতি চেপে আসতেন। হাতির গলায় ঘণ্টা বাঁধা থাকত। আমাদের বাড়ির ছামু দিয়ে হাতি যেত ঘণ্টা বাজিয়ে। আমি তো খোঁড়া-খঞ্জ মেয়ে। ছটফট কত্তাম। পাড়ার ছেলেমেয়েরা ছড়া গাইতে গাইতে হাতির পেছনে-পেছনে যাচ্ছে, হাতি তোর গোদা গোদা পা। হাতি তুই নেদে দিয়ে যা...'

বৃদ্ধা হাসতে থাকলেন। 'কে নিয়ে যাবে আমায় বলো? বাবা ছেরেস্তাদার মানুষ। আছেন কাছারিতে। আমার মাকে চোখে দেখিছি বলে মনেও পড়ে না। খাঁচার পাখির মতো ঘরে বন্দী আছি। ওই যে পাখি যেমন ছোলাদানা খায়, বাবা রেঁধেবেড়ে রেখে গেছেন, খিদে পেলে খাচ্ছি। হঠাৎ হাতির গলায় ঘণ্টার শব্দ।' হঠাৎ যেন মাথায় ঘা খেয়ে চুপ করে গেলেন। ঘোলাটে চোখের ফ্যাকাসে তারা বজবজ করছে জলে।

রঙ্গনা বাঁধানো পত্রিকাটা ফেরত দেবার আগে সুযোগ পেয়ে চোখ বুলিয়ে নিচ্ছিল। এবার ঠাকুমার দিকে তাকাল। মধুরবাবুর চা শেষ। জায়গামত কোপ বসানোর অপেক্ষায় আছেন। বললেন, 'সেই বটে, সেই বটে। সেই বাঁকা-শ্রীরামপুর। খুব চিনি, খুব চিনি।'

কুড়ানি ঠাকরুনের চোখ ভিজে গেছে। ক্লান্তভাবে বললেন, 'তা আমার একবার নিয়ে যেতে পারেন বাবা? আমি আপনার মায়ের মতন। গউর বাঁচলে অ্যাদ্দিন আপনার বয়সী হত।'

মধুরবাবু সায় দিতে দেরি করলেন না। 'আলবাৎ নিয়ে যাব। বাঃ, এ কী একটা কথা হল? এ বয়সে বাপের গাঁ যেতে কার না ইচ্ছে করে? এই যে দেখছেন, আমারও অবস্থা কি অন্যরকম? আমাদের বাড়ি ছিল রামপুরহাটের ওদিকে। প্রাণ কেঁদে যায় মা, বুঝলেন? কিন্তু যাব কোথায়? ভিটেমাটিটুকুও আর নেই।'

বৃদ্ধা সহানুভূতি দেখিয়ে বললেন, 'কী হল বাবা?'

'আত্মীয়স্বজনে দখল করে নিয়েছে। আর কী হবে?' মধুরবাবু রঙ্গনার দিকে আড়চোখে চেয়ে ফের বললেন, 'আপনার বেলায় তা হবে না। আপনি তো স্ত্রীলোক। আপনার বাবাজ্যাঠার বংশ এখনও ভিটে আলো করে বসে আছে। দেখলে কত আদর করে তুলে নেবে।'

কুড়ানি ঠাকরুন নিস্তেজ ভঙ্গিতে বললেন, 'কে জানে কে বেঁচে আছে কী নেই! এখানে এসে তো আর যাওয়া হয় নি।'

পারিবারিক ব্যাপারে হাত পড়েছে দেখে রঙ্গনা সজাগ হল। পত্রিকাটা বুজিয়ে মধুরবাবুর হাতে জোর করে গুঁজে দিয়ে বলল, 'রাত অনেক হল মধুরকাকা। এবার আমরা ঘুমব।'

মনে মনে ক্রুদ্ধ হলেও মধুরবাবু দাঁত বের করলেন। 'ঠিক, ঠিক। তাহলে এটা রাখবিনে মা?'

'না।'

'এক কাজ কর।' মধুরবাবু চাপা গলায় বললেন। 'রাত্তিরটা তোর কাছেই থাক। সকালে এসে নিয়ে যাব। কেমন? আর বুড়িমা, তাহলে ওই কথা রইল। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা। ওয়েদার ভাল হলেই মায়ে-পোয়ে বেরিয়ে পড়ব।'

পত্রিকাটা বিছানায় রেখে মধুরবাবু উঠলেন। দরজার বাইরে গিয়ে ছাতিটা নিলেন। তারপর একটু কেসে বৃদ্ধার দিকে হেঁট হয়ে কাঁচুমাচু মুখে বললেন, 'একটা কথা বলছিলুম, মা।'

'বলো বাবা!'

'এখন একটা টাকা হবে? ধারই চাইছি। খুব দরকার, মা। দিন না একটা টাকা!'

কুড়ানি ঠাকরুন পেটের কাছে কাপড়ের ভেতর হাত পুরে দিলেন। দুটো আধুলি বের করে বললেন, 'আমি গরিব মানুষ। ফলটা ফুলটা বেচে খাই, বাবা। সকালে একঝুড়ি পেয়ারা বেচেছিলুম।'

মধুরবাবু আধুলি দুটো তুলে নিয়ে ঝটপট বেরিয়ে গেলেন। হাওয়াটা আছে। বৃষ্টি একটু কমেছে। ঘুরঘুটে অন্ধকার এই পাড়াটা। তবু এই দুর্যোগের রাতকে মৌতাতে জমিয়ে তোলার তাগিদে মধুরকৃষ্ণ পাগলের মত ছুটে চললেন বাউরিপাড়ার দিকে। ন্যাড়া বাউড়ি গোপনে গাঁজা বেচে।

ন্যাড়াকে ঘুম থেকে ওঠানো সহজ কথা নয়। মালটা তার বউ দিল। মধুরবাবুর গায়ে তখন মত্ত হাতির বল।

ঠাকুরদালানের এদিকে নিচের তলায় কোনার ঘরে মধুরবাবু থাকেন। একটা জীর্ণ তক্তাপোষে নোংরা বিছানা পাতা। তক্তাপোষটা পাশ ফিরলেই বিশ্রি শব্দ করে। নসু ঠাকুর সপরিবারে থাকে পাশের ঘরে। রাতের খাবারটা সে যত্ন করে ঢেকে রেখে যায় এ ঘরে। সেও গাঁজাখোর মানুষ। তবে নিজে কেনে না, প্রসাদ পায়।

মধুরবাবু ভিজে দেশলাই অনেক সাধ্যসাধনা করে জ্বেলে হেরিকেন ধরালেন। এঘরের বাল্বটা কতদিন থেকে জ্বলে না। বলে-বলে হদ্দ হয়ে গেছেন। কেউ গ্রাহ্য করে না। তাই অভিমানে একটা হেরিকেন চেয়ে এনেছেন হেমন্ত কামারের কাছ থেকে। হেমন্ত বিদ্যুৎ নিয়েছে কামারশালে। হেরিকেনটা তাই পড়েছিল অযত্নে।

হেরিকেন জ্বেলে খাবারটা দেখলেন মধুরবাবু। কয়েকটা রুটি—'কুকুরের কান' তাঁর ভাষায়। একটু তরকারি। ছুঁলেন না। তাকে এক গেলাস দুধ আছে। দুধটা তাঁর নিজের পয়সার। মাসকাবারে দিয়ে যায় নকড়ি গোয়ালা। নসু ঠাকুর সেটার জিম্মাদার। গরম করে তেমনি যত্নে রেখে দেয়। বেড়ালের উৎপাতে মাঝে মাঝে দুধটা ভোগে লাগে না। কিন্তু কপালটাই যার পোড়া, সে করবেটা কী? তবে গাঁজার ভোগ হল গিয়ে দুধ। দুধের জোরেই এখনও টিকে আছে শরীরটা।

গুপ্তস্থান থেকে কল্কে ও ছোবড়ার গুটি বের করে গাঁজাটা আচ্ছারকম ডলে বিছানায় বসে মধুরবাবু মনে মনে বললেন, 'ব্যোম ব্যোম শংকর! জয় বাবা ভোলানাথ! বড় সুন্দর এই রাতটা পৃথিবীতে ছেড়েছে বাবা!'

বেলাপর্যন্ত ঘুমোন মধুরকৃষ্ণ। কিন্তু তার আগেই দরজা লাথির চোটে খিল ভেঙে দড়াম করে খুলে গেল। রাঙা চোখে ধুড়মুড় করে উঠে বসতেই কমলাক্ষর রুপো বাঁধানো ছড়িটা এসে পড়ল কপালে। তারপর কাঁধে।...'স্কাউন্ড্রেল! শুওরের বাচ্চা! চোর! আজ তোমায় শেষ করে ফেলব।' কমলাক্ষের গর্জনে ঠাকুরদালান গমগম করে উঠল। বাইরে পউষে বাদলা আগের দিনের মত ঝরছে ঝির ঝির করে। হাওয়া বইছে উদ্দাম। কপাল, ঠোঁটের কাছটা কেটে রক্ত ঝরছে মধুরকৃষ্ণের। চুপ করে বসে আছে মরা মানুষের মত। কেউ আটকাচ্ছে না কমলাক্ষকে।

দেয়ালে লেগে ছড়িটা মট করে ভেঙে গেল। তখন চুল খামচে ধরে হিঁচড়ে নামালেন। লাথি খেয়ে মধুরবাবু কঁক শব্দ করে পড়ে গেলেন।

কমলাক্ষ ভাঙা গলায় গর্জালেন, 'কোথায় কাকে বেচলি হারামজাদা? বল কাকে বেচেছিস?' তারপর আবার কাঁধে একটা লাথি। 'গাঁজাখোরটাকে আজ শেষ করে ফেলব!'

কমলাক্ষের বয়স হয়েছে! থরথর করে কাঁপছেন। এতক্ষণে ওপর থেকে বড় ছেলে সুহাস এসে তাঁকে ধরল। এবয়সে এতটা বাড়াবাড়ি হার্ট সইবে না। টানতে টানতে নিয়েগেল বাবাকে। সুহাস স্থানীয় কলেজের লেকচারার। বাবার মতে আদর্শ ছেলে। তাই সে ছাড়া কমলাক্ষকে নিবৃত্ত করা আর কারুর পক্ষে সম্ভব ছিল না। আপাতত বাবাকে সে হলঘরে নিয়ে গেল। তার কথা শোনা যাচ্ছিল—'নিজেও হার্টফেল করে মারা পড়বেন, আবার ওই গাঁজাখোরটাকে খুনখারাপি করে বাড়ির সবাইকে বিপদে ফেলবেন। এ এক জ্বালা!'

মধুরকৃষ্ণের মুখ রক্তে ভেসে যাচ্ছে। হাতের আঙুলে রক্তটা দেখে অবাক হয়ে গেছেন যেন। নিজের রক্তের দিকে তাকিয়ে আছে। কাঁধে আর উরুর কাছে প্রচণ্ড ব্যথা। মুখের ক্ষতগুলো রক্ত ঝরাচ্ছে, কিন্তু টের পাচ্ছেন না কোন যন্ত্রণা। মুখমণ্ডল—গলার ওপরের অংশটা নিঃসাড় হয়ে গেছে যেন।

বাড়ি অসম্ভব স্তব্ধ। কতক্ষণ পরে আস্তে আস্তে তক্তা-পোষটা আঁকড়ে অনেক কষ্টে উঠে দাঁড়ালেন হতভাগ্য প্রৌঢ় মধুরকৃষ্ণ। কিন্তু দাঁড়ানো যাচ্ছে না। বিছানায় গড়িয়ে পড়লেন। তারপর বুকের খুব

ভেতর থেকে একটা কান্নার মত আওয়াজ টেনে কণ্ঠনালী পার করালেন—তখন সেটা একটা জান্তব হুংকারে পরিণত হল মাত্র। তাঁর আহত শরীরটা কাঁপতে থাকল শুধু।

নসু ঠাকুর দয়াপরবশ হয়ে উঁকি মেরে চলে গেল ঘণ্টাখানেক পরে। সে দেখে গেল, চিত হয়ে চোখ বুজে শুয়ে আছেন মধুরবাবু—সারা মুখে কালো রক্তের ছোপ। বড় ভয়ংকর দেখাচ্ছে। পা দুটো অভ্যাসমত নাড়াচ্ছেন দেখে নসু ঠাকুর জেনেছে, বাবু জীবিত আছেন।

বিপাশার ঘরে রাত

কিছুকাল থেকে বিপাশা এক অদ্ভুত অসুখে ভুগছে। তার কোন-কোন রাতে ভাল ঘুম হয় না। ঘুম যদি বা একটুখানি আসে, কী সব স্বপ্ন এসে ঘিরে ধরে ঝাঁকে-ঝাঁকে। জলে টোপ পড়লে যেমন করে মাছের ঝাঁক এসে ঠোকরায়। নিজের কোন কথা মুখ ফুটে কাউকে বলার অভ্যাস নেই বিপাশার। সে বুঝতে পারে, নিজের ভেতরটা যেন একবিন্দু করে ক্ষয় হচ্ছে এবং একটা গহ্বর সৃষ্টি হচ্ছে দিনে দিনে। সেই গহ্বরে মাঝে মাঝে শোঁ শোঁ করে ভুতুড়ে হাওয়ার শব্দ তালগোল পাকিয়ে যায়—সে কে, কেন এখানে কাটাচ্ছে, কিছুক্ষণ ধরে এসব প্রশ্ন তাকে বড্ড জ্বালায়। জবাব খুঁজে পায় না। অনেক সময় বাবা বা মায়ের দিকে তাকিয়ে তার অবাক লাগে। ওঁরা কে? দূরের জন—অনাত্মীয়, কিংবা সম্পর্কহীন মানুষ বলে ভুল হতে থাকে। তখন সে বাবা অথবা মায়ের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকে। ছুঁয়ে ভুল ভাঙার চেষ্টা করে। শমিতা বলেন, 'কী হল বিয়াস? শরীর খারাপ?' দুহাতে মাকে জড়িয়ে ধরে বিপাশা ছোট্ট মেয়ের মত বুকে মাথা গোঁজে। কৃষ্ণনাথ আড়ালে স্ত্রীকে বলেন, 'আমায় তো বড্ড ভাবিয়ে তুললে বিয়াস। পরের বাড়ি গিয়ে কাটানো ওর হয়তো প্রব্লেম হবে।' শমিতা এতকিছু না বুঝে বলেন, 'প্রব্লেম সবারই হয়। আমারও কি হয় নি! তুমি ছাড়ো তো ওসব অলক্ষুণে কথা।'

কদিন থেকে অকালবৃষ্টির উপদ্রব চলেছে। শুধু বৃষ্টি হলে কথা ছিল, ঝোড়োহাওয়া বইছে শোঁ শোঁ করে। গাঢ় হিমে আচ্ছন্ন দিনরাত্রি। এর মধ্যে শতদ্রু গাড়ি হাঁকিয়ে ঘুরে আসছে হাইওয়েতে কতদূর। সে বলে, 'ইলিনয়ে বছরের বেশির ভাগ সময় এরকম। কোনোদিন রোদ উঠলে সাড়া পড়ে যায়। এমন ওয়েদার আমার গা-সওয়া।' আসলে শতদ্রু ভীষণ বদলে গেছে। একমুহূর্ত চুপচাপ বসে থাকতে পারছে না। ছুটোছুটি করে বেড়াতে চায়।

দোতলার পূর্ব-দক্ষিণ কোণের ঘরটা বিপাশার। এখন রাত প্রায় এগারোটা। আজ সন্ধ্যা থেকে বিদ্যুৎ বন্ধ। দুর্যোগে কোথাও গণ্ডগোল ঘটেছে। এদিকে বাড়ির জেনারেটরও সময় বুঝে রসিকতা করেছে। সকাল না হলে মিস্তিরি পাওয়া যাবে না। বাড়িটা অন্ধকারে প্রকৃতির করায়ত্ত হয়ে গেছে এখন। টেবিলে শেড দেওয়া কেরোসিন বাতি জ্বলছে। বিপাশার আজ কেমন ভয় করছে। কিসের ভয় সে বুঝতে পারছে না। মাঝে মাঝে হাত বাড়িয়ে শতদ্রুর আনা টেপরেকর্ডারে সিম্ফনি অর্কেস্ট্রার আওয়াজ বাড়িয়ে দিচ্ছে। দূরে কোথাও প্লেন উড়ে চলেছে যেন। মাথার ভেতর সেই সব অলীক প্লেন উড়ে আসার উপক্রম করলেই বিপাশা ফের নব ঘুরিয়ে আওয়াজ কমাচ্ছে।

খুট করে একটা শব্দ হল। মশারির ভেতর লেপের আরাম গায়ে নিয়ে শুয়ে আছে বিপাশা। পাশেই টেপরেকর্ডার চলছে ব্যাটারিতে। ভাবল টেপটা শেষ হবার শব্দ। কিন্তু না তো! সিম্ফনি অর্কেস্ট্রা সমানে বেজে চলেছে। গভীর আচ্ছন্নতার মধ্যে চোখ খুলে বিপাশা দেখল কে যেন দাঁড়িয়ে আছে সামান্য তফাতে। কয়েক মুহূর্ত কেটে গেল নিজেকে সচেতন করতে। ভাবল, শতদ্রু। হয়ত কিছু ফেলে গেছে এ ঘরে। দরজাটা তাহলে বন্ধ করতে ভুল হয়েছে। এমন ভুল বিপাশার হয় মাঝে মাঝে। বিপাশা বলল, 'দাদা?'

এসময় সে শতদ্রুকে সাটলেজ নাম ধরেই ডাকত। আমেরিকা থেকে ফেরার পর নিজের অগোচরে দাদা বলতে শুরু করেছে। শেড থাকায় আলোমিশ্রিত ছায়া ওখানে। নীল স্বচ্ছ মশারির ভাঁজের ভেতর দিয়ে মূর্তিটা বাঁকাচোরা স্যুররিয়ালিস্ট ছবির মত দেখাচ্ছে। বিপাশা ফের বলল, 'কী হল রে দাদা?'

'আমি অনি।'

বিপাশা চিৎকার করে উঠে বসতে চাইল। কিন্তু পারল না। মুহূর্তে তার মনে হল, ঘরে শুয়ে

নেই—বাইরে ঝোড়ো বাদলার মধ্যে চলে গেছে কোন অদ্ভুত উপায়ে। শুয়ে আছে ভেজা ঘাসের ওপর। সে অসহায় হাঁটতে না শেখা শিশুর মত ছটফট করতে থাকল।

অনি একটু এগিয়ে এসে বলল, 'বিয়াস কি ভয় পাচ্ছ? ওঠ, আমি অনি। বিয়াস! বিয়াস!' অনির কণ্ঠস্বর কেন অমন বাতাসের মত শনশন করে উঠছে, বুঝতে পারল না বিপাশা। এই সময় তার মনে পড়ে গেল, ক'বছর আগে সন্ধ্যায় ছাদে একা পায়চারি করার পর হঠাৎ ঝড় উঠেছিল। তারপর আলোগুলোও নিভে গিয়েছিল। ভয় পেয়ে নেমে আসার সময় চিলেকোঠার সিঁড়িতে অনি এমনি করে সাড়া দিয়ে বলেছিল, 'আমি অনি। কথা আছে শোনো।' অনি তাকে জড়িয়ে ধরেছিল। বিপাশা চিৎকার করে উঠেছিল সঙ্গে সঙ্গে। তারপর তাকে খুঁজে পাওয়া যায় অজ্ঞান অবস্থায় সিঁড়ির ওপর। পরে খুব অবাক হয়েছিল বিপাশা। অনির কথাটা যদিও কাউকে বলেনি, কিন্তু অনি কেমন করে চিলেকোঠার সিঁড়িতে আসতে পারল, সে বুঝতে পারে নি। বাড়ির সবার নজর এড়িয়ে কারুর পক্ষে ছাদে ওঠা সম্ভব নয়। তবে অনির মত ছেলের পক্ষেও কিছু অসম্ভব হয়ত নয়। ও সব পারে। পাইপ বেয়ে ওপরে উঠেছিল সম্ভবত।

বিপাশা অতিকষ্টে উচ্চারণ করল, 'কী?'

'ওঠ, আমি কথা বলব। আমার অনেক কথা আছে। ওঠ বিয়াস!'

'না।'

'তুমি কি ভয় পাচ্ছ আমাকে।'

'হ্যাঁ। তুমি চলে যাও।'

'বিয়াস, আমি বলতে এসেছি তুমি কথা রাখো নি।'

'কিসের কথা অনি? আমি তোমাকে কোনো কথা দিই নি।'

'দিয়েছিলে। তুমি আমার সঙ্গে চলে যাবে বলেছিলে।'...

'মিথ্যা কথা। আমি তোমাকে ঘৃণা করতুম। এখনও করি অনি।'

'কেন বিয়াস?'

'তুমি চলে যাও! নৈলে এখনই সবাইকে ডাকব। তুমি খুনী ডাকাত! তুমি ফেরারী আসামী।'

অনি হাসতে লাগল। তার হাসির শব্দে ঘরের ভেতর অদ্ভুত শন শন শব্দ ঘুরপাক খেতে থাকল। সে বলল, 'কেন ঘৃণা কর আমি জানি। তোমার কুমারীত্ব ভেঙেছিলুম বলে। বিয়াস, তোমাকে ভালবাসতুম। এখনও বাসি। ভালবাসা দিয়ে তোমাকে পূর্ণ নারীত্বে পৌছে দিতে চেয়েছিলুম। কেন তুমি বোঝ না?'

'চুপ করো! এ আমার লজ্জা, এ তোমার পাপ।' বিপাশা ফুঁপিয়ে উঠল।

'তোমার লজ্জা, আমার পুণ্য। তোমার সঙ্গে পাপ করেছি সেই তো আমার পুণ্য।'

'কী বললে?'

'তোমার সঙ্গে পাপ করেছি সেই তো আমার পুণ্য।'

বিপাশা কাঁদতে থাকল হু হু করে।

'ওঠ বিয়াস! এস আমার সঙ্গে।' অনি হাত বাড়াল। আবছা কালো একটা হাত মশারি ছুঁল। মশারি থর থর করে কেঁপে উঠল।

বিপাশা বালিশ আঁকড়ে ধরে উপুড় হল। সিম্ফনি অর্কেস্ট্রায় আবার দূরে সমুদ্রের একটা বিশাল ঢেউ এসে তটে আছড়ে পড়ার মত, কিংবা শত প্লেনের দিগন্ত জোড়া চাপা গর্জনের মত সুর বাজতে থাকল। বিপাশা কাঁদতে থাকল।

'বিয়াস! আমার বিয়াস!'

অনি কি তাকে ছুঁল? অনি যেন তাকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে ঘরের বাইরে হিম হাওয়া ও বৃষ্টির মধ্যে। বিপাশা অবচেতনার অন্ধকার তলদেশে মাটি আঁকড়ে ধরে নিজেকে লুকোতে চাইল।

সকালে ঘুম ভেঙে সে দেখল ওপাশে জানলার একটা পাট খোলা। উজ্জ্বল রোদ এসে পড়েছে ঘরে। সে উঠে বসল আস্তে আস্তে। মাথার ভেতরটা শূন্য লাগছে।

মশারি তুলে দিয়ে সে পা বাড়াতে গিয়ে হঠাৎ দেখল, মসৃণ মোজেকের চিত্রিত মেঝেয় কয়েক টুকরো শুকনো কাদা ঘাস আর ছেঁড়াপাতার কুচি। সঙ্গে সঙ্গে সে চমকে খেল। রাতের ঘটনা মনে পড়ে গেল। দ্রুত দরজার দিকে তাকাল। কিন্তু দরজা তো ভেতর থেকে বন্ধ! . .

থর থর করে কেঁপে উঠল বিপাশা। যদি স্বপ্ন হয়, তাহলে কাদা ঘাস ছেঁড়াপাতা এল কীভাবে? সে কম্পিত হাতে সেগুলো কুড়িয়ে জানালার বাইরে ফেলে দিল।

রাতে অনির উচ্চারিত বাক্যটা কবিতার লাইন হয়ে ঘরের ভেতর জেগে উঠল আবার। 'তোমার সঙ্গে পাপ করেছি... সেই তো আমার পুণ্য... তোমার সঙ্গে পাপ করেছি ... তোমার সঙ্গে পাপ করেছি...'

বিপাশা চঞ্চল হয়ে ঘরের ভেতর চোখ বুলোতে থাকল। মাথার কাছে টেবিলে একটা বই খুলে কখন সে উপুড় করে রেখেছিল মনে পড়ছে না। বইটা তুলতেই লাইনটা চোখে পড়ল। 'তোমার সঙ্গে পাপ করেছি...।' কিন্তু...

ফুল-ফলের সংসারে

শীতের শুকনো বাতাসে মিইয়েপড়া উদ্ভিদের বিবর্ণতা কদিনের অকালবৃষ্টিতে ঘুচে গেছে। আবার পড়েছে সজীবতার উজ্জ্বল প্রলেপ শিম-লাউ শশার মাচানে, পেয়ারা গাছে, জবাফুলের ঝাড়ে। কুড়ানি ঠাকরুনের মনেও ওইরকম এক বর্ণাঢ্য চঞ্চলতা। বৃদ্ধা দিনমান নড়বড় করে ক্রাচ খটখটিয়ে উঠোনে ঘোরেন। আর মাঝে মাঝে দোরে গিয়ে দাঁড়ান। কখন গোঁসাইবাবু আসবেন। গোঁসাইবাবু রেলের লোক ছিলেন। পৃথিবীর কোন ঠাঁই তাঁর অচেনা আছে? রঙ্গনা অবাক হয় ঠাকুমার এই চাঞ্চল্য দেখে। সে দুষ্টুমি করে বলে, 'আর এসেছেন গাঁজাবাবু। তোমার টাকাটা গচ্চা গেল ঠাকুমা!' বৃদ্ধা বলেন, 'আসবেন, আসবেন। না এসে পারেন নাকি? বুঝি ঠাণ্ডায় জ্বর-জ্বারি বাধিয়ে ফেলেছেন। ও রনি, একবার খোঁজ নে গা ভাই!'

রঙ্গনা ও-বাড়ি একসময় যেত। এখন যায় না। বাড়ির লোকগুলো কেমন দৃষ্টে তাকাত তার দিকে। চোখে যেন অশ্লীল প্রশ্নের পোকা কিলবিল করত। তবে কমলাক্ষবাবু লোকটা রঙ্গনার মতে খুব ভাল। কত বই ওঁর ঘরে। দোষের মধ্যে এক, বই চাইলেই রেগে যেতেন। তারপর মধুরবাবুর কাছে ওঁর চুরি করা বই গোপনে কেনার পর থেকে রঙ্গনা আর ও-বাড়ির ত্রিসীমানা মাড়ায় না। বড্ড ভয় করে তার, যদি সব জানাজানি হয়ে থাকে। বাঁধানো প্রবাসী পত্রিকাটা সে ঠাকুর্দার সিন্দুকে পুরনো কাপড়চোপড়ের তলায় লুকিয়ে রেখেছে। অপরূপাকেও জানায় নি কিছু। অপরূপা বেরুলে লুকিয়ে পাতা ওল্টায়। কিন্তু কান বাইরের দিকে। মধুরবাবুর জন্যে কুড়ানি ঠাকরুন বাড়ির দরজা প্রায় খুলেই রেখেছেন। তবে ভাগ্যিস রঙ্গনাদের বাড়ি সচরাচর কেউ আসে না। পারতপক্ষে আসতেও চায় না। নেহাৎ যাদের দরকার হয় কুড়ানি ঠাকরুনের ফুলফল কিনতে তারাই আসে। এলে বাইরে থেকে ডাকে ঠাকরুনকে।

এদিকে অপরূপা চাকরির জন্য পাগল হয়ে উঠেছে। দিনের অধিকাংশ সময় সে বাইরে থাকছে। তার ফলে রঙ্গনার পাড়াবেড়ানো বন্ধ হয়ে গেছে। ঠাকুমাকে একা রেখে যেতে ভয় পায়। বয়স হয়ে গেছে ঠাকুমার, হঠাৎ যদি কিছু ঘটে যায়। আসলে মৃত্যুকে বড় ভয় পায় রঙ্গনা। মায়ের কথা মনে নেই, কিন্তু চোখের সামনে বাবাকে মরতে দেখেছে। মৃত্যু বড় কষ্টদায়ক। মৃত্যু বড় ভয়ংকর। একটা মৃত্যু একটা সংসারকে কীভাবে তছনছ করে দেয়, কী বিশ্রি দারিদ্র্য দিয়ে যায়, রঙ্গনা হাড়ে-হাড়ে বুঝেছে। দিদির ওপর তার এতটুকু ভরসা নেই, যেমন ছিল না দাদার প্রতি। অপরূপা নিজেকে নিয়েই থাকে। স্বার্থপর ধরনের মেয়ে। আর আনির্বাণ তো ছিল বাউণ্ডুলে, নষ্ট ছেলে। আজ সাতবছর তার কোন পাত্তা নেই। তাই বলে তার জন্য কারুর মাথাব্যথাও নেই। অপরূপার তো নেই-ই। সে বলে, 'মরেছে। আপদ গেছে।' রঙ্গনা প্রথম-প্রথম একটু বিচলিত বোধ করত। এখন যেন সয়ে গেছে। সেও ধরে নিয়েছে, দাদা কোথাও মারা পড়েছে। জেলে-টেলে থাকলে নিশ্চয় কোনভাবে খবর পাওয়া যেত। বাঁচা গেছে বাবা! আর এ বাড়ি রাতবিরেতে পুলিশ এসে জ্বালাতন করে না।

অনির জন্য এবাড়িতে শুধু একজনই মাঝে মাঝে চোখের জল ফেলেন। কুড়ানি ঠাকরুন। একবার অনি তাঁকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছিল। একবার নিষ্ঠুরের মত দড়ি বেঁধে মেঝেয় ফেলে রেখে ওঁর পয়সাকড়ি ছিনতাই করে পালিয়েছিল। তবু বৃদ্ধা কান পেতে থাকেন তার জন্য রাতবিরেতে। কোন শব্দ কানে এলেই চঞ্চল হয়ে ওঠেন—'অই! অই! এল নাকি?'

এসব সময় অপরূপা ঠাকুমার ওপর অনেকদিনের রাগটা প্রচণ্ড ঝেড়ে নেয়। ছোটলোকের মত ফুলফল-তরকারি বেচেন কুড়ানি ঠাকরুন, এতে প্রচণ্ড লজ্জা অপরূপার। তার সামনে কেউ খদ্দের এলে সে ভাগিয়ে দেবেই দেবে। রঙ্গনা অতটা পারে না। তবে তারও ভারি লজ্জা হয় এতে। এমন ভাব দেখায় যেন ওসব ঠাকুমার ব্যাপার। ও পয়সা তাঁরই নিজের কাজে লাগে। যেন তাদের খাওয়া-পরা জোটে অন্য উপায়ে, যেভাবে আরও পাঁচটা ভদ্র পরিবারের জোটে। হুঁ, বাবা বুঝি টাকাকড়ি রেখে যাননি কিছু? পোস্টাপিসে, ব্যাংকে বাবার টাকা আছে জমানো। সেজন্যই না দিদি অথবা তাকে পোস্টাপিসে যেতে হয়। ব্যাংকে যেতে হয়। কোন ব্যাংক? না—শহরের ব্যাংকে। বসন্তপুরের ব্যাংকে টাকা রাখে নাকি মানুষে?

রঙ্গনার এসব কথা কানে এলে কুড়ানি ঠাকরুন মনে মনে হাসেন। একটু পরেই তো অপরূপা রঙ্গনাকে পাঠাবে পয়সা চাইতে। 'ঠাকুমা, পাঁচটা টাকা হবে গো? দিদি বলল, খুব দরকার।' চাল ডাল নুন তেল কম পড়লে সে দায়ও কুড়ানি ঠাকরুনের। নাতনিরা না খেয়ে থাকবে, সেও ভাল। পাশের বাড়ির দোরে গিয়ে ঠাকরুন তখন ডাকবেন, 'অ ছোটবউ! ছোটবউরে! একবার পেনীকে পাঠিয়ে দে না মা!' ছোটবউ মানে মধু ছুতোরের বউ। পেনী তার মেয়ে। বছর দশেক বয়স। দুটো ফলমূলের লোভে কুড়ানি ঠাকরুনের বাজারটা করতে তার আপত্তি নেই। মেয়েটি বড় চৌকস। ওজন বোঝে। হিসেব বোঝে। আর ঠাকরুন বোঝেন পেনী পয়সা মারে। তা মারুক। ধিঙ্গি মেয়ে দুটো যে না খেয়ে থাকবে।

গোঁসাইবাবুর প্রতীক্ষায় কুড়ানি ঠাকরুনের অস্থির কয়েকটা দিন কাটল। তারপর এক বিকেলে টিনের কপাটে মৃদু টোকার শব্দ হল। বৃদ্ধা চেঁচিয়ে উঠলেন, 'অই! অই!'

রঙ্গনা বেরিয়ে এসে বলল, 'কী?'

'দোর খুলে দে'দিনি। ওই বুঝি গোঁসাইবাবু এল।' বৃদ্ধার মুখ খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

রঙ্গনা ঠোঁট উল্টে 'হুঃ' বলে দরজা খুলতে গেল।...

শতদ্রু এবং রঙ্গনা

শতদ্রুকে দেখে রঙ্গনা ভীষণ অপ্রস্তুত বোধ করছিল। সে ভাবতে পারে নি, শতদ্রু তাদের বাড়ি এসে হাজির হবে। রঙ্গনার পরনের শাড়িটা যথেষ্ট ভদ্র নয়। ছেঁড়া ফাটা এবং মলিন। ব্লাউসটাও বেরঙা। যত কম দামের হোক, সোয়েটারটা চাপালেও পারত। বেশ তো শীত করছিল।

আর খালি পা এখন। শীতে প্রচণ্ড পা ফাটে রঙ্গনার। তাছাড়া রোজ স্নানের অভ্যাসও নেই তার। এ শীতে তো সপ্তায় দুদিনের বেশি স্নান তার পক্ষে অসম্ভব। চুলগুলো রুক্ষ, এলোমেলো। ঠোঁট শুকিয়ে ফেটে একাকার। ক্রিম ফুরিয়ে গেছে। যেটুকু ছিল চেঁছেমুছে নিয়ে গেছে অপরূপা। তাকে বাইরে ঘুরতে হচ্ছে।

শতদ্রু মিষ্টি হেসে বলল, 'কী হল? ট্রেসপাস করলুম বুঝি?'

মুখ নামিয়ে রঙ্গনা আস্তে বলল, 'না না। আসুন।'

'অসুখ বিসুখ করেছে নাকি?'

রঙ্গনা অগত্যা হাসল। 'না। ঘুমোচ্ছিলুম।'

দরজাটা ভাল করে বন্ধ করে এসে সে দেখল শতদ্রু উঠোনে দাঁড়িয়ে চারপাশটা দেখছে। বারান্দায় টেরচা হয়ে পশ্চিমের যেটুকু রোদ পড়েছে, তাই গায়ে নিয়ে একটুকরো চটের ওপর পা ঝুলিয়ে বসে আছেন কুড়ানি ঠাকরুন। পাশে দাঁড় করানো ক্রাচটা। কেমন বিভ্রান্ত চাউনি—নিষ্পলক। শতদ্রু বলল, 'বুড়িমা ভাল আছেন তো?' বৃদ্ধা নির্বিকার। জবাব দিলেন না।

অভদ্রতা হচ্ছে দেখে রঙ্গনা বলল, 'ঠাকুমা চিনতে পারছ না? সেদিন যাঁর গাড়িতে এসেছিলে করালীর থান থেকে।'

কুড়ানি ঠাকরুন এবার অস্ফুটস্বরে শুধু বললেন, 'ভাল তো?'

শতদ্রু বলল, 'আপনাদের বাড়িটা তো ভারি সুন্দর।'

রঙ্গনা সপ্রতিভ হবার চেষ্টা করছিল। বলল, 'বিয়াসদি কেমন আছে? ওর কাছে যাওয়া হয় না।'

শতদ্রু বলল, 'ইস! কত সব গাছ! ওগুলো বুঝি শশা? জানেন, আমেরিকায় ঠিক একইরকম শশা পাওয়া যায়। তবে সাইজে একটু বড়ো। আর...'

রঙ্গনা ঘর থেকে একটা জীর্ণ কম্বল সাবধানে ভাঁজ করে এনে ঠাকুমার সামান্য তফাতে পেতে দিল, যাতে শতদ্রু পা ঝুলিয়ে বসতে পারে। বলল, 'এখানেই বসুন।'

শতদ্রুর হাতে একটা ইংরেজি বই। এতক্ষণে চোখে পড়ল রঙ্গনার। শতদ্রু বইটা দিয়ে বলল, 'থ্রিলার পড়তে আপনার কেমন লাগে? স্টেট্‌সে থাকতে আমার অবশ্য সময় হয় না। সকাল আটটায় বেরিয়ে পড়তে হয়। ওভার ডিউটি করি ল্যাবরেটরিতে রাত আটটা অব্দি। টেরিফিক লাইফ!'

আড়ষ্ট হাতে বইটা ধরে রইল রঙ্গনা। কী বলবে, খুঁজে পায় না কথা।

শতদ্রু বলল, 'আপনার দিদির সঙ্গে দেখা হয়েছিল সকালে। বাবার কাছে গিয়েছিলেন।'

'দিদি এখনও ফেরে নি।'

'একেবারে নেচারের মধ্যিখানে থাকেন দেখছি।' শতদ্রু আবার চারপাশে চোখ বুলিয়ে বলল। তারপর তাকাল রঙ্গনার দিকে। রঙ্গনা চোখ নামাল। 'উইদাউট অ্যাপয়েন্টমেন্ট এসে পড়লুম বলে রাগ করেন নি তো? ওদেশে কিন্তু অ্যাপয়েন্টমেন্ট না করে কারুর বাড়ি যাওয়া যায় না। এমন কী প্রেমিকও-প্রেমিকার সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে তবে যায়।'

ঠাকুমার দিকে আড়চোখে চেয়ে রঙ্গনা বিব্রত বোধ করল। তার এখন ভাবনা, কতক্ষণে আপদ বিদেয় হবে। এ সময়ে কেউ লাউশাক কিনতে এলেই সমস্যা হবে।

শতদ্রু বলল, 'আমার অবস্থা বড় করুণ। বুঝলেন? ওদেশে থাকতে এদেশের জন্য মন কেমন করত। আবার এখন ওদেশের জন্য অস্থির হয়ে উঠেছি। কী ভয়াবহ অবস্থা এখানে! আমার ক্রমশ অসহ্য লাগছে। ভেবেছিলুম মাস দুই থাকব। মনে হচ্ছে, সেটা অসম্ভব। একেকটা দিন আর রাত্রি কীভাবে যে যাচ্ছে বোঝাতে পারব না। মনোটনি অ্যান্ড মনোটনি! ওঃ!'

রঙ্গনা আস্তে বলল, 'কেন? এ তো আপনার জন্মভূমি।'

শতদ্রু হাসল। 'ওসব সেন্টিমেন্ট যেভাবেই হোক, হারিয়ে ফেলেছি। এখন আমি টোটালি অ্যালিয়েনেটেড—উন্মূল অবস্থা যাকে বলে। তবু তো ওদেশে লাইফ আছে। কাজে নিজেকে জড়িয়ে ফেলার স্কোপ আছে। ফিরে এসে আমার খালি অবাক লাগছে, কীভাবে জীবনের অতগুলো বছর আমি নষ্ট করেছিলুম।'

রঙ্গনার মনে হল, বসন্তপুর কিছু ভাল লাগছেনা—একথাটা জানাতেই বুঝি শতদ্রু এসেছে। সে একটু হেসে বলল, 'বসন্তপুরে আপনার ভাল না লাগারই কথা। কলকাতায় হলে...'

কথা কাড়ল শতদ্রু। জোরে মাথা নেড়ে বলল, 'সে তো আরও টেরিফিক। কলকাতায় যাই নি বুঝি? কী দেখে গেছি আর কী হয়েছে! একেবারে জঘন্য নোংরা কদর্য। আমার এটাই ভীষণ অবাক লেগেছে, তবু লোকেরা বিনাপ্রতিবাদে দিব্যি কাটাচ্ছে ওখানে! ওয়েস্টের লোকেরা হলে কী করত ভাবুন।'

শতদ্রু অনর্গল এইসব কথা বলতে থাকল। রঙ্গনা অস্থির। কুড়ানি ঠাকরুন হাঁ করে তাকিয়ে আছেন কেষ্টসিঙ্গির ছেলের দিকে। মনে আকাশপাতাল চিন্তা। বিলেত-ফেরত ছেলেটা এবাড়ি এসে রঙ্গনার সঙ্গে কথা বলছে, মন্দ না। ভালই লাগে এসব। কায়েতের মেয়েকে লুঠ করে এনে বউ করেছিল বামুনের ছেলে। তাতে যদি দোষ হয়ে থাকে, তো কায়েতের ছেলে এই বামুনের মেয়েকে নিয়ে গেলে শোধবোধ। মন্দ কি? বৃদ্ধার ঠোঁটে আশ্চর্য হাসি ফুটে উঠল। তারপর বললেন, 'অ রনি, এট্টুকুন চায়ের যোগাড় কল্লে পাত্তিস ভাই! ছেলেটার গলা যে শুকিয়ে গেল।'

কুড়ানি ঠাকরুন খুক খুক করে হেসেও ফেললেন রসিকতার দরুন। শতদ্রু বলল, 'না—প্লীজ! আমি বহুকাল আগে চা-খাওয়া ছেড়েছি। তবে কফি খাই—উইদাউট মিল্ক। আমেরিকানরা, জানেন? পট-পট কফি খায়। ব্রেকফাস্ট লাঞ্চ ডিনার সবসময় আগে কয়েক কাপ খেয়ে নেবে। তারপর অন্য কিছু।'

রঙ্গনা কাঁচুমাচু মুখে বলল, 'কফি তো নেই। আমরা একটু চা খাই। কফি...'

'কফি পেলেও এখন খেতুম না। মেজাজ ভাল নেই।' শতদ্রু বলল। 'বাই দা বাই, যে জরুরী কথাটা বলতে এসেছিলুম—ফ্র্যাংকলি বলি। অন্যভাবে নেবেন না প্লীজ।'

রঙ্গনা দুরুদুরু বুকে বলল, 'বলুন।'

'বহু বছর আগে, মনে পড়ছে না ঠিক—আপনি তখন জাস্ট টিন-এজার...'

রঙ্গনা দ্রুত বলল, 'এখনও আমি টিন-এজার। নাইনটিন।' বলেই সে লজ্জায় পড়ে গেল। কেন বলতে গেল বয়সের কথা। ঠিক হল না।

শতদ্রু লাফিয়ে উঠল, 'ইজ ইট? তাই সম্ভব। ক্ষমা চাইছি।' সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টে রঙ্গনার দিকে তাকাল। সুন্দর চোখ শতদ্রুর। ফের বলল, 'আমি টোয়েন্টি সেভেন। সামনে মার্চে আমার বার্থ ডে পড়বে। জানি না ততদিন থাকব কিনা এখানে।'

'কী যেন বলছিলেন?' রঙ্গনা মনে করিয়ে দিল।

'স্কুলে একটা ফাংশান হয়েছিল। স্টেজের পেছনে একটা চেয়ারে বসে আপনি বই পড়ছিলেন। পরনে লাল ছিটের ফ্রক। চুলগুলো ছাঁটা ছিল। আমার কী দারুণ ভাল লাগছিল।'

রঙ্গনা বলল, 'মনে নেই।'

'আমার মনে আছে। এতবছর পরে সেদিন সন্ধ্যায় বিয়াসের ঘরে আপনাকে দেখেই চিনতে পেরেছিলুম।' শতদ্রু একটু আবেগ মেশাল গলায়। 'আমার কিন্তু যখন-তখন মনে পড়ত দৃশ্যটা—ভীষণ সেন্টিমেন্টাল হয়ে উঠতুম।.. আপনি কিছু মনে করছেন না তো?'

'নাঃ। মনে করার কী আছে!'

'কোনো-কোনো দৃশ্য কীভাবে যে মনে থাকে। একবার ডেনভারে ভন ন্যাস পার্কের রেলিঙে ভর দিয়ে ঠিক ওইরকম টিন-এজার—বয়স ধরুন হার্ড্লি চৌদ্দ, একটি মেয়েকে বই পড়তে দেখে গাড়ি থামিয়ে ছিলুম। চমকে গিয়েছিলুম একেবারে। এ কেমন করে হয়?'

'আমি তো কালো—বিশ্রি চেহারা।' রঙ্গনা একটু হাসল।

'কী বলেন!' শতদ্রু মুগ্ধ দৃষ্টে তাকিয়ে বলল। 'আপনি অসাধারণ সুন্দর! অন্তত আমার চোখে।'

রঙ্গনা ফের আড়চোখে কুড়ানি ঠাকরুনের দিকে তাকাল। ঠাকরুন তেমনি ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছেন শতদ্রুর দিকে—তবে ঠোঁটের কোনায় কেমন হাসি লেগে রয়েছে।

শতদ্রু বলল, 'মেমসায়েবদের রঙ কিন্তু আমার অপছন্দ। তবে আপনি ডার্ক নন, উজ্জ্বল ব্রাউন। এদেশে আপনাকে ফর্সাই বলবে সবাই। বলে না?'

রঙ্গনা ঠোঁট কামড়ে ধরে মুখ ঘোরাল অন্যদিকে। রোদটা কখন সরে গেছে। শীতের হিম গাঢ় হয়েছে। বাড়ির ওপর শেষবেলার ছায়া ঘন হচ্ছে। শতদ্রু উঠবে কখন?

সে আবার আমেরিকা এনে ফেলল। তারপর বাইরের দরজায় কেউ কড়া নাড়ল। রঙ্গনা ভারি পায়ে এগিয়ে দরজা খুলে দেখল, অপরূপা।

অপরূপা শতদ্রুকে দেখেই চমকে উঠেছিল। তারপর সারা মুখ হাসিতে ভরিয়ে দিয়ে বলল, 'আরে! সাটলেজদা! কতক্ষণ?'

শতদ্রু হাসতে হাসতে বলল, 'দারুণ! ওই নামে কেউ না ডাকলে খুব আনইজি ফিল করি। করছিলুম এতক্ষণ।'

অপরূপা চোখ কটমটিয়ে রঙ্গনাকে বলল, 'এই হিমের মধ্যে ওকে বাইরে বসিয়ে রেখেছিস? কী আক্কেল তোর? আমার ঘরটা খুলে দিস নি কেন?'

সে হন্তদন্ত হয়ে গিয়ে ঘর খুলল। ও ঘরটা কোনরকমে ভদ্রতারক্ষার মত সাজানো আছে। পুরনো

একটা জীর্ণ পালংকও আছে। তার গদীতে একশো বছরের ধুলো আর পোকামাকড়। কিন্তু রঙীন বেডকভারে ঢাকা। তার বয়সও অনেক হল। দেয়ালে ঝোলানো গোল মাঝারি আয়তনের একটা টেবিল আছে, চেয়ার না থাক। টেবিলটা এমনভাবে রাখা, যাতে বিছানায় পা ঝুলিয়ে বসে পড়াশোনা করা যায়।

লণ্ঠন জ্বেলে বিছানা ঠিকঠাক করে অপরূপা ডাকল, 'রনি! সাটলেজদাকে নিয়ে আয়।'

শতদ্রু বলল, 'থাক। আজ চলি বরং। পরে আবার আসব খন।'

অপরূপা মাথা দুলিয়ে মিষ্টি হেসে বলল, 'উঁহু! কী ভাগ্যে এসেছেন, এত শিগগির যেতে দিচ্ছি না। আসুন! বাইরে হিম পড়ছে।'

শতদ্রু বলল, 'প্লীজ!'

অপরূপা শুকনো মুখে বলল, 'গরিব মানুষ আমরা। আটকানোর ক্ষমতা নেই। কী বলব?'

'আপনি রাগ করছেন! আচ্ছা, চলুন—একটু বসে যাই। রঙ্গনা, এস।'

অপরূপা জিভ কেটে বলল, 'এরাম! আপনি আমাকে কক্ষণো আপনি বলবেন না। ভীষণ রাগ করব কিন্তু।'

'বলব। রঙ্গনা, বসুন।' শতদ্রু সরে বসল।

অপরূপা জিভ কেটে বলল, 'এরাম! রনিকেও আপনি বলছেন সাটলেজদা! ওকে তুই বলুন।'

'বলব।'

রঙ্গনা বলল, 'আসছি। ঠাকুমার ঘরে আলো জ্বেলে আসি।' সে বেরিয়ে গেল। কুড়ানি ঠাকরুণ তেমনি বসে ছিলেন। রান্না ঘর থেকে লম্প জ্বেলে এনে রঙ্গনা ঠাকুমাকে উঠতে সাহায্য করল। একটু পরে পাশের ঘর থেকে তার কানে এল, অপরূপা বলছে, 'আচ্ছা সাটলেজদা, একটা রিকোয়েস্ট করব? আমি তো আর্টস গ্র্যাজুয়েট—আমার ফরেনে কোন কাজের ব্যবস্থা করে দিতে পারেন না? আপনার নিশ্চয় কত জানাশুনা ওখানে। পারেন না সাটলেজদা?'

শতদ্রু কী বলল, শুনতে পেল না। কিন্তু রঙ্গনা নিঃশব্দ হাসিতে ভেঙে পড়ল। কী বলছে দিদি! ওর কি মাথাখারাপ হয়ে গেছে? কুড়ানি ঠাকরুণ সস্নেহে একটা থাপ্পড় মেরে চুপ করাতে চাইলেন রঙ্গনাকে। অত হাসতে আছে আইবুড়ো মেয়ের?

শতদ্রু ডাকছিল রঙ্গনাকে। কয়েকবার ডাকলেও রঙ্গনা গেল না। কিছুক্ষণ পরে ওরা বেরুল। অপরূপা বলল, 'একটু মিষ্টিমুখ করাতে চাইলুম করলেন না। একদিন কিন্তু খেতে হবে আমাদের বাড়ি।'

শতদ্রু ডাকল, 'রঙ্গনা! যাচ্ছি।'

রঙ্গনা বেরিয়ে বলল, 'আচ্ছা। আবার আসবেন।'

অপরূপা এগিয়ে দিতে গেল শতদ্রুকে। গেল তো গেলই। রঙ্গনা বলল, 'ও ঠাকুমা! দিদি কেলেংকারি না করে ছাড়বে না। কোনো মানে হয়? বিয়াসদির কানে গেলে কী বলবে? ছিঃ।'

অপরূপা ফিরল যখন, তখন বেশ অন্ধকার। রঙ্গনা বাঁকা মুখে বলল, 'বাড়ি অব্দি এগিয়ে দিয়ে এলি নাকি রে?'

অপরূপা আনমনে বলল, 'হুঁ।' তারপর নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল। তাকে বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল।

রঙ্গনা লম্পের আলোয় শতদ্রুর দেওয়া বইটা খুলেই বন্ধ করল। বলল, 'ঠাকুমা! তোমার মধুরচন্দ্র গোঁসাই তো এলেন না। টাকাটা গচ্চা। তার বদলে আমাকে নিয়ে চলো, কোথায় যাবে।'

কুড়ানি ঠাকরুন দুঃখের হাসি ফুটিয়ে বললেন, 'তোর বরের সঙ্গে যাব, ভাই। তুই মেয়ে, তুই কি বাঁকা-ছিরামপুরের হদিস কত্তে পারবি? পারবি না। তোর বর নিয়ে যাবে আমায়।'

রঙ্গনা চুপ করে আছে দেখে কুড়ানি ঠাকরুন ফের বললেন, 'ছেলেটি ভালই। দয়াধম্ম আছে মনে হল। তোকে পছন্দও হয়েছে। বাড়ির আপত্তি হলে বলব, বামুনের মেয়ে নিয়ে জাতে উঠবে—আবার অত কথা কিসের বাপু?'

রঙ্গনা প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, 'কী, হচ্ছে কী ঠাকুমা? গাঁট্টা খাবে বলে দিচ্ছি।'...

মধুরবাবুর সাধুসঙ্গ

রতুডাক্তার ডিসপেন্সারির দরজা খোলেন সাতটা নাগাদ। কম্পাউন্ডার কানাই কোন কোন দিন আগে চলে আসে। তাই বলে তাকে ডিসপেন্সারির চাবি দেবার পাত্র নন রতিকান্ত। বাড়ির দরজা দিয়ে বেরিয়ে যদি দেখতে পান কানাই বারান্দার সিমেন্টের বেঞ্চে বসে আছে, ডেকে বলেন, 'আয় কানাই! দাদাভাই মিলে বাজারটা সেরে আসি।' বাজারে লোভনীয় কিছু কিনতে দেখলেও কানাই আশা করে না যে ডাক্তারবাবু তাকে এবেলা খেতে বলবেন।

আগের কম্পাউন্ডার হরেন চুরি করে ওষুধ বেচত। সেই থেকে বিশ্বাস ঘুচে গেছে। তবে কানাই ছেলেটির স্বভাবচরিত্র ভালই মনে হয়। রতিকান্ত রায় সে আমলের এল এম এফ। কালক্রমে পসার কিছুটা কমে গেছে। বসন্তপুরে এখন দুজন এম বি বি এস প্রাইভেট প্র্যাকটিস করে দেদার কামাচ্ছেন। ওদিকে সরকারি হাসপাতাল, ফ্যামিলি প্ল্যানিং-কাম-মাতৃসদনেও অনেক কজন ডাক্তার। তবু রোগীর সংখ্যাও দিনে দিনে বেজায় বেড়ে চলেছে। তাই রতিকান্তের ডিসপেন্সারি একবারে ফাঁকা পড়ে থাকে না, পয়সাওলা রোগী না আসুক।

এদিন বাজার সেরে এসে চা-ফা খেয়ে ডিসপেন্সারির দরজা খুলে রতুডাক্তার কানাইয়ের বদলে মধুরবাবুকে দেখে অবাক হলেন। দরজা থেকে উঁকি মেরে বললেন, 'কে হে? মধুরকেষ্ট নাকি? ও কি খাচ্ছ ওখানে বসে?'

মধুরবাবু লাজুক মুখভংগি করে বললেন, 'এই একটু ব্রেকফাস্ট করছি আর কী।'

হা হা করে হাসলেন রতুডাক্তার। 'ব্রেকফাস্ট করছ? ওইখানে বসে? রাধেমাধব! ওখানে রাজ্যের রুগী এসে বসে থাকে। তোমার আর কাণ্ডজ্ঞানের বালাই নেই।'

মধুরবাবুর কপালে আর ঠোঁটের নিচে কালো ছোপ। ঘা শুকিয়ে গেছে প্রায়। কোয়ার্টার পাউন্ড শক্ত ইঁট পাঁউরুটি চিবুচ্ছেন আর হাতে ছোট্ট প্লাস্টিকের মগে খানিকটা চা। বললেন, 'ভারুর দোকানে ভীষণ ভিড়। বসার জায়গা পেলুম না। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে তো খাওয়া যায় না। তাই এখানে এসে বসলুম। আর ডাক্তার, রুগীর কথা বলছ? রেসিস্ট্যান্স পাওয়ার আমার বরাবর ভেরি ভেরি স্ট্রং।'

অকারণ একবার জিভ চুক চুক করে মাথা নাড়লেন রতুডাক্তার। বারান্দায় গিয়ে এদিক-ওদিক তাকিয়ে কানাইকে খুঁজলেন। এখানে-ওখানে চায়ের আড্ডা চলেছে শীতের সকালে। নামেই সকাল, এখনও রোদ্দুরকে কুয়াসা থেকে আলাদা করে চেনা যায় না। হাইওয়ে এখানে খুব চওড়া হয়ে বসন্তপুরে ঢুকেছে। রাস্তায় গাড়ির ভিড় নেই। এখন শীতকাতুরে লোকেরা একটু কুঁজো হয়ে হাঁটছে। মুখ দিয়ে ভাপ বেরুচ্ছে শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে। কিছুটা দূরে বাজারের দিকটায় ভিড় জমতে শুরু করেছে। চাপা গুঞ্জন কানে আসে।

রতুডাক্তার বললেন, 'কানাইটার কাণ্ড দেখছ?'

মধুরবাবু বললেন, 'উঁ?'

'হ্যাঁ হে মধুরকেষ্ট!' রতিকান্ত ঘুরলেন ওঁর দিকে। তারপর আরও অবাক হয়ে বললেন, 'ও কিসের ওপর বসে আছ? কী ওটা?'

মধুরবাবু হাসবার চেষ্টা করে বললেন, 'বেডিং।'

'বেডিং!'

'হ্যাঁ। আমার আজকাল ভোজনং যত্রতত্র শয়নং হট্টমন্দিরে। তাই সঙ্গে নিয়েই ঘুরি।'

'সে কী! কমলাক্ষের বাড়িতে আর থাকো না তুমি?'

মধুরকৃষ্ণ গোস্বামী জোরে মাথা নাড়লেন। 'নাঃ! কী দরকার ভাই পরের দোরে থেকে? ওতে

লিবার্টি থাকে না। এশপস্ ফেবলস পড়েছ তো? ঘরের কুকুর আর রাস্তার কুকুরে দেখা হল—ঘরের কুকুরের গলায় চেনের দাগ।' মধুরবাবু পাঁউরুটির শেষ ডেলাটা মুখে পুরে প্ল্যাস্টিকের মগে চুমুক দিলেন। গলার নলী কাঁপতে থাকল।

রতিকান্ত ততক্ষণে একটু সতর্ক হয়েছেন। এসব ক্ষেত্রে গায়ে পড়ে খবরা-খবর না নেওয়াই ভাল। উদাস দৃষ্টে কানাইকে খুঁজতে থাকলেন রাজপথে। কানাই এসে ঝাড়ু দেবে মেঝেয়। জীবাণুনাশক ওষুধ-মেশানো জল ছড়াবে। ধূপ-ধুনো দেবে। প্রেসক্রিপশনের কাগজ কেটে সুতোয় গাঁথবে। এখন কত কী খুচরো কাজ। শীতকাল বলে রুগী আসতে একটু দেরি হবে। ততক্ষণে তৈরি হওয়া দরকার।

মধুরবাবু চা খেয়ে ঢোলা কোটের পকেট থেকে সিগারেট-দেশলাই বের করে বললেন, 'চলবে নাকি ডাক্তার?'

রতিকান্ত গুম হয়ে বললেন, 'থাক। পরে।'

'রাত্তিরে আজ মন্দিরতলায় ছিলুম। চারদিক ঘেরা জায়গা।' মধুরবাবু বললেন। 'ভাগ্যক্রমে সাধুসঙ্গ পেয়েছিলুম, বুঝলে ডাক্তার? গঙ্গাসাগর থেকে পায়ে হেঁটে আসছে। সেই হিমালয়ে ফিরবে। বোঝ অবস্থা। ভোরবেলা চলে গেল লোটাকম্বল গুটিয়ে। আমার জাগিয়ে দিয়ে গেল। তখন বেরিয়ে পড়লুম।'

রতিকান্ত হাসলেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও। 'তাহলে রাত্তিরে শিবের প্রসাদ ভালই জুটেছিল?'

'হ্যাঁ।' খুশি মুখে জবাব দিলেন মধুরবাবু। 'দধিমচ্ছব যাকে বলে। এখনও চোখের অবস্থা দেখছ।'

'মারা পড়বে মধুরকেষ্ট!' রতুডাক্তার শাসনের সুরে বললেন। 'তোমার লাংসের অবস্থা তো তুমি টের পাচ্ছ না, আমি পাচ্ছি।'

'তা তো পাবেই। তুমি, ডাক্তার।' গলগল করে ধোঁয়া ছাড়লেন মধুরবাবু।

'তোমার ব্রেন পর্যন্ত শুকিয়ে যাচ্ছে। সাবধান। এরপর হাঁফানি ধরবে। তারপর বদ্ধ উন্মাদ হয়ে যাবে।'

'হোক না।' খিকখিক করে হাসতে লাগলেন মধুরবাবু। 'উন্মাদের বড় সুখ। যাকে খুশি ঢিল মারব। আমায় পায় কে?''

রতিকান্ত ভেতর ঢুকলেন। কানাইয়ের জন্য অপেক্ষা করা আর উচিত নয়। ঝিকে গিয়ে বলতে হবে। গলা চড়িয়ে ডাকলেন, 'রানু! ও রানু!'

রানু রতুডাক্তারের মেয়ে। তিন বোনের ছোটটি। বড় দুটিকে পার করেছেন। ছোটটি এখনও ফ্রকের বয়স পেরোয় নি। ভেতর দিয়ে উঁকি দিয়ে রতিকান্ত ঝিকে পাঠিয়ে দিতে বললেন। আর ঠিক সেই সময় কানাই হাজির। কানাই কাঁচুমাচু হেসে বলল, 'পথে একজায়গায় একটু দেরি করে ফেললুম ডাক্তারবাবু। মন্দিরতলার ওখানে গণ্ডগোল দেখে...'

ডাক্তার গম্ভীর মুখে বললেন, 'এখনও ছেলেমি তোমার যায়নি বাবু। কী গণ্ডগোল?'

'তিনচারজন সাধু এসেছে। রাত্তিরে কে ওদের কাছে শুয়েছিল। সাধুরা লোক জড়ো করেছে—সেই লোকটা নাকি টাকাকড়ি চুরি করে পালিয়েছে।'

রতিকান্ত দরজার ভেতর দিয়ে দৃষ্টি চালিয়ে মধুরবাবুকে বিঁধলেন। 'পুলিশে যাক না। অত কথা কিসের? যতঃ সব! নাও, নিজের কাজ করো।'

মধুরবাবু তড়াক করে লাফিয়ে উঠেছেন সঙ্গে সঙ্গে। 'শালারা তাই বলছে বুঝি? রাস্কেল কাঁহাকা! রোস, গিয়ে মজাটা দেখাচ্ছি! ইস! সাধু হয়েছে তো মাথা কিনে নিয়েছে।'

বুদ্ধিমান কানাই টের পেয়েই মুচকি হেসে বলল, 'যান না! পুলিশে খবর চলে গেছে!'

মধুরবাবু বোঁচকা আর মগ নিয়ে একলাফে নিচে নামলেন। তারপর ডাক্তারের উদ্দেশে বললেন, 'এ কি বিশ্বাসযোগ্য কথা হল? তুই ব্যাটারা সংসারত্যাগী পুরুষ। তোদের আবার টাকাকড়ি? কৈ সে গুখেকোর ব্যাটারা? একটা-একটা করে চুলদাড়ি উপড়ে বৃন্দাবনে পাঠিয়ে দেব।'

. বলেই তিড়িং বিড়িং করে হাঁটতে লাগলেন মধুরকৃষ্ণ। কানাই হাসতে হাসতে বলল, 'গেলে বিপদ

বাধবে ওনার। ঠাকুরঘরে কে রে, আমি তো কলা খাইনি—সেইরকম হল। তাই না ডাক্তারবাবু?'

রতুডাক্তার বললেন, 'নিজের চরকায় তেল দাও। যাও, নিজের চরকায় তেল দাও।'...

ঘণ্টা দুই পরে রোগীর ভিড় ঠেলে কমলাক্ষের কনিষ্ঠপুত্র অরণি হাজির। 'ডাক্তারকা, মধুরদা আসেনি আপনার এখানে? শুনলুম সকালে...'

ডাক্তার দ্রুত বললেন, 'হ্যাঁ। তারপর তো মন্দিরতলায় যাচ্ছি বলে গেল। কী হয়েছে?'

অরণি ক্রুদ্ধভাবে বলল, 'পুলিশ গিয়েছিল আমাদের বাড়ি ওর খোঁজে। সাধুবাবাদের টাকা চুরি করেছে নাকি। ছ্যা ছ্যা, লোকটার জন্য আর মানসম্মান রইল না আমাদের।'

রতিকান্ত নির্বিকার মুখে প্রেসক্রিপশন লিখতে লিখতে রুগীর পেট খামচে ধরে বললেন, 'ব্যথা?'...

যার প্রতীক্ষায় কুড়ানি ঠাকরুন এতদিন অস্থির, সেই মানুষটি সাতসকালে এসে হাজির। একেবারে সেজেগুজে তৈরি হয়েই। ঢোলা কোট, পায়ে জুতোমোজা, মাথায় হনুমান-টুপি এবং বগলে কম্বলপত্র। বৃদ্ধার শীত চলে গেছে। মুখে অনর্গল বাঁকা-ছিরামপুরের কথা।

মধুরকৃষ্ণ একেবারে ঘরের ভেতর ঢুকে বসে আছেন। বলছেন, 'কমলমামারা কেউ জানলে বাগড়া দেবে। যেতেই দেবে না। বড্ড ভালবাসে কি না। তাই বলছি, রনি মা আর অপু মা, যেন কাউকে বলো না আমার কথা। কেমন?'

অপরূপার চায়ের নেশা আছে। বাজারে ডেয়ারির একটা খুচরো দোকান হয়েছে। সেখান থেকে দুধ এনে উঠোনের রোদে বসে চা খাচ্ছিল। কুড়ানি ঠাকরুনও একটু খান কদাচিৎ। রঙ্গনা পিঠে রোদ নিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল একটা ইংরেজি পত্রিকার ওপর। হাতে চায়ের গেলাস। আগের পত্রিকাটা ফেরত দিয়ে বিপাশার কাছে আরেকটা এনেছে। ভাগ্যিস, শতদ্রু কলকাতা গেছে। কদিন থাকবে সেখানে। সিঙ্গিবাড়ি অনেক দোনামনা করেই ঢুকেছিল রঙ্গনা। পত্রিকাটা তো ফেরত দিতেই হত। তবে শতদ্রুর তাদের বাড়ি যাওয়ার কথা বলেনি বিয়াসদিকে। গিয়েই বুঝেছিল, শতদ্রুও কথাটা বলেনি বোনকে।

মধুরকৃষ্ণ খিড়কির দোর দিয়ে চুপিচুপি ঢুকছিলেন। এরা হতচকিত একেবারে...।

রাতের ট্রেনে নিমতিতে রওনা হবেন ঠাকরুনকে নিয়ে। দিনসবরে গেলে মামাবাড়ির লোকের চোখে পড়ে যাবেন যে! রঙ্গনা আপত্তি করে বলল, 'এই শীতের রাতে? ঠাকুমা! তোমার মাথা খারাপ?'

মধুরবাবু বললেন, 'কিছু অসুবিধে হবে না রে পাগলী মেয়ে! আমি রেলের লোক ছিলুম না বুঝি। বুড়িমা গিয়েই দেখবেন। ট্রেনে টিকিট পর্যন্ত কাটতে হবে না। নিমতিতেয় নেমে বাকি রাত্তিরটা থাকব অগস্ত্যিবাবুর কোয়ার্টারে।'

রঙ্গনা সন্দিগ্ধ সুরে বলল, 'কে সে?'

'স্টেশনমাস্টার। আবার কে? আমার বুজম ফ্রেন্ড। ভাবিস নে! কোনো কষ্ট হবে না তোর ঠাকুমার।' মধুরবাবু সহাস্যে বললেন। 'ওঠা-নামায় রেলের লোকের সাহায্য পাব। আর আমি তো আছিই।'

অপরূপার ভাল লাগছিল না ব্যাপারটা। বলল, 'ঠাকুমার সবটাই মিস্ট্রিয়াস। না জেনেশুনে আন্দাজে কোথায় গিয়ে হন্যে হবে—বুঝবে ঠ্যালা। সেখানে এবয়সে আর না গেলেই নয়? অ্যাদ্দিন যেতে কী হয়েছিল?'

বৃদ্ধা এককথায় বললেন, 'আমি যাব।'

রঙ্গনা বলল, 'মধুরকাকা! ঠাকুমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যে যাচ্ছেন, পৌঁছে দেবে কে?'

মধুরবাবু এবার চিন্তিত হয়ে বললেন, 'বাপের বাড়ি এতকাল পরে যখন যাচ্ছেন, বাবা না থাক, আত্মীয়স্বজন বংশধর সবাই আছে। তারা তো সহজে ছাড়বে না মা। কদিন থাকতে বলবে। এখন, আমি হচ্ছি গে আউটসাইডার। আমি কোন মুখে থাকব সেখানে—সেটাই প্রব্লেম।'

কুড়ানি ঠাকরুন বললেন, 'যাব, আর তক্ষুণি চলে আসব।'

রঙ্গনা বলল, 'সে কী! তাহলে যাওয়া কেন?'

'একবার চোখের দেখা দেখব।'

'ভ্যাট!' রঙ্গনা বিরক্ত হল। 'কাকে দেখবে শুনি? কে আছে তাও তো জানো না।'

বৃদ্ধা আস্তে বললেন, 'ভিটেটুকুন দেখব। তাতেই পুণ্যি ভাই।'

অগত্যা রঙ্গনা বলল, 'মধুরকাকা, তাহলে কিন্তু আপনার সব দায়িত্ব। নিয়ে যাবেন, আবার সঙ্গে করে নিয়ে আসবেন। কেমন?'

মধুরবাবু বললেন, 'তাহলে আর কথা কী? প্রব্লেম ইজ সল্‌ভ্‌ড্‌।'

রঙ্গনা বলল, 'লাউশাকে মটরডাল রাঁধব। অবশ্য ফুলকপির সঙ্গে কইমাছও আনবি। ঠাকুমাকে ভাল করে খাইয়ে দাইয়ে ব্রাইট করে বাপের বাড়ি পাঠাই। কী বলিস? আজ ঠাকুমাকে আমরাই রেঁধেবেড়ে খাওয়াই।'

অপরূপা অন্যদিকে তাকিয়ে বলল, 'আমার কাছে পয়সা নেই।'

'কবেই বা থাকে।' রঙ্গনা রেগে গেল। 'টিউশনি করিস যে বড়! কী হয় সেগুলো?'

অপরূপা বলল, 'বাঃ! আমার খরচা নেই? কত জায়গা ছোটাছুটি করতে হয় না আমাকে?'

'বেশ। আমিই টিউশনি ধরব এবার।'

'ধরিস না কেন? তোকে কেউ মানা করেছে? অ্যাদ্দিন ধরা উচিত ছিল।'

'তুই বকবি ভেবে ধরিনি।'

অপরূপা রেগে বলল, 'আমি বকব? আমার বকার ধার ধারিস খুব! দিনরাত তো এপাড়া-ওপাড়া টোটো করে ঘুরে বেড়াস।'

বোনে-বোনে মাঝে মাঝে বেধে যায়। কুড়ানি ঠাকরুন হাসতে হাসতে ক্রাচ তুলে বললেন, 'অ লা মুখপুড়ীরা। এবার থাম দিকিনি। এক ভদ্দরলোক ঘরে বসে রয়েছে, খ্যাল নেইক তোদের?'

ভদ্রলোকটি শুনছিলেন। বেরিয়ে এসে বললেন, 'বাজার করা নিয়ে ঝগড়া। আমারযে উপায় নেই, নৈলে যেতুম। বাজারে আজ প্রচুর মাছের আমদানি দেখে এসেছি। তবে যাই বলো, এ শীতের সময়টা ভেজেটিবেলসের স্বাদ অমৃত। পালংশাকে বড়ি, লাউশাকে মটরডাল—ইস! অবশ্য ফুলকপির সঙ্গে কইমাছও জমে ভাল। শীতের কই চর্বিতে জবজব করছে।'

রঙ্গনা গুম হয়ে গিয়েছিল। এবার বলল, 'ঠাকুমা, আমি যাচ্ছি। পয়সা দেবে?'

কুড়ানি ঠাকরুন পেটের ভেতর থেকে একটা পাঁচটাকার নোট বের করে ফিসফিসিয়ে বললেন, 'সব খচ্চা করিস নে যেন। দূরের পথ। আমার কাছে বেশি পয়সাকড়ি নেই।'

অপরূপা ভুরু কুঁচকে দেখছিল। বলল, 'রেখে দাও। আমার কাছে আছে।' সে তার ঘরে গিয়ে একটা পাঁচটাকা এনে রঙ্গনার হাতে গুঁজে দিল।

রঙ্গনা টাকাটা হাতে ধরে বলল, 'আমি পারি ওসব? করেছি কোনোদিন?'

'তুমি কিছুই পারো না।' অপরূপা টাকাটা কেড়ে নিয়ে থলে আনতে গেল। গজ গজ করে বলল ফের, 'পারো শুধু ইয়ে করতে।'

রঙ্গনা আহত দৃষ্টে তাকিয়ে রইল। দিদি কী বলতে চাইছে তার মাথায় ঢুকল না। মধুরবাবু ডেকে বললেন, 'অপুমা! যাচ্ছিস যখন, এক প্যাকেট সিগারেট আনবি। কেমন? আহা, পয়সা আমি দিচ্ছি। এই নে।'

মধুরবাবুর তুই-তোকারি শুনতে রাজি ছিল না অপরূপা। ভাল করে চেনেও না ভদ্রলোককে। শুধু জানে কমলাক্ষবাবুদের বাড়িতে থাকেন। মাঝে মাঝে বই বেচতে আসেন রঙ্গনাকে।

কিন্তু এ মুহূর্তে তার মনে অন্য ভাব। ঠাকুমার জন্যে মনটা কেমন করছে। এতদিন সে তো ঠাকুমাকে এভাবে ভাবে নি। ভাবে নি ঠাকুমারও বাপের বাড়ি বলে কিছু থাকতে পারে—কতকাল সেখানে যাওয়া হয়নি ঠাকুমার।

ঝোঁকের মাথায় অপরূপা আরও কয়েকটা টাকা সঙ্গে নিয়ে বেরুল।

অনেক—অনেকদিন পরে এই সচ্ছলতা সংসারে। এতরকম তরকারি, সত্যি সত্যি ফুলকপির সঙ্গে

কই মাছ, কাটা রুই। কুড়ানি ঠাকরুন কবে হবিষ্যি এবং পালন-টালন করতেন, সবাই ভুলে গেছে। পেটের জ্বালা বড় জ্বালা। তাঁর জন্যে আলাদা করে নিরিমিষ রান্নার প্রশ্নই ওঠে না। গৌরবাবু যতকাল বেঁচে ছিলেন, সে একরকম গেছে—কালক্রমে অন্য একরকম অবস্থা সংসারে। নিয়ম মানা কঠিন। তবে তার মধ্যে যতটুকু পারা যায়। মাছ বাদ দিয়ে একটুকরো ফুলকপি মুখে করতেই হল। নাতনিরা নাছোড়বান্দা আজ। ঠেসে খাওয়াবার তালে ছিল। মুখে আর রোচে না কিছু, দাঁত অবশ্য আছে। প্রকৃতি একটা পায়ে ঘা মেরেছেন, কিন্তু অন্যদিকে যেন পুষিয়ে দিয়েছেন। এবয়সে চিবিয়ে খেতেও পারেন।

মধুরবাবুর খাওয়ার বহর দেখতে হয়। খেয়ে সটান অপরূপার খাটে গিয়ে গড়িয়ে পড়লেন। নিজের কম্বলটি চড়াতে ভুললেন না। একটু পরে নাক ডাকিয়ে ঘুমোতে শুরু করলেন। রাতে ঘুমটা ভাল হয়নি—শিবের প্রসাদেও।

দুই নাতনি বৃদ্ধাকে এবেলা পিদিমের মত ঘিরে রেখেছে। কুড়ানি ঠাকরুনের চোখে জল এসে গেল। এত ভালবাসা তো টের পাননি এতকাল। তাঁরই পয়সায় সংসার চলেছে। অথচ উল্টে তাঁকেই পাঁচকথা শুনিয়ে ছেড়েছে অনেক সময়।

শীতের বেলা পড়ে এল হু হু করে। রাত আটটা পাঁচের আপে চাপতে হবে। পাছা ঘষটে এটা-ওটা নাড়াচাড়া করে বেড়ালেন কুড়ানি ঠাকরুন। পুরনো কাঠের সিন্দুকে কতবার হাত ভরে কত কী বের করলেন। আবার রেখে দিলেন। দুই বোন ঠাকুমার কাণ্ড দেখে হেসে খুন।

সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় রিকশ ডেকে আনল অপরূপা। কাচা থান পরে গায়ে গুটি সুটি একটা প্রাচীন কাশ্মীরী আলোয়ান জড়িয়ে কুড়ানি ঠাকরুন তৈরি। তাঁর মুখখানা লণ্ঠনের ম্লান আলোয় আজ ঝকমক করছিল। যৌবনে দারুণ সুন্দরী ছিলেন তাহলে—নাতনিরা অবাক হয়ে ভাবছিল।

রিকশয় মধুরবাবু কম্বল মুড়ি দিয়ে বসলেন। শুধু নাকটুকু জেগে রইল। ওঠার সময় হঠাৎ কুড়ানি ঠাকরুন দুহাতে দুই নাতনিকে জড়িয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। ক্রাচ পড়ে গেল। রঙ্গনা না ধরলে আছাড়ই খেতেন।

রঙ্গনার হাতে একটা ন্যাকড়ায় বাঁধা কিছু টাকাপয়সা গুঁজে দিয়ে বৃদ্ধা বললেন, 'যাব—আর আসব। বুদ্ধি করে চালিয়ে নিও। গাছপালাগুলান দেখো। বাড়ি ছেড়ে কোথাও বেরিও না। আর অপু, রনিকে একলা রেখে কোথাও যেও না। পই পই করে বলে যাচ্ছি। দুবোনে একত্তর থাকবে। একত্তর শোবে। আর অনি যদি আসে, তাকে আটকে রাখবে। আমার দিব্যি দেবে।'

রঙ্গনা ভিজে চোখে বলল, 'আমি যাই বরং স্টেশনে।'

মধুরবাবু দ্রুত বললেন, 'কী দরকার? রিকশোয় জায়গা হবে না।'

বৃদ্ধা বললেন, 'অপু একলা থাকবে।'

অপরূপা বলল, 'মধুরকাকা, প্লীজ লক্ষ্য রাখবেন।'

মধুরবাবু বললেন, 'কিচ্ছু বলতে হবে না। কিচ্ছু বলতে হবে না। রেসপনসিবিলিটি আমার।'

কুড়ানি ঠাকরুন বললেন, 'ভোরবেলা ছকু পাণ্ডা পুজোর ফুল নিতে আসবে। নিজে হাতে পেড়ে দিও। ওকে গাছে হাত দিতে দেবে না। তছনছ করবে। পয়সা চেও না। মাসকাবারি দিয়ে যায়। আর কেউ লাউটা শশাটা কিনতে এলে বুদ্ধি করে বেচো। না পারলে বলো, ঠাকুমা আসুক।'

দুইবোনে একসঙ্গে বলল, 'ছাড়ো তো ওসব কথা! দুর্গা দুর্গা দুর্গা!'

রিকশ অন্ধকারে মিশে গেল ঘন্টি বাজাতে বাজাতে। দুইবোন তবু কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে।

শতদ্রুর পাত্রী দর্শন

বাবাকে শতদ্রু কোনদিন তত আমল দেয়নি। এখনও তাই। কিন্তু মামাকে বড় সমীহ করে চলে। মামা ব্রজেন্দ্র দেখতে রাশভারি মানুষ হলেও অমায়িক প্রকৃতির। বি এন বোস এন্টারপ্রাইজের মালিক তিনি। এক্সপোর্ট-ইমপোর্টের দালালী, সরকারী এবং বেসকারী কোম্পানিতে অর্ডার সাপ্লাই, কখনও মাঝারি ধরনের কনসট্রাকশনের কাজে জীবন কাটিয়ে এখন অবসর নেবার তালে আছেন। তিন ছেলে চুটিয়ে বাবার কোম্পানি চালাচ্ছে। এখন দেশে ও বিদেশে নানা জায়গায় ব্রাঞ্চ খুলেছে। সদর অফিস

চৌরঙ্গীতে এক বহুতল প্রাসাদের নবম তলায়। পাঁচবছর পরে শতদ্রু এতটা উন্নতি দেখে অবাক হয়েছে। তার মনে হয়েছে, এদেশে কিছু-কিছু লোক যেন এককেটি লাফে পাহাড় ডিঙিয়ে চলেছে এবং বাকি লোকেরা সমতলে জল-কাদায় পড়ে হাত-পা ছুঁড়ছে। এ এক উদ্ভট অবস্থা।

ব্রজেন্দ্র আসলে ভাগ্নেকে ডেকেছিলেন কনে দেখতে। শতদ্রুর প্রকৃত গার্জেন তিনই। স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজা পার করে মার্কিনমুলুকে পাঠানো পর্যন্ত সবেতেই তাঁর হাত আছে। এবার একখানা উৎকৃষ্ট স্ত্রীরত্ন ভাগ্নেকে জুটিয়ে দিলেই তাঁর দায়িত্ব শেষ।

ইংরেজি পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেবার উদ্দেশ্য ছিল উচ্চবিত্ত অত্যাধুনিক পরিবারের কনভেন্টপড়া পাত্রীর সন্ধান। ব্রজেন্দ্র নিজের ছেলেদের বেলায় এটাই করেছেন। কিন্তু তারপরই তিনি মত বদলেছিলেন। পরিবারের কর্তাহিসেবে তাঁর অভিজ্ঞতা তত সুখের হয় নি। স্ত্রীজাতি সম্পর্কে তাঁর অবচেতনায় যে আদর্শ ছিল, তার সঙ্গে মেলেনি বলে মনে মনে ক্ষুব্ধ ছিলেন। ঝোঁকের বশে বা পূর্বঅভ্যাসে ভাগ্নের বেলায় তাই করতে গিয়ে সামলে নিয়েছেন দ্রুত। সনাতন ভারতীয় আদর্শটি অবচেতন থেকে এই কয়েকটা দিনে চেতনে ফুটে বেরিয়েছে। তখন বিজ্ঞাপনের জবাবে যত চিঠিপত্তর এসেছিল, ওয়েস্টপেপার বাস্কেটে ছুড়ে ফেলেছেন। একালে শুধু উচ্চবিত্ত নয়, মধ্যবিত্ত পরিবারেও যে এত ইংরেজি মাধ্যমে পড়া পশ্চিমী এটিকেট-দুরস্ত মেয়ে আছে, তলিয়ে ভাবেন নি ব্রজেন্দ্রনাথ।

বিশ্বস্ত লোকজনের সূত্রে তিনটি পাত্রীর সন্ধান এসেছে। একটা ভাটপাড়ায়, একটা চুঁচুড়া অন্যটা বারাসতে। বনেদী রাঢ়ী কায়স্থ পরিবার সবাই। মোটামুটি পয়সাকড়ি আছে। পাত্রীরাও অসাধারণ সুন্দরী। দেবদ্বিজে ভক্তিপরায়ণা। রন্ধনপটিয়সী, গৃহকর্মনিপুণা ইত্যাদি ইত্যাদি।

প্রারম্ভিক যোগাযোগের পর শতদ্রুকে ট্রাংককল করেছিলেন ব্রজেন্দ্র। বসন্তপুরে বছর দুই হল টেলিফোন এক্সচেঞ্জ হয়েছে।

শতদ্রু আসার পর ব্রজেন্দ্র ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলেছেন। 'দেখ বাপু, স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রীস্বাধীনতা এসব কথা মুখে যতই বলি, তত্ত্বহিসেবে শুনতে যতই ভাল লাগুক, মানুষের বাস্তব জীবনটা সম্পূর্ণ অন্যরকম। প্রকৃতি এমন অসম করে সৃষ্টি করেছেন। মানুষ নাচার। স্ত্রীলোকের শিক্ষা বলো, স্বাধীনতা বলো, তার রীতিটা পুরুষের নকল হবে কোন যুক্তিতে? পুরুষের শিক্ষার লক্ষ্য হবে আদর্শ পুরুষ হওয়া আর মেয়েদের শিক্ষার লক্ষ্য হবে আদর্শ মেয়ে হওয়া। তেমনি উভয়ের স্বাধীনতাও থাকবে ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে। পুরুষ মদ্যপান করে রাস্তায় মাতলামি করতে পারে, মেয়েদের তা সাজে না। পুরুষ প্রয়োজনে মানুষ খুন করতে পারে। মেয়েরা তা করবে কোন মুখে? তাছাড়া এককেজনের শারীরিক শক্তি সামর্থ্য এককে ক্ষেত্রে প্রকাশ পায়। মেয়েদের পুরুষ হয়ে ওঠাটা বড় বিপত্তিকর। জীবনে দুঃখকষ্ট আসে ওতে।..'

বক্তৃতাটি অনাবশ্যক রকমের দীর্ঘ হল। শতদ্রু মামার মুখের ওপর কথা বলতে পারে না। কিন্তু তার সায় ছিল। ফাঁক পেয়ে সে বলল, 'আমি সম্পূর্ণ একমত মামাবাবু। এতদিন ধরে চোখের সামনে ওয়েস্টের লাইফ তো দেখলুম। ট্র্যাজিক! এখন ওরা—মানে পুরুষরা দুঃখ করে বলছে, এটা ঠিক হয়নি। কিন্তু সমাজের গতি তো উল্টোদিকে ঘোরানো যাবে না। ওদের পারিবারিক এবং দাম্পত্য জীবন একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেছে।'

ব্রজেন্দ্র বললেন, 'আমাদের শাস্ত্রে স্ত্রীবুদ্ধিকে ভয়ংকরী বলা হয়েছে।' বলেই গলার স্বর চাপলেন। শতদ্রুর মামী সবিতা অদূরে বসে বাসি কাগজের পাতা ওল্টাচ্ছেন। এক নাতনি পিঠে সেঁটে দুহাতে গলা জড়িয়ে রয়েছে। ব্রজেন্দ্র বললেন, 'এখানেও ওয়েস্টের বায়ু প্রবল। মফস্বলে এখনও সেটা কম। গ্রামে তো নেই-ই। তবে তোমার সঙ্গে মানসিক আদানপ্রদানের ক্ষমতাটা দেখতে হবে। একেবারে গ্রাম্য হলেও চলবে না, আবার...'

শতদ্রু ঝটপট বলল, 'গ্রামেও আছে। মানে থাকতে পারে। আজকাল তো আর সেরকম গ্রাম নেই। আমাদের বসন্তপুরের কথাই ভাবুন না!'

মামা-ভাগ্নেয় এ নিয়ে অনেকক্ষণ কথাবার্তা চলতে থাকল সে-বেলা।

পরদিন থেকে পাত্রীদর্শন শুরু হল শতদ্রুর। প্রথমে ভাটপাড়া, তারপর বারাসত, শেষে চুঁচুড়া।

ব্রজেন্দ্রর এক হিতৈষী বন্ধু, এক বেয়াই এবং তাঁর কোম্পানির যে কর্মচারী-ভদ্রলোক এসব সন্ধান দিয়েছেন, তিনি—এই তিনসঙ্গী এবং স্বয়ং পাত্র শতদ্রু।

গার্জেনরা তাড়া দিলেও কোন পাত্রীকে কোন প্রশ্নই কবল না শতদ্রু। সে মিটিমিটি হাসছিল শুধু। চুঁচুড়া থেকে শেষ দেখার পর রাত্রে ব্রজেন্দ্র ভাগ্নেকে মতামত জানতে চাইলেন। মামীর সামনে সংকোচ হতে পারে ভেবে ব্রজেন্দ্র শতদ্রুকে একান্তে নিয়ে গিয়েছিলেন।

শতদ্রু হেসে বলল, 'আচ্ছা। ভেবে দেখি।'

'দেরি কোরো না।' ব্রজেন্দ্র বললেন, 'তোমার ছুটি ফুরিয়ে যাবে। তার আগে শুভকাজ শেষ করা চাই। বউমা না হয় পরে যাবে। সব ব্যবস্থা করে পাঠিয়ে দেব খন। নিউইয়র্কে আমাদের নতুন অফিস হচ্ছে শিগগির। সেখানে লোক যাবে। ছোটকুও যেতে পারে। তার সঙ্গে বউমা যাবে। অসুবিধে কিসের?'

শতদ্রু শুধু হাসল।

ব্রজেন্দ্র বিরক্ত হয়ে বললেন, 'এ হাসিতামাশা নয় বাবু। এ লাইফ অ্যান্ড ডেথ কোশ্চেন! নাকি কোনোটাই পছন্দ হল না? তাও বলো খুলে। আবার খোঁজখবর নেব বরং।'

এবার শতদ্রু আস্তে বলল, 'ধরুন, যদি গ্রামেই পছন্দমতো মেয়ে থাকে, আপনি কি আপত্তি করবেন?'

ব্রজেন্দ্র ওর চোখে চোখ রেখে বললেন, 'গ্রামে! কোন গ্রামে? কোথায়?'

'বসন্তপুরে।' বলে শতদ্রু চোখ নামাল নিজের হাঁটুর দিকে।

ব্রজেন্দ্র চেয়ারে সিধে হয়ে বসলেন। 'তোমাদের বসন্তপুরে? সে কী! কোন বাড়ির মেয়ে? কেমন অবস্থা?'

শতদ্রু সংকোচে হাসল। 'অবস্থা ভাল না। ভীষণ গরিব।'

ব্রজেন্দ্র হো হো করে হেসে উঠলেন। 'তা ভাল। গরিবের কন্যাদায় উদ্ধারে আপত্তি নেই। কিন্তু কিন্তু শিক্ষাদীক্ষা?

'শুনেছি কলেজে বছরখানেক পড়েছে।'

'হুঁ। তোমার সঙ্গে শিক্ষাগত ব্যবধান বড্ড বেশি হয়ে গেল না?'

'না।' শতদ্রু তার স্মার্টনেস ফিরে পেল। মুখ তুলে ফের বলল, 'না। শি ইজ অলরাইট। ইংরেজি বইটই পড়াশোনা করে। মেরিটোরিয়াস স্টুডেন্ট ছিল।'

'তোমাদের ফ্যামিলির দিক থেকে অসুবিধে হবে না তো? শুনেছি গ্রামাঞ্চলে বড় দলাদলি। তোমার বাবার আপত্তি না থাকলেই হল।'

শতদ্রু গলার ভেতর হেসে বলল, 'ভীষণ হবে। তাছাড়া..'

'তাছাড়া?' ব্রজেন্দ্র তীক্ষ্ণ দৃষ্টে ভাগ্নেকে দেখতে থাক্‌লেন।

'ওরা কুলীন ব্রাহ্মণ। মুখার্জি।' শতদ্রু শুকনো হাসল। 'আমরাও তো কুলীন কায়স্থ।'

ব্রজেন্দ্র গম্ভীর হয়ে গেলেন। 'কলকাতা মেট্রপলিটন সিটি। এখানে আজকাল এসব জলচল। কিন্তু বসন্তপুর তো আদতে গ্রাম। মেয়ের গার্জেন কে?'

'গার্জেন তেমন কেউ নেই। একা বৃদ্ধা ঠাকুরমা আছেন। ভদ্রমহিলার একটা ডিফেক্ট আছে। ক্রাচে চলাফেরা করেন। তবে তাঁর আপত্তি হবে বলে মনে হয না।'

'দেখ বাপু! গ্রামসমাজ সম্পর্কে আমার কোনো অভিজ্ঞতা নেই। জানাশোনা যেটুকু, তা কতকটা ইনডিরেক্টলি। কতকটা তোমাদের বাড়ির লোকের কাছে।' ব্রজেন্দ্র উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন। 'তোমাদের বসন্তপুরে আমি, যদ্দূর মনে পড়ে, সর্বসাকুল্যে বারতিনেক গিয়ে থাকতে পারি। তার বেশি নয়। এখন ধরো, তোমায় মেয়ে দিয়ে ওদের ফ্যামিলি বিপদে পড়লেন। তখন? তুমি তো বাইরে সাতসমুদ্দুর তেরনদীর পারে রইলে। ধরো, বৃদ্ধা ওই ঠাকুরমা মারা গেলেন। তখন?'

শতদ্রু আঙুল খুঁটতে খুঁটতে বলল, 'হ্যাঁ— সেসব কথাও ভেবে দেখেছি। আরও একটু খুলে বলি আপনাকে। মেয়ের দিদি আছে—সে গ্র্যাজুয়েট। এখনও বিয়ে হয নি।'

ব্রজেন্দ্র বললেন, 'তাহলে তো আরও প্রব্লেম। তার বিয়েতে অসুবিধে হতে পারে।'

'সে আমি দেখব। স্টেটসে আমার জানাশোনা অনেক বাঙালী ছেলে আছে। একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে।'

'কে জানে বাপু! আমার তো ভাল ঠেকছে না। পাত্রীর বয়স কী রকম?'

'নাইনটিন।'

'হুঁ।' ব্রজেন্দ্র একটু চুপ করে থাকার পর বললেন, 'আমার দিক থেকে বাধা নেই। থাকা উচিত না। বাধা যদি আসে তো দেখবে তোমার বাবার দিক থেকে। তোমরা একসময়কার জমিদার ফ্যামিলি। তোমার বাবার যথেষ্ট মানমর্যাদা আছে ওই অঞ্চলে। তুমি তাঁর একমাত্র ছেলে। হাইলি কোয়ালিফায়েড। তোমার সম্পর্কে কেষ্টদা আর শমুর একটা বড়রকমের অ্যামবিশান থাকা স্বাভাবিক। এ অবস্থায় তুমি ওখানে বিয়ে করে বসলে...'

কথা কেড়ে শতদ্রু বলল, 'প্লীজ মামাবাবু! আপনি বাবা-মাকে বুঝিয়ে বলুন না। আপনার কথা ওঁদের অস্বীকার করা একেবারেই অসম্ভব। আপনি তো জানেন সেটা।'

ব্রজেন্দ্র বারবার গোঁফে হাত বুলোতে থাকলেন।

শতদ্রু বলল, 'মামাবাবু!'

ব্রজেন্দ্র একটু হাসলেন। 'রোসো! দেখি কী করা যায়।'

শতদ্রু উঠে পড়ল। তখন ব্রজেন্দ্র তাকে ডাকলেন। 'তুমি কি পাত্রী কিংবা তার ঠাকুমা কিংবা তার দিদি—কাউকে কিছু বলেছ ইতিমধ্যে? কোনো কথা দিয়েছ কি?'

শতদ্রু বলল, 'না।'

ব্রজেন্দ্রও উঠলেন। 'এসব কথা বললেও পারতে আমাকে। খামোকা অত ছুটোছুটি করলুম। ওঁদের মনে আশা জাগালুম। তুমি বাপু এখনও আদৌ স্মার্ট হতে পারো নি। শহরে কাটালে ছেলেবেলা থেকে। তারপর সায়েবদের দেশে এতগুলো বছর থাকলে। তবু গেঁয়ো রয়ে গেলে মনে মনে! তুমি ভারি অদ্ভুত ছেলে সাটলেজ!'...

মামার প্রতি বরাবর আস্থা আছে শতদ্রুর। মামাকে সে সুবিবেচক এবং স্নেহশীল বলে জানে। এও লক্ষ্য করেছে, নিজের ছেলেদের তুলনায় তার প্রতি ব্রজেন্দ্রের ঈষৎ পক্ষপাত আছে যেন। তাই সে ধরেই নিল, ব্রজেন্দ্র মুখে যাই বলুন, তার ইচ্ছাপূরণে পিছপা হবেন না শেষ পর্যন্ত। যা বলবেন, তা মেনে নিতে দেরি করবেন না।

বিকেলে ব্রজেন্দ্রর কনিষ্ঠ পুত্র অপূর্ব ফোন করল শতদ্রুকে।..'সাটু, কী করছিস এখন?'

শতদ্রুর সমবয়সী এবং সহপাঠী সে। চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট। মামাতো ভাই হলেও যে বন্ধুত্ব হবে না এবং পরস্পর ফস্টিনস্টি, এমন কী অশ্লীল রসিকতাও চলবে না পরস্পর, তার মানে নেই। দুজনেই ছাত্রজীবনে পরস্পরকে জানিয়ে একটু-আধটু প্রেমের ভান করেছে কিছু-কিছু বোকা ও আবেগ সর্বস্ব মেয়ের সঙ্গে। শতদ্রু অবশ্য অপূর্বের মত চৌকস ছিল না। ঘাবড়ে যেত এবং পিছিয়ে আসত। অপূর্ব ছিল বেপরোয়া।

শতদ্রু বলল, 'কিচ্ছু না। ভাবছি, কী করব।'

'কাছাকাছি পিতৃদেব আছেন নাকি?'

'না। কেন?'

'কতগুলো মাল দেখলি বে?'

'এই! কী মাস্তানি করছিস! চেম্বারে তোর পি এ মহিলাটি নেই বুঝি?'

'আছে। শুনছে এবং হাসছে।'

'ইনডিয়ানরা যথেষ্ট এগিয়েছে বোঝা যাচ্ছে।'

'শোন্। আর একটু এগোনো যেতে পারে। এক্ষুনি চলে আয়!'

'কী ব্যাপার?'

'তোকে নিয়ে এক জায়গায় যাব। দারুণ জমবে।'

'কোথায় রে?'

'তোর জন্য মা—সরি, মেয়ে দেখতে।'

'কী যাতা বলছিস!'

'বাবার কেলোর কীর্তি তো দেখলি। এবার আমার পেঁচোর কীর্তি দেখে নে। আয় শিগগির!'

'আঃ, খুলে বল্ না বাবা!'

'একটা ককটেল পার্টিতে যাব। সঙ্গীসহ নেমন্তন্ন। কাজেই তোর...'

'তোর পি এ-কে নিয়ে যা।'

'বুদ্ধু কাঁহেকা! চলে আয় বলছি। গাড়ি যাচ্ছে, রেডি হ।' অপূর্ব ফোন রেখে দিল।

মিনিট কুড়ি পরে শতদ্রু অপূর্বর চেম্বারে পৌঁছুল। পাঁচটা বেজে গেছে। অফিস প্রায় ফাঁকা। অপূর্ব চেম্বারে বসে আরাম করে কান চুলকোচ্ছিল। সুন্দরী পি এ-কে দেখতে পেল না শতদ্রু।

অপূর্ব ঘড়ি দেখে বলল, 'আর মিনিট কুড়ি পরে বেরুব। বস্।'কফি খা।'

শতদ্রু বলল, 'আমাকে খামোকা কোথায় নিয়ে যাবি? তুই বরাবর বড্ড মিসট্রিয়াস অপু!'

অপূর্ব মুচকি হেসে বলল, 'তোর মাইরি কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই। তোকে ওইভাবে বাঁদর নাচিয়ে বেড়ালেন বাবা, আর তুইও দিব্যি নাচলি। কোনো মানে হয়?'

'ছাড় ওসব কথা।'

অপূর্ব বলল, 'এই সিসটেমটাই যাচ্ছেতাই অড। ভেরি ক্রুড অলসো। সেজেগুজে একটা মেয়ে এসে বসে থাকবে। তাকে চারদিক থেকে একদল ওল্ড হ্যাগার্ড খামচাবে। কাতুকুতু দেবে। আর তুই ভ্যাবলার মতো তাকাবি। পুরো ব্যাপারটা তোর ইনহিউম্যান মনে হয় নি?'

'হয়েছে তো!' শতদ্রু একটু হাসল। 'তাই মামাবাবুকে জানিয়েও দিয়েছি, চলবে না।'

'পেরেছিস? অসম্ভব।'

'বিশ্বাস কর।'

অপূর্ব হাত বাড়িয়ে বলল, 'হাতে হাত দে। তুই তাহলে নমস্য!' অপূর্ব হো হো করে হাসতে লাগল।

শতদ্রু বলল, 'কে পার্টি দিচ্ছে রে? কোথায়?'

'পার্টি আসলে আমরা দিচ্ছি—বেনামে। গ্যাঞ্জেস অ্যাডভারটাইজিংয়ের নামে। সেন্ট্রাল মিনিস্ট্রির এক বড় চাঁইকে কিঞ্চিৎ পিচ্ছিল করার চেষ্টা আর কী—যাতে সময়মত ব্যাম্বুটি প্রদান করা যায়।'

অপূর্বর কথাবার্তার ধরনই এরকম। শতদ্রুর মনে হল, অপূর্ব আরও ধূর্ত হয়েছে। চোখে-মুখে ধার চকচক করছে। বড় ভাইয়ের তুলনায় এবয়সেই দারুণ মুটিয়েও গেছে সে। সেই সঙ্গে নিজের স্ত্রী রুমাকেও খানিকটা গোলগাল করে ফেলেছে যেন। আমেরিকা থেকে কলকাতা পৌঁছেই মামার বাড়ি উঠেছিল শতদ্রু। তখন দেখেছে। এবার এসে দেখল রুমা নেই। গোয়া বেড়াতে গেছে সকন্যা কোন আত্মীয় বাড়ি। অপূর্ব দ্রুত মেয়ের বাপ হয়েছে দেখে শতদ্রুর অবাক লেগেছিল।

কাছাকাছি একটা বড় হোটেলে ককটেল পার্টি। শতদ্রু হতাশ হল পার্টির হালচাল দেখে। মহিলার সংখ্যা আঙুলে গোনা যায়। বেশির ভাগই মধ্যযৌবনা। মৃদু অর্কেস্ট্রার শব্দ। কেউ নাচে না। হাতে গ্লাস আছে, হাসিও আছে—কিন্তু সবমিলিয়ে থমথমে গুরুগম্ভীর পরিবেশ। শতদ্রুর দিকে সবারই চোখ পড়ছে অবশ্য। অপূর্ব আলাপ করিয়েও দিচ্ছে। কিন্তু শতদ্রুর কথা বলতে ভাল লাগছে না। বরং তার হাস্যকরই লাগছে। পশ্চিমের এই নকলিয়ানা তার পক্ষে সহনীয় ও আনন্দদায়ক হতে পারে, যার জীবনে আসলটা দেখার সুযোগ হয় নি। মনে পড়ছিল, আরবানায় এক মার্কিন বুড়ো তাকে হাসতে হাসতে বলছিল, 'ইওর গ্র্যান্ড হোটেল ইজ নট সো গ্র্যান্ড।'

ককটেল পার্টি মানেই উদ্দাম নাচ, বাজনা, হাসি। অবাধ চাঞ্চল্য। প্রচুর স্বাধীনতা। রাত যত বাড়বে, তত উদ্দীপনা বাড়বে। সদ্যচেনা যুবতীর গণ্ডদেশে আচমকা চুম্বনে ছড়িয়ে পড়বে ঘরভরা হাসির স্ফুলিঙ্গ। কেউ কার্পেটে পা ছড়িয়ে আধশোয়া অবস্থায় হাত রাখবে কোন মহিলার ঊরুদেশে। তাই

বলে কেউ মাতলামি করবে না। মাতলামির জন্য কেউ পার্টিতে যায় না। পার্টিতে কিছু-কিছু শিষ্টাচার আছে। সবাই তা মেনে চলবে। কিন্তু এ সব কী?

শতদ্রুর মদ্যপানের অভ্যাস নেই। তবে একটু-আধটু খেতে আপত্তি করে না। লাইম দেওয়া জিন নিয়েছিল। একটু পরেই মাথা ধরছে মনে হল। অপূর্ব চরকির মত এখান থেকে সেখানে ঘুরছে। শতদ্রু এককোনায় গিয়ে একা দাঁড়িয়ে আছে, তখন সে এক যুবতীর কাঁধে হাত রেখে তাকে নিয়ে এল। 'এর কথা তোকে বলেছিলুম—সোমা সিন্‌হা। কথক নৃত্যে এখন ইন্টারন্যাশনাল ফেম—মাইন্ড দ্যাট, এ বয়সেই।' অপূর্ব ঈষৎ মাতাল হয়েছে।

এর কথা অপূর্ব তাকে আদৌ বলেনি। তবু শতদ্রু বাধা দিল না। সোমা তাকে মার্কিন ঢঙে 'হাই' সম্ভাষণ করল। শতদ্রুও বলল, 'হাই!'

অপূর্ব বলল, 'শতদ্রু সিনহা। আমার পিসতুতো ভাই। কিন্তু ছাত্রজীবনে আমরা একসঙ্গে প্রেম করতুম।'

সোমা বলল, 'প্রেমিকা নিশ্চয় একজনই ছিল?'

অপূর্ব বলল, 'তা আর বলতে?'

শতদ্রু লক্ষ্য করল সোমা অদ্ভুত উচ্চারণে বাংলা বলছে ঠোঁটের ডগায়। এটাই এদেশে রীতি অবশ্য—সে জানে। অপূর্ব তক্ষুনি অন্য কোণে দৌড়ে গেল। তখন শতদ্রু বলল, 'দেন ইউ আর এ ড্যান্সার!' সে ইচ্ছে করেই মারকিন ঢঙে ইংরেজি বলতে থাকল। পাস্ট্ কে প্যাস্ট, কিংবা ফাস্ট্‌কে ফ্যাস্ট্।

সোমা ইংরেজি বলতে পেরে যেন স্বস্তি অনুভব করল। অপূর্ব তাকে শতদ্রুর পরিচয় আগেই দিয়েছে। সে জানাল, আমেরিকার কোথায়-কোথায় নেচেছে। আরবানার কাছে চিকাগোতে গত সেপ্টেম্বরে নেচেছে শুনে শতদ্রু খুশি হল। আসলে সে আমেরিকার প্রেমে পড়ে গেছে। সেখানকার কথা পেলে জমে ওঠে।

রাত আটটায় ছাড়াছাড়ি হল অপূর্বের পুনরাবির্ভাবে। পার্টি শেষ হয়েছে। সোমা বলল, 'খুব ভাল লাগল আপনার সঙ্গে কথা বলে। আবার দেখা হতে পারে—ইফ ইউ উড লাইক ইট। অপূর্বদা, শিগগির ওঁকে নিয়ে আসুন না আমাদের বাড়ি। ফেব্রুয়ারির ফার্স্ট উইক পর্যন্ত আই অ্যাম ফ্রি। তারপর যাচ্ছি জ্যাপ্যান।'

শতদ্রুর মনে পড়ল, তার জাপানী বন্ধু মিনাকোর সামনে যতবার জ্যাপ্যান বলেছে, ততবার মিনাকো হেসে ঘুসি পাকিয়ে বলেছে, 'আই মাস্ট কিল ইউ। নট জ্যাপ্যান, বাট জা-পা-ন!'

ফেরার পথে গাড়িতে অপূর্ব বলল, 'কী? পছন্দ হল?'

শতদ্রু তাকাল ওর দিকে। 'কাকে? কিসের পছন্দ?'

'বুদ্ধু! সোমাকে।'

শতদ্রু হাসতে লাগল। 'বেশ স্মার্ট আর কী! স্লিম গড়নের মেয়ে আমাদের দেশে খুব কম চোখে পড়ে। রঙটাও মন্দ না। গায়ের রঙের ব্যাপারে আমি কিন্তু মেমসায়েবদের বেজায় অপছন্দ করি।'

অপূর্ব চোখ নাচিয়ে বলল, 'নাচের জন্য ওকে ফিগার ঠিক রাখতে হয়। তবে কী জানিস? নাচিয়েদের নিচের দিকটা সবসময় একটু মোটা হয়ে যায়—বিশেষ করে কথক জাতীয় নাচ যারা নাচে। ওপরকার সব মাংস যেন ঝাঁকুনির চোটে নিচে এসে জড়ো হয়।'

শতদ্রু হাসতে হাসতে বলল, 'যা বলেছিস। গুড অবজার্ভেশন!'

'যাই হোক, ছুঁড়িটাকে নিবি?'

'মাতলামি করিস না অপু।'

অপূর্ব বলতে থাকল, 'বনেদী বংশ। তোদের মতোই। ও কে জানিস তো? বলেনি সোমা? গ্যানজেস অ্যাডভার্টাইজিংয়ের মালিক মাখনলাল সিনহার মেয়ে। ওর মাও এসেছিল—লক্ষ্য রাখলে চিনতে পারতিস। শুনেছি ওই ভদ্রমহিলাই এ কনসার্নের উন্নতির মূলে। সোসাইটি লেডি বলতে যা বোঝায় আর কী।'

শতদ্রু চুপ করে থাকল।

অপূর্ব বলল, 'বাবা তো বাইরের ব্যাপার নিয়ে থাকে। মা মেয়ের জন্য চিন্তিত। দেশে-দেশে ধেই ধেই করে মেয়ের নেচে বেড়ানো পছন্দ নয়।'

শতদ্রু বলল, 'মায়ের কথায় নাচ ছাড়বে বলে মনে হল না।'

'না। নাচুক না।' অপূর্ব সিরিয়াস ভংগিতে বলল। 'নাচুক। কিন্তু কোমরে দড়ি বাঁধা থাক।'

'বাঁদর নাচ।' শতদ্রু বিরক্ত হল। 'সোমা তা চাইবে কেন?'

অপূর্ব বাঁকা ঠোঁটে বলল, 'আরে ভাই, কত সোমা দেখা হয়ে গেল। মিসেস সিনহার সঙ্গে সামান্য কথা হয়েছে আমার। আভাস পেয়ে উনি লাফিয়ে উঠেছেন। বেশ তো! সোমা স্টেটসে থাকার সুযোগ পেলে ওখানে একটা অরগ্যানাইজেশন গড়ে তুলবে। কত স্কোপ পাবে। তারপর বুঝলি? মিসেস তোর সঙ্গে আলাপ করতে এগিয়ে গিয়ে পিছিয়ে গেলেন। তুই তখন সোমার সঙ্গে জমে আছিস। বললেন, এখন ওদের ডিসটার্ব করব না। পরে একদিন বাড়ি নিয়ে এস ছেলেটিকে।'

শতদ্রু নড়ে বসল। 'মাই গুডনেস! তাহলে সেই পেন্টেড মহিলা! আমার দিকে বারবার তাকাচ্ছিলেন।'

'কী বললি? পেন্টেড মহিলা!' অপূর্ব খিকখিক করে হাসতে লাগল। 'দারুণ বলেছিস সাটু! অ্যামেরিকা গিয়ে তোর ব্রেন শার্প হয়েছে। বাঃ!'...

সে-রাতে ভাগ্নেকে নিয়ে খেতে বসলেন ব্রজেন্দ্র। অপূর্বও বসল। ব্রজেন্দ্রের খাওয়া সবার শেষে। এতবড় সংসারের খাওয়া-দাওয়া হতে সময় লাগে। সুপ্রশস্ত ডাইনিং হলে দুটো প্রকাণ্ড টেবিল, বারটা সুদৃশ্য চেয়ার। বাণীব্রত এবং সুকুমার—অপূর্বর বড়দা ও মেজদা সস্ত্রীক এবং পুত্রকন্যাদের নিয়ে খাওয়া-দাওয়া আগেই সেরেছেন। রাতে এইরকম জমাট আসর বসে। দিনে এ সুযোগ হয় না। তাঁদের মা সবিতা নিরামিষ খান বলে আলাদা ব্যবস্থা। নিজের ঘরে বসেই খান। একটু একা থাকতে ভালবাসেন ইদানিং।

খেতে খেতে অপূর্ব শতদ্রুর দিকে একবার তাকিয়ে বলল, 'বাপী, একটা কথা ছিল! বলতে পারি?

ব্রজেন্দ্র সহাস্যে বললেন, 'আপত্তি কিসের?'

'সাটু তোমাকে বলেছে কি ওর কোনো পাত্রী পছন্দ হয় নি?'

ব্রজেন্দ্র একটু গম্ভীর হয়ে আনমনে বললেন, 'হুঁ।'

'গ্যানজেসের মিসেস সিনহার মেয়েকে আশা করি তুমি চেনো।'

ব্রজেন্দ্র তাকালেন কনিষ্ঠপুত্রের দিকে।

অপূর্ব বলল, 'শতদ্রুর তাকে পছন্দ। ক্যান আই প্রসিড টু...'

শতদ্রু কী বলতে যাচ্ছিল, ব্রজেন্দ্রর কথায় থেমে গেল। 'সেই নাচুনী!'

অপূর্ব হাসতে লাগল 'বাপী, প্লীজ! অমন করে বলো না! সি ইজ চার্মিং!'

ব্রজেন্দ্র ঘাড় বাঁকা করে পাশে শতদ্রুর দিকে ঘুরে বললেন, 'কী হে? অপু কী বলছে?'

অপূর্ব কড়ামুখে বলল, 'সাটলেজ! মুখ খুলবিনে। ঘুঁসি মারব। লেট মি ফেস বাপী।'

ব্রজেন্দ্র বললেন, 'তোমাদের জেনারেশনকে, সত্যি বলছি, আমি বুঝতে পারি নে। তোমরা কী ভাবো, কী করো, কী চাও—হোপলেস। আমাকে জিগ্যেস করার কী দরকার তাহলে?'

'বাপী! বাপী! প্লীজ। ইউ আর ডিসটার্বড!'

ব্রজেন্দ্র কনিষ্ঠপুত্রের কথার ভংগিতে হেসে ফেললেন। 'আই অ্যাম অলরাইট। দেখ বাপু' ভাগ্নে উদ্দেশে বললেন, 'যা করার ঝটপট করে ফেলো তাহলে।' মাখন সিঙ্গির পয়সা আছে। আমার চেয়ে তালেবর লোক। কেষ্ট সিঙ্গিও কম যায় না। সব দিকেই উত্তম জুটি। কিন্তু মাইন্ড দ্যাট, শি ইজ নাচুনী

'আর্টিস্ট বাপী, আর্টিস্ট! সোমাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য কোরো না। ইন্টারন্যাশনালি রেপুটেড ....'

অপূর্বর কথা কেড়ে শতদ্রু বলল, 'আমায় কিছু বলতে দিবি অপু?'

'শাট আপ! যার বিয়ে, তার কিছু বলার নেই। দিস ইজ আওয়ার ইন্ডিয়ান ফর্মালিটি। না বাপী?

ব্রজেন্দ্র গম্ভীর মুখে বললেন, 'হুম!'

শতদ্রু বলল, 'কাল আমি বসন্তপুর যাচ্ছি, মামাবাবু।'

ব্রজেন্দ্র বললেন, 'সে কী!'

'আপনাকে যা বলার বলেছি। আর কিছু বলার নেই। এখন সবকিছু আপনার হাতে।'

ব্রজেন্দ্র কিছু বললেন না—কারণ, কথাটা বুঝলেন। অপূর্ব রাগ করে বলল, 'ইডিয়ট! পস্তাবি।'...

অপমানিতার অভিমানে

অপরূপার বাইরে না গেলে চলে না। রঙ্গনা একা থাকবে এই নিরিবিলি বাড়িতে—তাই মধুছুতোরের বউকে বলে যায়। ছুতোর বউয়ের কাজের শেষ নেই। সে পেনীকে পাঠিয়ে দিয়ে বলে, 'হ্যাঁ গো বাবুদিদিরা! ওকে একটুখানি ন্যাকাপড়া শিখিও না বাপু। ওর মতন কত মেয়ে ইস্কুলে পড়ছে আজকাল।'

রঙ্গনা একা থাকতে ভয় পায়। কিন্তু পেনীকে পড়ানোর ইচ্ছে এতটুকু নেই। পেনীরও নেই। রঙ্গনা নিজের পড়া নিয়েই ব্যস্ত। পেনী বারান্দার মেঝেয় কাঠিকাঠি দুই পা ছড়িয়ে অ-আ ক-খ খুলে বসে থাকে শুধু। ওর মা এসে উঁকি মেরে দেখে যায়। ওই দেখেই সে খুশি। কুড়ানি ঠাকরুন তাড়াহুড়ো যাবার সময় তাকে কিছু বলে না গেলেও সে জানে তাকে কী করতে হবে। দু'বোনের খোঁজখবর নিয়ে যায় খিড়কির পথে। ঠাকরুনের মত দর করে লাউ বেচে দেয়।

কিন্তু সাত-সাতটা দিন চলে গেল। কুড়ানি ঠাকরুনের খবর নেই। রঙ্গনা উদ্বেগে কাঁদো-কাঁদো মুখে বলে, 'কিছু বোঝা যাচ্ছে না। কী হতে পারে বল্ তো দিদি!'

অপরূপা রাগ করে বলে, কী হবে? বাপের বাড়ি এনজয় করছে। আর আমরা ভেবে সারা হই না কেন?'

'একটা চিঠি দিলেও তো পারত।'

'লেখাপড়া জানলে তো? বাঁকা-শ্রীরামপুর নাম শুনেই বোঝা যাচ্ছে, গোমুখ্যু ইডিয়টদের দেশ।'

'ও দিদি, মধুরবাবু?

'কী হল মধুরবাবুর?'

'সে তো ফিরে আসবে। তার পাত্তা নেই কেন রে?'

অপরূপা খাপ্পা হয়ে বলে, 'আমি কেমন করে জানব। গাঁজাখোর কোথায় গাঁজা খেয়ে পড়ে আছে।'

দিনে কিছু বোঝা যায় না অতটা। রাত এলেই এই পুরনো এতকালের চেনা বাড়িটার চেহারা যেন বদলে যায়। বড় গা ছমছম করে দু'বোনের। উঠোনের দিকে তাকাতে পর্যন্ত ভয় করে দুবোনের। তারপর সারাটা রাত বারবার ঘুম ভেঙে যায়। একটু শব্দ হলেই এ ওকে ডাকে। অত যে কাঠ হয়ে এঘরে একা ঘুমোত অপরূপা, তার অবস্থা শোচনীয়। রঙ্গনা ঘুমজড়ানো গলায় বিরক্ত হয়ে বলে, 'নিজেও ঘুমোবে না—আমাকেও ঘুমোতে দেবে না!'

'কী একটা শব্দ হচ্ছে!' অপরূপা কান পেতে বলে।

রঙ্গনা ভীষণ ভয় পেয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে থাকে।

এক বাহাত্তুরে বুড়ি—যার একটা পা থেকেও নেই, সেই ছিল এবাড়ির শক্তি আর সাহসের উৎস। আশ্চর্য লাগে অপরূপার, এই ঘরে এ খাটে সে একা শুয়েছে এতকাল। এখন রাতবিরেতে এ ঘরের সব জীর্ণ ও তুচ্ছ আসবাব যেন জ্যান্ত হয়ে দাঁত কটমট করে। আয়নার দিকে তাকালে মনে হয়, আরও কাউকে দেখতে পাবে। আর সারা রাত খাটটার তলায় ঘূণপোকার কুট কুট খর খর অদ্ভুত সব শব্দ। মাথার ভেতর ঢুকে যেতে থাকে শব্দগুলো।

ঠাকুমা থাকার সময় কোথায় ছিল এসব শব্দ আর স্পন্দন, এত নড়াচড়া, উপদ্রব! বৃদ্ধা যেন সব অলৌকিক অনিষ্টকারীকে শাসনে রাখতেন। আমড়া গাছটায় পেঁচা এসে ডাকলেই ক্রাচ ঠুকে চেঁচাতেন, 'যাঃ যাঃ! দূর। দূর!' শরৎকালে পেয়ারা ডাগর হলে.বাদুড়ের উৎপাত হত খুব। কুড়ানি ঠাকরুনের কী বুদ্ধি! একটা ভাঙা টিনের ভেতর একটুকরো ইট পেনডুলামের মত ঝুলিয়ে গাছের ডালে লটকে

দিয়েছিলেন। তার সঙ্গে লম্বা একটা দড়ি। দড়ির ডগাটা চৌকাঠের কোনার ফুটো দিয়ে ডান পায়ের গোড়ালিতে বেঁধে শুতেন। বাদুড়ের শব্দ পেলেই পা নাড়াতেন। ঢং ঢং করে শব্দ হত পেয়ারা গাছে। একেবারে নাকের ডগায় ওই বিচ্ছিরি আওয়াজে ভড়কে যেত বাদুড়গুলো। তক্ষুনি ডানা শনশন করে পালিয়ে যেত। শীতের সময়টা বাদুড়ের উপদ্রব আর নেই।

কিন্তু রাতের কিছু-কিছু শব্দ অলীক নয়, কোন-কোনদিন তা বোঝা যাচ্ছে। চোর এসে সেরা লাউটিকে মুচড়িয়ে ছিঁড়ে নিয়ে গেছে। এক কাঁদি কলাও কে কেটে নিয়ে গেছে খিড়কির ঘাট থেকে। মধুর বউ এসে পস্তায়। গলা তুলে শাসায় চোরকে।...'কার বাড়ি তা জানো না খালভরারা? তোমাদের এত সাওস যে কালু মুখুয্যের ভিটেয় পা ফেলো?'

সে অদূরে লোকজন দেখলে শুনিয়ে শুনিয়ে আকাশচেরা গলায় বলে, 'জানিনে বুঝি কোন বামুনের কাজ? সব জানি। ঠাকরুনদি নেই—ফিরুক। তা'পরে অনিবাবু ফিরুক। তখন বুঝবে। ছি ছি ছি, এই করে মানুষে?'

তারপর একই সুরে রঙ্গনার উদ্দেশে চেঁচিয়ে বলে, 'অনিবাবুর আজকালই ফেরার কথা না গো? হ্যাঁ—অপু তো বলছিল, আজ নয় তো কাল দাদা এসে পড়বে। কলকেতায় আছে।'...

দু'বোনই বিরক্ত হয়। আবার মজাও পায়। তারপর দুজনেরই মনে হয়, ঠাকুমা যখন আসবে আসুক, দাদা যদি হঠাৎ এসে পড়ে, কী ভাল না হবে! অনি থাকতে আর কিছু না হোক, সাহস ছিল প্রচণ্ড। রাস্তা দিয়ে হাঁটার সময় কোন ছেলে ভুলেও ফচকেমির সাহস পেত না। এখন পেছনে শিস দেয়। কখনও টিপ্পনি। অপরূপার বেলায় যতটা না, রঙ্গনার বেলায় বেশি। রঙ্গনা মুখ নামিয়ে হন হন করে হেঁটে যায়। কান পাতে না।...

সেদিন বিকেলে অপরূপা বাড়ি ফিরে দেখল, পেনীকে নিয়ে রঙ্গনা খিড়কির ডোবা থেকে জল এনে গাছ-গাছালিতে সেচ দিচ্ছে। কোমরে আঁচল জড়ানো। পায়ে কাদা। উঠোনও ভিজিয়ে প্রায় কাদা করে ফেলেছে। সারা উঠোন কবে একসময় লাইমকংক্রিটে পোক্ত ছিল। কালক্রমে চাবড়া উঠে মাটি বেরিয়ে পড়েছিল। খঞ্জ মানুষ—আছাড় খেতেন কুড়ানি ঠাকরুন। তাই মুনিশ ডেকে দুরমুস করা হয়েছিল। তার ফলে উঁচু-নীচু গড়ানে হয়ে আছে অনেক জায়গা। বর্ষায় আর জল জমে না একটুও।

অপরূপা তার দিকে তাকিয়ে আছে দেখে রঙ্গনা হাসল।...'কী রে? কী দেখছিস?'

'তোর কীর্তি। এই অবেলায় জল ঘেঁটে জ্বর বাধালে দেখার সময় পাব না বলে দিচ্ছি।'

'সব শুকিয়ে চিমসে হয়ে গিয়েছিল যে!' রঙ্গনা আঙুল তুলে শিমের মাচান দেখাল। 'দেখছিস না, কেমন মিইয়ে গেছে। হরগৌরীর গাছটা পর্যন্ত নেতিয়ে গিয়েছিল। ঠাকুমা এলে কী বলবে বল্ তো দিদি?'

অপরূপা হঠাৎ নড়ে উঠল। 'এই রনি! বলতে ভুলে গেছি।' সে চোখ বড় করে শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বলল। 'জানিস? হরেনদা বলল মধুরবাবুকে নাকি কাল সন্ধ্যায় দেখেছে।'

রঙ্গনা বালতি হাতে থমকে দাঁড়াল। 'মধুরবাবু ফিরেছে?'

'তাইতো বলল হরেনদা।' অপরূপা করুণমুখে বলল। 'কিন্তু আমার অবাক লাগছে, ভদ্রলোক এসে বলে যাবেন তো!'

রঙ্গনা ঠোঁট বাঁকা করে বলল, 'ইমপসিবল। হরেনদাটা গুলবাজ জানিসনে? ফক্কুরি করেছে।'

'না রে! সিরিয়াসলি বলল। ঘোঁতনের দোকানে চা খাচ্ছিল মধুরবাবু। হরেনদা দেখেছে।'

রঙ্গনা এবার উদ্বিগ্ন হয়ে বলল, 'তুই ভাল করে জিগ্যেস-টিগ্যেস করলিনে কেন হরেনদাকে?'

'করলুম। একই কথা বলল।' অপরূপা নাক খুঁটতে থাকল।

রঙ্গনা বালতি রেখে বলল, 'আমি একবাব যাই দিদি। হরেনদাকে ভাল করে জিগ্যেস করে ঘোঁতনের কাছে খোঁজ নিই গে।

অপরূপা আস্তে বলল, 'থাক গে। সন্ধের মুখে আর বেরুস নে।'

পেনীর ফ্রকে জলকাদা লেগেছে প্রচুর। সে নিষ্ঠার সঙ্গে হামাগুড়ি দিয়ে মাচানের তলায় ঢুকে জল ঢেলেছে। অপরূপা হঠাৎ বলল, 'পেনী, তোর পিঠে ওটা কী রে? কাছে আয় তো!' পেনী কাছে এলে

সে একটা কাঠি কুড়িয়ে পেনীর পিঠ থেকে পোকা ফেলে দিল। পোকাটা দেখতে দেখতে বলল, 'রনি! এটা শুয়োপোকা নাকি দেখ্ তো!

রঙ্গনা একবার দেখেই বলল, 'নাঃ।'

পেনী পোকাটাকে পায়ের বুড়ো আঙুলে ঘষটে মেরে ফেলল। পেনী পোকা মারতে পেলে আর কিছু চায় না। এবাড়ি এলেই সে পোকা খুঁজে বেড়ায় গাছপালা লতাপাতায়। কুড়ানি-ঠাকরুনের সেটা অপছন্দ। তাড়া করে বলেন, 'অই! অই! আবার ওই নষ্ট স্বভাব?' পেনী যদি বলে, 'ও ঠাকরুন, পাতা খাচ্ছে যে,' ঠাকরুন বলেন, 'খাবে না? তুই খাসনে লা? থাক্।' এ কয়েকটা দিন কুড়ানি ঠাকরুন না থাকায় পেনীর খুব আনন্দ। পোকামাকড় খুঁজে বের করে মনের সুখে মেরেছে। ঘাসফড়িং গাঙফড়িংকেও রেহাই দেয় নি।

রঙ্গনা মুখ মুছতে মুছতে ঘরে ঢুকল। চুল আঁচড়াল। একটু ক্রিম ঘষবে ভেবে হাত বাড়াতে গিয়ে দেখল অপরূপা দাঁড়িয়ে আছে। একটু হাসল অপ্রস্তুত হয়ে। অপরূপা বলল, 'হরেনদাকে কি এখন পাবি? নতুন কথাই বা আর কী শুনবি ভাবছিস?'

রঙ্গনা সেই অপ্রস্তুত হাসি মুখে রেখেই বলল, 'বিয়াসদির কাছ হয়ে আসব। পত্রিকাগুলো পড়া হয়ে গেছে। বইটাও দিয়ে আসব রে দিদি!'

অপরূপা ওর আপাদমস্তক লক্ষ্য করে বলল, 'এ রাম! তুই কি এই কাপড়েই বেরুবি নাকি?'

'ভ্যাট্!' রঙ্গনা বলল। 'কাপড় বদলাব তো! তুই যেন কী।'

শাড়ি বদলে মোটামুটি ভদ্র হয়ে রঙ্গনা পেনীকে নিয়ে বেরুল। অপরূপা পই পই করে বলে দিল যেন শিগগির ফিরে আসে। দরজায় গিয়ে ফের চেঁচিয়ে বলল, 'বিয়াসের ওখানে কখনো আড্ডা দিবি নে।' রঙ্গনা জানে, দিদি একা থাকতে ভয় পাচ্ছে আসলে।

হরেন জয়কালী ট্রান্সপোর্টের অফিসে কাজ করে। সেখানে গিয়ে রঙ্গনা শুনল, এইমাত্র কোথায় বেরিয়েছে। কখন ফিরবে কেউ বলতে পারল না। অগত্যা কিছুক্ষণ পথ তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল রঙ্গনা। তারপর টের পেল, ওপাশে পেট্রল পাম্পের সামনে নিচু দেয়ালে বসে কয়েকটি ছেলে তাকে লক্ষ্য করে কী বলছে আর হাসছে।

রঙ্গনা হন হন করে হাঁটতে থাকল। পেনী বলল, 'ও দিদি! আবার কোথা যাচ্ছ?'

রঙ্গনা ধমকাল। 'তুই থাম্ তো। চুপচাপ সঙ্গে আয়।'

অনেকটা হেঁটে ঘোঁতনের চায়ের দোকান। দোকান শুধু নামেই। একটা প্রকাণ্ড শিরিস গাছের গুঁড়ি ঘেঁষে কাঠে টব। তার ওপর চায়ের সরঞ্জাম। পাশে কয়লার উনুন। সামনে ও একপাশে দুটো কাঠের বেঞ্চ। মাঝে মাঝে রোডস দফতরের লোকেরা এসে এ দোকান হটিয়ে দেয়। অধ্যবসায়ী ঘোঁতন ফের সাজিয়ে বসে। গুঁড়িতে অনেকগুলি টিনের টুকরো পেরেক দিয়ে আঁটা। তাতে নানারকম বিজ্ঞাপন।

ভিড় দেখে রঙ্গনা একটু তফাতে দাঁড়াল। পেনীকে বলল, 'ঘোঁতনকে জিগ্যেস করে আয় তো পেনী, মধুরবাবুকে দেখেছে নাকি। শোন্, দেখেছে বললে জিগ্যেস করবি, কখন দেখেছে।'

পেনী চলে গেল। রঙ্গনা দেখল, পেনী ঘোঁতনের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করছে। কিন্তু ঘোঁতন তার দিকে ঘুরেও তাকাচ্ছে না। অনেক চেষ্টার পর পেনী তার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। তখন ঘোঁতন দাঁতমুখ খিঁচিয়ে কিছু বলল। পেনী দৌড়ে চলে এল।

রঙ্গনা রুদ্ধশ্বাসে বলল, 'কী বলল রে?'

'বলল, আমি কি জানি নাকি?' অপমানিতা পেনী করুণ মুখে বলল।

'তুই বললিনে কেন, আমি জিগ্যেস করতে পাঠিয়েছি?'

'কথা কানেই নিচ্ছে না খালভরা।'

মায়ের গালটা বেশ রপ্ত করেছে মেয়েটা। রঙ্গনা একটু ইতস্তত করে ওদিকে তাকাল। পা বাড়াতে গিয়ে বলল, 'তোকে বলল জানে না? মানে মধুরবাবুকে দেখে নি?'

পেনী বলল, 'তা জানি না। বলল, আমি কি জানি নাকি?'

রঙ্গনা বলল, 'বলেছিলুম না হরেনদাটা গুলবাজ। ঘোঁতনের কাছে চা খেলে বলবে না কেন? আয় পেনী, আমরা একটু সিঙ্গিদের বাড়ি যাই। তুই গেটের কাছে দাঁড়িয়ে থাকবি। আমি যাব আর আসব। কক্ষনো চলে যাবিনে যেন।'

আরও কিছুটা এগিয়ে খানিকটা ফাঁকা জায়গা। সেখানে আগাছার ভেতর একটা ভাঙা মোটরগাড়ি পড়ে আছে। তার ওপাশটা সাফ করে একদল ছেলে ব্যাডমিন্টন খেলছে। হন হন করে পাশ কাটিয়ে ছোট একটা রাস্তায় পৌঁছুল ওরা। তারপর সিঙ্গিবাড়ির উঁচু পাঁচিল একটানা রাস্তার সমান্তরালে চলেছে।

বুগানভিলিয়ার ঝালরে ঢাকা সুন্দর চওড়া রেলিং দেওয়া গেট। একটু ফাঁক হয়ে আছে। পাশে টুলে বসে আছে ওদের দারোয়ান বাহাদুর। রঙ্গনাকে দেখলে সে হেসে বলে, 'এসো এসো দিদি।' কিন্তু আজ কেমন নির্বিকারভাবে তাকাল। রঙ্গনা হাসিমুখে বলল, 'বিয়াসদি নেই?'

বাহাদুর উঠে এসে বলল, 'নেই। কলকাতা গেসে। কুছু দরকার থাকে তো বলো।'

'এই বই কাগজগুলো দিতে এসেছিলুম।'

বাহাদুর হাত বাড়িয়ে বলল, 'তো দেও। আমি দিয়ে দেব।'

রঙ্গনা বই আর পত্রিকাগুলো দিয়ে প্রাঙ্গণের দিকে আনমনে তাকাল একবার। নুড়ি-বিছানো লনের দুধারে ফুলবাগান। ডাইনে অনেকটা ফাঁকা জায়গায় টেনিসকোর্ট করা হয়েছে। শতদ্রু বোনের সঙ্গে টেনিস খেলে। রঙ্গনা খেলাটা দেখেনি, শুনেছিল বিয়াসের কাছে। তার ওধারে বাড়ির পেছন দিকটায় একটা চারকোনা সুইমিং পুলের মত জলাশয়। বাঁধানো ঘাট। ভারি সুন্দর পরিবেশ।

রঙ্গনা চমকে উঠল। দূরে ঘাটের ওপর বিপাশা এদিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে। সে হেসে উঠল। 'বাহাদুরদা। তুমি কেন মিথ্যে বললে গো! ওই তো বিয়াসদি!'

বাহাদুর ঘুরে দেখে গুম হয়ে গেল। তারপর ভারি গলায় বলল, 'বিয়াসদিদির শরীর আচ্ছা নেই, বুখার হয়েছে। তাই মাইজী মানা করেছে, কারও সঙ্গে দেখা হবে না।'

'ভ্যাট্! ডাকো না তুমি। নৈলে আমি ডাকছি।' রঙ্গনা পা বাড়াল।

বাহাদুর গেটের ফাঁকে পথ আটকে বলল, 'নেই দিদি। মানা আছে। তুমি এখন এসো।'

রঙ্গনার দুই চোখ জ্বলে উঠল। 'আমারও যাওয়া মানা?'

'হাঁ। ওহি বাত।'

'আমার?' রঙ্গনার গলা শুকিয়ে গেল। শরীর ভারি মনে হল।

বাহাদুর কথা বাড়াল না। গেট টেনে বন্ধ করে দিল। তারপর টুলে গিয়ে বসল।...

কিছুটা চলার পর পেনী অস্ফুটস্বরে গাল দিল, 'খালভরা!'

পেনীও বুঝেছে—অতটুকু মেয়ে। রঙ্গনা অনেক কষ্টে আত্মসম্বরণ করল। রাগে দুঃখে অপমানে তার মাথা ঘুরছিল। এমনটি স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারে নি। তার বারবার মনে হল, বিয়াসদি জানলে এভাবে তাকে অপমানিত হতে হত না। বিয়াসদি কিচ্ছু জানে না হয় তো।

কিন্তু কেন বিয়াসদির সঙ্গে দেখা করা বারণ, কিছুতেই রঙ্গনার মাথায় ঢুকল না। কিছুদূর যাওয়ার পর সে অনেকটা ধাতস্থ হল। শতদ্রু যদি তাদের বাড়ি আসে, ঠিক এমনি অপমান করবে। শতদ্রু কারণ জানতে চাইলে তখন মুখের ওপর জবাব দেবে। তবে বিপাশা তাদের বাড়ি কখনও যায় নি। তাকে অপমান করার সুযোগ হয়ত পাবে না। পথে দেখা হলে অন্য কথা। কিন্তু বিপাশা পথেঘাটে বেরোয় খুব কদাচিৎ। যখন বেরোয়, বেশির ভাগ সময় গাড়ি করে যায়। গাড়ি থামিয়ে কথা শোনাবে রঙ্গনা—সে সহজ মেয়ে নয়।

কল্পনায় একবার শতদ্রু একবার বিপাশার সঙ্গে কথা বলতে বলতে তাদের যাচ্ছেতাই অপমান করতে করতে রঙ্গনা বাড়ি পৌঁছুল। পেনী একদৌড়ে সঙ্গছাড়া হল।

অপরূপা শেষবেলায় ধূসর উঠোনে বোনের মুখের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠেছিল। সে বলল, 'কী রে?'

রঙ্গনা সঙ্গে সঙ্গে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। তারপর দৌড়ে অপরূপার ঘরে ঢুকে খাটের ওপর উপুড় হয়ে পড়ল। তার শরীরের অর্ধাংশ ঝুলে রইল।

অপরূপা ঘটনার আকস্মিকতায় বোবা হয়ে গিয়েছিল। তারপর বুঝল, তাহলে ঠাকুমারই কিছু দুঃসংবাদ আছে। সে দ্রুত ঘরে ঢুকে কাঁপাকাঁপা গলায় বলল, 'রনি! ঠাকুমার কিছু হয়েছে?'

রঙ্গনা উঠে দাঁড়াল। তার নাসারন্ধ্র স্ফুরিত। হিস হিস করে বলল, 'ওই ছোটলোক সিঙ্গিরা দারোয়ানকে বলেছে আমাকে ঢুকতে দেবে না। এবার যদি শুনি, তুই ওদের ছায়া মাড়িয়েছিস দিদি, দেখবি তোর কী হয়!'

রঙ্গনা হাঁফাচ্ছিল। অপরূপা স্তম্ভিত হয়ে বলল, 'তোকে ঢুকতে দিল না?'

'না।' রঙ্গনা চেঁচিয়ে উঠল, 'তুই! তুই তো গায়ে পড়ে ভাব জমাতে গিয়েছিলি লোকটার সঙ্গে!'

'রনি!' অপরূপা ধমক দিল। 'কী বাজে বলছিস!'

রঙ্গনা ভেংচি কেটে বলল, 'আমায় আমেরিকা যাবার ব্যবস্থা করে দিন না শাটলেজদা, না কাটলেটদা! কে পটাচ্ছিল? আমি, না তুই?'

অপরূপা ওর গালে চড় মারল। 'অসভ্য! ইতর মেয়ে কোথাকার!'

রঙ্গনা চুপ করে গেল।

অপরূপা হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, 'ফের যদি আজেবাজে একটা কথা বলেছিস, তোকে শেষ করে ফেলব। আমি পটাচ্ছিলুম, না তুই? কার কাছে এসেছিল? হতচ্ছাড়ী বাঁদর মেয়ে কোথাকার!'

রঙ্গনা বেরিয়ে গিয়ে বারান্দার পলেস্তারা ওঠা থামটা আঁকড়ে দাঁড়াল। পশ্চিম আকাশে লালচে আভা ফুটে রয়েছে। চারপাশে গাছ-গাছালিতে পাখিরা তুমুল চেঁচামেচি করছে। দিন শেষ হয়ে গেল। হিম ঘনিয়ে আসছে। অপরূপা বেরিয়ে রান্নাঘরে গেল হেরিকেন জ্বালতে।

হেরিকেনটা বারান্দায় রেখে নিজের ঘরে লম্পটা নিয়ে গেল। তারপর ফিরে এসে শান্তভাবে বলল, 'বড়লোকের সঙ্গে এজন্যেই তো ভাব করতে নেই। বিয়াসের সঙ্গে কি আমি কখনও ভাব করেছি? দেখেছিস আমায় ভাব করতে? গায়ে পড়ে কথা বলত বলে আমিও বলতুম। ঠিক আছে। কাকে অপমান করেছে, এখন তো টের পাচ্ছে না। পাবে, দাদা যখন ফিরে আসবে। কালু মুখুয্যের নাতনিকে অপমান করার শাস্তি কী, তখন জানবে।'

বিপাশা ও অনি

শতদ্রুর সঙ্গে বিপাশার সম্পর্ক বরাবর একটু ছাড়া-ছাড়া। স্বাভাবিকভাবে শতদ্রুর সঙ্গ সে ছোটবেলা থেকে খুব কম পেয়েছে। শতদ্রু অতকাল বিদেশে ছিল, তাতেও বিপাশার কিছু যায়-আসে নি। বিপাশার স্বভাব হল একলা থাকার। শতদ্রু বিদেশ থেকে ফিরলে সে কিছুদিন হইচই করতে চেয়েছে দাদাকে নিয়ে। তারপর আবার যেমন ছিল তেমনি।

কেন যেন রাগ করেই শতদ্রু আবার কলকাতা চলে গেল। এই তো ক'দিন আগে গিয়েছিল, ফিরে এল হাসিমুখে। রাত্তিরটা আর সকালটা থাকল। আবার চলে গেল! বিপাশার মনে হয়েছিল, ওর বসন্তপুরে থাকতে ভাল লাগে না। একেবারে মন টেকে না বলেই বারবার কলকাতা পালায়।

কিন্তু বাড়িতে কিছু একটা ঘটেছে, বিপাশা পরে আঁচ করল। এমনিতে এতবড় বাড়িটা ভুতুড়ে লাগে। ওপরে-নিচে এতগুলো ঘর। বাস করার মানুষ নেই। মাঝে মাঝে আত্মীয়স্বজন এলে যা একটু ভিড়, হইচই। তারপর আবার সব নিঃঝুম। চওড়া কাঠের সিঁড়িতে পুরনো আমলের কার্পেট পাতা আছে। দেয়ালে ঝুলছে বড় বড় বিলিতি পেন্টিং। অনেক রাতে বিপাশার মনে হয়, সেই সিঁড়িতে ছবির লোকেরা হাঁটছে। হাঁটতে হাঁটতে হলঘরে, হলঘর থেকে আবার ওপরে। তারপর খালি ঘরগুলোর ভেতর কেমন চাপা শব্দ। রাতে হাওয়া দিলে বাড়িটার ভেতর অদ্ভুত শব্দ হতে থাকে। বিপাশা বারবার চমকে ওঠে। তবু প্রাণ গেলেও বলবে না সে ভয় পাচ্ছে!

শতদ্রু ফের কলকাতা গেলে বাড়ির গুমোট ভাবটা আরও ঘন হল যেন। বাবার মুখ গম্ভীর। একটুতেই চাকর-বাকর লোকজনকে তিরিক্ষি মেজাজে তেড়ে যাচ্ছেন। মায়ের চালচলনও তেমনি হঠাৎ বদলে গেছে। মুখে হাসি নেই। কথা বলছেন কম। বিপাশার চোখে পড়ল একটু করে। ভাবল মাকে

জিগ্যেস করবে কী হয়েছে। কিন্তু পরে মনে হল, কী দরকার? কোথায় কী ঘটেছে, তার সঙ্গে বিপাশার সম্পর্ক কিসের?

রাতে বিপাশা শুনেছিল কলকাতা থেকে মামাবাবু ফোনে বাবার সঙ্গে কথা বলছেন। বাবাকে খুব উত্তেজিত মনে হচ্ছিল। বিপাশা বিরক্ত হয়ে টেপরেকর্ডারের আওয়াজ বাড়িয়ে দিয়েছিল। কিছুক্ষণ পরে দরজার বাইরে শমিতা ডাকছিলেন, 'বিয়াস! ঘুমোলি নাকি?'

বিপাশা সাড়া দেয় নি।

মাঝে মাঝে মা বাবা, সংসারের সব মানুষজনের বিরুদ্ধে বিপাশার একটা তীব্র ক্রোধ জেগে ওঠে। কী বিরক্তিকর ওঁদের আচরণ! কী একঘেয়ে জীবনযাপন! খাওয়া দাওয়া ঘুম টাকা—বড় উদ্ভট এই জীবনধারণ। কাকেও খ্যা খ্যা করে হাসতে দেখলেই বিপাশার পিত্তি জ্বলে যায়। কখনও মনে হয়, বিশ্ব-সুদ্ধ লোক যেন তাকে ইশারা করেই কিছু বলছে—অথবা কিছু করার তালে আছে। প্রতিটি মুখে ষড়যন্ত্রের ভ্রূকুটি। চারদিকে চক্রান্ত।

চক্রান্ত।

মা ও বাবা চাপা গলায় কীসব আলোচনা করছিলেন। বিপাশাকে দেখে থেমে গেলেন। কৃষ্ণনাথ বললেন, 'বাইরে বেরুচ্ছিস নাকি? ঠাণ্ডা লাগবে যে। গায়ে কিছু জড়িয়ে নে।'

মা বললেন, 'মালাকে খবর দিলে এসে খেলত। টেনিসকোর্ট করা হল অত যত্ন করে, খালি পড়ে আছে।'

বিপাশা চুপচাপ নেমে গেল।

চারকোনা পুকুরটাকে কেন মা সুইমিং পুল বলে, বিপাশার রাগ হয়। আগের আমলে নাকি কলকাতা থেকে ঠাকুর্দার সায়েব বন্ধুরা বেড়াতে এসে সাঁতার কাটত। পুকুরে এখন ঘন দাম, শালুক আর পদ্মও ফোটে। জলটা ভারি স্বচ্ছ। ঘাট আছে। কিন্তু কারুর ও জলে নামা বারণ। একবার রান্নার ঠাকুর মাধবের ভাইপো মনের সুখে সাঁতার কাটতে নেমেছিল। শেষে মাধবের চাকরি যাবার দাখিল। ওর ভাইপো ওড়িশার ছেলে। বড়বাড়ির রীতিনীতি জানে না। দারোয়ানের তাড়া খেয়ে প্রায় কাপড়েচোপড়ে হয়ে গিয়েছিল বেচারার।

পুকুরঘাটে বিকেলে চুপচাপ দাঁড়িয়ে বা বসে সময় কাটায় বিপাশা। শীত তীব্র হলে চলে আসে। দিনে-দিনে শীত কমে যাচ্ছে ক্রমশ। এবেলা সে সিঁড়িতে বসে জলের দিকে তাকিয়ে এলোমেলো নানা কথা ভাবতে লাগল।

একটু পরে তার যেন মনে হল, পেছনে কে এসে দাঁড়িয়েছে! ঘুরে দেখল, কেউ নেই। অথচ তার দৃঢ় ধারণা কেউ এসেছিল। তার শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দও যেন শুনতে পাচ্ছিল। সিঁড়িটা উঁচু করে বাঁধানো। গোলাকার বেঞ্চ আছে। দুধারে দুটো লাইমকংক্রিটের পরীমূর্তি। শ্যাওলায় কালো হয়ে গেছে। সে উঠে পড়ল। পেছনে গুঁড়ি মেরে বসে আছে কি কেউ?

কেউ না। বিপাশার একটু গা-ছমছম করল। বাগানের গাছে-গাছে নীলচে কুয়াসার স্তর ভাসছে। দূরে গেটের ওদিকে সূর্য ডুবে গেছে। চারপাশে কোন লোক নেই। বিশাল বাড়িটা কালো হয়ে তাকিয়ে আছে তার দিকে। বিপাশা একটু শক্ত হল। জেদ করে আবার বসে পড়ল। একটা অলীক ভয় তাকে সারাক্ষণ তাড়া করে বেড়াচ্ছে যেন। এই ভয়কে জয় না করতে পারলে তাঁর বেঁচে থাকা অসম্ভব হবে হয়ত। এই গোপন ভয় তাকে বেঁচে থাকার আনন্দ ছুঁতে দিচ্ছে না। অথচ মরে যাওয়ার কথাও ভাবা যায় না। বিপাশার খালি মনে হয়, একটা কিছু জরুরী উদ্দেশ্য তার জীবনে আছে এবং তাই তাকে বেঁচে থাকতেই হবে। সে বুঝতে পারে না কী সেই উদ্দেশ্য, খালি মনে হয়—একটা কিছু ঘটবে—গোপন অথচ বিরাট কিছু, যা তার জীবনকে ভয়হীন ও সুন্দর করে তুলবে।

আর এই কথাটা যখনই ভাবে, অনির কথা মনে পড়ে যায়। নিজের বেঁচে থাকার সেই রহস্যময় উদ্দেশ্যের সঙ্গে অনি কীভাবে জড়িয়ে গেছে, বিপাশা বোঝে না।

অনি বড় দুরন্ত ছেলে ছিল। তখন বসন্তপুর স্কুলে কো-এডুকেশন ছিল। অনি তার দু ক্লাস ওপরে পড়ত। ক্লাস নাইনে হঠাৎ পড়াশুনা ছেড়ে দেয় অনি। অনি বরাবর বলত, 'ধুৎ! পড়ে কি আমার দুটো

মাথা গজাবে?' অনিকে ভাল লাগত বিপাশার। গরিব পরিবারের ছেলে। কিন্তু তার দাপটটা ছিল বড়লোকের ছেলের মতই। বড় অহংকারী আর দুর্দান্ত প্রকৃতির ছিল অনি। রুক্ষ চেহারা, কপালে একটা ক্ষতচিহ্ন, শক্ত গড়ন। ফুটবল খেলাতে কত ছেলেকে সে জখম করত তার সংখ্যা নেই। মারকুটে স্বভাবের জন্য কেউ তার সঙ্গে মিশতে চাইত না। বসন্তপুরে তার বন্ধু বলতে কেউ ছিল না।

অপরূপার সঙ্গে বিপাশার খানিকটা বন্ধুত্ব ছিল। তাই বলে বিপাশা ওদের বাড়ি যেত না। অপরূপাই আসত তাদের 'সিংহভবনে।' অপরূপার দাদা বলে অনিকে একটু খাতির করে চলত বিপাশা। কিন্তু অনির সবতাতেই বাড়াবাড়ি। দূর থেকে দেখেই অনি চেঁচাত, 'বিয়াস! বিয়াস! বিয়াস!' খুব বিব্রত বোধ করত বিপাশা।

কৃষ্ণনাথের কেন যেন পছন্দ ছিল অনিকে। সে পড়াশুনা ছেড়ে দিলে কৃষ্ণনাথ তাকে ডেকে নিজের কন্ট্রাকটরির কাজে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। অনির এই স্বভাব—যেটা পছন্দ হবে, সেটা নিয়ে একেবারে পাগলের মত লেগে থাকবে। তারপর খেয়াল ভেঙেও যেত রাতারাতি। যত্নে গড়া ধুলোর ঘর যেমন করে লাথি মেরে বালকেরা ভেঙে দেয়, অনি সব ভাঙতে। এলাকার রাস্তাঘাট, সরকারী প্রকল্প অনুসারে ঘরবাড়ি তৈরি—কৃষ্ণনাথ সবকিছুই করতেন। অনি সেই সূত্রে বিপাশাদের বাড়ি আসত সবসময়। বাড়ির একজন হয়ে উঠেছিল সে। বিরক্ত হলেও সবাই তাকে পাত্তা দিত। বিপাশার সঙ্গে ঝাঁপিয়ে এসে মিশত সুযোগ পেলে। বিপাশাও যেন তাকে প্রশ্রয় দিতে শুরু করেছিল। বিপাশার তাকে ভাল লাগতে শুরু করেছিল। তখন কৈশোর-যৌবনের সন্ধিকাল বিপাশার। অনি তাকে পেয়ে বসেছিল। অনেকসময় নিজেরই খারাপ লাগত, একটা আজেবাজে ছেলের দিকে কেন এত টান তার? কিন্তু অনি যেন ভূতের মত বিপাশার আত্মায় ঢুকে পড়েছিল।

তারপর অতর্কিত একটা সাংঘাতিক ঘটনা ঘটে গেল।

কৃষ্ণনাথ সেদিন কলকাতা গেছেন। তাঁর কাজের দায়িত্ব নিবারণ দত্তের ওপর। নিবারণবাবু একসময় সরকারী ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। কোথায় রাস্তার ওপর ব্রিজ তৈরি হচ্ছিল। কী একটা কথায় অনির সঙ্গে দত্তবাবুর ঝগড়া বেধে যায়। দত্তবাবু এ ছোকরাকে সইতে পারতেন না। অনি তাঁর মাথা ফাটিয়ে দেয়। তখন দত্তবাবুর হুকুমে মজুররা ঝাঁপিয়ে পড়ে অনির ওপর। অনিরও মাথা ফাটে।

অনি কৃষ্ণনাথকে বলতে এসেছিল, চাকরি ছেড়ে দিচ্ছে। কিন্তু কৃষ্ণনাথ নেই। শমিতাও তাঁর সঙ্গে গেছেন। অনি চিৎকার করছিল হলঘরে। বিপাশাকে সিঁড়ির ওপর দেখে সে দৌড়ে গিয়েছিল। বিপাশা ভয় পেয়েছিল তার মূর্তি দেখে।

কিন্তু বিপাশার মুখোমুখি দাঁড়িয়েই অনি হঠাৎ শান্ত হয়ে গিয়েছিল। ফিক করে হেসে বলেছিল, 'একটু ডেটল লাগিয়ে দাও তো!'

বিপাশা চুপচাপ ডেটল এনে লাগিয়ে দিয়েছিল। কোন প্রশ্ন করে নি। তারপর তুলো আর একটুকরো কাপড় দিয়ে ব্যান্ডেজও বেঁধে দিয়েছিল। অনি বলেছিল, 'কী হয়েছে জিগ্যেস করছ না বিয়াস?'

বিপাশা একটু হেসে বলেছিল, 'জিগ্যেস করার কী আছে? কোথাও মারামারি করেছ।'

'এক গ্লাস জল দাও। না—ঠাকুরচাকরের হাতে নয়, তোমার হাতে খাব।'

বিপাশা জল এনে দিলে খাওয়ার পর অনি বলেছিল, 'এবার একটু চা খেতে ইচ্ছে করছে।'

বিপাশা চা বলে এসে দেখে, অনি তার ঘরে বসে রয়েছে। একটু বিব্রত বোধ করেছিল বিপাশা। বাবা-মার কানে তুললে বকবেন। কিন্তু অনিকে ঘর থেকে নড়ানো তার পক্ষে কঠিন।

নাকি ওর বাবা-মা নেই জেনেই সেদিন অনি অমন সাহসী হয়ে উঠেছিল? চা দিয়ে গিয়েছিল ভুলো নামে একজন বয়স্ক লোক। সে এবাড়িতে বংশপরম্পরা কাজ করে। একটু ঠোঁটকাটা স্বভাবের লোক। বলেছিল, 'দিদিমণির ঘরে ঝামেলা কচ্ছ কেন বাপু? চা খাবে তো বসার ঘরে বসেই চা খেলে কি ক্ষেতি হত?'

অনি বলেছিল, 'আরে যাও, যাও! কালু মুখুয্যের নাতি সিঙ্গিবাড়িতে পা রেখেছে, এতেই ধন্য হয়ে গেছে বাড়ি। কী বলো বিয়াস?'

'ভুলোদা, তুমি যাও তো এখন।' বিপাশা রাগ করে বলেছিল। লোকটা ফোঁপরদালালী করতে পেলে ছাড়ে না। আসলে বিপাশা অনির অপমানে ভয় পাচ্ছিল সেদিন। অনিকে ভয় পেত সে। বোশেখ মাসের বিকেল। তারপর কখন আকাশ কালো করে মেঘ উঠেছিল। প্রচণ্ড ঝড় এসেছিল। সারা বাড়িটা কাঁপছিল। জানলাগুলো ঝটপট বন্ধ না করে উপায় ছিল না। একটু পরেই বাজ পড়ার শব্দ, তারপর বৃষ্টি, সেই সঙ্গে শিল পড়তে শুরু করেছিল। অনি খুব খুশি হয়ে বলছিল, 'দারুণ! জমে গেছে!' তারপর সে লাফিয়ে উঠেছিল, 'বিয়াস! শিল কুড়োবে? দারুণ লাগে ঝড়বৃষ্টিতে শিল কুড়োতে। ওই শোনো, ছাদে দড়বড় করে শিল পড়ছে! চলো না ছাদে যাই।'

বিপাশা বলেছিল, 'না!'

'ধুৎ! সব তাতেই না। এসে দেখ না মজাটা!'

'তুমি যাও।'

'ছাদে ওঠার সিঁড়ি কোথায়?'

'চলো দেখাচ্ছি।'

বিপাশা চিলেকোঠায় সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে অনির কাণ্ড দেখছিল। ততক্ষণে অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। বাড়িতে আলো জ্বলে উঠেছে। কিন্তু সিঁড়িতে আলো নেই। একরাশ শিল কুড়িয়ে অনি দৌড়ে এসে বলেছিল, 'ধরো ধরো!'

বিপাশা হাত বাড়িয়েছিল। হয়ত সেটাই বড় ভুল হয়ে গিয়েছিল। ঝড় বৃষ্টি বজ্র শিলাপাতের সন্ধ্যায় বুঝি তারও কী টান বেজেছিল মনে। তারপর হঠাৎ অনি দুহাতে ওকে জড়িয়ে ধরে ফিস ফিস করে বলেছিল, 'বিয়াস! আমার বিয়াস!'

সিঁড়ির মাথায় পড়ে গিয়েছিল বিপাশা। বাধা দেবার শক্তি হারিয়ে ফেলেছিল—কিংবা একটা কিছু ঘটেছিল তার মধ্যে, আজও বুঝতে পারে না। এখনও কোন নির্জন মুহূর্তে সেই চাপা কণ্ঠস্বর তার কানের কাছে এসে পড়ে—বিয়াস! আমার বিয়াস!' বিপাশার মনে হয়, কোথাও লুকিয়ে পড়ার মত জায়গা খুঁজে পাচ্ছে না। কেন সে নিজেকে রক্ষা করতে চেষ্টা করে নি—কেনই বা অমন অবশ হয়ে গিয়েছিল সেদিন?

তারপর কতদিন অনির মুখোমুখি হয়নি সে। অনি এ বাড়ি আসা ছেড়ে দিয়েছিল। একদিন গেটের কাছে সে কৃষ্ণনাথের উদ্দেশে চেঁচামেচি করে বলেছিল, 'দিও না শালা! হজম হবে না। এ বাবা কালু মুখুয্যের নাতি। হার্টে হাত ভরে পাওনাকড়ি বের করে নেবে।'

বাহাদুর বলেছিল, 'ঝামেলা করো না বাবু। চলে যাও। বহৎ মুশকিলে পড়ে যাবে।'

অনি বলেছিল, 'তা তো বলবি রে! তুই ছত্রী রাজপুত—আর কেষ্ট সিঙ্গিও ছত্রী রাজপুত। কে জানে না, জাত ভাঁড়িয়ে ওর ঠাকুর্দার বাপ কায়েত হয়েছিল! নর্থবিহারে পাহাড়ের কোলে মোষ চরাত। বসন্তপুরে এসে জমিদারি পেয়ে কায়েত বনে গেল!'

বাহাদুর কুকরি বের করেছিল। কৃষ্ণনাথের হুকুমে সরে আসে। অনিও কেটে পড়ে।

কলেজ যেতে ভয় পেত বিপাশা। ছলছুতো করে গাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার ধুয়ো তুলেছিল। কিন্তু অনির সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে অনি তার দিকে তাকিয়ে শুধু হাসত। গাড়ি থেকে বিপাশা দেখত, অনি দূরে সরে গেছে—অন্যদিকে মুখ। হয়ত সেও অনির এক খেয়াল। পরে যেন ভুলে গিয়েছিল বিপাশাকে।

কিন্তু আশ্চর্য, সে বিপাশার স্বপ্নে বারবার আসে। ভদ্র সুশিক্ষিত মানুষের কণ্ঠস্বরে কথা বলে। বিপাশা বুঝতে পারে এ অনি এক অলীক অনি। সত্যিকার অনির সঙ্গে তার আকাশ-পাতাল ফারাক। কিংবা সত্যিকার অনি যা হতে পারত, যা তার হওয়া উচিত ছিল. বিপাশার স্বপ্নের অনি সেই ছেলেটি সুন্দর একটি সম্ভাবনার পরিণত ফসল। এ ফসল বিপাশার অবচেতনার ক্ষেতে যেন অনেক শ্রমে সাধে ফলানো। অনেক ইচ্ছায় রাঙানো।

অথচ বিপাশা কিছুতেই ভুলতে পারে না সেই কালবোশেখীর সন্ধ্যায় ছাদের ওপর বিদ্যুতের আলোয় ঝলসে ওঠা এক দুর্দান্ত তরুণ মানুষকে—বৃষ্টি ও শিলপড়ার মধ্যে যে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে

আর চিৎকার করে কী বলছে। তার ক্ষতস্থানের ব্যান্ডেজ ভিজে যাচ্ছে। ধুয়ে যাচ্ছে ডেটল ও রক্ত। সে ঝড়ের সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলছে, 'বিয়াস! আমার বিয়াস!'

তখন আঠারো বছর বয়স বিপাশার। ঝড়ের সন্ধ্যায় সেই সাংঘাতিক এবং সুন্দর অভিজ্ঞতা তাকে বয়স বাড়িয়ে দিয়েছিল যেন। এবং ভালবাসার একাকার একটা আবেগ হঠকারিতায় তার অচেনা এক গ্রহে ঠেলে দিয়েছিল তাকে। সেই থেকে বিপাশা অন্য এক গ্রহের প্রাণী হয়ে গেছে। সেখানে সে ভীষণ একা।

তারপর অনি একদিন বেপাত্তা হয়ে গেল বসন্তপুর থেকে। অপরূপা বা রঙ্গনাকে তাদের দাদার কোন ব্যাপারে দায়ী করা হত না বলে তারা এ বাড়ি মাঝেমধ্যে আসতে পারত। দাদার কথা তুলে নিজেরাই নিন্দে করত। কেউ নিন্দে করলে তাতে সায় দিত। তারাই বলেছিল, 'কে জানে কোথায় চলে গেছে! আপদ গেছে বাবা!' কৃষ্ণনাথ বলতেন, 'কোথায়-কোথায় খুন-খারাপি আর চুরি ডাকাতি করে বেড়াচ্ছিল বদমাসটা এখন গাঢাকা দিয়েছে। ধরা পড়লে যাবজ্জীবন জেল কিংবা ফাঁসি।'...

বিপাশা চমকে উঠল আবার। পুকুরের জলের ওপর, বাগানে কুয়াসা ঘনিয়েছে। আবছা আঁধারে কুয়াসার রঙ এখন গাঢ় নীল। কুয়াসার ভেতর শুকনো পাতায় কার শব্দ শুনল কি? ঘুরে-ঘুরে চারপাশ দেখে নিল সে। বাড়িতে আলো জ্বলছে। বাড়ির পেছনদিকে খিড়কির দরজার মাথায় যে বাল্বটা জ্বলছে, তার অলো এতদূর পৌঁছয় নি। পুকুরের পর কয়েকটা লিচু আর আমের গাছ। একটা বর্মী বাঁশের ঝাড়। কুয়াসা মেশানো আঁধারে সব অস্পষ্ট হয়ে রয়েছে। হিমে তার শরীর অবশ হয়ে যাচ্ছে। বিপাশা উঠে দাঁড়াবে ভাবল, পারল না। কেউ তাকে খুঁজতে আসছে না কেন? সে এখানে বসে আছে—কেউ কি তাকে দেখতে পাচ্ছে না? বিপাশার মনে অভিমান হল। তাকে কেউ চায় না—কেউ পছন্দ করে না। বাবা না—কেউ না।

'বিয়াস! বিয়াস! বিয়াস!'

বিপাশা তাকাল। তার সামনে কি অস্পষ্ট একটা মানুষ দাঁড়িয়ে আছে? বিপাশা অস্ফুটস্বরে বলে উঠল, 'কে?'

'বিয়াস! আমি অনি।'

বিপাশা চুপ করে থাকল। দাঁতে দাঁত চেপে বসে রইল।

'কথা বলছ না কেন বিয়াস? আমি অনি।'

বিপাশা তবু কথা বলল না। অনি তার দিকে ঝুঁকে আসতেই সে আক্রান্ত জন্তুর মত ছিটকে সরে গেল। তারপর বোবাধরা গলায় চিৎকার করে দৌড়ুল। গাঢ় নীল কুয়াসা অথবা আঁধারে বিভ্রান্ত বিপাশার মনে হচ্ছিল অনি তাকে তাড়া করেছে। সে বাড়ি খুঁজে পেল না। কোথাও আলো চোখে পড়ল না। গাছপালার ভেতর দিয়ে বারবার আছাড় খেতে-খেতে বিপাশা এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করতে থাকল! যেখানে যাচ্ছে, সেখানেই পেছন থেকে অনি শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বলছে, 'বিয়াস! আমার বিয়াস!' বিপাশা বর্মী বাঁশের ঝোপের ভেতর হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল।

তখন বাড়ির ভেতর যে-যার কাজে ব্যস্ত। কলকাতা থেকে ব্রজেন্দ্র ফোনে আবার কথা বলছেন কৃষ্ণনাথের সঙ্গে। শমিতা পাশে দাঁড়িয়ে জবাব যুগিয়ে দিচ্ছেন। শতদ্রু এমন ঝামেলা বাধাবে, কেউ কল্পনা করতে পারেন নি। ফোন ছেড়ে কৃষ্ণনাথ ক্রুদ্ধভাবে বললেন, 'ব্রজেনদাই ওর মাথাটি কবে খেয়ে আছে। আমি এখন যাই কী করে বলো তো? জরুরী মিটিং রয়েছে। মিনিস্টার আসছেন। বরং এক কাজ করো। তুমি যাও। হতচ্ছাড়াকে আগাগোড়া মুখুয্যেদের হিসট্রি বুঝিয়ে দিয়ে এসো! কাল সকালের ট্রেনেই যাও—নাকি গাড়ি করে যাবে? আড়াইশো কিলোমিটার এমন কিছু লং জার্নি নয়।'

শমিতা গুম হয়ে শুনছিলেন। হঠাৎ বললেন, 'আচ্ছা! বিয়াসকে তো ফিরতে দেখলুম না। এই ঠাণ্ডায় অন্ধকারে এখনও কি সুইমিং পুলে বসে আছে নাকি? ও ভুলো? একবার দেখতো বাবা!'

ভুলো টর্চ নিয়ে বেরুল। পুকুরের দিকটা অন্ধকার হয়ে আছে।

অবেলায় কিছু পুঁটিমাছ

সকালে টিউশনি করে ফেরার পথে শতদ্রুর একটা চিঠি পেয়ে ভারি অবাক হল অপরূপা। একটা মরা সোঁতার ওপর কাঠের সাঁকো। ওপারে ব্লক বাবুদের কোয়ার্টার। ঝিম মেরে দাঁড়িয়ে আছে সাহেব সাধুদের মত একদঙ্গল ইউক্যালিপ্টাস গাছ। ফুল আর সবুজ বীথিতে ওদিকটা চকরা-বকরা। তার মধ্যে হলুদ-হলুদ বাসাঘর। বড় লোভে অপরূপা ওখানে টিউশনি করতে যায়। ফেরার পথে সাঁকোর রেলিঙে হেলান দিয়ে দ্রুত চিঠিটা পড়ে নিল।

শতদ্রু তাকে আমেরিকায় পৌঁছে দেবেই দেবে, প্রথম পাতায় এগুলো পড়তে পড়তে আবেগে তার চোখে জল এসে গিয়েছিল! ভালবাসা না হলে কি এমন কথা ওঠে? কিন্তু পরের পাতায় গিয়ে দারুণ চমকাল। তারপর রাগে দুঃখে অপমানে সে লাল হয়ে গেল। রঙ্গনাকে তার চাই! অপরূপা নয়, রঙ্গনা! রঙ্গনাকে লুকিয়ে বিয়ে করার ইচ্ছা। তার দিদির সাহায্য চাই। নির্লজ্জ ছোটলোক কোথাকার! বসন্তপুরে থাকতে লেখার সাহস পায় নি। দূরে কলকাতা গিয়ে এই সাহস হয়েছে।

চিঠিটা কুটিকুটি করে ছিঁড়ে নিচে ফেলেছিল অপরূপা। তার মাথার ভেতর সন্দেহ ঘুরপাক খেতে থাকল। তাহলে কি কবে থেকে শতদ্রু ও রঙ্গনা লুকিয়ে প্রেম করছে—সে একটুও টের পায় নি? রঙ্গনার পেটে-পেটে এতসব আছে, তার দিদি জানত না কিছুই! আশ্চর্য এবং আশ্চর্য! রঙ্গনাকে সে এতকাল সরল ভেবে এসেছে।

অপরূপা ভেবে পেল না তাকে পছন্দ না হয়ে শতদ্রুর রঙ্গনাকে পছন্দ হল কোন গুণে? ইংরেজি বই পড়ার ঢঙ করে বলেই কি? সবাই জানে এবং এ তো চন্দ্রসূর্যের মত সত্য যে অপরূপা তার বোনের চেয়ে সুন্দর। অপরূপার মাথায় অনেক বেশি চুল। গায়ের রঙও অনেক ফর্সা। নাকমুখের গড়ন চমৎকার। সেজেগুজে থাকলে তার ওপর চোখ না পড়ে পারে না। তার শরীরটাও রঙ্গনার মত কাঠি কাঠি নয়, মেদে নিটোল। তার গাল অনেক বেশি ভরাট। তার বুকের সৌন্দর্য সুডৌল স্ফীতিতে—রমণীর যৌবনকে যা প্রগলভতায় পুরুষের কাম্য করে তোলে। অথচ রঙ্গনার মধ্যে এখনও নির্বোধ বালিকার আদল। রোগা পাঁকাটি নিষ্প্রভ।

শেষে ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে একটু ধাতস্থ হল অপরূপা। তাহলে শতদ্রু বাবা-মাকেও নির্লজ্জের মত ব্যাপারটা জানিয়েছিল। বাবা-মা চটেন আর না-চটেন! বোঝা যাচ্ছে, সেজন্যেই সিঙ্গিবাড়ি রঙ্গনাকে ঢুকতে দেয়নি সেদিন।

আবার আশ্চর্য লাগল অপরূপার। সে ভেবেই পেল না, রঙ্গনার মত মেয়েকে নিয়ে শতদ্রু বাবা-মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করে বসল! কী পেয়েছে সে রঙ্গনার মধ্যে?

বাড়ি ঢুকেই রঙ্গনাকে বলল, 'চিঠি পেয়েছিস?'

রঙ্গনা এনামেলের বাটিতে মুড়ি খাচ্ছিল। সামনে বাঁধানো 'প্রবাসী' পত্রিকা—মধুরবাবু যেটা দিয়ে গেছে বৃষ্টির রাতে। হাঁ করে তাকাল। 'চিঠি? কার চিঠি রে?'

অপরূপা ভেংচি কেটে বলল, 'ন্যাকা! শতদ্রুর চিঠি।'

রঙ্গনা হাসল। 'যাঃ! কী বলছিস! আমাকে সে চিঠি লিখবে কেন?'

অপরূপা চোখ পাকিয়ে বলল, 'লুকোস নে রনি। এটা তোর বাঁচা-মরার প্রশ্ন। ওই লম্পট বদমাসটার সঙ্গে অ্যাদ্দিন নিশ্চয় তুই ডুবে ডুবে জল খাচ্ছিলি। পাপ কখনও চাপা থাকে না, জেনে রাখিস।'

রঙ্গনা নিষ্পলক তাকিয়ে ছিল ওর মুখের দিকে। ক্রমে তার হাসি মিলিয়ে যাচ্ছিল। ঠোঁটের কোনায় মৃদু ভাঁজ পড়ছিল। শান্তভাবে বলল, 'দিদি! তোকে কে বলেছে রে মিছিমিছি?'

অপরূপা শক্ত গলায় বলল, 'কেউ কিছু বলে নি। আমি জানি। আমার গায়ে হাত রেখে বল, বিয়াসের দাদা তোকে কলকাতা থেকে চিঠি লেখে নি?'

রঙ্গনা উঠে এসে তার গায়ে হাত রেখে বলল, 'বিশ্বাস কর দিদি, আমাকে ও কোন চিঠি লেখে নি। সত্যি বলছি, তোকে তাহলে লুকোতুম আমি?' রঙ্গনা ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল! 'আমি তো ওর সঙ্গে কখনও মিশিনি, তুই জানিস দিদি!'

অপরূপা ওর হাতটা ঠেলে দিয়ে বলল, 'আমার অসাক্ষাতে কী হয়েছে, আমি কি দেখেছি? তুই কতদিন ওদের বাড়ি গেছিস।'

রঙ্গনা বাচ্চা মেয়ের মত কান্নার সুরে বলল, 'সে কি নতুন যাচ্ছি? বিয়াসদির দাদা যখন বাইরে ছিল, যেতুম না বুঝি? তুই খালি মিছিমিছি আমার নামে স্ক্যান্ডাল করছিস।'

'থাম্! আর ন্যাকাকান্না কাঁদে না। আমি সব জানি!' বলে অপরূপা তার ঘরে গিয়ে ঢুকল।

রঙ্গনা স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। এই আকস্মিক আক্রমণের কারণ খুঁজে পাচ্ছিল না সে। কিছুদিন থেকে অপরূপা কেমন যেন হয়ে উঠেছে। একটুতেই খাপ্পা মেজাজ। ঠাকুমা যাবার পর কয়েকটা দিন খুব আদর দিচ্ছিল তাকে। তারপর কী হল, সে বদলাতে থাকল যেন। সংসারে টানাটানিটা নিশ্চয় ভীষণ বেড়ে গেছে। ঠাকুমা কোত্থেকে পয়সাকড়ি পেতেন আর চালিয়ে নিতেন কোনরকমে। কালই তো দুই বোন ঘর সংসার তন্ন তন্ন হাতড়ে ঠাকুমার লুকোনো টাকাকড়ি খুঁজে হন্যে হয়েছে। কোন পাত্তা পায় নি। অপরূপা বলেছে, কোথাও নিশ্চয় আছে। ঠাকুর্দার নাকি অনেক টাকাকড়ি লুকোনো ছিল। মায়ের কাছে শুনেছি। ঠাকুমাই তার খোঁজ রাখেন।

এদিনটা রঙ্গনার এত দুঃখ হল যে সে দুপুরে ভাল করে খেতেই পারল না। অপরূপাও পীড়াপীড়ি করল না তাকে। বিকেলে মধুর বউ এল গল্প করতে। 'একবার খোঁজখবর নিলেও পাত্তে গো বাবুদিদিরা। পেনীর বাবা বলছিল, তাকে সঙ্গে করে বরঞ্চ কেউ যদি যেত। কমলবাবুর ভাগ্নেবাবু তো লোক ভাল না। ফিরে যে এল, খবরটা তো দেবে। তা নয়, গা ঢাকা দিয়ে বেড়াচ্ছে। আমার বাপু কুড়ানি ঠাকরুনের জন্য ভাবনা হচ্ছে।'

শুনে-শুনে বিরক্ত লাগে এখন। অপরূপা মুখ খুলতে চায় না। রঙ্গনা তাকে সায় দেয়। আজ কিন্তু অপরূপা মধুর বউয়ের সঙ্গে জমিয়ে গল্প জুড়েছে। গল্প মানে বসন্তপুরের কুৎসা। রঙ্গনা বলল, 'আমি আসছি।'

অপরূপা গ্রাহ্য করল না। মধুর বউ বলল, 'পেনীকে সঙ্গে নেবে নাকি দিদি? ডাকব?'

'থাক গে।' বলে রঙ্গনা বেরিয়ে গেল। অপরূপা একবার তাকিয়ে দেখে ঠোঁট ওল্টাল শুধু।

রঙ্গনার বাড়িতে থাকতে ইচ্ছে করছিল না। ছোটবেলা থেকেই তো পাড়াবেড়ানী স্বভাব। সে আনমনে এদিক থেকে সেদিক কিছুক্ষণ হেঁটে হাইওয়েতে গেল। তারপর আচায্যি-পাড়ায়।

রমেন মোক্তারের মেয়ে ছন্দা রাস্তা থেকে তাকে বাড়িতে ধরে নিয়ে গেল। 'কী হয়েছে রে রনি? অনেকদিন তোর পাত্তা নেই যে? ডুবে ডুবে খুব জল খাচ্ছিস বুঝি? চেহারা দেখেই টের পাচ্ছি।'

রঙ্গনা চটে গেল। 'হুঁ, তোর মতো!'

ছন্দা হাসল। 'ইচ্ছে তো করে রে! পাচ্ছি কোথায় জল? সবাই তো তোর মত লাকি নয় যে অ্যামেরিকা থেকে জেটপ্লেনে সটান উড়ে এসে...'

'ছন্দা!' রঙ্গনা প্রায় চেঁচিয়ে উঠল।

ছন্দা গ্রাহ্য করল না। হাসতে হাসতে বলল, 'দ্যাখ্ রনি, আমাকে লুকোনো তোর উচিত হয় নি। সারা বসন্তপুর জেনে গেল, তখন আমি জানতে পারলুম। এটা কেমন হল বল্?'

রঙ্গনা ভুরু কুঁচকে বলল, 'কী জেনেছিস তুই?'

ছন্দার মা কোথায় ওত পেতে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ঘরে ঢুকে বললেন, 'এই যে রনি! আর যে দেখি না বড়। থাকো কোথায় বলো তো?'

ছন্দা বলল, 'ও এখন সিঙ্গিবাড়ির বউ হতে চলেছে। আর আমাদের পাত্তা দেবে কেন?'

রঙ্গনা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। কী বলবে ভেবেই পেল না। কিছু একটা ঘটেছে, যেন, অপরূপার কথায় সেটা আঁচ করেছিল। কিন্তু এরাও তো সেরকম কিছু বলছে। তার মুখ নীল হয়ে গেল।

ছন্দার মা বিভাবতী বললেন, 'তা ভালই তো বাপু। আজকাল ওসব কে আর মানে-টানে। বরং সিঙ্গিরা জাতে উঠবে। শুনেছি ওদের পূর্বপুরুষ নাকি বাইরের লোক। ছত্রী রাজপুত। তাই পদবী সিংহ। তাতে আর কী হয়েছে? আজকাল টাকাকড়িই আসল কথা।'

রঙ্গনা আস্তে বলল, 'কেন এসব কথা আমাকে বলছেন মাসিমা? আমি তো কিছু জানি না।'

ছন্দা ওকে গুঁতিয়ে দিয়ে বলল, 'ন্যাকামি হচ্ছে ফের।'

কাঁপা-কাঁপা গলায় রঙ্গনা করুণ মুখে বলল, 'বিশ্বাস কর, আমি সত্যি কিছু জানি না।'

বিভাবতী তার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। বাঁকা ঠোঁটে বললেন, 'ছেলে এখন সোমত্ত সাবালক। বিদেশে বড় চাকরি করে। সে যখন জেদ ধরেছে, তখন বাবা-মা কি আর আটকাতে পারবে? ওদের কথা শুনবে কেন? বিয়ে করে সোজা চলে যাবে বউ নিয়ে আপন কর্মস্থলে। সিঙ্গির তড়পানি থেমে যাবে।'

রঙ্গনা বেরিয়ে এল সঙ্গে সঙ্গে। ছন্দা তার পেছন-পেছন দৌড়ুল। 'কী রে! তুই রাগ করে চলে যাচ্ছিস কেন? যা বাবা! এই রনি। শোন, শোন!'

রঙ্গনা বলল, 'কেন আমাকে নিয়ে তোরা জোক করবি? কী করেছি তোদের?'

ছন্দা অবাক হয়ে বলল, 'এ রাম! তুই যে ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেললি! রাস্তায় দাঁড়িয়ে সিন ক্রিয়েট করবি কেন? আয়।'

'না। পরে আসব।'

ছন্দা দাঁড়িয়ে রইল। রঙ্গনা হন হন করে হাঁটতে থাকল। তাহলে বসন্তপুরে তাকে নিয়ে এইসব কথা রটেছে। তাই শুনেই অপরূপা সকালে তাকে চার্জ করে বসেছিল। কিন্তু বোঝাই যায়, সবটাই একতরফা। শতদ্রু বা কেউ তো এধরনের কোন কথা বলতে তাদের বাড়ি আসে নি।

'রনি! রনি!'

রিকশোয় তপতী নামে একটা মেয়ে যেতে যেতে তাকে ডাকছিল। রঙ্গনা তাকালে সে মিষ্টি হেসে 'কনগ্রাচুলেশন রনি' বলে উঠল। রিকশোটা জোরে বেরিয়ে গেল। তপতী বি এ পাস করে এখন কোথায় যেন বি এড পড়ছে। প্রাইমারি সেকশানে শিক্ষিকা হয়েছে। রঙ্গনার কিছু হল না।

আবার কিছুটা এগুতেই একটা ঘরের জানালা থেকে কেউ তাকে ডাকছিল—'রনি! রনি!' রঙ্গনা ঘুরে দেখল সঙ্গীতাদি। গার্লস কলেজের বাংলার লেকচারার। কিন্তু ওঁর মুখের হাসিতে কি একই কথা লেখা নেই? রঙ্গনা ঘেমে উঠল শীতের অবেলায়। আসলে সঙ্গীতাদির বাড়িতেই সে যাচ্ছিল। কিছু বই-টইয়ের আশায়। কিন্তু এভাবে তাকে গলিরাস্তায় দেখামাত্র ডাক দেওয়ার মানে একটাই দাঁড়ায়।

রঙ্গনা মরিয়া হয়ে বলল, 'আসছি সঙ্গীতাদি! একটু পরে আসছি। একটা আরজেন্ট কাজে যাচ্ছি।'

এরপর রঙ্গনা আত্মরক্ষার তাগিদে বিপথ ভেঙে ধোপীপাড়ার মাঠ হয়ে হাইওয়েতে গিয়ে উঠল ফের। লজ্জায় অপমানে সে লুকিয়ে পড়তে চাইছিল। অপমান বৈকি। সে কি এত শস্তা মেয়ে যে যার খুশি তাকে হাত বাড়িয়ে তুলে নেবে এবং লোকে তাই নিয়ে যা খুশি রটাবে?

এ বয়সে রঙ্গনা নিজের কোন ভবিষ্যত নিয়ে ভাবতে জানে না। বড় জোর মনে ভেসে আসে একটা চাকরি-বাকরির কথা। সেও খুব স্পষ্ট নয়। তার একটা চাকরি থাকলে ভাল হত। কিন্তু দিদিরই হল না তো তার মত ড্রপআউটের কী করে হবে? দিদির একটা জুটুক তো। তারপর তার একটা কিছু ঘটবে হয়ত।

ঝোঁকের বশে এলোমেলো হাঁটতে স্লিপারের ফিতে ছিঁড়ল। কতদিন চালাচ্ছে হিসেব নেই। ছেঁড়া স্বাভাবিক। খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে কিছুটা এসে নিজেদের বাড়ির কাছাকাছি খুলে হাতে নিল। ঠিক সেই মুহূর্তে খুব জোরালোভাবে তার মনে এল কুড়ানি ঠাকরুনের কথা। বুকের ভেতরটা দুলে উঠল। দিদির কাছে পয়সা চাইবে না প্রাণ গেলেও—ছিঁড়ুক জুতো। ঘরে চুপচাপ দিন কাটাবে বরং। ঠাকুমা না ফিরে এলে বেরুবার নামও করবে না। ঠাকুমার কাছে পয়সা নেবে। মুচির কাছে যাবে। আবার মাথা উঁচু করে ঘুরে বেড়াবে বসন্তপুরে।

ঠাকুমার জন্য চোখে জল এসে গিয়েছিল রঙ্গনার। শিরিস কৃষ্ণচূড়ার এলাকা ছাড়িয়ে এখন বিশৃংখল অযত্নে বেড়ে ওঠা গাছ আর আগাছার জটলা। মধ্যে দিয়ে একফালি রাস্তা। নির্জন রাস্তায় চোখে জল নিয়ে রঙ্গনা খুব আশা করল, বাড়ি ফিরে যেন দেখে ঠাকুমা ফিরে এসেছেন। সে মনে মনে মাথা কুটছিল, যেন ফিরে আসেন ঠাকুমা। খোঁড়া মানুষ। কত কষ্টে-সৃষ্টে ক্রাচটা নিয়ে হাঁটেন

একটুখানি। সেও অভ্যাসের হাঁটাহাঁটি বাইরে পর্যন্ত নয়। খিড়কির ডোবার জল শুকিয়ে আরও খানিকটা নেমে গেলে তাঁর সাধ্য থাকে না আর এমন মানুষ কোথায়। এতদিন ধরে কীভাবে কাটাচ্ছেন কে জানে! একটা চিঠিই বা কেন কাউকে দিয়ে লেখাচ্ছেন না?

বাড়ি ফিরলে অপরূপা তাকে দেখে বলল, 'ছুতোর বউ অবেলায় পুঁটিমাছ দিয়ে গেল। বললুম, নেবনা ওসব ঝামেলা। শুনল না। কে বাছবে ওসব? আমার দ্বারা হবে না।'

রঙ্গনা দেখল কচুপাতায় গোটাকতক পুঁটিমাছ থামের কাছে রাখা আছে। মুহূর্তে তার মুখটা খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে গেল। বলল, 'খুব টাটকা রে দিদি! কোথায় পেল এখন?'

'জানি না' বলে অপরূপা ইঁদারাতলায় গেল।

রঙ্গনা জুতো দুটো যত্ন করে রেখে মাছগুলো নিয়ে বসল। কদিন মাছের গন্ধ নেই পাতে। দুপুরে শিম পেড়েছিল কিছু। তার সঙ্গে মার্বেলগুটির মত ছোট্ট কয়েকটা আলু কুচিয়ে ঝোলমত একটা তরকারি। রাগ ছিল বলে খাওয়াটা পেট পুরে হয়নি! এবেলা পুষিয়ে খাবে রঙ্গনা।—ছোট বঁটিতে মাছ বাছতে বাছতে বলল, 'দিদি! লম্ফটা জ্বেলে দিবি?'

হাতের রেখা ঢেকে দিয়ে অন্ধকার নেমেছে সন্ধ্যায়। একটু পরে অবশ্য বাড়ির পেছনের মাঠে চাঁদ উঠবে। চাঁদের কথা ভাবলে আবার ঠাকুমার জন্য মনটা মোচড় দেয়। শীতের জ্যোৎস্নায় কতক্ষণ উঠোনে ঘুরে কুড়ানি ঠাকরুন কী সব নাড়াচাড়া করে বেড়াতেন। ক্রাচের খুট খাট শব্দ শোনা যেত। বিছানায় শুয়ে রঙ্গনা বলত, 'ও ঠাকুমা! হল তোমার? আমার ভয় করছে যে!'

অপরূপা লম্প জ্বেলে এনে পাশে রাখলে রঙ্গনা কাঁচুমাচু হয়ে বলল, 'একটা কথা বলব? রাগ করিস না দিদি।'

অপরূপা থামের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। গলার ভেতর বলল, 'কী?'

'আচায্যি পাড়ায় গিয়েছিলুম। সঙ্গীতাদির বাড়ি যেতুম বই আনতে। ছন্দা ধরে নিয়ে গেল ওদের বাড়িতে।'

'গেলি কেন? একবার ওর মা কী অপমান করেছিল ভুলে গেছিস?'

'নিজে থেকে যাইনি তো।' রঙ্গনা দুঃখিত কণ্ঠস্বরে বলল। 'জোর করে নিয়ে গেল। গিয়ে অনেক কথা শোনাল। ওর মাও সায় দিয়ে বলল...'

অপরূপা বলল, 'বেশ করেছে। তোমার যেমন লজ্জা নেই।'

'আহা শোন্ না!' রঙ্গনা গলা চেপে বলল। 'কীসব আজেবাজে কথা রটেছে রে, জানিস? সঙ্গীতাদি পর্যন্ত! সিঙ্গিরা লোক ভাল না, তা কি জানি না, কিন্তু এ কী বিচ্ছিরি স্ক্যান্ডাল রে দিদি! আমি তো কিচ্ছু জানি না। তুই জানলেও তো বলতিস আমাকে।'

অপরূপা গম্ভীরভাবে বলল, 'কী বলল ওরা?'

'বলল...' রঙ্গনা ঢোক গিলল। 'বলল যে... ভ্যাট্! আমার লজ্জা করছে। তুই কাল আচায্যিপাড়া গেলে শুনতে পাবি।'

'ন্যাকামি করিস নে। কী বলল ওরা তাই বল্। তারপর দেখাচ্ছি মজা।'

'না দিদি! তুই ঝগড়া করতে যাস্‌নে ওদের সঙ্গে।' রঙ্গনা ব্যস্তভাবে বলল। 'ওরা নিশ্চয় সিঙ্গি বাড়ি থেকে শুনেছে। বিয়াসদির দাদা নাকি আমাদের বাড়ি বিয়ে করতে চায়। তাই নিয়ে ওদের বাড়িতে গণ্ডগোল হয়েছে। এইসব।'

অপরূপা কী বলবে ভেবে পেল না। একটু পরে বলল, 'আমাদের বাড়ি বিয়ে করবে মানে কী? তোকে তো? সে আমি জানি।'

'তুই জানিস?' রঙ্গনা চমকে উঠল।

'জানি বৈকি। বিয়াসের দাদার তোকে তো খুবই পছন্দ।'

রঙ্গনা মুখ নামিয়ে আঁশ ছাড়াতে থাকল। অপরূপা যেন একটা জবাব শোনার আশা করে আছে। একটু পরে রঙ্গনা আস্তে বলল, 'তোকে বলেছে?'

'হুঁউ।'

'তোকে বলেছে বিয়াসদির দাদা?'

'বলেছে।' অপরূপা ঠোঁটের কোনায় বাঁকা হাসল। 'কী? তোর আপত্তি নিশ্চয় নেই?'

'আছে।' রঙ্গনা বঁটি আর মাছগুলো কচুপাতায় মুড়ে ইঁদারাতলায় গেল। ওখানে রেখে দৌড়ে এসে লম্পটাও নিয়ে গেল। তারপর বলল, 'আমাকে একটু হেল্প করবি দিদি? জল তুলে দিবি?'

অপরূপা তেমনি বাঁকা হাসি নিয়ে ইঁদারাতলায় গেল। বালতি নামিয়ে বলল, 'কেন? সায়েবলোকের বউ হবি। প্লেনে চেপে অ্যামেরিকা যাবি। মেমসায়েব হয়ে উঠবি পুরোপুরি। আপত্তি কিসের?'

রঙ্গনা কথা বলল না। জলের বালতি সামনে এনে সে মাছ ধুতে থাকল।

অপরূপা বলল, 'ঠাকুমা ফিরে আসুক। বিয়াসের দাদা তো গোঁ ধরে কলকাতায় মামার বাড়িতে আছে। এখনও পুরো একমাসের বেশি থাকবে। তারপর চলে যাবে অ্যামেরিকা। ঠাকুমা এলে ওকে চিঠি লিখব'খন। ঠাকুমার আপত্তি হবে না, তা বাজি রেখে বলতে পারি।'

এতটা শোনার পর রঙ্গনা ঠোঁটের ডগায় বলল, 'অ্যামেরিকায়' যাবার জন্য তুই তো স্বপ্ন দেখিস। আমি দেখি? না হয় ইংরেজি বইটই একটু পড়ার চেষ্টা করি। বেশ তো! আর পড়ব না।'

অপরূপা শব্দ করে হাসল। 'কী কথায় কী। তোকেই তো ওর পছন্দ।'

রঙ্গনা শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বলল, 'ও একটা ক্লাউন!'

'এই! কী বলছিস! কোয়ালিফায়েড ছেলে। দেখতে কত সুন্দর। স্বাস্থ্যবান। কত পয়সা ওদের।' অপরূপা খিল খিল করে হাসতে লাগল।

'তোর যখন অত পছন্দ, তুই বিয়ে কর ওকে।' বলে রঙ্গনা বঁটি, মাছ আর অন্যহাতে লম্প নিয়ে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল। অপরূপা অন্ধকার ঠাণ্ডা ইঁদারাতলায় গুম হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

অথৈ সাগরে

'বাবারা! ওগো আমার বাবারা!'

লোহাগড়া স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের বেড়ায় পরনের থান শুকুতে দিয়ে কুড়ানি ঠাকরুন বোবাধরা গলায় ডাকাডাকি করছিলেন। এইমাত্র ট্রেন এসেছে। ভিড় করে লোকেরা স্টেশনঘরের গেটের দিকে চলেছে। কেউ কান করে না। একজন যেতে যেতে একটা দশ পয়সা ছুঁড়ে দিয়ে গেল সামনে। বৃদ্ধা ক্রুদ্ধ দৃষ্টে পয়সাটার দিকে চেয়ে থাকলেন কিছুক্ষণ। তারপর গাল দিতে থাকলেন, 'তোদের পয়সায় আগুন লাগুক আঁটকুড়োরা! মিনসেরা! হতচ্ছাড়ারা! আমি কি ভিক্ষে চাইছি?'

পাশেই গোড়াবাঁধানো বকুলগাছ। সেখানে ক'জন লোক বসে আছে। একটু আগে তাদের কাছে কষ্ট করে পাছা ঘষড়ে গিয়ে যেই বলেছেন, 'বাবারা! ওগো বাবারা', তারা খেঁকিয়ে উঠেছিল। খেঁকানি শুনে ভয় পেয়ে সরে আবার জলকলটার কাছে সরে গেছেন কুড়ানি ঠাকরুন। সবখানেই বাবারা বলে ডাকলে লোকেরা খ্যাঁক করে ওঠে কেন কে জানে। কাল বিকেলে লোহাগড়ায় এসেছেন। আজিমগঞ্জে একটা লোক বলেছিল, 'বাঁকাশ্রীরামপুর? সে তো শুনেছি লোহাগড়ার ওদিকে।' তারাই বৃদ্ধাকে টিকিট কেটে ট্রেনে চাপিয়ে দিয়েছিল। ট্রেনের কামরার একজনকে বলে দিয়েছিল লোহাগড়ায় নামিয়ে দিতে। কিন্তু নামার পর আবার একই অবস্থা। জিগ্যেস করলে ভিখারিনী ভেবে কেটে পড়ে লোকেরা। কেউ যদি বা কান পাতে, বাঁকা-শ্রীরামপুর সে চেনেই না। আর রেলবাবুদের ডেকে কিছু বলতে গেলে তেড়ে বলে, 'ভাগ্! ভাগ্।' ভোরবেলা বড় শীত পড়েছিল আজ। স্টেশনঘরে উঁকি মারতে গেলে স্টেশনবাবু 'কী চাই' বলে এমন দাবড়ানি দিলেন যে বৃদ্ধার প্রাণপাখি খাঁচাছাড়া হবার উপক্রম।

জীবনে ছ-ছ'টা দীর্ঘ দশক কাটিয়ে এই প্রথম বাড়ির উঠোন পেরিয়ে বাইরের পৃথিবীতে আসা। সবতাতেই হকচকানি, সব কিছু দেখেই মুখে কথা সরে না। ফ্যালফ্যাল করে তাকান। কী বলবেন কথা খুঁজে পান না। সব তালগোল পাকিয়ে যায়। বোবাধরা গলায় জড়িয়ে-মড়িয়ে কোনরকমে উচ্চারণ করেন, বাঁকাছিরামপুর কেউ কিছু বোঝে না। ভিড় করে লোক গেলেই ডাকেন, 'বাবারা! ওগো আমার বাবারা!'

পরনের থান ময়লায় দুর্গন্ধ হয়ে উঠেছিল। ক্রাচটা খোয়া গেছে। অতি কষ্টে আড়াল খুঁজে জৈবকর্ম সেরে নিতে হয়েছে। অনেক সময় হাতের কাছে জলও পান নি। আজ্ঞ মরিয়া হয়েছিলেন সামনে জলকল দেখে। একটা হাঘরে ছেলেকে দশটা পয়সা দিয়ে জল টিপিয়ে নিয়েছেন। খুপথুপ করে কাপড় কাচতে গিয়েও বিপদ। লোকেরা জল খেতে এসে খুব গালমন্দ করেছে।

কাপড় শুকুলে চান করার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু আশেপাশে কোথাও সেই ছেলেটাকে দেখতে পেলেন না বৃদ্ধা। নিচে একটু তফাতে পুকুর আছে। পুকুরটার দিকে তাকিয়ে রইলেন কাতর দৃষ্টে। অতদূর যাওয়ার চেয়ে ভয়ের কথা, ডুবে গেলে কী হবে? পৃথিবীটা বরাবরই হৃদয়হীন লোকে ভরা। ডুবে গেলে কি তাঁকে কেউ ওঠাবে? কেউ ওঠাবে না। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে মজা দেখবে।

প্ল্যাটফর্মের ঝাড়ুদারনি এল ঝাঁটা আর বালতি হাতে। আশান্বিতা কুড়ানি ঠাকরুন করুণ হেসে বলতে চাইলেন, 'অ মা। আমার সোনার মেয়ে রে! একটুখানি জল টিপে দে না, মাথায় দি।' কিন্তু বাক্যটা গলার কাছ থেকে জিভ পর্যন্ত উঠে এসে সেঁটে গেল। ঝাড়ুদারনি চোখ কটমটিয়ে তাকাচ্ছিল। জীবনে কখনও টিউবওয়েল টেপেনি বৃদ্ধা। ঝাড়ুদারনি চলে গেলে নলের তলায় মাথা রেখে হাত বাড়িয়ে চাপ দিলেন হাতলে। কয়েকটা ফোঁটা জল পড়তে না পড়তে তেড়ে এল একটা লোক। 'এটা কি চান করার জায়গা? এই বুড়ি! ভাগ! পুকুরে যা।'

স্টেশনেই চায়ের দোকানে পাঁউরুটি-চা খেয়ে আজও অন্যদিনের মত দুপুরটা গেল। কতদিন ভাত খাওয়া হয় নি! কোথায় ভাত পাওয়া যায় তাও জানেন না। পয়সাকড়ি যেটুকু আছে, খাওয়া কি আর যেত না? কলা খেতে সাধ হয়েছিল। দাম শুনে আঁতকে উঠেছিলেন, একজোড়া ওইটুকুন কলা চার আনা দাম? বসন্তপুরে খিড়কির ডোবার ধারে কী প্রকাণ্ড কলা ফলে। বস্তায় জড়িয়ে সিন্দুকে পাকাতে দিতেন। কেউ কিনতে এলে দরাদরি করতেন না। গাছের ফল নিজের হাতে লাগানো।

বাইরের পৃথিবীর কাণ্ডকারখানা দেখতে দেখতে অবাক হতে হতে কুড়ানি ঠাকরুন এখন হতাশ হয়ে পড়েছেন। ধরে নিয়েছেন, এটাই নিয়ম। তিনিই কেবল অন্যরকম মানুষ। বাইরে যতক্ষণ আছেন, তাঁকে তাই ততক্ষণ ওইরকম হয়েই চলতে হবে। কোন ভিখিরি তাঁকে খেতে দেখে ভাগ চাইলে আর দেন না। মুখ গোমড়া করে অন্যদিকে তাকিয়ে দ্রুত চিবোতে থাকেন। ন্যাংটা হাঘরে বাচ্চাগুলো প্যাটপ্যাট করে তাকিয়ে তাঁর খাওয়া দেখে। আড়চোখে দেখতে দেখতে গাল দেন। মনে মনে বলেন, 'শত্তুর! শত্তুর!'

এত যে কষ্ট, অথৈ সাগর, তবু কুড়ানি ঠাকরুন হাল ছাড়েন নি। দিনে দিনে জেদটা বেড়ে গেছে। বেরিয়ে যখন পড়েছেন, তখন বাঁকাশ্রীরামপুরে না পৌঁছে ছাড়বেন না। এ গোঁ তাঁর ছোটবেলায় কি কম ছিল? বাবা রাগ করে বলতেন, 'ওই গোঁ তোর কাল হবে কনক। বলে দিচ্ছি, ওতেই তোর সর্বনাশ হবে।' কনক বুঝত না সর্বনাশ ব্যাপারটা কী। আজও কি বুঝল এ বাহাত্তর বছর বয়সে?

বিকেলে কাচা থান পরে বসে আছেন, এমন সময় একটা লোক এসে স্টেশনঘরের সামনে বেঞ্চটায় বসলেন। রোদ পুইয়ে ঝিমুনি ধরেছিল। থামে হেলান দিয়ে ঝিমুতে এসেছেন কুড়ানি ঠাকরুন। লোকটাকে দেখে ঝিমুনি কেটে গেল। পরনে পানজাবি-ধুতি, গায়ে শাল, হাতে একটা লাঠি। গোঁফ আছে পুরুষ্টু। মাথায় টাক। ঠিক যেন বাঁকা-শ্রীরামপুরের সেই গোমস্তামশাই। লোকটা তাঁর দিকে তাকিয়ে বলল, 'কোথা যাওয়া হবে বুড়িমা?'

কুড়ানি ঠাকরুন এতদিন পরে আর অশ্রু সম্বরণ করতে পারলেন না।

লোকটা অবাক হয়ে গেল। তারপর পকেট থেকে একটা আধুলি বের করে দিতে আসছে, তখন বৃদ্ধা জোরে হাত নেড়ে বললেন, 'পয়সা চাইনি বাবা। একটা কথা শুধোব।'

'বলো বুড়িমা।'

এরপর দুজনের মধ্যে এইসব কথাবার্তা হল।

'বাঁকা-ছিরামপুর যাব বলে বেরিয়েছিলুম বাবা। আজ কী বার?

'শনিবার।'

'গত মঙ্গলবারের আগের মঙ্গলবার সন্ধেবেলা রেলগাড়িতে চাপলুম। তাহলে কদিন হল?'

'মঙ্গল-মঙ্গল আট। আজ শনি। বুধ বেস্পতি শুক্কুর গেল এগারো। আজ নিয়ে বারো।'

'বারোদিন ঘুচ্ছি এ ইস্টেশন থেকে সে ইস্টেশনে।'

'সে কী বুড়িমা? কেন, কেন?'

'বাঁকাছিরামপুর যাব বলে। আমার কপাল বাবা!'

'কৈ, এমন জায়গার নাম তো কখনও শুনি নি!'

'গাঁয়ের পরে মাঠ। মাঠের পরে যেন আবার গাঁ ছিল। তারপর যেন ইস্টেশান।'

'কী স্টেশন?'

'সেটাই তো খ্যাল 'করি নি। তখন ছোট বয়েস। খঞ্জ মেয়ে। বাবা কোলে করে নিয়ে গিয়ে...

'কী কাণ্ড! কোত্থেকে আসছ বলো তো আগে!'

'বসন্তপুর। ওইখেনে শউরমশায়ের বাড়ি। আর বাঁকাছিরামপুর আমার বাপের বাড়ি।'

'বসন্তপুর! ওরে বাবা! সে তো অন্য লাইনে। অনেক দূর এখান থেকে। এলে কিভাবে? পায়ের অবস্থা তো এই।'

'সঙ্গে কেরাচ ছিল। আমার স্বামী এনে দিয়েছিল কলকাতা থেকে।'

'কী? ক্রাচ?'

'হ্যাঁ বাবা। তা যার সঙ্গে এলুম রেলেরই লোক ছিল। মধুর গোঁসাই নাম। মিনসে আমাকে নিমতিতে এস্টেশানে নামাল। রেতের বেলা বড্ড শীত। তখন আমার গায়ে ওর কম্বলখানা চাপিয়ে পর্যন্ত দিলে। বুঝতে পারচ বাবা, কী বুদ্ধি ওলাওঠোর? আমি ঘুমোলে ওর চুরি করে কেটে পড়ার সুবিধে হবে।'

'তারপর, তারপর?'

'ঘুমও এসেছিল অনেককাল পরে। বুড়োবয়সে এতদিন বাপের বাড়ি যাচ্ছি। প্রাণে বড় শান্তি। তখন মিনসে আমার পেটের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে পয়সা হাতড়াচ্ছে। খপ করে ধরতে গেছি। কেটে পড়ল।'

'তুমি চেঁচালে না কেন? লোকে তাকে ধরে পিটুনি দিত।'

'ভয় লেগেছিল বাবা। এ বয়সে পরভরসা করে বেরিয়েছি। বিদেশবিভুঁই জায়গা।'

হুঁ। তারপর?'

'ওলাওঠো মিনসে কখন বুদ্ধি করে আগে থেকে আমার কেরাচখানা সরিয়েছিল। কেন বুঝলে তো?'

'হুঁউ। তা আর বুঝলুম না। তুমি ওকে তাড়া করবে বলে। তবে কম্বলখানা তোমার লাভ হল বলো?'

'তা হল। তবে কেরাচখানা আর পেলুম না। শেষে লোকে আমার কথা শুনে বলল, বুড়িমা, তুমি ফিরে যাও। আমরা গাড়িতে তুলে দিচ্ছি। আমি বাবা মনে মনে পিতিজ্ঞা করে বেরিয়েছি, বাঁকাছিরামপুরে বাপের ভিটেয় প্রণাম না করে ফিরব না।'

'কী মুশকিল! তারপর কী হল?'

'দুদিন ওখেনে থাকলুম। শেষে একজন বললে, বাঁকাছিরামপুর সাহেবগঞ্জের কাছে। সেখানে গেলুম। সেখানে গিয়ে শুনলুম, বাঁকাছিরামপুর লোহাগড়ার কাছে।'

'বুড়িমা! আর এমন করে ঘুরো না। মারা পড়বে। বাড়ি ফিরে যাও।'

'তুমি চেন না বাবা বাঁকাছিরামপুর?'

'নামটা শোনা লাগছে। কিন্তু কোথায় তা বলতে পারব না।'

'একবারে আমার হয়ে রেলের লোককে শুধোও না বাবা! আমি শুধোতে গেলে তেড়ে আসে।'

'তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে বুড়িমা! বাড়ি ফিরে যাও। বাড়িতে কে আছে তোমার?'

'দুই নাতনি আছে বাবা। আর কেউ নেই।'

'তাদের কাউকে সঙ্গে আননি কেন?'

'তারা ছিক্কিত মেয়ে। আমার সঙ্গে আসবে কেন? আর আসবেই বা কী করে? দুই সোমত্ত মেয়ে। একজন এলে একজন থাকবে কি করে? আবার দুজনায় এলে বাড়িতে ফুলফলের গাছটা আছে—সব নষ্ট হয়ে যাবে।'

'তোমার কাণ্ড দেখে রাগ হচ্ছে, আবার দুঃখও হচ্ছে। হ্যাঁ গা বুড়িমা; নিজের বাপের গাঁ কোথায় তা জানো না—এটাই বা কেমন কথা হল?'

'বাবা! সেই ছোটবেলায় বিয়ে হয়েছিল। তারপর আর বাপের খবর পাইনি। কেউ আমারও খবর করে নি। সে কতকাল আগের কথা।'

'হ্যাণ্ডেরি! এতকাল ইচ্ছে করেনি বাপের গাঁ যেতে?'

'ইচ্ছে তো করত। নিয়ে কে যাবে?'

'কেন? তোমার স্বামী।'

'সে বেঁচে নেই, বাবা।'

'যখন বেঁচে ছিল, তখন নিয়ে যায় নি কেন?

'সে বড় কড়া লোক ছিল। বড় শক্ত পেরান। হ্যাঁ, দয়াধম্ম না ছিল, এমন নয়। তবে বাবার কথা তুললেই বলত, তুলে আছাড় মারব। চুপ করে থাকো। বাবা, আমি খোঁড়া মেয়েমানুষ। নাচার।'

'তোমার ছেলেমেয়েরা?'

'মেয়ে তো পেটে ধরি নি। মেয়ে থাকলে মায়ের দুঃখু বুঝত। একটা ছেলে ছিল। সে আসলে বোমভোলা স্বভাবের। যোয়ানবয়সেই পেটে শূল হয়ে মারা গেল।'

'শোনো বুড়িমা! আমি আজিমগঞ্জ জংশনে যাচ্ছি। তোমাকে নিয়ে যাই। ওখানে বসন্তপুরের গাড়ি ধরিয়ে দেব। গাড়ির লোককে বলে দেব। নামিয়ে দেবে। বাড়ি ফিরে যাও।'

'শুধোও না বাবা টেশানবাবুদের বাঁকাছিরামপুর...'

'হ্যাণ্ডেরি! মারা পড়বে—একেবারে মারা পড়বে! আমার কথা শোনো। বাড়ি গিয়ে তোমার সেই শিক্ষিত নাতনীদের বলো, কোথায় বাঁকাশ্রীরামপুর তারা খুঁজে বের করুক। সদরে ডি এম অফিসে—মানে কালেকটরিতে খুঁজলে পাবে। ল্যান্ড রেভেনিউ অফিসে খুঁজলে পাবে। বলিহারি তাদেরও আক্কেল বটে বাপু! বুড়ো ঠাকুমা তার ওপর খোঁড়া মানুষ। তাকে এমন করে...হ্যাঁ গা, তারা এতদিন কি নাকে তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছে?'

'না বাবা! আমার নাতনিরা বড় ভাল মেয়ে। ছোটটা তো ইংরেজি বই পড়ে সারাদিন।'

'রাখোদিকি! চলো আমার সঙ্গে।'

এইসময় একজন এসে বলল, 'কী হরিদা! বুড়ির সঙ্গে কী অতক্ষণ বকবক করছ? হলটা কী?'

হরিবাবু বললেন, 'এই যে রক্ষাকর, চললে কোথায়?'

'ধুলিয়ান যাব। তুমি?'

'আজিমগঞ্জ।'

'ভালই হল। আজিমগঞ্জ পর্যন্ত একসঙ্গে যাই।'

কুড়ানি ঠাকরুন ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। দুজনে তাঁরা কথা ভুলে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে টিকিট কাটার ঘণ্টা বাজল। তখন হরিবাবু বললেন, 'ও বুড়িমা! টিকিটের পয়সাকড়ি আছে তো সঙ্গে? না থাকলে আমি কেটে দিচ্ছি।'

বৃদ্ধা চুপ করে থাকলেন। চোখে জল পড়তে থাকল। পৌঁছতে পারলেন না বাপের ভিটেয়। পৃথিবীটা এত বড়, এমন অথৈ সাগর। ঢেউয়ে নাকানি চুবানি খাওয়াই সার হল।

রক্ষাকরবাবু বললেন. 'কী ব্যাপার?'

'পরে বলছি হে। যাচ্ছ নাকি টিকিট কাটতে? দুটো আজিমগঞ্জ কেটে আনো তো। পয়সা নিয়ে যাও।'

এবার কুড়ানি ঠাকরুন পেটে হাত ভরে কাপড়ের ভেতর ন্যাকড়ার গিঁট খুলতে থাকলেন। এভাবে বরাবর পয়সা বের করা অভ্যাস আছে। হাত দিয়ে বুঝতে পারেন মুদ্রা বা নোটের অংকটা কত।

অপূর্বের ঘটকালি

বিপাশা খুব অসুস্থ খবর পেয়েও শতদ্রু বসন্তপুরে যায় নি। বাবা-মায়ের ওপর ভীষণ খাপ্পা সে। তার পছন্দ করার মেয়ের সঙ্গে বিয়েতে অমত বলে নয়, ওঁদের মানসিকতার সঙ্গে এতকাল পরে এ ছিল একটা প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ। এমনিতেই বাবা-মায়ের সংসর্গের বাইরে কেটেছে শতদ্রুর। তাছাড়া কখনও এমন কোন পরিস্থিতি দেখা দেয়নি, যাতে ওঁদের সঙ্গে তার কোন সংঘাত বাধবে।

আসলে লজ্জা হচ্ছে নিজের কাছেই। বিয়ে কি তার মাথায় চড়েছে? বিয়ে করতেই হবে এমন কোন ইচ্ছা নিয়ে সে দেশে পাড়ি জমায় নি। নেহাত কথাটা উঠেছিল এবং তারও মনে হয়েছিল, বিদেশে একজন এদেশী সঙ্গিনী থাকলে মন্দ হয় না।

ব্যাপারটা খুব সহজ পথে চলতে পারত। কিন্তু এ এক অপমানজনক অবস্থা দাঁড়িয়ে গেল। সবাই ভাবছে মেয়েটির সঙ্গে তার বুঝি দারুণ প্রেম। অপরূপাকে মরিয়া হয়ে একটা চিঠি লিখে ফেলেছিল। এখন পস্তাচ্ছে, সেটা বিশ্রি হটকারিতা হয়ে গেছে। ছি ছি, কী ভাববে রঙ্গনা?

এদিকে বসন্তপুর থেকে দুবেলা ট্রাংককল ব্রজেন্দ্রর কাছে কৃষ্ণনাথের। ব্রজেন্দ্র বলেন, 'বুঝতেই পারছ ভায়া, আর সে সাটলেজ নেই। বিদেশ থেকে ফিরে দিনকতক যেটুকু বা গ্রাহ্য করছিল আমায়, এখন আর তাও করে না। কোথায়-কোথায় ঘোরে। ফেরে অনেক রাতে। আমার সঙ্গে বিশেষ দেখা হয় না। বরং তোমাদের ছেলে, তোমরা এসে দেখ কী করতে পার।'

ব্রজেন্দ্রও কৃষ্ণনাথের ওপর চটেছেন। এখনও লোকটা সেই জেদী গেঁয়ো থেকে গেলেন। এখনও হাড়ে-হাড়ে জমিদারী গোঁয়ার্তুমি! দিনকাল কত বদলেছে টের পান না কৃষ্ণনাথ। ব্রজেন্দ্র ভেবে পান না উনি কন্ট্রাকটারি করতেন কেমন করে? ও কাজ তো মানুষকে আগাপাছতলা বদলে দেয়। লজ্জা, ঘেন্না ভয়, তিন থাকতে কন্ট্রাকটারি নয়। প্রয়োজনে অনেক সময় তুচ্ছ লোকেরও জুতো বইতে হয়। তাছাড়া কৃষ্ণনাথ নিরীহ সজ্জন মানুষও নন। যা করতে চান, করতেই তো পারেন। তাঁকে ঠেকাবে কে? সম্ভবত কৃষ্ণনাথের চরিত্রেরই এ এক অসঙ্গতি। নাকি মফস্বলের মানুষের এটাই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য? ব্রজেন্দ্র ভেবে কূল পান না! ওদিকে বিপাশার কী অদ্ভুত অসুখ—হিস্টিরিয়া বলেই মনে হচ্ছে। মেয়েকে এনে কলকাতায় সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে দেখাক। পরামর্শ দিয়েছেন ব্রজেন্দ্র। বুঝতে পারছেন না ওরা কী করবে। কৃষ্ণনাথ বলেছেন, 'দেখা যাক।' ভারি অদ্ভুত লোক এই কৃষ্ণনাথ।

ভোরে উঠে ব্রজেন্দ্র এক চক্কর ঘুরে আসেন গঙ্গার ধারে। স্নান সেরে ফেরেন। গাড়ি নিয়েই বেরোন। ফিরে এসে দেখলেন শতদ্রু ব্রেকফাস্ট টেবিলে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে। ব্রজেন্দ্র ভুরু কুঁচকে ভাগ্নের আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বললেন, হঠাৎ সুমতির উদয় যে?'

শতদ্রু আস্তে বলল, 'আপনার সঙ্গে কথা আছে।'

'তাই বুঝি?' ব্রজেন্দ্র একটু হাসলেন। 'আমি ধরেই নিয়েছিলুম তোমার সব কথা আজকাল অপুর সঙ্গে থাকে। আমি এখন ওল্ড হ্যাগার্ড। রট্‌ন্ পিস। কদিন বাদে কেওড়াতলা চলে যাব।'

শতদ্রু বুঝল, মামার অভিমান হয়েছে। বলল, 'দোষত্রুটি থাকলে নিজগুণে মার্জনা করে দেবেন। কদিন পুরনো বন্ধু-বান্ধবের খোঁজে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছিলুম।'

ব্রজেন্দ্র হো হো করে হাসলেন। 'নেভার মাইন্ড! তোমার সাতখুন মাফ।'

'আপনার সঙ্গে একটা জরুরী কথা আছে।'

'খুব বুঝেছি। অপুর মাথায় কুলোয় নি।'

'না মামাবাবু। কোনো প্রব্লেম-ট্রব্লেম নয়।' শতদ্রু একটু গম্ভীর হল। 'আমি ঠিক করেছি, এ সপ্তাহেই চলে যাব।'

ব্রজেন্দ্র কিছু না বুঝে খুশি হয়ে বললেন, 'ভাল কথা। খুবই ভাল।'

'আমি স্টেটসে ফিরে যাব, মামাবাবু। আমার একেবারে ভাল লাগছে না। মানে, ঠিক অ্যাডজাস্ট করতে পারছি না। দম আটকে যাচ্ছে...'

ব্রজেন্দ্র তাকিয়ে রইলেন ওর দিকে।

'আমার জয়েন করার কথা সেভেন্‌থ্‌ মার্চ। আজ ফেব্রুয়ারি সেকেন্ড। এখনও আরবানার রাস্তায় হয়তো বরফ গলে নি। ল্যান্ডলেডি মিসেস বারবারা লিখেছেন, এবার শীতটা বড্ড বেশি। তুমি গ্রীষ্মের দেশে গিয়ে বেঁচেছ।' শতদ্রু বলতে থাকল। 'আমি ওঁকে লিখে দিলুম, আরবানা হিলসে স্কি করার জন্য পা সুড় সুড় করছে।' শতদ্রু শুকনো হাসল।

ব্রজেন্দ্র গুম হয়ে বললেন, 'বিয়াস ভীষণ অসুস্থ। তাছাড়া...'

শতদ্রু মুখ নামিয়ে বলল, 'শি ইজ সাইকিক। ছোটবেলা থেকেই। আমার করার কিছু নেই। সাইকিয়াট্রিস্ট দিয়ে চিকিৎসা করালেও সারবে কি না জানি নে। বাবার যাবতীয় কমপ্লেক্স নিয়ে ও জন্মেছিল।'

ব্রজেন্দ্র ফোঁস করে উঠলেন। 'সাহেবদের দেশে থেকে তুমিও দেখছি ওদের মতো দেউলে হয়ে গেছ সাটলেজ! মূল্যবোধগুলোও হারিয়ে ফেলেছ দেখছি। নিজের বোন সম্পর্কে তোমার এমন কথাবার্তা তো ভাল ঠেকছে না!'

'সায়েবদের মূল্যবোধ আমাদের চেয়ে অনেক বেশি মামাবাবু।'

মনে মনে আহত হলেন ব্রজেন্দ্র। বললেন, 'তোমার ব্রেনওয়াশের বাকি রাখেনি দেখছি।'

'এখানে সবাই তা আমাকে বলছে বটে।'

'তুমি বাবা-মায়ের একমাত্র ছেলে, মাইন্ড দ্যাট।'

'আপনি তো জানেন, ওসব কথা নিয়ে আমি কোনোদিন ভাবি নি।'

'ভাবা উচিত ছিল।'

শতদ্রু একটু চুপ করে থাকার পর বলল, 'সম্ভবত আপনিই সেকথা ভাবার সুযোগ দেন নি—মনে করে দেখুন মামাবাবু! বসন্তপুর গিয়ে একদিন দেরি করলে আপনি ব্যস্ত হয়ে উঠতেন। লোক পাঠাতেন। ফিরে এলে বলতেন, ওই কুৎসিত গ্রাম্য পরিবেশে বেশিদিন থাকলে আমি বিগড়ে যাব। বলতেন না?'

'সে তো তোমার ভালর জন্যই বলতুম।' ব্রজেন্দ্রের মুখ লাল হয়ে গেল। 'যতসব ডাকাত আর বদমাসের জায়গা। বসন্তপুর কে এক ডাকাতসর্দার ছিল নাকি—মেয়ে লুঠ করে এনে আটকে রাখত ঘরে। আইনকানুনের বালাই ছিল না তোমাদের গ্রামে। কত কথা শুনেছি। বীভৎস সব ঘটনা।' ব্রজেন্দ্র আরও উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'আরও যদি সাংঘাতিক কিছু শুনতে চাও শোনাতে পারি। শুনলে বুঝতে, কেন শমির ছেলেকে এখানে রেখে মানুষ করতে চেয়েছিলুম!'

শতদ্রু গতিক দেখে সাবধান হল। হাসবার চেষ্টা করে বলল, 'আমি কিছু জানতাম না মামাবাবু।'

'বাবা অত জানলে শমির বিয়ে ওখানে দিতেন না। তোমারও জন্ম হত না।' ব্রজেন্দ্র হঠাৎ একটু শান্ত হলেন। 'জমিদারবংশের ছেলে বলে বাবা ওই ভুলটা করে বসলেন।'

'কী ভুল?'

'ওসব কথা তোমার শুনতে নেই। তোমাদের ফ্যামিলির স্ক্যান্ডাল। আমার এসব আলোচনা করার প্রবৃত্তি হয় না।'

'বলুন না মামাবাবু। আমার জানা দরকার!'

ব্রজেন্দ্র আরও শান্তভাবে বললেন, 'ছেড়ে দাও। শুধু জেনে রাখো, তোমার মায়ের জীবন খুব সুখের ছিল না। এতকাল পরে বেচারী সম্ভবত একটু সুখশান্তি পেয়ে থাকবে। কারণ তোমার বাবার সে বয়সও নেই—দিনকালও বদলেছে।'

শতদ্রু আস্তে বলল, 'আমারও বরাবর ধারণা, বাবা খুব সচ্চরিত্র মানুষ ছিলেন না। দু একবার নাকি মার্ডারকেসেও জড়িয়ে পড়েছিলেন।'

ব্রজেন্দ্র কোন কথা বললেন না। কফি শেষ করে উঠলেন।

শতদ্রু বলল, 'আমি ভাবছি আজই প্লেনের টিকিট কেটে ফেলব। নেক্সট-উইকে রওনা হব।'

'তোমার ইচ্ছা।' বলে ব্রজেন্দ্র করিডোর পেরিয়ে তাঁর লিভিং রুমে ঢুকলেন।

শতদ্রু বেরিয়ে পড়ল।

এয়ার অফিসে যাবার পথে ভাবল একবার অপূর্বর কাছ হয়ে যাবে। ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে সে সাকসেনা বিল্ডিংয়ের চওড়া সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল। লিফটের সামনে যেতেই সোমার সঙ্গে দেখা। সোমা মিষ্টি হেসে বলল, 'হাই!'

এবারে এসে দুবার সোমার সঙ্গে দেখা হয়েছে শতদ্রুর। অপূর্বর সঙ্গে একটা অনুষ্ঠানে নাচ দেখতে গিয়েছিল সোমার গ্রুপের। সোমা বলেছিল, 'হচপচ গোছের জাস্ট এ ভ্যারাইটি। শুধু কথকে জমে না।' আরেকদিন হুট করে একা হাজির হয়েছিল শতদ্রু ওর ক্যামাক স্ট্রিটের ফ্ল্যাটে। ওখানে সোমা মাঝে-মাঝে একা এসে থাকে। আসলে ওটাই তার গ্রুপের আড্ডা। প্রশস্ত একটা লিভিং রুমে শক্ত কাশ্মীরী কার্পেটি পাতা। বাদ্যযন্ত্রে ভর্তি ঘরটা। ওখানে দাঁড়ালে পর্দার আড়ালে সোমার শোবার জায়গা নজরে পড়ে। বেডের দেয়ালে কাঠের থাকে সাজানো স্টিরিও রেকর্ড প্লেয়ার। ডাইনে ডাইনিং স্পেস। বেশ চওড়া। টেবিলের দুদিকে কেন ছটা চেয়ার বুঝতে পারে নি শতদ্রু। কোনায় টিভি। টিভি দেখার জন্য সোফাও আছে। তার লাগোয়া কুকিং রেঞ্জ।

শতদ্রু মনে মনে হেসেছিল। 'ইওর গ্র্যান্ড হোটেল ইজ নট সো গ্র্যান্ড!' মনে পড়ে গিয়েছিল কথাটা। একজন সাধারণ মারকিনের জীবনযাপনের উপকরণ এবং গৃহসজ্জা এর চেয়ে অনেক গুণে সুন্দর এবং আরামদায়ক। বাথরুমের কার্পেটেও পা দেবে যায় কয়েক ইঞ্চি।

সোমা সেদিন একটা ইউরোপীয় কনসার্টের সঙ্গে ভারতীয় কয়েকটা ক্লাসিক নাচ মিশিয়ে নতুন কিছু তৈরি করার নমুনা দেখিয়েছিল। ওর গ্রুপের আরও দুটি মেয়ে ছিল। উর্মিলা যোশি আর নিনা পারভেজ। সাড়ে পাঁচটায় ওরা চলে গেলে সোমা বলেছিল, 'কী মনে হচ্ছে? ওয়েস্টে এসবের খাতির হবে না? আপনার কী মত?

শতদ্রু নাচগান বোঝে না। বলেছিল, 'হওয়া তো উচিত।'

'কেন ওকথা বলছেন বলুন তো? আপনি কি ওদের ব্যালে কোনো ধরনের পারফরমেন্স দেখেন নি?'

'দেখেছি।'

সোমা তার কাঁধের কাছে সোফার হাতায় বসে বলেছিল, 'আপনি এমন ইনডিফারেন্ট কেন সব কিছুতে?'

'তাই কি?'

'আই থিংক সো।'

'আসলে আর্ট ব্যাপারটাই আমার মাথায় ঢোকে না।'

সোমা হেসে অস্থির। 'ইউ লুক জাস্ট লাইক অ্যান আর্টিস্ট। আপনাকে দেখেই প্রথম কী মনে হয়েছিল বলব? পেন্টার। আপনি...ওয়েল, ওই ছবিটা দেখছেন। ওটা আমার এক বন্ধুর আঁকা। উষা গ্যাডগিলের নাম নিশ্চয় শুনেছেন। লস অ্যানজেলসে একজিবিশন করল মাস দুই আগে।'

সোমা অনর্গল এধরনের কথা বলছিল। তার ফাঁকে দুটো বিয়ার এনেছিল। শতদ্রুর মনে হয়েছিল, সোমার সঙ্গে একজন মারকিন মেয়ের তফাত কতটুকু? তাছাড়া ওর বাবা-মা এমন অঢেল স্বাধীনতা দিয়েছেন মেয়েকে—যদিও ভেতর-ভেতর সোমাকে পাত্রস্থ করার তাগিদও ভারতীয়মতে চলেছে। সোমার স্বাধীনতায় তাহলে কোথাও একটা অচিহ্নিত সীমা রয়ে গেছে যেন।

আজ লিফটে ঢুকে সোমা চোখে হেসে বলল, 'অপূর্বর কাছেই যাচ্ছি।'

লিফট থেকে নেমে শতদ্রু বলল, 'আমি স্টেটসে ফিরে যাচ্ছি শিগগির। আজই এয়ার অফিসে যাব। ভালই হল আপনার দেখা পেয়ে। বিদায় জানিয়ে দিলাম। অ রিভোয়া!'

সোমা বলল, 'সে কী! বলছিলেন যে কিছুদিন পরে ফিরবেন? এনিথিং হ্যাপনড বাই দিস টাইম?'

'নাঃ।' শতদ্রু মাথা দোলাল। 'এমনি। আসলে অ্যাডজাস্ট করতে পারছি না।'

সোমা সায় দিয়ে বলল, 'তা ঠিক। দেখুন না, আমিও ঠিক অ্যাডজাস্ট করে চলতে পারি না। দিনে দিনে কেমন আনহ্যাবিটেবল হয়ে যাচ্ছে না কলকাতা? কদর্য ভিড়। ভ্যান্ডালিজম। ওমাসে, রবীন্দ্রসদনে আমাদের একটা বড় পারফরম্যান্স, নষ্ট হয়ে গেল। কী অবসিন সব রিমার্ক পাশ করে অডিয়েন্স থেকে, কানে আঙুল দিতে হয়।'

কথা বলতে বলতে করিডোর দিয়ে হেঁটে ওরা অপূর্বর চেম্বারে ঢুকল। দুজনকে একসঙ্গে ঢুকতে দেখে অপূর্ব হকচকিয়ে গেল। তারপর ফিক করে হেসে বলল, 'আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলুম জানি না। খুঁজে তাকে বের করে কিছু উপহার দেব বরং।'

সোমা বসে বলল, 'বেশি কিছু আশা কোরো না অপূর্ব। এমনও হতে পারে তোমার ঘাড় ভাঙতে এসেছি আমি। ওঁর কথা আলাদা। উনি তোমার কাজিন ব্রাদার।'

অপূর্ব ভয় পাওয়ার ভান করে বলল, 'তোমার ফর্ম্যাল অ্যান্ড ভেরি সিরিয়াস মুড দেখলে আমার সত্যি বড় আতঙ্ক হয়, সোমা। সো মাচ বিজনেসলাইক টক!'

সোমা একটু হাসল। 'ইয়া! দিস ইজ বিজনেস।'

অপূর্ব শতদ্রুর দিকে একবার তাকিয়ে বলল, 'দেন ইউ ওয়েট, জেন্টলম্যান।'

শতদ্রু ওঠার ভংগি করে বলল, 'সেরে নাও। আমি ততক্ষণ কলকাতাদর্শন করি।'

সোমা তার হাত ধরে টেনে বসিয়ে দিল। 'আপনি বসুন তো। ওর সঙ্গে আমার কোনো...আই মিন, আই হ্যাভ নাথিং প্রাইভেট অ্যান্ড কনফিডেনসিয়াল উইথ হিম।'

অপূর্ব ওপরে দৃষ্টি তুলে দিয়ে বলল, 'আই নো আই নো। তুম ঔর হাম একদম রোটি ঔর ডাল বরাবর। ঠিক হ্যায় ভাই! কাম অন অ্যান্ড লাভ মি।'

সোমা বলল, 'আই লাইক ইউ।'

অপূর্ব হাসতে লাগল। 'শুনলি তো সাটু?'

সোমা ভুরু কুঁচকে বলল, 'হোয়াটস দ্যাট? সাটু!'

'কিছু না। তুমি শুরু করে দাও।'

সোমা শতদ্রুকে বলল, 'আপনার শতদ্রু নামটাকে টুইস্ট করেছে বুঝি?'

শতদ্রু বলল, 'শতদ্রুর ইংরেজি সাটলেজ। তাই থেকে সাটু।'

'মাই গুডনেস!' সোমা অবাক হবার ভংগি করল। 'আমি তো ভেবে দেখিনি—শতদ্রু নামে একটা নদী আছে।'

অপূর্ব বলল, 'ওর বোনের নাম কি জানো? বিপাশা। তাই ডাকনাম বিয়াস।'

'বাঃ! কোথায় থাকেন তিনি?'

অপূর্ব বলল, 'ধাপধাড়া-গোবিন্দপুরে।'

'সে কোথায়?'

'ধরে নাও জাস্ট'এ প্লেস।'

সোমা কপট রাগ দেখিয়ে বলল, 'ইউ অলওয়েজ টক নানসেন্স। শতদ্রু, আপনার সেই গ্রামের নামটা কী যেন বলছিলেন—ভেরি সুইট নেম ইনডিড?'

শতদ্রু বলল, 'বসন্তপুর। যদিও বসন্তপুরে বসন্ত আসে বলে মনে হয় না।'

অপূর্ব ভুরু কুঁচকে বলল, 'হাউ ইট ইজ পসিবল?'

সোমা বলল, 'কী?'

'ওর সঙ্গে কি তোমার কোনো যোগাযোগ আছে—বিয়ন্ড মাই নলেজ?'

শতদ্রু বলে ফেলল, 'সেদিন ওঁদের গ্রুপের রিহার্সাল দেখতে গিয়েছিলুম।'

'ক্যামাক স্ট্রিটে তো?'

সোমা দ্রুত বলল, 'ইউ আর গোয়িং বিয়ন্ড ইওর জুরিসডিকশন।'

'অলরাইট। নো কোশ্চেন বেবি! আই রিট্রিট সেফ্‌লি।'

এরপর কফি এল এবং ফের কিছুক্ষণ এধরনের কথাবার্তা হল। অপূর্ব সবসময় এইরকম স্ফূর্তিতে এবং রসিকতায় থাকে। কফি খাওয়ার পর সোমা তার কথাটা তুলল। পনের ফেব্রুয়ারি তার গ্রুপ টোকিও পৌঁছচ্ছে। ইন্দো-জাপান মৈত্রী সংস্থা এ অনুষ্ঠানের হোস্ট। সেখান থেকে আঠারো তারিখে রওনা হবে লসএঞ্জেলস। চেষ্টাচরিত্র করে এ. যোগাযোগ ঘটে গেছে। কিন্তু টোকিওতে বাড়তি দুটো দিন যে কাটাবে, তার খরচ কোথায়? ট্রাভেল এজেন্টকে যেমনটি বলেছিল তেমনি ব্যবস্থা হয়েছে।

অথচ ঝোঁকের বশে বাড়তি খরচের কথাটা খেয়াল করেনি সোমা। এখন কথা হচ্ছে, অপূর্বদের টোকিও অফিস দুটো শোয়ের ব্যবস্থা করতে পারে কি না স্থানীয় কোনো ক্লাব-টাবকে ধরে? 'ক্রান্তি ট্রুপের' সেরা অ্যাডভেঞ্চার। সোমা তার গ্যারান্টি দিতে রাজি যেভাবে হোক, দুটো মাত্র শো। সেই শো দুটো হতে পারে। ইন্দো-জাপান মৈত্রী সংস্থাকে অবশ্য ধরা যায়। কিন্তু সেটা ওঁদের ওপর অত্যাচারেব শামিল হতে পারে। তাছাড়া এমন অনুরোধ করাও তো হ্যাংলামি।

শেষে সোমা করুণ মুখে বলল, 'আই ডিডন্‌ট্‌ থিংক অফ দা আদার সাইড! দ্যাটস মাই ফল্ট। শেষ পর্যন্ত টোকিও থেকে ফিরে আসতে হবে হয়তো। অপূর্ব, উড ইউ প্লিজ...'

অপূর্ব মিটিমিটি হেসে বলল, 'কজন যাচ্ছ তোমরা?'

'জাস্ট নাইন টু টেন ওনলি।'

'দুদিনের থাকা এবং খাওয়া?'

'দ্যাটস রাইট।'

'শো না করেও যদি ব্যবস্থা হয়?'

সোমা লজ্জার ভংগি করে বলল, 'ও নো নো—প্লীজ! সেটা কেমন দেখায়।'

'তুমি কেন ভাবছ এমনি-এমনি আরও অফার জুটবে না। টোকিও ইজ এ ভেরি বিগ প্লেস।'

'অনিশ্চিত তো! যদি—ধরো, আমরা ফেল করি? অডিয়েন্স না নেয়?'

'আই সি। তুমি বুদ্ধিমতী এবং হিসেবী। তোমার উন্নতি হবে।' বলে অপূর্ব ফোন তুলে পি বি এক্সে ওভারসিজ লাইনের ব্যবস্থা করতে নির্দেশ দিল। তারপর ফোন রেখে বলল, 'এখন টোকিও লাইন বিজি। বিকেলে পাওয়া সম্ভব। তুমি বরং সন্ধ্যার দিকে আমাকে ক্যালকাটা ক্লাবে একবার রিঙ কোরো। কেমন?'

সোমা বলল, 'তাহলে এটাও আনসার্টেন!'

'হতাশ হবার কারণ নেই। আই অ্যাসিওর ইউ।' অপূর্ব বরাভয়ের ভংগিতে হাত তুলল। 'তুমি তৈরি হতে থাকো ততদিনে। নাও, স্মাইল বেবি! জাস্ট আ সুইট স্মাইল!'

সোমা হাসল।

অপূর্ব বলল, 'সাটু, হাসিটা দেখলি? আ লাভলি সানরাইজ না?'

সোমা বলল, 'শাট আপ! ওঁকে জড়াচ্ছ কেন? শতদ্রু, আপনি দেখছেন তো, অপূর্ব বিয়ে করার পর কী বিশ্রিরকমের ডেঁপো হয়ে গেছে! আগে ভীষণ গোবেচারা ছিল।'

'তাই তো হয়। এই যেমন সাটু এখন আছে—বিয়ের পর কি অমনি গোবেচারা থাকবে?'

আবার ফক্কুরি চলতে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর সোমা শতদ্রুকে বলল, 'বাই দা বাই, আপনি তখন অ-রিভোয়া করলেন। সত্যি কি চলে যাচ্ছেন নাকি?'

শতদ্রু বলল 'হুঁউ। এয়ার অফিসে যাব বলে বেরিয়েছি। যত শিগগির যাওয়া যায়। নেক্সট অ্যাভেলেবল্‌ ফ্লাইটে।'

অপূর্ব তাকাল ওর দিকে। 'সে কী! বিয়ে না করে ফেরত যাবি? কেন? হল কী তোর?'

'বিয়ে করতে এসেছিলুম বুঝি?

'সেরকমই শুনেছিলুম।'

শতদ্রু হাসল। সোমা বলল, 'আমি উঠি অপূর্ব। ইভনিংয়ে ক্যালকাটা ক্লাবে তো? শতদ্রু, হোপ টু সি ইউ এগেন। বাই!'

সোমা উঠে দাঁড়িয়েছিল। অপূর্ব বলল, 'ওয়েট। সোমা, তোমার ট্রুপের সঙ্গে একজন গার্জেন নেবে? লসএঞ্জেলস অব্দি—দেন টু এনিহোয়্যার ইন দা স্টেটস। নিয়ে নাও। আমি দিচ্ছি।'

সোমা চোখ বড় করে হাসল। 'মাই গুডনেস! শতদ্রু আপনি টোকিও হয়ে চলুন না আমাদের সঙ্গে। আমাদের ভীষণ ভাল লাগবে। এটা আমার মাথায় আসে নি। রিয়্যালি, ইট উড বি আ প্লেজারট্রিপ।'

শতদ্রু আস্তে বলল, 'তা মন্দ হয় না! আই ক্যান অ্যাফোর্ড দ্যাট।'

সোমা বলল, 'আমাদের ট্র্যাভেল এজেন্টকে বললে আপনাব বুকিং অ্যারেঞ্জমেন্ট হয়ে যাবে। চলুন, ওদের অফিসে নিয়ে যাই আপনাকে। এই বিল্ডিংয়েই গ্রাউন্ডফ্লোরে।'

দুজনে বেরুতে যাচ্ছে, অপূর্ব বলল, 'আমার একটা ধন্যবাদ প্রাপ্য ছিল ডার্লিং!'

সোমা ঘুরে বলে গেল, 'যথাসময়ে পাবে। সব কিছু ম্যাচিওর হতে দাও—তবে না?'

লিফটে দুজনে নেমে গেল নীচের তলায়। ফুটপাতে নেমে গিয়ে ট্রাভেল এজেন্সিতে ঢুকল। লাল কার্পেট মোড়া মেঝের একপাশে কয়েকটা গদিআঁটা চেয়ার এবং সোফাসেট। টেবিলে অনেক রঙীন পত্রিকা। দুজন সায়েব ট্যুরিস্ট বসে আছে। সোমা বলল, 'টোকিওর প্রব্লেমটা মাথায় এমনভাবে ঢুকে ছিল যে এব্যাপারটা আমি চিন্তাও করি নি। অপূর্ব সত্যি একটা জিনিয়াস। ওর মাথায় সব দ্রুত খেলে যায়। কিন্তু...'

তাকে থামতে দেখে শতদ্রু বলল, 'কিন্তু?'

'ও কিছু না।' সোমা ঘড়ি দেখে বলল, 'এই রে! সাড়ে বারোটা! আই অ্যাম সো ফুলিশ টু মিস অ্যান অ্যাপোয়েন্টমেন্ট। অপূর্বটা যা দেরি করিয়ে দিল না! যাক্ গে, এখন হাতে প্রচুর সময় পাওয়া গেল। শতদ্রু, বাইরে কোথাও আমরা ডিনার সেরে নিয়ে স্বচ্ছন্দে ঘুরতে পারি। কী? আপত্তি আছে?'

শতদ্রু বলল, 'না।'

'থ্যাংকস। আসুন।' সোমা ট্রাভেল এজেন্টের চেম্বারের পর্দা তুলে ঢুকল। শতদ্রু তাকে অনুসরণ করল।...

কুড়ানি ঠাকরুনের প্রত্যাবর্তন

বারোদিনের দিন সন্ধ্যায় কুড়ানি ঠাকরুন বাড়ি ফিরেছেন। কে দয়া করে সাইকেল রিকশোয় তুলে দিয়েছিল বসন্তপুর স্টেশনে। পাদানিতে বসে দুহাতে রড আঁকড়ে ধরে এসেছেন। রিকশোওলার ডাকাডাকিতে দুই বোন দরজা খুলে অবাক।

আর সেই কুড়ানি ঠাকরুন নেই, এ অন্য মানুষ। অথর্ব জরোদ্গাব লোল অস্থিচর্মসার এক বুড়ি। মুখের দিকে ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকান। পাঁচটা কথা বললে কোনরকমে একটা জবাব দেন। সেও খুব স্পষ্ট নয়। জীবনের সব কথা যেন শেষবারের মতো বলে নিয়েছেন লোহাগড়ায় এক হরিবাবুর সঙ্গে। নাতনিরা বুঝতে পেরেছে কী ঘটেছিল। দুদিক থেকে দুজনে ঝাঁঝালো স্বরে চেঁচিয়েছে, 'বাড়ি ফিরতে কী হয়েছিল তাহলে? যখন দেখলে ওই অবস্থা—অ্যাঁ? বেশ হয়েছে তোমার। বোকা মেয়ে কোথাকার?'

রঙ্গনা পরে বলেছে, 'আমাদেরই ভুল হয়েছিল রে দিদি! আমরা কেউ খোঁজ নিতে গেলুম না কেন? কিংবা কাউকে পাঠালুম না কেন?'

অপরূপা চোখ পাকিয়ে বলেছে, 'এখন তো বলছিস! তখন মাথায় এসেছিল কি? আর লোকের কথা বললি, কে তোর লোক শুনি? কগণ্ডা লোক পাবি তুই বসন্তপুরে? মুখে রক্ত উঠে মরলেও কি দেখতে আসবে ভেবেছিস? থাম্।'

বৃদ্ধা যে অতগুলো দিন প্রায় না খেয়ে কাটিয়েছেন বোঝা গেছে। এসে যা গোগ্রাসে ভাত খেলেন, দেখে অবাক লাগে। পরদিন দুইবোন ইঁদারাতলায় ফেলে রগড়েছে ঠাকুমাকে। গরম জল আর সাবান ঘষে ময়লা সাফ করে দিয়েছে। অতিকষ্টে একবার বলেছিলেন, 'না-না। সাবুন মাখতে নেই ভাই'—কে শোনে ধর্মের কথা? বসন্তপুরে এই এক বুড়ি বিধবা যিনি হবিষ্যি না করতে পারুন, একাদশীটা বরাবর পালন করেছেন—কিন্তু তীর্থধর্ম বরাতে জোটেনি। গৌরবাবু গোঁফখেজুরে মানুষ ছিলেন। সময়ও পেতেন না। শুধু অনি আশ্বাস দিত, 'রোসো বুড়ি! তোমায় মথুরা-কাশী বৃন্দাবন সব ঘুরিয়ে আনব। যত পাপ করেছ, সব ধুইয়ে আনব প্রয়াগে।' অনিকে একঘটি গঙ্গাজলের জন্যে মাথা ভাঙতেন। রঙ্গনা এনে দিত মাঝে মাঝে ছকা পাণ্ডার কাছ থেকে। ছকাও দিয়ে যেত কখনও ফুল নিতে এসে! ও-মাসে নাতনিদের বলেছিলেন, 'মকরসংকেরান্তিতে একবার গঙ্গাসাগর নিয়ে যাবি আমায়? শুনলুম এখান থেকে বাসমোটরে করে সবাই যাচ্ছে।' নাতনিরা ঠোঁট উল্টে বলেছিল, 'থামো! আদিখ্যেতা কোরো না। একেকজনের ভাড়া কত জানো?'

এবার অপরূপা হাসতে হাসতে বলে, 'ওই ভেবে নাও, তীর্থ করে এলে' প্রচুর পুণ্য হয়ে গেছে তোমার।'

মধু ছুতোর অবস্থা দেখে জিভ চুকচুক করে কয়েকঘণ্টার মধ্যে একটা কাঠের ক্রাচ বানিয়ে দিয়ে গেছে। কিন্তু কুড়ানি ঠাকরুনের গায়ে আর একটুও জোর নেই। ক্রাচটাও ভারি অবশ্য। সেটা পড়ে থাকে বারান্দায়। বৃদ্ধা পাছা ঘষড়ে একটু আধটু চলাফেরা করেন। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকেন ফলফুলের উদ্ভিদের দিকে। শীর্ণ আঙুলে স্পর্শ করেন তাদের। ছুতোরের মেয়েটি আগের চেয়ে ন্যাওটা হয়েছে বৃদ্ধার। সারাক্ষণ কাছে থাকে। মুখের দিকে ঝুঁকে প্রশ্ন করে জানতে চায়, কী করতে হবে। আর রঙ্গনারও খুব লক্ষ্য ঠাকুমার দিকে আগের চেয়ে। দুহাতে শূন্যে তুলে বারান্দা থেকে নামায় উঠোনে। খিড়কির ঘাটে নিয়ে যায়। ঠাকরুন ঘাটের মাথায় কলাগাছের কাছে বসে তাকিয়ে থাকেন কলার মোচার দিকে। হলুদ বাঁশপাতা ঝরে পড়ে ডোবার সবুজ জলে। মাছরাঙা কঞ্চিতে বসে থাকে। একচোখ জলের দিকে, অন্য চোখ পেনীর দিকে। পেনী ঢিল কুড়োলে কুড়ানি ঠাকরুন জড়ানো গলায় বলেন, 'অই অই!' পেনী হাসতে হাসতে পাশে বসে পড়ে। খোলামকুচি কুড়িয়ে লুফতে লুফতে বলে, 'ও ঠাকমা! লুফা খেলবে?' রঙ্গনা এসে উঁকি মারে। খিড়কির চৌকাঠে দুপাশে হাত রেখে বলে, 'ঠাকুমা, তোমরা কী করছ গো?'

মাঘের সূর্য দক্ষিণায়নে সরেছে। রোদে আঁচ বেড়েছে। মাঠের দিক থেকে দুপুরবেলা ঘূর্ণিহাওয়া এসে বাঁশবন নাড়া দিয়ে ডোবার জলের ওপর নাচে। হলুদ পাতা ঝরে পড়ে সর্ সর্ খর্ খর্। তারপর ঘুরতে ঘুরতে ছড়িয়ে পড়ে জলের বুকে। ঘূর্ণিহাওয়াটা কলাবন পেরিয়ে বসন্তপুরে ঢোকে। হাইওয়েতে ছেঁড়া শালপাতা, কাগজের টুকরো, লালনীল সেলোফেন কাগজ উড়িয়ে নিয়ে যায়। পেছন পেছন ঘেউ ঘেউ করে ছুটতে থাকে নেড়ি কুকুরটা। শালপাতায় খাদ্যের গন্ধ ছিল।

ডোবার ঘাটে নির্জন দুপুরে এক বৃদ্ধা চুপচাপ বসে বুঝি এবার মৃত্যুর প্রতীক্ষারত। চোখে জল দেখে ছুতোরের মেয়েটা দৌড়ে বাড়ি ঢুকে বলে, 'ও বাবুদিদি! দেখবে এস দেখবে এস। ঠাকমা কাঁদছে।'

অপরূপা নেই। রঙ্গনা এসে বলে, 'কী হল ঠাকুমা? কাঁদছ কেন?'

বৃদ্ধা মাথাটা আস্তে দোলান। 'না। কাঁদি নাই।'

'ফের মিথ্যা কথা? কী তোমার এত দুঃখ বলো তো?' রঙ্গনা পাশে হাঁটু দুমড়ে বসে। 'বাঁকাশ্রীরামপুর খুঁজে পেলে না বলে? দিদি তো বলেছে—ম্যাপে খুঁজে বের করবে। স্কুল ম্যাপ আছে না জেলার?'

অপরূপা আরও একটা টিউশনি যোগাড় করেছে। সকালসন্ধ্যা দুবেলা পড়াতে যায়। দুপুর অব্দি ঘোরাঘুরি করে ব্লকের অফিসার আর মাতব্বর লোকদের কাছে। ট্রান্সপোর্ট অফিসের হরেন বলেছে, 'সাধুদাকে বলব তোমার কথা। কলকাতা থেকে ফিরুক। না হয় এখানেই একটা কিছু করলে। মাসে শতখানেক টাকা পাবার আশা আছে। পরে ভালকিছু পেলে ছেড়ে দেবে।' অপরূপা আশায় চনমন করে বেড়াচ্ছে। কবে সাধুবাবু কলকাতা থেকে ফিরবেন কে জানে? কলকাতায় আরেকটা অফিস খুলেছেন। সেখানে হলে তো খুব ভাল। কলকাতায় থাকার সুযোগ পেলে অপরূপাকে আর পায় কে!

কদিন পরে অপরূপা সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরল—মুখটা কালো। রঙ্গনা বলল, 'কী হয়েছে রে দিদি?'

অপরূপা শুকনো হেসে বলল, 'কী হবে? কিছু না। তোরা খেয়েছিস?'

'ঠাকুমাকে খাইয়ে দিয়েছি। শুয়ে পড়েছে। আয়, আমরা খেয়ে নিই।'

'আমি কিছু খাব না রে! তুই খেয়ে নে।'

'খাবি নে? কী হয়েছে—তাও বলবিনে?' রঙ্গনা বিরক্তি প্রকাশ করল।

অপরূপা আস্তে বলল, 'আমি খেয়েছি। তুই খাগে যা।'

'মিথ্যা বলিস নে। ভাল হবে না বলে দিচ্ছি।'

অপরূপা স্বভাবমত মেজাজ করল না। বলল, 'বিশ্বাস কর আমি খেয়ে এলুম।'

'কোথায় খেলি?'

'নুটুবাবুর রেস্টুরেন্টে।' অপরূপা শাড়ির ওপর দিয়ে পেটে হাত বুলোল। 'চপ-কাটলেট কতকিছু।'

রঙ্গনা সন্দেহের দৃষ্টে চেয়ে বলল, 'কে খাওয়াল? নিজের পয়সায় নিশ্চয় না?'

'পয়সা খরচ করে খাব?' অপরূপা হাসল একটু। 'আমি অত স্বার্থপর নই রে—যাই ভাবিস তোরা।'

'বেশ। কে খাওয়াল?

অপরূপা এবার চটল। 'জেরা করছিস কেন? আমার বুঝি বন্ধু নেই?'

রঙ্গনা ঠোঁট উল্টে একটা ভংগি করে চলে গেল। অপরূপা গম্ভীর হয়ে বসে রইল বিছানায় পা ঝুলিয়ে। ইচ্ছার বিরুদ্ধে একটু বেশি এগিয়ে গেছে। হরেনকে সে প্রেমিক হিসেবে চিন্তা করতেই পারে না। অথচ হরেনকে পাত্তা দিতে হচ্ছে। সে আজ নীলা রেস্তোরাঁয় পর্দার আড়ালে তার পায়ে পা ঠেকিয়েছে—তারপর টেবিলের ওপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে তার কাঁধ ছুঁয়েছে। এমন কী হাঁ করে বলেছে, 'আমায় খাইয়ে দাও না অপু।' অপরূপা হেসে উড়িয়ে দিতে চাইছিল এমন আচরণ। কিন্তু তাকে সত্যি কাটলেটের টুকরো গুঁজে দিতে হয়েছে হরেনের মুখে।

বেরিয়ে এসে তখন ভীষণ লজ্জায় পড়ে গিয়েছিল অপরূপা। চেনা লোকেরা তো দেখল। কী ভাববে তারা? রাস্তাব পাশাপাশি হেঁটে হরেন তাকে এগিয়ে দিতে এল। নির্জনে এসে তার হাতও ধরল। অপরূপা কাঁপছিল। শিরিসতলায় গলি রাস্তায় ঢোকার মুখে অন্ধকারে হরেন তার দুকাঁধ ধরে চুমু খেতে এল। অপরূপা ছাড়িয়ে নিয়ে হন হন করে চলে এসেছে।

ঠাকুমা ফিরে আসার পর অপরূপা আবার একা শুচ্ছে। রঙ্গনা ওঘরে ঠাকুমার কাছে শোয় আগের মত। আড়াই টাকায় নীলচে শেড দেওয়া একটা ছোট্ট কেরোসিনবাতি কিনেছে অপরূপা। ইলেকট্রিক টেবিল ল্যাম্পের নকল করে নীলাভ আলোটা বেশ লাগে। শুয়ে কত কী কল্পনা করে অপরূপা। নিজের ভবিষ্যত স্পষ্ট করে দেখতে চায়। চাকরি, কোয়ার্টার, এক অস্পষ্ট পুরুষ, এক শিশু—তাকে স্কুলে দিতে যায়, মাথায় রঙীন ছাতি। কখনও মধ্যরাতে হঠাৎ সে টের পায়, আমেরিকায় আছে। বিপাশার কাছে শতদ্রুর অ্যালবামে অসংখ্য রঙীন ছবি দেখেছিল। সুন্দর বাড়ি, রাস্তাঘাট, মানুষজন। তাদের একজন হয়ে যায় সে। তারপর শতদ্রুর কথা ভাবতে থাকে। কল্পনা বহুদূর এগিয়ে যেতে থাকে। নির্লজ্জ কল্পনা। অবাধ স্বাধীনতাময় সেই কল্পনা। তারপর শতদ্রুর চিঠিটা সেই প্রসারিত কল্পনাকে মুহূর্তে উড়িয়ে দেয়। চোয়াল আঁটো হয়ে যায় অপরূপার।

দূরে হুইস্‌ল্ বাজিয়ে চলে যেতে থাকে মধ্যরাতের ট্রেন। শব্দহীন রাতে সেইসব দূরের শব্দ দূরে সরে যেতে থাকে। ডোবার ধারে বাঁশবনে পেঁচা ডেকে ওঠে, ক্র্যাঁও ক্র্যাঁও ক্র্যাঁও। অপরূপা লেপ মুড়ি দিয়ে বালিশে মাথা গোঁজে। তারপর কখন ঘুম এসে তাকে বাঁচিয়ে দেয়।

টিউশনির জন্য খুব সকালে উঠতে হয় অপরূপাকে। বেলাঅব্দি ঘুমোচ্ছে দেখে রঙ্গনা দরজায় ধাক্কাধাক্কি করছিল। অপরূপা দরজা খুলে বলল, 'আজ শরীরটা খারাপ করছে রে! তুই আমার হয়ে যা না রনি। কখনও তো তোকে বলি নি। যা না—কামাই হবে আজ।'

রঙ্গনা দমে গিয়ে বলল, 'আমি? আমায় পড়াতে দেবে? কোন ক্লাসের রে?'

অপরূপা হাসল। 'ব্লক অফিসের এগ্রিকালচারাল অফিসার। জিগ্যেস করলে কোয়ার্টার দেখিয়ে দেবে।'

'ভ্যাট্! কোন ক্লাসের স্টুডেন্ট তাই জিগ্যেস করছি।'

'দুটি মেয়ে—ক্লাস ফাইভ আর ফোর। ছেলেটি ক্লাস টু।'

'তিনটে?'

'আর চাই নাকি?'

'কত দেয় রে দিদি?'

'পঞ্চাশ টাকা।'

'ইস! অনেক টাকা দেয় তো তোকে। কী করিস অত টাকা?'

অপরূপা রেগে গেল। 'শাড়ি-গয়না কিনি মাসে-মাসে। আর খাওয়া দাওয়া-সংসার চালিয়ে দিচ্ছে তোর কর্তাবাবা।'

'কর্তাবাবা না হোক, কর্তামা তো চালিয়েছে।' রঙ্গনা কৌতুকের ভংগিতে বলল। 'তুই তো মোটে এ মাসটা।'

'থাক। তোকে যেতে হবে না। যা—ইংরিজি নভেল পড়গে যা।'

'আহা যাচ্ছি। যাব না বলছি নাকি?' রঙ্গনা ওঘরে কাপড় বদলাতে গেল। ওঘর থেকে ফের চেঁচিয়ে বলল, 'তোর স্লিপারদুটো দিতে হবে কিন্তু। আমারটা কবে থেকে ছিঁড়ে পড়ে আছে।'

অপরূপা টুথব্রাশে পেস্ট নিয়ে ইঁদারাতলায় গেল। বলল, 'সারিয়ে নিতে কী হয়? নিয়ে যেতে পারো না মুচির কাছে?'

রঙ্গনা শাড়ি পরতে পরতে জবাব দিল, 'যাবার পথে দিয়ে যাব।' একটু পরে সে সেজেগুজে বেরিয়ে এসে কুণ্ঠিত মুখে বলল, 'দিদি! ওরা যদি আমায় পড়াতে না দেয়? আর—ওরা তো আমায় চেনেই না রে!'

'পরিচয় দিবি।' অপরূপা উঠে দাঁড়াল। 'এক মিনিট দাঁড়া। বউদিকে চিঠি লিখে দিই।'

কুড়ানি ঠাকরুন এই সাতসকালে লাউগাছের ভেতর ঢুকে পড়েছেন। কী করছেন, বোঝা যাচ্ছে না। হাতে একটা শুকনো ছোট্ট কঞ্চি। রঙ্গনা বেরুচ্ছে দেখলেন মুখ ঘুরিয়ে। তারপর আবার কঞ্চি দিয়ে কী খোঁচাখুঁচি শুরু করলেন।

'জুতো সারতে পঁচিশ পয়সার বেশি লাগা উচিত নয়।' বলে অপরূপা বোনকে আরও পাঁচটা পয়সা বেশি দিয়েছে।

রঙ্গনা বেশ কিছুদিন বাড়ি থেকে বেরোয় নি। সে হাঁফিয়ে উঠেছিল। তবে ব্লক অফিসটা শেষদিকে। বাজার এবং বসতি এলাকার উল্টোদিকে। বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে হাইওয়ে। তারপর রশিদুই এগোলে বাঁক। বাঁকের ডাইনে খাল। খালে কাঠের সাঁকো আছে। ওদিকটায় বাঁজা ভাঙা আর জঙ্গল ছিল একসময়। সমতল করে বিশাল এলাকা জুড়ে হলুদ একতলা বাড়ি, লম্বা পার্ক, ইউক্যালিপটাস, কতরকম ঝাউগাছ, ক্যাকটাস আর ফুলবাগিচার উজ্জ্বলতা তৈরি করা হয়েছে। সংকীর্ণ ঝকঝক শুকনো পিচের পথ। দুধারে কৃষ্ণচূড়া। ফুলের সময় হয়ে এল।

আনন্দ এবং উৎকণ্ঠা নিয়ে সেখানে ঢুকল রঙ্গনা। পার্কে ঘাস ছাঁটছিল মালী। তাকে জিগ্যেস করলে এ. ও. সায়েবের কোয়ার্টার দেখিয়ে দিল। বারান্দায় ফর্সা লম্বা এবং রোগা এক মহিলা দাঁড়িয়ে উল বুনছিলেন। রঙ্গনাকে দেখে হাতের কাজ থামিয়ে তাকালেন। রঙ্গনা ভয়ে-ভয়ে বলল, 'দিদির শরীর খারাপ। তাই আমায় পড়াতে আসতে বলল।'

'তুমি অপুর বোন বুঝি?' মিষ্টি হাসলেন এ. ও. সায়েবের বউ। 'অপুর শরীর খারাপ? আচ্ছা! তুমি পড়াবে? কী করো তুমি?'

রঙ্গনা একটু হাসল। 'কিছু না।'

'এতটুকু মেয়ে তুমি! কোন ক্লাসে পড়ছ?'

রঙ্গনা হকচকিয়ে গেল। 'আমি...আমি আর পড়ি না।'

'সে কী! কতদূর পড়াশুনা করেছ?'

'বি এ পার্ট ওয়ান দিয়েছিলুম।'

'আর পড়লে না কেন?'

মায়ের পেছনে দুটি মেয়ে এবং একটি বাচ্চা উঁকি দিচ্ছিল। রঙ্গনা বলল, 'হল না। বাবা মারা গেলেন।'

'আচ্ছা! তা ক্লাস ফাইভের ইংরেজি পড়াতে পারবে তো?'

'পারব।'

'অংক?'

'হয়তো পারব।'

এ. ও. সায়েবের বউ ঘুরে ছেলেমেয়েদের ধমক দিলেন, 'কী দেখছ সব? যাও—বসো গিয়ে।' তারপর রঙ্গনাকে বললেন, 'তুমি বললুম বলে কিছু মনে করো নি তো? একেবারে বাচ্চা মেয়ে! এস।'

রঙ্গনা রাগ করেনি বলতে গিয়ে চুপ করল। বলার সুযোগ পেল না। সে বারান্দায় উঠল।...

সেবেলা রঙ্গনা যতক্ষণ পড়াল, এ. ও. সায়েবের বউ ততক্ষণ কাছে বসে নজর রাখলেন। রঙ্গনার অস্বস্তি হচ্ছিল। তার ইংরেজি উচ্চারণ শুনে ভদ্রমহিলা একবার জেনে নিলেন, রঙ্গনা ইংলিশ মিডিয়ামে পড়েছে কি না। বসন্তপুরে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল কোথায়? কোন আমলে খ্রীস্টান মিশন ছিল। তখন নাকি একটা ছিল। দেশভাগের সময়ে উঠে যায়। পাদ্রীরা সবাই ছিলেন সায়েব। বসন্তপুরে একঘর হাড়ি খ্রীস্টান হয়েছিল। তারা কোথায় চলে গেছে। পাশের গাঁয়ে কিছু খ্রীস্টান আছে। তাদের ছেলেমেয়েরা বাংলা স্কুলে পড়ে।

রঙ্গনা কথা বলে একটা সম্পর্ক গড়তে চাইছিল। কিন্তু মহিলাটি হিসেবী। পড়ানোর সূত্র ধরিয়ে দিয়ে উঠে গেলেন। একটু পরে চা আর দুটো বিস্কুট এল। নিজে হাতে তুলে দিয়ে মহিলা বললেন, 'আমায় সুষমাদি বলবে।' রঙ্গনা ভারি খুশি হল। সে আসলে চেয়েছিল, তার দোষত্রুটির জন্য যেন অপরূপাকে কথা শুনতে না হয়। দিদির দেওয়া দায়িত্বটা ভালভাবে পালন করাও উচিত মনে হয়েছিল।

কিন্তু এতেই বুঝি গণ্ডগোলে পড়ে গেল সে। সুষমা কড়া ধাতের মহিলা সে টের পেয়েছিল। নটায় ওরা স্কুলের জন্য তৈরি হতে গেল। তখন সুষমা বললেন, 'তোমার পড়ানোটা আমার পছন্দ হয়েছে, বুঝলে মেয়ে? বলি কী, তুমিই এসে পড়াও না কেন—দিদির বদলে? ফ্র্যাংকলি বলাই ভাল, তোমার দিদিকে আমরা নেহাত রেখেছি—তেমন কোনো টিচার পাচ্ছি না বলে। এখানে টিচারদের যা দেমাক আর টাকার ডিম্যান্ড।'

রঙ্গনা ভড়কে গিয়ে বলল, 'দেখুন সুষমাদি, আমার সময় হবে না। তাছাড়া...'

ধমকের সুরে এ. ও. সাহেবের বউ বললেন, 'কী সময় হবে না? বললে তো কিছু করো-টরো না। দিদি রাগ করবে? সোজা কথা বলছি শোনো। তোমার দিদির দ্বারা এসব হবে না। নেহাত আমরা বলে ওকে রেখেছি। বড্ড ফাঁকিবাজ মেয়ে।'

রঙ্গনা ভেতর-ভেতর চটেছে। কিন্তু মুখে শুকনো হাসি ফুটিয়ে বলল, 'আমি টিউশনি করতে পারি না। আমার ভালও লাগে না। নৈলে কোথাও এতদিন করতুম।'

'আচ্ছা!' বলে সুষমা চোখ কটমট করে তাকালেন।

রঙ্গনা কুণ্ঠিতভাবে বলল, 'দিদিকে বলব বরং, ভালভাবে পড়াবে। লাস্ট ইয়ার তো গোটাবছর দিদি পড়িয়েছে আপনার ছেলেমেয়েদের। আমার ধারণা...'

ভেতরে ভাইবোনে ঝগড়ার চেঁচামেচি শোনা যাচ্ছিল। সুষমা চলে গেলেন হন্তদন্ত হয়ে। একটু দাঁড়িয়ে থাকার পর রঙ্গনা চলে এলো।

সারাপথ উদ্বেগে সে অস্থির। টিউশনি করার মধ্যে যে এমন সব অপমান আছে, সে কোনদিন ভাবে নি। অপমান ছাড়া আর কী? একবছর ধরে অপরূপা ওদের পড়াচ্ছে। স্ট্যান্ড না করুক, ভালভাবে প্রমোশন তো পেয়েছে ওঁর ছেলেমেয়েরা! হঠাৎ রঙ্গনাকে পেয়ে এমন অদ্ভুত কথা বলার মানে কী? রঙ্গনা চটে গিয়ে ভাবছিল, সে না গিয়ে অন্য কেউ গিয়ে পড়ালেও হয়ত তাকে একই কথা বলা হত। অপরূপার বদনাম গাওয়া হত।

বাড়ি ফিরলে অপরূপা তার গাম্ভীর্য লক্ষ্য করে হাসতে হাসতে বলল, 'কী রে? একেবারে স্কুলের দিদিমণির মত তুম্বো মুখ করে আছিস যে? নিশ্চয় সুষমাদি তোর পড়ানোর খুঁত ধরেছেন। তোকে বলা হয়নি—ভদ্রমহিলা নিজে নাকি বিয়ের আগে টিচার ছিলেন। একটু এদিক-ওদিক হবার যো নেই। ভুল ধরেছিলেন তো?'

রঙ্গনা বাঁকা ঠোঁটে বলল, 'হুঁ, বিদ্যাদিগগজ মহিলা। ভুল ধরবে আমার। আচ্ছা দিদি, তুই ওখানে কী করে এতকাল টিউশনি করছিস রে?'

'কেন?' অপরূপা একটু উদ্বিগ্ন হয়ে জিগ্যেস করল। 'তোকে খারাপ কিছু বলেছে বুঝি?'

'হুঁঃ! আমি ওদের ধারি কিছু যে বলবে।' রঙ্গনা রাগ দেখিয়ে বলল। 'তুই নাকি ফাঁকি দিয়ে পড়াস-টড়াস।'

'বলল?'

'হুঁ।' রঙ্গনা জোরে মাথাটা দোলাল।

অপরূপা আরও উদ্বিগ্ন হয়ে বলল 'কী বলল, কী বলল? ছাড়িয়ে দিয়ে অন্য কাউকে রাখবে বলল?'

রঙ্গনা বিরক্তভাবে বলল, 'অত বলতে পারছি না আমি।' সে বলল না যে তাকেই পড়াতে বলেছেন এ. ও. সায়েবের বউ। কথাটা দিদি কীভাবে নেবে সে বুঝতে পারছিল না। অপরূপা ভুরু কুঁচকে কী ভাবছে দেখে সে ফের বলল, 'তুই বরং ওখানটা ছেড়ে দিয়ে অন্য কোথাও খুঁজে দ্যাখ দিদি! পেয়ে যাবি।'

অপরূপা একটু মাথা দোলাল বটে সায় দিয়ে, কিন্তু ব্লক অফিস এলাকায় পড়াতে যাওয়ার পিছনে তার মনের একটা গোপন স্বপ্ন আছে, বোনকে বলতে পারবে না। কাঠের সাঁকোর মুখ হলুদ-হলুদ ফুলে ভরা গাছটার দিকে চোখ পড়লেই তার নেশাধরা আচ্ছন্নতা এসে যায়। ওই এক সুন্দর চাকরি-বাকরির জগত। ছবির মত একতালা কোয়ার্টার। জানলায় নীলপর্দা। বুগানভিলিয়ার ঝালর। মাসে মাসে নিশ্চিত টাকাকড়ি। সমাজশিক্ষা কর্মসূচিতে সে একজন হয়ে উঠতে পারে বৈকি কোন একদিন—হঠাৎ তার দরখাস্তের তলায় গোটাগোটা হরফে সেই 'অপরূপা মুখার্জি' দেখে কোন সদাশয় অফিসারের মন নরম হয়ে ওঠাও কি অসম্ভব? অপরূপা স্পষ্ট দেখতে পায়, সারাদিন সে গ্রামে-গ্রামে মেয়েদের মধ্যে ঘুরে কথা বলে-বলে ক্লান্ত গ্রামসেবিকাদের দলে দিনশেষে ফিরে আসছে জিপ গাড়িতে চেপে তার সুন্দর কোয়ার্টারে—জানলায় নীল পর্দা, গেটে বুগানভিলিয়ার ঝাঁপিতে লাল-লাল ফুল। সুষমা কেন যে ওই জীবনকে কথায় কথায় ঝাঁটাপেটা করেন, অপরূপা বোঝে না। আসলে মহিলাটি স্নায়ুরোগী। বদমেজাজী। খিটখিটে স্বভাব। আরও তো কত মহিলা আছেন ওখানে—এস. ই. ও. সায়েবের বউটি, পুতুলের মত গোলগাল চেহারা, মুখে হাসি লেগেই আছে। লনে বেতের চেয়ার পেতে বসে উল বুনছেন সারা শীতকাল। পিঠের কাছে বিশাল ডালিয়া। নতুন বিয়ে হয়েছে। চোখে চোখ পড়লেই হেসে বলেন, 'এই যে!' অপরূপাকে বসন্তপুরের লোকেরা পাত্তা দিতে চায় না, তার ঠাকুর্দা ছিলেন কুখ্যাত ডাকাত নাকি এবং তার দাদাও গুণ্ডাবদমাস ছেলে, তার ওপর এই দারিদ্র্য। কিন্তু ব্লক কোয়ার্টারে অপরূপার কত সম্মান। যেচে পড়ে কত মেয়ে ভাব জমিয়েছে। পুরুষরাও তাকে খাতির করে ভদ্রভাবে কথা বলেন। এমন কী বি. ডি. ও সায়েব পর্যন্ত।

রঙ্গনা কাপড় বদলে এসে বলল, 'ঠাকুমা বুঝি খিড়কির দোরে?'

অপরূপা আনমনে মাথা নাড়ল।

রঙ্গনা বলল, 'এবেলা তোর কাজ করে দিলুম। কাজেই এবেলা তুই রাঁধবি দিদি। আগেভাগেই কিন্তু বলে দিলুম। সেদিনকার মতো খাবার সময় গিয়ে যেন না শুনি, তোরই তো রাঁধার কথা—আমায় তো বলিস নি।'

রঙ্গনা অপরূপার নকল করল। তারপর সেই বাঁধানো প্রবাসী পত্রিকাটা নিয়ে খিড়কিতে গেল। কুড়ানি ঠাকরুন কঞ্চিহাতে বসে আছে। পেনী কলার পাতায় কলমি শাক বাছছে। মাঝে-মাঝে কলমিডাঁটায় ফুঁ দিয়ে বাঁশি বাজানোর চেষ্টা করছে। না পেরে বলছে, 'অ ঠাউরুনদি, দ্যাও না এট্টু করে—সিদিন কেমন দিইছিলে! অ ঠাউরুনদি! দ্যাও না।'

ঠাকরুনের ঠোঁটে একটু হাসি ফুটেছে এতদিন পরে। কঞ্চিটা নাচাচ্ছেন। রঙ্গনা পাশে শুকনো মাটিতে বসে বলল, 'কলমিশাক কোথা পেলিরে পেনী?'

পেনী ডোবার দিকে আঙুল তুলে বলল, 'ওই তো। তুলে আনলুম। বাবুদিদি, জানো? আর এট্টু হলেই সাপে কামড়ে দিইছিল। অ্যাত্তো বড় সাপ।'

কুড়ানি ঠাকরুন বললেন, 'ধোঁয়া, ধোঁয়া!'

রঙ্গনা লক্ষ্য করে বলল, 'ঠাকুমা! ধোঁয়া বলছ কেন? ঢোঁড়া বলতে পারো না? তোমার বাপের দেশে বুঝি ঢোঁড়াকে ধোঁয়া বলে?'

কুড়ানি ঠাকরুন নিজের মুখের দিকে আঙুল তুলে কিছু দেখালেন।

রঙ্গনা ঝুঁকে দেখতে দেখতে বলল, 'কী? কী হয়েছে?'

'কঁতা ওঁছে না।' পষ্ট করে উচ্চারণ করলেন বৃদ্ধা। পেনী প্যাট-প্যাট করে তাকিয়ে রইল।

রঙ্গনা চমকে উঠেছিল। বলল, 'ঠাকুমা! একী গো? তোমার কথা অমন জড়িয়ে যাচ্ছে কেন?' বলে সে দরজার দিকে মুখ ঘুরিয়ে অপরূপাকে ডাকতে থাকল।

অপরূপা তার ঘরের জানলা থেকে, জানালাটা রঙ্গনাদের পিঠের কাছেই, বলল, 'কী রে?'

'দেখে যা দিদি, ঠাকুমা কথা বলতে জিভ জড়িয়ে যাচ্ছে। আর দেখতে পাচ্ছিস? ঠোঁটটা কেমন যেন একটুখানি বেঁকে গেছে। তাই না?'

অপরূপা দেখে নিয়ে বলল, 'তাই তখন আমাকে আঙুলের ইশারায় মুখ দেখাচ্ছিল। সকাল থেকে কিছু হয়েছে মনে হচ্ছে। প্যারালেসিস না তো?'

রঙ্গনা বলল, 'ঠাকুমা, চলাফেরা করতে অসুবিধে হচ্ছে না তো?'

বৃদ্ধা মাথা দোলালেন। হচ্ছে না।

'খেতে-টেতে?'

'ত্রঁও।' অর্থাৎ একটু।

পেনী ফিক ফিক করে হেসে বলল, 'তাই তখন থেকে ঠাউরুনদি কী করে কথা বলছে। মাকে ডাকি বাবুদিদি?'

রঙ্গনা ধমকাল। 'চুপ কর্ তো! তোর মা ডাক্তার! ও ঠাকুমা, এখানে তাহলে বসে আছ কেন? অদ্ভুত তো তুমি! এস—চলে এস। বারান্দায় বসে থাকবে এস।'

বৃদ্ধা একটু হাসলেন। 'নাঁ নাঁ। কিঁছু অঁয় নি।' বলে পেনীর জন্য কলমিডাঁটা ভেঙে বাঁশি বানাতে থাকলেন। রঙ্গনা পত্রিকাটা খুলে চোখ রাখল বটে, কিন্তু মন বসল না পত্রিকার পাতায়। সে বারবার মুখ তুলে বৃদ্ধার ঠোঁট লক্ষ্য করছিল।

একটু পরে অপরূপা ফের জানলায় এসে বলে গেল, 'বৃদ্ধবয়সে এমন কতরকম হয়, বুঝলি রনি? দিদিমারও হয়েছিল না? শেষে মেসোমশাই ধানবাদের হসপিটালে নিয়ে গিয়েছিলেন। ম্যাসেজ করে ভাল হয়েছিল। ওবেলা বরং একটু ম্যাসেজ করে দেব গরম তেল দিয়ে।'

রঙ্গনা বলল, 'রতুডাক্তারকে বললে হয় না দিদি?'

অপরূপা রেগে গেল। 'এসেই দুটাকা ভিজিট চাইবে। তারপর ওষুধের দাম।'

'তাহলে হসপিটালেই ভাল।'

শোনামাত্র কুড়ানি ঠাকরুন জোরে নড়ে উঠলেন। জড়ানো গলায় তীব্র প্রতিবাদ করলেন, 'না।'

ভংগি দেখে রঙ্গনা না হেসে পারল না। অপরূপা বলল, 'সেই তো বলছি। লাইফে কখনও ওষুধ খেতে দেখেছিস ঠাকুমাকে? একবার—তুই তখন বাচ্চা, বাবা জোর করে ওষুধ খাইয়ে দিয়েছিলেন। বমি-টমি করে কেলেংকারি। বলে ওষুধের গন্ধ সহ্য হয় না।'

রঙ্গনা ভেবে বলল, 'কান্তবাবুর হোমিওপ্যাথি করালে হয় রে।'

অপরূপা উড়িয়ে দিয়ে বলল, 'বুড়োবয়সে অমন একটু-আধটু হয়। ছাড় তো! দেখবি, ম্যাসেজ করে দেব। 'ঠিক হয়ে যাবে।...'

অপরূপা রান্নার ব্যাপারে খেয়ালী। কোনোবেলা সে রাঁধতে বসলে সামান্য উপকরণেই ভাল রাঁধে। মন না থাকলে অখাদ্য করে ছাড়বে। এবেলা ভাগ্যিস খেয়ালবশে চালে-ডালে ঘ্যাঁটমতো করেছিল। কাঁচা লংকা, কলমি শাক আর উঠোনের কোনায় বৃদ্ধার হাতের লাগানো বুড়ি বেগুনগাছের সম্ভবত শেষ বেগুনটি পুড়িয়ে খাওয়াটা খুব জমেছিল। ঘ্যাঁটে জলটা বেশি হওয়াতে কুড়ানি ঠাকরুন খেতে পারলেন কোনরকমে। রাতে তো দিব্যি শক্ত দিনের ভাত চিবিয়ে খেয়েছেন। সকালে চায়ে মুড়ি

ভিজিয়ে গিলেছেন। কিন্তু শক্ত খাদ্য আর গিলতে পারছেন না। খাওয়ার পর সর্ষের তেল গরম করে অপরূপা কিছুক্ষণ মালিশ করে দিল। তাতে ঠোঁট সিধে হল না। তেমনি বেঁকে রইল।

সে-রাতে শুতে গিয়ে অপরূপা রঙ্গনাকে ডাকল, 'রনি কি শুয়ে পড়লি?'

'না রে! কেন?'

'শুনে যা।'

'কী?'

'চেচাঁচ্ছিস কেন? তেমন কিছু না। জাস্ট একটা কথা বলব। এ ঘরে আয় না।'

রঙ্গনা দরজা খুলে বেরুল। অপরূপা তাকে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে চাপা গলায় বলল, 'দ্যাখ্, আমার মনে হচ্ছে, ঠাকুমা আর বোধ হয় বেশিদিন বাঁচবে না। দিদিমার ঠিক এমনি হয়েছিল না? তো আমার মাথায় একটা কথা এল। বলি শোন্।'

রঙ্গনা দিদির মুখের দিকে সাগ্রহে তাকিয়ে বলল, 'কী রে?'

অপরূপা আরও গলা চেপে বলল, 'আমার বরাবর ধারণা, তাছাড়া মায়ের কাছেও শুনেছি—ঠাকুর্দার নাকি অনেক টাকাকড়ি আর সোনার গয়না লুকোনো আছে বাড়িতে। ঠাকুমা সব জানে। বাবার মৃত্যুর পর তোর মনে আছে তো —ঠাকুমা অনেক টাকা খরচ করেছিল শ্রাদ্ধের সময়।'

রঙ্গনা বলল, 'যাঃ! সে তো গয়না বেচেছিল নিজের। নীরেন স্যাঁকরাকে ডেকে এনেছিলুম—মনে নেই বুঝি?'

অপরূপা হাসল। 'আরও নেই তোকে কে বলল? নিজের মরার খরচটা রেখে না যাবার পাত্রী নয়—আমি বাজি রেখে বলতে পারি।'

রঙ্গনা বলল, 'দাদা ঠিক এই কথা ভেবে ঠাকুমার ওপর অত্যাচর করত।'

'তুই তর্ক করিস না তো!' অপরূপা চটে গেল। 'এখনও মুখে কথা বলতে পারছে—যা বলছে, বোঝা যাচ্ছে। তাই বলছিলুম, আমার চেয়ে তোকে বেশি ভালবাসে ঠাকুমা। তুই আজ রাতেই কোনো ছলে কথাটা তোল না। নিশ্চয় কোথাও ঠাকুর্দার টাকাকড়ি লুকোনো আছে। শাকপাতা শিমশশা বেচে অত পয়সা পায় কোথায় রে? তুই বিশ্বাস করিস এটা?'

রঙ্গনা ভেবেচিন্তে বলল, 'ঠাকুর্দার টাকা হলে তো ব্রিটিশ পিরিয়ডের। সে টাকা চলবে?'

'সেকথা পরে।' অপরূপা উজ্জ্বল চোখে চেয়ে বলল। 'আর সোনার গয়না? তার তো মার নেই।'

রঙ্গনা মুখ নামিয়ে লাজুক হাসল। 'যাঃ! আমি জিগ্যেস করতে পারব না। তুই করিস, দিদি।'

অপরূপা গম্ভীর হয়ে বলল, 'রনি! এটা একটা লাইফ অ্যান্ড ডেথ কোশ্চেন। আজ রাতেই...'

রঙ্গনা উঠে দাঁড়াল। তারপর 'সে আমি পারব না' বলে সে বেরিয়ে গেল।

পাশের ঘরের দরজা বন্ধ করার শব্দ হল। অপরূপা ঠোঁট কামড়ে দাঁড়িয়ে রইল কতক্ষণ।...

অমরনাথের হাওয়াকল

শতদ্রুর ঠাকুর্দা অমরনাথ সিংহের বিচিত্র সব বাতিক ছিল। জমিদারী আমলের শেষ জেল্লা তাঁর মধ্যেই দেখা গেছে। কৃষ্ণনাথ পেয়েছিলেন কিঞ্চিৎ ছাই মাত্র। অমরনাথের কাণ্ডকারখানার কোন মূল্য দেন নি তাই। কলকাতা ফিরে অমরনাথ আরও বড় জমিদার অর্থাৎ তথাকথিত রাজারাজড়া এবং সায়েবদের যা কিছু দেখতেন, বসন্তপুরে তার নকল করতে চাইতেন। বারোতেরো একর জমির ওপর কুঠিবাড়ির মত বিশাল বাড়ি, বিদেশি গাড়ি, বিদেশি গাছ ও লতাবিতান, ভাস্কর্য, সুইমিং পুল—তারপর একটা হাওয়াকল পর্যন্ত।

এ এলাকায় এই তাজ্জব জিনিসটি খুব নজর কেড়েছিল লোকের। দলবেঁধে বহু গ্রাম থেকে লোকেরা এসে সেটি দেখে অবাক হয়ে যেত। আসলে ফুলবাগান আর লতাবিতানে জলসেচের উদ্দেশ্য ছিল অমরনাথের। উত্তর-পশ্চিম রাঢ়ের এ মাটি গ্রীষ্মে শুকিয়ে খটখটে হয়ে যায়। দীঘিতে তলানি

পড়ে। পুকুরডোবায় পাঁক বেরিয়ে যায়। গভীর ইঁদারায় নল বসিয়ে চল্লিশফুট উঁচুতে টিনের চরকি লাগিয়ে হাওয়াকল বানিয়েছিলেন অমরনাথ। খরার সময় প্রচণ্ড বাতাসে সেই চরকি বনবন করে ঘুরত এবং ইঁদারা থেকে জল তুলে নলে ঢালার ব্যবস্থা করত। সুইমিং পুলটাও তাই ভর্তি থাকতে পারত বারোটা মাস। গাছপালায় জল সেচনের কাজটাও হত। এমন কী এক ফোয়ারাও ঝরঝরিয়ে জল ছড়াত চারপাশে। অমরনাথ জ্যোৎস্নারাতে ফোয়ারার কল খুলে বসে থাকতেন বাগানে।

১৯৪২ সালের আগস্টে ভয়ংকর ঝড়ে হাওয়াকল ভেঙে উড়ে গিয়েছিল। তখন অমরনাথের আর সেদিন নেই। ইঁদারাটা ছিল দক্ষিণপূর্ব কোণে—যার মাথায় ছিল ওই যন্তরমন্তর। কালক্রমে অব্যবহার্য হয়ে জলটা পচে যায়। তারপর শুকিয়ে যেতে থাকে। বাগানের ভাস্কর্য ঘিরে গজিয়ে ওঠে আগাছা। কিছু তুলে নিয়ে গিয়ে দালানের সামনের বারান্দায় এবং চওড়া সিঁড়ির দুপাশে রাখা হয়েছিল। উজ্জ্বলতা হারালে এবং টুটাফাটা হয়ে গেলে অনেকগুলো ফেলে দেওয়া হয়েছিল আঁস্তাকুড়ে। ইঁদারা ঘিরেও আগাছা জন্মেছিল। নষ্ট ভ্রষ্ট বাগানে আর যেতেন না অমরনাথ। পরবর্তীকালে বড়জোর সাধের সুইমিং পুলের ধারে অতিবৃদ্ধ পক্ককেশ মানুষটি নাতি-নাতনীকে নিয়ে বসে গল্প শোনাতেন কোন-কোন দিনাবসানে।

অমরনাথের আমলেই দুধের জন্য একপাল গরু পোষা হত। কৃষ্ণনাথের সময় তাদের সংখ্যা তিনে ঠেকেছিল। একবার একটা বাছুর হাওয়াকলের ইঁদারায় দৈবাৎ পড়ে যায়। তাকে অনেক কষ্টে ওঠানো হয়েছিল বটে, কিন্তু বেচারার কোমর ভেঙে যায়। সেই অবস্থায় সে অনেকদিন বেঁচে ছিল। কৃষ্ণনাথ তখনই বলেছিলেন, 'ইঁদারাটা বুজিয়ে দিতে হবে।'

কৃষ্ণনাথ নিশ্চয় সময় পাচ্ছিলেন না কন্ট্রাকটারির কাজের চাপে। গতবছর সময় পেয়ে ওটা বুজিয়ে সমতল করে দিয়েছেন। এই একবছরেই সেখানে ঘাস আর ভাঁটফুলের জঙ্গল গজিয়ে গেছে। চেনা যায় না যে কোন সময় ওখানে একটা ইঁদারা এবং তার মাথার ওপর একটা হাওয়াকল ছিল।

কলকাতা থেকে শ্যালক ব্রজেন্দ্রের ডাকে কৃষ্ণনাথ দুদিন আগে জিপে কলকাতা ছুটে গিয়েছিলেন। শতদ্রু আর বাড়ি ফিরবে না এবং ওখান থেকেই অ্যামেরিকা চলে যাবে শুনে কৃষ্ণনাথ মর্মাহত। তাঁর আদতে ইচ্ছাই ছিল না শতদ্রু আবার বিদেশে যাক। কিন্তু তাকে নিবৃত্ত করার ক্ষমতা বাবা হয়েও তাঁর নেই সেটা জানতেন। বরং যাবেই যখন, সঙ্গে বউ নিয়ে যাক। কিন্তু এবার ব্রজেন্দ্রও ভাগ্নেকে বশ মানাতে পারেন নি দেখে কৃষ্ণনাথ মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন। নিজের দুর্দান্ত রূপটি ফুটিয়ে তুলেছিলেন ছেলের সামনে। তাতে হিতে বিপরীত হয়ে গেছে। শতদ্রু বাবাকে মুখের ওপর বলে দিয়েছে, বসন্তপুরে আর কোনদিন সে যাবে না। এই জঘন্য দেশে থাকতেও তার আর একটুও ইচ্ছা নেই। অমন শান্তশিষ্ট অমায়িক প্রকৃতির ছেলে ছিল শতদ্রু! কৃষ্ণনাথ এর জন্য মনে মনে ব্রজেন্দ্রকেই দায়ী করেছেন। আশ্চর্য, ব্রজেন্দ্রের সামনে শতদ্রু বাবাকে একরকম অপমানই করল, ব্রজেন্দ্র চুপ করে থাকলেন। কৃষ্ণনাথ রাগ করে চলে এসেছেন কলকাতা থেকে।

তবে ব্রজেন্দ্রের সামনে ছেলেকে শুনিয়েও এসেছেন কড়া কথা। 'বদমাস ডাকু কালু মুখুয্যের কুচ্ছিত নাতনিকে বিয়ে করতে বাধা দিয়েছি বলেই তো? তুমি জানো ওদের বংশের কীর্তিকলাপ? কালু মুখুয্যে একটা খোঁড়া অসহায় মেয়েকে কোত্থেকে লুঠ করে এনে লুকিয়ে রেখেছিল জানো? শুনেছি সেটা খুব নীচু জাতের মেয়ে। তারই পেটের ছেলে ছিল গউর মুখুয্যে—আড়তে খাতা লিখত আর গাঁজা খেত। সেই গউরের মেয়েকে তোমার চোখে ধরল শেষপর্যন্ত—এত দেশবিদেশ ঘুরে এসে এই? ছি ছি ছি! ছিঃ!'

ছেলের কাছ থেকে ফিরে এসে কৃষ্ণনাথ শোনেন এবার মেয়ের কীর্তি। রাগে দুঃখে এবং কিছুটা আতংকেও কৃষ্ণনাথ ঝিমিয়ে পড়েছেন। কীর্তিই বটে। কিছুদিন আগে সন্ধ্যাবেলায় বাগানে বর্মীবাঁশের ঝাড়ে অজ্ঞান হয়ে মুখ গুঁজে পড়েছিল বিপাশা। তারপর থেকে তাকে জোর করে শুইয়ে রাখা হয়েছে। শমিতা সবসময় মেয়ের পাশে। গতরাতে তাঁর তন্দ্রামত এসেছে, হঠাৎ কেটে গেল বিপাশার কথায়। সে কার সঙ্গে কথা বলছে। টেবিল ল্যাম্প জ্বেলে দেখেন, বিপাশা দিব্যি তাকিয়ে আছে এবং তার

সামনে দাঁড়িয়ে আছে, এমন এক অদৃশ্য লোকের সঙ্গে কথা বলছে। তারপরই চমকে ওঠেন শমিতা। বিপাশা অনি নামে সেই সাংঘাতিক ছেলেটার সঙ্গে যেন কথা বলছে। স্পষ্ট বলছে, 'অনি! তুমি আর এস না। জানাজানি হয়ে যাবে।'

শমিতা ভীষণ ভয় পেয়ে যান। বিপাশাকে ডাকাডাকি করেন। ধাক্কা দেন। বিপাশা বিড়বিড় করে বলে, 'হাওয়াকলের কাছে! হাওয়াকলের কাছে আমি যাব না। আমার বড় ভয় করে হাওয়াকলেব কাছে যেতে।'

কৃষ্ণনাথ কাঠ হয়ে শুনছিলেন। শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বললেন, 'হাওয়াকল?'

'হ্যাঁ। তাই তো বলল।' শমিতা চাপাগলায় বললেন। 'তারপর মুখে জল ছেটালুম। ঠাণ্ডার মধ্যে টেবিলফ্যানটাও মাথার কাছে খুলে দিলুম। ডাক্তার যে ট্যাবলেটটা ফিটের সময় মুখে পুরে দিতে বলেছেন, তাও দিলুম। কিন্তু জ্ঞান হল না। তবে চোখ বুজল। মনে হল ঘুমোচ্ছে।'

কৃষ্ণনাথ গলার ভেতর ফের বললেন, 'হাওয়াকলের কথা বলছিল? আশ্চর্য তো!'

'তারপর শোন কী হল। এই দেখ, আমার হাত পা কাঁপছে!' শমিতা বললেন। 'তারপর আবার ঘুমিয়ে গেছি। হঠাৎ ঘুম ভেঙে দেখি, বিয়াস লেপ ছেড়ে উঠে আমার ওপর দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে যাচ্ছে। দুহাতে জড়িয়ে ধরে বললুম, কোথায় যাচ্ছিস? আমায় ধাক্কা মেরে খাটের নিচে নামল। আমি আরও শক্ত করে জড়িয়ে ধরলুম। তখন ধস্তাধস্তি করতে শুরু করল। আর কাঁদতে কাঁদতে কী বলল জানো?' শমিতা আরও গলা চেপে বললেন, 'আমি অনির কাছে যাব। ছেড়ে দাও, আমি অনির কাছে যাচ্ছি। হাওয়াকলের কাছে অনি আমার জন্য দাঁড়িয়ে আছে! আমায় ছেড়ে দাও!'

কৃষ্ণনাথ তাকালেন। ঠোঁট কামড়ে ধরলেন।

শমিতা বললেন, 'আমি কাপড়চোপড় সামলে উঠতে না উঠতে দরজা খুলে বেরিয়ে পড়েছে। তখন ভুলোদের ডাকলাম। সবাই ছুটে গেল সিঁড়ি বেয়ে। আমিও গেলুম। ও তখন দৌড়ুচ্ছে। খুব জ্যোৎস্না ছিল। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার দেখ, কেউ ওকে আটকাতে পারল না। গায়ে যেন অসম্ভব স্ট্রেংথ। একেবারে হাওয়াকলের ওখানে—মানে ইঁদারার জায়গায় আছাড় খেয়ে পড়ল। পড়ার সময় সে কী চিৎকার অনি বলে! সে-চিৎকার শুনলে মনে হবে, অন্য কেউ।'

'হুঁ। তারপর?'

'অজ্ঞান হয়ে গেল। কাঁটা-খোঁচে মুখ, গলা সব চিরে রক্তারক্তি। কাপড় ফালা-ফালা হয়ে গেছে। ধরাধরি করে তুলে আনা হল। তখন রাত তিনটে। ডাক্তার চ্যাটার্জিকে ফোন করলুম। ভদ্রলোক একটু পরেই এলেন। ওষুধ দিলেন। ব্যান্ডেজ করে দিয়ে গেলেন। বললেন, ইমিডিয়েটলি কলকাতায় নিয়ে যান কোনো সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে। আর ফেলে রাখবেন না। অবস্থা সিরিয়াস মনে হচ্ছে।'

কৃষ্ণনাথ ফের শুধু বললেন, 'হাওয়াকলের কাছে! তাহলে কি ও.. '

থামতে দেখে শমিতা বললেন, 'কী?'

'কিছু না। কী করছে এখন?'

'শুয়ে আছে। টেপরেকর্ডার চালিয়ে গান শুনছে।'

'স্বাভাবিক কথাবার্তা বলছে তো এখন?'

'বলছে। তবে কথা বলছে খুব কম।'

'খাওয়াদাওয়া?'

'খাচ্ছে, তবে বলছে মুখের স্বাদ নেই।'

'চলো, গিয়ে দেখছি।'

কিছুক্ষণ পরে পোশাক বদলে কৃষ্ণনাথ বিপাশার ঘরে গেলেন। শমিতা পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। টেপরেকর্ডারে বিদেশি অর্কেস্ট্রা বাজছে। জানালা দিয়ে দক্ষিণ থেকে রোদ এসে পড়েছে বিপাশার গায়ে। সে একটা চাদর বুক অব্দি ঢেকে শুয়ে আছে। মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে শিউরে উঠলেন কৃষ্ণনাথ। মাত্র দুতিনদিনেই বিপাশার চেহারা আরও মলিন হয়ে গেছে কেন? মুখের রঙ পাণ্ডুর।

চোখের তলায় কালি। কী এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে বাবাকে দেখেই চোখ নামাল। কৃষ্ণনাথ গিয়ে মাথায় হাত রেখে ডাকলেন, 'বিয়াস।'

বিপাশা একটু হেসে বলল, 'উঁ?

'কেমন বোধ করছ এখন?'

'তুমি কলকাতা গিয়েছিলে?

'হ্যাঁ।'

'দাদা এল না?'

কৃষ্ণনাথ একটু ইতস্তত করে বললেন, 'আসবে। ওর তো বসন্তপুরে কোনোদিন মন টেকে না। টিকবে কী করে? বরাবর মেট্রপলিসে মানুষ। তারপর অ্যামেরিকার মতো জায়গায়। এখন তো আর এদেশের কোনো মেট্রপলিসে মন টিকবে না।'

শমিতা বললেন, চল্। তুই-আমি কলকাতা যাই। দাদা রোজই তো ডাকছেন। তোকে অনেকদিন দেখেন নি। যাবি?'

বিপাশা আস্তে বলল, 'উঁহু। আমি কোথাও যাব না।'

শমিতা হেসে বললেন, 'সে কী! কেন রে?'

বিপাশা চুপ করে থাকল। কৃষ্ণনাথ বললেন, 'যাবে, যাবে। শরীরটা একটু দুর্বল তো। ওষুধ টষুধ খেয়ে গায়ে স্ট্রেন্থ হোক—তবে না।'

একটু পরে কৃষ্ণনাথ বেরিয়ে গেলেন। বিকেল নেমেছে। অমরনাথের সুইমিং পুলের কাছে কিছুক্ষণ আনমনে দাঁড়িয়ে থাকলেন। তারপর হাওয়াকলের ইঁদারার দিকটায় চোখ রাখলেন। হঠাৎ মাথার ভেতরটা প্রচণ্ড ক্রোধে উত্তপ্ত হয়ে উঠল। হনহন করে এগিয়ে গেলেন লুপ্ত ইঁদারার ঝোপের কাছে। একটা ভাটফুলের ঝোপের মাথা খামচে ধরলেন কৃষ্ণনাথ। পটপট করে ছিঁড়ে গেল একগুচ্ছ বন্য ফুল।

শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে কৃষ্ণনাথ চোখের দৃষ্টিতে জরিপ করছিলেন। বাড়ির দোতলায় পুবদক্ষিণ কোণে বিপাশার ঘর। জানলা থেকে এখানটা সরাসরি নজরে পড়ে। বিপাশা কি কিছু দেখেছিল তাহলে?

ভাটফুলগুলো ছুড়ে ফেলে দিলেন কৃষ্ণনাথ। তাঁর হঠাৎ কেমন গা ছমছম করতে থাকল। দ্রুত চলে এলেন ওখান থেকে। কিছুটা দূরে চৌকোনা পুকুরের ঘাটের মাথায় বাঁধানো জীর্ণ চত্বরে বসে পানজাবির পকেট থেকে সিগারেট বের করলেন। কিন্তু ধরাতে গিয়ে কিছুক্ষণের জন্য অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন।

কেঁচুয়া! কেঁচুয়া!

'অপু, অপু!'

অপরূপা হনহন করে ফিরে আসছিল ব্লক কোয়ার্টারে টিউশনি সেরে। মেজাজ ভাল নেই। সেই সময় নির্জন রাস্তায় কেউ পেছন থেকে চাপা গলায় ডাকলে। ঘুরে দেখল হরেন।

বটগাছের তলায় সে সাইকেল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মুখে মিটিমিটি হাসি। 'অপু কি রাগ করেছ আমার ওপর? আহা, শোনোই না।' সে হাত তুলে কাছে ডাকল।

অপরূপার বুকের ভেতর কী একটা কাঁপুনি। সে আস্তে বলল, 'বলো। আমার জরুরী কাজ আছে।'

'যা বাবা! তোমার হল কী বলো তো?' হরেন সাইকেল ঠেলে নিয়ে কাছে এল। 'টিউবটা এখানে এসেই পাংচার হয়ে গেল হঠাৎ। এক জায়গায় যাচ্ছিলুম। কী গেরো দেখ তো।'

অপরূপা বলল, 'সারিয়ে নাও গে।'

পায়ে হাঁটতে হাঁটতে হরেন বলল, 'আমি জানি তুমি রাগ করেছ। সেদিন ঝোঁকের মাথায় হয়তো একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছি।'

অপরূপা কোনো কথা বলল না।

হরেন বলল, 'ক্ষমা চাইতে যেতুম তোমার কাছে। সাহস হচ্ছিল না। তুমি এডুকেটেড মেয়ে, আমি স্কুলফাইন্যাল।' সে হাসতে লাগল। 'আমার এসব বাড়াবাড়ি সাজে না। তাই না?'

অপরূপা হেসে ফেলল ওর কথার ভংগিতে। বলল, 'সাইকেল সারিয়ে নিয়ে যেখানে যাচ্ছিলে যাও। আমি চলি।'

হরেন বলল, 'শোন অপু, সাধুবাবু ফিরেছেন অ্যাদ্দিনে। ওনাকে তোমার কথা বলেছি।'

অপরূপা তাকাল তার মুখের দিকে। মুহূর্তে তার মনের সব জ্বালা একপাশে সরে গেল। বলল, 'কী বললেন?'

'বললেন ভালই।' হরেন গাম্ভীর্য নিয়ে বলল। 'বুঝতেই পারছ অপু, তোমার ব্যাপারটা সব সময় আমি ভাবি। এ অবস্থায় কীভাবে তোমরা দুটি বোন বেঁচে আছ, ভাবতে আমার খুব কষ্ট হয়। ঘরদোরের অবস্থাও তো ওই। কখন...'

কথা সেরে অপরূপা বলল, 'কী বললেন সাধুবাবু?'

হরেন একটু হাসল। 'বহরমপুরের অফিসে, নয়তো কলকাতার অফিসে—যেখানে হোক, মনে হচ্ছে হয়ে যাবে। দেশজোড়া ট্রান্সপোর্টের কারবার তো। শিগগির হয়ে যাবে। আমি চেষ্টায় রইলুম।'

'আমি বরং গিয়ে দেখা করি সাধুবাবুকে। কী বলো?' অপরূপা আগ্রহে বলল।

হরেন বলল, 'আরও একটু এগোতে দাও আমায়। বুঝলে না? কোটিপতি লোক। কখন মেজাজ কেমন থাকে। সময় হলে আমিই নিয়ে যাব তোমাকে।'

বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলায় দুলতে দুলতে অপরূপা বলল, 'যাঃ! সব তোমার চালাকি!'

হরেন দাঁড়িয়ে গেল। অভিমান দেখিয়ে বলল, 'এতটুকুন বেলা থেকে তোমায় আমি দেখছি। তুমিও আমায় দেখছ। আমাদের অবস্থা না হয় এখন পড়ে গেছে—তোমাদেরও গেছে। কিন্তু এত সত্ত্বেও কি কখনও তঞ্চকতা করতে দেখেছ আমাকে? সৎভাবে থেকে দুটো পয়সা রোজগার করি। কারুর হরে-হম্মে খাই নে। তাহলে তো কবে আঙুল ফুলে কলাগাছ হত।'

এসব শোনার পর অপরূপা ওর কথায় অবিশ্বাস করবে কোন যুক্তিতে? মিষ্টি হেসে বলল, 'হয়েছে বাবা, হয়েছে! আমি কি তাই বলেছি?'

হরেন বলল, 'অপু! বিকেলে এসো না! আমাদের অফিসের সামনে এসে একটু দাঁড়াবে। আজ দুজনে সার্কাস...'

'সার্কাস এসেছে শুনেছি।' অপরূপা ঈষৎ দুঃখিতভাবে বলল। 'রনি দেখতে চাইছিল। তো ঠাকুমার যা অবস্থা!'

'কী হয়েছে গো ওনার?'

হরেনের কথার মধ্যে স্নেহ ছিল। অপরূপার ভাল লাগল। বলল, 'প্যারালেসিস মনে হচ্ছে। মুখটা বেঁকে গেছে। কথা বলতে পারছে না।'

'কাকে দেখাচ্ছ?'

'দেখানো হয় নি। ভাবছি।'

'ভাবছ?' হরেন প্রায় তেড়ে এল। 'তোমরা কী বলো তো অপু? আমায় জানাবে তো? গউরকাকা আমার আপন কাকার মতো ছিলেন। ছ্যা ছ্যা, বলতে হয় আগে। রতুজ্যাঠাকে কবে ধরে নিয়ে আসতুম।'

হরেন যখন সাইকেলের চাকার লিক না সারিয়ে তক্ষুনি অপরূপাদের বাড়ি চলে এল, অপরূপার সংশয়টুকু চলে গেল তার ওপর থেকে। গৌরীমোহন বেঁচে থাকতে হরেন কয়েকবার নানা কাজে এ বাড়ি এসেছে। বাড়ি ঢুকে চারপাশে তাকিয়ে সে খুব আফসোস করল। এ কী অবস্থা হয়েছে বাড়িটার! কুড়ানি ঠাকরুন বারান্দার থামে পিঠ দিয়ে বসেছিলেন। সে কাছে বসে খুব কথা বলতে থাকল তাঁর সঙ্গে।

রঙ্গনা ইঁদারাতলায় কাপড় কাচছিল। সে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

অপরূপা হরেনকে ঠাকুমার বাঁকাশ্রীরামপুর যাওয়ার পুরো ঘটনাটা জানাল। শুনে হরেন রাগ

দেখিয়ে বলল, 'সেই গাঁজাখোর রাস্কেলটা? সে তো বসন্তপুরেই আছে। তোমায় বলেছিলুম না? তারপর তো আর কিছু জানালে না। কালও দেখেছি ওকে। থামো, হীনুকে দিয়ে ওকে রামপেঁদান পেঁদাচ্ছি!'

অপরূপা বলল, 'না না। যা হবার হয়েছে হরেনদা। ভুলটা তো আমাদেরই।'

রঙ্গনা ইঁদারাতলা থেকে বলল, 'মধুরবাবু এসেছিল হরেনদা।'

হরেন লাফিয়ে উঠল। 'এসেছিল? কখন?'

অপরূপাও বলল, 'কখন রে?'

রঙ্গনা হাসতে হাসতে বলল, 'একটু আগে এসে বললে কী জানো? ঠাকুমা মিথ্যে বলেছে। ফেলে পালায় নি—আসলে নাকি ঠাকুমাই তাকে কী কথায় গালমন্দ করেছিল। এইসব আবোল-তাবোল!'

অপরূপা ঠাকুমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'ঠাকুমা! তুমি ওকে লাঠিপেটা করলে না? আর রনি, তুই বা ওকে বাড়ি ঢুকতে দিলি কেন?'

কুড়ানি ঠাকরুন ভুরু কুঁচকে মাটির দিকে তাকিয়ে রইলেন। রঙ্গনা বলল, 'দরজা খুলতেই দৌড়ে গিয়ে ঠাকুমার পা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল।'

'ঢঙ!' অপরূপা বাঁকা মুখে বলল। 'আমি থাকলে মজা দেখিয়ে দিতুম।'

হরেন বলল, 'ঠাকুমার চিকিৎসার দায়িত্ব আমার। এক্ষুনি রতুজ্যাঠাকে ধরে আনছি।'

অপরূপা আস্তে বলল, 'হরেনদা, আমার কাছে ততকিছু টাকাপয়সা নেই যে। বরং হোমিওপ্যাথি ওষুধের ব্যবস্থা করব।'

হরেন বলল, 'ধুর ধুর! ওসব ছাড়ো তো! আমি এক্ষুনি আসছি।'

সে সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে গেলে অপরূপা বলল, 'হ্যাঁ রে রনি! সেদিন পড়াতে গিয়ে সুষমাদিকে কী এমন বলেছিস বল্ তো—রোজ আমায় কথা শোনাচ্ছে।'

রঙ্গনা একটু ভয় পেয়ে বলল, 'কী বলব? কিছুই তো বলিনি ওকে।'

'বলিস নি তুই ভাল ইংরিজি পড়াতে পারিস? আমি নাকি ইংরিজিতে বরাবর কাঁচা। বলিস নি এসব?'

রঙ্গনা চোখ বড় করে বলল, 'এ রাম! তাই বলছে বুঝি?'

'বলেছিস, তাই বলছে।' অপরূপা অন্যদিকে ঘুরে ফের বলল, 'তোর টিউশনির ইচ্ছে থাকে তো কর। আমি তো তোকে বরাবর বলি। চুপচাপ না বসে থেকে টিউশনিই কর। পয়সা পাবি। নিজের জামাকাপড়টা হবে। করবি?'

'দিদি! বিশ্বাস কর, ওঁকে কিচ্ছু বলিনি এসব।' রঙ্গনা প্রায় কেঁদে ফেলল।

'ভ্যাঁ করিস নে তো! কান্নাকাটি আমার খারাপ লাগে।' অপরূপা কাপড় বদলাতে ঘরে ঢুকে আবার বেরিয়ে এল। ডাক্তার আসবে। সে ফের বলল, 'পরদিন গিয়েই বুঝেছিলুম একটা কিছু হয়েছে। আমার ভুল ধরতে শুরু করল সুষমাদি। ভুল করছি না—অথচ বলছে, না ওটা কারেক্ট নয়। তারপর থেকে রোজ শোনাচ্ছে, পড়াশোনা ভাল হচ্ছে না। ক্লাসটিচার বকাবকি করছে। হোমটাস্কে ভুল থাকে নাকি। আসলে আমাকে ছাড়িয়ে দিতে চায়। অথচ কথাবার্তা শুনে এও বুঝতে পারি, তোকে ওর খুব পছন্দ। শতমুখে তোর প্রশংসা।'

রঙ্গনা কাপড়গুলো নিঙড়ে উঠোনের তারে মেলে দিচ্ছিল। কোনো কথা বলল না।

'তুই করবি ওখানে টিউশনি? আমি বরং আরেকজায়গায় দেখে নেব।'

রঙ্গনা বেশ বোঝে, দিদি তার মনোভাব জানতে টোপ ফেলল। সে বলল 'না।'

'অন্য কোথাও?'

'বকবক করতে আমার ভাল লাগে না।'

এবার অপরূপা হাসল একটু। 'হ্যাঁ রে, সংসার চলবে কী করে তাহলে? দুজনে টিউশনি করলে কতগুলো টাকা মাসে ঘরে আসে বল। হরেনদা এলে ওকে বলি, তোকে কোথাও একটা টিউশনি দেখে দিক।'

রঙ্গনা গোঁ ধরে বলল 'না। ওসব আমার দ্বারা হবে না।'

'তা হবে কেন? তোর কত ব্রাইট ফিউচার! সায়েবসুবো বর তোর জন্য ওয়েট করছে। জেটপ্লেনে তুলে নিয়ে চলে যাবে।' অপরূপা খিলখিল করে হাসতে লাগল। 'আর তুই মেমসায়েব হয়ে যাবি। তাই না?'

রঙ্গনা উঠোন থেকে দিদির হাসিটা দেখল। অশ্লীল বিকৃত এক হাসি। সে ফোঁস করে শ্বাস ফেলে খিড়কির দরজার দিকে চলে গেল। জীবনে এই প্রথম তার সংশয় জাগল, দিদি কি তাকে ঈর্ষা করে?

কিছুক্ষণ পরে হরেন এল রতুডাক্তারকে নিয়ে। রতিকান্তও হরেনের মতো বাড়ির অবস্থা দেখে একটু পস্তালেন। তারপর কুড়ানি ঠাকরুনের সামনে যেতেই উনি থামের দিকে ঘুরে আক্রান্ত কোণঠাসা জন্তুর মতো গোঙিয়ে উঠলেন, 'নাঁ নাঁ নাঁ।'

অপরূপা জোর করে ঠাকুমাকে ঘোরাল ডাক্তারবাবুর দিকে। কিন্তু বৃদ্ধার ছটফটানি বন্ধ হল না। অপরূপা প্রথমে হাসছিল। পরে রেগে গেল। হরেন সুদ্ধু কুড়ানি ঠাকরুনকে চেপে ধরল থামটার সঙ্গে। রতু ডাক্তার খিক খিক করে হেসে বললেন, 'গউরের মা যে ওষুধ টষুধ খায় না, তা জানি বলেই না তোকে বললুম হরেন, বৃথা চেষ্টা?'

ক্রুদ্ধ অপরূপা বলল, 'ইঞ্জেকশান দিন ডাক্তারজ্যাঠা। ছটফটানি কমবে। আদিখ্যেতা! নিজে ভুগবে, আমাদেরও ভুগিয়ে ছাড়বে।'

ইঞ্জেকশান শুনেই কুড়ানি ঠাকরুন গোঁ গোঁ করে আরেকদফা ধস্তাধস্তি করে ফেললেন। রতিকান্ত সত্যি ইঞ্জেকশানের সিরিঞ্জ বের করে বললেন, 'একটুখানি জল চাই যে গো! হবে নাকি!'

অপরূপা রঙ্গনাকে ডাকতে থাকল। কিন্তু রঙ্গনার সাড়া নেই। হরেন বলল, 'তুমি করে নিয়ে এস। আমি ধরে থাকছি ঠাকুমাকে।'

অপরূপা রান্নাঘরের দিকে দৌড়ুল। এবার বৃদ্ধা দুর্বোধ্য শব্দে হরেনের দিকে চোখ কটমটিয়ে কী সব বলতে লাগলেন। হরেন বুঝতে পারছিল, যাচ্ছেতাই গাল দিচ্ছেন কুড়ানি ঠাকরুন। কিন্তু সে দাঁত বের করে হাসিমুখে বলল, যত শাপই দিন ঠাকুমা, এ বাবা যমের হাতে পড়েছেন। আর ছাড়াছাড়ি নেই। আপনাকে সিধে না করে হরেন যাচ্ছে না।'

রতু ডাক্তার বারান্দায় ভাঙা চেয়ারে বসে ঘরদোরের অবস্থা দেখছিলেন। চাপা গলায় হরেনকে বললেন, 'কালু মুখুয্যের নামে একসময়, বুঝলি হন্না, বাঘেগরুতে একঘাটে জল খেত। একেই বলে মহাকাল! তুই এদের হিসট্রি কিছু জানিস নিশ্চয়। আমাদের ছোটবেলায়...' হঠাৎ থেমে গিয়ে দেখলেন বৃদ্ধা শান্তভাবে তার দিকে তাকিয়ে আছেন। তাই বললেন, 'কিছু বলবেন মা? কষ্ট হচ্ছে বুঝি? এক মিনিট সহ্য করুন—সব ঠিক হয়ে যাবে।'

বৃদ্ধা কী একটা বললেন, বুঝতে পারলেন না। 'কী বলছেন রে হন্না, বুঝতে পারছিস?' রতু ডাক্তার জিগ্যেস করলেন।

হরেন অনুমান করে বলল, হয়তো বাঁকা-শ্রীরামপুরের কথা জিগ্যেস করছেন। ওনার বাপের বাড়ি নাকি সেখানে। বিয়ের পর আর যান নি। কিন্তু আমার বড্ড অবাক লাগছে ডাক্তারজ্যাঠা! বাপের দেশ কোথায় তা ভুলে গেছেন, এমন কী করে হয়? অপুর কথাটা মাথায় ঢুকল না।'

রতু ডাক্তার রহস্যময় হেসে বললেন, 'হয়, হয়। হিসট্রিটা তো তুই জানিস নে হন্না! তাই বলছিস। তোকে বলব'খন।'

হরেন হাসল। 'কিন্তু জায়গাটা কোথায়? শুনেছি বলে মনে হচ্ছে!'

ডাক্তারবাবু বললেন, 'ওই তো মনিগ্রামের আগের স্টেশন বদ্যিপুর—সেখান থেকে মাইল তিনেক হবে। আগে স্টেশনের নাম ছিল নাকি কেঁচুয়া। লাইনের পাশেই ছিল হাড়িদের একটা ছোট্ট গাঁ। পরে নাম হয়েছে বদ্যিপুর। বেশ বড় গ্রাম। বদ্যিপুরে আমার মেজ মেয়ের শ্বশুরবাড়ি না? এখন অবশ্যি ওরা ভাগলপুরে আছে।'

বৃদ্ধা কান খাড়া করে শুনছিলেন। এবার বুক ফেটে কেঁদে উঠলেন। হরেন সান্ত্বনা দিয়ে বলল, 'কাঁদবেন না ঠাকুমা! আমি আপনাকে বাঁকাশ্রীরামপুর নিয়ে যাব।'

এর পর কুড়ানি ঠাকরুন শান্ত মেয়েটি হয়ে চোখ বুজে ইনজেকশান নিলেন। তার সারাশরীর অবশ্য থরথর করে কাঁপছিল। চোখ বুজে ফেলেছিলেন। রতুডাক্তারকে হরেন বিদায় করে এসে বলল, 'ওষুধ আনবে কে? এতক্ষণে আমার সাইকেল রেডি হয়ে গেছে। আর তো ফাঁকি দেওয়া যাবে না অপু। মালিকের কাজে যেখানে যাচ্ছিলুম যেতে হবে।'

অপরূপা বলল, 'রনিকে পাঠাচ্ছি। কৈ প্রেসক্রিপশন দাও।'

হরেন প্রেসক্রিপশনের সঙ্গে একটা দশটাকার নোট দিয়ে বলল, 'এতেই হয়ে যাবে। যদি লাগে, বাকি রেখে এস আমার নাম করে। নাও, হেজিটেট করো না। আমায় আপনজন ধরে নাও না।'

অপরূপা টাকাটা নিতে আর আপত্তি করল না। হরেন যাবার সময় বিকেলে সার্কাসের কথাটা ইশারায় মনে করিয়ে দিয়ে চলে গেল।

অপরূপা কিছুক্ষণের জন্য অন্যমনস্ক রইল। কুড়ানি ঠাকরুন বারান্দার মেঝেতে একপাশে কাত হয়ে পড়ে আছেন। রঙ্গনা এসে চমকে উঠল। তারপর পাশে বসে ডাকাডাকি করতেই বৃদ্ধা চোখ খুলে কী একটা বললেন। রঙ্গনা অবাক হয়ে গেল। ঠাকুমা কেমন যেন হাসছেন।

রঙ্গনা তাঁকে তুলে বসিয়ে দিয়ে ভয়ে-ভয়ে বলল, 'দিদি! দ্যাখ্, ঠাকুমা হাসছেন কেন?'

অপরূপা বলল, 'বলেছি না ঢঙ? লোকের সামনে এমন করে যে প্রেসটিজ পর্যন্ত থাকে না।'

কুড়ানি ঠাকরুন রঙ্গনার এক কাঁধে হাত রেখে হাঁউ মাঁউ করে বলে উঠলেন, 'কেঁচুয়া! কেঁচুয়া!'

রঙ্গনা আরও চমকে উঠে বলল, 'দিদি! ঠাকুমা কী বলছে!'

'ওই যে রতুডাক্তার ওকে বাপের বাড়ির হদিস দিয়ে গেল এতদিনে।' অপরূপা বলতে বলতে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল। কাপড় ছাড়তে ছাড়তে ফের বলল, 'কেঁচুয়া না ফেঁচুয়া—কী একটা স্টেশন ছিল। এখন হয়েছে নাকি বদ্যিপুর। মনিগ্রামের আগের স্টেশন। সেখানে নেমে বাঁকাশ্রীরামপুর না ধাদ্ধাড়া-গোবিন্দপুর—সেখানে যেতে হয়।'

রঙ্গনা উত্তেজিতভাবে বলল, 'ইস্! আমরা কেন রতুবাবুকে জিগ্যেস করিনি রে দিদি?'

এতদিনে কুড়ানি ঠাকরুন দীর্ঘ এক আচ্ছন্নতা কাটিয়ে যেন জেগে উঠলেন। তাঁকে চঞ্চলা বালিকা বলে ভ্রম হচ্ছিল। রান্নাঘরে গিয়ে রাঁধতে হাত লাগালেন। সারা দুপুর আপন মনে বিকৃত স্বরে অনর্গল কথা বলতে থাকলেন। কাঠের সিন্দুক, বাকসো-প্যাঁটরা হাতড়ালেন। বিকেলে পেনী এলে তাকে দিয়ে জল আনিয়ে গাছ-লতাবিতানের গোড়ায় নিজের হাতে জল সেচন করলেন।

রঙ্গনা ওষুধ এনে দিয়েছিল। কিন্তু ওষুধটা খাওয়ানো যায় নি। রাগ করে দুইবোন একসুরে বলেছিল, 'চলো—তোমায় বাপের বাড়ি রেখে আসি।' অর্থাৎ তাঁর দায়িত্ব আর তারা বইবে না।

বিকেলে অনেক দোনামনার পর অপরূপা সেজেগুজে বেরিয়ে গেল। তখন রঙ্গনা সুযোগ পেল। মধুরবাবুর বইটা বের করল গুটিয়ে রাখা লেপতোষকের তলা থেকে। বইটা তখন ভাল করে খুলেও দেখে নি। ঠাকুমাকে সেধে আধুলি যোগাড় করে দিয়েছিল মধুরবাবুকে। বলে গেছেন, 'আরও একটা আধুলি পাওনা রইল।' এখন বইটা খুলে দেখে 'স্টোরিজ ফ্রম দি অ্যারাবিয়ান নাইটস।' লনডন থেকে টমাস নেলসন অ্যান্ড সনসের প্রকাশিত। ১৯১২ সালে ছাপানো। টাইটেল পেজে লেখা আছে 'ইনক্লুডিং সিন্দবাদ দি সেলর অ্যান্ড দি স্টোরি অফ আলাদিন।' তারপরের পাতা উল্টেই সে চমকে উঠল।

বইয়ের মালিকের নাম লেখা আছে। দিস বুক বিলংস টু মাস্টার আশুতোষ সান্যাল। রঙ্গনা খুব বিব্রত বোধ করছিল। মধুমিতার বাবা। মধুমিতাই তার সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল। গত বছর বিয়ে হয়ে জামসেদপুরে আছে। আশুবাবু স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। এখন অবসর নিয়েছেন। লম্বা রোগা মানুষ। খুব বদরাগী। রঙ্গনা ভেবে পেল না ওদের বাড়ি থেকে কীভাবে বইটা চুরি করল মধুরবাবু!

সে ডটপেন বুলিয়ে নামটা ঢেকে দিল ভাল করে। পাতাটা ছিঁড়তে মায়া হল। কিছুক্ষণ আনমনা হয়ে রইল রঙ্গনা। ছোটবেলায় কতসব ভাল-ভাল বই পায় কত লোকে। চুরির বই তো নয়—কিনে দেয় বাবা কিংবা কোনো স্নেহময় আত্মীয়। তাকে কেউ কোনোদিন বই কিনে দেয় নি। সে বইটার গন্ধ

শুঁকে দুঃখটা আরও তীব্রভাবে অনুভব করতে থাকল। তারপর উঠোনের দিকে তাকাতে চোখে পড়ল, কুড়ানি ঠাকরুনের কাপড় খুলে গেছে কোমর থেকে। প্রায় উলঙ্গ অবস্থায় পা ঘষটে চলার চেষ্টা করছেন। সে দৌড়ে গিয়ে বলল, 'এ কী ঠাকুমা! এ রাম!'

জানালার নিচে একটা লোক

বিপাশা বালিশে হেলান দিয়ে বসে আছে উঁচু বেডে। শতদ্রু পাশে জানলার কাছে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল। 'কতকটা বসন্তপুরে আমাদের বাড়ির মত পরিবেশ, তাই না বিয়াস? রেলিংয়ের ওধারে একটা পুকুর পর্যন্ত।'

বিপাশা বলল, 'ওটা পাবলিক পার্ক। তুই এদিকে আসিস নি কখনও?'

'না।' শতদ্রু হাসল। 'দরকার হয়নি। আমার তো তোর মত অসুখ হয় নি!'

'বাজে কথা বলিস নে দাদা! আমার কোন অসুখ হয় নি।'

শতদ্রু সতর্ক হল। বলল, 'ইস! কত ক্রিসেন্থিমাম ফুটিয়েছে দেখছিস? তুই লাকি বিয়াস।'

বিপাশা হাতে একটা ছোট্ট রুমাল নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে বলল, 'কেন চলে যাচ্ছিস?'

'উঁ? শতদ্রু তাকাল। তারপর বুঝতে পেরে বলল, 'তাই তো কথা ছিল। তোদের দেখতে আসব। কিছুদিন থাকব। উইন্টার সিজন ততদিনে চলে যাবে। বরফ গলবে। তখন ফিরব।'

'ফেব্রুয়ারি বুঝি উইন্টার সিজন না?'

শতদ্রু চোখ নাচিয়ে বলল, 'আরবানা হিলসে স্নোর ওপর এখন দারুণ স্কেটিং করা যায়। তার ওপর স্কিইং। এখন তো স্কিইং সিজন। জানিস? গত শীতে আমরা ক'জন মিলে কলোরাডো গিয়েছিলুম। রকি মাউন্টেন এলাকায় ভেইল নামে একটা জায়গা আছে। চৌদ্দ হাজার ফুট উঁচুতে সেখানে স্কি সেন্টার। ইউরোপ থেকেও সেখানে লোকেরা স্কি করতে যায়। ছবিতে তো দেখেছিস ব্যাপারটা। দেখিস নি?'

বিপাশা মাথাটা একটু দোলাল। তারপর রুমালটা ভাঁজ করে বলল, 'রঙ্গনাকে তোর পছন্দ হয়েছিল—আমি সেই সন্ধ্যাবেলাতেই বুঝতে পেরেছিলুম। তারপর বেড়াতে গিয়ে কতক্ষণ তুই রঙ্গনার কথা বলছিলি।'

শতদ্রু চমকে গিয়েছিল। বলল, 'হঠাৎ ওকথা কেন রে?'

'তুই তো রঙ্গনার ব্যাপারেই রাগ করে চলে যাচ্ছিস!'

শতদ্রু হাসতে হাসতে বলল, 'যাঃ! কী যে বলিস!'

'অপুদার কাছে শুনলুম, তুই নাকি একটা ব্যালেট্রুপের সঙ্গে জাপান হয়ে ফিরবি।' বিপাশা রুগ্ণ মুখে একটু হাসল। 'অপুদা বলছিল, ট্রুপের একটা মেয়েকে তোর পছন্দ হয়েছে। তাকে কি বিয়ে করবি নাকি?'

শতদ্রু বলল, 'অপুটা স্কাউন্ড্রেল!'

'মেয়েটাকে ওবেলা নিয়ে আসবে অপুদা।'

'মাই গুডনেস!' শতদ্রু চমকানোর ভংগি করল। 'অপু তুই কি আমার গার্জেন হয়েছিস শেষঅব্দি?'

বিপাশা রুমালের ভাঁজ এলোমেলো করে দিয়ে বলল, 'জানিস দাদা? পরে ভেবে দেখেছি—রঙ্গনাকেই তোর বিয়ে করা ভাল। বাবা-মায়ের কথা শুনিস নে। ওকে বিয়ে করে নিয়ে তুই চলে যা।'

'বিয়াস! প্লীজ ওসব কথা থাক্।'

বিপাশার দুচোখে আগ্রহ ফুটে উঠল। বলল, 'রঙ্গনাকে আমি ছোটবেলা থেকে ভীষণ ভালবাসি—মুখে যাই বলি না কেন। ও এলে আমার খুব ভাল লাগত বরাবর। তুই আসার পর কী হল, ও আসা বন্ধ করল। তুই জানিস নে ও কী অসাধারণ মেরিটোরিয়াস স্টুডেন্ট ছিল। টাকার অভাবে পড়াশুনো হল না।'

'অত বেশি কথা বললে টায়ার্ড হয়ে পড়বি বিয়াস!'

বিপাশা গ্রাহ্য করল না। বলল, 'অপরূপাকে আমি লিখছি বরং। আজই লিখছি। সেই তো এখন গার্জেন!'

শতদ্রু অপরূপাকে চিঠি লিখেছিল। কিন্তু কথাটা বলল না। চোখ পাকিয়ে বলল, 'তুই চুপ করবি?' শতদ্রু অবশ্য হাসছিল।

বিপাশা বলল, 'দাদা। আর বোধ হয় আমার চুপ করে থাকা উচিত নয় রে। বসন্তপুরে থেকেই তোকে একটা চিঠি লেখার কথা ভেবেছিলুম। রাগ করে লিখিনি—তুই বসন্তপুরে যাবি না শুনে। মামাবাবুদের ওখানে এসে তোকে কিছু বলার সুযোগ পাইনি। আয়, এখানে বস।'

শতদ্রু ওর বেডে বসে মিটিমিটি হেসে বলল, 'বসলুম। বল্।'

'দাদা, তুই রঙ্গনাকে বিয়ে কর্।'

শতদ্রু কৌতুকের ভংগিতে বলল, 'বেশ, করা যাবে। কিন্তু ওর গার্জেন যদি রাজি না হয়? ওরা তো গ্রামের বামুন। কায়েতের ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবে কেন?'

'বাজে কথা। অপরূপা বর্তে যাবে—আমি জানি।'

শতদ্রু মাথা নেড়ে বলল, 'তুই কিছুই জানিস নে। বসন্তপুর কলকাতা নয়।'

বিপাশা একটু চুপ করে থাকার পর বলল, 'আমার শরীরটার যে ছাই কী হয়েছে। খালি মাথা ঘোরে। আগের মত হলে আমিই সব করতুম।' বলে সে হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠল। শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে ফের বলে উঠল, 'রঙ্গনাকে তুই বিয়ে করলে অনির আত্মা শান্তি পেত। অনি রঙ্গনাকে অপরূপার চেয়ে বেশি ভালবাসত। রঙ্গনার জন্য কত গর্ব ছিল অনির। আমি সব জানি। রঙ্গনা যেবার স্কুলফাইনালে স্ট্যান্ড করল...'

শতদ্রু অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিল। এবার কথা কেড়ে বলল, 'কী বললি? অনির আত্মা না কী যেন?'

'হ্যাঁ।'

'সে তো বেঁচে আছে বলেছিলি। অ্যাবস্কন্ডার হয়ে লুকিয়ে বেড়াচ্ছে বলেছিলি।'

বিপাশা আস্তে বলল, 'নেই।'

'সে কী!'

বিপাশা নিষ্পলক দৃষ্টে তাকিয়ে কাছে জানলার দিকে। বলল, 'আমিও কি জানতুম? আমাদের বাগানে দাদুর হাওয়াকলটা ছিল মনে আছে তোর?'

'হ্যাঁ। ইঁদারার মাথায় ছিল মনে পড়ছে।'

'গত বছর অক্টোবরে পুজোর পর অনেক রাতে ঘুম ভেঙে গেল। কারেন্ট ছিল না। ভীষণ গুমোট। জানলার ধারে বসলুম। তখন দেখি হাওয়াকলের ওখানে টর্চ জ্বলল। জ্যোৎস্না ছিল। অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছিল কারা কী করছে ওখানে। ভাবলুম মাকে ডাকি। কিন্তু আবার টর্চ জ্বালতেই বাবাকে দেখতে পেলুম। একটু পরে ওরা চলে এল। ভাবলুম চোর-ডাকাত এসেছিল হয়ত—খুঁজে বেড়াচ্ছে সেবারকার মত। তারপর সকালে উঠে দেখি, ইঁদারাটা বোজানো হচ্ছে।'...বিপাশা ক্লান্তভাবে চুপ করল।

শতদ্রু বলল, 'তার সঙ্গে অনির কী সম্পর্ক?'

'বিকেলে রোজকার মত বেড়াতে বেরিয়েছি।' বিপাশা ফিসফিস করে বলতে থাকল। 'তখন বাগানে প্রচণ্ড ঘাস। বর্মী বাঁশের ঝোপটার পাশে ঘাসের ওপর খানকটা রক্ত দেখতে পেলুম, জানিস?'

শতদ্রু চমকে উঠল। 'বলিস কী!'

'জমাট বাঁধা রক্ত। কালো হয়ে গেছে। কিন্তু ওগুলো রক্ত।'

শতদ্রু শ্বাস ছেড়ে বলল, 'তুই কাকেও জিগ্যেস করলি নে?'

'ভুলোদাকে জিগ্যেস করেছিলুম। বলল, মুসলমান মজুর এসেছিল ইঁদারা বোজাতে। তারাই মুর্গি কেটে রান্নাবান্না করেছে।' বিপাশা আবার চুপ করে রইল কিছুক্ষণ।

শতদ্রু উদ্বিগ্ন হয়ে লক্ষ্য করল বিপাশার চোখের কোনায় জল জমেছে। সে বলল, 'কিন্তু তুই কি ভাবলি রঙ্গনার দাদাকে মার্ডার করে পুঁতে দিয়েছে?'

মাথাটা দোলাল বিপাশা।

'অসম্ভব। ও তোর মিথ্যা সন্দেহ!'

'বাবা সব পারেন! বাবার কাছে তো তুই কম থেকেছিস। আমি জানি বাবাকে।' বিপাশা ধরা গলায় বলল। 'অনি বাবাকে শাসিয়েছিল। একবার নাকি কোথায় বাবার জিপ লক্ষ্য করে বোম মেরেছিল।'

'হতে পারে। কিন্তু তাতে কিছু প্রমাণ হয় না।'

বিপাশা কাঁপা-কাঁপা হাতে রুমালটা তুলে চোখের কোনা মুছে শান্তভাবে বলল, 'কিছুদিন আগে—তুই তখন এখানে আছিস, আমি বাগানে বেড়াচ্ছি, ভুলোদা গেল। তখন হঠাৎ কথাটা মনে এল। আসলে আমার সন্দেহটা ছিলই। ভুলোদাকে চেপে ধরতেই সব বলে দিল।'

'কী বলল?'

'অনি সন্ধ্যাবেলা পাঁচিল ডিঙিয়ে ঢুকেছিল। বাহাদুরকে নাকি ড্যাগার মারতে গিয়েছিল। তখন বাহাদুর কুকরি ছুঁড়ে মারে। অনি মারা যায়। তখন...'

বিপাশা বিছানার ওপর পড়ে গেল হঠাৎ। হাত দুটো মুঠো করে দুপাশে ছুড়তে থাকল সে। শরীরটা বেঁকে গেল। পা দুটোও ছুড়তে থাকল। শতদ্রু ওকে চেপে ধরে চিৎকার করে উঠল, 'সিস্টার! সিস্টার!' দুজন নার্স এল ঘরে। শতদ্রু-কে বাইরে যেতে অনুরোধ করল তারা।

একটু পরে ডাক্তার গোবিন্দ চৌধুরী শতদ্রুর পাশ কাটিয়ে ঢুকলেন। শতদ্রু দরজার পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে রইল। ভেতরে বিপাশার চিৎকার শোনা যাচ্ছিল, 'ছেড়ে দাও! আমি অনির কাছে যাব—আমায় ছেড়ে দাও!'

আস্তে আস্তে বিপাশার কণ্ঠস্বর মিইয়ে যেতে থাকল। ডাঃ চৌধুরী বেরিয়ে এসে চুপচাপ শতদ্রুর একটা হাত ধরে নিয়ে তার চেম্বারে নিয়ে গেলেন। মুখোমুখি বসে একটু হাসলেন। 'এ ভেরি পিকিউলিয়ার কেস মিঃ সিনহা! তবে আমার কাছে নতুন কিছু নয়। মেলানকলিয়া অ্যাট দা ফার্স্ট স্টেজ, দেন ইট ডেভালপস ইনটু হিস্টিরিয়া। লাস্ট স্টেজে আসে এপিলেপ্টিক্যাল হিস্টিরিয়া। তবে সে স্টেজে পৌঁছতে দেব না। আই ক্যান অ্যাসিওর ইউ দ্যাট। আমার এই মেন্টাল ক্লিনিকের বয়স —স্যে, অ্যাবাউট থার্টি। তো কী কথার পর হঠাৎ ফ্ল্যাশ করল পেসেন্ট বলুন তো? আমার জানা দরকার।'

শতদ্রু সব বলল।

ডাঃ চৌধুরী হাসতে লাগলেন। 'ব্যাপারটা সত্য হতেও পারে, আবার নিজেরই কল্পিত হতেও পারে। ফ্রি অ্যাসোসিয়েশন অফ আইডিয়াজ পদ্ধতি প্রয়োগ করে অবশ্য আমিও একই ফ্যাক্ট জানতে পেরেছি। কাল রাতে তো গিয়ে দেখি, জানলার ধারে দাঁড়িয়ে কথা বলছে কার সঙ্গে। মাইন্ড দ্যাট, জানলার নিচে কিন্তু কেউ নেই। এটাই এ কেসের বৈশিষ্ট্য। আপনাকে একটা বই দেখাচ্ছি, বুঝতে পারবেন হ্যালুসেনিসান কী ধরনে ডেভালাপ করে এসব কেসে।' সেলফ থেকে একটা প্রকাণ্ড বই এগিয়ে দিলেন শতদ্রুর দিকে। একটুকরো কাগজে চিহ্ন দেওয়া পাতাটা খুলে বললেন, 'পড়ে দেখুন এই প্যাসেজটা।'

শতদ্রু বইটার টাইটেলপেজ দেখে নিল আগে। মার্লো পন্টির 'দা ফেনোমেনলজ অফ পারসেপশান।' সেই পাতায় এক মানসিক রোগীর কাহিনী রয়েছে। সে জানলার কাছে গিয়েই চিৎকার করে ওঠে, 'জানলার নিচে একটা লোক! জানলার নিচে লোক! জানলার নিচে একটা লোক!' সে সেই অদৃশ্য লোকটার পোশাকেরও চমৎকার বর্ণনা দেয়।

শতদ্রু বইটা ফেরত দিয়ে বলল, 'দা সেইম কেস মনে হচ্ছে।'

'আপনার মামা বলছিলেন আপনি নাকি চলে যাচ্ছেন নেক্সট্ উইকে?'

শতদ্রু মাথা দোলাল।

'শুনলুম এখনও তো লম্বা ছুটি। নাই বা গেলেন এ অবস্থায়!' ডাঃ চৌধুরী একটু গম্ভীর হলেন। ফিটের সময় পেসেন্টকে আপনার কথা বলতে শুনেছি। সুস্থ অবস্থাতেও আপনার সম্পর্কে কত কথা বলে। আমার ধারণা হয়েছে, বাবা-মায়ের চেয়ে আপনাকে কাছের লোক মনে করেন মিস সিনহা।'

শতদ্রু তাকিয়ে রইল।

'এর একটা কারণ আই জাস্ট গেস। মিস সিনহার চারপাশে যাঁরা থাকেন, তাদের ওপর ওঁর ভীষণ অবিশ্বাস এবং কিছুটা সন্দেহও। ওঁকে নিয়ে যেন সবাই চক্রান্ত করছে। এক্ষেত্রে যেহেতু আপনি খানিকটা আউটসাইডার অথচ নিজের দাদা—পেসেন্ট আপনাকে বিশ্বাস করে। তাই আপনার থাকা খুব দরকার।'

শতদ্রু আস্তে বলল, 'ঠিক আছে। ক্যান্সেল করাচ্ছি জার্নি।'

ডাঃ চৌধুরী খুশি হয়ে বললেন, 'আপনার বাবা এবং মামা ওঁদেরও বলেছি একটা কথা! মিস সিনহা মোটামুটি সুস্থ হয়ে উঠলে ওঁকে যেন আর ওই বাড়িতে না নিয়ে যান। আপনার বাবা বললেন, তাঁরও সেই ইচ্ছে। ওখানকার বাড়ি-টাড়ি সম্পত্তি সব বেচে কলকাতায় চলে আসবেন ঠিক করেছেন।'

শতদ্রু বলল, 'হ্যাঁ। মামা বলছিলেন।'

একজন নার্স এসে বলল, 'পেসেন্টের জ্ঞান হয়েছে। দাদাকে ডাকছেন।'

ডাঃ চৌধুরী বললেন, 'হ্যাঁ—যান মিঃ সিনহা। স্বচ্ছন্দে! একটু অ্যালার্ট থাকবেন—যেন ওসব কথা বেশি না বলেন পেসেন্ট। কেমন?'

শতদ্রু ঘাড় নেড়ে বিপাশার ঘরে এল। দেখল, বিপাশা তেমনিভাবে বালিশে হেলান দিয়ে বসে আছে। শতদ্রু পাশে বসে হাসতে হাসতে বলল, 'কী রে! খুব ভেল্কি লাগাচ্ছিস দেখছি।'

বিপাশা দুর্বলভাবে হাসল। 'ভেল্কি কিসের লাগালুম বল তো?'

শতদ্রু সতর্ক হয়ে বলল, 'নয়? আমায় কী মন্তর পড়ালি যে এখন ইচ্ছে করছে জার্নি ক্যান্সেল করি। অর্থাৎ যাচ্ছি না।'

বিপাশা খুশি হল। সেই রুমালটা নিয়ে আগের মত খেলতে থাকল। একটু পরে কেমন চোখে তাকিয়ে বলল, 'অনি এসেছিল।'

শতদ্রু উদ্বিগ্ন মুখে বলল, 'কী বলছিস আবার? অন্য কথা বল তো শুনি।'

'অনি এসেছিল জানলার ওধারে। ডাকলুম, ভেতরে ঢুকল না।' বিপাশা যেন অনেক দূর থেকে বলতে থাকল। 'তোকে ডাকলুম সেজন্য। ওকে ডেকে নিয়ে আয় না দাদা।'

শতদ্রু বিব্রতভাবে জানলার ধারে গিয়ে খোঁজার ভংগি করে বলল, 'কেউ নেই। তোর ভুল বিশ্বাস।'

'আমি ভুল করি নি রে! অনি আমার সঙ্গে কথা বলল ওখানে দাঁড়িয়ে। আমিও বললুম।'

'স্বপ্ন দেখেছিস।'

বিপাশা সেই রুমাল ওর গায়ে ছুড়ে মেরে চেঁচিয়ে উঠল, 'তুই মিথ্যুক। তুই চলে যা আমার সামনে থেকে। চলে যা বলছি!'

ডাঃ চৌধুরী দ্রুত ঘরে ঢুকে বললেন, 'মিঃ সিনহা, আপনি এবার আসুন বরং।'

শতদ্রু চুপচাপ বেরিয়ে গেল। করিডোরে গিয়ে দেখল বাবা, মা আর মামাবাবু আসছেন।...

মথুরামোহনের ভিটে

সারাজীবন এক নিঃশব্দ মানুষ ছিলেন কুড়ানি ঠাকরুন। যেদিন রতুডাক্তার তাঁকে ইঞ্জেকশন দিয়ে যান এবং সন্ধ্যায় রঙ্গনা তাঁকে বিবস্ত্র অবস্থায় মাচানের তলায় ঢুকতে দেখে, সে দিনই মৃত্যু তাঁর পিছু নিয়েছিল। তাড়া খেয়ে আক্রান্ত জন্তুর মত তিনি নিজের আশ্রয়ে লুকোতে চাইছিলেন। বড় যত্নে ও মায়ায়গড়া সেই উদ্ভিদ-জগত। রঙ্গনা যখন তাঁকে টেনে বের করে, তখন তিনি মৃত। নিঃশব্দ মানুষের নিঃশব্দ মৃত্যু হয়ত স্বাভাবিক ছিল। রঙ্গনার বুঝতে সময় লেগেছিল। অপরূপার সে-বেলা টিউশনি ফাঁকি দিয়ে হরেনের সঙ্গে সার্কাস দেখে ফিরতে একটু রাত হয়েছিল! অপরূপাও বুঝতে পারে নি। হরেনই নাড়ি দেখে বলেছিল, 'হয়ে গেছে।' দুই বোন বোবা হয়ে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হু হু করে কেঁদে উঠেছিল।

করালীর মন্দিরের পাশে নদীর ধারে শ্মশান। হরেন বাড়ির ছেলের মত সবকিছু করল-টরল।

মুখাগ্নি পর্যন্ত। শেষ রাতে শ্মশান থেকে ফিরে হরেন আর তার বন্ধুরা দুটি ভীত শোকার্ত মেয়েকে সাহস সান্ত্বনা দিতে কার্পণ্য করে নি। রঙ্গনা সারারাত খুব কেঁদেছিল। তার খালি এক কথা, 'রতুডাক্তারই মেরে ফেলল ঠাকুমাকে।' শুনলে রতিকান্ত ক্ষেপে যেতেন। কেউ কানে তোলে নি তাঁর।

তারপর থেকে হরেন এ বাড়ির গার্জেন হয়ে গেছে। যখন-তখন আসে। অপরূপার ঘরে ঢোকে। গল্প-সল্প করে। অপরূপার অস্বস্তি একটাই—অনি যদি হঠাৎ ফিরে আসে, কী হবে? আর রঙ্গনা মনে-মনে ফোঁসে হরেনের ব্যাপারে। আড়ালে দিদিকে মুখ ফুটে কিছু বললে ধমক খায়। অপরূপা বলে, 'তুই বড্ড অকৃতজ্ঞ আর স্বার্থপর রনি। ও এলে তোর কী? কোন ব্যাপার তুই অনেস্টলি নিতে জানিস নে। সবতাতেই খারাপ ভাবিস।'

ছোট আকারে একটা শ্রাদ্ধ-শান্তি হরেনের উদ্যোগেই হল। আত্মীয়রা খবর পেয়ে কেউ আসেন নি। বহুদূরে থাকেন। কুড়ানি ঠাকরুনের পেটে গোঁজা থলেয় গোটা বত্রিশ টাকা আর খুচরো কিছু পাওয়া গিয়েছিল। অপরূপার টিউশনির বাবদ কিছু আর হরেনের তাগিদে কিছু জুটেছিল। এর পর বসন্তপুরের লোকে জেনেছে হরেন অপরূপাকে বিয়ে করবে। তার গার্জেন বলতে এক জ্যাঠা। বাবা-মা নেই ইহজগতে। জ্যাঠা দীনবন্ধু চাটুয্যের মাথায় বাজ পড়েছে! নিজে অক্ষম বুড়োমানুষ। গণ্ডাকতক পুষ্যি ঘরে। বুঝিয়ে বলেছেন, 'ওরে নির্বোধ! ওই গ্রাজুয়েট মেয়ে তোর সংসার করবে ভেবেছিস? ও তো তোকে ভড়কি দিচ্ছে। তার ওপর গউরের রামপাঁঠা—সেই অনি হারামজাদা এসে পড়লে কী হবে? ছুরি-চাকু খাবার ইচ্ছে না থাকলে মানে-মানে সরে আয় বাবা। লক্ষ্মি ছেলে, কথাটা শোন।'

হরেনের মাথায় প্রেম চড়ে আছে। তাছাড়া বি এ পাশ বউ পাওয়া তার পক্ষে ভাগ্যের কথা। নিজেও কি কোনদিন আশা করেছিল, অপরূপার মত মেয়ে দৈবাৎ তার কাছে এসে জুটবে? সাধুবাবুর টোপ ঝুলিয়ে একেবারে অপরূপার ঘরের দোরে পৌঁছেছিল। কুড়ানি ঠাকরুনও ভাগ্যিস মারা গেলেন। হরেন এবার ঘরে ঢুকে পড়েছে অপরূপার। এখন সারা বসন্তপুর তার লেজে দড়ি বেঁধে টানলে লেজ ছিঁড়ে যাক, হরেনকে ফেরত আনা যাবে না।...

রঙ্গনা একদিন বলল, 'দিদি, ঠাকুমার বাবার পক্ষের কেউ না কেউ বাঁকাশ্রীরামপুরে আছে। তাদের তো মরার খবর দেওয়া হল না।'

অপরূপা বলল, 'চিঠি লেখা যেত—কিন্তু কারুর নাম তো জানা নেই।'

'চল না রে, আমরা যাই একদিন। দেখে আসি ঠাকুমার দেশ।'

অপরূপা একটু ভেবে বলল, 'ইচ্ছে করে দেখে আসতে, জানিস রনি? বিশেষ করে ঠাকুমার হিস্ট্রিটা জানার পর ভীষণ ইচ্ছে করছে আমারও। কিন্তু সে তো শুনেছি স্টেশনে থেকে অনেকটা হাঁটতে হবে। বাস-টাস চলে না ওদিকের রাস্তায়। একেবারে সৃষ্টিছাড়া দেশ ঠাকুমাদের।'

রঙ্গনা ভেবে বলল, 'এই দিদি! হরেনদাকে সঙ্গে নিয়ে গেলে হয়!'

অপরূপা মুখে আপত্তি করল। 'ধুর। ওকে আবার কেন?'

'ক্ষতি কী রে দিদি? হরেনদা সঙ্গে গেলে তো ভালই। বললেই রাজি হবে দেখবি!'

'তুই বুঝতে পারছিস না রনি, আমাদের ফ্যামিলির একটা স্ক্যান্ডাল আছে না এব্যাপারে? হরেন জেনে যাবে না?'

'জানলেই বা!' রঙ্গনা একটু হাসল।

'জানলেই বা মানে?'

রঙ্গনা চুপ করে গেল। তার ধারণা, অপরূপার সঙ্গে হরেনদার বিয়ে হবে। দুজনের মধ্যে প্রেম-ট্রেম যে চলছে, সে অনুমান করেছে অনেকদিন আগেই। ব্যাপারটা তার মনঃপুত হয়নি। কিন্তু অপরূপা যদি তা চায়, তার বারণ করার সাধ্য নেই এবং ইচ্ছাও নেই।

সে-রাতে অপরূপা টিউশনি থেকে ফিরে বলল, 'রনি। শোন। হরেনের সঙ্গে কথা হল। ও কাল বিকেলে ফ্রি থাকবে। তিনটের ট্রেনে যাওয়া যায় বলল। ওর অফিসে নাকি এখন ভীষণ কাজের চাপ। তাই বিকেল ছাড়া হবে না।'

রঙ্গনা খুশি হল শুনে। পরদিন সকাল থেকে আর তার সময় কাটছিল না। বইয়ের পাতায় মন বসছিল না। দুটো নাগাদ হরেন সেজেগুজে কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে হাজির হলে রঙ্গনা একমুখ হেসে বলল, 'আমরা এখন রেডি।'

হরেন বলল, 'কী মুশকিল! তুমিসুদ্ধু যাবে নাকি?'

রঙ্গনা হকচকিয়ে গেল। অপরূপা বলল, 'চলুক না। ওর ইচ্ছেই তো বেশি।'

হরেন উদ্বিগ্ন মুখে জোরে মাথা দুলিয়ে বলল, 'পাগল, না মাথাখারাপ! বাড়িতে থাকবে কে? বাড়িতে কেউ না থাকলে ফিরে এসে আর কিছু পাবে ভেবেছ? রোজ চুরি হচ্ছে বাড়ি-বাড়ি।'

অপরূপা হাসতে হাসতে বলল, 'আমাদের নেবেটা কী?'

'তুমি জানো না অপু!' হরেন গম্ভীর হয়ে বলল। 'কথায় বলে চোরের কপনিটুকুও লাভ। মাঠের ধারে বাড়ি। খাট-কপাট-চৌকাঠ সব খুবলে তুলে নিয়ে যাবে। ওই তো মড়িদার বাড়িতে সেবার কী হয়েছিল মনে নেই?'

ওপাশে আগাছার জঙ্গলের মধ্যে একটা ভাঙা একতালা ঘর দাঁড়িয়ে আছে। মড়িবাবু থাকতেন ধানবাদে। বাড়িতে তালা দেওয়া ছিল। ক্রমে ক্রমে বাড়ির চৌকাঠ-জানলা-কপাট সব কারা নিয়ে গিয়েছিল। এখন ভূতের আড্ডা হয়ে পড়ে আছে। ছাদের কড়িকাঠগুলো-ঝুলে পড়েছে। নেহাত চাপাপড়ার ভয়ে সেগুলো খুলতে পারেনি চোরেরা।

অপরূপা বলল, 'হ্যাঁ—তাই তো!'

হরেন ঘড়ি দেখে বলল, 'নাও। আর দেরি কোরো না। রনি থাক্। ছুতোর বউকে ডেকে নেবে রাত্রে—আর চিন্তা কিসের?'

অপরূপা বলল, 'আজই ফিরে আসা যাবে না?'

'সেটা আনসার্টেন। বুঝলে না? তোমাদের আত্মীয়-স্বজন আছেন সেখানে। রাত্রে যদি না আসতে দেন? তাছাড়া পায়ে হাঁটা রাস্তা। অনেককিছু ভাববার আছে। দিনকাল তো আর সেরকম নেই।'

অপরূপা রঙ্গনার দিকে তাকিয়ে বলল, 'ঠিক আছে। আগে দেখে তো আসি। চেনা হয়ে গেলে তোকে নিয়ে যাব'খন। তুই পেনীর মাকে ডেকে নিস। সাবধান, একা থাকবিনে।'

রঙ্গনা চুপ করে থাকল। ওরা দুজনে বেরিয়ে গেলে সে দরজা আটকে দিল। তারপর খিড়কির ওদিকে গিয়ে পেনীকে ডাকাডাকি করতে থাকল।

সেই আদ্যিকালের কয়লাখেকো ইঞ্জিন এই লুপ লাইনে হাঁপকাশের রুগীর মত কষ্টেসৃষ্টে ডাউনট্রেনটাকে টানছিল। যে স্টেশনে থামছে, থেমেই থাকছে। অপরূপা ক্রমশ আড়ষ্ট হয়ে উঠছিল। বদ্যিপুরে নামল যখন, তখন সূর্য বিস্তীর্ণ মাঠের শেষে লাল একটা গোলা হয়ে গেছে। প্রায় জনহীন স্টেশন। একটা চায়ের দোকান আছে প্ল্যাটফর্মের ওপর। চা খেতে খেতে লালচে আলোটা মরে গেল। অপরূপা শুকনো হেসে বলল, 'কোনদিকে যেতে হবে আমাদের?'

হরেন আঙুল তুলে পশ্চিমের মাঠ দেখিয়ে বলল, 'ওই যে—ওদিকে।'

'কিন্তু রাস্তা কই?'

হরেন সিগারেট জ্বেলে বলল, 'সেই তো বলছিলুম। এ তল্লাটের অবস্থা এরকমই। ওই যে দেখছ দীঘির পাড়ে কয়েকখানা কুঁড়ে ঘর—ওই বোধ করি কেঁচুয়া। দাঁড়াও, জিগ্যেস করে নিই। আমি কি কখনও এসেছি এদিকে?'

চা-ওলাকে জিগ্যেস করলে বলল, 'বাঁকাছিরামপুর যাবেন? কেঁচুয়া পর্যন্ত আলপথ। ওখানে কাঁচা রাস্তা পাবেন। আর ওই যে দেখছেন কালো মতন গাঁ—হ্যাঁ, ওইটা। নজর করে দেখুন, যেন ধনুক বাঁকা হয়ে বেঁকে আছে না? তাই বাঁকা ছিরামপুর।'

হরেন বলল, 'কতক্ষণ লাগতে পারে দাদু?'

চা-ওলা হাসল। 'তা আপনাদের দেখে মনে হচ্ছে টাউনের লোক। পায়ে হাঁটা অব্যেস আছে? আমাদের ঘণ্টা দুয়েক লাগে বৈকি! একটা কাঁদর আছে। এখন অবিশ্যি জল নেই। একটু কাদা হতে পারে।'

অপরূপা কুণ্ঠিতভাবে বলল, 'তাহলে থাক। আমরা পরের ট্রেনে ফিরে যাই।'

হরেন বলল, 'শুনেই ভড়কে গেলে? আমি সঙ্গে আছি কেন? আমার ওপর বিশ্বাস রাখোদিকি অপু।'

সে হনহন করে হাঁটতে থাকল। অনিচ্ছাসত্ত্বেও অপরূপা যন্ত্রের মত তাকে অনুসরণ করল। উঁচুতে রেললাইন। নিচের মাঠে সবুজ চৈতালি। আলপথে কিছুদূর হেঁটেই ক্লান্ত হয়ে পড়ছিল অপরূপা। হরেন হাসতে হাসতে পিছিয়ে এসে তাকে সঙ্গ দিচ্ছিল। কেঁচুয়ায় দীঘির পাশ দিয়ে একটা সংকীর্ণ রাস্তা পাওয়া গেল। গরুর গাড়ির চাকার দীর্ঘ আঁকা-বাঁকা দাগ গভীর হয়ে আছে। প্রচণ্ড ধুলো জমেছে। অপরূপার স্যান্ডেল আর শাড়ির নিচেটা ধুলোয় নোংরা হয়ে গেল কিছুক্ষণের মধ্যে।

ফাঁকে মাঠে শেষবেলার ঠাণ্ডা হাওয়ায় অপরূপা খুব বিপদে পড়ে গেল। হরেন গুনগুন করে গান গাইছিল। নির্জন রাস্তায় সে এতক্ষণে অপরূপার কাঁধ বেড় দিয়ে বলল, 'চলো অপু। তোমায় কাঁধে বসিয়ে নিয়ে যাই।'

অপরূপা নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, 'কী অসভ্যতা করছ বলো তো! এমন জানলে আমি কখনো আসতুম না!'

'কী আশ্চর্য!' হরেন খ্যা খ্যা করে হাসতে লাগল। 'একটুতেই এই। মাইরি, এডুকেটেড মেয়েদের সাইকলজি আমি বুঝতে পারিনে। হুইমজিক্যাল!'

অপরূপা চুপচাপ হাঁটতে থাকল।

হরেন পাশে হাঁটতে হাঁটতে বলল, 'এই অপু! ভাল কথা—তোমায় বলতেই ভুলে গেছি। আজই লোকাল কাগজে দেখলুম, ডিসট্রিক্টে প্রাইমারি টিচার নেওয়া হবে। বুঝলে?'

অপরূপা আস্তে বলল, 'কোন কাগজে বেরিয়েছে?'

'মুর্শিদাবাদ সমাচারে। আমি রেখেছি পাতাটা। আমাদের অফিসে আসে তো।'

'প্রাইমারি টিচার নেবে দেখলে?'

'হ্যাঁ।' হরেন উৎসাহ দিয়ে বলল। 'সাধুদা ডিসট্রিক্ট স্কুল বোর্ডের মেম্বার জানো তো?'

'তাই বুঝি?'

'এ তোমার হওয়াই ধরো। চেয়েছে স্কুলফাইনাল। তুমি তো বি এ। এমনিতেই হয়ে যাবে।'

হাতের রেখা দেখা যাচ্ছিল না এবার। দুধারে ঢেউখেলানো শস্যশূন্য মাঠ। দূরে ইলেকট্রিক লাইনের উঁচু সব ফ্রেম এক দিগন্ত থেকে অন্যদিগন্তে চলে গেছে। আকাশে ভেসে যাচ্ছে বুনো হাঁসের ঝাঁক। অপরূপার মনটা চাপা আবেগে চঞ্চল হয়ে গেল। একটু পরে হরেন তার একটা হাত নিলে সে বাধা দিল না আর।

হরেন গুনগুন করে বেসুরো গলায় প্রেমের গান গাইতে থাকল। একবার তার হাত অপরূপার কাঁধে উঠলে অপরূপা আস্তে নামিয়ে দিল। তখন হরেন অভিমান দেখিয়ে বলল, 'তুমি আমায় বড্ড পর ভাবো অপু! ঠিক আছে। আমার যা কর্তব্য করে যাই। আমি তো প্রতিদানের আশায় কিছু করি না। বরাবর এই স্বভাব আমার!'

অপরূপা বলল, 'উঃ! আর কতদূর বলো তো?'

হরেন ব্যাগ থেকে টর্চ বের করে বলল, 'কী অখদ্যে দেশ রে বাবা। রাস্তায় একটা লোকপর্যন্ত পেলুম না যে জিগ্যেস করি! ঠিক আছে, চলো তো।'

অন্ধকার হয়ে এসেছে। টর্চের আলোয় কাঁদরটা দেখে ভড়কে গেল অপরূপা। পাঁকে ভর্তি একটা অপ্রশস্ত নালায় নেমে গেছে রাস্তাটা। অসংখ্য চাকার দাগে বিচিত্তির একেবারে। সে অস্ফুটস্বরে বলল, 'এ কী!'

হরেন হাসল। 'ভাবছ কেন? কাঁধে চাপো। তোমার পায়ে কাদা লাগলে আমার কষ্ট হবে। এস!'

হরেন সত্যি হেঁট হয়ে কাঁধ পাতছে দেখে অপরূপার হাসি পেল। 'যাঃ! কাঁধে চাপব কী! তুমি পা বাড়াও। আমি তোমায় ফলো করব।'

হরেন হঠাৎ দুহাতে ওকে শূন্যে তুলে নামিয়ে দিল। 'পারব না ভেবেছ তুলতে? তুমি কী এমন ভারি!'

অপরূপা খিলখিল করে হাসছিল। একটা অভিজ্ঞতা হল বটে ঠাকুমার দেশে এসে। সে কল্পনাও করে নি ঠাকুমা এমন দেশের মেয়ে। ইতিমধ্যে হরেন জুতো খুলে ব্যাগে ঢুকিয়েছে। সে বলল, 'তাহলে রেডি! ওয়ান টু থ্রি...' সে ফের অপরূপাকে শূন্যে তুলল।

কিন্তু এবার তার শরীরের আলতো আক্রমণ টের পাচ্ছিল অপরূপা। খালটা পেরিয়ে শুকনো জায়গায় নামিয়ে দিয়েই হরেন তাকে বুকে চেপে ধরল এবং চুমু খাবার চেষ্টা করল। অপরূপা কয়েক মুহূর্তের জন্য অবশ হয়ে পড়েছিল। আরো একদিন এমন করেছিল হরেন। তখন জোর বাধা দিয়েছিল। আজ কতকটা অসহায় হয়ে আত্মসমর্পণ করল যেন। একসময় নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সে আস্তে বলল, 'চলো!'

অন্ধকারে একটু দূরে আলো দেখা যাচ্ছিল। আলোটার কাছাকাছি গিয়ে বোঝা গেল একটা গ্রাম। রাস্তার ধারে একটা লোক লণ্ঠন হাতে জৈবকর্মে এসেছিল। সে এদের দেখে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

হরেন জিগ্যেস করল, 'দাদু, এটা কি বাঁকাশ্রীরামপুর?'

'তাই বটে বাবুমশাই। আপনারা কোত্থেকে আসছেন?'

'বসন্তপুর।' হরেন বলল, 'আচ্ছা দাদু, ঘোষেদের বাড়ি কোন দিকে পড়বে?'

লোকটা হাসল। 'আজ্ঞে ঘোষ বলতে এক আমাদের এই পাড়াটা—গয়লাপাড়া। আর ঘোষ বলতে ধরুন বাবুপাড়ায় কায়েতরা। কার বাড়ি যাবেন বলুন?'

অপরূপা বলল, 'মথুরামোহন ঘোষের কথা জিগ্যেস করো না। চিনবে নিশ্চয়।'

লোকটা শুনতে পেয়ে বলল, 'সে-নামে তো কেউ নেই মশাই!'

অপরূপা বলল, 'জমিদারের কাছারিতে সেরেস্তাদার ছিলেন।'

'হ্যাঁ—কাছারি ছিল শুনেছি। সে তো এখন ইস্কুল হয়েছে।' লোকটা বলল। 'বরঞ্চ আপনারা সতুবাবুর বাড়ি যান। বাবুপাড়ায় ঢুকেই দেখবেন পেত্থম বাড়ি—দোতালা। ওনাদের কেউ হবেন তাহলে।'

হরেন বলল, 'তুমি একটু সঙ্গে চলো না দাদু!'

অন্ধকার ও ঠাণ্ডায় গ্রামটা ঝিম মেরে আছে। রাস্তায় ধুলো। প্রকাণ্ড বটতলায় মাচান রয়েছে। লোকজন নেই সেখানে। একটা দোতলা বাড়ির বাইরের ঘরে আলো জ্বলছে। লোকটা বলল, 'এই হল সতুবাবুর বাড়ি। চলে যান—আমার সঙ্গে ওনাদের বনিবনা নেই।'

সে চলে গেলে টর্চের আলোয় হরেন একটা টিউবেল দেখতে পেল। বলল, 'অপু! হেল্প করো দিকি একটু। আগে পা দুটো ধুয়ে নিই।'

অপরূপার ধারণা ছিল না এই সন্ধ্যায় ঠাকুমার গ্রাম এমন নিঃঝুম হয়ে যায়। হরেন পা ধুয়ে জুতো পরে বারান্দায় উঠল। অপরূপা নিচে দাঁড়িয়ে রইল।

ঘরের ভেতরে একদিকে একটা টেবিলের ওপর লণ্ঠন জ্বলছে। দুটি ছেলেমেয়ে মন দিয়ে অঙ্ক কষছে। একজন হরেনের বয়সী যুবক রাশভারি ভংগিতে বসে অঙ্ক কষাচ্ছে। ওরা সবাই যেন এই অন্ধকার নিঃশব্দ গ্রামের অংশ হয়ে রয়েছে। হরেন একটু কাশলে তিনজনে তাকাল। যুবকটি বলল, 'কে?'

হরেন বলল, 'বসন্তপুর থেকে আসছি। সতুবাবুকে চাই।'

যুবকটির ইশারায় ছেলেটি ভেতরে চলে গেল। একটু পরে বেঁটে নাদুস-নুদুস গড়নের টাক-মাথা প্রৌঢ় ভদ্রলোক, পরনে লুঙি, গায়ে চাদর, ভেতর থেকে এসে হরেনকে দেখে অবাক হলেন। হরেন নমস্কার করে বলল, 'আমার নাম হরেন চ্যাটার্জি। বসন্তপুর থেকে আসছি। আপনার সঙ্গে একটু জরুরী কথা আছে।'

সতুবাবু আড়ষ্টভাবে বললেন, 'বসন্তপুর থেকে, না থানা থেকে?'

হরেন তক্ষুনি বুঝল, তাকে শাদা পোশাকের পুলিশ বা আই বির লোক ভেবেছে। সে হাসতে হাসতে বলল, 'না, না! আমার সঙ্গে আরও একজন আছেন। অপু, এস।'

অপরূপার ভয় করছিল বলে বারান্দায় এসেছে ততক্ষণে। অপরূপাকে দেখে সতুবাবুর চোখ বড় হয়ে গেল। তারপর সন্দিগ্ধভাবে বললেন, 'আপনারা বসুন। বাবা মদন ওদের নিয়ে ভেতরে বস গে।'

প্রাইভেট টিউটর ছাত্র-ছাত্রীসহ ভেতরে চলে গেল। হরেন ও অপরূপা বসল। সতুবাবু অন্য একটা চেয়ারে বসে বললেন, 'আমি তো কিছু বুঝতে পারছি নে! কী ব্যাপার বলুন।'

অপরূপা লক্ষ্য করছিল সতুবাবুর কথাবার্তায় ঠাকুমার কথার টান অবিকল! হরেন বলার আগে সে বলল, 'আচ্ছা, এখানে অনেক আগে মথুরামোহন ঘোষ বলে এক ভদ্রলোক ছিলেন। জমিদারি সেরেস্তায় কাজ করতেন নাকি। তিনি নিশ্চয় বেঁচে নেই। তাঁর কোনো রিলেটিভ কি আছেন কেউ?'

ভাল করে শুনে সতুবাবু বললেন, 'মথুরামোহন? মথুরামোহন...এক মিনিট। বাবা বলতে পারবেন। আপনারা বসুন—জিগ্যেস করে এসে বলছি।'

সতুবাবু চলে গেলে হরেন চাপা গলায় মুচকি হেসে বলল, 'যাক্ গে। রাত কাটানোর ভাল জায়গা পাওয়া গেছে। ওই রাস্তায় রাত্তিরবেলা ফেরা অসম্ভব। কী বলো?'

অপরূপা হাসল। 'দিলে তো থাকতে এরা?'

'আলবাৎ দেবে। তোমায় অন্তত দেবে।'

'হুঁ। যার-তার বাড়ি থাকতে বয়ে গেছে আমার। ফিরে যাব।'

'পারো তো যেও।' হরেন আরামে বসে সিগারেট বের করল। ধরিয়ে নিয়ে বলল, 'পয়সাওলা পার্টি মনে হচ্ছে। এ শীতের রাতের আরাম ছেড়ে কোথাও নড়ছিনে বাবা!' সে হুশ হুশ করে ধোঁয়া ছাড়তে থাকল। ফের বলল, 'এক কাপ চা দরকার। নিশ্চয় এসে যাবে। কী বলো?'

অপরূপা ঘরের ভেতরটা দেখছিল। দেয়াল ধবধবে সাদা। কয়েকটা ক্যালেন্ডার আর বাঁধানো ফোটো ঝুলছে। ওপাশে একটা তক্তাপোষের ওপর সতরঞ্চি বিছানা রয়েছে। তাকের থাকে-থাকে সাজানো পাঠ্যপুস্তক। কুলুঙ্গিতে একটা মাকালীর বাঁধানো ছবি—কিছু শুকনো ফুল। তক্তাপোষের মাথার দিকে দেয়ালে একটা ক্যারামবোর্ড দাঁড় করানো আছে।

সতুবাবু ফিরে এসে বললেন, 'একবার ভেতরে আসুন। বাবা বৃদ্ধ মানুষ। আর হাঁটাচলা করতে পারেন না।'

দরজার ওদিকে মেয়েদের ভিড় জমেছিল। সরে গেল ছত্রভঙ্গ হয়ে। অপরূপা টের পেল, খুব সাড়া পড়ে গেছে বাড়িতে। ভেতরে ঢুকে দেখল, মধ্যিখানে উঠোন—চারদিকে ঘর। নিচের একটা ঘরে ঢুকে সতুবাবু ডাকলেন, 'আসুন।'

ঘরে প্রকাণ্ড সেকেলে খাটে এক বৃদ্ধ বসে আছেন। গায়ে আলোয়ান। একটা লোক দুটো চেয়ার রেখে গেল তক্ষুনি। ইশারায় বসতে বললেন বৃদ্ধ। সতুবাবু দাঁড়িয়ে রইলেন। বললেন, 'বাবা, এঁরাই বসন্তপুর থেকে এসেছেন!'

বৃদ্ধ ফোকলা মুখে বললেন, 'কী নাম বললে? মথুরামোহন? ও! আমাদের সেই মথুরা? আমরা বলতুম মোথুকাকা। বড় সাদাসিধে লোক ছিল। ওই তো লেবুতলায় ভিটে।'

অপরূপা বলল, 'ওনার কেউ আছেন গ্রামে—কোনো আত্মীয়?'

বৃদ্ধ কানে কম শোনেন। সতুবাবু প্রশ্নটা বুঝিয়ে দিলে বললেন, 'কে থাকবে? কেউ নেই। ওই তো ভিটে পড়ে আছে। মোথুকাকার শেষ বয়সে মাথার গণ্ডগোল হয়েছিল। অ সতু, সেই যে রে—মনে পড়ে না? তোরা সব ছেলেপুলেরা বড্ড পেছনে লাগতিস!'

সতুবাবু বললেন, 'তাই বলো! মোথা ক্ষ্যাপা বলতুম—একটু একটু মনে পড়ছে যেন। হ্যাঁ—সবসময় চেঁচিয়ে বেড়াতেন—ডাকাত! ডাকাত!'

এক বৃদ্ধা ঘরে ঢুকে অপরূপাকে দেখতে দেখতে বললেন, 'মোথো পাগলার কথা এককাল বাদে কেন গো? সে কি আজকের কথা? তখন সতু এতটুকুন ছেলে। পাঁচ-ছ বছর বয়স হবে।'

সতুবাবু হিসেব করে বললেন, 'তাহলে ধরো বছর পঞ্চাশ আগের কথা। আমি এখন ফিফটি সিক্স।'

বৃদ্ধা বললেন, 'ওইরকমই হবে। আমার তখন সবে বিয়ে হয়েছে।'

অপরূপা জিগ্যেস করল, 'ইনি কে?'

সতুবাবু বললেন, 'আমার দিদি।'

সতুবাবুর বাবা একটা ভংগি করে বললেন, 'খালি ডাকাত ডাকাত বলে চেঁচাত। কী যেন একটা হয়েছিল, আর মনে নেই! বেশ বসে আছে চুপচাপ। হঠাৎ...ওই ডাকাত! ডাকাত!'

বৃদ্ধা বললেন, 'তা জানিনে বাপু। অত মনে নেই। মোথোপাগলার নাকি একটা মেয়ে ছিল।'

কথা কেড়ে অপরূপা বলল, 'তার একটা পা খোঁড়া ছিল জন্ম থেকে?'

বৃদ্ধা বললেন, 'তা জানিনে বাপু। অত মনে নেই। তা এতকাল পরে কেন সেকথা? তোমরাই বা তার খোঁজে এলে কেন—এটুকুন বুঝিয়ে বলোদিকিনি?'

হরেন বলল, 'এই ভদ্রমহিলার ঠাকুমা ছিলেন মথুরাবাবুর মেয়ে। মানে—যে-মেয়ের কথা হচ্ছে।'

সতুবাবু তার বাবাকে কথাটা বুঝিয়ে দিলে বৃদ্ধ ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন অপরূপার দিকে। অপরূপা বলল, 'আমরা কিছু জানতুম না। ঠাকুমা সেদিন মারা গেলেন। তাই ভাবলুম...'

বৃদ্ধা বললেন, 'কিছু বুঝলুম না বাপু!'

হরেন একটু হেসে বলল, 'বোঝার কী আছে পিসিমা? ঠাকুমার বাবার ভিটে দেখতে সাধ হয় কি না বলুন নাতনিদের? তাই এসেছে আর কী!'

বৃদ্ধা বললেন, 'তা এতকাল বাদে?'

অপরূপা বলল, 'আমরা তত কিছু জানতুম না। কিছুদিন আগে জেনেছি সব কথা। ঠাকুমা বরাবর অবশ্য বাঁকাশ্রীরামপুরের নাম করতেন, আসতেও চাইতেন। খোঁড়া মানুষ—আসার অসুবিধে ছিল। উনি মারা গেলে ভাবলুম ভিটেটুকু অন্তত দেখে আসি।'

অপরূপার গলা ধরে এসেছিল। সে ব্যাগ থেকে রুমাল বের করে চোখ মুছতে থাকল। তখন হরেন বলল, 'মজাটা লক্ষ্য করেছেন তো? নাতনি কিন্তু কুলীন মুখুয্যে—ঠাকুমা আপনাদের কায়েত।' সে খ্যা খ্যা করে হাসতে লাগল।

সতুবাবু বললেন, 'মথুরাবাবুর মেয়ের বুঝি মুখুয্যে ঘরে বিয়ে হয়েছিল? সে আমলে অসবর্ণ! বলেন কী!'

অপরূপা সতর্কভাবে বলল, 'এখন একবার ওনাদের ভিটেটা দেখা যায়?'

হরেন বলল, 'রাতে কী দেখবে? সকাল হোক। এখন তো বদ্যিপুর স্টেশনে ফেরা যাবে না। ফিরতে চাইলেই বা এ ভদ্রলোকেরা দেবেন কেন?'

সতুবাবু ব্যস্তভাবে বললেন, 'না না—এই শীতের রাতে ছাড়ব কেন? একটা সম্পর্ক ধরে যখন এসেই পড়েছেন।'

সতুবাবু বেরিয়ে গেলেন। বৃদ্ধা বললেন, 'হ্যাঁ গো বাছা, তোমার নামটাই বা কী, আর এই ছেলেটারই বা কী নাম?' নাম শুনে নিয়ে ফের বললেন, 'তা ও মেয়ে, এটি তোমার সম্পর্কে কে বটে? আপন কেউ না হলেই বা আসবে কেন সঙ্গে?

হরেন ঝটপট বলল, 'অপু আমার মামাতো বোন।' অপরূপার অস্বস্তি কেটে গেল।

বৃদ্ধা তাকিয়ে ছিলেন তেমনিভাবে। বললেন, 'সন্ন! ও সন্ন!'

বৃদ্ধা কাছে গিয়ে বললেন, 'কিছু বলছ বাবা?'

হরেন অপরূপার দিকে চোখ নাচাল। অর্থাৎ এই বুড়ির বাবা ওই বুড়ো—দেখছ তো মজাটা!

বৃদ্ধ বললেন, 'মোথুকাকার একটা খোঁড়া মেয়ে ছিল। তুই তাকে দেখিস নি, সন্ন। তখন তুই কোথা, সতুই বা কোথা? আমার তখন বিয়েই হয় নি।'

বৃদ্ধা তাঁর কানের কাছে মুখ রেখে বললেন, 'এই মেয়েটা তার নাতনি।'

বৃদ্ধ ফোকলা দাঁতে হাসলেন। 'মোথুকাকার মেয়ের নাতনি? ভাল, ভাল। কোথা বিয়ে দিয়েছিল মনে নেই।'

অপরূপা সাবধানে বলল, 'বসন্তপুরে।'

বৃদ্ধা তাঁর বাবার কানে কথাটা পাচার করে বললেন, 'বামুনের ঘরে বে হয়েছিল—বুঝলে?'

বৃদ্ধ ফের হেসে বললেন, 'আমরা শুনি নি। হয়তো শুনে থাকব, মনে নেই।'

অপরূপা বুঝতে পারছিল, মথুরামোহন খোঁড়া মেয়েকে নিয়ে করালীর থানে গিয়েছিলেন এবং সেখান থেকে তার ঠাকুর্দা কালু মুখুয্যে সেই মেয়েকে লুঠ করে আনেন—এসব ঘটনা এঁরা জানেন না। কেন জানেন না? মথুরামোহন নিশ্চয় কাকেও কিছু বলেন নি। হয়তো সে-আমলের সমাজটা ছিল খুব কড়া। তাঁকে মেয়ে লুট হওয়ার জন্য জাতিচ্যুত বলে একঘরে করা হত। কিংবা আরও সামাজিক শাস্তির আশংকা ছিল। তাই চেপে গিয়েছিলেন। তারপর একসময় পাগল হয়ে যান।

কিন্তু ঠাকুর্দারই বা কী আক্কেল। পরে যোগাযোগ করলেও তো পারতেন শ্বশুর বেচারার সঙ্গে! অপরূপার মা বলতেন, 'শ্বশুর মশাইকে শেষ বয়সে দেখেছি! নেশাভাঙ করতেন বড্ড। কোথায় ডাকাতি করতে গিয়ে পেটে গুলি লাগে। ওতেই মারা যান। লোকটা এমনিতে বেশ নরম মনের মানুষ ছিলেন। অথচ ওই দুর্দান্ত স্বভাব।'

তবু ঠাকুর্দাকে অপরূপার ভালই লেগেছে শেষ পর্যন্ত। একটা খোঁড়া মেয়েকে লুট করে আনুক আর যাই করুক, তাকে বউ করে সারাজীবন আশ্রয় তো দিয়েছিলেন। তখনকার দিনে গ্রামের কুলীন বামুন। ওই বিকলাঙ্গ বউ নিয়েই সন্তুষ্ট ছিলেন—আর বিয়ের নাম করেন নি। এটা নিশ্চয় ঠাকুর্দার মহৎ মনের পরিচয়। শুধু অবাক লাগে ভাবতে, ওই মেয়েটার মধ্যে কী খুঁজে পেয়েছিলেন কালীনাথ মুখুয্যের মত সাংঘাতিক মানুষ? ঠাকুমা যৌবনে দেখতে নিশ্চয় সুন্দরী ছিলেন—আর গায়ের রঙটাও ফর্সা ছিল। কিন্তু তাও হয়ত নয়—মমতা। ঠাকুমার মতো মমতাময়ী মেয়ে কটাই বা দেখা যায়? বাড়িটাকে কীভাবে দুহাতে আগলে রেখেছিলেন, সাজিয়ে তুলেছিলেন ভালবাসায়, ভাবা যায় না!

ঠাকুমার মৃত্যুর পর রঙ্গনার সঙ্গে অপরূপা এসব নিয়ে কত আলোচনা করেছে। রঙ্গনার দৃষ্টিটা একটু অন্যরকম। সে বলেছে, 'একটা সাংঘাতিক লোকের পাল্লায় পড়লে একটা খোঁড়া মেয়ে কী করতে পারে বল দিদি? ঠাকুমা বলছিল তখন মোটে তের-চৌদ্দ বয়স। ঠাকুর্দার তখন তার ডবল বয়স নিশ্চয়! ঠাকুমার জন্য আমার কষ্ট হয় রে!'

অপরূপা তা মানে না। দুজনে পরস্পরের মধ্যে একটা কিছু দেখেছিল—কোন আশ্রয়, কোন শান্তি—কিংবা বড় কিছু। এতো আর রাবণের সীতাহরণ নয়!

'হ্যাঁ গো মেয়ে!' বৃদ্ধা ডাকছিলেন। 'কী নাম ছিল তোমার ঠাকুমার?'

অপরূপা বলল, 'কনকলতা।'

বৃদ্ধা তাঁর বাবার কানে নামটা পাচার করলেন। তখন বৃদ্ধ সায় দিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ—হ্যাঁ। কনক। বাড়িতে শশা লাগাত। ফুলের গাছ লাগাত। মনে পড়ছে বটে। একটা কঞ্চি হাতে লেবুগাছের ছায়ায় বসে থাকত। আমরা ছেলেপুলেরা ওকে জ্বালাতন করতুম। হাঁটতে পারত না কি না? তাই শশার মাচানের তলায় চুপিচুপি ঢুকে যেতুম। টের পেলে সে কী চেঁচানি।'

বুড়ো বয়স পর্যন্ত তাহলে তাই করে গেলেন ঠাকুমা। অপরূপা ভাবল। আসলে বাইরের পৃথিবীতে যার পা বাড়ানোর উপায় নেই, বাড়ির ভেতর সে একটা পৃথিবী গড়ে নিয়েছিল। গাছপালা ফুলফলের পৃথিবী। সেখানে সে সম্রাজ্ঞীর মতো কঞ্চি হাতে শাসন করত!

বৃদ্ধ হঠাৎ নড়ে উঠলেন।.. 'সন্ন। সন্ন রে!'

'বলো বাবা!'

'অই মনে পড়েছে। মোথুকাকা তার মেয়েকে কোথায় কোন সাধুর আশ্রমে রেখে এসেছিল!'

'তাহলে তার নাতনি এল কোত্থেকে?' বলে বৃদ্ধা ঠোঁটে বাঁকা হেসে অপরূপার দিকে তাকালেন।

বৃদ্ধ বললেন, 'খোঁড়া মেয়ের বে হবে না। তাতে সবসময় পিছুটান—বাড়িতে আর তো কেউ ছিল না। জমিদারি সেরেস্তার কম্ম পণ্ড হয়। তাই মোথুকাকা মেয়েকে সাধুর আশ্রমে রেখে এলেন।'

বৃদ্ধা কড়া মুখে প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন 'না, না।'

'কেন রে সন্ন?'

এই মেয়েটা বলছে তার নাতনি। বসন্তপুরে মুখুয্যে ঘরে বে হয়েছিল বলছে।'

'মোথুকাকার মেয়ের?'

'হ্যাঁ। তাই বলছে।'

বৃদ্ধ হঠাৎ খুব রেগে গেলেন। বললেন, 'মিথ্যে কথা।'

অপরূপা বিব্রত হয়ে বলল, 'বিশ্বাস করুন। আমি কনকলতার নাতনি।'

হরেন ব্যাপার দেখে হ্যা হ্যা করে হেসে বলল, 'বুড়ো মানুষ। স্মৃতিভ্রংশ হতেই পারে।'

বৃদ্ধ সন্দিগ্ধ মুখে বললেন, 'দেখ বাপু, ভাবগতিক আমার ভাল ঠেকছে না। আজকাল দিনকাল খারাপ! কে কোন দলে রেতের বেলা গেরস্থর বাড়ি আসে। একে তো সতু নানা ফৌজদারি মামলায় ফেঁসে রয়েছে। তোমরা বাইরের ঘরে গিয়ে বসো দিকিনি। পরে কথা হচ্ছে।'

হরেন ও অপরূপা মুখ তাকাতাকি করল। অপরূপা লজ্জায় অপমানে লাল হয়ে উঠেছে। দুজনে বেরিয়ে বারান্দা হয়ে সেই বাইরের ঘরে গেল। ঘরটা ভেতর থেকে বন্ধ এবং অন্ধকার। পেছন-পেছন হেরিকেন হাতে সতুবাবু এলেন। এখন তাঁর মুখেও সন্দেহের ছায়া দেখা যাচ্ছে।

সতুবাবু আমতা হেসে বললেন, 'কিছু মনে করবেন না। আপনারা টাউনের লোক—আমাদের পাড়াগাঁয়ে আজকাল বড্ড অশান্তি। এই তো ক'বছর আগে নকশালপন্থীদের নিয়ে খুব হাঙ্গামা হয়ে গেল। গতবছরও একটু গণ্ডগোল বাধিয়েছিল ওরা। এই যেমন আপনারা এলেন, তেমনিভাবে ওরা আসত। মেয়েছেলেও থাকত সঙ্গে। তারপর হঠাৎ...'

কথা কেড়ে হরেন হাসতে হাসতে বলল, 'তারপর হঠাৎ পিস্তল বের করে গুডুম! দাদা, আমার নাম হরেন্দ্রকুমার মুখার্জি। বসন্তপুরে সাধুবাবুর ট্রান্সপোর্টে সারভিস করি। বেশি কী আর বলব আপনাকে!'

অপরূপা গম্ভীরভাবে বলল, 'যাক ওসব কথা। আপনি দয়া করে একবার মথুরাবাবুর ভিটেটা দেখিয়ে দেবেন? আমরা দেখেই চলে যাব।'

সতুবাবু বললেন, 'তা কি হয়? ভদ্রলোকের বাড়ি। একটা ব্যবস্থা নিশ্চয় হবে। তবে এখনই যদি দেখতে চান, আপত্তি নেই।' বলে তিনি ভেতরে দরজায় গিয়ে চেঁচিয়ে ডাকলেন, 'বদনা! ও বদন!'

একটা গুঁফো বলিষ্ঠ আকৃতির লোক এল। গায়ে তুলোর কম্বল জড়ানো। সতুবাবু বললেন, 'এনাদের মোথো পাগলার ভিটেটা দেখিয়ে আন।'

হেরিকেন নিয়ে বদন বলল, 'আসুন।' অপরূপা ও হরেন তাকে অনুসরণ করল। অপরূপার মন রাগে গরগর করছিল। মথুরাবাবুকে মোথোপাগলা বলছে এখনও! এদের কোনো ভদ্রতাবোধও নেই। এদের বাড়ি রাত কাটানো কি সম্ভব?

লোকটা সারবন্দী মাটির বাড়ির পাশ দিয়ে পুকুরপাড়, আগাছার বন ভেঙে একটা মোটামুটি ফাঁকা জায়গায় গিয়ে বলল, 'এই হল গে মোথোপাগলার ভিটে।'

আলোটা খুব কম। চারপাশে যেটুকু ছড়িয়েছে, তাতে শুধু ঘুটিঙ-কাঁকরে ভরা শক্ত খানিকটা নগ্ন মাটি চোখে পড়ছে। তার বাইরে অন্ধকার। অপরূপা লোকটার হাত থেকে হেরিকেন নিয়ে বলল, 'ঘর কোথায় ছিল?'

বদন নির্বিকার মুখে বলল, 'তা কেমন করে জানব বলুন? ওই উঁচু জায়গাটায় হবে।'

অপরূপা ঘুরে ঘুরে দেখে কিছু বুঝতে পারল না। নিমবন চারপাশে। কয়েকটা ঝাঁকড়া লেবুগাছও রয়েছে। এগুলো কি কনকলতার হাতের গাছ? এখনও বেঁচে আছে? কে জানে। বদন সাবধান করে দিল, 'কাঁটায় আটকে যাবেন গো। বড্ড কাঁটা!'

পটাপট কয়েকটা লেবু ছিঁড়ল অপরূপা। আর সেই সময় তার মনে হল কনকলতা চেঁচিয়ে উঠেছে, 'অই! অই!' চমক ভাঙলে টের পেল, বদন নিষেধ করছে। রাতবিরেতে গাছের ফল ছিঁড়তে নেই। লেবুগুলো হাতে নিয়ে সে ঝুঁকে একটু ধুলো-মাটি তুলে নিয়ে মাথায় ঠেকাল। মনে মনে বলল, 'ঠাকুমা! বড় দেরি হয়ে গেল। তোমায় ফিরিয়ে আনতে পারিনি—ক্ষমা কোরো।'

হরেন মৃদু স্বরে বলল, 'ছি অপু! কাঁদে না। চলে এস। দিনসবরে আবার আসা যাবে। রঙ্গনাকে নিয়ে আসব। আর আইনত এ জায়গা তো তোমাদেরই।' সে টর্চ জ্বেলে চারদিকটা দেখতে থাকল।

পেছন থেকে বদন হাসতে হাসতে বলল, 'জায়গা জায়গা হয়েই আছে—তাই থাকবে। এখন খাস সম্পত্তি। যদি উদ্ধার কত্তে পারেন, তবু কাজ হবে না। কেউ কিনবে না।'

হরেন বলল, 'কেন?'

'দু-তিনপুরুষ ধরে শুনে আসছি, এ ভিটের দোষ আছে। দোষ-লাগা ভিটে না হলে কি অ্যাদ্দিন এমন পড়ে থাকত ভাবছেন? কেউ-না-কেউ দখল করে রাখত।'

'দোষ মানে?'

'তা জানি নে মশাই!' বদন হাসল। 'শুনেছি কোনপুরুষে কী দোষ ঘটেছিল।'

এইসময় টর্চের আলো ফেলে সতুবাবু এসে গেলেন। 'দেখলেন?'

অপরূপা বলল, 'হ্যাঁ।'

সতুবাবু টর্চের আলো চারদিকে ফেলে ভালভাবে দেখিয়ে দিতে দিতে বললেন, 'মোটে কাঠা পাঁচেক জায়গা। এখানে গাঁয়ের শেষ। আর ওদিকটায় কিছুটা গেলে পুরনো আমলের জমিদারি কাছারি পাবেন। এখন প্রাইমারি স্কুল হয়েছে।'

অপরূপা চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে দেখে হরেন তাড়া দিল, 'আর কী! চলে এস অপু।'

সতুবাবুর বাড়ির সামনে গিয়ে অপরূপা বলল, 'অসংখ্য ধন্যবাদ সতুবাবু! আমরা তাহলে চলি।'

হরেন অবাক হল। সতুবাবু কাঁচুমাঁচু হেসে বললেন, 'না—না। সে কী কথা! আমরা কি আপনাদের সত্যি সত্যি সন্দেহ করেছি? ও একটা কথার কথা। তাছাড়া এই শীতের রাতে পাক্কা তিন মাইল রাস্তা হাঁটা কি সম্ভব? ফেরার ট্রেনও সেই রাত তিনটের আগে নয়।'

অপরূপা গোঁ ধরে বলল, 'না—আমাদের রাতেই ফিরতে হবে। এস হরেনদা।'

সতুবাবু বললেন, 'আহা! সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে। অকল্যাণ করবেন না মা! আমরা সামান্য গৃহস্থ। ছেলেপুলে নিয়ে ঘর করি।'

হরেন বলল, 'ঠিক আছে। বলছেন যখন অত করে।'

অপরূপা শক্ত মুখে বলল, 'না। তুমি এস।'

'মারা পড়বে যে! তোমার মাথা খারাপ?' হরেন হাসতে লাগল।

বাইরের ঘরের বারান্দায় সতুবাবুর সেই দিদি এবং আরও কয়েকটি মেয়ে ভিড় করে দাঁড়িয়ে গেল। সতুবাবুর দিদি বললেন, 'মেয়ের দেখছি বেজায় দেমাক! অত যদি ইয়ে তো দিনসবরে এলেই পাত্তে বাপু! এ রেতের বেলা ভদ্রলোকের বাড়ি ঝঞ্ঝাট বাধাতে কেন আসা?'

সতুবাবু ধমক দিলেন, 'তুমি ভেতরে যাও তো দিদি। সব-তাতে তোমার থাকা চাই। মানুষের মানমর্যাদা বোঝ না।'

বৃদ্ধা দুপদাপ পা ফেলে ভিড় ঠেলে চলে গেলেন ভেতরে। বারান্দায় ভিড় থেকে অপরূপার বয়সী এক যুবতী, সিঁথিতে সিঁদুর এবং হাতে শাঁখা নোয়ার সঙ্গে সোনার কাঁকন—এগিয়ে এসে বলল, 'আপনি আসুন তো ভাই! পিসিমার কথায় কান দেবেন না। ওইরকম মানুষ বরাবর। আসুন আপনি!'

সতুবাবু বললেন, 'আমার বড় মেয়ে। কাটোয়ায় থাকে। যান মা, ওর সঙ্গে ভেতরে যান।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও অপরূপা বারান্দায় উঠল। সতুবাবুর মেয়ে তার হাত ধরে ভেতরে নিয়ে গেল। হরেন সতুবাবুর সঙ্গে ঘরে ঢুকে বলল, 'দাদা! এক কাপ কড়া করে চা পেলে জমত। বড্ড শীত আপনাদের গ্রামে।'

সতুবাবু হেসে বললেন, 'সব ব্যবস্থা হয়েছে। ভাববেন না।'

'না।'...হরেন হাসল।

অপরূপার নতুন স্বপ্ন

রঙ্গনার ভাল ঘুম হয়নি রাতে। পেনি আর তার মাকে শুতে দিয়েছিল মেঝেয়, রঙ্গনা ছিল অপরূপার খাটে। ওদের ঘরে ঢুকিয়েছে এবং শুতে দিয়েছে জানলে অপরূপা কী বলবে, সেই ভয়টাও কম ছিল না রঙ্গনার। ভোরবেলা ওদের জাগিয়ে দিয়েছিল। তারপর বেলাঅব্দি অপরূপার প্রতীক্ষায় বারবার দরজা খুলে দাঁড়িয়ে থেকেছে। দেখতে দেখতে দুপুর হয়ে গেছে। সে তখনও ঘর-বার করছে। অবশেষে একসময় রিকশো থেকে অপরূপা নেমেই দৌড়ে এসে বোনকে জড়িয়ে ধরল। রঙ্গনা দমআটকানো গলায় বলল, 'দেখে এলি দিদি? দেখতে পেলি ঠাকুমার ভিটে কে? কে সব আছে রে? তাদের সঙ্গে দেখা হল? কী বলল?'

উঠোনে গিয়ে রঙ্গনাকে ছেড়ে অপরূপা বলল, 'সব বলছি। কী সুন্দর গ্রামটা রে রনি! ঠাকুমার বাবার ভিটেয় কত লেবুগাছ! নিশ্চয় ঠাকুমা ছোটবেলায় পুঁতেছিল গাছগুলো। এই নে, লেবু এনেছি সেই গাছের।'

সে ব্যাগ খুলে কয়েকটা লেবু বের করল। রঙ্গনা সেগুলো দুহাতে নিয়ে বুকে গালে ঘসে আদর করতে থাকল। 'ইস! কী সুন্দর গন্ধ রে দিদি! ঠাকুমার গায়ের গন্ধ। অবিকল! আমায় কবে নিয়ে যাবি রে?'

অপরূপা বলল, 'শিগগির যাব। তুইও দেখে আসবি। আর জানিস? অনেক সুখবর আছে। বলছি দাঁড়া।'

সে ইঁদারাতলায় গেল। জল তুলে হাত মুখ পা রগড়ে ধুল। তারপর বারান্দায় গিয়ে তোয়ালেতে মুছতে মুছতে বলল, 'ওখানে এক ভদ্রলোকের বাড়িতে রাতে ছিলুম। খুব আদর যত্ন করল। প্রথমে একটু মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়েছিল, জানিস? আমাদের নকশাল ভেবেছিল!'

রঙ্গনা খিল খিল করে হেসে উঠল। 'বলিস কী! তারপর?'

অপরূপা ঘরে ঢুকে কাপড় ছাড়তে গেল। রঙ্গনাও ঢুকল পেছনে-পেছনে। কাপড় বদলাতে-বদলাতে মোটামুটি একটা বিবরণ দিল অপরূপা। রঙ্গনা বলল, 'অ্যাডভেঞ্চার বল্! থ্রিলিং রে! তাই না?'

অপরূপা পরনের শাড়িটা পায়ে ঠেলে মেঝের একপাশে রেখে বলল, 'সতুবাবুদের বাড়িতে আমার খুব খাতির হয়ে গেছে। সেই বুড়ি ভদ্রমহিলা পর্যন্ত আসার সময় কত আদর করল জানিস? বামুনের মেয়ে বলে প্রণামের ঘটা যদি দেখতিস! তারপর আসল ব্যাপারটা বলি শোন্। ওদের ওখানে একটা প্রাইমারি স্কুল হয়েছে। সেটা ওরা ক্লাস এইট অব্দি আপাতত করতে চেষ্টা করছে। মেয়েদের এডুকেশনের অসুবিধা হচ্ছে তো—প্রাইমারি পাশ করে ছেলেরা দূরের গ্রামে কোনো হাইস্কুলে যায়। হোস্টেল পায় সেখানে। মেয়েদের বেলায় তো প্রব্লেম।

'তোকে মাস্টারি দেবে বলল বুঝি?'

'বলল মানে? সাধল বল্।' অপরূপা উজ্জ্বল মুখে বলল। 'সতুবাবু বলল, আমরা আপনাদের কুটুম্ব হয়ে গেলুম গ্রামসম্পর্কে। সতুবাবুই স্কুলের সেক্রেটারি। বলল, কোনো অসুবিধে হবে না। বাড়িতে আলাদা ঘর দেব। আমার ছেলে-মেয়েদের পড়াবেন। স্কুলে ফাইভ এবছরই চালু হয়েছে। ছাত্র হয়েছে। এখনই বাড়তি টিচিং স্টাফ দরকার। আমি জয়েন করলেই হল।'

'মাইনে দেবে তো? নাকি বিনি মাইনেতে?'

'যাঃ! তা কেন? গ্রামের লোকে আপাতত চাঁদা তুলে স্কুলফান্ড করেছে। স্যাংশান হলে তখন বোর্ড থেকে গ্রান্ট দেবে। ব্যস! আর ভাবনা কী?' বলে অপরূপা কপালে ও বুকে হাত ঠেকাল। আস্তে বলল, 'সবই যেন ঠাকুমার ইচ্ছেয় হচ্ছে রে রনি!'

রঙ্গনা উদ্বিগ্ন হয়ে বলল, 'তুই ওখানে থাকলে আমি এখানে একা কীভাবে থাকব?

অপরূপা বোনকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'তোর কথা বলিনি বুঝি? তোকেও তো চায় ওরা। তোর ইংরিজি পড়ানোর প্রশংসা করেছি।'

'সত্যি বলছিস?'

'তোর গা ছুঁয়ে বলছি।' অপরূপা শান্তভাবে তার চিরাচরিত স্বপ্ন দেখার সময়কার দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল। 'সতুবাবু একা নাকি? বললুম না—আমাকে দেখতে কত লোক জুটেছিল সকালে। আমার ধারণা, বি এ পাশ করা মেয়ে ঠাকুমার গাঁয়ে এই প্রথম দেখল ওরা।'

রঙ্গনা চিন্তিতভাবে বলল, 'আমরা চলে গেলে বাড়ির কী হবে?'

'দাদা যখন আসবে, তখন থাকবে তার বাড়িতে।' অপরূপা গার্জেনের ভংগিতে বলল। 'মেয়েরা কি বাবার বাড়ি চিরকাল থাকে? দাদা ফিরে এসে থাকবে।'

দাদার কী হল বল্ তো!' রঙ্গনা ধরা গলায় বলল। 'বোম্বেতে থাকলেও তো চিঠি অন্তত লিখত।'

অপরূপার মাথায় অন্য ভাবনা। বলল, 'শিগগির—ধর্, পরশু-তরশু তোতে-আমাতে যাই। কেমন? গিয়ে কবে একেবারে যাব, তাও ঠিক করে আসি। জিনিসপত্র কী আর নেব? সবই থাকবে। ছুতোর বউকে থাকতে বলে যাব।'

রঙ্গনা বলল, 'ঠাকুমার গাছপালাগুলো?'

'ছুতোর বউ ভোগ করবে যখন, তখন সেই জলটল দেবে-টেবে। ওটা প্রব্লেম নয়।'

হঠাৎ রঙ্গনা একটু হাসল। 'দিদি! হরেনদার কী হবে?'

অপরূপা চোখ কটমটিয়ে তাকাল। 'কী হবে মানে? কে ওর ধার ধারে? নেহাত একটা চাকরির জন্য একটু আস্কারা দিতুম—সাধুবাবুর লোক বলে। নৈলে ওইসব আজেবাজে আনএডুকেটেড লোককে আমি পাত্তা দিতুম ভাবছিস? পথে আসতে-আসতে ওর সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে আমার। ইস্! আমি কী করব, না-করব, তা ঠিক করবে ও!'

রঙ্গনার মনে হল, দিদি তাকেই অকৃতজ্ঞ স্বার্থপর বলে, অথচ সে নিজে কী? হরেনদা এতদিন বাড়ির লোক হয়ে কত দেখাশোনা করল। রঙ্গনা মুখে কিছু বলল না।

অপরূপা বলল, 'অ্যাদ্দিন তোকে বলিনি—আজ বলছি শোন। হরেনদা লোকটা মোটেও ভাল না। অনিচ্ছায় বাধ্য হয়ে মিশেছি। তাছাড়া বড্ড গায়েপড়া তো—এড়ানো যায় না। বদ্যিপুর স্টেশন থেকে বাঁকাশ্রীরামপুর যাবার পথে খানিকটা অন্ধকার হয়েছিল।' অপরূপা ফিসফিস করে বলল। 'তখন জানিস—আমার সঙ্গে অসভ্যতা করতে এসেছিল। আমায় তো চেনে না! জড়িয়ে ধরে কিস করতে আসছিল—এত ওর সাহস!'

রঙ্গনা মনে মনে হেসে মুখে রাগ দেখিয়ে বলল, 'থাপ্পড় দিসনি কেন?' বলে হাসিটা চাপতে পারল না। পরক্ষণে ফিক করে হেসে ফেলল। 'তুই নিশ্চয় ইনডালজেন্স দিয়েছিস। নৈলে অত সাহস হবে?'

অপরূপা রেগে গেল। 'বাজে কথা বলিস নে রনি! আমার মেজাজ ঠিক থাকবে না বলে দিচ্ছি।'

রঙ্গনা হাসতে হাসতে লেবুগুলো লুফতে-লুফতে বেরুল। বলল, 'আজ লেবু-ভাত দিদি। আর কিচ্ছু চাই নে।' সে ঠাকুমার ঘরের দরজা খুলে কয়েকটা লেবু ঠাকুমার পুজোর জায়গায় রাখল। প্রণাম করল। তারপর দুটো লেবু নিয়ে রান্নাঘরে চলে গেল। ডাল-ভাত করা আছে। লেবু হলে জমবে ভাল।

মধুরবাবুর মুক্তি

বসন্তপুরের 'সিংহভবনে' একসময় ঘণ্টা ঘড়ি ছিল। ঘণ্টায় ঘণ্টায় সেটা গেটের কাছে ঢঙ ঢঙ করে বাজত। কৃষ্ণনাথের আমলে আর বাজে না সেটা। এখন দারোয়ান মাত্র একজন—ওই বাহাদুর। ইদানিং বাড়ির মালিক কলকাতায় বলে তার অঢেল স্বাধীনতা। গেটের পাশে টানা একতলা কয়েকটা ঘর। দুটো ঘরে মোটরগাড়ির গ্যারেজ। একটা অ্যামবাসাডার, একটা জিপ। অ্যামবাসাডার গাড়িটা এখন কলকাতায়। ড্রাইভারও সঙ্গে গেছে। গেটের লাগোয়া বাহাদুরের ঘরের খাটিয়ায় বসে সে রোজ রাতে শোবার আগে গাঁজা টানত। গাঁজার ব্যাপারে সঙ্গী একজন চাই-ই। একটানা ছিলিম টানা পোষায় না। তাই বাহাদুর একজন সঙ্গী খুঁজছিল। বদমেজাজী গোঁয়ার বলে বসন্তপুরে তার সঙ্গী জোটে নি। এতদিনে জুটে গেছেন মধুরকৃষ্ণ গোস্বামী। তিনিও তক্কে তক্কে ছিলেন।

শুধু ছিলিমসঙ্গী হন নি মধুরবাবু, আহারনিদ্রারও সঙ্গী বাহাদুরের। বাড়ির ভারপ্রাপ্ত গার্জেন ভুলো—মহেশ্বর যার প্রকৃত নাম, আপত্তি জানাতে এলে বাহাদুর এমন চোখে তাকিয়েছিল যে ভুলো আর ভুলেও উচ্চবাচ্য করে না। ভুলো জানে, বাহাদুর খুনে প্রকৃতির যুবক—কুকরির কোপ ঝাড়তে ভাবনা-চিন্তা পর্যন্ত করবে না। আর কর্তাবাবু বাহাদুরকে পুত্রবৎ স্নেহ করেন! কেন করেন, তাও জানে ভুলো। পয়সা দিয়ে ডালকুত্তা পুষেছেন।

মধুরবাবুর চেহারায় আর বাকি জেল্লাটুকুও নেই। কিন্তু কোত্থেকে একটা ঢোলা প্যান্ট আর খদ্দরের পানজাবি জুটিয়ে চেহারার ভোল রক্ষা করেছেন। রঙ্গনার ঠাকুমার কাছে যে কম্বলটা ফেলে পালিয়েছিলেন নিমতিতা স্টেশনে, এতদিনে সেটা ফেরত পেয়েছেন। রঙ্গনা মেয়েটা—তাঁর মতে, পৃথিবীর এক সেরা মেয়ে। ও মেয়ে যার বউ হবে, তার বরাতকে হিংসে করা উচিত।

বাহাদুর স্বপাক খায়। মধুরবাবু যত পৈতে দেখান না কেন, সে তাঁর ছোঁয়া খাবে না। তবে ছিলিম জিনিসটা আলাদা ব্যাপার। আগুনের কি এঁটো থাকে? তদুপরি শিবের প্রসাদ। শিবের চেলাদের জাতিবর্ণ ভেদ নেই।

ড্রাইভার ভগবতীপ্রসাদের খাটিয়া বাহাদুরের ছোট ঘরে আনায় একটু ঠাসাঠাসি হয়েছে। হাতে সেঁকা চাপাটি আর আলুফুলকপির ঘ্যাঁট দুজনে খেয়ে ছিলিম টেনেছে এবং প্রচুর সুখদুঃখের কথাবার্তা হয়েছে। মৌতাত যত জমে, কথাও তত কমতে থাকে। তারপর পাশাপাশি দুটি খাটিয়ায় দুজনে শুয়ে বেঘোরে ঘুমোয়।

কৃষ্ণপক্ষের রাত। চাঁদ ক্ষয়ে গেছে—উঠবে সেই শেষ রাতে। কম্বলের ভেতর থেকে মধুরবাবু মুখ বের করে বাহাদুরের অবস্থা অনুমান করছিলেন। তার নাক সমানে ডাকছে। কিছুক্ষণ কান পেতে শোনার পর আস্তে আস্তে উঠে বসলেন। অন্ধকার ঠাহর করে আগে ওর বালিশের পাশ থেকে লম্বা টর্চ, তারপর খাপেভরা মারাত্মক কুকরিটা তুলে নিলেন। তারপর দরজা খুললেন সাবধানে। সামনে ফালি রাস্তার পর লতার বেড়া, তার ওদিকে টেনিস লন। বাড়ির মাথা থেকে একটা বালব্ আলো ছড়াচ্ছে গেট অব্দি। গেটে ভেতর থেকে তালা আঁটা। চাবির থোকা দেয়ালের হুকে ঝুলছে। মধুরবাবু সাবধানে টর্চ জ্বেলে বাহাদুরের খাটিয়ার তলায় আলো ফেললেন। প্রকাণ্ড টিনের ট্রাংক। টানলেই শব্দ হবে। হতাশ হয়ে অগত্যা নিজের কম্বল, বাহাদুরের টর্চ আর কুকরিটা সম্বল করেই বেরুলেন। দরজা বাইরে থেকে ঠেলে ভেজিয়ে দিতে ভুললেন না।

গেটের তালা খুলে একটু ফাঁক করে বেরিয়ে গেলেন মধুরবাবু। তারপর তাঁকে আর পায় কে? সিংহভবনের সামনের রাস্তায় দূরে-দূরে একটা করে ল্যাম্পপোস্ট। রাস্তাটা পেরিয়ে গিয়ে আগাছার জঙ্গল ভেঙে মাঠে নামলেন। তারপর খিক খিক করে আপন মনে হেসে উঠলেন। আজ ছিলিমের টানে বড্ড ফাঁকি দিয়ে ঠকিয়েছেন ছোকরাকে। মাথার ওপর ঝকঝক করছে নক্ষত্রপুঞ্জ। কম্বলটা এযাত্রা রক্ষা করেছেন বলে আরও আনন্দ হচ্ছিল। কম্বল মুড়ি দিয়ে নাকবরাবর চললেন স্টেশনের দিকে। এই ছোটলোকদের দেশ থেকে পালানোর জন্য কবে থেকে মন ছটফট করছিল। টর্চটা প্রথমেই ঝেড়ে দেবেন কাউকে। কুকরির খদ্দেরের অভাব হবে না। তাছাড়া যতক্ষণ সঙ্গে এ জিনিস থাকে, ততক্ষণ সাহসও থাকে। আসুক না নেপালী ছোঁড়াটা, এক কোপে মুণ্ডু নামিয়ে দেবেন। অন্ধকারে কুকরিটা একবার বের করে চারদিকে শূন্যে কোপ ছেড়ে মধুরবাবু চাপা গর্জালেন, 'আয় শালারা! চলে আয়—এবার দেখছি।'

স্টেশনের আলো জুগ জুগ করছিল কুয়াশায়। ঠাণ্ডাটা বেড়ে যাচ্ছিল। রাত একটা দশের ডাউন ট্রেনে বিস্তর লোক কলকাতা যায়। ঝিমধরা ভিড় জমে ওঠে প্ল্যাটফর্মে। ঘুমঘুম গলায় চা হেঁকে বেড়ায় জয়রাম আর মঙ্গল। মঙ্গলের চায়ে আদার রস থাকে। মধুরবাবু হনহন করে টাট্টু ঘোড়ার মতো স্টেশনের দিকে চললেন।

অনেকদিন থেকে কলকাতা যাবার কথা ভাবছিলেন মধুরবাবু। যাওয়া হচ্ছিল না। কলকাতায় না

গেলে মানুষের উন্নতি হয় না। এবার যাওয়াটা ঠেকাবার মতো কিছু রইল না। কারণ ওই বাহাদুর। বাহাদুরকে শত্রু করতে পেরে নিজের একটা মুক্তি জোটাতে পেরেছেন মধুরবাবু। বাপ্‌স! ওই খুনে বসন্তপুরে থাকতে আর কি ফেরার কথা ভাবা যায়?

রাত একটার পর যে কোনো সময় বসন্তপুর আপ ও ডাউন দুটো ট্রেন এসে পাশাপাশি দাঁড়ায়। যতক্ষণ না অন্য ট্রেনটা পৌছচ্ছে, স্টেশনে আগে-আসা ট্রেনটাকে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। লুপ লাইনের এই নিয়ম। একটু গণ্ডগোল হলেই মুখোমুখি একই লাইনে সংঘর্ষ ঘটে যাবে।

মধুরবাবু কম্বল মুড়ি দিয়ে এককোণে বসে যখন চা খাচ্ছেন, তখন হাওড়া থেকে আপ গয়াপ্যাসেঞ্জার এসে পৌছল। মধুরবাবু হনহন করে টাট্টু ঘোড়ার মতো কেষ্ট সিঙ্গির মেয়েকে একা নামতে দেখে অবাক হয়ে গেলেন। আর এ কী চেহারা হয়েছে মেয়েটার! শুনেছিলেন কী অসুখ-বিসুখ হয়ে কলকাতায় আছে নার্সিং হোমে। এত রাতে একা এভাবে ফিরে এল যে?

ভীষণ ইচ্ছে করল কথা বলতে, কিন্তু উপায় নেই। একসময় দেখা হলে নিঃসংকোচে টাকাপয়সা চাইতেন। হাসিমুখে দু-একটা টাকা দিত মেয়েটা। দূর থেকে দেখলেই মধুরবাবু চেঁচিয়ে ডাকতেন, 'বিয়াস! বিয়াস!' খুব ভাল মেয়ে। অমন বড়লোকের মেয়ে, দেমাক তো থাকবেই। কিন্তু মধুরবাবুর সামনে একটুও দেমাক দেখায় নি কোনোদিন।

একটা সুন্দর চান্স চলে গেল। কিছু পয়সাকড়ি চাওয়া যেত। দুঃখিত মনে মধুরবাবু চায়ে শেষ চুমুক দিলেন। তারপর ভাঁড়টা ছুঁড়ে ফেললেন স্টেশন ঘরের ড্রেনের দিকে। এবার ভয় হল, ও তো গিয়েই ডাকবে বাহাদুরকে। বাহাদুর জেগে উঠে দেখবে তার টর্চ নেই। কুকরি নেই। তখন কী হবে?

মধুরবাবু মনে মনে মাথা কুটতে থাকলেন, ডাউন ট্রেনটা এক্ষুনি এসে যাক ভালয়-ভালয়। হে মা কালী! হে বাবা মহাদেব!

আপের দিকে সিগন্যাল দিয়েছে। দেখে উঠে পড়লেন। তর সইল না। ওভারব্রিজ না পেরিয়ে গয়াপ্যাসেঞ্জারের কামরা গলিয়ে লাইন ডিঙিয়ে হাঁচড়-পাঁচড় করে ওপারের প্ল্যাটফর্মে উঠে নিশ্চিন্ত হলেন মধুরবাবু। দূরে বাঁকের মুখে আলো দেখা যাচ্ছে। ঢঙ ঢঙ করে ঘণ্টা বেজে উঠেছে আবার। মধুরবাবু কাঁপা-কাঁপা গলায় গান গাইবার চেষ্টা করছিলেন।

'তোমার সঙ্গে পাপ করেছি...'

বাড়ির উত্তর অংশে একটা ঘরে সপরিবারে ভুলো বাস করে। দরজায় ধাক্কা আর ডাকাডাকিতে আলো জ্বেলে সে বেরুল। তারপর আকাশ থেকে পড়ল। 'দিদিমণি তুমি! কর্তাবাবু কৈ? কী ব্যাপার। এমন করে..'

বিপাশা রুগ্‌ণ স্বরে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, 'থামো তো! ওদিকে দরজা খুলে দাও।'

সে বাড়ির সামনের দিকটায় চলে গেল। ভুলো ভেতরের ঘর দিয়ে গিয়ে হলঘরের দরজা খুলল। উঁকি মেরে দেখল গেটের দিকটায় জনপ্রাণী নেই। সে হতবাক হয়ে রইল। বাহাদুর নিশ্চয় গেট খুলে দিয়ে শুয়ে পড়েছে।

বিপাশা বলল, 'হাঁ করে কী দেখছ? আমার ঘরের দরজা খুলে দাও গে। আমি বড্ড টায়ার্ড।'

ভুলো সিঁড়ি বেয়ে ওপরে চলে গেল। দরজা খুলে দিল। সিঁড়ি বেয়ে বিপাশার পৌছতে দেরি হচ্ছিল। সে দোতলার বারান্দায় পৌছে একটু জিরিয়ে নিল। তারপর আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকে সোফায় বসল। আস্তে বলল, 'বিছানাটা ঠিক করে দাও। আমি শোব।'

ভুলো বিছানা গুছিয়ে দিয়ে বলল, 'কিছু খাবে গো? গরম দুধ এনে দেব?'

বিপাশা বলল, 'না! জল খাব।'

ভুলো জল এনে দিল। জলটা খেয়ে বিপাশা একটু হাসল। 'অবাক লাগছে—না ভুলোদা? আমি পালিয়ে এসেছি।'

'সে কী গো!'

'হ্যাঁ। বলো ভুলোদা, মিছিমিছি রুগী সেজে থাকতে ভাল লাগে?' বিপাশা আস্তে আস্তে বলল। 'রোজ বিকেলে একটু বেড়াই। একটা সুন্দর বাগান করে রেখেছে নার্সিং হোমের পেছনে। ওখানে গিয়ে চুপচাপ বসে থাকি। বাড়ির কথা ভেবে কান্না পায়। তাই চলে এলুম।'

ভুলো একটু হাসল। 'কী কাণ্ড! ওনারা তো খুঁজবেন গো।'

'হুঁ! তুমি ট্রাংক কল করে মামাকে জানিয়ে দাও।'

'কর্তাবাবুর ঘরের চাবি তো নেই আমার কাছে। ফোন যে ওনার ঘরে!'

'চাবি নেই?'

'না।'

'তাহলে সকালে পোস্ট অফিসে গিয়ে করবে। যাও ভুলোদা, ঘুমোও গিয়ে।'

'লক্ষ্মী দিদি, কিছু খাও। দুধ গরম করে আনছি।'

বিপাশা রাগ দেখিয়ে বলল, 'কী জ্বালাতন করো ভুলোদা! বললুম না আমি টায়ার্ড। ঘুমুবো।'

'আচ্ছা, আচ্ছা। তুমি ঘুমোও।' বলে উদ্বিগ্ন ভুলো চলে গেলে। বাইরে গিয়ে সে ফের বলল, 'দরজা ভাল করে আটকে দিও দিদি!'

বিপাশা বলল, 'দিচ্ছি! তুমি শুয়ে পড় গে তো! খালি কথা বাড়ায়।' ভুলোর পায়ের শব্দ কাঠের সিঁড়িতে তলিয়ে গেল সে উঠে দরজা বন্ধ করল। দক্ষিণের জানলাটা খুলে দেখল, ওদিকটা অন্ধকার হয়ে আছে। ঘরের উষ্ণতায় সে আরাম পাচ্ছিল। কিন্তু জানলা দিয়ে ঠাণ্ডা আসছে দেখে বন্ধ করে দিল। ফের সোফায় কিছুক্ষণ বসে রইল। কাপড় বদলানো উচিত। কিন্তু ইচ্ছে করছিল না। জীবনে এমন দীর্ঘ আর ক্লান্তিকর ট্রেনজার্নির অভিজ্ঞতা তার ছিল না। রিকশো করে বাড়ি পৌঁছুতে ঠাণ্ডায় প্রায় জমে গিয়েছিল। এখন একটু একটু করে চাঙ্গা হয়ে উঠছে তার শরীর-মন।

বাড়ি ফেরার আনন্দ তাকে নাড়া দিচ্ছিল। তখন ড্রয়ার খুলে একটা ক্যাসেট বের করল। ক্যাসেট চালিয়ে দিল। এই টেপরেকর্ডারটা দিশি জিনিস। শতদ্রু যেটা এনেছে, সেটা ডাঃ চৌধুরীর ক্লিনিকে তার ঘরে রয়ে গেছে। এটা একটা ঘসঘস শব্দ করে। ক্যাসেটটাও হিন্দি ফিল্মের। তবু এখন এই নির্জন রাতে সঙ্গীত তার বড় প্রয়োজন। যা হোক কোনো সঙ্গীত—শুনতে শুনতে তার ঘুমুনোর অভ্যাস বহুদিনের। বড় আলোটা নিভিয়ে টেবিল ল্যাম্পটা জ্বেলে দিল সে। তারপর বিছানায় উঠে শুয়ে পড়ল। কার্ডিগানটা ছুঁড়ে ফেলল সোফায়। কার্ডিগানটাও শতদ্রু এনে দিয়েছে। এদেশের শীতের পক্ষে বাড়াবাড়ি বলা যায়। কলকাতায় তো গায়ে ঘাম এনে দিত। তবু রাতের ট্রেনে কার্ডিগানটা তাকে বাঁচিয়েছে আজ।

বিছানায় চোখ বুজে শুয়ে সে গান শুনতে থাকল। সুরটা তার ভাল লাগছিল এখন। কোন্ গান কোন্ সুরে কখন যে ভাল লাগে, বলা কঠিন। এই ক্যাসেটটা সে দৈবাৎ ঝোঁকের বশে কিনে ফেলেছিল। একটুও ভাল লাগত না। এখন ভাল লাগছে। সে গভীর সুখে ডুবে রইল।

কতক্ষণ পরে তার মনে হল পুবের জানলার বাইরে কে হাওয়ার শব্দে কী একটা বলছে। কান পাতল সে। 'তোমার সঙ্গে পাপ করেছি সেই তো আমার পুণ্য।' বিপাশা উঠে বসল। 'তোমার সঙ্গে পাপ করেছি...' সে অস্ফুটস্বরে বলল, 'কে?'

তেমনি হাওয়ার শব্দে জবাব এল, 'আমি অনি।' বিপাশা বিছানা থেকে নেমে পুবের জানলা খুলে দিল। দেখল, বাগানের পুব-দক্ষিণ কোণে একটা হাওয়াকল উঁচুতে খুব আস্তে ঘুরছে। তার গায়ে আটকে গেছে কৃষ্ণপক্ষের ভাঙা একফালি চাঁদ। ক্ষীণ জ্যোৎস্না তার। হাওয়াকলের প্রকাণ্ড চাকাটা ঘুরে-ঘুরে চাপা ও গম্ভীর শ্বাসপ্রশ্বাসে আবৃত্তি করছে, 'তোমার সঙ্গে পাপ করেছি সেই তো আমার পুণ্য...'

সুপ্রাচীন অলীক এক হাওয়াকলের দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে রইল বিপাশা...

বিপাশার চিঠি

বাঁকাশ্রীরামপুর খুব একটা পছন্দ হয়নি রঙ্গনার। তবে লোকগুলো বেশ ভাল। কথায় কেমন ঠাকুমার মতো টান। শুনতে হাসি পায়। ঠাকুমাদের ভিটের ওপর দাঁড়িয়ে রঙ্গনা হতাশ হয়ে ভেবেছে, এই শুকনো ঢিবি, নিমবন, লেবুগাছের ঝোপ-ঝাড় দেখতে আসার জন্য এত ছটফটানি ছিল ঠাকুমার। রঙ্গনা যদি বসন্তপুর ছেড়ে কোথাও গিয়ে থাকত, কক্ষণো তার মন খারাপ করত না। অবশ্য জায়গাটা ভাল হওয়া চাই। বাঁকা-শ্রীরামপুরের মতো হলেই মুশকিল। না রাস্তাঘাট, না কিছু। এঁদো পাড়াগাঁ। সতুবাবু বলেছেন, 'শিগগির রাস্তা পাকা হচ্ছে স্টেশন অব্দি। ওদিকে মাত্র পাঁচমাইল দূরে রয়েছে হাইওয়ে। তার সঙ্গে জুড়ে দিলে তো এ গ্রাম একেবারে শহর হয়ে যাবে। তখন বাসে চেপেই বসন্তপুর পৌঁছে যাবে লোকে।'

মথুরামোহনের ভিটেয় দুবোনকে ঘর তুলে দেবে গাঁয়ের লোক। অপরূপা ফেরার পথে সেই ঘরের গল্পও সাতকাহন করে শুনিয়েছিল রঙ্গনাকে। 'মাটির ঘর হোক না—দেয়ালে প্ল্যাস্টারিং করে নেব। চুনকাম করলে দারুণ দেখাবে। পরে ইটের করে নিলেই চলবে। জানিস? ওখানকার মাটিতে ভাল ইট হয়? সতুকাকা বলছিলেন। তাছাড়া ধর, দুতিন বছরের মধ্যে ইলেকট্রিসিটিও এসে যাবে গ্রামে। বসন্তপুর কী ছিল বল্? আমাদের ছেলেবেলায় তো কত মাটির ঘর দেখেছি। এখনও দুচারটে আছে। এভাবেই তো হয়। দেশের চেহারা বদলাচ্ছে না বুঝি?'

রঙ্গনা এত শুনেও ভেতর-ভেতর মনমরা হয়ে পড়েছে। তার একটা আশা, দাদা ফিরে এলে তাকে বাঁকাশ্রীরামপুরে নিশ্চয় থাকতে দেবে না। দিদির একটা চাকরির দরকার—করুক না ওখানে। যদি দৈবাৎ কলকাতার সেই ইন্টারভিউয়ের চাকরিটা হয়ে যায়, দিদিও কি ওখানে থাকতে চাইবে?

রঙ্গনা টের পেয়েছে, অপরূপার সঙ্গে হরেনের সম্ভবত একটা রফা হয়েছে। হরেন তাদের সঙ্গে আবার যেতে চেয়েছিল তার মানেটা কী? তাই বলে অপরূপা কি ওকে বিয়ে করবে শেষ পর্যন্ত? রঙ্গনার খুব খারাপ লাগে এটা। দিদিটা বড্ড বোকা। কেন ছেলেদের সঙ্গে মিশতে গিয়েছিল? রঙ্গনা তো এ পর্যন্ত কোনো ছেলেকে পাত্তা দেয় নি। দেবেও না কোনোদিন।

অবেলায় বাড়ি ঢুকলে ছুতোর বউ একগাল হেসে বলল, 'খুব খাওনা-দাওনা হল তাহলে কুটুম বাড়িতে? তা না গো?'

উঠোনের পেয়ারাগাছে একটা দোলনা ঝুলছে, তার ভেতর পেনীর ছোট্ট ভাইটা। অবাক হয়ে অপরূপা বলল, 'ও কী গো বউ?'

'পেনীর বাবা বানিয়েছে। রোজ বলি, কানে করে না।' ছুতোর বউ কুণ্ঠিত হেসে বলল। 'খুলে নিয়ে যাব এক্ষুনি। কোলের খোকা সামলাব, না তোমাদের বাড়ি আগলাব বলো? সবসময় চোরচোট্টার উঁকি ঝুঁকি।'

অপরূপা হেসে বলল, 'না না। থাক না। বেশ তো টাঙিয়েছ।'

দুটো ব্যাগ ভর্তি কপি, টমাটো, আলু নিয়ে এসেছে দুইবোন। চটের ব্যাগে ভরে দিয়েছেন সতুবাবু। ছুতোর বউ তার ভাগ পেল। কোঁচড়ভরে নিয়ে যাবার সময় হঠাৎ পিছু ফিরে বলল, 'উদিকে এক কাণ্ড। পথে আসতে শুনলে না কিছু?'

অপরূপা আনমনে বলল, 'কী গো বউ?'

ছুতোর বউ ফিসফিস করে বলল, 'কেষ্টসিঙ্গির মেয়ে—বুঝলে? কাল রাত্তিরে ছাদ থেকে ঝাঁপ দিয়ে মারা গেছে।'...

অপরূপা চমকে উঠল। 'বিয়াস? বিয়াস ছাদ থেকে ঝাঁপ দিয়েছিল?'

রঙ্গনা চোখ বড়ো করে বলল, 'সে কী। বিয়াসদি তো কলকাতায় ছিল, কবে এল? যাঃ! সব মিথ্যে কথা।'

'না গো। চোখের দিব্যি।' ছুতোর বউ চোখ ছুঁয়ে বলল, 'পেনীর বাবা বললে, কখন হাসপাতাল থেকে পালিয়ে বাড়ি চলে এসেছিল। তারপর রেতের বেলা নাকি নিশিতে ছাদে ডেকে নিয়ে যায়।'

অপরূপা আস্তে বলল, 'মারা গেছে?'

'হ্যাঁ। এতক্ষণ পুড়িয়ে এসেছে শ্মশানে। নাকি পোড়াচ্ছে।' ছুতোর বউ খিড়কির দিকে যেতে যেতে বলল। 'সিঙ্গি, সিঙ্গির বউ, সিঙ্গির ছেলে দুপুরবেলা এসেছে খবর পেয়ে। ফোন করেছিল—বুঝলে না? ফোন করেছিল ভোরবেলা। পেনীর বাবা বলল।'

চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে অন্ধকার এল। নিঃশ্বাস ফেলে অপরূপা বলল, 'রনি, আলো জ্বালাবি নাকি?'

রঙ্গনা হেরিকেন জ্বেলে এনে বলল, 'বিয়াসদির কী হয়েছিল, জানিস দিদি?'

অপরূপা মাথা নাড়ল। একটু পরে বলল, 'ওদের বাড়ি তো যাওয়া হয় না। তোকে অপমান করেছিল। ঢুকতে দেয়নি। নৈলে একবার যেতুম। বিয়াস এভাবে মরে যাবে কে ভেবেছিল বল্?'

রঙ্গনা ধরা গলায় বলল, 'আমায় খুব ভালবাসত বিয়াসদি। কত বই দিত।'

'হ্যাঁ। বিয়াসের মনটা বড় ভাল ছিল।'

'দিদি!'

'উঁ?'

'বিয়াসদি আমায় চুপিচুপি দাদার কথা জিগ্যেস করত। কেন রে?'

অপরূপা ঝাঁঝালো স্বরে বললে, 'আমি কেমন করে জানব? ওসব ছেড়ে দে তো। সন্ধ্যাবেলা আজে বাজে কথা ভাল লাগে না। উনুন ধরাতে হবে। কুকারে তেল নেই। কে আনবে বাবা? কয়লা ধরিয়ে দিচ্ছি।'

রঙ্গনা চুপ করে থাম ধরে দাঁড়িয়ে রইল। তার কান্না পাচ্ছিল। বিয়াসদি এভাবে মারা গেল! সত্যি কি নিশি বলে কিছু আছে—যা মানুষকে রাতের বেলা ডেকে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলে? চোখে জল নিয়ে রঙ্গনা ভয়-পাওয়া দৃষ্টিতে অন্ধকার পাঁচিলের দিকে তাকিয়ে রইল।

পরদিন সকালে টিউশনি করে ফেরার সময় অপরূপা একটা চিঠি পেয়ে চমকে উঠল। বিয়াসের চিঠি যে! তার হাত কাঁপছিল। খামটা কোনরকমে ছিঁড়ে তারিখটার ওপর চোখ পড়লে সে নিশ্চিন্ত হল। চারদিন আগের তারিখ। ড্রিমল্যান্ড নার্সিং হোম থেকে লেখা। কলকাতার ঠিকানা বিয়াস লিখেছে : 'অপু, কতদিন থেকে ভাবছি, তোকে একটা চিঠি লিখব। আলসেমি করে হয়ে ওঠে নি। তুই তো জানিস, আমি চিরকাল ভীষণ অলস। চুপচাপ সময় কাটাতে পারলে আর কিছু চাই নি। এতদিনে যেন তার শাস্তিটা ভালরকমে পাচ্ছি। আমি জানি আমার কোনো অসুখ নেই। অথচ আমাকে জোর করে এই নার্সিং হোমে আটকে রেখেছে। এটা একটা মেন্টাল ক্লিনিক আসলে। রাজ্যের পাগল এনে এখানে ঢুকিয়েছে। আমি কি পাগল? তুই বল্ অপু! আমাকে এবার সত্যি সত্যি পাগল করে ছাড়বে এরা। তাই খুব শিগগির এখান থেকে পালাতে চাই। তার আগে তোকে এই চিঠিটা লিখে ফেললাম একটা জরুরী তাগিদে। তুইও ভাল করে ভেবে দেখিস, যা লিখছি তাতে তোর বা তোদের ফ্যামিলির কোনো অপমান হবে না। আমি জানি, তোদের ভাইবোন কারুর মধ্যে গ্রাম্য লোকের মতো কুসংস্কার ছিল না। অনিদা ঠাট্টা করে আমাকে বলত, তোমরা তো ছাতুরুটিখেকো খোট্টা ছত্রী রাজপুত বংশ। এদেশে এসে জাত ভাঁড়িয়ে কায়েত হয়েছ। আমি বলতুম, তোমাদের দেহেও কিন্তু বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ রক্ত নেই। তোমার ঠাকুমা নাকি কায়েতের মেয়ে।...'

অপরূপা চিঠি থেকে চোখ তুলে দাঁড়িয়ে রইল। কী সব লিখেছে বিপাশা! কেন এসব কথা লিখেছে? তারপরই তার মনে পড়ে গেল ফের, বিপাশা মৃত। সে অন্যমনস্ক হয়ে রইল কিছুক্ষণ। রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে এভাবে চিঠি পড়া উচিত নয় ভেবে সে হন হন করে বাড়ির দিকে হাঁটতে লাগল।

বাড়ি ঢুকে দেখল, রঙ্গনা চুপচাপ বসে আছে বারান্দায় পা ঝুলিয়ে। পেনী তার পায়ের কাছে বসে কড়ি খেলছে আপন মনে। রঙ্গনা বলল, 'চিঠি নাকি রে দিদি? কার চিঠি?'

অপরূপা বলল, 'বলছি।' তারপর সে ঘরে ঢুকে ফের চিঠিটা নিয়ে বসল।

'...তখন অনিদা হাসতে হাসতে বলত, তাহলেও প্লাসে-মাইনাসে মাইনাস হয়ে গেছে। নিছক কথার কথা। এতদিন তোকে বলা দরকার অপু, তুই ছাড়া বসন্তপুরে কেউ আমার বন্ধু ছিল না—সে তুই যাই

ভাব না কেন। তোকেই বলছি শোন্, অনিদার সঙ্গে আমার একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। বুঝতেই পারিস, খুব গোপন সম্পর্ক সেটা। অনিদা আমাকে নিয়ে চলে যেতে চেয়েছিল। আমি সাহস পাই নি। এখন ভাবি, চলে গেলে দুজনেই বেঁচে যেতুম। তবে সেকথা যাক্। যা হয় নি, হল না এ জন্মে—তার দুঃখ নিয়ে আমি বেঁচে থাকলুম। আমার দুঃখ আমারই একার। তাই থাক ওকথা। এবার আসল কথাটি বলি শোন্। দাদার রঙ্গনাকে খুব পছন্দ। দাদা তোকে বলতে সাহস পায় নি। কিন্তু আমাদের বাড়িতে এ নিয়ে প্রচণ্ড অশান্তি হয়ে গেছে। এখনও বাবার সঙ্গে দাদার কথা বন্ধ। কেন তা আশা করি বুঝতে পারছিস। বাবা সেকেলে মানুষ। ফিউডাল সংস্কারে আচ্ছন্ন। দাদার সঙ্গে বাবার কোনোদিন তো মতের মিল হয় নি।...'

অপরূপা একটু হাসল। শতদ্রু তাকে চিঠি লিখেছিল, বলে নি বিপাশাকে। বললেই পারত।

'...জায়গা কমে গেল লেখার। লিখতেও কষ্ট হয় আজকাল। শরীর দুর্বল। অপু, আমার অনুরোধ তুই রঙ্গনাকে দাদার হাতে তুলে দে। রঙ্গনার ভাল হবে। দাদা ওকে নিয়ে অ্যামেরিকা চলে যাবে। আমি জানি, রঙ্গনার মনেও এধরনের একটা স্বপ্ন আছে। ইংরেজি উপন্যাসের পোকা বরাবর। দাদা যখন বিদেশে, তখন রঙ্গনা আমার কাছে গিয়ে খুঁটিয়ে সেখানকার কথা জানতে চাইত। দাদার পাঠানো ছবি গুলো দেখে মুগ্ধ হত। ওকে যদি বলতুম, তুই যাবি ওদেশে? রঙ্গনা বলত, কে নিয়ে যাবে? তাকে তখন বলতে পারি নি, দাদা নিয়ে যাবে। কারণ তখন ওসব কথা মাথায় আসে নি। এখন বলতে পারি।...'

বিপাশা ক্ষুদে অক্ষরে মার্জিনগুলো ভরিয়ে ফেলেছে। শেষপাতার মার্জিনে লেখা খুব অস্পষ্ট হয়ে গেছে। খুঁটিয়ে কষ্ট করে অপরূপা উদ্ধার করল, নাম সইয়ের ওপর দুটো লাইনে লেখা আছে ঃ 'অপু, আমি হয়তো বেশিদিন বাঁচব না। অনি আমাকে ডাকছে। আমি অনির কাছে চলে যাব। ইতি তোর বিয়াস।'

অপরূপা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। ভুল পড়ল নাকি? আবার পড়ার চেষ্টা করল।...'অনি আমাকে ডাকছে। আমি অনির কাছে যাব।'

অপরূপা নড়ে বসল। ডাকল, 'রনি! রনি! আয় তো!'

রঙ্গনা এসে বলল, 'কী রে দিদি? কার চিঠি?'

সে-কথার জবাব না নিয়ে অপরূপা বলল, 'এই লাইন দুটো পড়তে পারিস?'

রঙ্গনা পড়ল ঃ 'অনি আমাকে ডাকছে। আমি অনির কাছে যাব। ইতি তোর বিয়াস।' সে চমকে উঠে বলল, 'বিয়াসদির চিঠি! সে কী!'

অপরূপা বলল, 'আমি, না অনি লিখেছে? ভাল করে দ্যাখ।'

রঙ্গনা দেখে বলল, 'হ্যাঁ-রে! অনি। দিদি, অনি কে রে!'

অপরূপা গলার ভেতর বলল, 'দাদা।'

'দাদার কথা লিখেছে বিয়াসদি?' রঙ্গনা অবাক হল। 'দাদা ওকে ডাকছে—দাদার কাছে যাবে, তার মানে কী রে দিদি? কিছু তো বোঝা যাচ্ছে না।'

অপরূপা তার হাতে চিঠিটা দিয়ে মুখ ঘুরিয়ে জানলার বাইরে কলাবনের ফাঁক দিয়ে ডোবা দেখতে থাকল। মাছরাঙাটা বাঁশের কঞ্চিতে চুপ করে বসে আছে। জলটা সরে আরও সবুজ হয়েছে।

রঙ্গনা খুঁটিয়ে চিঠি পড়ার পর করুণভাবে হাসল। 'যাঃ! কোনো মানে হয় না! মনেই পড়ে না কবে বিয়াসদিকে বলেছিলুম অ্যামেরিকা যাব। বিয়াসদি থাকলে...' সে চুপ করে গেল।

অপরূপা অস্ফুটস্বরে বলল 'শেষ কথাটা এমনভাবে লিখেছে যেন দাদা একজন ডেড ম্যান। পাগলামি না কী! বিয়াসের অসুখটা তো মেন্টাল। সাইকিক পেসেন্টের কীর্তি!' সে ঘুরে রঙ্গনার দিকে তাকিয়ে তার মতামত বুঝতে চাইল। 'তাই না রনি? দাদার কিছু হলে বিয়াস জানবে, আমরা বুঝি জানব না?'

রঙ্গনা ঠোঁট উল্টে চিঠির দিকে তাকিয়ে বলল 'কে জানে!'

অপরূপা একটু হাসল। 'কী রে? ইচ্ছে করছে?'

'কিসের ইচ্ছে?'

'যাবি অ্যামেরিকা?'

'মারব বলে দিচ্ছি!' রঙ্গনা কিল তুলল। 'দিদি বলে খাতির করব না।'

চিঠিটা সে অপরূপার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল।

অপরূপা ডাকল, 'রনি! শোন।'

বাইরে থেকে রঙ্গনা বলল, 'কী?'

'এখানে আয়। কথা আছে।'

'ওখান থেকে বল্। কান আছে আমার।'

অপরূপা বেরিয়ে গিয়ে বলল, 'সিরিয়াসলি বলছি, রনি। সিঙ্গিরা তোকে বাড়ি ঢুকতে দেয়নি। তোর কি প্রতিশোধ নিতে ইচ্ছে করছে না?'

রঙ্গনা মুখ নামিয়ে বলল, 'খুব করছে।'

'তাহলে?'

রঙ্গনা চুপ করে থাকল। তার পায়ের আঙুলে থামের গোড়ার ভাঙা পলেস্তারা খসে পড়ছিল।

অপরূপা বলল, 'কী হল? কাঁদছিস কেন?'

রঙ্গনা জবাব দিল না।

তখন অপরূপা বোনকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'ছিঃ রনি! এতে কাঁদবার কী হল বল তো? বিয়াস আমার একমাত্র বন্ধু ছিল। বেচারা অমন করে মরে গেল। কিন্তু কী করব? আমার নিজের সমস্যা কি কম? আর কিছু ভাববার সময়ই পাচ্ছি না। অন্তত বিয়াসের মুখ চেয়ে একটা কিছু করা দরকার। তুই অমত করিসনে রে! কেমন?'

গোপনে নির্জনে

সূর্য এখন উত্তরায়নে চলে এসেছে। রোদে উষ্ণতা জেগেছে। বসন্তপুরের মাঠে ঘূর্ণিহাওয়া রেললাইন ডিঙিয়ে চলে যায় করালী নদীর দিকে। শ্মশানের ভস্ম উড়িয়ে ঢোকে দেবী করালীর ভিটেয়। প্রাচীন বৃক্ষেরা চঞ্চল হয়ে ওঠে। মধ্য ফাল্গুনে এখন মন্দার শিমুল পলাশের লাল ফুল দাউদাউ জ্বলছে চতুর্দিকে। হাইওয়ের দুধারে দীর্ঘ বৃক্ষরেখা। শিরিস দেবদারু বট অশত্থ চিকণ ঘনসবুজ রঙে ঢাকা। নদীর সাঁকোর কোণে অমলতাস গাছটা হলুদ ফুলে ঢাকা। দুই বোন বাস থেকে নেমে করালীর ভিটেয় গিয়েছিল।

কুড়ানি ঠাকরুন বলতেন, 'করালী আমার মা। আমি তার মেয়ে।' বলতেন, 'মা স্বপ্ন দিয়ে ডেকে পাঠিয়েছিল আমাকে। মায়ের মনে এট্টা ইচ্ছে ছিল। সে-ইচ্ছের ফল এই দেখছিস ভাই! আমার ঘরসংসার, আমার ফুলফলের বিরিক্ষি, আমার গউর, আমার অপু, আমার রনি, আমার দুষ্টুটা—ওই অনি। আর কী চাই মানুষের? শুধু দুঃখটা রইল বাপটার জন্যে। সেই যে জল আনতে গেল, আর ফিরে এল না—দেখাও হল না এ জন্মেতে।'

দেবী করালীর কাছে তাঁর জন্য 'মানসা' করতে এসেছিল দুজনে। ঠাকুমার গাছের কিছু ফুলফল এনেছিল রেকাবিতে। দুজনেরই পরনে নতুন তাঁতের শাড়ি। স্নান করে এসেছে। এলোচুল ছড়িয়ে রয়েছে পিঠে। ভাঙা মন্দিরের চত্বরে রেকাবিটা রেখে দুজনেই চোখের জল ফেলেছে। গলবস্ত্রে প্রণাম করেছে। তারপর শেষবেলায় বাস রাস্তায় ফিরে এসে বাসের প্রতীক্ষা করছে বকুল গাছটার তলায়।

সেই সময় ব্রিজের শেষ প্রান্তে অমলতাস গাছটার ধারে একটা মোটরগাড়ি এসে থামল। অমনি রঙ্গনা অস্ফুটস্বরে বলে উঠল, 'বিয়াসদির দাদা না?'

অপরূপা তাকিয়ে রইল। শতদ্রু গাড়ি থেকে বেরিয়ে ব্রিজের ওপর উঠল। রেলিঙে ভর দিয়ে নদী দেখতে থাকল।

অপরূপা চঞ্চল হয়ে উঠল। বলল, 'আমাদের দেখতে পায় নি। নৈলে চলে আসত। আয় রনি!'

'কোথায়?'

'শাটলেজদার কাছে।' অপরূপা দুষ্টুমি করে হাসল। রঙ্গনার হাত ধরে টানলও।

রঙ্গনা রাঙামুখে বলল, 'তুই যেন কী! যেচে পড়ে ভাব জমাতে যাস্ লোকের সঙ্গে।'

অপরূপা বলল, 'অতবড় একটা ট্রাজেডি ঘটল। নিজের ছোট বোন! তাই অ্যাদ্দিন আমদের বাড়ি আসে নি। আমিও সেইকথা ভেবে কোন যোগযোগ করি নি। আয় না! অন্তত বিয়াসের জন্য সিম্প্যাথি জানানো উচিত কি না বল্ তুই?'

রঙ্গনা বলল, 'সিম্প্যাথি থাকলে দুলাইন পোস্টকার্ডে লিখে পাঠাতিস! পাঠাস নি কেন?'

অপরূপা দোষী মুখে বলল, 'ঠিক বলেছিস। অতটা খেয়াল হয় নি। যাক গে, যা হবার হয়েছে—আয়।'

রঙ্গনা দ্বিধাজড়িত পা ফেলে অপরূপাকে অনুসরণ করল। অপরূপার এই তাগিদের কিছু বোঝে না রঙ্গনা। অপরূপা ফেব্রুয়ারি মাসটা টিউশনি করে জবাব দিয়েছে। বাঁকাশ্রীরামপুর চলে যেতে খরচপাতি আছে বলে হিসেব করে চলছে। বিয়াস ওভাবে মারা না গেলে সে শতদ্রুর সঙ্গে শিগগির যোগাযোগ করত। কিন্তু শোকতাপগ্রস্ত মানুষকে এসব কথা এখন বলা যায় না! অবশ্য ইচ্ছে তো শতদ্রুরই। কিন্তু শতদ্রুরও এসে কিছু বলার মতো মানসিক অবস্থা ছিল না এতদিন। এবার কথাটা নিয়ে বসা যায়। রঙ্গনার ব্যবস্থাটা সেরে ফেলে অপরূপা তখন বাঁকাশ্রীরামপুর চলে যাবে।

পায়ের শব্দে মুখ ফিরিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল শতদ্রু। তার পরনে ঘিয়ে রঙের পাঞ্জাবি আর দুধের মতো শাদা রঙের পাজামা। তার চুল উড়ছিল এলোমেলো হাওয়ায়। অপরূপার চোখে খুব সুন্দর দেখাল তাকে। এমন ছেলের হাতে বোনকে তুলে দেবার গর্বে সে চঞ্চল হল আরও।

শতদ্রু আস্তে বলল, 'কী খবর?'

একটু দমে গেল অপরূপা। ভাবল, এখনও বোনের শোকটা কাটিয়ে ওঠে নি শতদ্রু। অপরূপা একটু হাসল। 'আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছিলুম। বিয়াস ওভাবে হঠাৎ...'

শতদ্রু বলল, 'মন্দিরে গিয়েছিলেন বুঝি? পুজো দিতে?'

অপরূপা বলল, 'হ্যাঁ। আমরা—মানে আমি চলে যাচ্ছি তো বাঁকাশ্রীরামপুরে, তাই প্রণাম করতে এসেছিলুম।'

'সেটা কোথায়?'

'বেশ খানিকটা দূরে। আমার ঠাকুমার বাবার গ্রাম। সেখানে স্কুলে একটা চাকরি পেয়েছি।'

'আচ্ছা!' শতদ্রু একটু হেসে রঙ্গনার উদ্দেশে বলল, 'আপনিও যাচ্ছেন তো?'

রঙ্গনা আস্তে ঘাড় নাড়ল। হ্যাঁ কিংবা না বোঝা কঠিন। অপরূপা দ্রুত বলল, 'কিছু ঠিক নেই। ওর গ্রাম-ট্রাম ভীষণ অপছন্দ। আপনি তো ভালই জানেন শাটলেজদা, দিনরাত্তির ইংরিজি উপন্যাস পড়ে ওর মনে এখন সে-দেশের স্বপ্ন।' অপরূপা হাসতে লাগল। রঙ্গনা মুখ ফিরিয়ে নদী দেখতে থাকল।

শতদ্রু হাসল। 'তাই বুঝি? বেশ তো। আরও পড়াশুনো করুন। নিউজপেপার দেখবেন, মাঝে মাঝে ফরেন স্কলারশিপের বিজ্ঞাপন দেয়।'

অপরূপা বলল, 'বিয়াসদি মৃত্যুর আগে কলকাতা থেকে আমাকে চিঠি লিখেছিল।'

'হ্যাঁ আমাকে বলেছিল লিখবে।'...বলে শতদ্রু একটু হাসল। 'কিন্তু আর তো সে-প্রশ্নই ওঠে না।'

'আপনি কবে ফিরছেন শাটলেজদা?'

শতদ্রু ভুরু কুঁচকে একটু ভেবে বলল, 'কোথায়? স্টেট্সে? নাঃ। ফিরছি না।'

অপরূপা আস্তে বলল, 'হ্যাঁ—এমন একটা ট্র্যাজিক ঘটনা ঘটল। বাড়ির একমাত্র ছেলে আপনি।'

'ঠিকই ধরেছেন।' শতদ্রু একটা চাবির রিঙ আঙুলে জড়িয়ে ঘোরাতে-ঘোরাতে বলল। 'এ বয়সে বাবাকে কষ্ট দেওয়া উচিত মনে করলুম না। তবে বসন্তপুরে থাকছি না ডেফিনিটলি! আমাদের এখানকার বাড়ি-টাড়ি এভরিথিং বেচে দিচ্ছি। সব ঠিক হয়ে গেছে। মোস্ট্ প্রবেবলি বাই দা নেক্সট্ উইক আমরা কলকাতায় নতুন বাড়িতে গিয়ে উঠছি।'

অপরূপা শুকনো মুখে বলল, 'হ্যাঁ—বাড়িটার তো দোষ ঘটে গেল।'

শতদ্রু হাসতে লাগল। 'যিনি কিনছেন, তিনি সব জেনেশুনেই কিনছেন।'

'আপনি কলকাতায় থাকছেন তাহলে?

'হ্যাঁঃ।' শতদ্রু ঠোঁট বাঁকা করে বলল। 'একটা কিছু করতে হবে রুজিরোজগারের জন্য। আমার বরাত! নরক বলে যাকে ঘেন্না করি, তার সঙ্গে অ্যাডজাস্ট করে চলতেই হবে। উপায় কী?' সে শিস দেবার ভংগিতে ঠোঁট গোল করে নদীর দিকে ঝুঁকল।

রঙ্গনা বলল, 'দিদি! একটা ট্রাক আসছে। নিয়ে যাবে না?' অপরূপা দেখে নিয়ে বলল, 'দ্যাখ না, দাঁড়ায় নাকি।'

শতদ্রু বলল, 'কেন? আমি অনায়াসে আপনাদের লিফট্ দিতে পারি।'

অপরূপা জবাব দিল না। দুই বোন রাস্তার একেবারে মাঝখানে। ট্রাকটা থেমে গেল। ড্রাইভার মুখ বাড়িয়ে বলল, 'গাড়ি বিগড়ে গেসে?'

অপরূপা দ্রুত বলল, 'হ্যাঁ। আমাদের একটু বসন্তপুরে পৌঁছে দেবেন সর্দারজী?'

'আইয়ে, আইয়ে। বৈঠ্ যাইয়ে।'

বাড়ি ঢুকেই অপরূপা বলল, 'মা করালী যা করেন, সবই ভালর জন্যে রে! ভেবে দ্যাখ, কেষ্টসিঙ্গির ছেলের কথায় তখন যদি কিছু করে বসতুম, এখন কী অবস্থা হত তোর? ওই ছত্রী রাজপুত—খোট্টাবংশের বুড়ো আর তার দেমাকী বৌ-এর পাল্লায় পড়তেই হ'তো তোকে। আর শাটলেজ না কাটলেট বলতিস, ঠিকই বলতিস। আসলে বড়লোকের ছেলের খেয়াল। কথায় বলে না? বড়র পীরিতি বালির বাঁধ...'

রঙ্গনা ইঁদারাতলার দিকে যাচ্ছিল। ঘুরে বলল, 'শাট্ আপ! খুব হয়েছে।'

অপরূপা আসন্ন সন্ধ্যার ধূসর আলোয় শান্তভাবে হাসল। 'সত্যি বলছি রে রনি, তুই না থাকলে বাঁকাশ্রীরামপুরে কী করে একা থাকতুম ভেবে পাচ্ছিনে। আফটার অল বিদেশবিভুঁই জায়গা তো বটে। অজ পাড়াগাঁ। দুজনে থাকলে কত সাহস পাব বল্ রনি।'

তারপর সে বাড়ির ভেতর চোখ বুলিয়ে শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে ফের বলল, 'দাদা যদি কোনোদিন ফিরে আসে, সে এ বাড়িতে বাস করবে। সেই ভেবেই বাড়িটা বেচলুম না। থাক পড়ে। ছুতোর বউ দেখাশোনা করবে। ঠাকুমার লাগানো ফুল-ফলের গাছপালাগুলো একটু জলটল পেয়ে বেঁচে থাকলে ঠাকুমার আত্মা শান্তি পাবে। আর কী করতে পারি আমরা, বল্ রনি?'

রঙ্গনা কিছু বলল না। সে ইঁদারায় ঝুঁকে গভীরতম জলের ভেতর আকাশ দেখার চেষ্টা করছিল। বালতিটা ডুবিয়ে জলকে স্থির হতে দিচ্ছিল। তার দিদি জানে না, কেউ জানে না, সেই কবে ঠাকুমার সঙ্গে করালীর মন্দির থেকে ফেরার সময় শতদ্রুর গাড়িতে তার মনের খুব তলার দিকে কী এক আবছা গোপন স্বপ্ন জেগে উঠেছিল। সেই স্বপ্ন সে মুছে ফেলতে পারে নি। স্বপ্নটা ছিল অজানা সুন্দর আশ্চর্য এক দেশের—সে এক বহুদূরের পৃথিবী। ছবির মতো সাজানো রাস্তাঘাট। প্রজাপতির মতো ফুটফুটে রঙীন মানুষজন। হয়তো অ্যামেরিকা নয়, ইউরোপ নয়—অন্য এক দেশ। স্বর্গের মতো সুন্দর, মহৎ, সম্ভাবনাময়, নিরুপদ্রব।

বিয়াসদির চিঠিটা পড়ার পর সেই গোপন স্বপ্ন তাকে আরও চঞ্চল করেছিল। সারারাত সে ভাবত কত সব ভাবনা। আর ভাবনাগুলোর মধ্যে ফুটে উঠত দীর্ঘ সুঠাম উজ্জ্বল চেহারার এক যুবাপুরুষ—তার মধ্যে শতদ্রুর আদল দেখে সে লজ্জায় বালিশে মুখ গুঁজত। রঙ্গনা সেই যুবাপুরুষটিকে চুপি চুপি ভালবাসতে শুরু করেছিল। এতদিনে আবিষ্কার করল, সেই যুবাপুরুষ শতদ্রু নয়। অন্য একজন। তার প্রতীক্ষা রঙ্গনার জীবনে আমৃত্যু থেকে যাবে। রূপের জগতে সে বুঝি এক অরূপরতন।

রঙ্গনা ইঁদারায় ঝুঁকে স্বপ্নভঙ্গের দুঃখটাকে লুকোতে চাইছিল। তার বুকের ভেতরে তীব্র একটা কান্নার আবেগ ঠেলে উঠছিল। সে ঠোঁট কামড়ে ধরে গভীরতর প্রতিবিম্বিত আকাশ দেখতে থাকল।

অপরূপা যখন তাকে ডেকে বলল, 'অমন করে সন্ধেবেলা ইঁদারায় ঝুঁকে থাকতে নেই, সরে আয়—' তখন সে মুখ তুলে আস্তে বলল, 'যাচ্ছি।' তারপর ভরা বালতিটা তাড়াতাড়ি টেনে তুলল। দিদি দেখার আগেই ভেজা চোখ দুটো সে বালতির জল দিয়ে ধুয়ে ফেলল।..

উপসংহার

আজকাল গ্রামাঞ্চলের চেহারা দ্রুত বদলে যাচ্ছে। আদত কারণ অবশ্য ভোটের রাজনীতি। ভোটকুড়ুনো মোটরগাড়ি চলাচলের উপযোগী রাস্তাঘাট দরকার। মাত্র একটা ভোট জয়-পরাজয় সূচিত করে। সুতরাং এই তৎপরতা। হাইওয়ে থেকে বাঁকা-শ্রীরামপুর পর্যন্ত পাঁচমাইল কাঁচা রাস্তা পাকা হচ্ছে। একপ্রস্থ ঝামা ইটের সোলিং পড়েছে, যদিও প্রত্যেকটা টুকরোর মধ্যে কালো রঙ খোঁজা বৃথা এবং দ্রুত ডিজেলচালিত বৃহৎ রোলারে পেষাই করে তখনই একস্তর হাল্কা পাথরকুচি ছড়িয়ে সত্যাসত্য গোপন করা হচ্ছে। রোডস দফতরের ওভারশিয়ারবাবু কন্ট্রাকটারের তাঁবুতে বসে মুরগির ঠ্যাং চিবোন এবং ওকে আওয়াজ দিয়ে সদর অফিসে ফেরেন। ক্বচিৎ কোনো মোলায়েম-স্বভাবী ইঞ্জিনিয়ারের আগমন ঘটে। পথিপার্শ্বে কালো ড্রামে পিচ সেদ্ধ হয়। কড়াইভর্তি গরম পিচ নিয়ে লোকেরা ছোটাছুটি করে। তাদের পেছনে আদিবাসী মেয়েদের মাথায় বালির ঝুড়ি। ইঞ্জিনিয়ার ভদ্রলোক উদাসচোখে দিগন্তবিস্তৃত সবুজ মাঠ দেখতে দেখতে হঠাৎ-জেগে-ওঠা কণ্ঠস্বরে বলেন, 'মাই গুডনেস! এ যে দেখছি সত্যিই সবুজ বিপ্লব!'

এখন বসন্তকাল। তবু শরতকাল বলে ভ্রম হয়। বাঁকা-শ্রীরামপুরের গা ঘেঁষে বাঁজা ডাঙায় কন্ট্রাকটারের তেরপলের কয়েকটা তাঁবু পড়েছে। পেছনে ঢ্যাঙা বিশাল শিমুল তার ফুল উজাড় করে ফেলে নিঃস্ব হয়ে সারাদিন উচ্ছৃংখল হাওয়ায় পুঞ্জপুঞ্জ তুলো ছড়ায়। পুকুরপাড়ে জীর্ণ প্রাচীন শিবমন্দিরে ভক্ত সন্নেসীরা দেয় আসন্ন সংক্রান্তির উদ্দেশে জয়ধ্বনি। স্কুলপালানো ছেলেমেয়েরা তাঁবুর আনাচেকানাচে ঘুরঘুর করে। সিগারেটের শূন্য প্যাকেট থেকে রাংতাকাগজ সংগ্রহ করে। প্রাইমারি সেকশনের দিদিমণিটি বড় কড়া। স্কুলের বারান্দা থেকে এদিকে তাকালেই তাদের বুকের স্পন্দন বেড়ে যায়। শিবমন্দিরের কল্কেফুলের জঙ্গলে তারা গা ঢাকা দেয়। ঠিক তখনই ঢং ঢং করে টিফিনের ঘণ্টা বেজে ওঠে।

বাঁকা-শ্রীরামপুর আমোদিনী বিদ্যালয় এখন সরকারী অনুমোদন লাভ করেছে। সামনে বছর অন্তত একডজন ছাত্র-ছাত্রী স্কুলফাইনাল দেবে। প্রাচীনকালের জমিদারী কাছারিবাড়ির একতালা সারবাঁধা ঘরগুলোর ভোল বদলেছে। দুপাশে কিছু নতুন ঘর জোড়া দেওয়া হয়েছে। সামনে ফুলবাগিচা জেগে উঠেছে, এবং গেটে বুগানভিলিয়ার ঝাঁপি। ফুলে ফুলে লাল ঝরনা নেমেছে।

ছুটির পর রঙ্গনা বাড়ি ফেরে না। স্কুলের পেছনে বাঁধের নিচেই ছোট্ট নদী। সে বাঁধে কিছুদূর এগিয়ে ঘাসেঢাকা একটুকরো জমিতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত বসে থাকে। হাতে একটা বই। বইপড়া স্বভাব তাকে আজও ছাড়েনি। পড়তে পড়তে কখনও মুখ তুলে প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে থাকে। দূরের ঘাটে থানপরা কোনো বৃদ্ধাকে দেখলেই তার বুক ছ্যাঁৎ করে ওঠে, কুড়ানি ঠাকরুন নাকি?

কুড়ানি ঠাকরুনের বাপের ভিটেয় গ্রামপঞ্চায়েত দুবোনের জন্য মাটির ঘর তুলে দিয়েছে। উঠোন ঘিরে সুন্দর বাঁশের বেড়া আর বেড়া ঢেকে ফেলেছে সবুজ লতার ঝালর। উঠোনে কত ফুলফলের গাছ। কুড়োনি ঠাকরুনের আত্মা ভর করেছে রঙ্গনাকে। জামাইবাবু হরেনকে দিয়ে বীজ ও চারা আনায়। হরেন এখনও বসন্তপুরে সাধুবাবুদের পেট্রল পাম্পে চাকরি করছে। ছুটির দিনটা ছুটে আসে বউয়ের কাছে। চাকরি ছাড়লে তার চলবে না। তার অথর্ব জ্যাঠামশাইকে সপরিবারে ভিখিরী হতে দেবে কোন মুখে সে? এদিকে অপরূপা সন্তানসম্ভবা। হরেনের ইচ্ছা, বাচ্চাটা পৃথিবীর মুখ দেখলেই সে শ্যালিকাকে কোথাও গায়ের জোরে ঝুলিয়ে দেবে পাকাপোক্ত জায়গা দেখে। আর কোনো আপত্তি বরদাস্ত করবে না। আর কতকাল ধিঙ্গি আইবুড়ি থাকবে অমন সুন্দর মেয়েটা? বিয়ের কথা শুনলেই আত্মহত্যার শাসানিতে নিশ্চয় গভীর কোনো অভিমান আছে, হরেনের এই ধারণা। তবে হরেনের এও

মনে হয়, গতবছর বহরমপুরে বেসিক ট্রেনিং পড়ার সময় মাসছয়েক একা ছিল। তখন কারুর সঙ্গে প্রেম-ট্রেম বাধিয়ে আসে নি তো? অপরূপা তাই শুনে বলে, 'তোমার মাথা খারাপ? তাহলেও তো বেঁচে যেতুম। ওর মনটা অন্যধাতুতে গড়া।'

এদিন বিকেলে রঙ্গনা স্কুলের ছুটির পর নদীর ধারে বসে ছিল। তার হাতে একটা হাল্কাধরনের ইংরেজি নভেল। বহুবার পড়া হয়ে গেছে। কিন্তু উপায় কী? বাঁকা-শ্রীরামপুরে বই কোথায় পাবে? বহরমপুরে ট্রেনিংয়ের সময় কয়েকটা বই স্টাইপেন্ডের টাকা বাঁচিয়ে কিনেছিল। আর কয়েকখানা যা আছে, সবই মধুরবাবুর চোরাইমাল। বইগুলো সে যত্ন করে তাকে সাজিয়ে রেখেছে। সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে সুখী চোখে তাকিয়ে থাকে। কল্পনা করে তার সারাঘর বইয়ে ঢাকা—রঙীন ফুলের মতো সুন্দর কত বই, কত কথা। সেখানেই তার বেঁচে থাকার পৃথিবী।

বাঁদিকে বাঁধের ওধারে উঁচু বাঁজা ডাঙায় কন্ট্রাকটারের তাঁবুর মাথা দেখা যাচ্ছিল। শেষবেলায় কালো ধোঁয়া উঠেছে চাপচাপ সেদিকটায়। পিচের ড্রাম গরম করছে মজুরেরা। মার্চেই কাজ শেষ করার কথা ছিল। শেষ করা যায় নি। এপ্রিলের একটা সপ্তাহ চলে গেল। তাই ব্যস্ততা। সন্ধ্যা অব্দি কাজ চলেছে। আগামী পয়লা বোশেখ পূর্তমন্ত্রী উদ্বোধন করতে আসবেন।

বাঁজা ডাঙা থেকে কেউ দাঁড়িয়ে তাকে দেখছে—পরনে ধূসর প্যান্ট, সাদা শার্ট, মাথায় টুপি। রঙ্গনা অস্বস্তি বোধ করছিল। লোকটাকে সে এদিকে আসতে দেখে উঠে দাঁড়াল। নির্জন জায়গা। তার গা ছমছম করছিল। বাঁধে উঠতেই সে দেখল, লোকটা থমকে দাঁড়িয়ে গেছে। পড়ন্ত বেলার লালচে আলো তার মুখের একটা পাশে পড়েছে। রঙ্গনাও দাঁড়িয়ে গেল। তার বুকের ভেতর একঝলক রক্ত ছলকে উঠল। শতদ্রু না?

পরক্ষণেই দেখল শতদ্রু হাসছে। তারপর লম্বা পায়ে এগিয়ে সে বাঁধে উঠল। 'কী আশ্চর্য! আপনি রঙ্গনা না?'

রঙ্গনা হাসল এতক্ষণে। 'আপনি এখানে?'

শতদ্রু একটু মুটিয়ে গেছে। রঙের সেই উজ্জ্বলতা আর নেই। ঈষৎ তামাটে, রোদপোড়া আর রুক্ষ দেখাচ্ছে তাকে। বলল, 'কদিন থেকে লক্ষ্য করছি আপনাকে। কিন্তু ভুলেও ভাবিনি যে আপনি।' শতদ্রু সিগারেট ধরাল উদ্দাম হাওয়ার আড়ালে। 'বাঁকা-শ্রীরামপুরের কথা আপনার দিদির কাছে শুনেছিলুম যেন। নাকি অন্য কেউ বলেছিল। যাক্ গে, খবর বলুন। আপনার দিদি কেমন আছেন?'

রঙ্গনা বলল, 'দিদি ভাল আছে। আপনি বুঝি রাস্তার কাজে এসেছেন?'

'আর বলবেন না।' শতদ্রু একটু বিরক্ত মুখে বলল। 'শেষপর্যন্ত পৈতৃক পেশায় ঢুকতে হল। চাকরি-টাকরি আমার পোষাল না। ওদিকে বাবা মারা গেলেন। তারপর ভাবলুম, বাবার পরিচিত এলাকাতেই কাজকর্ম নেওয়ার সুবিধে অনেক। বাবার অনেক কন্ট্যাক্ট্ ছিল তো এ জেলায়।'

রঙ্গনা হাসল। 'তাহলে সত্যি আমেরিকায় ফিরে যাননি দেখছি।'

শতদ্রুও হাসল। 'সেই শেষ দেখা আপনার সঙ্গে—করালী নদীর ব্রিজে। মনে আছে, আমি সম্ভবত খানিক রূঢ় ব্যবহার করেছিলুম। এতদিনে ক্ষমা চাওয়ার সুযোগ পাওয়া গেল। আসলে তখন আমি প্রচণ্ড মানসিক বিপর্যয়ে ভুগছিলুম। ক্ষমা করছেন তো?'

রঙ্গনা আস্তে বলল, 'কেন ও কথা? পাঁচবছর আগে কী ঘটেছিল, আমার মনে নেই।'

'আমার মনে আছে।' শতদ্রু দূরের দিকে তাকিয়ে চাপা নিঃশ্বাস ফেলল। তারপর ঘুরে বলল ফের, 'তারপর আমার খুব ইচ্ছে করেছিল, আপনাদের বাড়ি যাই। সবকথা বলে আসি। কিন্তু বুঝতে পারিনি কীভাবে আপনারা নেবেন ব্যাপারটা।'

রঙ্গনা ওর চোখে চোখ রেখে বলল, 'কী?'

'আপনার দাদার ব্যাপারটা।'

'আমরা জানি।'

'জানেন? শতদ্রু একটু চমকে উঠল। 'কীভাবে জানলেন?'

'আমার জামাইবাবু শুনেছিলেন আপনাদের বাড়ির একটা লোকের কাছে।'

'ভুলোদার কাছে বুঝি?'

'হ্যাঁ।'

শতদ্রু গলায় একটু ব্যকুলতা এনে বলল, 'বাবার কোনো হাত ছিল না এতে। জানোয়ার পুষেছিলেন বাড়িতে—'

বাধা দিয়ে রঙ্গনা বলল, 'ওসব কথা থাক। বসন্তপুরের বাড়িটা তো বেচে দিয়েছেন শুনেছি।'

শতদ্রু আনমনে বলল, 'হ্যাঁ। বহরমপুরে একটা বাড়ি কিনেছি সম্প্রতি। কলকাতার বাড়িটায় ভাড়াটে বসিয়েছি।' তারপর সে একটু হাসল। 'এখন বাবার মতো ঘোর বিষয়ী মানুষ হয়ে গেছি, বুঝলেন? খুব হিসেবী মানুষ।'

'তাই বুঝি?'

'হ্যাঁ। বউ, ছেলেপুলে—অবশ্য মাত্র একখানা, সবে হাঁটতে শিখেছে—বড্ড বিচ্ছু। বুঝলেন?'

রঙ্গনা তাকাল তার মুখের দিকে। 'কোথায় বিয়ে করলেন?'

'বহরমপুরেই শেষপর্যন্ত! বাবাকে আর বুড়োবয়সে কষ্ট দিতে চাইনি। তাছাড়া মায়েরও...'

রঙ্গনা হঠাৎ বলল, 'আচ্ছা, চলি। দিদিকে বলব আপনার কথা।'

শতদ্রু আস্তে বলল, 'এলাকায় আছি। তাই আশা করছি, যে কোনোদিন আপনার বিয়ের নেমন্তন্ন পেয়ে যাব! ভুলে যাবেন না কিন্তু। আমার বিয়েটা এমন হঠাৎ হয়ে গেল যে কিছু করার ছিল না আসলে ভাগ্য বলে কী যেন একটা আছে। আমাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনো মূল্য সে দেয় না।'

রঙ্গনার চোখ জ্বলে উঠেছিল। মুহূর্তে শান্ত হয়ে সে ঠোঁটের কোনায় বাঁকা হাসল। 'বিয়ে ছাড় এখনও অন্যকিছু ভাবতে শেখেন নি মনে হচ্ছে। আচ্ছা, চলি।'

শতদ্রু পা বাড়িয়ে বলল, 'রঙ্গনা! শুনুন। আপনি কি রাগ করলেন আমার কথায়?'

'না।'

'রঙ্গনা, আপনি রাগ করেছেন!'

'না।'..

আক্রান্ত প্রাণীর মতো রঙ্গনা হনহন করে হাঁটছিল। স্কুলবাড়ির কাছে গিয়ে একবার ঘুরে দেখল, শতদ্রু তখনও বাঁধের ওপর দাঁড়িয়ে তাকে দেখছে। একমুহূর্তের জন্য তার মনে প্রশ্ন উঠল, কেন? কিন্তু জবাব খুঁজতে গিয়ে দেখল তার বুকের ভেতরটা পাঁচবছর আগের এক সন্ধ্যাবেলার মতোই দুলে উঠেছে, চোখ ছাপিয়ে জল আসছে।

যখন সে বাড়ি ঢুকল, তখন সে শান্ত এবং কঠোর। অপরূপা বলল, 'কোথায় থাকিস রনি এতক্ষণ পর্যন্ত? রতুর বউ এসেছিল। এই দ্যাখ, একগাদা মাছ দিয়ে গেল। কাল থেকে ওর ছেলেটাকে নিয়ে একটু বসবি, বুঝলি? জাস্ট আধঘণ্টা একটু পড়াবি।' অপরূপা কলাপাতা আলতোহাতে খুলে খয়রামাছগুলো দেখিয়ে হাসল! 'রতুর বউ বলল, রোজ এমনি টাটকা মাছ খাওয়াবে। ও রনি, অবেলায় আমি আর আঁশের হাত করব না রে! লক্ষি ভাই, তুই এগুলোর ব্যবস্থা কর।'

ঝকঝকে মাছগুলো দেখে মুহূর্তে রঙ্গনার মুখ খুশিতে ভরে গেল। বটি নিয়ে কলতলায় দৌড়াল হন্তদন্ত। দিনশেষের ধূসর আলোয় ফুলফলের সংসারে বসন্তপুরের ভিটের সেই পুরনো কোনো দিনের আনন্দ ফিরে এসেছে! আঁশ ছাড়াতে ছাড়াতে রঙ্গনার মনে হয়, কুড়ানি ঠাকরুন তেমনি করে দাওয়ায় বসে তাকে দেখছেন এবং হাত কাটলেই বলে উঠবেন, 'অই! অই!'

রঙ্গনা বলল, 'দিদি, ভুলে গেছি বলতে। আজ কী অদ্ভুত ব্যাপার জানিস?'

'কী রে?'

'বিয়াসদির দাদার সঙ্গে দেখা হল।'

অপরূপা ব্যস্ত হয়ে কাছে এল। 'সে কী রে! সাটলেজদাকে কোথায় দেখলি আবার?'

রঙ্গনা কাজে মন দিয়ে বলল, 'ওই যে রাস্তা হচ্ছে—তার কন্ট্রাক্টর অ্যাদ্দিন আছে এখানে, আমর জানিই না। আর বুঝলি দিদি? মুখের জিওগ্রাফি বদলে গেছে। হঠাৎ দেখলে চিনতেই পারবি না। কী মুটিয়ে না গেছে! তোর কথা জিগ্যেস করছিল।'

অপরূপা ব্যস্ত হয়ে বলল, 'তুই সঙ্গে করে ডেকে আনলিনে কেন? কোথায় উঠেছে বল তো সাটলেজদা?'

'কেন? তুই যাবি নাকি দেখা করতে?'

অপরূপা হাসল। 'যাব বৈকি। হাতের কাছে এসে পড়েছে। যাব না? শিবমন্দিরের পাশে কন্ট্রাক্টরের ক্যাম্প দেখেছি। ওখানেই থাকে নাকি রে রনি?'

রঙ্গনা মাথা দোলাল।

'হ্যাঁ রে, কেমন মনে হল ওকে?' অপরূপা চাপা গলায় বলল। 'আসলে দাদার ব্যাপারটার জন্যেই পিছিয়ে গিয়েছিল। কনসেনসাস ছেলে তো! কিন্তু ভেবে দ্যাখ রনি, ওর তো কোনো দোষ নেই ওতে। ওর বাবারও নেই ভাবতে গেলে। বাহাদুরটাকে যদি পেতুম, বঁটি দিয়ে কাটতুম। পালিয়ে গেছে যে।'

রঙ্গনা টিউবেলের হাতল টিপে মাছের ওপর জল ঢালতে থাকল। টিউবেলটা হরেনের টাকায় হয়েছে। পলিমাটি এলাকার জল বলে কেমন আঁশটে গন্ধ জলটার। তবু অল্প চাপেই ঝরঝর করে একরাশ জল উগরে দেয়।

অপরূপা চোখের জল মুছে বলল ফের, 'পাস্ট্ ইজ পাস্ট্। আমি সকালেই যাব সাটলেজদার কাছে। শুনেছি কেষ্ট সিঙ্গি মারা গেছে। তবে ওর বউ ভারি ভালমানুষ। হবে না কেন? কলকাতার মেয়ে—এডুকেটেড মেয়ে। কথাবার্তায় কি আভাস পেতুম না তোকে কত পছন্দ বিয়াসের মায়ের?'

রঙ্গনা মাছগুলো ধোয়া-কলাপাতায় নিয়ে যেতে যেতে বলল, 'বুঝলি দিদি? তোর সাটলেজদা বহরমপুরে বিয়ে করেছে। বাচ্চা হয়েছে। হাঁটি-হাঁটি পা-পা করছে বলল। আর বলল, বড্ড বিচ্ছু।'

অপরূপা ঘুরে দাঁড়িয়ে কান খাড়া করে শুনছিল। চমক খেয়ে বলল, 'সত্যি?'

'সত্যি।'

রান্নাঘরের বারান্দায় হেরিকেন জ্বেলে রঙ্গনা দেখল, অপরূপা তখন ও চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে কলতলার কাছে। আবছা আঁধারে তাকে ভূতের মতো দেখাচ্ছে। রঙ্গনা কুড়ানি ঠাকরুনের কণ্ঠস্বরে ডাকল, 'সন্ধেবেলা অমন করে দাঁড়িয়ে থাকে না। এখানে আয় না রে দিদি!'

অপরূপা আস্তে বলল, 'যাই।'...

বিভ্রান্ত

হৈমন্তীর চিঠি পেয়ে পারু বিব্রত হয়েছিল। কতকাল পরে হৈমন্তীর সাড়া এল ভেবে প্রথমে খুব খুশি হলেও পরে পারু টের পেল, চিঠিটা আসলে ডালিমেরই। তার বন্ধু ডালিম।

পারুর মতে, মানুষের মূল্যবোধ ব্যাপারটা খুব গোলমেলে। বন্ধুত্বের কথা ধরা যাক। বন্ধুত্ব একটা বিশুদ্ধ মূল্যবোধ, যাকে বলা যায় পারফেকশন। কিন্তু খুনি ও লম্পটের মধ্যেও তো বন্ধুত্ব হয়। চোরে ও মুনাফাখোরে হয়। ঘুষখোর ও বেশ্যায় হয়। এসব বন্ধুত্বের খাতিরে স্বার্থত্যাগ, প্রচুর মহত্ত্ব, এমন কি অনেক সময় প্রাণ বিসর্জনও দেখা যায়।

আবার আত্মহত্যা নাকি পাপ। এতে কোন মূল্যবোধই থাকতে পারে না। অথচ দেশ বা আদর্শের জন্য আত্মহত্যার বেলায়? আমৃত্যু অনশন কিংবা আগুনে আত্মাহুতি কি আসলে আত্মহত্যা নয়?

এবং আদর্শের কথাও ধরা যাক। আদর্শের জন্যে হত্যাকেও মানুষ বিরাট মূল্যবোধে সম্মানিত করে। দেশের জন্যে যুদ্ধ হয় এবং অজস্র হত্যাকাণ্ড ঘটে। ক্ষুদিরাম স্বাধীনতার আদর্শের জন্য মানুষ মেরেছিলেন। নাথুরাম গডসে নিজের মতাদর্শের জন্যে গান্ধীজীকে হত্যা করেছিল এবং সেজন্যে তাকেও ফাঁসিতে মারা হয়েছে। অথচ হত্যাকে মূল্যবোধ বলে কেউ মানব না, বরং তা মূল্যবোধের হানি এবং তা ঘৃণ্য পাপ।

বড্ড গোলমেলে ব্যাপার সব। সবই যেন আপেক্ষিক সত্য। পারু ভাবতে গিয়ে খেই পায় না। সে স্বভাবে শান্ত, নিরীহ, বন্ধুত্বপ্রিয়, মিষ্টি স্বভাবের মানুষ। ঈষৎ অভিমানীও। তার অনুভূতিশীলতা বেশ প্রখর।

সে বরাবর বন্ধুত্বকে মূল্যবোধের বড় ব্যাপার বলে মনে করে, তাই মাঝে মাঝে কোন ঘটনায় সে বিচলিত হয়। প্রচুর ভাবে। জট ছাড়িয়ে খেই পেতে চেষ্টা করে। কিন্তু পারে না। একবার একটা অদ্ভুত ঘটনা সে লক্ষ্য করেছিল। কলকাতা এসে প্রথম একটা বাণিজ্যিক বেসরকারি অফিসে চাকরি পেয়েছিল সে। হেড ক্লার্ক ভদ্রলোকের বয়স পঞ্চাশের ওধারে। রোগা খট্‌রাগী লোক। দাঁত-মুখ খিঁচিয়েই থাকতেন। নাম ছিল সত্যব্রত মজুমদার। কিন্তু খুব কাজের লোক বলে কর্তৃপক্ষের কাছের লোক ছিলেন। সেজন্য তাঁর অত্যাচার অফিসের সবাই বরদাস্ত করতে বাধ্য হত। কি এক অজ্ঞাত কারণে সত্যব্রত নকুল নামে ছোকরা বেয়ারাটিকে একেবারেই সহ্য করতে পারতেন না। কতবার নকুলের চাকরি যায়-যায় অবস্থা হয়েছিল। তা হঠাৎ সবাই লক্ষ্য করল, সত্যব্রত ও নকুলের মধ্যে একটা সমঝোতা হয়ে গেছে যেন। ব্যাপারটা ক্রমশ এতদূর গড়াল যে দুজনে নাকি রীতিমত বন্ধুতা হয়েছে এমন সব লক্ষণ দেখা গেল। সত্যব্রতর বাড়ি কালনায়। থাকেন শিয়ালদার দিকে একটা মেসে। নকুলকেও সে মেসে টেনে নিয়ে গেলেন। বেচারা নকুল থাকত আপিসের নিচের তলায় লিফটের পাশে দারোয়ানের সঙ্গে।

কেউ কেউ বলল, নির্ঘাৎ নকুল ব্ল্যাকমেইল করছে বড়বাবুকে। কিন্তু ব্ল্যাকমেইল যদি করবে, তাহলে সত্যব্রতর ভাবভঙ্গিতে তো সেটা টের পাওয়া যাবে। অফিসের ছুটির পর কেউ কেউ দুজনকে প্রায় হাত ধরাধরি অন্তরঙ্গ ভাবে হাঁটতে দেখেছে। রসিকতা করে হাসতে দেখেছে। ব্যাপারটা কি?

ব্যাপারটা জানতে আরও দেরি হত, যদি না আচমকা একদিন সত্যব্রত থ্রম্বসিসে মারা পড়তেন। নকুলের সে কি শোক! যেন বউ মারা গেছে! দাড়ি গোঁফ চুল গজিয়ে ফেলল সে। তার মনমরা শোকার্ত ভাব কিছুতেই যাচ্ছে না। এমন সময় নতুন বড়বাবু বহাল করলেন কোম্পানি। ইনি সত্যব্রতর উল্টো মানুষ। ভারি অমায়িক, হাসিখুশি, স্নেহপরায়ণ। নাম অমিয় তরফদার।

হঠাৎ একদিন এই অমিয় তরফদার নকুলের চাকরি খেয়ে বসলেন। নকুল কান্নাকাটি করে পা ধরে সাধাসাধি করেও পার পেল না। তখন অফিসের সবাই ওর হয়ে অমিয়কে ধরল। অমিয়র মত মানুষ, কি আশ্চর্য, একেবারে বদলে গেছেন! রুদ্রমূর্তি ধরে গর্জন করে বললেন, ওই হারামজাদা স্কাউন্ড্রেলের জন্যে আপনারা রিকোয়েস্ট করতে এসেছেন? জানেন ব্যাটার স্বরূপ? তারপর ইংরেজি ভাষায় যা বর্ণনা করলেন, সবাই শুনে তো হতভম্ব।

নকুল নাকি সোনাগাছির দালাল। অমিয়কে চুপি চুপি সেধেছিল, যাবেন স্যার? কলেজ গার্ল স্যার। আগের বড়বাবু তো প্রত্যেকদিনই ...

নকুলের কাছেই কেউ কেউ ব্যাপারটা পরে শুনেছিল। এই বাজারে চাকরি যাওয়া! মাসখানেক আসা-যাওয়া করেছিল বেচারা। তার কাহিনী বেশ মজার। নকুলের বাড়ি মেদিনীপুরের পাড়াগাঁয়ে। বউ ছেড়ে একা পুরুষ মানুষের থাকা—তার ওপর এই শহরে সারাক্ষণ কত রঙবেরঙের স্ত্রীলোক সে দেখছে। দৈবাৎ (?) গিয়ে পড়েছিল এক জায়গায় নেহাত রিপুর বশে। গিয়েই প়ড়বি তো পড় মুখোমুখি সত্যব্রতর পাল্লায়। সবে দরজায় বেরুচ্ছেন, ছুঁড়িটা ওঁর গালে ঠোনা দিয়ে বলছে, আবার কবে আসবে নাগর, এবং নকুল ...

আসলে দুজনেরই সমস্যাটা মৌলিক এবং একান্তভাবে জৈবিক। আকবর বাদশা আর হরিপদ কেরানির মধ্যে যত ফারাকই থাক, শরীরের রকমসকমে কোন এদিক-ওদিক নেই। মহাপুরুষরাও যে আহার নিদ্রা ও মৈথুনের অনুগামী, কেউ মনে রাখে না এ কথা।

সত্যব্রত-নকুল, দুই মেরুর দুটি মানুষের মধ্যে যে নতুন সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, তা বন্ধুতা ছাড়া আর কিছুই নয়। এই বন্ধুতার ভিত্তি বেশ্যা।

অতএব পারু টের পেয়েছিল, বন্ধুত্ব যে সব সময় পারফেকশন থেকেই জন্মাবে তার মানে নেই। খুব খারাপ ব্যাপার থেকে পৃথিবীতে অনেক ভাল ব্যাপারের উদ্ভব হয়। আর খুব ভাল ব্যাপার থেকে খারাপও জন্মায়। মূল্যবোধ তাই বড্ড গোলমেলে জিনিস। অতি বড় খুনিও যখন তার বাচ্চাকে আদর করে, তখন তার পিতৃস্বরূপ এবং বাৎসল্য তো অস্বীকার করা যায় না। ত্যাগব্রতী মহান দেশনেতা যখন তাঁর নারীর ওষ্ঠে চুম্বন করেন, তখন তাঁর প্রেমিক সত্তাটাও কি সত্য হয়ে ওঠে না? হিটলারও নাকি নিজের ভাগ্নীর প্রেমিক ছিল। সম্পর্কটা অবৈধ এবং হিটলার লক্ষ লক্ষ ইহুদি হত্যার জন্য দায়ী, অথচ প্রেম একটা বিশুদ্ধ উচ্চতর মূল্যবোধের ব্যাপার। প্রেমের জন্যে বিশ্ব জুড়ে কত না সাহিত্য কাব্য শিল্পকলার আবির্ভাব, যা নিয়ে মানুষের সভ্যতার এত বড়াই। ...

সত্যি, মূল্যবোধ বড্ড গোলমেলে ব্যাপার। পারু হাল ছেড়ে দিয়ে হাই তোলে। আড়মোড়া দিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়ায়। নিজের দিকে তাকিয়ে থাকে কয়েকটি মুহূর্ত। একটু রোগা দেখাচ্ছে কি তাকে? চোখের তলায় তামাটে রঙ জমেছে দিনে দিনে। আজ যেন রঙটা আরও গাঢ়। রাতে ঘুম হয়নি। কত রকম আবোল-তাবোল স্বপ্ন দেখেছে। ভোরের দিকে ঘুম হয়ত গাঢ় হত, হঠাৎ আবার চিঠিটার কথা মনে পড়ে গিয়েছিল। আর ঘুম এলও না, শুয়ে থাকতেও ভাল লাগল না।

আয়নার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে একই সঙ্গে তার কতকগুলো কথা মনে আসে। গত রাতে ঝোঁকের বশে মদ্যপানটা একটু বেশিই হয়েছিল। তার পক্ষে পুরো তিন পেগ খুব বেশি। বার থেকে ট্যাক্সি করে ফিরে টলতে-টলতে শুয়ে পড়েছিল। ঘুম তো গভীর হবারই কথা। হঠাৎ চিঠিটা আবার পড়ার ইচ্ছে হল। ওটাই সম্ভবত কাল হল ঘুমের। নাকি খালি পেটে শুয়ে পড়ার জন্যেই?

হঠাৎ কী হয়েছে যেন, রাতারাতি দাড়ি এত বেশি গজিয়ে গেল? আর কি সর্বনাশ! এত পেকে গেছে দাড়ি? এখনই দাড়িটা সাফ করা দরকার। সে নিজেকে এত রোগা দেখছেই বা কেন? ট্রেনটা ছাড়ে নটা পাঁচে। পৌঁছয় বিকাল তিনটে বেয়াল্লিশে। টাইম টেবিল দেখেছে মোটে একবার। অথচ দিব্যি মুখস্থ হয়ে গেছে।

সঙ্গে কী নেবে? আয়না থেকে ঘুরে সে ঘরের ভিতরে চোখ বুলোয়। এক ঘরের ফ্ল্যাট। ওপাশে একটুকরো ব্যালকনিতে কয়েকটা টব আছে। কাল বিকেলে জল দেওয়া উচিত ছিল। এবার শীতে

গোলাপ ফুটল না। এখন তো মার্চ। খুব জোর দিয়ে পাতা ডালপালা গজাচ্ছিল। পাতাগুলো হলুদ হয়ে ঝরে যাচ্ছে। নিশ্চয় কোন অসুখ-বিসুখ হয়েছে। সব কিছু পায়ে মাড়িয়ে তার ওই রুগ্ণ ও বন্ধ্যা নারীর মত পাণ্ডুর ও করুণ গোলাপ গাছের কাছে যেতে ইচ্ছে করল।

তারপর হঠাৎ মনে পড়ল, কাল রাতে রুচিরা থেকে তার খাবার কি এসেছিল? মহিলারা বড্ড ভুলো যেন। রুচিরা থেকে খাবার এলে পারু যদি না থাকে, দোতলায় মীরা বউদির কাছে রেখে যাওয়ার কথা। মীরা বউদি যত রাতই হোক আসবেন এবং টিফিন কেরিয়ারটা দিয়ে যাবেন। কাল রাতে কি উনি এসেছিলেন? কাল রাতে ফেরার পর বেশ কিছুক্ষণ পারু অবশ্য অন্য জগতের বাসিন্দা ছিল। কিন্তু চিঠিটার কথা যদি মনে পড়ে, কলিং বেলের শব্দ কেন সে শুনতে পাবে না?

ব্যালকনিতে প্রচুর রোদ। গিয়ে দাঁড়াতেই আবার চিঠিটা তাকে ভেতর থেকে খোঁচা দেয়। মূল্যবোধের ব্যাপারগুলো মাছির মত ভনভন করে উড়ে আসে মগজের ভিতরে। বন্ধুতা একটা পারফেকশন। অথচ তার সঙ্গে ডালিমের বন্ধুতা ছিল, ভাবতেই তার অস্বস্তি হচ্ছে। কী নয় ডালিম? মাতাল, খুনি, গুণ্ডা, জেলখাটা দাগী!

আর এই ডালিমই একদিন তাকে মৃত্যুর মুখ থেকে বাঁচিয়েছিল। সেই সন্ধ্যায় রেল-ইয়ার্ডের কাছে হঠাৎ ডালিমের যদি দেখা না পেত, বীরেশ্বরের চেলারা তাকে স্ট্যাব করত। ড্যাগার তুলেছিল, নাকি ভোজালি, আবছা অন্ধকার ছিল, একটা মালগাড়ির ছায়া পড়েছিল সেখানে। পারুর কাঁধে ডালিম যখন হাত রেখে বলেছিল, শিগগির চলে আয়! পারু যেন ঘুমোচ্ছিল। রেল লাইন ডিঙিয়ে যেতে সে হোঁচট খেয়ে পড়েছিল। ডালিম তাকে প্রায় শূন্যে তুলে নিয়ে দৌড়ল।

অনেক ঠকে অনেক শিখেছে পারু। জেনেছে, জীবনের অসুন্দর ব্যাপার যত প্রচুর থাক, ইচ্ছে করলে সেগুলো এড়িয়ে জীবনে শুধু সুন্দর নিয়ে বাঁচাও সম্ভব। এখনও মানুষের সমাজে নেই-নেই করেও অনেক ভাল ব্যাপার আছে। সে বুঝেছে, জীবনকে বাইরে থেকে ভোগ করাই ভাল। অনাসক্তি দাঁড় করিয়ে রেখেও আসক্ত হওয়া যায়। পাঁকাল মাছের মত, কিংবা যেমন বেণী তেমনি রবে চুল ভেজাব না। মন্দিরের পথের পাশে কুষ্ঠরোগী বসে আছে বলেই দেবতার সামনে সিক্তবসনা যুবতীর কেশ লুটান প্রণাম অসুন্দর হয়ে যায় না। হিংস্র জন্তুর নখের আঘাতে যন্ত্রণায় হরিণী আর্তনাদ করলেও বসন্তের বনভূমিতে রঙের বাজার কালো হয়ে যায় না। ওটা মানুষের মনের কারচুপি। প্রকৃতি সুন্দরই থেকে যায়। চিকন হয়ে ওঠা নতুন পাতায় তলার হলুদ শুকনো ঝরাপাতার দুঃখ ঘোচাবার আয়োজন আছে। বন্যার পর মাটি উর্বর হয়।

চিঠিটা হৈমন্তী লিখলেও ওটা আসলে ডালিমেরই চিঠি। হস্তাক্ষরে কি আসে যায়! এমন কি স্বাক্ষরেও? পারু তো তার কোম্পানির কত চিঠি সই করে। কখনও লেখে 'উই আর এক্সট্রিমলি সরি ফর ...' তাই বলে পারু নিজে কি দুঃখিত হয়? —'তোমাকে অনেকদিন দেখিনি, তুমি কি বদলে গেছ পারু, শরীরে কিংবা মনে—অথবা দুই'তেই?' এ খবর হৈমন্তী জানতে চায়নি, চেয়েছে ডালিমই। হৈমন্তী তার স্বামীর মাইক্রোফোনের কাজ করেছে। অতএব ওর জন্যে কিছু না ভাবাই ভাল। ভাবতে হলে ডালিমের জন্যে।

বেচারা ডালিম! ওর জীবনটাই বড় অদ্ভুত। ওকে কেউ যেন কোনদিনও বুঝতে চাইল না বলেই ওর অত সব হাঙ্গামা, হুলুস্থুলু দাপাদাপি। ওর সব কুকীর্তি আসলে মায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যে স্নেহ-বঞ্চিত শিশুর এটা ভাঙা ওটা ভাঙা অস্থিরতা হয়ত। সবাই যে পারুর মত শান্ত ভাবে মুখ বুজে প্রতেকটা বঞ্চনা ও ক্ষয়ক্ষতি মেনে নেবে, এ আশা করা ভুল। মানুষের স্বভাব, সে জন্মাবার পর থেকেই নানা দাবি তোলে। দাবির ফিরিস্তি নিয়েই তার পৃথিবীতে আসা। এটা চাই, ওটা চাই। তাকে জীবন দেওয়া হবে, অথচ দাবিগুলি আদৌ মেটানো হবে না, কিংবা টালবাহানা করা হবে, এ কেমন কথা? জীবন মানেই তো দাবির ইস্তাহার। জীবন মানেই চাওয়ার একগুচ্ছ স্লোগান। জীবন মানেই অন্ধ, তীব্র প্রবল কামনা-বাসনা। কেউ কেউ কামনা-বাসনাকে চাপা দিয়ে বাঁচতে পারে, কেউ কেউ পারে না। ডালিম পারে নি। এখনও পারছে না। সম্ভবত এখন আরও তীব্র হয়ে উঠেছে তার চাওয়ার তালিকা। কারণ, উরুর নিচে থেকে একটা পা কেটে ফেলা হয়েছে তার। ক্রাচ ছাড়া চলাফেরাই করতে পারে না। হৈমন্তীর লেখায় ডালিম নিজেকে অনেকটা তুলে ধরেছে।

পারুর চোখে সামান্য দূরে পার্কের থ্যাঁতলান খয়েরি ঘাসের ওপর ক্রাচে ভর দিয়ে ডালিম হেঁটে যায়, কিছুতেই অন্য প্রান্তে পৌঁছতে পারছে না। একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে পারু আবার আয়নার কাছে ফেরে। শেভিং পেস্টের ছিপি খুলতে থাকে। ক্যালেন্ডারের বুকে ঝোলানো ঘড়িটা দেখে নেয়। ইস! সাড়ে আটটা বাজে প্রায়। ...

মোট কথা, কলকাতা থেকে প্রায় দেড়শ কিলোমিটার দূরত্ব পেরিয়ে পারুর এই স্বদেশযাত্রার পিছনে অনেক মানসিক ঝড় রয়েছে। দ্বিধাদ্বন্দ্ব এসেছে। হাওড়া স্টেশনে এসেও হঠাৎ চুলোয় যাক বলে ফেরার জন্যে ঘুরেছে। কিন্তু ট্রেনটা যখন হুইসিল বাজিয়ে ছেড়েছে, তখন অগত্যা নিজেকে সময়ের হাতে তুলে দিয়েছে।

ব্যান্ডেল থেকে মোড় নিয়ে সোজা উত্তরে চলতে থাকা লুপ লাইনটার অবস্থা সেই ১৯১৮ থেকে একই রকম। পারু বাবার কাছে এই লাইন পাতার গল্প শুনেছে। পলাশপুর তখন নিতান্ত একটা পাড়াগাঁ। বাদশাহী আমলের কাঁচা রাস্তায় খোয়া ফেলে জেলাবোর্ড সদর শহরের সঙ্গে মফস্বল শহরের যোগাযোগের ব্যবস্থা করেছিল। তার মাঝখানে পড়ে পলাশপুর। তারও আগে ছিল ছোট্ট চটি একটা। চটির পিছনে পুকুর ছিল, তার পাড়ে ছিল বটগাছ। তার নাম ছিল নির্বংশতলা। রেল লাইন পাতার সময় গাছটা কাটা হল। তার কোটরে আর ডালের গর্তে মানুষের মাথা পাওয়া গিয়েছিল। রেল কোম্পানি পুকুরটার সংস্কার করতে গিয়ে আরও অনেক কঙ্কাল পেয়েছিল। নির্বংশতলার এই ইতিবৃত্ত।

হরনাথ ছিলেন ডাক্তার। পাস করা ডাক্তার নন, কম্পাউন্ডারের চাকরি করতেন মফস্বল শহরের দাতব্য চিকিৎসালয়ে। মহারানী অমলাসুন্দরীর দান সেটা। পরে চাকরি ছেড়ে গাঁয়ে আসেন। নিজেই ডাক্তারি শুরু করেন। তখন পলাশপুর প্রায় বাজার জায়গা হয়ে উঠেছে। একটা ছোট লাইন ওখান থেকে নিয়ে গিয়ে পাশের জেলার সদরে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। তখন প্ল্যাটফর্মও হয়েছে উঁচু। ওভারব্রীজ হয়ে গেছে। শান্টিং ইয়ার্ড ছড়িয়ে গেছে বিশাল এলাকায়। হলদে বিশাল বোর্ডে লেখা আছে পলাশপুর জং। মধ্যরাতে শান্টিং ইয়ার্ডের ওপর ভাঙা চাঁদ তখন অলীক লাগে। তীব্র শিস দিয়ে একলা ভুষকালো ইঞ্জিন মসমসিয়ে ঘোরে। মাঠের ওপর রেলের ডাকবাংলোতে পাহারাদার সুখলাল আড়বাঁশি বাজাচ্ছে শোনা যায়।

ওভারব্রীজে অত রাতে দাঁড়িয়ে থাকত দুটি ছোট্ট ছেলে। পারু আর ডালিম। বয়স তখন দশের বেশি নয়। ডালিম এই বয়সেই সিগারেট খেতে শিখেছিল। অনেক রাতে বাড়ির ভেতর সব শব্দ থেমে গেলে দুটিতে বেরিয়ে পড়ত চুপি চুপি। ওরা থাকত ডিসপেন্সারির পাশের ঘরটায়। একই তক্তাপোশে শোওয়া। একই সঙ্গে খাওয়া স্কুলে যাওয়া, সব কিছু। ডিসপেন্সারির মেঝেয় মাদুর বিছিয়ে শুয়ে থাকত ধরণী কম্পাউন্ডার। সে ছিল গাঁজাখোর। তাকে ডিঙিয়ে ঘরের দরজা খুলে বেরুনো একটুও কঠিন ছিল না।

রাতে ওভারব্রীজে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানার মধ্যে হয়ত স্বাধীনতার প্রথম স্বাদ পেয়েছিল পারু, এবং ডালিমও। পৃথিবীতে কী বিরাট আর তীব্র স্বাধীনতাস্রোত বয়ে যাচ্ছে! সেই প্রথম যেন পারুকে ডালিমই চিনিয়ে দেয়। কিন্তু পারু স্বভাবে শান্ত, ভীতু, নিরীহ। তার মধ্যে সাহসের ব্যাপারটা পরিমিত। তাই সে সাবধানে পা ফেলেছে। ডালিমের সাহসের কোন গণ্ডিরেখা ছিল না। হয়ত ওর রক্তটাই অন্য রকম।

কিন্তু অপরিমিত প্রাকৃতিক সাহসই কি ডালিমকে স্বাধীনতা চিনিয়ে ছিল? পারু বুঝতে পারে না এখনও। নাকি দৈবাৎ চিনে ফেলেছিল ডালিম? অত রাতে ওভারব্রীজে গিয়ে সিগারেট খাওয়ার কথা কীভাবে তার মাথায় এসেছিল?

ডালিম ছিল হরনাথ ডাক্তারের আশ্রিত ছেলে। ওঁর অদ্ভুত অদ্ভুত বাতিক ছিল। তেমনি মানুষও ছিলেন খুব কড়া ধাতের। যা গোঁ ধরতেন, তাই করা চাই। এখন তো পলাশপুর রীতিমত একটা টাউনশিপ, তার ওপর ইস্টার্ন রেলের কলোনিও বটে। নানা জায়গার নানা রকম মানুষ এসে ভিড়

করেছে। এখন সমাজ-টমাজ জাত-বেজাত ওসবের কোন বালাই বিশেষ নেইটেই। কেউ মাথাও ঘামায় না ও নিয়ে। কিন্তু পারুর ছেলেবেলায় পাড়াগাঁয়ের সবরকম ব্যাপার-স্যাপার পলাশপুরে ছিলই।

ডালিম একে মুসলমানের ছেলে, তার ওপর বাবা রমজান ছিল চোরচোট্টা লোক, খাঁটি মুসলমান হলেও কথা ছিল, ওরা তো বেদে। পলাশপুরের সমাজপতিদের মনোভাব ছিল কতকটা এ রকম। হত যদি আরশাদ কাজী কিংবা ইরফান মীর্জার বংশোদ্ভূত কেউ, তাহলে কথা ছিল। ওঁদের চালচলন খানদানি। আদবকায়দা উচ্চস্তরের। আরশাদ সায়েব সাব-রেজিস্টারি করে চুল পাকিয়েছেন। তাঁর আত্মীয়স্বজন সবাই বড় অফিসার। দেশ ভাগ হলে সবাই অবশ্য পাকিস্তানবাসী হলেন। ইরফান মীর্জা তো জমিদার বংশের লোক। তাঁর ঠাকুরদা মুরশিদাবাদ নবাবি সেরেস্তায় দেওয়ান ছিলেন। সে রবরবা যারা দেখেছে, তারা দেখেছে। এখন কথা হচ্ছে, ওই সব খানদানি পরিবারের ভূলুণ্ঠিত ইজ্জত বাঁচাতে হরনাথ ডাক্তার যদি কিছু করতেন, আনন্দের ব্যাপার ছিল।

তা নয়, রমজান বেদের ছেলে ডালিম—এই সেদিনও মা সুবাসিনীর সঙ্গে তাকে ন্যাংটো হয়ে সবাই ভিক্ষে করতে দেখেছে, তাকে হরনাথ এনে তুললেন নিজের বাড়িতে। নিজের ছেলের সঙ্গে স্কুলে পড়ার ব্যবস্থা করে দিলেন। একই ঘরে থাকা, পাশাপাশি বসিয়ে খাওয়ান, একই ছিটের জামা কিনে দেওয়া।

আমার ইচ্ছে! মাই উইশ! হরনাথ উঠোনে কুয়োতলায় গাড়ু হাতে দাঁড়িয়ে গর্জন করেছেন। পারুর মা বনশোভা গম্ভীর মুখে বারান্দার রোদে বসে ডালের কুটো বাছছেন। ইয়েস, আমার খুশি। তোরা কেউ ডাকিস নে আমায়। আসিস নে আমার ডিসপেন্সারিতে। ব্যস!

পারু এই দৃশ্যটাও স্পষ্ট দেখতে পায়। তখন তার একটুও অবাক লাগেনি, হঠাৎ এক অচেনা সঙ্গী পেয়ে কি খুশি যে হয়েছিল! ওর জাতটাতের ব্যাপারটা মাথায় ঢোকেইনি পারুর। ডালিম দেখতে বড় সুন্দর ছিল। পৃথিবীর—নাকি এই পলাশপুরেরই কত অজানা জিনিস পারুকে চিনিয়ে দিয়েছিল। পারু কৃতজ্ঞ থেকেছে ডালিমের কাছে।

হরনাথের ডাক্তারির কোন ক্ষতি অবশ্য হয়নি। পারু এখন বুঝতে পারে, পুরনো গ্রামসমাজ আর তার লোকাচারে ততদিনে মুহুর্মুহু এসে আঘাত পড়ছে বাইরের। একেকটা ইঞ্জিন যেন টেনে নিয়ে আসছে কোত্থেকে একেকটা জটিল বিশাল ট্রেন। পলাশপুর জংশনের মাটি ও আকাশ কাঁপছে থরথর করে। উজ্জ্বল নতুন এসে ময়লা-মাখা পুরনোকে ঢেকে ফেলেছে ক্রমশ। স্টেশনের পিছনের বাজারে চায়ের দোকান করেছিল তারক মেকদার। তার আগে সে প্রতিমা গড়ত। চায়ের দোকান খোলার কারণ যাই থাক, প্রতিমা গড়া কেন ছাড়ল, সারাক্ষণ শোনাত চা-পিয়াসীদের। হ্যাঁ গো, পলাশপুরের বাবুদের আর কি সেদিন আছে? রায়বাবুদের ঘরের মায়ের পুজো যদ্দিন নিজেরা দিতেন, ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো এই তারককেই ডাকো। এখন বারোয়ারির হাতে ছেড়ে দিয়েছেন। জমিদারির পটল তো পয়মালের গো! আর বারোয়ারি? ঝাঁটা মার! বলে, টাউন থেকে আর্টিস্ট দিয়ে ঠাকুর গড়িয়ে নেব! তারকের কাজ মোটা দাগের! শোন কথা তাহলে। আর সিঙ্গীমশায়ের পুজো? ও দেড় টাকার কারবারে তারক নেই বাবা। সেদিন কি আর আছে?

আসলে তারক সময়ের নতুন রুচির সঙ্গে এগোতে পারছিল না। না—ভুল বলা হল। একটা রুচির নাগাল না পেয়ে অন্য একটা সহজ নতুনের সঙ্গ নিল। তারক হল চা-ওয়ালা। স্টেশনে ট্রেন থেকে নামে ছত্রি জাতের মানুষ। মুসলমান পাইকাররা মাথায় গামছা জড়িয়ে বেঞ্চে বসে থাকে। তারিয়ে তারিয়ে চা খায়। সেই এঁটো গেলাস ধোয় তারকের খাকি হাফ পেন্টুল পরা ছেলে তপন। পেন্টুলের দড়ি কিছুতেই টিকবে না কোমরে। ফস করে খুলে পড়বেই। নবীন অধিকারী ফিক করে হেসে বললেন, এই বারবেলায় ভগবানের জিভ দেখাস নে মানিক!

ডালিম বলেছিল, এই পারু, ভগবানের জিভ দেখবি?

সে কী রে?

পুবের মাঠে রেলের বাংলোয় সুখলাল তখন নেই। টিশনবাজারে গেছে ময়দা কিনতে। চারপাশে কল্কেফুলের জঙ্গল। এক সময়ে ওটা একটা উঁচু পোড়ো জমি ছিল। বাংলোর চারিদিকে উঁচু বারান্দা।

পিছনের বারান্দায় বসে ছিল দুজনে। কল্কেফুলের জঙ্গলের ওধারে পুকুর। পুকুর থেকে পদ্মফুল তুলেছে ডালিম। জোঁক লেগেছিল। জোঁকটাকে ছাড়িয়ে দুটো খেজুর কাঁটায় বিঁধিয়ে টান টান করে রোদে রেখেছে। পুকুরের ওধারে দিগন্ত অবধি ছড়ান ধানক্ষেত। টেলিগ্রাফের তারে নীলকণ্ঠ বসে আছে। এমন সময়ে পদ্মফুলের কলি নিয়ে খেলতে খেলতে ডালিম বলেছিল, ভগবানের জিভ দেখবি পারু?

ডালিম সম্ভবত সেদিনই পারুকে শরীর সচেতন করে ফেলেছিল। এ দৃশ্যটা আজও স্পষ্ট মনে পড়ে পারুর। আসলে ডালিম তার আগে পৃথিবীটা চিনে ফেলেছিল অনেকখানি। তার মা সুবাসিনী প্রথম প্রথম খেজুর তালাই বানিয়ে বেচে বেড়াত। শেষদিকে খেজুর পাতা কাটতে গিয়েই একটা চোখে খোঁচা লাগল। হরনাথ ওষুধ দিতেন। কাজ হয়নি। ক্রমশ অন্য চোখটাও গেল। তখন ভিক্ষে করে বেড়াত। সঙ্গে ন্যাংটো ফুটফুটে সুন্দর ছেলেটা। মায়ের মতই সুন্দর। এবং পারু আরও বড় হয়ে টের পেয়েছিল, লোকে হরনাথ আর সুবাসিনীর গোপন ভালবাসার কথা বিশ্বাস করে। হয়ত তা সত্য হতেও পারে।

সুবাসিনী ডাউন ডিস্ট্যান্ট সিগনালের কাছে, যেখানে একটা মস্ত কয়েতবেলের গাছ আছে, সেখানে ট্রেনের সামনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। ডালিম নাকি শেষ মুহূর্তে মায়ের শরীর থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসে। কয়েতবেলের গাছের নিচে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে একটা বাচ্চা ছেলে, নেমে এসে গার্ডসাহেবের প্রথমে এই দৃশ্য চোখে পড়েছিল।

পারু বোঝে, ডালিমের মধ্যে প্রকৃতি দিয়েছিলেন এক তীব্র অতিকায় চেতনা—ওর শরীরের আধারে তা কুলোত না। তাই এত অস্থির ছিল সে। অথচ অস্থিরতাকেও তো চেপে রাখতে সে ছিল অদ্বিতীয়। তার মুখ দেখে বোঝার উপায় ছিল না কী ঘটেছে।

রমজান বেদের ছোট ভাই আনিস এক মুসলমান স্টেশনমাস্টারের সুনজরে পড়ে লেখাপড়া শিখেছিল। বউদির সঙ্গে তার যোগাযোগই ছিল না। থাকত মুঙ্গেরে। পরে পাকিস্তানে চলে যায়। পারু অনেক পরে শুনেছিল, আনিস খুলনায় সাবজজ।

রমজান আর আনিসের বাবা কাল্লু চমৎকার পট আঁকত। পোস্টাপিসের ঘরটা তখন মাটির ছিল। তার দরজার দুধারে দেয়ালে দুটো সায়েব এঁকে দিয়েছিল কবে। পারুও দেখেছে। একটু একটু মনে পড়ে। পোস্টমাস্টার শ্যামবাবু তা সযত্নে রক্ষা করতেন। ১৯৪২-এর ঝড়ে ঘরটা ভেঙে যায়। কাল্লু পট নিয়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরে গো-মাহাত্ম্য শোনাত ছড়া ও গানের সুরে। আবার সাপও ধরত। গোবিদ্যার কাজও করত। ইরফান মীর্জার নবাবি আমলের প্রকাণ্ড বাড়ির কিছু অংশ ধসে গিয়েছিল। সেখান থেকে গোখরো বেরিয়ে ঘরে ঢুকেছিল। সেকেলে খাটের তলা থেকে সেই গোখরো ধরে কাল্লু মাটির হাঁড়িতে পুরেছে, বুড়ো মীর্জা বায়না ধরলেন, খেলা দেখাও কাল্লু!

কাল্লু বলে, হুজুর, আ-কামানো সাপ। সাক্ষাৎ আজরাইল!

আজরাইল হলেন মৃত্যুর দূত। মীর্জা জেদ ধরলেন, ঠিক হ্যায়! আজরাইল দেখব!

কাল্লু অনেক কাকুতি মিনতি করেও রেহাই পেল না। মীর্জাদের দেওয়া মাটিতে তার ঘর। তখন ব্রিটিশ রাজত্ব। জমিদারি দাপট সমানে চলেছে। কাল্লু হাঁড়ি খুলতেই ক্রুদ্ধ অপমানিত সাপটা তার কপালেই ছোবল দিল ...

এই গল্পটা ডালিম হয়ত তার বাবা-মার কাছে শুনেছিল। রেল লাইনের ব্রীজে বসে পারুকে শুনিয়েছিল সে। তখন দুজনে ক্লাস নাইনে উঠেছে। ডালিম ছাত্র হিসেবে ভালই ছিল। ফার্স্ট না হলেও সেকেন্ড বা থার্ড হত বরাবর। পারু তো টেনেটুনে পাস করত। রেজাল্ট বেরুলে হরনাথ ডালিমকে টেনে নিতেন। —মাই গোল্ডেন আইজ! আমার চোখ জহুরির চোখ!

হরনাথ ক্লাস এইটের বেশি পড়ার সুযোগ পাননি এবং কম্পাউন্ডার হয়েছিলেন, পারু বোঝে, তাই যেন অদ্ভুত সব কমপ্লেক্স ছিল বাবার। ভুলভাল ইংরেজি বলে তার মাকে তাক লাগাবার চেষ্টা করতেন। সবাইকে অশিক্ষিত ভূত মুখ্যু বলতেন। মোটা মোটা বই দিয়ে ডিসপেন্সারির একটা দিক ভরে তুলেছিলেন। বিকেলে ডিসপেন্সারির বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে গড়গড়া টানতেন, হাতে থাকত

প্রকাণ্ড বই। ধর্ম ইতিহাস দর্শনের উৎকট সব বাংলা ইংরেজি বই। বারান্দার নিচে একটুকরো লন। লনে ফুলের বাগান করেছিলেন। গেটে ল্যাভেন্ডার লতার ছাউনি ছিল। তার ওধারে জেলাবোর্ডের সড়ক। সড়কের ওপাশে প্রসারিত ধানক্ষেত। রেল লাইনটা কোনাকুনি চোখে পড়ে। হঠাৎ ডেকে বলতেন, পারু! ডালিম! কাম হেয়ার! পারু, এই প্রিফেসটা পড়ে মানে বল তো দেখি!

ক্লাস নাইনে ব্যাপারটা অত সোজা ছিল না। পারুর মুখে তখন যেন খুব তাড়াতাড়ি সন্ধ্যার রঙ এসে লেগেছে। —কী পড়ান হয় তোদের? ডালিম, কাম অন!

ডালিম রিডিং ভালই পড়ত। ওর গলাটা ছিল জোরাল। একটু পড়া হতে না হতে বাগদীপাড়ার ভুজঙ্গ এসে বলে, ডাক্তারবাবু, অনুগ্রঃ করে একবার চলুন, মেয়েটা কেমন যেন করছে!

হো হো করে হাসেন হরনাথ। তোর মরণ নেই রে ভুজঙ্গ! কি হল মেয়ের? এগো, যাচ্ছি।

ভিতরে ব্যাগ আনতে গেছেন, বনশোভা বললেন, ভুজঙ্গ এসেছে মনে হল! ওকে বল তো, ভোরবেলা জাল আনতে। কাটোয়া থেকে ছোটঠাকুর আসবেন, বলে পাঠিয়েছেন। সেবারে খুব ঠাট্টা করেছিলেন না? খুব তো মাছ খাচ্ছ!

নিবারণ আসবে? তবেই হয়েছে! হরনাথ বলেন, তোমার মাথা খারাপ? নিবারণ! ওর স্বগগো লুঠ হয়ে যাবে না? হুঃ, নিবারণ!

না না, আসবেন। বাণীকে বলে পাঠিয়েছেন।

হরনাথ স্ত্রীকে পাত্তা দিতেন না কোন কিছুতে। বনশোভা ছিলেন পারুর মতই শান্ত চুপচাপ মানুষ। হরনাথ কোন কারণে রেগে গেলে যেন মুখে ভয়ের ছায়া পড়ে থাকত। তাই বলে বাবা-মায়ে মনের অমিল ছিল এমন মনে হয় না পারুর। স্বামীকে নির্বিচারে মেনে নিতে জানতেন বনশোভা। বরং হরনাথ কোন ব্যাপারে মতামত চাইলে বনশোভা একটু চুপ করে থাকার পর মিষ্টি হেসে ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে বলতেন, তুমি বলছ যখন তখন তাই। কখনও বলতেন, অতশত বুঝি নে। যা ভাল হয় কর। আমি কি কখনও কোন ব্যাপারে বাধা দিয়েছি? ...

স্টেশনের ওয়েটিং রুমে ন্যাংটো ডালিম বসেছিল। স্টেশন মাস্টার কোয়ার্টার থেকে একটা জামা আর পেন্টুল এনে দিয়েছিলেন। পোশাক দুটো খুব আগ্রহের সঙ্গে উল্টেপাল্টে দেখে সে ব্যস্তভাবে পরে ফেলেছিল। তারপর স্মার্ট হয়ে দাঁড়াল। ঠোঁটের কোনায় হাসি। ওদিকে তখনও তার মায়ের রক্তাক্ত লাশ পড়ে আছে ডিস্ট্যান্ট সিগন্যালের কাছে, কয়েতবেলের তলায়। মাটিটা ওখানে একেবারে নগ্ন। গরুর পাল মাঠে নামার পথে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকত। গায়ে গা ঘষত। সেই মাটিতে সুবাসিনী চিত হয়ে শুয়ে আছে। ওপরে একটা ছেঁড়া তেরপল চাপান।

কাটোয়া থেকে হরনাথ ফিরছিলেন ট্রেনে। সেই অনিচ্ছুক ঘাতক ট্রেনের একটা কামরা থেকে লাফিয়ে নেমে লাশের দিকে দৌড়ে গিয়েছিলেন। —সর, সর সব! আই অ্যাম এ ডক্টর! লেট মি সি ফার্স্ট!

হাস্যকর নিশ্চয়। ঘন একরাশ চুল ছিল সুবাসিনীর মাথায়। একটুও পাক ধরেনি। তার রোদ-বৃষ্টি-শীত খাওয়া তামাটে শরীরটায় কোন আঘাত লাগেনি। চুলগুলোয় চাপ চাপ রক্ত ছিল। মাথাটা চেপ্টে গিয়েছিল। হরনাথ থমকে দাঁড়িয়ে ছিলেন। সুবাসিনী না?

কতক্ষণ পরে তিনি চেঁচিয়ে ওঠেন, ছেলেটা কোথায়? ওর ছেলেটা? হোয়ার ইজ হার সন?

রামধন পয়েন্টসম্যান বলল, গাঁটসাহাব উনহিকো লিয়ে গেসলে টিশানমে। ...

পারুর ঘুম পেয়েছিল। এ লাইনে সচরাচর ভিড়টা কম এখনও। সেই আগের মত কয়লার ইঞ্জিন হাঁফাতে হাঁফাতে দৌড়ুচ্ছে। কামরাগুলোর চেহারায় পুরনো সময়ের ছাপ রয়ে গেছে। ফার্স্ট ক্লাসে সে একা। কিন্তু এ কি সত্যি ফার্স্ট ক্লাস? সেকেন্ড ক্লাসে গেলেই পারত। তত কিছু ভিড় ছিল না। তবে হাত-পা ছড়িয়ে শোয়া গেল, এও মন্দ নয়। রাতের ঘুমটা পুষিয়ে নেওয়া গেল। সে ঘড়ি দেখে, আড়াইটে বাজে। টানা তিনটে ঘণ্টা ঘুমিয়েছে। কেউ লক খোলার জন্যে তাকে বিব্রত করেনি। এ লাইনে চেকারবাবুদের দেখা কদাচিৎ মেলে। কিংবা হয়ত উঁকি দিয়ে দেখে গেছেন ওঁদের কেউ,

সায়েবসুবো বলে জাগাতে চাননি। পারু উঠে বসে। তার ঘাড় ব্যথা করছে। সুটকেসে মাথা রেখে শুয়েছিল।

সরে এসে জানলার ধারে সিগারেট ধরায় সে। কতকাল পরে যাচ্ছে। সব অচেনা লাগছে। সময় দেখে বোঝা যায়, এবার জায়গাগুলো তার চেনা উচিত। পারছে না। বাজারসহু স্টেশন নিশ্চয় পেরোয়নি। ওখানে পাকা আধঘণ্টা স্টপেজ। ইঞ্জিনে জল ভরা হবে। দু'ধারে বিশাল মাঠ। কোথাও কোথাও সবুজ হয়ে আছে। আগের দিনে এমন চৈত্রে ধু-ধু করত মাঠগুলো। মাঝে মাঝে দেখতে পাচ্ছে ইলেকট্রিক লাইন চলেছে। বড় বড় ফ্রেম মাঠের উপর দাঁড়িয়ে আছে। দেশটা বদলেছে অনেক। যে যা-ই বলুক, অনেক রূপান্তর ঘটেছে। পারু দেশের কথা ভেবে খুশি হয়। একেই কি বলে দেশাত্মবোধ? মানুষের অবচেতনায় যেন এইরকম যূথবদ্ধতার সংস্কার আছে। এই সব মাঠে সবুজ বিপ্লব ঘটলে তার নিজের কতটা লাভ হবে, না হবে না, ভাবতেই ইচ্ছে করে না। প্রচুর কলকারখানা গড়লে তার কি মাইনে বাড়বে? হয়ত তাও না। তবু ভাল লাগে ব্যাপারটা।

আর এই ভাল লাগা, নতুনকে ভাল লাগার মধ্য দিয়েই ডালিম নামে একটা অস্বস্তিকর ব্যাপারকে পারু সহজ করে তোলার চেষ্টা করে, যেন গাছ ভরা সবুজ চিকন পাতার মধ্যে একটা হলদে পোকায় খাওয়া পাতা থাকলেও কিছু যায় আসে না। ...

স্টেশনে নেমে পারু অবাক হল। কিছু চেনা যাচ্ছে না তো! শান্টিং ইয়ার্ডটা কত দূর ছড়িয়ে গেছে! রেল লাইনের দু'ধারে নানান চেহারা ও সাইজের কত সব ঘরবাড়ি হয়েছে। পুবের মাঠে সেই ডাকবাংলোটা খুঁজে পায় না সে। তরুণ ইউক্যালিপটাস, ঝাউ আর কৃষ্ণচূড়ার বনের ফাঁকে হলদে অনেকগুলো কোয়ার্টার দেখতে পায়। শুনেছিল, পলাশপুরে ব্লক অফিস হয়েছে। ওটাই কি?

স্টেশনের পশ্চিমে নিচুতে অজস্র দোকানপাট। ভিড় গিজগিজ করছে। কয়েকটা বাস দাঁড়িয়ে আছে। সাইকেল-রিকশগুলো বিকেলের আপ ট্রেনের যাত্রী বোঝাই করতে ব্যস্ত। ইটবোঝাই ট্রাকটা বিকট আওয়াজ দিয়ে ভেঁপু বাজাচ্ছে। বাসের মাথায় দাঁড়িয়ে এক ছোকরা যাত্রীদের মালপত্র সামলাচ্ছে। মাঝে মাঝে চেরা গলায় চেঁচিয়ে উঠছে, 'কদমপুর! হাতিমারা! লোটনগঞ্জ—ও—ও'—

তিনটে প্ল্যাটফর্ম জুড়ে টুকরো-টুকরো ভিড়। হঠাৎ পারুর মনে ক্লান্তি আর তেতভাব এসে পড়ে। বড় অশ্লীল লাগে পলাশপুর জংশনকে। নামেই জংশন ছিল একসময়, নির্জন চুপচাপ হয়ে থাকত সারাক্ষণ। ছোট লাইনের প্ল্যাটফর্ম একেবারে শেষ প্রান্তে। সেখানেও লোকরা গিজগিজ করছে। উত্তর-পশ্চিমের মাঠে ছোট লাইনটা এখন ইটখোলা আর গুদামঘরের ভিড়ে হারিয়ে গেছে। ওদিকে নিরিবিলি একটা মালগাড়ির ভাঙা কামরা দাঁড়িয়ে থাকত ডেড স্টপের পাশে। বড় বড় ঘাস গজিয়ে উঠেছিল তার তলায়। ভজুয়া খালাসির সংসার ছিল ওখানে। ডালিমকে ধারে-কাছে দেখলেই তাড়া করত। পারুকে শাসিয়ে বলত, ঠাহারো! ডাগদারবাবুকো বোল দেগা! কেন অমন শাসাত কে জানে? ওরা তো কোন খারাপ মতলব নিয়ে যেত না ওখানে। বিশাল মাঠের বুকে ছোট একটা রেল লাইন বাঁক নিতে নিতে দূরের দিকে চলেছে, ওপাশে বড় রেল লাইনটার চেয়ে তাকে কত অনাথ দেখাচ্ছে। তার সেই নির্জন তুচ্ছতাটুকুর প্রতি হয়ত গভীর মমতা ছিল দুটি ছোট্ট ছেলের। হঠাৎ বাবার সঙ্গ ছেড়ে একলা ভুলোমন তাদের মতই ছোট্ট ছেলে যেন তেপান্তরে হারিয়ে যাচ্ছে, এ রকম মনে হত।

ডাউনের দিকে ছিল রেলের ওয়ার্কশপ। প্রায় এক মাইল দূরে ছিল সেটা। স্টেশন থেকে বাঁক নিয়ে পাশাপাশি বড় আর ছোট দুটো রেল লাইন পশ্চিমে এগিয়ে ওয়ার্কশপ অবধি পৌঁছেছিল। দক্ষিণ ওয়ার্কশপ, উত্তরে ছোট রেল, এর মধ্যে পলাশপুর গ্রাম। গ্রামের পশ্চিমে জেলাবোর্ডের সেই সড়কটা। স্টেশন থেকে এখন পীচের ঝকঝকে পথ গিয়ে সোজা মিশেছে সেটার সঙ্গে। এখন আর কিছু চেনার উপায় নেই। রেলকলোনির আড়ালে পড়ে গেছে পলাশপুর। পারুর অস্বস্তি হচ্ছিল। না আসাই হয়ত ভাল ছিল। এত সব অশালীন জটিলতার তলায় পুরনো পলাশপুর খাতার পাতায় ভরে রাখা প্রজাপতির মত মরে শুকিয়ে চ্যাপ্টা হয়ে গেছে।

পারু সিগারেট ধরায়। অচেনা লোকের ভিড়ে সেও এক অচেনা মানুষ। কেউ তাকে চিনতে পারছে না, সেও চিনতে পারছে না কাকেও। এটাই হয়ত তার খারাপ লাগছে। পনের বছর আগেও স্টেশনে দাঁড়ালে কত লোক তাকে চিনতে পারত। কথা বলত। কুশল প্রশ্ন করত। এখন সে পুরো বাইরের লোক হয়ে গেছে।

এই সময় দু-তিনজন কমবয়সী ছেলে তার দিকে দৌড়ে এল। —আমাকে দিন সার! আমি লিয়ে যাব সার! ওদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়ে গেল। পারুর স্যুটকেসটা পায়ের কাছে দাঁড় করান। হাল্কা ব্রিফকেসটা বাঁ হাতে ঝুলছে। একজন স্যুটকেসে হাত রেখে বলে, বলোক আফিসে তো সার? চলুন সার!

ব্লক অফিসের লোক ভেবেছে পারুকে। পারু লক্ষ্য করে। সঙ্গীদের চেয়ে ওই ছেলেটা রোগা। অথচ জোরটা এরই বেশি। অন্যেরা হতাশ হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। একজন পারুর দিকে চোখ টিপে বলে, দেখবেন সার, মাল লিয়ে কেটে পড়বে। খুব চিটিংবাজ সার!

অমনি স্যুটকেস ছেড়ে রোগা ছেলেটা ওর দিকে তেড়ে যায়। সেই ফাঁকে আরেকজন এসে স্যুটকেসে হাত দেয়। রোগা ছেলেটার পক্ষে দুদিক সামলান কঠিন। সে চেঁচিয়ে ওঠে, মারব! মারব শালাকে! এ ছেলেটা মরিয়া হয়ে স্যুটকেস মাথায় তুলতেই সে এসে আক্রমণ করে। পারু ধমক দেয়, এই! কী হচ্ছে সব! তারপর স্যুটকেসটা কেড়ে নেবার চেষ্টা করে। দ্বিতীয় ছেলেটা আক্রমণের মুখে বিপন্ন, তার মধ্যেই সে কাকুতিমিনতি করে, আমায় দেন সার! আমি নিয়ে যাই সার! পারু বুঝতে পারে, রীতিমত রুজির সংঘর্ষ চলেছে। এতটুকু ছেলে সব। দল বেঁধে একসঙ্গে ঘোরে। ভাবও আছে। অথচ এখন পরস্পর শত্রু। রেলের উর্দি পরা একটা লোক যেতে যেতে থমকে দাঁড়িয়েছিল। এবার সে এসে পটাপট থাপ্পড় লাগায় ওদের। ওরা একটু তফাতে সরে যায়। পারু স্যুটকেসটা হাতে নিয়ে বিব্রত মুখে হাসে। উর্দি পরা লোকটা বলে, ভাগ! ভাগ কুত্তার পাল! কোথায় যাবেন স্যার? এক মিনিট—লোক দিচ্ছি।

পারু কিছু বলার আগেই সে ছাউনির দিকে হাত তুলে কাকে ডাকে, এই ঘোড়ে! এখানে আয় রে! মাল লিয়ে যা।

বেঞ্চ থেকে ন্যালাখ্যাপা গোছের এক যুবক দাঁত বের করে উঠে আসছে। পারু স্যুটকেসটা নিয়ে হাঁটতে শুরু করে। রেলের লোকটা বলে, ওকে দিন স্যার। নিয়ে যাবে।

পারু গম্ভীর স্বরে বলে, দরকার হবে না। সে বুঝতে পারে, এই সামান্য ব্যাপারেও স্বজনপোষণ চলেছে। সে হনহন করে স্টেশন ঘরের পাশ দিয়ে গেটে যায়। গেটে কেউ টিকিট নিচ্ছে না আর। যাত্রীরা কখন চলে গেছে। সিঁড়িতে নামার পর সে সাইকেল-রিকশ ডাকে। একসঙ্গে কয়েকজন সাড়া দেয়। পারু আবছাভাবে টের পায়, পলাশপুরে জীবনসংগ্রামের তীব্রতা যেন বড্ড বেশি বেড়ে গেছে। প্রত্যেকে যেন প্রত্যেকের প্রতিদ্বন্দ্বী। আবার তার মনটা তেতো হয়ে ওঠে। পলাশপুরে আসা তার উচিত হয়নি।

কতটুকুই বা হাঁটতে হবে। গম্ভীর মুখে সে পা বাড়ায়। দাড়িওয়ালা বুড়ো এক রিকশওলা তার মুখের দিকে আশা নিয়ে তাকিয়েছিল। সিটে থাপ্পড় মেরে বলে, আসুন সার। লিয়ে যাই। যা মন চায় দেবেন।

ওর মুখের দিকে তাকিয়ে একটু চেনা লাগে পারুর। লোকটা অবশ্য তাকে চিনতে পারেনি। পারুর নীরবতায় উৎসাহ বেড়ে যায় ওর। হাত থেকে স্যুটকেসটা নিয়ে বলে, উঠুন সার। বলক আপিসে যাবেন তো!

পারু বলে, না। ওখানে—পীরতলার কাছে।

রিকশওয়ালা হনুমানের মত সিটে লাফ দিয়ে ওঠে। তারপর পারু ওঠে। চাকা গড়াতে থাকে। সোজা পশ্চিমে এগিয়ে চলে রিকশ। এটা এখন স্টেশন রোড। আগে ছিল কাঁচা রাস্তা। দু'ধারে নিশিন্দা ঝোপ আর কেয়াগাছ ছিল। সোমলতার ঝালর ঝুলত। বাঁদিকে গ্রাম, ডাইনে মাঠ, মাঠের মধ্যিখানে ছোট রেল লাইন। এখন দু'ধারে সে-সব ঝোপ-ঝাড় বিশেষ নেই। তরুণ শিরীষ অশ্বত্থ অর্জুনের চারা লাগান হয়েছে। ডাইনে কয়েকটা নতুন বাড়ি হয়েছে। বাঁদিকে ইটখোলা হয়েছে। সামনে একটু দূরে

পুরনো প্রকাণ্ড বটগাছটা দেখা যাচ্ছে। পারু একটু আশ্বস্ত হয়। ওটাই পীরতলা। কোন এক পীরের গোরস্তান আর দরগা আছে ওখানে। তার ডাইনে মীর্জাদের দালানবাড়ি। ধ্বংসস্তূপ বলাই ভাল। ওরই মধ্যে একটা দোতলা অংশ টিকে আছে। ডালিম ওটার মালিক হয়েছিল অনেক লড়াই দিয়ে। মীর্জারা একে একে দেশত্যাগ করেছিলেন। ডালিম সুযোগটা নিয়েছিল। সেটলমেন্ট রিচেকিং-এর সময় সে নিজের নামে দখল দেখিয়েছিল। তাকে অস্বীকার করার ক্ষমতা কারও ছিল না।

পীরতলায় স্যার? কাদের বাড়ি যাবেন?

রিকশওয়ালার প্রশ্নে পারু সোজা হয়ে বসে। আস্তে বলে, মহারাজার।

রিকশওয়ালা আচমকা প্যাডেল থামিয়ে ব্রেক কষে। ঘুরে সন্দিগ্ধ স্বরে বলে, মহারাজার বললেন?

পারু একটু হাসে। —হ্যাঁ। কেন?

রিকশওয়ালা একটু থেমে গিয়েছিল। আবার চলতে থাকে। কিন্তু আগের মত গতি নেই। রিকশওয়ালা ভারি গলায় বলে, ওনার সঙ্গে আগে চেনাজানা আছে স্যার? নাকি নতুন যাচ্ছেন?

পারু গম্ভীর হয়ে যায়। —কেন?

এমনি বলছি স্যার। রিকশওয়ালা চুপচাপ প্যাডেলে চাপ দেয়। বাতাস ঠেলে এগোতে যেন এতক্ষণে খুব মেহনত হচ্ছে তার।

মহারাজা। ডালিমের এই ডাকনামটা হঠাৎ কী ভাবে তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে এতদিন পরে! আসলে তার সঙ্গী ছেলেটি ছিল ডালিম, পরে সে 'মহারাজা' হয়ে উঠেছিল। কিন্তু পারুর কাছে ডালিমই সত্য। কারণ ডালিমকেই সে চেনে, মহারাজাকে চেনে না। একদা কে কিংবা কারা ডালিমকে আড়ালে মহারাজা বলে ডাকতে শুরু করেছিল, বোঝা যায়নি। স্কুলের থিয়েটারে ডালিম একটা ছোট্ট পার্ট পেয়েছিল। সেটা ছিল রাজভৃত্যের। সংলাপ ছিল মোটে দুটো। দুটোই একটিমাত্র শব্দ : মহারাজ! স্টেজে ডালিম ভড়কে গিয়ে মহারাজা বলে ফেলেছিল। তারপর থেকে কেউ কেউ ওকে মহারাজা বলত আড়ালে। এক সময় দেখা গেল, ডালিম নিজেও মেনে নিয়েছে নামটা। ডাকলে সাড়াও দিচ্ছে। তারপর একদিন তার ডালিম নামটাও হারিয়ে গেল সবার কাছে, সে মহারাজা হয়ে উঠল। এমন কি হরনাথও মৃত্যুর সময় অবধি এই নামেই তাকে খুঁজেছিলেন।

কিন্তু তখন ডালিম কোথায়? গুজব রটেছিল, সে নাকি মিলিটারিতে নাম লিখিয়েছে। বছর পাঁচেক পরে যখন সে ফিরল, তখন দেখা গেল সত্যি তাই। পারু জানে, ডালিম ফ্রন্ট লাইনেও গিয়েছিল। তবে যুদ্ধ করতে নয়, সে ছিল নেহাত ক্যান্টিন-বয়। বর্মা ও আসামে ট্রেঞ্চে গিয়েও সৈনিকদের খাবার পৌঁছে দিত। তার সাহসের তুলনা হয় না। তার গায়ে ক্ষতচিহ্ন ছিল অনেক।

তবু কোনদিন পারুর কাছে ডালিম মহারাজা হয়ে ওঠেনি, আজও নয়। মহারাজা একটা অচেনা নাম পারুর কাছে। সে চেনে ডালিমকে।

এই রিকশওলার কাছে হয়ত নিছক মুখ ফসকে মহারাজাটা বেরিয়ে গেছে, কিংবা এ নামেই ওকে সবাই চিনবে বলে তার মনে হয়েছে। তাই বলেছে। আর রিকশওয়ালা তা শুনে সন্দিগ্ধ হয়েছে। কেন হয়েছে বুঝতে পারছে পারু। ডালিমের মত কুখ্যাত একটা লোকের কাছে সে যাচ্ছে, রিকশওয়ালার পক্ষে সম্ভবত এটা অস্বস্তিকর। সে হয়ত ভাবছে তার এই যাত্রীও একই গোত্রের। কিংবা এক সময় যেমন ডালিমকে দিয়ে লোকে কাজ উদ্ধার করত, এও তাই যাচ্ছে। অবশ্য এখন তো ডালিমের একটা পা-ই নেই। ক্রাচ ছাড়া হাঁটতে পারে না। ঘর ছেড়ে বেরয় না।

মাফ দেবেন স্যার, একটা কথা শুধোচ্ছি। রিকশওয়ালা চাপা ষড়যন্ত্রসঙ্কুল স্বরে বলে ওঠে।

পারুর হাসি পায়। সে বলে, বল!

আপনি কি কলকাতা থেকে আসছেন?

হ্যাঁ।

মহারাজার কেউ হন নাকি? মানে ... রিকশওয়ালা ঘোঁত ঘোঁত করে বিকৃত মুখে কেমন হাসে। ... মানে ওনার কেউ আছে বলে তো শুনিনি, তাই শুধোচ্ছি।

পারু ইচ্ছে করেই ওর সঙ্গে তামাশা করতে চায়। বলে, তুমি হরনাথবাবু ডাক্তারকে চিনতে?

খুউব স্যার! চিনব না কেন? ওরে বাবা, গরিবের মা বাপ। ধন্বন্তরী ছিলেন। বলে রিকশওয়ালা কপালে হাত ঠেকিয়ে সম্মান জানায় হরনাথের উদ্দেশে।

পারুর ভাল লাগে এটা। সে বলে, মহারাজাকে উনি ছেলেবেলায় মানুষ করেছিলেন, জান তো?

রিকশওয়ালা হতাশভাবে মাথা দুলিয়ে বলে, দুধ দিয়ে কালসাপ পোষা স্যার, বুঝলেন কিনা! ভগবানের ইচ্ছেয় তিনি গত হলেন। নইলে বড্ড কষ্ট পেতেন মনে। আরে বাবা, বীজ যেমন বিরিক্ষ হবে তেমনি। খুব রক্ষে পেয়েছিলেন ডাক্তারবাবু। স্যার, কথাটা হল কী জানেন? জ্ঞানী হলে কী হবে? বীজ চিনতে ভুল হয়েছিল। ...

লোকটা আপন মনে এসব বলতে থাকে। পারু ভাবে, এই সামান্য রিকশওয়ালাও হরনাথের প্রশংসা করছে। বাবা সত্যি বিচিত্র মানুষ ছিলেন। এখনও তাঁকে হয়ত কেউ ভোলেনি। ডালিমের ব্যাপারটা নিয়ে একসময় আড়ালে যত কুৎসাই রটুক, অমন সহৃদয় ডাক্তার তো সচরাচর মেলে না। মন দিয়ে রোগীর চিকিৎসা করতেন। পয়সার কথা মুখ ফুটে বলতেনই না। যে যা হাতে তুলে দিত, হাসিমুখে নিতেন। নিজের পয়সায় ওষুধ কিনে দিতেন গরিব রোগীকে। ডাক্তারি বিদ্যা বলতে তো কিছুই ছিল না, ছিল মেধা আর অভিজ্ঞতা। শহরের বড় ডাক্তারের কাছে হন্যে হওয়া রোগীরা এসে ভিড় করত তাঁর ডিসপেন্সারিতে। রোগীকে দেখেই টের পেতেন রোগটা কী। সার্জারিতেও হরনাথের হাত ছিল কুশলী। কাজীসায়েবের এক ধনী আত্মীয়ের ছেলে, বাচ্চা এতটুকু ছেলে, তার গলায় টিউমার গজিয়েছিল, হরনাথ অপারেশন করেছিলেন। পারুর মনে পড়ে, কাজীসায়েবের ইচ্ছে ছিল, শুক্রবারে দুপুরে জুম্মা নামাজের সময় যেন তার অপারেশন হয়। এদিকে দরজা বন্ধ করে অপারেশন চলছে, ওদিকে মসজিদে এলাকার কয়েকশ লোক মিলে প্রার্থনা করছে। সারা পলাশপুরে সেদিন অস্বস্তিকর স্তব্ধতা। কী হিন্দু, কী মুসলমান—সব বাড়িতে লোকেরা উৎকণ্ঠায় সময় গুনছে। সে এক আশ্চর্য পরীক্ষার সময় হরনাথের জীবনে। জীবন ও মৃত্যুর লড়াই চলেছে তাঁর সাদা শীর্ণ আঙুলের ইশারায়। পাতলা ঠোঁটের নিচে আত্মবিশ্বাসের সেই পরিচিত রেখাটি স্পষ্টতর হয়েছে। দুই ভুরুর মধ্যিখানে তীক্ষ্ণ ভাঁজটা স্থির। দৃষ্টি তীব্র। খাড়া নাকের ডগায় বাঁধা সাদা কাপড়ের টুকরো ঘামে ভিজে যাচ্ছে। দূরের মসজিদ থেকে ভেসে আসছে সমবেতভাবে প্রার্থনার গম্ভীর ধ্বনিপুঞ্জ। এদিকে ঠাকুরঘরে এলোচুলে বনশোভা চুপচাপ বসে আছেন করজোড়ে। চোখ বন্ধ। বাড়ি প্রচণ্ড স্তব্ধ। ...

হরনাথ জিতে গিয়েছিলেন। সুনাম আরও বেড়ে গিয়েছিল। প্রচুর টাকা দাবি করতে পারতেন—ওঁরা ছিলেন ধনী মানুষ। কিন্তু কিছু নেননি। পীড়াপীড়ি করায় হাসতে হাসতে বলেছিলেন, বেশ, আমায় একটা ঘোড়া কিনে দিন না দেখি। এ বয়সে আর সাইকেলের প্যাডেল করতে বড্ড পরিশ্রম হয়।

ঘোড়াটা এসে গেল। কালচে—নাকি খয়েরি রঙের মস্ত ঘোড়া। আবছা মনে পড়ে পারুর। ডালিম ঘোড়াটাকে বড্ড জ্বালাত। হরনাথ ওষুধ কিনতে শহরে যেতেন বাসে চেপে। কখনও ট্রেনেও যেতেন। আর সেই ফাঁকে পুকুরের ধার থেকে ঘোড়াটা নিয়ে ডালিম সওয়ার হত। কতবার আছাড় খেয়েছিল। হাড় নড়ে গিয়েছিল। ডিসপেন্সারিতে ওকে ধরে আছে ধরণী কম্পাউন্ডার। আর হরনাথ হাতের হাড় বসাচ্ছেন। ডালিম লাল চোখে যন্ত্রণা সইছে। আশ্চর্য, মুখে এতটুকু বিকৃতি নেই। শুধু বড় বড় জলের ফোঁটা গালের ওপর। হরনাথ হাসছেন আর বলছেন, কাঁদবি তো হাউহাউ করে কাঁদ না বাবা। তোর মুখ দেখে যে ভিসুভিয়াস মনে হচ্ছে। কি করি বল তো তোকে নিয়ে! কিছু বললে ভাববি, আফটার অল পর—পর বলেই বকছে। তার চেয়ে এদিকে আয় হতভাগা। হাতজোড় করে বল্ আই বেগ ইওর পারডন স্যার!

নির্বিকার ডালিম মিনমিনে গলায় বলল, আই বেগ ইওর পারডেন স্যার!

নট পারডেন! পারডন! হরনাথ গর্জে উঠেছিলেন, বানান করে বল্।

রিকশওয়ালা চলে গেলে বটতলায় দাঁড়িয়ে পারু বড় নিঃশ্বাস ফেলে। লোকটা হরনাথ ডাক্তারের কথায় ডুবে গিয়ে তার পরিচয়টা জানাতে ভুলে গেল। ভালই হল। বঁদিকে রাস্তার ধারে খালের ওপর

কাঠের ব্রিজ হয়েছে দেখে পারু অবাক হয়। মীর্জাবাড়ির সদর দরজাটা ছিল পশ্চিমে। উত্তরে এই রাস্তা। এখান থেকে ও-বাড়ি ঢোকার জন্যে খিড়কি অবধি একটা সরু পায়ে-চলা পথ ছিল। কিন্তু এই ব্রিজটা ছিল না। ডালিম তৈরি করে নিয়েছিল হয়ত। পনের বছরে পলাশপুর জুড়ে যে তৈরি করার হুলস্থূল চলেছে, তার হিড়িকে ডালিমও নিশ্চয় কত কিছু তৈরি করে নিয়েছে!

যেমন হৈমন্তীকে। তৈরি করে নেওয়া বইকি। হৈমন্তী নিশ্চয় ডালিমের জন্যে রেডিমেড গুডস ছিল না।

হৈমন্তীর কথা মনে আসতেই পারুর মধ্যে একটা চাপা উত্তেজনা জেগে ওঠে। তীব্র কৌতূহল পারুকে নাড়া দেয়। কীভাবে ডালিমের ঘর করছে সে? ডালিম জন্মসূত্রে মুসলমান। সেটা পারুর কাছে কোন ব্যাপারই নয়। ধর্মের কথা তুললে বলতে হয়, ডালিম না-ঘরকা না-ঘাটকা। ধর্ম তো বরাবর ওর চক্ষুশূল ছিল। কিন্তু হৈমন্তী যে দারুণ মানত-টানত সব।

সেই হৈমন্তী। পারুর মাথার ভিতরটা এতক্ষণে, এই নড়বড়ে কাঠের ছোট্ট ব্রিজে দাঁড়িয়ে শূন্য লাগে। তার মুখোমুখি এতদিন পরে দাঁড়াতে চলেছে সে। হৈমন্তী মাথা কুটে লিখেছিল, তোমার পথ তাকিয়ে রইলুম। এক্ষুনি চলে এস লক্ষ্মীটি। কলকাতা কখনও যাইনি—একা মেয়ে কী ভাবে যাব! হয়ত বেরিয়ে পড়তুম। তুমিই এস। আসবে তো?

পারু সামনে চারপাশে ছড়ান ধ্বংসস্তূপ আর আগাছার জঙ্গলের দিকে শূন্যদৃষ্টে তাকায়। আর তার এগোতে ইচ্ছে করে না। যেন ঐ ধ্বংসস্তূপের মধ্যে এতদিন পরে খুঁজতে এসেছে কুলুঙ্গিতে রাখা সোনার পিদিম।

ইতিমধ্যে মার্চের বিকেলের রঙ ফিকে হয়েছে। পারু নড়ে ওঠে। পিছনে স্টেশন রোডে যেতে যেতে লোকেরা তার দিকে তাকাচ্ছে। এমন জায়গায় একটা চুপচাপ-দাঁড়িয়ে-থাকা লোক দেখে নিশ্চয় তারা অবাক হচ্ছে। তারপর এল একটা বাচ্চা মেয়ে। লাল ফ্রক পরা মেয়েটা সোজা দৌড়ে কাঠের ব্রিজে উঠল। পারুকে দেখে থমকে দাঁড়ায় সে। পারু তার দিকে তাকিয়ে একটু হাসে। অমনি মেয়েটা যেন ভয় পেয়ে আড়চোখে এবং সন্দিগ্ধ দৃষ্টে তাকে দেখতে দেখতে এগিয়ে যায় ধ্বংসস্তূপের দিকে। একটু পরেই আগাছা ও ঢিবির আড়ালে সে অদৃশ্য হয়। তখন পারু পা বাড়ায়।

সরু একফালি রাস্তা। ঘুরে ঘুরে এগিয়েছে রাস্তাটা। এটাই ছিল মীর্জাদের প্রাইভেট রোড। পর্দানসীন মেয়েরা বাইরে থেকে এ রাস্তায় খিড়কির দরজা দিয়ে অন্দরমহলে ঢুকত। অজস্র কল্কেফুল পড়ে আছে দেখে পারু নিজের অজান্তে একটা কুড়িয়ে নেয়। তারপর মুখ তুলতেই দেখে রাস্তার বাঁকে ঢিবির ওপর একটা ঝাকড় মাকড় জংলি গাছের নিচে কে দাঁড়িয়ে আছে। আলো খুব কম এখন। পারুর লংসাইট ইদানীং ভাল নয়। তবু বুঝতে পারে, ওই হৈমন্তী।

প্রায় পনের বছর পরে হৈমন্তীকে সে দেখতে পাচ্ছে, ব্যাপারটা এখন স্বপ্ন মনে হয়। একমুহূর্ত পরেই পারু স্মার্ট হয়ে ওঠে। লম্বা পা ফেলে এগিয়ে যায়। তার যাওয়ার মধ্যে একটা প্রবল সাড়া, যেন বলতে চায়, আমি এসে গেছি, হৈমন্তী!

মুখোমুখি গিয়ে সে থমকে দাঁড়ায়। হৈমন্তীকে উচ্ছ্বাসে আবেগে চঞ্চল দেখার আশা ছিল কি মনে? হৈমন্তী শান্ত। ঠোটের কোনায় একটা ভাঁজ, হাসিটা খুব সামান্যই আঁকা হয়েছে। কয়েক মুহূর্ত দুজনেই চুপচাপ। তারপর হৈমন্তী বলে, এস। বলেই সে ঘোরে। চলতে থাকে।

পারুর আলোড়নটাও আর নেই। পিছন থেকে শান্তভাবে সে বলে, ভাল আছ তোমরা?

হৈমন্তী যেতে যেতে ঘুরে জবাব দেয়, আছি। তুমি?

আছি।

রাস্তাটার শেষে একটুকরো উঠোন দেখা যাচ্ছিল। একদিকে দোতলা একটা পুরনো বাড়ি—দেওয়ালে অজস্র ফাটল। কার্নিশে গাছের চারা। শ্যাওলায় সবুজ হয়ে আছে বাড়িটা। কোথায় পলেস্তারা খসে ইট বেরিয়ে রয়েছে। নোনা-ধরা মেটে সিঁদুরের মত ইটগুলোর বয়স অনেক। ওই রকম ছোট্ট ইট একশ-দেড়শ বছর আগে বানানো হত। মীর্জাদের এই সব বাড়ি সম্ভবত ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে তৈরি।

পারু দেখল, উঠোনের তিনপাশে পাঁচিল নেই, শুধু ধ্বংসস্তূপ। তার ওপর আগাছার জঙ্গল গজিয়ে রয়েছে। এমন একটা জায়গায় ওরা থাকে দেখে পারুর অবাক লাগে। ডালিমের দাদু কাল্লু বেদে তো এখানেই কোথাও গোখরো সাপ ধরেছিল।

সেই বাচ্চা মেয়েটা উঠোনে দাঁড়িয়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকাচ্ছে। হৈমন্তী তাকে ডেকে বলল, মিলু, শোন্! এদিকে আয়। তারপর পারুর দিকে ঘুরে সে একটু হেসে বলে, তোমার বন্ধু ওপরে আছে।

এই নিরুত্তাপ অভ্যর্থনা পারুকে ক্ষুব্ধ করেছে ততক্ষণে। চিঠিটা যে সত্যি বকলমে ডালিমেরই, তা প্রমাণিত হল। সে দাঁড়িয়ে আছে দেখে হৈমন্তী ফের বলে, ওপরে চলে যাও। নিচের ঘরে আমরা থাকি না। সাপের বাসা।

হঠাৎ এতক্ষণে পারুর কানে আসে, ওপরের ঘরে বেহালা বাজছে! খুব ক্ষীণ আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। ডালিম ট্রানজিস্টার বাজাচ্ছে! বারান্দায় উঠে সে ডাইনে সিঁড়ি দেখতে পায়। সিঁড়িতে ওঠার সময় বেহালার সুরটা হঠাৎ তীব্র বেসুরো বাজে। যেন দুষ্ট বাচ্চা ছড় নিয়ে জোরে একটা টান দিল।

ওপরের বারান্দায় পৌঁছলে বেহালা থেমে যায়। তারপর ভারি গলায় আওয়াজ আসে—নিরু এলি? আয় শালা, দেখাচ্ছি মজা! সিগারেট আনতে পাক্কা তিন ঘণ্টা। ঘড়ি ধরে বসে আছি। বাঞ্চোৎ!

সামনের প্রথম ঘরটার দরজা বন্ধ। পাশের ঘর থেকে আওয়াজ এল। পারু নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারে না, এই সেই ডালিমের কণ্ঠস্বর! আরও গম্ভীর, আরও জোরাল যেন।

ফের আওয়াজ আসে, বাঘের গলার চাপা গর্জন। —অ্যাই শুওরের বাচ্চা! আসবি, নাকি যাব?

পারু দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। হাসিমুখে ডাকে, মহারাজা!

ডালিমের গায়ে একটা ময়লা ধূসর পাঞ্জাবি, পরনে পাজামা। এক হাতে বেহালা কাঁধের ওপর, অন্য হাতে ছড়—সে জানালার কাছে দাঁড়িয়েছিল। পাশে একটা টেবিল। টেবিলের গ্লাসে যে তরল পদার্থ তা নিশ্চয় জল নয়। তার চোখ দুটো বরাবর বিশাল। তলায় সেই ঘুম-ঘুম ভাবটা এখনও আছে। তার গোঁফ, জুলপি, বড় বড় এলোমেলো চুল সবই ধূসর হয়ে গেছে। লম্বা তীক্ষ্ণ নাকের ওপরদিকে কাটা দাগটা কালচে হয়েছে। কপালের ভাঁজগুলো হয়েছে আরও গভীর। এবং মুখে একটা হিংস্র ভাব—নাকি রুক্ষতা, ঠিক বোঝা যায় না। তার চোখের পাতা ঘোলাটে। প্রথম সে পাথরের মূর্তির মত স্থির হল। তারপর ভুরু দুটো কুঁচকে গেল। তারপরই সে আচমকা এই পোড়ো বাড়ি তোলপাড় করে চেঁচিয়ে উঠল, হিমি! হিমি! মাই ফ্রেন্ড আ গেয়া। হিপ হিপ হুররে!

প্রথম কয়েক মুহূর্ত ওকে ওভাবে স্থির ভাবে সোজা দাঁড়াতে দেখে পারু ভুলেই গিয়েছিল, ওর বাঁ পা হাঁটুর ওপর থেকে কাটা গেছে। পাজামার বাঁদিকটা সোজা মেঝে ছুঁয়েছে—হয়ত সেজন্যই। পারুর সব অস্বস্তি-দ্বিধা মুহূর্তে কেটে গেছে। সে ঘরে ঢোকে। স্যুটকেসটা রাখে। ব্রিফকেসটাও রাখে।

এক পায়ে অদ্ভুত ভঙ্গিতে ডালিম লাফ দিয়ে চলে এসেছে তার কাছে। তারপর হাহা হাহা প্রচণ্ড রকমের হেসে বেহালা ও ছড়সুদ্ধ তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে। পারু মদের গন্ধ পায়। ডালিম তার বুকে কাঁধে গলার কাছে মুখ ঘষতে থাকে। অস্পষ্ট স্বরে কী বলতে থাকে একটুও বোঝা যায় না।

পারু শান্ত স্বরে বলে, তুই ... তুই আমার চেয়ে বুড়ো হয়ে গেছিস মহারাজা!

ডালিম চোখ পাকিয়ে বলে ওঠে, অ্যাই শালা! খবর্দার! মহারাজা কে রে? আমি তোর ডালিম! ইওর লাভার ডালিম, ওরে পারু বাঞ্চোৎ! তোর গায়ে ঠ্যাঙ তুলে তোকে বুকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে থাকতুম। তখন হিমি কোথায় রে! অ্যাই হিমি, জলদি আ যাও বেগম!

বলে সে দুষ্ট হেসে ফিসফিস করে, বেগম শুনলে চটে যায় হিমি। মাইরি।

পারুর কাঁধে হাত দিয়ে বিছানায় নিয়ে যায় সে। ঘরটা বড়। একটা সেকেলে প্রকাণ্ড মেহগনি পালঙ্ক আছে। বেশ উঁচু বিছানাটা। পারুকে বসিয়ে দিয়ে সামনে এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকে সে। মিটিমিটি হাসে।

পারু বলে, খুব মেজাজে আছিস দেখছি। আর সব খবর বল্।

ডালিম হাতের ছড় তুলে বলে, খবর-টবর রাখ। ব্যাপারটা বলি শোন! হঠাৎ সেদিন পুরনো জিনিসপত্র হাতড়াতে গিয়ে একগোছা চিঠি পেয়ে গেলুম। তোর চিঠি। ...

পারু একটু চমকে গিয়ে বলে, আমার চিঠি? কাকে লিখেছিলুম?

ডালিম হাসতে হাসতে বলে, নেভার মাইন্ড! যাকেই লিখে থাকিস কিছু যায় আসে না। তো চিঠিগুলো দেখতে দেখতে তোর জন্যে মনটা কেমন করে উঠল। বিশ্বাস কর্ পারু। শালা আমার মত পাপীতাপী লোকের চোখে জল এসে গেল। তো হিমিকে অবিশ্যি চিঠির কথা বললুম না। জাস্ট ক্যাজুয়ালি ওর সঙ্গে তোর কথা আলোচনা করলুম, পারু তো আজ অবধি আমার কোন চিঠির জবাব দেয়নি। তুমি লেখ না। অনেক সাধাসাধি করে অনেক গালমন্দ—আমার শালা মুখ তো জানিস, ও রাজি হল। লিখল। আমি জানতুম, তুই ওকে অস্বীকার করতে পারবি না।

পারুর ভেতরটা কেঁপে উঠেছিল ওর কথা শুনতে শুনতে। সে এক সময় কিছু চিঠি হৈমন্তীকে লিখেছিল তার বিয়ের আগে। সেগুলোই কি? হৈমন্তী কি বোকার মত সেগুলো রেখে দিয়েছিল কোথাও? পারুর অস্বস্তি হয়। কিন্তু মুখে শান্ত হাসি ফুটিয়ে বলে, তাহলে আমাকে ট্র্যাপ করে ফেলেছিস বল্! তুই বরাবর সাংঘাতিক ট্র্যাপার!

ডালিম তার পাশে বসে পড়ে। জোরে মাথা দোলায়, না রে শালা না। আমি হারামজাদা হতে পারি, আমি মানুষ। আমার একটা স্মৃতি বলে বস্তু আছে। আমার ... আমার ... তার মুখটা উত্তেজনায় আবেগে লাল হয়ে ওঠে। সে আচমকা উঠে এক পায়ে লাফাতে লাফাতে টেবিলের গ্লাসটা নেয়। এক চুমুক খেয়ে গ্লাসটা হাতে নিয়ে পারুর কাছে ফিরে আসে। তারপর চোখ নাচিয়ে বলে, হ্যাঁ রে, এখন তো শুনছি দু-হাজারি মনসবদার হয়েছিস! ড্রিঙ্ক নিশ্চয় করিস। বল্ না, করিস না কি! নয়ত তোর সামনে খাব না।

পারু আস্তে বলে, খাই। একটু-আধটু।

খাস! ডালিম নড়ে ওঠে। হিপ হিপ হুররে! আলবাত খাবি। তো এই বাঞ্চোৎ, আমাকে তো মহারাজা বলে ডাকলি লোকের মত, মহারাজার জন্যে উপঢৌকন আনিসনি? জানিস আমাকে ভেট দিতে হয়?

এনেছি। বলে পারু উঠে যায় স্যুটকেসের কাছে।

ডালিম আরও উত্তেজনায় অস্থির হয়ে বলে, শাবাশ! দিশি খেয়ে বড্ড কষ্ট হয় রে। আজ অনেকদিন পরে ভাল জিনিস খাব।

হুইস্কির বোতলটা পারুর হাত থেকে কেড়ে নিয়ে সে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে, তারপর কেমন নিস্তেজ হয়ে যায়। বোতলটা রেখে পারুর দিকে তাকায়।

পারু বলে, কী হল?

ডালিম মাথা নাড়ে। —কিছু না। কিন্তু হিমি আসছে না কেন? হিমি! হিমি!

হিমি—হৈমন্তী বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল এতক্ষণ, পারু বুঝতে পারে। সে এবার দরজার কাছে এসে বলে, পারু, ওর ড্রিঙ্ক করা বারণ। হার্ট অ্যাটাক হয়ে হাসপাতালে ছিল এক মাস।

পারু বিব্রত হয়ে বলে, আমায় তো জানাওনি তোমরা! তাহলে আনতুম না।

ডালিম ভুরু নাচিয়ে বলে, হিমি অনেকটা বাড়িয়ে বলছে রে! তুই তো চিনিস ওকে। সব তাতেই ওর বাড়াবাড়ি। পারু, সিগারেট দে। কখন আনতে পাঠিয়েছি, এল না।

হৈমন্তী ঘরে ঢোকে। জানালার কাছে টেবিলটার পাশে দাঁড়িয়ে বলে, সিগারেট খাওয়াও বারণ। অথচ শুনবে না। আমার কী!

ডালিম পারুর কাছে থেকে প্যাকেটটা ছিনিয়ে নিয়ে বলে, দিন-রাত্তিরে দুটো-তিনটে খেলে দোষ নেই। আসলে হয়েছে কি জানিস পারু? এক বছর জেলে ছিলুম। ওই সময়টা আমার হেলথ একেবারে টেঁসে গেছে।

দরজার কাছে সেই বাচ্চা মেয়েটি এসে বলে, বউদি, জল ফুটছে।

ডালিম চোখ নাচিয়ে বলে, হিমি! আমার ফ্রেন্ডের খাতির না হলে আমার সেকেন্ড হার্ট অ্যাটাক হবেই। তখন তুমি টু-থার্ড বিধবা হবে। পারু, ও এখন ওয়ান-থার্ড বিধবা।

পারু এবার হো হো করে হেসে ওঠে। হৈমন্তী বেরিয়ে যায়। যাবার সময় বলে যায়, তুমি জামাকাপড় বদলে নাও পারু। নিচে জল দেওয়া আছে।

সে চলে গেলে ডালিম সিগারেট বের করে। বলে, ধরিয়ে দে পারু। ডাকবাংলোর কল্কেফুলের জঙ্গলে যেমন করে ধরিয়ে দিতিস। তুই তখনও টানতে শিখিসনি কিন্তু। মনে আছে? তোকে মেরে মেরে টানা শেখাতুম!

পারু সহজ হয়ে ওঠে। সব অস্বস্তি কেটে যায় তার। ডালিম—ডালিমও স্মৃতি নিয়ে তার মতই দিন কাটায়। তারও সব মনে আছে। আশ্চর্য তো!

সিগারেটে জোরাল একটা টান দিয়ে কতক্ষণ ধরে ধোঁয়া ছাড়ে ডালিম। তারপর বলে, চাকরি যারা করে না, তারাও যে রিটায়ার্ড লাইফের খপ্পরে পড়ে, ভাবতেই পারিনি। আর এ কী বিচ্ছিরি সময় রে! নো ওয়ার্ক, নো পে। রোজগার বন্ধ। এখন প্র্যাকটিক্যালি হৈমন্তী আমায় বাঁচিয়ে রেখেছে। মার্কেটিং কো-অপারেটিভে ওকে দয়া করে একটা চাকরি দিয়েছিল সত্যদা। সত্যদাকে তো চিনিস! মানে, ভেঁটুবাবু রে! ইলেকশনওয়ালা!

ডালিম হাসতে থাকে। পারু বলে, ভেঁটুবাবুর ইলেকশান তুই খেটেছিলি নিশ্চয়?

ঠিক বলেছিস। কারও কারও উপকার-টুপকার করেছিলুম এক সময়। তারা অনেকেই ভোলেনি দেখলুম। আমি যখন জেলে, এ বাড়িতে একা থাকত হৈমন্তী।

বলিস কী! পারু চমকে ওঠে। —এই বাড়িতে একা থাকত?

হ্যাঁ একা। তবে ওকে তো চিনিস, ওর ক্ষমতা প্রচণ্ড। অত হুলস্থুলের বিরুদ্ধে ড্যাম কেয়ার করে আমার ঘরে এসে ঢুকেছিল। পরে সব শুনবি! তো আমার জেলে থাকার সময় ভেঁটুবাবু ওকে চাকরিটা দেয়। মাসে শ'দেড়েক টাকা। তাতেই মাইরি টাকা-ফাকা জমিয়ে এক কাণ্ড করে ছিল। ফিরে এসে খুব নবাবি করলুম।

ডালিম আবার হাসতে থাকে। কিন্তু তার সেই তীব্রতা, পারুকে দেখে হইচই করা, ক্রমশ যেন থিতিয়ে আসছে। তাকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে। গলার স্বরটা ভাঙা, নিস্তেজ। পারু বলে, তুই বেহালা বাজাতে শিখেছিস দেখছি!

হুঁ। বুড়ো বয়সে এই রোগ। করবটা কী বল! বলে সে আঙুল তোলে টেবিলের দিকে। —ওখানে দেখছিস কী ব্যাপার?

কী ওগুলো? পারু তাকায়। দেখে, একটা কালার বক্স, অজস্র তুলি, কয়েকটা রঙের কৌটো। একগাদা কাগজ। ছবি আঁকে ডালিম?

ডালিম ফের আঙুল তোলে দেওয়ালে। —ওই দ্যাখ্! দেখতে পাচ্ছিস?

দেওয়ালে চোখ যায় পারুর। ছবি এঁকে কোণায় পেরেক পুঁতে টাঙিয়ে রেখেছে। উঠে গিয়ে ছবি দেখে সে। সবই ল্যান্ডস্কেপ। একটা মোটে পোর্ট্রেট-গোছের ছবি। মুখ ফিরিয়ে থাকা স্ত্রীলোক।

ডালিম বলে, হিমিকে এঁকেছি। হয়নি?

ডালিম স্কুলে মোটামুটি ভাল ছবি আঁকত। ম্যাগাজিনেও বেরিয়েছিল ওর ছবি। পারু এসে তার পাশে বসে। বলে, খুব ভাল লাগল। তোর তো বড্ড ন্যাক ছিল এতে!

ডালিম হাসবার চেষ্টা করে। —আমরা পোটো বংশ, মাইন্ড দ্যাট। আমার ঠাকুর্দা পট আঁকত। পোস্টাপিসের দেওয়ালের সায়েব দুটোর কথা মনে আছে?

আছে।

নেই!

হঠাৎ ওর গর্জন শুনে চমকে ওঠে পারু। সে তাকায় ওর দিকে।

ডালিম হাঁসফাস করে বলে, নেই। তোর কিছু মনে নেই। তাহলে অ্যাদ্দিন তোকে পঞ্চাশটা চিঠি লিখেছি, ডেকেছি, দৌড়ে চলে আসতিস! চালাকি করিস নে। আমি সব সইতে পারি, মিথ্যে কথা চালাকি জোচ্চুরি সইতে পারি নে!

পারু উদ্বিগ্ন হয়ে বলে, প্লিজ ডালিম!

ডালিম ক্লান্ত স্বরে বলে, বীরেশ্বরবাবুকে ভোজালিতে কুপিয়ে কেটেছিলুম। আমাকে জাস্ট একটা মিথ্যে বলেছিল, সেজন্যে।

ও কথা থাক ডালিম। বরং ...

ওকে থামিয়ে ডালিম একটু হেসে বলে, এখন বুঝতে পারি। আমার মধ্যে কিছু ভাল জিনিসও ছিল। কীভাবে বুঝলাম জানিস? জেল থেকে ফিরে অ্যাকসিডেন্ট ঘটল। পা কেটে ফেলতে হল। তখন বিছানায় শুয়ে থাকা ছাড়া উপায় ছিল না। আর দিনের পর দিন, রাতের পর রাত আমি সেলফ অ্যানালিসিস করতুম। বুঝতে পেরেছি, আমি যদি ছবি আঁকতুম, নাম-করা পেন্টার হতুম। যদি মিউজিক নিয়ে থাকতুম, ফেমাস হতুম। পারু, বড় সায়েন্টিস্ট হতেও পারতুম। কারণ আমার হেরিডিটরি ক্ষমতা ছিল। আমার পূর্বপুরুষদের বলা হয় বেদে। তারা ছবি আঁকতে, গান গাইতে, গান বানাতে জানত। বংশপরম্পরা এ ক্ষমতা ছিল তাদের। তারা বিষাক্ত সাপ ধরতে পারত। সাপের সব কিছু তারা জানত। তুই জানিস, আমি কিছুদিন সাপ ধরতুম? সাপে-কাটা রোগীর চিকিৎসাও করতুম, জানিস?

শুনেছি। অমুর সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা হয়েছে। সে বলেছে।

মোটামুটি ভালই চলছিল সাপ-টাপ নিয়ে। নিচের ঘরে সাপগুলো রেখে দিতুম। মাসে একবার করে বিষ চালান দিয়েছি কলকাতার একটা কোম্পানিকে। ভাল রোজগার হত। তখন অবশ্য হিমি আমার ঘরে আসেনি। কিন্তু আমার ভেতরেই ছিল ভয়ঙ্কর একটা সাপ। তাকে বাগ মানাতে পারিনি।

হৈমন্তীকে আবার দেখা গেল দরজায়। —কী হল পারু? কথা পরে বলা যাবে না!

ডালিম বলে, হ্যাঁ, কাপড় বদলে নে। নিচে গিয়ে হাতমুখ ধুয়ে আয়। পাক্কা ছ'ঘণ্টার জার্নি! এই লাইনটা শালা তেমনি থেকে গেল। সেই হেঁপো এনজিন। নড়বড়ে হাড়।

পারু পোশাক বদলাতে ওঠে। হৈমন্তী চলে যায়। ডালিম ফের বলে, ওঃ, আজ কতকাল পরে তোকে নিয়ে শোব রে পারু!

পারু ছেলেবেলার মধ্যে থেকে হাসে। এতক্ষণে সে পরিষ্কার টের পেয়েছে, ডালিমের ডাক দুর্ধর্ষ মানুষ মহারাজার ডাক নয়। স্মৃতির ডাক। এখন বেচারার স্মৃতি ছাড়া আর কী-ই বা আছে! পারুর মনে একটা আবেগ আসে, গতরাতে যেমন এসেছিল। সে পাজামা পরতে পরতে বলে, আমরা কি খুব বুড়ো হয়ে গেছি রে ডালিম? আমারও চুল-টুল প্রায় পেকে গেছে। তোর বয়স কত হল রে?

ফর্টিফাইভ প্রায়।

আমারও।

তুই আমার তিন মাসের ছোট নাকি। তো পারু—!

উঁ?

তুই কি সত্যি আর বিয়ে করিসনি? অমুর সঙ্গে তোর দেখা হয়েছিল কোথায়, অমুই বলছিল। আমি কিন্তু বিশ্বাস করিনি। অমু ভীষণ গুলবাজ তো!

হঠাৎ পারুর চোখ চলে যায় দেওয়ালে। হরনাথ ডাক্তারের ছবি। সে ছবিটার দিকে এগিয়ে যায়। ডালিমও তার পাশে এসে দাঁড়ায়। দুজনেই নিঃশব্দে ছবিটা দেখতে থাকে। তারপর অস্ফুট স্বরে পারু বলে, বাবার ছবি! কোথায় পেলি ডালিম?

ডালিম ওর কাঁধে হাত রেখে বলে, দৈবাৎ পেয়েছি।

দুজনে চুপচাপ ছবিটা দেখতে থাকে। হরনাথ হাসিমুখে ওদের দেখছেন। ...

তাহলে কি হৈমন্তী চায়নি পারু আসুক? মনের মধ্যে এই সংশয় নিয়ে পারু হৈমন্তীর হাবভাব লক্ষ্য করছিল। পোশাক বদলে সে নিচে গেছে, দেখেছে বারান্দার কোনায় হৈমন্তীর রান্নাঘর। থামের সঙ্গে ভাঙা ইটের দেওয়াল মাটি দিয়ে গাঁথা। ভেতরটা অন্ধকার গুহার মত। তার মধ্যে হৈমন্তীর ফ্যাকাশে মুখে খুব শান্ত একটা ভাব। এ যদি হৈমন্তীর সাম্প্রতিক ব্যক্তিত্বের প্রকাশভঙ্গি হয়, পারুর অস্বস্তি ততটা হবে না। তার গাম্ভীর্য যদি অন্তত বয়সেরও লক্ষণ হয়, তাতেও পারুর খারাপ লাগবে না। কত বয়স

হয়েছে হৈমন্তীর? পারু হিসেব করেছে মনে মনে। অন্তত দশ বছরের ছোট ছিল হৈমন্তী। তাহলে দাঁড়ায় পঁয়ত্রিশ কি বড়জোর ছত্রিশ। অথচ ওর শরীরে তো বয়সের ছাপ তেমন কিছু পড়েইনি। ওকে অনায়াসে ত্রিশের কোটায় ফেলা যায়। একটু রোগা দেখাচ্ছে, কিন্তু মুখের ডিমালো গড়ন, গালের মাংসের ড্যাবডেবে ভাব, উদ্ধত ঋজু গ্রীবা, আর ওর মাথার একরাশ চুলে নারীর যৌবনের সব কিছুই প্রকাশ পাচ্ছে।

আর হৈমন্তী কি ডালিমের কাছে সুখী? এও একটা তীব্র প্রশ্ন পারুর কাছে। জাতিধর্মের ব্যাপারটা আপাতত অবান্তর লাগছে। এ মেয়ের সাহস এবং হয়ত বা নির্লজ্জতাও চূড়ান্ত রকমের। একালের সমাজ—বিশেষ করে এমন একটা আধা-গ্রাম আধা-শহরের মত জায়গায় অনেক নতুন ঘটনা মানিয়ে যায়। দেশভাগের পর আরও কত বাইরের মানুষ এসে জুটেছে এখানে। জীবন জটিল হয়েছে, জটিলতর হচ্ছে। কেউ কারও ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলায় না হয়ত, কিংবা তার সময়ও পায় না। কলকাতার সঙ্গে সাঁকো বাঁধার কাজ রেল কোম্পানি তো ১৯১৮ সালেই করে গিয়েছিল। কাজেই হৈমন্তীর ব্যাপারটা মানিয়ে গেছে। কিন্তু তবু প্রশ্ন থেকে যায়। হৈমন্তীর নিজের মনের অতল তলে যে অবচেতন সংস্কার, তা কি কখনও ফুঁসে ওঠে না?

ওর বাবা ছিলেন স্কুলের মাস্টারমশাই। বাংলা পড়াতেন। রোগা একটু কুঁজো মানুষ। পদ্য আওড়াতে গিয়ে আবেগে চোখে জল এসে যেত। মধুবাবুর সেই পদ্য পড়ার ক্যারিকেচার ডালিম চমৎকার দেখাতে পারত। বড্ড ভাবপ্রবণ লোক ছিলেন। তেমনি সম্মানজ্ঞানও ছিল টনটনে। সামনের লোকটি রাস্তা ছেড়ে সরে দাঁড়িয়ে ওঁকে যেতে না দিলে অপমানিত বোধ করতেন। পিছন থেকে কেউ চেঁচিয়ে ডাকলে ক্ষুণ্ণ হতেন। কেন—সামনে এসে নম্রভাবে কথা বলতে কি বাধে মানুষের? দোকানদার তাঁকে সবার আগে সওদা না দিলে রেগে যেতেন। আসলে নিজেকে খুব উচ্চস্তরের মানুষ মনে করতেন মধুবাবু।

ডালিমকে উনি বলতেন রাঙামুলো। ডালিম পিছন থেকে বক দেখাত। বারোয়ারিতলার বটগাছে গয়লাদের বিনোদ গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলেছিল। সন্ধেবেলা ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। মধুবাবু বাড়ি ফিরছেন। ছাতি নিয়ে বেরোননি। বটতলায় এসে দাঁড়িয়েছিলেন একটুখানি। বৃষ্টিটা ধরলেই আবার হাঁটবেন। এমন সময় ডালিমের সিগারেট খাওয়ার ইচ্ছে হয়েছে। পারুকে ইশারায় ডেকে নিয়ে বেরিয়েছে দুজনে। রাস্তার ওধারেই বটগাছটা। দৌড়ে এসে সেখানে দাঁড়াতেই অন্ধকারে মধুবাবুর মুখোমুখি হল। মধুবাবু কিছু বলার আগেই ডালিম চেঁচিয়ে উঠেছিল, ভূত! ভূত! পারু রে, বিনোদ গয়লার ভূত রে!

মহাখাপ্পা হয়ে মধুবাবু পাল্টা চেঁচালেন, তুই ভূত!

সে এক হই-হই কাণ্ড। আশেপাশের বাড়ি থেকে লোকেরা লণ্ঠন ও লাঠি নিয়ে বেরিয়ে এল। ডালিম তখনও পারুকে জড়িয়ে ধরে চোখ বুজে ভূত ভূত বলে চেঁচাচ্ছে।...

তারপর হাসাহাসি পড়ে গেল। কিন্তু মধুবাবুর রাগ আর পড়ে না। ব্যাপারটা প্রচণ্ড অপমান বলেই ধরে নিলেন। তাঁকে ভূত বলার চেয়ে মর্মান্তিক ঠাট্টা আর কি হতে পারে? নালিশ তুলেছিলেন হরনাথের কাছে। হরনাথ বোঝালেন—ছেলেমানুষ, সত্যি ভয় পেয়ে ভূত বলেছে। মধুবাবু শুনবেনই না। ও জেনেশুনেই ভূত বলেছে। তাও শুধু বললে কথা ছিল, বিনোদ গয়লার ভূত! মধুবাবুকে বিনোদ গয়লার সঙ্গে তুলনা?

ডালিম সেবার বাংলায় টেনেটুনে তেরোর বেশি পায়নি। আর ক্লাসে এসে মধুবাবু বলতেন, ডাক্তারের পালিতপুত্র বলুক, বিজিগীষার অর্থ কী? ডালিম মানে বলতে না পারলে বলতেন, ডাক্তারের পালিতপুত্র বেঞ্চে উঠে দাঁড়াক।

তখন হৈমন্তী হয়ত সবে জন্মেছে কিংবা জন্মায়নি। ওর ছেলেবেলাটা পারুর অজানা। তখন কত মেয়ে পলাশপুরে জন্মেছে, বেড়েছে, শ্বশুরবাড়ি চলে গেছে। হৈমন্তীও একদিন চলে যেত। তার যাওয়া হয়নি। কেন হয়নি, মনে পড়ে না পারুর। শুধু মনে পড়ে, ওদের সংসারটা তছনছ হয়ে গিয়েছিল। পাড়াগাঁয় জমিজমা না থাকলে যা হয়। ওর এক মামা থাকতেন শহরে। সেখানে চলে গিয়েছিল

হৈমন্তী। তখন অবশ্য পারুর কলেজে পড়া শেষ। মাও বেঁচে নেই। ডালিম নিরুদ্দেশ। পারু চাকরির চেষ্টা করে হন্যে হচ্ছে। মুসলিম লিগের আমল চলছে। পারু রাজনীতিতে নেমেছিল। গাঁয়ে গাঁয়ে মিটিং করে বেড়াত। বক্তা সে মোটেও ভাল ছিল না। কিন্তু সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশতে জানত। গাঁয়ের লোকে তখন তার দলকে বলত লাল ঝাণ্ডার দল। অনেকবারই আক্রান্ত হয়েছে পারু। মারধরও খেয়েছে। সেই সব সময়ে তার তীব্র ভাবে মনে পড়ে গেছে ডালিমের কথা। ডালিম যদি পাশে থাকত তার।

পার্টি অফিসেই একদিন আলাপ হল একটি মেয়ের সঙ্গে। বছর পনের-ষোল বয়স। সাদাসিদে চেহারা। কিন্তু কী একটা তীক্ষ্ণতার ছাপ আছে। সবে সে ম্যাট্রিক পাস করেছে। পার্টি তাকে কলেজে পড়ার খরচ দেবে। আশ্রয়ও দিয়েছে ইতিমধ্যে। কারণ যে আত্মীয়ের বাড়ি থাকত এতদিন, তারা ওকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

নাকি নিজেই ঝগড়া করে চলে এসেছিল সে। হঠাৎ একটু হেসে বলল, আপনাকে চিনি। আমাদের বাড়ি ছিল পলাশপুরেই। আমার বাবার নাম মধুসূদন ত্রিপাঠী।

এভাবেই হৈমন্তীর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল পারুর। তারপর হৈমন্তীকে একরকম পারুই টেনে এনেছিল পার্টির পলাশপুর সেলে। মেয়েদের মধ্যে কাজ করার জন্যে। হৈমন্তীদের ভিটেটা আগাছায় ভরে গিয়েছিল। গাঁয়ের কৈবর্ত, বাগদী, ডোম, ছোট চাষী আর ক্ষেতমজুর তখন পার্টিতে এসে গেছে। বর্ণশ্রেষ্ঠদের মধ্যে কিছু নিম্নবিত্ত পরিবারের যুবকরাও এসেছে। মধুবাবুর ভিটেয় ঘর বানানো হল। হৈমন্তী সেখানে থাকে। পার্টির অফিসও সেখানে। পলাশপুরে তখন দলের একটা বড় ঘাঁটি। কলকাতা থেকে নেতারা যাতায়াত করছেন। হৈমন্তীকে আদর করে অনেকে বলতেন, কুইন অফ দি রেড এরিয়া!

হৈমন্তী কিছু বলত না। পারুও খুশি হত। কিন্তু পরে দলের তাত্ত্বিকরা কেন্দ্রীয় বৈঠকে কড়া সমালোচনা করতেন কথাটার। কুইন-টুইন মধ্যযুগীয় সংস্কার। ওসব কেন? বরং রেড এরিয়ার নেত্রী বললে ব্যাপারটা বস্তুতান্ত্রিক হয়।

যাই হোক, তবু কুইন কথাটা বেশ চালু হয়েছিল। কাজের চাপে হৈমন্তীর কলেজে পড়াটাই বাতিল হয়ে গেল। তার নিজেরও আর তাগিদ ছিল না। সারাদিন হৈমন্তী আর কিছু মেয়ে এলাকায় ঘুরত। পারুও তাদের সঙ্গে গেছে। ফেরার সময় সন্ধ্যায় মাঠে দল বেঁধে 'ইন্টারন্যাশনাল' গাইতে গাইতে এসেছে। সদ্য ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষের ঝড়ঝাপটা সামলে লোকেরা উঠে দাঁড়িয়েছে। সে ছিল যেন এক সন্ধিকাল।

কিন্তু হৈমন্তীর সঙ্গে তখনও কোন গোপন আবেগময় সম্পর্ক গড়ে উঠতে পেরেছিল পারুর? পারুর ওদিকে ততটা মন ছিল না। হৈমন্তীরও যেন তাই। তারপর কী একটা ঘটতে থাকল। আঠার—নাকি উনিশ বছরের এক নারীর সঙ্গে সাতাশ-আটাশ বছরের এক যুবক কী ভাবে যেন টের পেয়ে গেল রাজনীতির যোগসূত্রের চেয়ে গভীর এক যোগসূত্র—যা নিছক জৈবিকও নয়—অন্যরকম কিছু।

কত তুচ্ছ ঘটনায় যে পুরুষ ও নারীর মধ্যে ভালবাসা স্বরূপে বেরিয়ে আসে—অপ্রত্যাশিত!

পারুকে সদর কেন্দ্রে থেকে কাজ করার নির্দেশ এসেছিল। পারুর পলাশপুর ছেড়ে যাবার ইচ্ছে নেই। সে মনমরা হয়ে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে আছে। ঘরে কেউ নেই—একা হৈমন্তী। পোস্টার গোছাচ্ছে। পারু বিকেলের বাসে কিংবা ট্রেনে রওনা হবে। হঠাৎ হৈমন্তী ডাকল, পারুদা!

কমরেড বলেই ডেকেছে বরাবর। পারুও ডেকেছে, বয়েসে যত ছোটই হোক। সে আমলে কমরেড শব্দে কী এক আবেগ ছিল, নতুনত্ব ছিল। পারুদা শুনে পারু ঘুরে একটু হেসেছিল, ভাবলুম অন্য কেউ ডাকল!

কেন? আমি কি পারুদা বলে ডাকি নে কখনও?

হয়ত ডেকেছ, খেয়াল নেই। বলে পারু জানলার ধারে পা ঝুলিয়ে বসেছিল। —বল হৈমন্তী।

কখন যাচ্ছ?

ঘণ্টা দুই পরে। কেন?

হৈমন্তী একটু চুপ করে থেকে বলেছিল, না। এমনি জিজ্ঞেস করলুম।

পারু ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, আমার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু ...

কিন্তু কী? ইচ্ছের বিরুদ্ধে যেতে হচ্ছে, এই তো?

ঠিক তাই। তাছাড়া হঠাৎ আমাকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কেন? ওঁরা তো বেশ জানেন, আমি এখান থেকে গেলে ক্ষতি হতে পারে।

হৈমন্তী হাসল। তোমার কী ধারণা, শুনি?

পারু চাপা গলায় উত্তেজিত ভাবে বলেছিল, ননীদার কারচুপি ছাড়া এ কিচ্ছু নয়। বরাবর ওঁর এই ব্যাপারটা দেখছি। যেখানে সেল বেশ স্ট্রং হয়েছে, উনি সেখানে গিয়ে চার্জ নেবেন। তারপর সেলটা ছত্রভঙ্গ হলে আবার ডিস্ট্রিক্ট সেলে ফিরে যাবেন। বরাবর আমি এ নিয়ে কথা বলেছি। ননীদা ... ননীদা নিশ্চয় কারও এজেন্ট। হয় গভর্নমেন্টের, নয়ত কংগ্রেসের। এবার পলাশপুর সেলটা ভাঙতে চান।

হৈমন্তী নিষ্পলক তাকিয়ে ওর কথা শুনে বলেছিল, আমিও তাই ভেবেছি।

ভেবেছ? পারু উঠে এসে মেঝেয় ওর মুখোমুখি বসে পড়ল। —তুমি ইনটেলিজেন্ট হৈমন্তী। ননীদা সম্পর্কে পার্টির আস্থা অগাধ। অথচ ওঁরই পরামর্শে কিছু ভাল কমরেড আমরা হারিয়েছি। সৌরীনের ব্যাপারটা দেখ। তার বাড়িতে গিয়ে হামলা করে বইপত্তর কাগজ সব কেড়ে আনা হল। সৌরীন পরে যে চিঠিটা লিখেছিল আমি দেখেছি। লিখেছিল—আমার কাছে সবই এখন গ্রীষ্মের দুপুরের দুঃস্বপ্ন মনে হয়। আমি আপনাদের চিনেছি। অন্তত কমরেড ননীগোপাল ভট্টাচার্যের মুখোশের আড়ালে প্রকৃত মুখটা আমার আগেই চেনা হয়ে গেছে। এর জন্যে আপনাদের প্রচণ্ড মূল্য দিতে হবে। ...

হৈমন্তী অস্ফুট স্বরে বলেছিল, তুমি নির্দেশ না মানলে তোমাকেও এক্সপেল করা হবে।

পারু বলেছিল, আমার কেমন যেন ফ্রাস্ট্রেশন এসে যাচ্ছে হৈমন্তী। খুব ক্লান্তি লাগছে। কেন যেন মনে হচ্ছে, ভুল রাস্তায় ঠেলে দেওয়া হচ্ছে আমাদের।

যেন আমারও। মাঝে মাঝে সব উদ্দেশ্যহীন লাগে। ... বলে হৈমন্তী মুখ নামিয়ে নিজের হাতের আঙুল দেখতে দেখতে ফের বলেছিল, ভবিষ্যৎটা খুব অস্পষ্ট মনে হয় এখন।

সেই দুপুর থেকে বিকেল—দুজনের ওভাবে খোলাখুলি আলোচনার মধ্য দিয়েই যেন একটা গভীর সম্পর্ক বেরিয়ে পড়ল, যা এতদিন আড়ালে ছিল। মতামতের মিল, আশা-নিরাশার মিল আর ক্লান্তির মিল। পারু গেল না। তা নিয়ে বিতর্ক শুরু হল। প্রথমে চিঠিপত্র, তারপর জেলান্তরের নেতাদের যাতায়াত, আলোচনা, সে রীতিমত ঝড় একটা। তারপর তোলা হল একটা তীব্র অভিযোগ। পারু ও হৈমন্তীর আচরণ এবং ইদানিংকার ঘনিষ্ঠতা নিয়ে। ননীদা এলেন যথারীতি। ঠোঁটের কোনায় ওঁর একটা তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের রেখা জন্মক্ষণ থেকেই ছিল যেন। তার সঙ্গে মৃদু হাসি জুড়ে বললেন, ঠিক আছে। এটা এখনই সেট্‌ল করা হোক। পার্টির বদনাম রটেছে। আমি ওদের পার্টি-ম্যারেজের প্রস্তাব দিচ্ছি। এটা যদি না কার্যকর হয়, এই সেল ঝড়ের মুখে উড়ে যাবে। একে তো লোকে আজকাল প্রজাপতির দফতর বলে ঠাট্টা তামাশা করে। স্ট্রং মরালিটি বজায় রাখতেই হবে। নইলে আমরা এখানে খতম হয়ে যাব।

পারু কঠোর মুখে বলেছিল, না।

হৈমন্তীও বলেছিল, না।

তারপর পলাশপুরে প্রকাশ্যে সভা ডাকা হয়েছিল। এমন কি কলকাতা থেকে নেতারাও এসেছিলেন। ঘোষণা করা হল, আমাদের পার্টির শৃঙ্খলা ও নৈতিকবোধ খুবই কঠোর। কারণ আমাদের সংগ্রাম সর্বহারার মুক্তি সংগ্রাম। এই সংগ্রামে কোন নৈতিক দুর্বলতা বরদাস্ত করা হয় না। তাই গভীর দুঃখের সঙ্গে কমরেড পার্বতীচরণ সান্যাল এবং হৈমন্তী ত্রিপাঠীকে পার্টি থেকে বহিষ্কৃত করা হল। ...

সন্ধ্যায় যখন স্কুলের মাঠে সেই সভা চলেছে, তখন পারু আর হৈমন্তী ডাউনে ডিসট্যান্ট সিগনালের ওপাশে রেলব্রীজের চত্বরে বসে আছে। ভালবাসার কথা বলছিল কি? মোটেও না। পারু বরাবর এসব ব্যাপারে বড্ড লাজুক ছিল। আর হৈমন্তীও কেমন যেন ভাবলেশহীন চোখে তাকিয়ে থাকত।

অথচ ভালবাসা ছিল। হঠাৎ পারুর ইচ্ছে করত পাশাপাশি হেঁটে আসতে আসতে ওর হাতটা ধরে। সংকোচ এসে বাধা দিত। পারু ভাবত, বয়সে তার চেয়ে কত ছোট হৈমন্তী!

হৈমন্তীর ঘর থেকে পার্টি অফিস চলে গিয়েছিল মুকুলদের একটা ঘরে। মুকুলের বাবা ছিলেন মফঃস্বল কোর্টের মোক্তার। দলের সিমপ্যাথাইজার ছিলেন গোড়া থেকেই। মুকুলও মোক্তারি পাস করে বাবার জুনিয়র হয়ে কোর্টে যেত।

এর কিছুদিন পরেই হৈমন্তীর ও ঘরে একা থাকা অসম্ভব হয়ে উঠছিল। রাতদুপুরে জানলায় ধাক্কা, উঠোনে ঢিল, বেনামা চিঠি। ভিটের কিছু অংশ সে আগেই বেচে দিয়েছিল একজনকে। সম্ভবত তারই ষড়যন্ত্র। গোটা জমিটা নেওয়ার মতলব ছিল তার। অগত্যা পারুর পরামর্শে সবটাই বেচে দিয়েছিল হৈমন্তী। তারপর পারুদের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল। পারু এতদিন পরে অনেক সাহসে বলে ফেলেছিল, হৈমন্তী, পৈতৃক বাড়িটা তো রয়েছেই আমার, তুমি সারা জীবন থেকে যেতে পার না?

আনমনে হৈমন্তী বলেছিল, উঁ? কেন?

এ বাড়িতে আর কেউ নেই। শুধু তুমি আর আমি থাকি। লোকেরা কী ভাবে তুমিও জান, আমিও জানি। তাই বলছিলুম ...

বরাবর থেকে যেতে তো?

হ্যাঁ, হৈমন্তী। পারু আরও সাহস নিয়ে বলেছিল। কেউ তো বিশ্বাস করবে না আমাদের দুজনের মধ্যে একটা বিশাল নদী আছে। বল, বিশ্বাস করবে? আমাদের মধ্যে তো কোন রিলেশন নেই। আছে কি? অথচ আমরা একই বাড়িতে থাকি!

হৈমন্তী কেমন হেসে বলেছিল, তুমি এবং আমি যা জানি, তাই-ই কিন্তু সত্য। লোকের মিথ্যা জানায় কী আসে যায়?

কী জানি আমরা, হৈমন্তী?

হৈমন্তী মুখ ঘুরিয়ে অস্ফুট স্বরে বলেছিল, আমরা একই ঘরে শুই না। আমরা তো আলাদা ঘরে রাত কাটাই।

পারু একটু ক্ষুব্ধ হয়েছিল এ কথা শুনে। —তুমি কী আশ্চর্য ছেলেমানুষ হৈমন্তী! তোমার কথাগুলো আমার কানে খুব খারাপ শোনাল। তুমি কি আমাকে পরমহংস মনে কর? আফটার অল আমি পুরুষমানুষ!

হৈমন্তী ঠাণ্ডা স্বরে বলেছিল, তুমি কি ভয় দেখাচ্ছ আমায়?

তোমার ভয় পাওয়া উচিত ছিল।

পাইনি। পাব না। আমায় কি তুমি এখনও চেননি পারুদা?

কিন্তু আমার পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠেছে। হৈমন্তী, সব কিছু বোঝার বয়স তোমার কি হয়নি এখনও?

হৈমন্তী কথাগুলো উড়িয়ে দেবার ভঙ্গিতে হেসে বলেছিল, কী মুশকিল! আমি তো চলে যেতেই চাচ্ছি।

কোথায় যাবে তুমি? মামার ওখানে? ওখানে তুমি আশ্রয় পাবে ভাবছ?

পৃথিবীটা অনেক বড় পারুদা।

পারু ওর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলেছিল, না। তুমি মেয়ে। তোমার বয়স কম। তোমার জন্য পৃথিবী মোটেও বড় নয়।

বেশ তো। আমায় দেখতে দাও তাই কিনা।

না।

সেই প্রথম পারু হৈমন্তীর দু'কাঁধে হাত রাখল। তারপরই ঘটল বিস্ফোরণ। হৈমন্তী ওর বুকে মুখ গুঁজে কেঁদে উঠল। কতক্ষণ কাঁদতে থাকল।

আজ মনে পড়ে না, আর কখনও হৈমন্তীর অমন কান্না সে দেখেছিল কিনা, এমন কি কখনও ওর চোখ ছলছল করে উঠতেও কি দেখেছিল? সম্ভবত না। স্মৃতিটা বড় তালগোল পাকানো। জট খোলা কঠিন।

সেদিন নির্জন বাড়িতে এই রকম প্রচণ্ড আত্মপ্রকাশের পর হৈমন্তী আস্তে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে একটু তফাতে সরে গিয়েছিল।

আচ্ছন্ন পারু ডেকেছিল, হৈমন্তী!

হৈমন্তী ভাঙা গলায় বলেছিল, আমায় অন্তত একটা দিন সময় দাও তুমি। ...

তখন পারু টিউশনি করে পেট চালাচ্ছে। স্কুলে মাস্টারির জন্যে চেষ্টা করতে গিয়েছিল। সেক্রেটারি বীরেশ্বর চক্রবর্তী অন্য দলের রাজনীতির পাণ্ডা ছিলেন। প্রথমে খুব সহানুভূতি দেখিয়েছিলেন, মোহভঙ্গ হল তো পারু? খামোকা আমাদের সঙ্গে অ্যাদ্দিন ধরে শত্রুতা করলে! এখন কথা হচ্ছে, তুমি আমাদের হরনাথ ডাক্তারের ছেলে। তোমার বাবা ছিলেন গ্রেট ম্যান। তুমি বাবার লাইনে তো গেলেই না, উপরন্তু...

পারু বাধা দিয়ে বলেছিল, সুযোগ তো পাইনি বীরুকা। ম্যাট্রিকের আগেই বাবা মারা গেলেন।

ওয়েট, ওয়েট। শোন। তা না হয় গেলে না কিংবা চান্স পেলে না, তো তারপর যা করলে, সেটাই তো আমাদের কাছে মুশকিল হয়ে দাঁড়াচ্ছে!

পারু বলেছিল, পার্টি তো আর করি না।

বীরেশ্বর হা হা করে হেসে বলেছিলেন, কর না নয়, তোমাকে ওরা বহিষ্কৃত করেছে বলেই করার চান্স পাচ্ছ না। তবে সে না হয় গেল। ওতে আটকাত না। তোমার প্রতি আমাদের খুবই সিমপ্যাথি আছে। ভাল ছেলে বলেও তোমার সুনাম ছিল। তোমার বর্তমান দুরবস্থার জন্য রিয়্যালি আমাদের কষ্ট হয়। কিন্তু বাবা, স্কুলের শিক্ষকতা তো তোমাকে দেওয়া যাবে না।

কেন দেওয়া যাবে না বীরুদা? আমি তো গ্র্যাজুয়েট।

হাত তুলে বীরেশ্বর বলেছিলেন, নো নো। তুমি গ্র্যাজুয়েট এবং আমাদের স্কুলে অনেক ম্যাট্রিক নন-ম্যাট্রিক টিচারও আছেন। কথাটা তা নয়। আসলে ম্যানেজিং কমিটি মনে করেন, শিক্ষকদের নৈতিক মান থাকা এসেন্সিয়াল। কো-এডুকেশনের স্কুল। ভদ্রলোকের মেয়েরা পড়ে। সেখানে একে তো ইয়ং টিচার আমরা বরাবরই নিইনি, তাতে ...

বীরেশ্বর হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলেছিলেন, মধুবাবু আমাদেরই স্কুলের প্রাতঃস্মরণীয় শিক্ষক ছিলেন। তাঁর মেয়ের প্রতিও আমাদের—অন্তত আমার তো বটেই, প্রচুর সিমপ্যাথি এখনও আছে। এবার নিজেই ব্যাপারটা বুঝে দেখ।

পারু ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছিল। ক্ষুব্ধভাবে বলেছিল, ওর কথা আসছে কেন? হৈমন্তীর জন্যে আমি তো বলতে আসিনি!

বীরেশ্বর কেঠো হেসে বলেছিলেন, মেয়ে টিচার রাখি না। তাতে শিক্ষকমশাইয়ের মর‍্যাল স্ট্যান্ডার্ড ব্রেকডাউন হওয়ার চান্স থাকে। বুঝেছ তো?

কিন্তু আমি আমার নিজের জন্যে আপনাকে রিকোয়েস্ট করতে এসেছি।

বীরেশ্বরের মুখটা হঠাৎ বিকৃত হয়ে গিয়েছিল। —তুমি কি ন্যাকা পারু? গাল টিপলে দুধ বেরুচ্ছে? বোঝ না কিছু?

কী বলতে চান আপনি?

প্রকাশ্য জনসমাজে অবৈধভাবে বাস করছ দুজনে। একই বাড়িতে একই ঘরে নির্লজ্জের মত আচরণ করছ। আবার জাঁক দেখাচ্ছ আমাকে? ইচ্ছে করলে তোমাদের দুজনের মাথা মুড়িয়ে গ্রাম থেকে বের করে দিতে পারি, জান? নেহাত হরনাথ ডাক্তারের খাতির। ... বীরেশ্বর চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। ভয়ঙ্কর চেহারা।

পারু থরথর করে কাঁপছিল। মাথা ঘুরে উঠেছিল। তখনও অবস্থাটা সে তলিয়ে ভাবেনি, তাই ওই কথাগুলো অশ্লীল কুৎসা হয়ে বুকে বেজেছিল তার। আসলে তখন ওর বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা একেবারে কাঁচা। সে হাঁফাতে হাঁফাতে বলেছিল, কথা উইথড্র করুন বীরুদা!

গেট আউট—গেট আউট বলছি! এই কে আছিস? একে গেটের বাইরে রেখে দিয়ে আয় তো।

কেউ ঘরে ঢোকার আগেই পারু বলেছিল, এর জন্যে আপনাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। তারপর দ্রুত বেরিয়ে এসেছিল।

বাড়ি ফিরে আসার পথেই তার সব ক্ষোভ কেন কে জানে ফুরিয়ে যায় সেদিন। কিছুক্ষণ বারোয়ারি বটতলায় দাঁড়িয়ে সে ব্যাপারটা ভাবতে চেষ্টা করেছিল। তারপর মনে হয়েছিল, সত্যি তো! বীরেশ্বরবাবু কোন অন্যায় কথা তো বলেননি। শিক্ষকের চরিত্রের দিকটাই আগে লোকের চোখে পড়ে। অথচ সে তো অসচ্চরিত্র নয়! এই বোধ তার মধ্যে সাহস এনে দিয়েছিল। তখন সে হৈমন্তীর কাছে গিয়ে শান্তভাবে বলেছিল, তুমি আমার কাছে সারাজীবন থেকে যেতে পার না হৈমন্তী?

হৈমন্তী অন্যমনস্কভাবে বলেছিল, উঁ? কেন?

হঠাৎ পারুর মনে হয়, সে একটা কবরখানায় দাঁড়িয়ে আছে। মীর্জাবাড়ির ধ্বংসস্তূপে, আগাছার জঙ্গলে এই জীর্ণ দোতলা পোড়ো বাড়িটা ঘিরে এক বিশাল ছায়া এসে পড়েছে, সে ছায়া মৃতদের অতীত জীবনের। এখানে না আসাই তার উচিত ছিল। বস্তুত এ সবই তো স্মৃতি ছাড়া কিছু নয়। সে সোজা স্মৃতির মধ্যেই চলে এসেছে। তাই সব কিছু ধূসর, অস্পষ্ট, রহস্যময় লাগে। অস্বস্তিতে দম আটকে যায়। হৈমন্তীর মুখের ধূসরতা তাকে ভয় পাইয়ে দেয়। কে ডেকেছিল তাকে? ডালিম, না হৈমন্তী? ভেবেছিল হৈমন্তীর বকলমে ডালিম তাকে চিঠি লিখেছে এবং একটু আগে ডালিমের কথায় সেই অনুমান সত্য হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এখন নিচে হাত-পা ধুতে এসে হঠাৎ তার মনে হচ্ছে, আসলে হৈমন্তীই ডেকেছিল। ডেকেছিল একটা কবরখানা থেকে, যেখানে জনমানুষ নেই, শুধু আছে মৃতদের অপচ্ছায়া, তাদেরই দীর্ঘশ্বাস। এই গভীর প্রাকৃতিক স্তব্ধতার মধ্যে তিনজনের কণ্ঠস্বর ভুতুড়ে বলে মনে হতে পারে বাইরের মানুষের কাছে। বড় অদ্ভুত এক পটভূমিতে তিনজনে এসে দাঁড়িয়েছে।

দম-আটকানো ভাবটা নিয়ে পারু চারপাশটা দেখতে দেখতে বলে, তোমাদের সন্ধেটা খুব শিগগির হয় দেখছি।

হৈমন্তী চায়ের ট্রে সাজাচ্ছিল। নীল ফ্রক পরা মেয়েটির দিকে ঘুরে সে বলে, হেরিকেনটা জ্বেলে দে মিলু। পারবি তো?

মেয়েটি মাথা দোলায়। হৈমন্তী ট্রে নিয়ে বেরিয়ে আসে রান্নাঘর থেকে। ফের বলে, হাত পোড়াস না যেন। আর শোন, লম্ফটাও জ্বালবি। জ্বেলে রেখে হেরিকেনটা ওপরে দিয়ে যাবি? কেমন?

কথার জবাব দিল না দেখে পারু ক্ষুণ্ণমনে সিঁড়ির দিকে পা বাড়ায়। হৈমন্তী ততক্ষণে সিঁড়িতে উঠেছে। ওপরের ধাপ থেকে সে এবার পারুকে বলে, আছাড় খাবে। এক মিনিট দাঁড়াও। মিলু হেরিকেনটা আনছে।

পারু অপেক্ষা করে না। হেসে বলে, অন্ধকার দেখতেই তো ফিরে এসেছি।

হৈমন্তী এ কথাও এড়িয়ে ওপরের বারান্দায় পা বাড়ায়। পারু ওকে একটু সময় দিয়ে তারপর এগোয়।

ডালিম ডাকে, পারু, তোর হল?

পারু ভেতরে ঢুকে দেখে ডালিম জানলার পাশে সেকেলে গদী-আঁটা চেয়ারে বসে আছে। টেবিলে হুইস্কির বোতলটা খোলা। গ্লাসে ঢেলেছেও খানিকটা। হৈমন্তী ট্রে-টা একপাশে রেখেছে। ফুলকো লুচি, একবাটি তরকারি, কিছু সন্দেশ, আলুভাজা। ডালিম গ্লাসটা হাতে নিয়ে মুখে মিনতি ফুটিয়ে বলে, জাস্ট একটু টেস্ট করে নিচ্ছি। কিছু মনে করিস নে। বড় আসর বসবে রাত দশটায়।

হৈমন্তী কঠোর মুখে বলে, না।

ডালিম টেবিলে বাঁ হাতে কিল মেরে বলে, আরে ছোড় ইয়ার! কিত্‌নে দিন বাদ মেরা দোস্ত আ গেয়া! ধুস শালা! মাঝে মাঝে মুখ দিয়ে খোট্টাই বুলি বের হয় কেন বল্ তো? আসলে খোট্টাই বুলিতে বেশ জোর আছে, তাই না পারু?

পারু বলে, আছে।

অমনি ডালিম তাকে হ্যাঁচকা টান মেরে কাছে নেয় এবং দু'হাতে পারুর কোমর জড়িয়ে ধরে প্রায়

চেঁচিয়ে ওঠে, সাবাস! আমার ফ্রেন্ড ছাড়া আর আমার সাপোর্টার কে আছে? হিমি, আর তোমার ভয় পাচ্ছে না মহারাজা! বলেই সে জিভ কেটে হাসে। কী বললুম? মহারাজা! ড্যাম ব্লাডি ফুল মহারাজা! জাহান্নামে গেছে মহারাজা। আমি আবার ডালিম হয়েছি। হিপ হিপ হুররে!

পারু বুঝতে পারে না, ডালিমের নেশাটা বেড়ে যাচ্ছে, নাকি ইচ্ছাকৃত মাতলামি? ও এতক্ষণ নিশ্চয় চুপচাপ হুইস্কির বোতল খালি করছিল। পারু বোতলের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে দেখে, অন্তত তিন ভাগের এক ভাগ খেয়ে ফেলেছে। তারপর সে হৈমন্তীর দিকে তাকায়। হৈমন্তীর চোখে চোখ পড়ে তার। হৈমন্তীর চোখে স্পষ্ট ভর্ৎসনা ফুটে রয়েছে।

এতক্ষণে পারু হৈমন্তীর অস্বাভাবিক আচরণের অনেকটা ব্যাখ্যা করতে পারছে। হুইস্কিটা দেখেই সম্ভবত পারুর ওপর ক্ষুব্ধ হয়েছে। পারু অপরাধবোধে আড়ষ্ট হয়ে ওঠে।

সে হৈমন্তীকে শুধু বলে, ওর অসুস্থতার কথা জানতুম না।

হৈমন্তী আস্তে বলে খেয়ে নাও।

চোখ পাকিয়ে ডালিম বলে, কী বললি রে ওকে? অসুস্থতা! কার অসুস্থতা, কিসের অসুস্থতা? গডড্যাম শালা অসুস্থতা! আমার ফ্রেন্ড এসেছে, আমার ভাই এসেছে, আমার জন্যে বড় মুখে খানিক মাল এনেছে, আমি খাব না? ও কে আমার জানে না হিমি? ওই ভদ্রলোক আমাদের ফাদার, সে জানে না? বলিনি হিমিকে? হিমি, এখন তুমি যাও। আমাদের গ্রেট ফাদারের পায়ের নিচে বসে আমরা দু-ভাই এখন ন্যাংটো খোকা হয়ে যাব। হিমি, তুমি সরে যাও!

পারু বলে, ডালিম, তুই মাতলামি শুরু করলি এরই মধ্যে?

ডালিম হো হো করে হেসে ওঠে। তারপর বলে, থিয়েটার করে ফেলছি, তাই না? লোকে ভাববে, পোড়ো বাড়িতে ভূতের আবির্ভাব হয়েছে। না, আমি কথা বলব না। তুই খা। হিমি, ওকে ওই চেয়ারটা দাও।

হৈমন্তী অন্য কোণ থেকে এমনি একটা গদি-আঁটা পুরনো চেয়ার এনে পাশে রাখে। তারপর বলে, তোমার জন্যেও রয়েছে। দুজনেই খাও।

পারু বসে। ডালিম তার দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে মিটিমিটি হাসে। কী রে! আমায় এখন দারুণ ভদ্রলোক দেখাচ্ছে না?

দেখাচ্ছে।

তাহলে তুই আমায় খাইয়ে দে। প্লিজ পারু!

দিচ্ছি। তুই হাঁ কর্!

একটু লুচি ভেঙে ওর মুখে গুঁজে দিয়ে পারু লক্ষ্য করে ডালিমের চোখের কোনায় টলটলে কয়েক ফোঁটা জল। কিন্তু সে কিছু বলে না। গোঁফ মুছে ডালিম খুব আস্তে বলে, আচ্ছা পারু, হঠাৎ যদি আমরা নাইন্টিন থার্টিনাইনে ফিরে যাই এখন? তোর ভাল লাগবে?

পারুরও চোখে জল এসে যায় এ কথায়। আবেগে বুকের ভিতরটা অস্থির হতে থাকে। কিন্তু নিজেকে সংযত করে বলে, ফিরে যেতেই তো এসেছি!

একটা আঙুল তুলে ডালিম হৈমন্তীকে দেখিয়ে একটু হেসে বলে, ও তো তখন ছিল না। ওর তখন কি জন্ম হয়েছিল? মনেই হয় না। ও জাস্ট একটা কচি মেয়ে! জানিস পারু, এখনও আমার তাই মনে হয়। ওর সঙ্গে আজ প্রায় এগার বছর সংসার করছি, ও এখনও তাই থেকে গেল। তুই দ্যাখ্ ওর দিকে তাকিয়ে—দ্যাখ্ না শালা। হিমি, দাঁড়িয়ে থাক। পারু তোমাকে দেখে বলবে, হিমি, কোথায় যাচ্ছ? প্লিজ ...

হৈমন্তী দরজার দিকে এগিয়ে বলে, মিনু, দাঁড়িয়ে আছিস কেন? আলোটা দিয়ে যা। আচ্ছা বোকা মেয়ে তো তুই!

আলো দেখে এতক্ষণ পারু বুঝতে পারে, ঘরে এতক্ষণ একটুও আলো ছিল না। পশ্চিম খাটের পাশের জানলা থেকে দিনের যেটুকু আলো আসছিল, কখন তাকে মাড়িয়ে হালকা অন্ধকার এসে

ঢুকেছে, যদিও এখানে আকাশের টুকরোটা লালচে দেখাচ্ছে। তা যেন আত্মদহন সময়ের বুকের ভেতরকার অঙ্গার। তা বাইরের জন্য নয়। আর এই জানলাটা উত্তরের। উত্তরে ঘন গাছপালা। এখন রীতিমত কালো হয়ে গেছে এদিকটা।

খেয়ে নাও, আসছি। বলে বেরিয়ে যায় হৈমন্তী।

সে চলে যেতেই ড়ালিম বলে, এক কাজ কর্ তো! বোতলটা তুই লুকিয়ে রাখ্ কোথাও। নয়ত আমার যা লোভ, রাতের আসরটা জমবে না।

বোতলটা সে গুঁজে দেয় পারুর হাতে। পারু টেবিলের তলায় রেখে বলে, তোর আর খাওয়া উচিত নয়। হৈমন্তী দুঃখ পাবে।

ডালিম বলে, দুঃখটুকু পাবে বলেই তো ছেড়ে দিয়েছি শালা। জিজ্ঞেস কর্ না ওকে! মাঝে মাঝে একটুখানি খাই। সেটুকু হিমিই আনিয়ে দেয়। দুলেপাড়ায় চোলাই করে, সেখান থেকে। তাছাড়া আমার এতদিনে নিজের ওপর অনেকটা কন্ট্রোল এসেছে। দেখছিস তো, মাতলামি করতে বারণ করলি, করছি না। আমার বয়েস হয়েছে যে রে! আমার এখন গুরুগম্ভীর হয়ে যাওয়া উচিত না?

পারু না হেসে পারে না—ঠিকই বলেছিস।

চোখ নাচিয়ে ডালিম চাপা গলায় বলে, ছেলে নেই পুলে নেই, একেবারে গোরস্তানের মত জায়গায় বাস করছি, মলে তো কেলেঙ্কারি! কেউ আমাদের মড়া ছোঁবে না। অতএব ওড়াও স্ফূর্তি। যা খুশি কর। তাই না?

যা খুশি করাটা তো তোর বরাবর। সে তো নতুন নয়।

ডালিম তক্ষুনি দমে গিয়ে বলে, এখন যা খুশি আর করা যাচ্ছে না। আমার এই ব্লাডি শুওরের বাচ্চা ঠ্যাংটা! ও, হেল ওফ ইট! শালা নিজের বাড়িতে নিজের শত্রু ছিল কে জানত! বলে সে গেলাসের বাকিটুকু গলায় ঢেলে নেয়। ওঠে। এক পায়ে লাফাতে লাফাতে বিছানার কাছে যায় এবং বেহালা আর ছড়টা তুলে নিয়ে খাটে হেলান দিয়ে দাঁড়ায়। একটু হেসে বলে, তুই খা, আমি বাজাই। জাস্ট সন্ধেবেলা, পুরিয়া ধানেশ্রী বাজাই। কী বল্?

পারুর মনে হয় অন্ধকার ধ্বংসস্তূপ আর এই পুরনো জীর্ণ বাড়িটার গভীর থেকে নাড়িছেঁড়া যন্ত্রণায় চাপা ক্ষীণ আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে। খেতে তার হাত ওঠে না। ...

হৈমন্তী একদিনের সময় চেয়েছিল। ওই একটা দিন পারুর কাছে একটা বছর। হৈমন্তীর চলে যাওয়ার কথা সে ভাবতেই পারছিল না। মনে হচ্ছিল একটা সাংঘাতিক হার হবে তার। ওর জন্যেই তাকে রাজনীতি ছাড়তে হয়েছে। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, ওকে সে তীব্র আবেগে ভালবেসে ফেলেছে। অথচ যতটা পুরুষোচিত সাহস আর আক্রমণাত্মক শক্তি থাকা দরকার, তাই তার ছিল না। পরে মনে হয়েছে, সত্যি, তার এতটা ভীরু হওয়া উচিত ছিল না। নির্জন বাড়িতে সারাক্ষণ সুযোগ অথচ শারীরিক ঘনিষ্ঠতায় পৌঁছতেও পারেনি পারু। এটাই যেন বরাবর ওর চরিত্রের একটা বৈশিষ্ট্য। কেড়ে নেওয়া বা দাবি জানাবার শক্তি ওর ছিল না। অনেকেরই থাকে না হয়ত। কিন্তু হৈমন্তী তো তাকে ভালবাসত। অসতর্ক মুহূর্তে হৈমন্তীর সে ভালবাসা প্রকাশ পেয়েছে। পারু বুঝতেও পেরেছে, তাকে ছেড়ে যেতে হৈমন্তীরও কষ্ট হবে। অথচ মধ্যিখানে যেন বিশাল নদী ছিল।

পারুর মনে হত, ছুঁলেই হৈমন্তী বুঝি ভাববে ওর অসহায় নিরাশ্রয় অবস্থার সুযোগ নিচ্ছে। তাই সে মনে মনে তৈরি হয়েও শারীরিক ঘনিষ্ঠতার দিকে এগোতে পারেনি।

এদিকে পার্টির সঙ্গে সম্পর্ক শেষ হয়ে গেলেও অন্তত নিচুতলার নিরক্ষর মানুষগুলোর সঙ্গে পারুর সম্পর্ক নষ্ট হয়নি একটুও। এর পিছনে হরনাথ ডাক্তারেরই অবদান ছিল বেশি। তাঁর ছেলের যত বদনামই হোক, তাকে তারা সাধ্যমত সাহায্য করতে চাইত। শাকতোলানি মেয়েটিও এক কোঁচড় শাক না দিয়ে ছাড়বে না। জেলেপাড়া থেকে মাছ দিয়ে যাবে। চাষী হিন্দু মুসলমান বাড়ি থেকেও এটা-ওটা এসেছে। আপত্তি শুনবেনই না ওরা। ডাক্তারবাবুর আমল থেকে এটা চলে আসছে। গ্রামের মানুষ ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। পুরনো রীতিনীতি ও প্রথা তারা মেনে চলতে অভ্যস্ত। পারু তাদের এই সেন্টিমেন্টে আঘাত দিতে চাইত না।

হৈমন্তীর সঙ্গে পারুর সম্পর্ক নিয়েও ওরা তত বেশি মাথা ঘামাত না। ওরা ভাবত, মধুবাবুর মেয়ের সঙ্গে অনেক আগে মালাবদল গোছের কিছু হয়েই গেছে। এখন শুধু হইচই আনুষ্ঠানিক ব্যাপারটা যা বাকি। জেলেবউ নাপিতবউ কুনাই পাড়ার মাঠকুড়োনি মেয়েরা—সবাই হৈমন্তীর কাছে এসে আগের পার্টিজীবনের মতই গল্পগুজব করত। তারপর একফাঁকে নিঃসঙ্কোচে বলে উঠত, আমরা ভোজ খাচ্ছি কবে দিদি, তাই বলুন দিকিনি এবার?

হৈমন্তী একটু হেসে বলত, বেশ তো, খাবে!

হ্যাঁগা দিদি, পার্টি থেকে বে হলে বুঝি শাঁখাসিঁদুর পরতে নেই?

পারু আড়ালে বসে ঘামত। এই মেয়েরা পার্টির রীতিনীতি কিছু কিছু জানে। পুরুষদের কাছেও শুনেছে। পার্টিম্যারেজ কথাটা বেশ চালু ছিল তখন। ওরা ধরেই নিয়েছে, পার্টিম্যারেজ হয়েছে বলেই পারু ও হৈমন্তী এভাবে বাস করছে। খেটে খাওয়া মানুষ সব। কোন রকমে বেঁচে আছে। রাজনীতি নিয়ে তলিয়ে ভাবার মত বিদ্যাবুদ্ধিও নেই, আবার সময়ও নেই। মিছিলে সভায় যোগ দেয়। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে বক্তৃতা শোনে। বড়জোর টের পায়, তারা খেতে পরতে পাবে দু মুঠো। ব্যস, এটুকুই। একটা ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষের পর এর চেয়ে বেশি কিছু বুঝতে চাইত না ওরা। এবং এজন্যেই পারু ও হৈমন্তীকে জড়িয়ে পার্টির বদনাম ছড়ানটা অন্তত ওদের মধ্যে কোন প্রভাবই সৃষ্টি করতে পারেনি। হরনাথ ডাক্তারের ছেলে পার্টি ছাড়ার পরই ওদের উৎসাহ কমে গিয়েছিল। নবীন বাগদী বলেছিল, ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলুন তো দাদাবাবু?

কী বলব? বলার কিছু নেই।

তা বললে চলে দাদাবাবু! দল থেকে তাড়িয়ে দেবে আপনাকে, আর আমরাই সেই দলের ঝাণ্ডা বইব? আমরা আপনাকে চিনি। আপনি ডেকেছেন গেছি। আপনি নেই, আমরাও নেই।

পার্টির পলাশপুর সেল সত্যি ছত্রভঙ্গ হয়ে যাচ্ছিল। হরনাথ ডাক্তারের ছেলে কোন অন্যায় করতে পারে, নিচুতলার ওই লোকগুলো বিশ্বাস করত না। হৈমন্তীকে বাড়িতে যখন আশ্রয় দিল, তখন ওরা ধরে নিল, বিয়ে কবে গোপনে হয়েই গেছে। এখন পয়সাকড়ি জমলে একটু ধুমধাম হয়ত হবে। ...

পারু দু'বেলা যে দুটো টিউশনি পেয়েছিল, সে ওই মুসলমানপাড়ায়। নিজের পাড়ার ভদ্রলোকের ছেলেমেয়েরা তার কাছে পড়বে, ভাবাই যায় না। হিন্দু ও মুসলমানপাড়ার মধ্যে চিরাচরিত ব্যবধান একটা ছিল। পারুর চরিত্রহীনতার বদনাম নিয়ে মুসলমানপাড়াতেও কেউ মাথা ঘামায়নি। যেন দুটো গ্রাম একই গ্রামের মধ্যে। মুসলিম লিগের রাজনীতি হু-হু করে ছড়িয়ে পড়ছে তখন। ও পাড়ায় লিগের মস্ত ঘাঁটি গড়ে উঠেছে। কমিউনিস্টরা তো ওদের দাবির প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলই। তাই পারু ওদের চোখে দুশমন ছিল না। সে সহজেই টিউশনি পেয়েছিল। সকালে পড়াত কাজী সাহেবের ছেলেমেয়েদের, বিকেলে ইরফান মীর্জার নাতিদের। বুড়ো মীর্জার আভিজাত্যবোধ ছিল অসাধারণ। ভাঙাচোরা বিশাল দালানবাড়ির মধ্যে বাদশাহের মতই বাস করছিলেন। পাকা দেউড়িটা ভেঙে পড়েছিল। সেখানে মাটির দেউড়ি বসান হয়েছিল ফের। বিশাল লনের তিনদিকে ছিল সার-সার একতলা ঘর। সেরেস্তা, খাজাঞ্চিখানা, মেহমানখানা (অতিথিশালা), চাকরনোকরদের থাকার ঘর। সবগুলোই জীর্ণ ফাটল ধরা। একপাশে পুরনো ঘোড়াশালের ধ্বংসাবশেষ ছিল। দেউড়ি থেকে এগোলে সামনে যে ঘরটা পড়ত তার বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে গড়গড়া টানতেন মীর্জা ইরফান আলি। বুড়ো বয়সেও কণ্ঠস্বর জোরাল। চোখের দৃষ্টি এতটুকু ক্ষীণ হয়নি। দেউড়িতে ঢুকলেই পারুকে চিনতে পারতেন। চেঁচিয়ে বলতেন, ওরে, তোদের মাস্টারমশাই এসে গিয়েছেন।

মীর্জা ওঁর পাশের ঘরে লিগের অফিস বসিয়েছিলেন। পারুর সঙ্গে রাজনীতি নিয়ে কথাবার্তা বলতেন। বলতেন, আমার অ্যাঙ্গল এক ভিসন, বাবা অন্যরকম। আমি বুঝি, বড় বটের তলায় কোন গাছই বাঁচে না। তোমরা হিন্দুরা বটগাছ। মুসলমানকে মাথা তুলে বাঁচতে হলে তফাতে সরে যেতেই হবে। নয়ত মুসলমানত্ব থাকবে না।

পারু চুপ করে থাকত। মাঝে মাঝে বলত, হয়ত ঠিকই বলছেন।

আলবৎ ঠিক বলছি। হিন্দুধর্ম সর্বগ্রাসী। বাদশা আকবরের আমলে তো প্রায় গিলেই ফেলেছিল।

ঔরঙ্গজেব বাঁচালেন। তারপর ইংরেজ এল। ইংরেজ নিজের স্বার্থে মুসলমানকে আলাদা হয়ে বাঁচবার সুযোগ দিয়েছে। ভেদনীতি বলে যতই নিন্দে কর। এতে মুসলমানদের আলাদা প্ল্যাটফর্ম পাওয়া গেছে।

পারু বলত, এখন নাকি দেশ স্বাধীন হবে।

বেশ—হোক। হাতি ঘোড়া হবে, কী হবে তাই হোক। কিন্তু আলাদা আলাদা হয়ে বাস করা ভাল। এক জায়গায় থাকলেই ঝামেলা। কি বল?

মীর্জাসাহেবের রাজনৈতিক তত্ত্ব বোধগম্য হওয়া কঠিন। পারু চুপচাপ শুধু শুনত। তারপর ওঁর নাতিরা এসে দাঁড়ালেই উঠে পড়ত।

সেদিন বিকেলে পারুর মন চঞ্চল। হৈমন্তী একদিন সময় নিয়েছে, বিয়ে করবে কিনা সে সিদ্ধান্ত নেবে। কখনও সে অসহায় রাগে হৈমন্তীর ওপর ফুঁসছে। কখনও ভাবছে, যদি পুরুষ হয়েও ওর সামনে নতজানু হয়ে করজোড়ে বলে, দয়া কর হৈমন্তী! হৈমন্তী কি বলবে, না?

পার্টি যখন বিয়ের কথা তুলেছিল, তখন পারুর প্রস্তুতি ছিল না মনে, তার চেয়ে বড় কথা, ব্যাপারটা তার কাছে অপমানজনক মনে হয়েছিল। বিয়ের ব্যাপারে তার ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তটাই কি বড় নয়? পার্টি হুকুম দেবার কে?

আর হৈমন্তীও নিশ্চয় একই কারণে কথাটা নাকচ করে দিয়েছিল। পারু জানে, ওর আত্মসম্মানবোধে আঘাত লেগেছিল। তখনই চলে যেতে চেয়েছিল পলাশপুর থেকে। কিন্তু যেন পারুর মুখের দিকে তাকিয়েই সঙ্কল্পটা ছেড়ে দিয়েছিল। পারুর পরামর্শ মেনে নিয়েছিল। এমন কি একদিন পারুর বাড়িতে চলে আসতেও তার বাধেনি।

অথচ যখন বোঝাপড়ার চরম মুহূর্ত এসে গেল, তখন সে কেন ভাববার সময় নিচ্ছে, পারু বুঝতে পারছিল না।

বিকেলের টিউশনিতে সেদিন মীর্জাবাড়ি গেল না পারু। অন্যমনস্কভাবে ঘুরতে ঘুরতে স্টেশনে গেল। প্ল্যাটফর্মের ওভারব্রিজে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল সে। তখন একটা আপ ট্রেন আসত বিকেলের দিকে। ট্রেনটা চলে যেতে দেখল সে। প্ল্যাটফর্ম প্রায় ফাঁকা হয়ে এসেছে, এত বেশি ভিড় তখন ছিল না—হঠাৎ পারু দেখল, খাকি প্যান্ট-শার্ট আর মাথায় মিলিটারি ক্যাপ পরা কে একজন চারদিকে ঘুরে ঘুরে দেখছে। তার পায়ের কাছে কালো মস্ত একটা স্টিলের ট্রাঙ্ক, তার ওপর একটা খাকি হ্যাভারস্যাক, আরও কী সব টুকিটাকি মালপত্র।

সে ঘুরে ওভারব্রিজের দিকে তাকাতেই পারুর বুক কেমন করে উঠল। মুখটা তার চেনা মনে হচ্ছে যেন! ফর্সা, সুন্দর চেহারার এক যুবক—সূচাল মিলিটারি গোঁফ, পাতলা ঠোঁট, কপালের ভাঁজগুলোও বিকেলের রোদে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। সে ক্যাপটা ঝট করে মাথা থেকে খুলে নাড়তে নাড়তে চেঁচিয়ে উঠল, হ্যালো পারু!

আট-দশটা বছর খুব সামান্য নয়। অথচ একটা চিৎকারেই বছরগুলো কোথায় উড়ে গিয়েছিল। পারু দৌড়ে নেমেছিল।—তুমি ডালিম না?

শাট আপ! তুমি ডালিম না! ... ডালিম দু হাতে জড়িয়ে ধরে চেঁচামেচি শুরু করেছিল। —ওরে আমার বাঞ্চোৎরে! কতকাল তোকে দেখিনি রে! ওরে শালা! তুই এমন যোয়ান মদ্দ হয়ে গেছিস্ রে! তুই যে জিরাফের মত লম্বা হয়েছিস রে! বলতে বলতে ওর গালে একটা চুমুও খেয়ে বসল। তারপর কানফাটান হা-হা-হা হাসি।

পারু অবাক হয়ে দেখছিল ওকে। সেই ডালিম। বিশ্বাস হয় না। সে এত স্মার্ট, এমন সুন্দর আর স্বাস্থ্যবান হয়েছে, সে কল্পনাও করেনি। মাঝে মাঝে তার কথা যখন মনে হয়েছে, তাকে দেখেছে সেই শক্তসমর্থ বলিষ্ঠ গড়নের ছেলেটি—ষোল-সতের বছর বয়স। দুষ্টুমিতে তার জোড়া ছিল না পলাশপুরে। মারামারি করে নিজের মাথাও ফাটিয়ে আসত। হরনাথ ব্যান্ডেজ বেঁধে দিতেন।

রিকশায় যেতে যেতে ডালিম বলেছিল, পুনা থেকে আসছি। বাড়তি বলে বাতিল করে দিলে। ওয়ার থেমে গেছে। আবার কি! তবে ভাই, এক্সপিরিয়েন্স হল। ও একটা লাইফের মত লাইফ! সব শুনবি। শুনে বলবি, তোরা কোথায় আছিস, শালা এঁদো গাঁয়ের মধ্যে! দূর দূর!

পারু হাসতে হাসতে বলেছিল, তবে চলে এলি যে?

এলুম। আফটার অল জন্মভূমি! তারপর একটু থেমে বলেছিল, বাবার জন্য জানিস, মাঝে মাঝে ভীষণ মন খারাপ করত। ভাবতুম একটা চিঠি দিই—কিন্তু লিখতে গিয়ে মনে হত, কিছু না বলে চলে এসেছি। থাক গে, কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিয়ে কি হবে? বাবা কেমন আছেন রে? আমার কথা নিশ্চয় বলেন!

পারু ঘাড় নেড়েছিল।

বলেন না, তাই না? ওঁর মনে আঘাত দিয়েছি। দ্যাখ পারু, হঠাৎ অমন করে চলে গেলুম, তোর কি মনে হয়েছিল বল তো?

অতদিন আগের কথা আমার কিচ্ছু মনে নেই।

বাবা কিচ্ছু বলেননি? নিশ্চয় বলেছেন। জানিস, আমি কলকাতায় থেকে যেতুম। কিন্তু হঠাৎ মনে হল, বাবাকে একটা প্রণাম করে আসি। বলেই সে অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে হেসে ফেলেছিল।—এই দ্যাখ, মায়ের কথাটা বলছি নে। মা ভাল আছেন তো? রিয়েল মাদার মাইরি! দুজনকেই প্রণাম করে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে কলকাতা যাব। আমাদের মেজর সাহেব বলেছেন, দেখা করলেই কাজটা হয়ে যাবে। ফার্স্ট প্রেফারেন্স। পারু, তুই—তোকে এমন দেখাচ্ছে কেন রে?

পারু ম্লান হেসে বলেছিল, ও কিছু না। কিন্তু বাড়ি গিয়ে তুই আর বাবা কিংবা মা কাকেও দেখতে পাবি নে ডালিম।

কেন, কেন বল তো। ওঁরা বাইরে গেছেন?

হ্যাঁ।

কোথায় গেলেন হঠাৎ?

ওই যে কী বলা হয়, স্বগ্‌গো-টগ্‌গো কী সব!

ডালিম অস্ফুট চেঁচিয়ে উঠেছিল, পারু! বাঞ্চোৎ তুই ঠাট্টা করছিস!

না, তুই যাবার কিছুদিন পরে বাবা গেলেন। তার এক বছর পরে মা মারা যান। বাবা মৃত্যুর সময় তোকে দেখতে চেয়েছিলেন।

তাহলে—তাহলে আমি কেন এলুম পারু? আমি কার কাছে এলুম? কোথায় এলুম আমি? ... দু হাতে মুখ ঢেকেছিল ডালিম।

পারু ওর কাঁধে হাত রেখে বলেছিল, তুই বড্ড অকৃতজ্ঞ ডালিম। আমাকে তুই অস্বীকার করছিস! বাঃ, চমৎকার! আমিও কি তোর কথা ভাবিনি? তোর পথ তাকাইনি কোনদিনও? জানিস ডালিম, আজ কেন মন টেনেছিল স্টেশনের দিকে? ইনটুইশন! যেন টের পাচ্ছিলুম, তুই আসছিস। তোকে আমার দরকার মনে হচ্ছিল। আর তুই বলছিস ...

কথায় বাধা পড়ল। রাস্তা থেকে কে ডেকে বলেছিল, পারুবাবু! পারুবাবু! শুনুন, শুনুন! আপনার সঙ্গে কে? ও পারুবাবু!

রিকশ দাঁড়াল। মনোরঞ্জন স্যাকরা এসে ডালিমকে দেখে বলেছিল, সেই মহারাজা না? দেখেই চিনেছি। কেমন আছ মহারাজা? ওরে বাবা কতকাল পরে ফিরলে গো!

তারপর রীতিমত ভিড় জমে গিয়েছিল। সেই ভিড় থেকে বেরিয়ে বাড়ি পৌঁছতে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল। ডালিম পলাশপুরের একটা সেনসেশন ছিল বরাবর। পারু টের পাচ্ছিল, দলে দলে লোকেরা ওকে দেখতে আসবে। খুবই হইচই চলবে কয়েকটা দিন।

আগে যে ঘরে ডিসপেন্সারি ছিল, সে ঘরে পারু শোয়। পাশের ঘরে হৈমন্তী। উঠোনের অন্যদিকের ঘর দুটো ছিল মাটির। ধ্বসে গিয়েছিল ঝড়-বৃষ্টিতে। বাইরে গেটের এদিকে ফুলবাগানটা নষ্ট হয়ে আগাছার জঙ্গল হয়ে উঠেছিল। রিকশ থেকে জিনিসপত্র নামিয়ে দুজনে ভেতরে ঢুকল। রিকশওয়ালার মাথায় বড় ট্রাঙ্ক।

বারান্দায় হৈমন্তী দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে দেখছিল ওদের। ডালিম দূর থেকে ওকে দেখেই পারুর

পিঠে চিমটে কেটে বলেছিল, ওরে খচ্চর, নিজের আখের গুছিয়ে বসে আছে, এখনও বলছ না? উরেব্বাস! বৌঠান বলব, না বৌদি বলব রে?

অমনি চাপা গলায় পারু বলেছিল, ওর ব্যাপার পরে বলব। ভদ্রমহিলা আমার স্ত্রী নন। প্লিজ, তুই বেফাঁস কিছু বলবি নে!

ডালিম ওর মুখের দিকে তাকিয়েই আবার হৈমন্তীকে দেখতে দেখতে এগোল। রিকশওয়ালা চলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল পারু। তারপর একটু হেসে বল, হৈমন্তী, তোমাকে মহারাজা, মানে ডালিমের কথা বলেছিলুম! ...

হৈমন্তী নমস্কার করেছিল সঙ্গে সঙ্গে। মুখে স্মিত হাসি। —দেখেই বুঝতে পেরেছি।

ডলিম হো হো করে হেসে উঠল। তুই ওঁকে মহারাজার কথাও বলেছিস, আবার ডালিমের কথাও বলেছিস!

ডালিম, ওর নাম হৈমন্তী। আশা করি তুই চিনবি। আমাদের শ্রদ্ধেয় মাস্টারমশাই মধুবাবুর মেয়ে।

ডালিম অমনি দু'হাত জোড় করে কপালে ঠেকাল।—মাস্টারমশায়ের কাছে কত যে পাপ করেছি, তার সংখ্যা নেই। কিন্তু ভাবা যায় না, আপনি তাঁর মেয়ে। হ্যাঁ রে পারু, তাহলে ওঁকে আমি নিশ্চয় দেখে থাকব!

হৈমন্তী বলল, হয়ত দেখেছেন। আমার কিন্তু আপনাকে মনে আছে। দেখেই চিনেছি। মানে, মহারাজা নামটাও মনে আছে তো! তাই ...

ডালিম পারুকে ঠেলে দিয়ে বলল, শোন্, শোন্! আমাকে দেখামাত্র চিনেছেন। আর তুই ওভারব্রিজ থেকে হাঁ করে তাকিয়ে ছিলি!

পারু খুশিতে অস্থির হয়ে উঠেছে ততক্ষণে। ব্যস্তভাবে বলল, প্লিজ হৈমন্তী, ওর জন্যে তাড়াতাড়ি কিছু রান্নাটান্না করে দাও!

ডালিম ভেতরের দরজা দিয়ে সটান চলে গিয়েছিল উঠোনে। ছেলেমানুষের মত দাপাদাপি করছিল। মাটির ঘরটার অবস্থা দেখে সে থমকে দাঁড়াল কিছুক্ষণ। পেয়ারাতলায় গিয়ে তাকিয়ে রইল গাছটার দিকে। কুয়োতে উঁকি মেরে কু-উ দিল। তারপর উঠোনের মধ্যিখানে দু'হাত কোমরে রেখে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ।

সন্ধ্যার আবছায়া নেমেছে তখন। পারু কিছু কিনতে বেরিয়েছে। ভেতরের বারান্দায় হৈমন্তী স্টোভ জ্বেলেছে। হ্যারিকেনটা জ্বেলে সে বারান্দার ধার ঘেঁষে রাখল। এই সময় ডালিমের পায়ের কাছে ...

ডালিম আস্তে বলে, সেই সন্ধ্যাটা স্পষ্ট মনে আছে আমার। এতটুকু ভুলিনি। তুই ডিম-টিম আনতে গেলি যেন, আমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছি।

পারু বলে, ডিম না, মুসলমানপাড়া গেলুম মুর্গি আনতে।

তাই হবে। তো আমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছি। হৈমন্তী হ্যারিকেনটা এমনভাবে রাখল, যেন উঠোন অবধি আলো পড়ে।

আলো না থাকলে সাপটাপ ...

ওয়েট, ওয়েট। আমায় বলতে দে। বলে ডালিম একটা বালিশে কনুই রেখে একটু কাত হল খাটের বিছানায়। —হ্যাঁ, আলোটা ছিল বলেই সাপটা দেখতে পেয়েছিল হিমি। সে চেঁচিয়ে উঠল, সরে আসুন! সাপ যাচ্ছে!

হৈমন্তী টেবিলের কাছে চেয়ারে বসেছে। সে বলে ওঠে, প্রায়ই সাপটা দেখতে পেতুম। পারু বলত, বাস্তু সাপ। কামড়ায় না নাকি।

সাপের কথা আমায় শিখিও না, শোন। আমার পায়ে মিলিটারি বুট। মাথায় বুট চাপিয়ে লেজ ধরে ফেললুম। তারপর বুট তুলে নিয়েই ঝাঁকুনি দিলুম। সাপটা সোজা হয়ে গেল। হিমিকে বললুম, শিগগির একটা হাঁড়ি বা পাতিল যা হয় কিছু দিন। ও তো একেবারে বোবা! প্রায় ফিট হয়ে গেছে।

হৈমন্তী হাসে। —বা রে! আমি তো কখনও দেখিনি ও সব।

তুই বিশ্বাস কর্, প্রায় পাঁচ মিনিট ওভাবে সাপটা রাখলুম। তারপর আমার নার্ভ গেল। ও তো পাথরের প্রতিমূর্তি হয়ে গেছে। তখন কী আর করব? ফের বুটের তলায় মাথাটা চেপে দিতে হল। তোদের উঠোনে লাইম-কংক্রিট ছিল না? ছিল। পিষে থেঁৎলে মেরে দিলুম। প্রকাণ্ড সাপ!

পারু বলে, ইস, পরে যা ভয় পেয়েছিলুম! রাত্রে বেরুতে পারতুম না।

বাস্তু সাপ মাড়ালে নাকি অভিশাপ লাগে। তোর বাড়িটা চলে গেল। তুই আপরুটেড হয়ে গেলি। ...ডালিম প্রায় এক নিশ্বাসে বলতে থাকে।

পারু বলে, ও সব কুসংস্কার। বাড়ি তো রোড্স ডিপার্ট নিলে। সাপ থাকলেও নিত। হাইওয়ে হচ্ছিল তো। আরও অনেকের নিয়েছিল।

ডালিম মাথা নেড়ে বলে, না রে, এখন আমি সব কিছুতে বিশ্বাস করি। আমিই তোকে আপরুটেড করেছিলুম। এখন সেই সব ভাবি আর বড্ড কষ্ট হয়। জানিস পারু, সেই সন্ধ্যাটা—দ্যাট ব্লাডি বাঞ্চোৎ ইভনিংয়ে কিছু একটা ঘটে গিয়েছিল—সেটা হৈমন্তী বলতে পারে। তুই যে হৈমন্তীকে দেখে গিয়েছিলি, ডিম কিংবা মুর্গি কিনে ফিরে কি সেই হৈমন্তীকে আর দেখতে পেয়েছিলি? কী মনে হয় তোর?

হৈমন্তী একবার তাকিয়ে মুখ নামায়। পারু অস্ফুট স্বরে বলে, জানি না। অত কিছু লক্ষ্য করিনি।

ডালিম বলে, সে হৈমন্তীকে আর তুই দেখতে পাসনি। হৈমন্তী, তুমি বল!

হৈমন্তী মুখ তোলে। —আমিও জানি না।

জান তুমি। ডালিম সোজা হয়ে বসে। তার মুখে হাসি, কিন্তু চোখ দুটো উজ্জ্বল আর তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। —নিজেকে প্রবঞ্চনা করছ কেন হিমি? আমাদের চুল পেকে গেল। তুমিও কি ভাবছ কালো চুল নিয়েই শ্মশানে কিংবা কবরে যাবে? সে হো হো করে আগের মত হেসে ওঠে হঠাৎ। কথাটায় হৈমন্তী আঘাত পাবে ভেবেই হাসি দিয়ে যেন হালকা করতে চায়। কিন্তু তারপর ফের গম্ভীর হয়ে যায়। ফের বলে যে, তুমি আমার মধ্যে কিছু একটা দেখেছিলে। খুব শক্ত কিছু। ভীষণ কিছু। তাই না? এ বয়সে আর লজ্জা-সঙ্কোচের কোন মানে হয় না হিমি। আমরা এখন কী? গোরস্তানের তিনটে গাছ মাত্র। দূরে দাঁড়িয়ে আছি। তিনটে-পাতা-ঝরা রুক্ষ গাছ। তিনটে ব্লাডি হেল!

এক পায়ে নড়বড় করে খাট থেকে নামে সে। তারপর এক পায়ে লাফাতে লাফাতে টেবিলের কাছে যায়। তলা থেকে হুইস্কির বোতলটা বের করে। অমনি হৈমন্তী বোতলটা কেড়ে নেয়। বলে, না, আর তুমি খাবে না।

পারু ব্যস্ত হয়ে বলে, প্লীজ ডালিম! আর না। এখন না, পরে।

ডালিম বোতলটা কাড়তে হাত বাড়ায়। হৈমন্তী দ্রুত সরে দরজার কাছে যায়। তার নাসারন্ধ্র স্ফীত। চুল খুলে গেছে। সে বলে, বাড়াবাড়ি করলে ভেঙে ফেলব বলে দিচ্ছি। চুপ করে বস।

ডালিম ওর দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে থাকার পর ক্লান্তভাবে বলে, পারু এনেছে আমার জন্যে। জাস্ট একটা দিন তো। দুজনে একটু খেতুম।

না। বলে হৈমন্তী বারান্দায় চলে যায়।

ডালিম হাসবার চেষ্টা করে বলে, তাই বলে সত্যি ভেঙে ফেল না। দামি জিনিস। এই হিমি, সত্যি ভাঙছ নাকি?

আগে তুমি বস চুপ করে।

বেশ, বসলুম। বলে সে আবার খাটে চলে আসে। বালিশে কপাল রেখে চুপচাপ কিছুক্ষণ একটা পা নাচায়। তারপর মুখ তুলে বলে, সেদিন হৈমন্তী আমার মধ্যে কিছু একটা দেখেছিল, তা সত্যি। কী বলিস, পারু?

পারু বলে, ও কথা থাক। বরং তুই বেহালা বাজা, শুনি।

ড্যাট্! মাল-ফাল না খেলে হাত খোলে না। —হিমি!

বারান্দার অন্ধকার থেকে সাড়া আসে, বল!

লক্ষ্মীটি! এই একটা রাতের জন্যে দয়া কর।

হৈমন্তী হনহন করে ঘরে ঢোকে। তারপর টেবিলের কাছে গিয়ে দুটো গ্লাসে ঢালে। পারু অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। তারপর হৈমন্তী বোতলটা রেখে বলে, জল মেশাতে হবে?

ডালিম খুশি হয়ে বলে, এই না হলে বউ? পারু, এবারে টের পাচ্ছিস হিমি কে? তুই চুপ কেন রে? একটা কিছু বল্। এই বুড়ো ভাম! বয়সের তো গাছপালা নেই।

সে তার অক্ষত পা দিয়ে পারুর একটা পা নেড়ে দেয়। পারু সরলভাবে হাসে।

হৈমন্তী জল মিশিয়ে একটা গ্লাস পারুর কাছে নিয়ে আসতে আসতে বলে, মাতলামি করলে তুলে নিচে ফেলে দেব কিন্তু!

আমি মাতলামি করছি কোথায়?

ওকে তুমি লাথি মারছ।

বেশ করছি। ও আমার ফ্রেন্ড। আমার প্রাণের ইয়ার। ও আমার—ওই দেখতে পাচ্ছ? আমার গ্রেট ফাদারের রিয়েল পুত্র! ও আমার বউয়ের চেয়েও আপন। আজ ওকে নিয়ে শোব। বেশি বকো না। গ্লাসটা দাও।

হৈমন্তী গ্লাসটা দিয়ে বেরিয়ে যায়। পারু অনুমান করে, বারান্দায় অন্ধকারে হৈমন্তী চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে হয়ত। এই নির্জন ভাঙা ভুতুড়ে বাড়িতে হৈমন্তী কি ভাবে কাটাচ্ছে? সে অন্যমনস্কভাবে গ্লাসে চুমুক দিতে গিয়ে অস্ফুট বলে, চিয়ার্স।

ডালিম বলে, হ্যাঁ। তারপর শোন্। হৈমন্তী কী ভাবে তোকে ঠকাল।

না। শুনব না।

তুই শুনবি। তোকে শোনাবার জন্যে আসতে বলেছিলুম। ...

হৈমন্তী তাকে ঠকিয়েছিল, নাকি সে নিজেই হৈমন্তীকে ঠকিয়েছিল? এতদিনে সেটা জেনেও তো কোন লাভ নেই। অথচ সেই সন্ধ্যায় একটা কিছু ঘটেছিল, তাতে কোন ভুল নেই। স্বাস্থ্যবান সুন্দর এক যুবক, পরনে মিলিটারি পোশাক, তার পা ফেলার ভঙ্গিতে সাহস আর বেপরোয়া ধরনের ঔদ্ধত্য—যেন ভালমন্দ সবকিছু মাড়িয়ে যাবে, এতটুকু ভাববে না, সিদ্ধান্ত নিতে এক মুহূর্তও দেরি করবে না, তাকে ভাল না লেগে পারে না। ভাল লাগা অবশ্য অনেক সময় ভালবাসা না হতেও পারে। কিন্তু হৈমন্তীর বেলায় ভাললাগা ভালবাসার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল যেন।

প্রায় সারারাত তিনজন জেগে কাটিয়েছিল সেদিন। ডালিম তার মিলিটারি জীবনের কথা বলছিল। চমৎকার ওর বলার ভঙ্গি। মাঝে মাঝে পাগলাটে হাসি আর লাফিয়ে ওঠা, গল্পে মরা-বাঁচার সঙ্কট-মুহূর্তেও হাস্যকর কিছু দেখিয়ে দেওয়া, এক কথায় ডালিম হৈমন্তীকে গ্রাস করতে শুরু করেছিল সে রাত থেকেই।

ঘুম থেকে উঠতে ডালিম ও পারুর স্বভাবত দেরি হয়েছিল। অনেক বেলায় উঠে পারু একটু অবাক হল। অনেক আগেই হৈমন্তী উঠেছে। স্নান করেছে। এবং একটু সেজেছেও। পারুর চোখের ভুল নয়, তা সে হলফ করে বলতে পারত। অবশ্য সাজাটা খুব সামান্যই। একটা হালকা নীল শাড়ি ওর বাক্স থেকে বের করে পরেছে। শাড়ির ওপর টুকরো মিহি কিছু নকশা ছিল। এ শাড়ি হৈমন্তীকে কখনও পরতে দেখেনি পারু। আর কী? তেমন কিছু নয় নিশ্চয়। কিন্তু ওই শাড়ি পরা আর সকালের স্নানে পরিচ্ছন্ন হয়ে ওঠা চেহারায় নতুন একটা সৌন্দর্য হৈমন্তীকে তীব্র করে তুলেছিল। উজ্জ্বল করেছিল। আশ্চর্য সুন্দর দেখাচ্ছিল ওকে। ওর মুখে যেন একটা তৃপ্তির ভাব খেলা করছিল। দৃষ্টিটাও ছিল চঞ্চল।

আর পারু খুব লোভের চোখে দেখল ওকে। তার ভাল লাগল এই ভেবে যে হৈমন্তী তাহলে বিয়েতে রাজি। হৈমন্তী তাকে ছেড়ে যেতে চায় না। যাচ্ছে না।

চা খেয়েই ডালিম হইচই করে বেরুল গ্রাম ঘুরতে। ওর সবার সঙ্গেই ভাব ছিল। পলাশপুরের ছোট-বড় সবাই ওকে পথে দেখলে চেঁচিয়ে উঠত, মহারাজা! মহারাজা! বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে ওর সম্পর্ক ছিল চমৎকার। কেউ ওর কাকিমা, জেঠিমা, দিদি, বউদি। বয়স্করা ওর দাদা, কাকা, খুড়ো, মামা

... কত সব সম্পর্ক। ওর দুষ্টুমিতে লোকে রাগ করত। কিন্তু ওকে দেখলেই ভুলে যেত। মানুষকে বশ করার যাদুমন্ত্র জানত ডালিম।

কিন্তু শুধু মুসলমান পাড়ায় কেউ যেন ওকে পছন্দ করত না। হিন্দুর বাড়িতে মানুষ হয়েছে, পুজোপার্বণে মাতামাতি করেছে, কথাবার্তা চালচলনে এতটুকু মুসলমানি ব্যাপার নেই। তাই ডালিমকে ওদের পছন্দ না হওয়াই ছিল স্বাভাবিক। তাছাড়া অমন বাচ্চা বয়েসে সে হরনাথের বাড়ি আশ্রয় পেয়েছে, ইসলাম ধর্মের কোন কিছু শেখার সুযোগই পায়নি। কেবল একটা ব্যাপারে তার যেটুকু মুসলমানত্ব ছিল সেটা সারকামসিশন। মুসলিমরা যাকে বলে 'খৎনা'। আড়াই বছর বয়সেই ওটা তার হয়ে গিয়েছিল। অথচ পলাশপুরের মুসলমানরা তা নিয়েও সন্দেহ প্রকাশ করত। পারু কিন্তু জানত ব্যাপারটা সত্য! রেলের নির্জন বাংলোর বারান্দায় বসে ডালিম পেন্টুল খুলে হি হি করে হাসত।

এই পারু! ভগবানের জিভ দেখবি? ...

ডালিম বেরিয়ে যাবার সময় পারুকে ডেকেছিল। পারু যায়নি। সত্যি বলতে কি হৈমন্তীর জন্যেই পারুর মনে একটা অস্বস্তি আর সংকোচ ছিল। সে মেলামেশা ছেড়েই দিয়েছিল একরকম। ডালিম যাবার সময় বলে গিয়েছিল সব ঠিক হয়ে যাবে, কিচ্ছু ভাবিস নে। কত দেখলুম!

সে চলে যাবার পর কতক্ষণ অস্থির থেকে এক সময় হৈমন্তীর মুখোমুখি হল পারু। বুকে দুরুদুরু কাঁপন, দু'চোখে নিশ্চয় হ্যাংলামি ছিল, সে অনেক ইতস্তত করার পর মরিয়া হয়ে বলেছিল, কী ভাবলে হৈমন্তী?

অমনি হৈমন্তীর চোখ জ্বলে উঠল। —আপদ বিদায় করতে তর সইছে না। এই তো?

পারু মিইয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। —আঃ! কী বলছ তুমি? আমি তা বলিনি।

ঠিক তাই বলছ।

না। তুমি একটু ভেবে দেখ, হৈমন্তী। ডালিম এসে গেছে। ও না এলে প্রব্লেমটা এতখানি সিরিয়াস হত না। আর যার কাছেই হোক, ওর কাছে ছোট হয়ে যাওয়া আমার বড্ড খারাপ লাগছে। পারু শান্তভাবে বলেছিল এসব কথা। তাছাড়া ভেবে দেখ, ডালিমও তো তোমার সম্পর্কে কী ভাববে! মুখে যা-ই বলুক না কেন?

হৈমন্তী ঝাঁঝাল করে বলেছিল, কী ভাববেন তোমার বন্ধু? আমি তোমার রক্ষিতা?

পারু হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। —ছিঃ! তুমি কি বলছ, হৈমন্তী!

নয় তো কী? রক্ষিতার মতই আছি। লোকে আর কী-ই বা ভাববে? কিন্তু কে কী ভাবল না ভাবল, তাতে আমার কিছু যায় আসে না।

এবার পারুর রাগ হয়েছিল। —আমার যে যায় আসে! সে ক্ষুব্ধ মুখে বলেছিল। এতদিন হয়ত গ্রাহ্য করিনি কিছু কিন্তু এর একটা তো সীমা থাকা দরকার। তাছাড়া ডালিমের চোখে ...

কথা কেড়ে হৈমন্তী বলেছিল, তোমার বন্ধুর চোখে তোমায় আর ছোট হতে হবে না। আমি চলে যাচ্ছি।

পারুর মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, বেশ। তাই যাও। ...

হৈমন্তী ঠোঁট কামড়ে ধরেছিল। উঠোনের দিকে তাকিয়ে একটা চাপা নিঃশ্বাস ফেলেছিল। তারপর ঘরে ঢুকেছিল। বাইরে দাঁড়িয়ে পারু শুনতে পাচ্ছিল, জিনিসপত্র গোছাচ্ছে হৈমন্তী। তার প্রতিটি শব্দ প্রচণ্ড জোরে এসে ধাক্কা মারছিল পারুর বুকে। তার চারপাশে এগিয়ে আসছিল কুয়াশা—সব কিছু ঢেকে ফেলছিল সেই ঘন ধূসর কুয়াশার ঝাঁক।

তারপর হৈমন্তীর কণ্ঠস্বর ভেসে এল, একটা রিকশ ডেকে দেবে দয়া করে? ...

পরে ডালিম বলেছিল, তুই বাঞ্চোৎ হাবা গাধা গাড়ল হাতি ভেড়া উল্লুক! কী নোস তুই? ও তোকে রিকশ ডেকে দিতে বলল, তবু তুই উজবুকের মত কিছু টের পেলি নে? সুড়সুড় করে শালা চাকর রিকশ ডাকতে চলে গেলি? যে যাবার, সে কি তোকেই রিকশ ডাকতে বলবে, নাকি নিজেই ডেকে আনবে! তোর বাড়ির দরজার বাইরে সব সময় রিকশ যাচ্ছে। বাসও যাচ্ছে ঘণ্টায়-ঘণ্টায়। জানলা থেকে ডাকলেই শুনতে পাবে কেউ না কেউ। তোর মত আহাম্মক আমি দেখিনি পারু!

পারু রিকশ ডাকতে বেরুচ্ছে। যন্ত্রের মানুষের মতই তার আচরণ, তার চাউনি, তার পা ফেলার ভঙ্গি। হৈমন্তী বারান্দার কোনায় স্টোভের দিকে হঠাৎ ব্যস্তভাবে যেতে যেতে বলেছিল, ভাতটা ঠিক সময়ে ফ্যান গেলে নিও। রাতের মাংসটাও জ্বাল দিতে হবে।

স্টোভে ভাত চাপান ছিল। স্টোভের চারপাশে অগোছাল জিনিসপত্র।

পারু বলল, আচ্ছা।

গেটে ডালিমের মুখোমুখি হয়েছিল সে। ডালিম চাবির রিঙ আঙুলে জড়িয়ে শিস দিতে দিতে ঢুকছে। ঢোকার সময় পুরনো ল্যাভেন্ডারের এলোমেলো হয়ে যাওয়া লতাপাতা তার মাথায় লাগলে শিস দিতে দিতে সেগুলো সযত্নে সরিয়ে দিচ্ছে। পারুকে দেখে বলল, তুই কুঁড়ের রাজা পারু। ইস! এমন সুন্দর গাছটা কী হয়ে গেছে দেখছিস? বাপের কুপুত্র আর কাকে বলে?

পারুর মুখটা গম্ভীর। চোখ দুটো নিশ্চয় লাল দেখাচ্ছিল। সে ছোট্ট একটু 'হুঁ' বলে পা বাড়াচ্ছিল।

ডালিম বলল, কোথায় যাচ্ছিস রে? আয়, তোকে একটা দারুণ জিনিস দেখাব।

আসছি। রিকশ ডেকে আনি।

রিকশ? রিকশ কেন?

হৈমন্তী চলে যাচ্ছে।

চলে যাচ্ছে মানে? কোথায় যাচ্ছে?

সে জেনে তোর লাভ নেই। তুই গিয়ে বোস, আসছি।

ডালিম ওর একটা হাত শক্ত করে ধরে ফেলেছিল। ওর মুখের দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলেছিল, ঝগড়া করেছিস? তারপর সে সামনের বাড়িটার দিকে একই দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল। তখন হৈমন্তী জানলায়। জানলায় কোন পর্দা ছিল না।

পারু ব্যথা পাচ্ছিল। বলেছিল, আঃ, ছাড় ডালিম!

ডালিম ওকে হিড়হিড় করে টানতে টানতে বাড়ি ঢোকাল। তারপর চেঁচিয়ে উঠল, কই? শুনুন তো এদিকে! গেস্টকে না খাইয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার মানেটা কি? আমি কি আনডিজায়ারেবল গেস্ট? অ্যাঁ? শ্রদ্ধেয় মাস্টারমশাই না হয় আমাকে কিংবা পারুর মত একটা স্কাউন্ড্রেলকে মানুষ করতে পারেননি, নিজের মেয়েকেও কি পারেননি?

হৈমন্তী বেরিয়ে শান্তভাবে বলেছিল, ওই তো রান্না হচ্ছে।

রান্না হচ্ছে আর আপনি ওকে রিকশ ডাকতে পাঠিয়েছেন? আমার ভীষণ ক্ষিদে পেয়েছে। আমাকে খেতে দেবে কে? হাত ধুতে জল ঢেলে দেবে কে?

ডালিম রীতিমত গম্ভীর মুখে বলে যাচ্ছিল। অদ্ভুত ওর বলার ভঙ্গি। ... জানেন? এ বাড়িতে আমি খাওয়ার পর পারুর মা ওইখানে আমাদের দুজনের হাতেই জল ঢেলে দিতেন? কেন দিতেন জানেন? আমরা দুজনেই ভাল করে হাত ধুতে পারতুম না। নোংরা ছড়াতুম। মা পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে ভীষণ কড়া ছিলেন, জানেন? উঠোন হাতের তালুর চেয়ে চকচকে হয়ে থাকত। ওই যে দেখছেন মস্ত জবা গাছটা মাটি ধসে গিয়ে অর্ধেক চাপা পড়ে গেছে, ওই গাছের তলায় মাদুর বিছিয়ে আশ্বিন মাসের দুপুরবেলা আমরা ছুটির পড়া করতুম। এখন তার তলায় ঘাস গজিয়েছে। আরে বাবা, এ সব তো মেয়েদেরই কাজ! আর ... জানেন? কত কাল আমি মেয়েদের হাতে খাইনি?

হৈমন্তী পারুকে অবাক করে হেসে ফেলেছিল। হৈমন্তীকে বোঝা যায় না। আজও বুঝতে পারেনি পারু। কোনটা ওর সত্যি, কোনটা মিথ্যে পারু বোঝে না। হৈমন্তী তারপরই অবশ্য দ্রুত হাসি চেপে বলেছিল, আঃ, থামুন তো এবার! লোকে ভাববে কী হচ্ছে!

থামব! আপনি কুয়ো থেকে জল তুলে দেবেন, আমি চান করব, তারপর খেতে পাব, তখন থামব। আমার পেটে আগুন জ্বলছে।

ডালিম ছাড়া এটা কেউ পারত না। এমন নিঃসঙ্কোচ আবদার কিংবা আদেশ তার পক্ষেই সম্ভব ছিল। হৈমন্তী সত্যি কুয়ো থেকে জল তুলে দিয়েছিল ওকে। ও এতটুকু বাধা দেয়নি। দিব্যি পা ছড়িয়ে খালি গায়ে বসে গেল কুয়োতলায়। অসম্ভব উজ্জ্বল আর বলিষ্ঠ বুক, চওড়া ছাতি, বুকে সামান্য একটু লোম ছিল, দুটো পেশীবহুল বাহু বাড়িয়ে হৈমন্তীর বালতি থেকে বড় বালতিতে জল ঢেলে নিচ্ছিল। কী যেন রসিকতা করছিল। আর তাই শুনে হৈমন্তী চাপা হাসছিল। কিন্তু পারুর চোখে ব্যাপারটা একটুও ভাল ঠেকেনি। ...

পাতাঝরা তিনটে রুক্ষ গাছ। কবরখানার তিন কোনায় তিনটে ধূসর একলা গাছ। এ বসন্তে তাদের ডালে পাতা জেগে ওঠার জন্যেই কি এমন গুরুতর আয়োজন! বয়স্ক গাছগুলোর শিরা-উপশিরা শক্ত হয়ে গেছে। শুকিয়ে যাচ্ছে দ্রুত। আজ এই রাতের ঝড়ে তারা এত আলোড়িত এত অস্থির! ... পারু আড়চোখে ঘড়ি দেখে নেয়। রাত বারোটা বেজে গেছে। টেবিলে হেরিকেন জ্বলছে। তেমনি ভঙ্গিতে বসেছে তিনজনে। হৈমন্তী টেবিলের কাছে বসেছে। পারু আর ডালিম খাটে। খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেছে। বাইরে ঝিঁঝি ডাকছে। মাঝে মাঝে দূরে ট্রেনের শব্দ। কাঠি দিয়ে দাঁত খুঁচিয়ে ডালিম বলে, আমার ডান চোয়ালের তিনটে, বাঁ দিকে দুটো নেই। বাঁধিয়েছি। তোর, পারু?

পারু একটু হাসে—বয়সের সঙ্গে দাঁত পড়ার সম্পর্ক আছে নাকি? আমার একটা গেছে। বাঁদিকের আক্কেল দাঁতটা।

আদতে ছিল কি কোন দিন? তুই তো বরাবর বেআক্কেলে!

এ কথায় হৈমন্তীও হাসে। —এত অত বীরত্ব, অথচ দাঁত তুলতে গিয়ে হইচই ফেলে দিয়েছিল, জান পারু?

ডালিম গালে হাত রেখে মাথা ঝাঁকুনি দেয়। —ওরে বাবা! হরিব্‌ল!

ব্যথা পাওয়া তো উচিত নয়। ইঞ্জেকশন দেয় তো।

দিলে কী হবে? দাঁত ওপড়াচ্ছে, এই সেন্সটাই যথেষ্ট!

হৈমন্তী বলে, শুধু কি এই? নখ কাটতে পর্যন্ত ভয়। নখের অবস্থা দেখতে পাচ্ছ না? কাটা ছেঁড়াতে ভীষণ ভয় ওর। অথচ ..., —বলে চুপ করে যায় সে।

ডালিম বলে, জানি, কী বলতে চাইছ! স্ট্যাব করতে হাত কাঁপেনি, এই তো? তোদের দুজনের দিব্যি, ও সব কাজ শালা মহারাজার। ডালিম অলওয়েজ ভীতু গোবেচারা মুখ্যুসুখ্যু লোক। সেজন্যই তার সঙ্গে পারুর এত ভাব হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এ-ও সত্য, মহারাজা না থাকলে ডালিমকে পারু আমলই দিত না। তাদের বাড়ির আশ্রিত বলে অবজ্ঞা করত—করুণা করত, ছোট করে রাখত। তাই না পারু?

পারু ভর্ৎসনার এবং ক্ষোভের ভঙ্গিতে বলে, তুই তো বরাবর অকৃতজ্ঞ!

ডালিম সোজা হয়ে বসার চেষ্টা করে। —কার কাছে কৃতজ্ঞতা পারু? আমি বুঝি নিজের প্রতি নিজের কৃতজ্ঞতার চেয়ে বড় কিছু নেই। ডালিম আর মহারাজা দুজনেই দুজনের প্রতি কৃতজ্ঞ। মহারাজা ছিল বলেই ডালিম বেঁচে থাকতে পেরেছে। আর ডালিম ছিল বলেই মহারাজা অন্তত একটা ঠ্যাং বাঁচিয়েও টিকে আছে। তাই না? কিন্তু এ সব আলোচনার জন্য হুইস্কিটা দরকার। হিমি! লক্ষ্মীটি! দয়া কর, অন্তত একটা রাত!

হৈমন্তী কয়েক মুহূর্ত ওর দিকে তাকিয়ে থাকার পর টেবিলের তলা থেকে বোতলটা আবার বের করে। গ্লাস দুটো টেবিলেই ছিল। জগ থেকে জল ঢালে। তারপর খুব অল্প করে হুইস্কি ঢেলে দেয় গ্লাস দুটোতে। ডালিম বলে, এই! আরেকটু, প্লিজ!

কোন কথা না বলে হৈমন্তী গ্লাস দিয়ে যায়। তারপর চেয়ারে বসে পড়ে। পারু দেখতে পায়, মুখের ভাবে চাঞ্চল্য জেগেছে—যেন ভেতরে অনেক কথা তোলপাড় হচ্ছে, বলতে পারছে না। তাই সে হাসতে হাসতে বলে, হৈমন্তী, তুমি কি চুপচাপ শুনে যাবে? তোমার বলার কথা নেই? ইচ্ছে করছে না বলতে? এমন সময় আর পাবে না কিন্তু।

হৈমন্তী বলে, আমার কোন বলার কথা নেই।

পারু সকৌতুকে বলে, মহারাজার ভয়ে?

মহারাজার ভয় তোমার থাকতে পারে। পলাশপুরের লোকের থাকতে পারে। আমার নেই।

এ কথা শুনে ডালিম হো হো করে হেসে ওঠে। তার গ্লাস থেকে মদ ছলকে পড়ে। তার গলায় আটকে যায়। সে প্রচণ্ড কাশতে থাকে। তারপর সামলে নিয়ে বলে, মহারাজাটা ছিল একটা গুণ্ডা। দলবল নিয়ে এলাকাকে জব্দ করে রেখেছিল। ও শালার এখন তেমনি প্রায়শ্চিত্ত হচ্ছে। ঠ্যাং কাটা হয়ে পড়ে আছে। লোকেরা পাপের শাস্তি বলে ভগবানের ঢাক পেটাচ্ছে। কিন্তু তবু শালারা এখনও মনে মনে ভয় পায়। পুলিশ লেলিয়ে দেয়। এই তো সেদিনই আই বি ভদ্রলোক হঠাৎ এসে এ ঘরে খুব যত্নআত্তি নিয়ে গেল হৈমন্তীর। কেন এসেছিল, কে জানে!

পারু বলে, বলিস কী!

হৈমন্তী বলে ওঠে, এমন পোড়ো বাড়িতে আমরা থাকি, তাই ভাবে, কোন অপকর্মের ঘাঁটি আছে নাকি! অবিশ্যি ও-মাসে আমরা স্টেশনের কাছে চলে যাচ্ছি। একটা বাসা পাব। বাড়িটা তৈরি হচ্ছে এখনও।

ডালিম অন্যমনস্কভাবে বলে, সেখানেও আই বি যাবে। না মরা অবধি রেহাই নেই। কিন্তু মহারাজা কি সত্যি মরবে? ও শালা অমর। আবার গজাবে। কারণ লোকের দরকার হবে তাকে। তাই না পারু?

লোকের দরকারে সাড়া দিতে পারত বলেই ডালিম খুব শিগগির পলাশপুরে নিজের একটা শক্ত জায়গা করে নিতে পেরেছিল। এটাই অদ্ভুত যে ওর মধ্যে যেন পুরনো পৃথিবীর খুব শক্ত ও স্থায়ী কোন জিনিস ছিল। অন্তত পারুর তাই মনে হত। এখনও মনে হচ্ছে। নয়ত পারু ও হৈমন্তীর জীবনে অমন একটা সন্ধিকালে ডালিমকে দেখে দুজনেই মনে জোর পেয়েছিল কেন? হৈমন্তী যেন ভুলেই গিয়েছিল, সে ওবেলা রিকশ ডাকতে বলেছিল চলে যাবার জন্যে। পারুও ভুলে গিয়েছিল যেন হৈমন্তীর চব্বিশ ঘণ্টা সময় নেওয়ার কথা। নির্জন বাড়িটা ভরে তুলেছিল ডালিম তার চড়া গলার কথাবার্তায়, হুল্লোড়ে, হাসিতে। পারুর মনেই হচ্ছিল না হৈমন্তী ও তার কোন গোপন সমস্যা আছে।

সমস্যা নিশ্চয় ছিল। ওভাবে তো বেশিদিন থাকা যায় না। পারু ও হৈমন্তীর মধ্যে বোঝাপড়ার ব্যাপারটা সাময়িকভাবে চাপা পড়লেও খুব শিগগির আবার মাথা চাড়া দিত। অসম্ভব ধূর্ত ডালিম পরদিনই যেন একটানে পর্দা ছিঁড়ে দুজনকে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিল। —হ্যাঁ রে, তুই তো কমিউনিস্ট?

পারু বলেছিল, ছিলুম। এখন আছি কিনা বলা কঠিন। কেন?

শুনেছি কমিউনিস্টরা খোদা-ভগবানে বিশ্বাস করে না। তাই না?

পারু ও হৈমন্তী দুজনেই হেসে ফেলেছিল ওর অবোধ বালকের মত বলার ভঙ্গি দেখে। তারপর পারু বলেছিল, হুঁ, তাতে হয়েছে কী?

ডালিম তখন রীতিমত সিরিয়াস। বলেছিল, তাহলে তো মুশকিলের কথা।

একটা কিছু তো চাই-ই, যাকে তোরা ভয় পাবি!

আমরা কাকেও ভয় পাই নে। কিন্তু কেন ও কথা বলছিস?

ডালিম আঙুলে তুড়ি দিয়ে বলেছিল, হয়েছে! মানুষের মধ্যে বিবেক বলে একটা কিছু আছে তা মানিস, না মানিস নে?

মানি। নিশ্চয়ই মানি। কিন্তু কেন?

বেশ। নিজে নিজের বিবেককে সাক্ষী রেখে তোরা ..., হঠাৎ থেমে ডালিম এদিক-ওদিক চঞ্চল চোখে তাকাল। তারপর লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। বলল, আমি আসছি। এক্ষুনি আসছি। ওয়েট! হাম আভি আতা হ্যায়!

সে দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বাইরের বারান্দা থেকে লাফিয়ে পড়ার আওয়াজ শোনা গেল। জোরাল আওয়াজ। পায়ে বেশির ভাগ সময় সে মিলিটারি বুট পরে থাকত। এমন কি খাকি বুশ শার্ট

আর প্যান্টটাও পরনে থাকত। মাথায় ক্যাপ পরতেও ভুলত না। পারুর মনে হত, ওই ভাবে ডালিম যেন পলাশপুরে দাপট দেখাতে চাইছে।

তখন গ্রীষ্মের বিকেল। হৈমন্তী জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়েছিল পারুর দিকে। তারপর যেন টের পেল, তারা নির্জনে আবার পরস্পরের মুখোমুখি হয়েছে। অমনি হৈমন্তী বাইরে বারান্দায় চলে গেল।

পারু ততক্ষণে অনেকটা সামলাতে পেরেছে নিজেকে। হৈমন্তী কী করে না-করে তাতে আর যেন তার মাথাব্যথা নেই। হয়ত ওটা ছিল তার অসহায় মরিয়াপনা। গায়ের জোরে তো হৈমন্তীকে সে চায়নি কোনদিনও।

পারু ভেতরের বারান্দায় চেয়ার টেনে নিয়ে গিয়ে বই পড়তে শুরু করল। ঘণ্টাখানেক পরে হইহই করে ফিরল ডালিম। সে বাইরে থেকে চেঁচাচ্ছিল, পারু! পারু! কখন হৈমন্তী এসে নিঃশব্দে ও-ঘরে ঢুকে চুপচাপ বসে আছে, পারু টের পায়নি। ডালিমের চেঁচামেচিতে পেল। —এই যে, চলে আসুন! ধরুন এগুলো। জানলা ধরা মেয়েদের ভারি বদ অভ্যেস, চলে আসুন বলছি!

পারু বেরিয়ে গিয়ে দেখে, সে এক অদ্ভুত কাণ্ড। একটা রিকশ দাঁড়িয়ে আছে গেটের ওখানে। ডালিমের এক হাতে দড়ি-বাঁধা একটা প্রকাণ্ড মাটির হাঁড়ি, অন্য হাতে একগাদা ফুল কিংবা মালা, তার পায়ের কাছে রিকশর ওপর একগাদা প্যাকেট আর কী সব জিনিসপত্র! সে চোখ পাকিয়ে বলল হাঁ করে কী দেখছিস শালা? ইধার আ যা!

পারু হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে আছে দেখে সে ওই অবস্থায় লাফ দিয়ে নামল। তারপর রিকশওয়ালাকে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বলল, আরে ইয়ার! তুম্ ভি আঁখে ফাঁড়কে কেয়া দেখ্ রাহা? জিনিসগুলো খুব ওজনদার নয়, বাবা! হাত লাগাতে তকলিফ হবে না। ননীর গতর বাঞ্চোৎ! ওঠা বলছি!

শেষের কথাগুলো বাপ তুলে গালাগালের মত শোনাল। হিন্দুস্থানী রিকশওয়ালাটাকে পারু চিনত। রেলস্টেশনের খালাসি ভজুয়ার দাদাটাদা হয় সম্পর্কে। পার্টি রিকশওয়ালাদের সমিতি গড়েছিল। সেই থেকে আলাপ। ডালিমের ধমক শুনে সে ভ্যাবাচাকা খেয়ে তড়াক করে নামল। একগাল হেসে প্যাকেটগুলো দু'হাতে বুকের কাছে ধরে তক্ষুনি নিয়ে এল।

একটু খারাপ লাগছিল পারুর। পার্টিতে থেকে তার দৃষ্টিভঙ্গি এই সব নিচুতলার মানুষদের প্রতি অন্য রকম হয়ে উঠেছিল। সে ওদের সম্মান করে কথা বলত। কমরেড বলে সম্ভাষণ করত। হাত মুঠো করে ওপরে তুলে লাল সেলাম দিত।

ভজুয়ার দাদা শ্রদ্ধার সঙ্গে জিনিসগুলো বারান্দায় রেখে তারপর যথারীতি পারুকে লাল সেলাম দিল। ডালিম হাঁ করে তাকিয়ে দেখল। তারপর বলল, কি বাবা! তুমি ওকে ঘুষি দেখাচ্ছ কেন?

রিকশওয়ালা হলুদ ভাঙা দাঁতগুলো বের করে বলল, উন্‌হি হামাদের পার্ট্রির কোমরেড আছে হুজোর! ওহি লিয়ে আমি উন্‌হিকো লাল সেলাম দিচ্ছে। ডালিম মুখ ভেংচে বলল, পয়সা দিচ্ছি আমি, আর ওকে দিচ্ছ সেলাম! তাও আবার লাল রঙের! শোন বাবা, একখানা সেলাম দাও দিকি! লাল নয়, নীল। এই দেখ, ঠিক এরকম। বলে সে গোড়ালিতে শব্দ তুলে একখানা মিলিটারি সেলামের ভঙ্গি করল।

রিকশওয়ালা খিকখিক করে হাসতে লাগল। তারপর কতকটা ওই রকম একটা সেলামও দিতে ভুলল না।

একটু পরে সে চলে গেলে ডালিম ধমক দিয়ে বলল, কী রে শালা? গরজ কি আমার না তোদের? হাত লাগাবি, না ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকবি?

পারুর মনে পার্টি সম্পর্কে তখন রাগ ছিল প্রচুর। ক্ষোভ ছিল প্রচণ্ড। কিন্তু তখনও সে বিশ্বাস হারায়নি। তাই লাল সেলাম নিয়ে আর এই রিকশওয়ালার প্রতি ডালিমের ঠাট্টা-তামাশায় মনে মনে খুব রেগে গিয়েছিল। বলল, এ সব কি আনলি?

ডালিম কিছুক্ষণ নিষ্পলক চুপচাপ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকার পর ঠোঁটের কোণে ওর সেই অনবদ্য বিদ্রূপের ভাঁজটা স্পষ্ট করে আস্তে আস্তে বলল, ন্যাকামি দেখলেই আমার মাথায় খুন চড়ে যায়!

হৈমন্তী এসে দাঁড়িয়েছিল দরজায়। তার দিকে চোখ পড়তেই ডালিম নিজেকে যেন সংযত করে নিল। গম্ভীর মুখে বলল, এগুলো কাজে না লাগলে পুকুরে ফেলে দেব, না হয় জাহান্নামে ছুঁড়ে দেব। জানব, এ বাড়ির সঙ্গে আমার সম্পর্ক নেই। আমি আউটসাইডার।

তারপর সে সোজা হৈমন্তীর পাশ দিয়ে ঘরে ঢুকল। হৈমন্তী আরও একটু সময় নিয়ে পা বাড়াল। পারু তখনও ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে আছে।

পারু দেখল, হৈমন্তী প্যাকেটগুলো নিয়ে যাচ্ছে। তখন সে আস্তে আস্তে ভিতরে গিয়ে ঢুকল। ডালিম ভিতরের বারান্দায় কোমরে দু'হাত রেখে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে।

পারু পিছনে গিয়ে দাঁড়াল। —কিন্তু তুই বুঝতে পারছিস না ডালিম ...

পারছি। তুই একটা কাওয়ার্ড! তুই আহাম্মক!

হৈমন্তী যা চায় না ...

কথা কেড়ে নিয়ে ডালিম বলেছিল, হৈমন্তীর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে।

কখন কথা হল, কি কথা হল, পারু অবাক হয়ে গিয়েছিল! তাহলে কি দুপুরে যখন সে ঘুমিয়ে পড়েছিল, হৈমন্তীর সঙ্গে কথা বলতে গিয়েছিল ডালিম? পারু আড়চোখে হৈমন্তীর দিকে তাকাল। হৈমন্তীর ঠোঁটের কোনায় হাসি ফুটে রয়েছে। মুহূর্তে পারুর বুক থেকে বিশাল পাথর নেমে গেল সঙ্গে সঙ্গে। পারু শুধু বলেছিল, বেশ, তুই যখন বলছিস!

ডালিম ফেটে পড়েছিল, আমার বলার ব্যাপার নয়। হরনাথ সান্যালের ছেলে তুই। ও মধুসূদন ত্রিপাঠি মশায়ের মেয়ে। প্রাতঃস্মরণীয় মানুষের ছেলেমেয়েদের এটা সাজে না। লজ্জা করে না তোদের? উইদাউট মর‍্যাল বেসিস এভাবে দুজনে বাস করছিস! ঢাল নেই তরোয়াল নেই, নিধিরাম সর্দার! ফ্যামিলির ইজ্জত আছে না? এ বাড়িতে বসে কেলেঙ্কারি না করলে চলত না? এ বাড়ির সম্মান নিয়ে তোরা ছিনিমিনি খেলছিস না? আমার শালা স্পষ্ট কথা, আমি সেই মহারাজা!

হৈমন্তী এবার মৃদু প্রতিবাদের সুরে বলল, আঃ, কি বলছেন ডালিমদা! এবার আপনি কিন্তু বাড়াবাড়ি করছেন!

ডালিম অমনি বদলে গেল। হুঁ, খুব চেঁচামেচি করছি বটে। শুনুন, লোকজন এক্ষুনি এসে যাচ্ছে। ন্যাড়া ঠাকুরকে বলে এসেছি, এসে যাচ্ছে'খন। আপনি ঝটপট সেজে নিন। এই যে, শাড়ি-ফাড়ি স্নো-পাউডার সিঁদুর-টিঁদুর যা দরকার, সব আছে। হেরম্বর বোনকে বলেছি, আসব তো বলল! ওর জন্যে দেরি করা ঠিক নয়। ন্যাড়াঠাকুর পাঁজি দেখে বলেছে ছ'টা ঊনত্রিশে লগ্ন। এই বুদ্ধু, এখানে তোর ধুতিটুতি আছে। রেডিমেড পাঞ্জাবি পেলুম না। নেই তোর? সিল্কের হলে ভাল হয়। নয়ত আদ্দি-টাদ্দি। জুতোও এনেছি। হৈমন্তী, আপনার স্লিপার দুটো দেখুন তো, ঠিক আছে নাকি! পাঁচ নম্বর লাগবে বলল।

ডালিম বিপ্লব ঘটাতে পারত। ঘটিয়েছিল। ...

এখন সবই ছেলেখেলা লাগে। ছেলেখেলা ছাড়া কী? হৈমন্তী পারুর সঙ্গে কয়েকটা বছর যে-ঘর করেছিল তা খেলাঘর ছাড়া কিছু নয়। দুজনের মধ্যিখানের সেই বিশাল নদীটা ক্রমশ সাগর হয়ে উঠেছিল। সেই সাগরের ঢেউয়ের শব্দ এত জোরাল, কেউ কারও কথা শুনতে পেত না, শুনলেও বুঝতে পারত না।

হৈমন্তীর বাড়ি-বেচা টাকাগুলো পোস্টাপিসে রেখেছিল। পারুরই পরামর্শে। পরে ডালিম স্টেশনের কাছে একটা স্টেশনারি দোকান খুলল। পারুও তার পার্টনার হল। পারুর কাছে কানাকড়িও ছিল না। হরনাথের যা কিছু সঞ্চয় ছিল, এমন কি তার মায়ের টাকাকড়ি আর সোনাদানা, সবই কিছুটা পারুর কলেজের খরচ যোগাতে, কিছুটা পার্টি-ফান্ডে দানে খরচ হয়ে গিয়েছিল। স্টেশনারি দোকানে পারু হৈমন্তীর টাকাগুলোই লাগিয়েছিল। হৈমন্তীরই পরামর্শে। ডালিম ছিল প্রচণ্ড খরুচে। ওর পুঁজিও খুব বেশি ছিল না।

দোকানের নাম দিয়েছিল ফ্রেন্ডস স্টেশনার্স। ডালিম ছিল বেশ কেতা-দুরস্ত। মিলিটারি থেকে ফেরার পর তার ওই কেতাদুরস্ত ভাবটা প্রবল হয়ে উঠেছিল। ব্যবসা করার দিকে তার মন ছিল সামান্যই। পারু দোকানে বসত। ডালিম আড্ডা দিয়ে বেড়াত। তার সাঙ্গপাঙ্গ জুটে গিয়েছিল অনেক। ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করেছিল মহারাজা। তার ডালিম নামটা ভুলেই গিয়েছিল লোকে। যখন-তখন একে-ওকে ধরে পেটাত সে। বীরেশ্বরবাবু ইলেকশনে দাঁড়িয়েছিলেন। ছেচল্লিশের অন্তর্বর্তী নির্বাচনের হুল্লোড় চলেছে তখন সারা দেশে। মুসলিম লিগ আর কংগ্রেস মুখোমুখি রুখে দাঁড়িয়েছে। ডালিমকে মীর্জা আর কাজীরা দলে টানতে চেষ্টা করেছিলেন, পারেননি। বীরেশ্বর ভোটে জিতেছিলেন। কিন্তু পলাশপুরে রাজনৈতিক সংঘর্ষ কখনও হয়নি। হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গাও হয়নি। ছোটখাট সংঘর্ষ যা কিছু হত, তা নিছক ব্যক্তিগত কারণে। ডালিমের আরেকটা কাজ ছিল, বাড়ি বা জমির দখলের ব্যাপারে ভাড়াটে গুণ্ডা যোগান। সে থাকত আড়ালে। তার চেলারা গিয়ে কাজ করত, কড়ি বুঝে নিত ডালিম। পারু তাকে সামলাতে পারত না। নিজেও বড় ভয় করত ওকে।

কিন্তু হৈমন্তীর অদ্ভুত পক্ষপাত লক্ষ্য করত পারু ডালিমের দিকে। তখনও অত কিছু তলিয়ে বুঝতে পারেনি। অনেক পরে পেরেছিল। তখন আর কিছু করার ছিল না। পারু সারাদিন দোকানে থেকেছে। সেই ভোরে সাইকেলে বেরিয়ে এসেছে। ফিরেছে রাত দশটায়। সরাসরি কলকাতা থেকে মালপত্র আনতে হয়েছে প্রায়ই। পারতপক্ষে সে বাইরে রাত কাটাতে চাইত না। দোকানে ডালিমকে পাওয়া যাবে না তা তো জানাই। অগত্যা হৈমন্তী এসে বসত। একজন ছোকরা কর্মচারীও রেখেছিল। সে সুযোগ পেলেই চুরি করত। তাই পারু যেত ভোরের ট্রেনে। ফিরে আসত রাত ন'টার আগে। বাড়িতে খেতে গিয়ে দেখত, হৈমন্তী একা আছে এবং আশ্বস্ত হত পারু। জিজ্ঞেস করত, ডালিম খেতে আসেনি? হৈমন্তী মাথা নাড়ত।

পারুর মনে সংশয় জাগত, ও কি সত্যি বলছে? ডালিম কি প্রায়ই দুপুরের খাওয়াটা বাইরে খায়?

তারপর একদিন দুপুরে, একটু আগেই পারু বাড়ি গেল। গিয়ে দেখল, ডালিম খেতে বসেছে। হৈমন্তী তার সঙ্গে যেন খুব হাসাহাসি করছিল এতক্ষণ, একটু হকচকিয়ে গেল দুজনেই। অবশ্য ব্যাপারটা সামান্য। কিন্তু পারুর মনের সংশয় আরও ঘন হল। হৈমন্তী কেন অত সেজেগুজে থাকে? পারু যখন থাকে না, তখন কি ডালিম ওর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করে?

এরপর প্রায়ই পারু যখন-তখন একটা অছিলা নিয়ে বাড়ি এসেছে। ডালিমকে যেদিন বাড়িতে দেখেছে, ডালিম বলেছে, শরীর ভাল না, সেদিনই পারু গম্ভীর হয়ে থেকেছে। ভাল করে কথা বলেনি হৈমন্তীর সঙ্গে। ...

এই স্মৃতিটা দীর্ঘ এবং তেতো। পারু ভুলে যেতে চেষ্টা করেছে, পারেনি। বিশেষ করে এক বর্ষার প্রচণ্ড বৃষ্টির দিনে হৈমন্তীর দরজা খুলতে দেরি হওয়া, আলুথালু বেশ, তারপর পাশের ঘরে ডালিমের ঘুমের ভান করে শুয়ে থাকা। ...

যে ফোড়াটা দেখা যাচ্ছিল, ক্রমশ স্পষ্ট হল, পেকে গেল। গলে বেরিয়ে এল পুঁজরক্ত। সে এক কদর্য সময়!

তখন দেশভাগ হয়ে গেছে। মীর্জা-কাজীসায়েবরা পাকিস্তানে চলে গেছেন। মীর্জার এক বিধবা ভাগ্নি আঞ্জুমান বেগমকে মীর্জার ছেলেরা সম্পত্তি বেচার সময় ফাঁকি দিয়েছিল। মামলা হয়েছিল। কিন্তু হেরে যান ভদ্রমহিলা। তাঁকে বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করার সময় মহারাজার আবির্ভাব হল সদলবলে। ক্র্যাকার ফাটিয়ে হুলস্থূল করে অন্যপক্ষকে তাড়ানো হল। ওঁরা তখন পাকিস্তানের নাগরিক আইনত। আঞ্জুমান বেগমের সামান্য কিছু জমি ছিল। ছেলেমেয়ে নেই। একা থাকতেন বৃদ্ধা। ডালিম তাঁর ন্যাওটা হয়ে উঠেছিল।

হৈমন্তী ও পারুর তিক্ততা লক্ষ্য করে একদিন সে নিঃশব্দে আঞ্জুমান বেগমের বাড়িতে গিয়ে উঠল। স্টেশনারি দোকানেও আর যেত না। দেখা হলে পারুর সঙ্গে কথাও বলত না। পারুও না। ...

এই সেই বাড়ি। ডালিম এখন সেখানে হৈমন্তীকে নিয়ে ঘর করছে। পরস্ত্রী হৈমন্তী। ডালিম পারুর ঠিকানা যোগাড় করে লিখেছিল, আমার বিবেকে বাধে৷ পরস্ত্রী নিয়ে লোকে কি ঘর করতে পারে?

আমার বড্ড খারাপ লাগে। কিন্তু হৈমন্তী আমাকে ছেড়ে কোথাও যাবে না। আমাকে দোষ দিস নে পারু। আমি এখানেই অসহায়। আমি জানি, ও আমার কেউ নয়। আইনত ধর্মত তোর স্ত্রী। অথচ ওকে তাড়াব কেমন করে?

বোতলের শেষটুকু হৈমন্তী কেড়ে নেওয়ার আগেই, ডালিম চোঁ চোঁ করে গিলে ফেলে। তারপর মিটিমিটি হাসে। —তুই ওকে অনেকগুলো চিঠি লিখেছিলি। ওকে কলকাতায় তোর কাছে চলে যেতে ফুঁসলেছিস বার বার। ও যাবে, না তুই এসে নিয়ে যাবি রে গাড়ল? ও মেয়ে। ও কি যেতে পারে নিজে থেকে? তুই তো ওকে অসহায় অবস্থায় ফেলে চলে গিয়েছিলি। এমন কি বাড়িটাও বেচে দিয়েছিলি গোপনে। তারা ওকে উচ্ছেদ করতে এল। তখন কী করবে ও?

পারু গম্ভীর মুখে বলে, এ কথা বলার জন্যে যদি ডেকে থাকিস, ভুল করেছিস।

ডালিম দুলে দুলে হাসে। —লোকে জানে, তুই পরে ওকে ডিভোর্স করেছিস। সবাই জানে, আমি ওকে বিয়ে করেই রেখেছি। অথচ সব গুল। ধাপ্পা।

পারু বলে, আঃ ডালিম!

ডালিম আরও জোরে হাসতে থাকে। তারপর বলে, কিন্তু এখন এ সবের কোন মানে হয় না। তিনটি শুষ্ক বৃক্ষ। আমরা তো খোলাখুলি আলোচনা করতে পারি এখন। কারও প্রতি কারও আর এতটুকু মোহ নেই। আমরা প্রত্যেকেই জানি কেউ কারও কাছ থেকে নিঙড়ে কিছু বের করে নিতে পারব না যাতে চিত্ত শীতল হয়।

ক্রমাগত হাসিতে সে অন্ধকার নিশুতি রাত আর এই জীর্ণ বাড়িটাকে তোলপাড় করতে থাকে। হৈমন্তী মুখ নামিয়ে আঙুল খোঁটে।

চিত্ত শীতল হয়। কেমন চমৎকার আমি কথা বলতে পারছি রে, সুশিক্ষিত মানুষের মত! ভদ্রলোকের মত! ডালিমের চোখ দুটো পাগলাটে দেখায়। তার ঠোঁটে লালা চকচক করে। সে বলতে থাকে, বোমার টুকরো লেগে পা-টা গেল। তারপর আমি কী নিয়ে সময় কাটিয়েছি জানিস? শুধু বই। যা পাই, পড়ি। হৈমন্তী আমাকে বই এনে দিয়েছে। শালা ম্যাট্রিকটাও পাস করে মিলিটারিতে যাইনি! এখন আমি বুক অফ নলেজ! আমাদের গ্রেট ফাদার ঠিক যা করতেন। এ আমার দেখে শেখা রে উল্লুক! ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? ওই শিক্ষিত মহিলাকে আমি ডাক্তার হরনাথ সান্যালের মত জ্ঞান দিই। জিজ্ঞেস কর্! এই হিমি, বল না! বল, তুমি একটা কিছু বল!

হৈমন্তী চুপ করে থাকে। পারু বলে, তুই শুয়ে পড়। রাত হয়েছে।

কভি নেহি। আমিও ঘুমব না, তোমাদেরও ঘুমতে দেব না। আমার লাস্ট সাপার খাওয়া হয়ে গেছে। এবার আমি ক্রুশবিদ্ধ পয়গম্বর ইসা হব। আমার সামনে একটা ক্রুশ পোঁতা হয়েছে। ... ডালিম আবার হা-হা করে হেসে ওঠে। তারপর হাসিটা আস্তে আস্তে ঝিমিয়ে আসে। সে বালিশে কপাল রেখে তখনকার মত উপুড় হয়ে শোয়। তার পিঠটা কাঁপতে থাকে। শব্দহীনতার দিকে টেনে নিয়ে গেল সে ওই বিভ্রান্ত হাসিকে, না-কি কান্নায় ডুবিয়ে দিচ্ছে? পারু বুঝতে পারে না। ওর পিঠটা অত কাঁপছে কেন?

পারু ডাকে, ডালিম!

কোন জবাব আসে না। সে হৈমন্তীর দিকে তাকায়। হৈমন্তী উদ্বিগ্ন মুখে উঠে এসে ওকে ওঠাবার চেষ্টা করলে ডালিম চাপা গলায় গর্জায়, আঃ, আমার ঘুম পাচ্ছে! বিরক্ত কর না।

হৈমন্তী বলে, ঘুমবে তো ভাল করে শোও। বিছানা ঠিক করে দিই।

ডালিম অস্ফুটস্বরে বলে, ঠিক আছে। ঘুমবো—যাও!

হৈমন্তী পারুর দিকে তাকায়। পারু বলে, থাক। তখন হৈমন্তী উঠে গিয়ে টেবিলের পাশে জানলার কাছে দাঁড়ায়। একটু পরে পারু ডাকে, হৈমন্তী!

উঁ?

ঘুম পাচ্ছে না তোমার?

না।

পারু খুকখুক করে হাসে। গত রাতের মতই নেশা হয়েছে তার। বলে, তাহলে দাঁড়িয়ে থাক। আমি...

হৈমন্তীকে হঠাৎ তার দিকে ঘুরতে দেখে সে থামে। হৈমন্তী ক্ষুব্ধ স্বরে বলে, তুমি এলে এলে, ও সব কথা না তুললেই কি চলত না?

পারু বিব্রত হয়। —আমি কোথায় তুললুম? ও নিজে থেকেই তুলল।

আমি তো বাধা দিচ্ছিলুম।

তুমিই তুলেছ। মনে করে দেখ।

আহা! সে তো ফর্টিনাইনের ব্যাপার। একেবারে ছেলেবেলার।

জান না, শেকড় টানলে গাছটাই উপড়ে যায়?

পারু চুপ করে থাকে কয়েক মুহূর্ত। তারপর বলে, তাহলে আসার আমারই উচিত ছিল না। তাই না?

হ্যাঁ।

উচিত ছিল না? পারু উঠে বসে।

না।

তুমি বলছ, আসা ঠিক হয়নি?

বলছি। কবর খুঁড়ে এখন যা পাচ্ছ, তা তো জ্যান্ত মানুষ নয় পারু!

যাক। খুশি হলুম যে তোমার চোখে এখনও জল আসে।

আমি কাঁদিনি।

তুমি কী হৈমন্তী! এতটুকু বদলাওনি! এতটুকু অনুতপ্ত নও! যেমন ছিলে ঠিক তাই আছ!

হৈমন্তী হিস হিস করে বলে, থাম। আমার নিজের কী হওয়া বা না-হওয়া, কী করা বা না-করা উচিত, সে আমি জানি। তুমি নিজের কথাটা ভাব।

আমিও কি আগের মতই আছি? পারু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকায়। —ভুল কর না হৈমন্তী। যদি আগের মত থাকতুম, এসেই বলতুম, যেহেতু ধর্মত আইনত তুমি আমার স্ত্রী, সেই হেতু তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছি।

লজ্জা করে না বলতে? লজ্জা করেনি এত চিঠি লিখতে? বীরেশ্বরবাবুর ভয়ে রাতারাতি দেশ ছেড়ে পালিয়েছিলে বউকে ফেলে? হৈমন্তী তীব্র অথচ চাপা স্বরে কথাগুলো বলে। তার নাসারন্ধ্র কাঁপে। দ্রুত বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। একটু পরে পাশের ঘরে দরজা খোলার শব্দ হয়। দরজা বন্ধ করার শব্দ হয়। তারপর আবার স্তব্ধতা। কতক্ষণ স্তব্ধতা।

পারু ডালিমকে ডাকে, এই! ডালিম!

ডালিম পাশ ফিরে গড়িয়ে পড়ে। বিড়বিড় করে কিছু বলে। প্রচণ্ড নেশা হয়েছে হয়ত। নাকি উত্তেজনার পর ক্লান্তির সঙ্গে হুইস্কির নেশাটা মিলেমিশে ওকে ঘুমের অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে নিশ্চেতনার পাতালে নিয়ে চলেছে! ওর ঠোঁটটা কাঁপছে। পারু তবু বলে, চলি রে!

তারপর বাবার ছবির সামনে গিয়ে প্রণাম করে। ঘড়ি দেখে। রাত তিনটে। সে খাটের বাজু থেকে প্যান্ট-শার্টটা টেনে নেয়। স্যুটকেসে ভরে। তারপর হেরিকেনের পলতেটা কমিয়ে দেয়। দরজা খোলা রেখে বেরিয়ে আসে জিনিসপত্র নিয়ে। হৈমন্তীর দরজার সামনে গিয়ে ডাকে—হৈমন্তী!

কোন সাড়া আসে না।

সে ফের ডাকে—হৈমন্তী! আমি চলে যাচ্ছি।

তবু কোন সাড়া নেই।

হৈমন্তীর উদ্দেশে মনে মনে পারু বলে, তোমার বোঝা উচিত ছিল হৈমন্তী, এত দিন পরে এ বয়সে আমি আর কোন দাবি নিয়েও আসিনি, কিংবা তোমাদের সঙ্গে ঝামেলা করতেও আসিনি। এসেছিলুম যেভাবে লোকেরা একদিন ছেড়ে যাওয়া পৈতৃক বাস্তুভিটে দেখতে আসে। তার বেশি কিছু নয়;

হৈমন্তী। তাছাড়া তুমি তো জান, আমার ছেলেবেলাটা ডালিমের সঙ্গে একাকার। ওর কাছ থেকে আমার অংশটুকু কেড়ে নিতে এসে দেখি, তুমি সামনে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছ। একেবারে দরজা আটকে আছ। তাই ভেতরে ঢোকা হল না। বাইরে থেকে উঁকি মেরে দেখে গেলুম।

তখন কৃষ্ণপক্ষের ভাঙা চাঁদ উঠেছে। মীর্জাবাড়ির ধ্বংসস্তূপের ওপর হলদে জ্যোৎস্না পড়েছে। সাঁকো পেরিয়ে রাস্তায় এসে পারু একবার ঘোরে। পোড়ো দোতলা বাড়িটার দিকে তাকায়। ওপরে জানলায় হ্যারিকেনের আলো ভৌতিক মনে হয়। যেন কোন একচোখা ভয়ঙ্কর প্রেত তার চলে যাওয়া দেখছে। ওই প্রেতের নামই তো স্মৃতি।

তারপর একটু চমকায় পারু। আগাছা আর স্তূপের মধ্যিখানে সরু রাস্তাটার ওপর কেউ যেন দাঁড়িয়ে আছে। চোখের ভুল ভেবে সে পা বাড়ায়।

স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের শেষদিকে একটা খালি বেঞ্চে বসে পড়ে পারু। ফেরার ট্রেন কখন জানে না—হয়ত ভোরের দিকে। নিঝুম স্টেশনের বাতিগুলো এখন ঘুম-ঘুম দেখাচ্ছে। সামনে ফিকে জ্যোৎস্নায় ঢাকা মাঠের দিকে তাকালে মনে হয় অন্তহীন গোরস্তান, আর সেখানেও ঘুমের আচ্ছন্নতা। বস্তুত এখন এই শেষরাতে ঘুমে শরীরকে যেন ধুয়ে মুছে নতুন করে তোলার আয়োজন চলেছে প্রকৃতিতে—কারণ সকালে আবার সংঘর্ষময় জীবনযাত্রা শুরু হবে।

পারু যদি এখন ঘুমতে পারত! তার মধ্যে কী এক রাক্ষুসে জাগরণ তোলপাড় হচ্ছে। আর গ্লানি, লজ্জা, ক্ষোভ। এতদিন পরে হঠাৎ কেন এভাবে হুট করে এখানে এসে হাজির হল সে?

এতক্ষণে বুঝতে পারছে, ডালিম তাকে শাস্তি দিতেই ডেকেছিল। ডালিম তার সামনে একটা পুরনো আয়না দাঁড় করিয়ে দিল, যাতে পারু নিজের চেহারা পুরোপুরি দেখতে বাধ্য হল। এমন করে নিজেকে তো কখনও দেখেনি পারু। নিজের বোকামি, ভীরুতা, কাপুরুষতা, স্বার্থপরতা কদর্য ক্ষতের মত ফুটে উঠল আয়নার মধ্যে। ...

যতবার এসব কথা ভাবল সে, ততবার তার পিঠে যেন চাবুক পড়ল। পারুর চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল। চুল খামচে ধরে শূন্যদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। হৈমন্তী আর ডালিমের মূর্তি ক্রমশ বিশাল হতে হতে তার দৃষ্টির শূন্যতা ভরাট করে তুললে অসহায় পারু ভাবল, যদি এখন সে শেষরাতের কোনও হঠকারি ট্রেনের সামনে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারত!

পারবে না। সে সাহস কিংবা ক্ষমতাও তার নেই। সে বড় লোভী। সে তাই হ্যাংলার মত জীবনের আনাচেকানাচে লুকোচুরি খেলে যেটুকু বাগাতে পেরেছে বাগিয়ে নিয়েছে। কুকুর, কুকুর একটা!

কিছুক্ষণ এভাবে বসে থাকার পর সে সিগারেট জ্বালে। সুটকেসটা বেঞ্চে রেখে সামনে অস্থিরভাবে পায়চারি করতে থাকে। সেই সময় তার চোখে পড়ে, স্টেশনের বারান্দা দিয়ে হনহন করে কে এদিকে আসছে। আলো-আঁধারি জায়গাটা পেরিয়ে খোলা প্ল্যাটফর্মের ল্যাম্পপোস্টের তলায় আসতেই পারু চিনতে পারে, হৈমন্তী!

সঙ্গে সঙ্গে সে টের পেল, নিজের মধ্যে হঠাৎ অমানুষিক ধরনের একটা রদবদল ঘটে যাচ্ছে।

তাহলে মির্জাবাড়ির ধ্বংসস্তূপে সত্যি সত্যি হৈমন্তীকেই তখন দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল। সে বেরিয়ে আসার পরই হৈমন্তী তাকে অনুসরণ করেছিল। তারপর হয়ত কিছু ভেবে থমকে দাঁড়িয়েছিল। হৈমন্তী যে অমন করে তাকে মুখোমুখি আঘাত দিল, অথচ তার নিজের কি আঘাত পাওনা নেই? পারু না হয়ে অন্য কেউ হলে তো পাল্টা আঘাত দিতে পিছপা হত না—কিংবা এমন করে তক্ষুনি পালিয়েও আসত না। কারণ হৈমন্তী যা করেছে, তা কোন মেয়ে কি করতে পারত? স্বামী ফেলে গেছে বলেই স্বামীর বন্ধুর সঙ্গে স্ত্রীর মত থাকা! পারুর ঠোঁটের কোনায় বিদ্রূপ ফুটে ওঠে। সে তৈরি হতে থাকে মুহূর্তে মুহূর্তে। হৈমন্তী এখন তার কাছে যে জন্যেই আসুক, পারু তাকে এবার সহজে ছেড়ে দেবে না।

পারু সোজা হয়ে দাঁড়ায়। অপেক্ষা করে। হৈমন্তী অত দ্রুত আসছে, অথচ মনে হয় একটা যুগ

কেটে গেল। দম বন্ধ করে পারু তাকিয়ে থাকে। আর হৈমন্তীর খোঁপাভাঙা চুলের পুরনো গন্ধটাও যেন সে টের পায়, টের পায় তার শ্বাসপ্রশ্বাসের সেই চেনা ঘ্রাণ, এই শেষরাতের নিস্পন্দ নির্জন প্ল্যাটফর্মে আবার যেন স্মৃতির কোনায় পড়ে থাকা এক টুকরো রেশমী রুমাল জ্যোৎস্নার হঠকারিতায় উড়ে আসে তার দিকে। পারু বুঝতে পারে, আবার সে হ্যাংলা হয়ে যাচ্ছে। অথচ হৈমন্তীকে এমন করে আর বাগে পাওয়া যাবে না—আঘাত দেবার এমন সুযোগও আর জীবনে আসবে না। হৈমন্তী সামনে এসে দাঁড়ালে সে খুব গম্ভীর এবং বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গিতে বলতে চেষ্টা করে—কী? কিন্তু তার স্বরভঙ্গ হয়। শ্লেষ্মায় জড়িয়ে যায় এই দীর্ণ প্রশ্ন : কী?

হৈমন্তী হাঁফাচ্ছে। তার শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে পারু। অনুভূতি, বোধ, স্নায়ুকেন্দ্র—সব কিছু এখন এত তীব্র পারুর! তার প্রতি রোমকূপে এখন যেন একটা করে ইন্দ্রিয়। পারু ফের স্খলিত স্বরে বলে—আবার কী?

হৈমন্তী শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে মিশিয়ে আস্তে বলে—ভুলে গিয়েছিলুম ...তোমার কিছু জিনিসপত্র আমার কাছে থেকে গেছে। ওগুলো তোমার নিয়ে যাওয়া উচিত।

—জিনিসপত্র? যেন আচমকা বুকের মধ্যে কী একটা ঘটে যায় পারুর। কয়েক মুহূর্ত সে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে।

হৈমন্তী বলে—হ্যাঁ। ওগুলো তুমি নিয়ে যাও। কেন আমার কাছে ফেলে রাখবে! তাছাড়া ...হয়ত ওগুলোর মধ্যে তোমাদের ফ্যামিলির পুরনো এবং দরকারি অনেক কিছু থাকতে পারে।

পারুর সব উত্তেজনা একটা ভারি নিঃশ্বাসের সঙ্গে বেরিয়ে যায়। খুব ক্লান্তভাবে সে বলে—হ্যাঁ। আমিও ভুলে গিয়েছিলুম। তোমাকে ধন্যবাদ হৈমন্তী। বলে সে একটু হাসবার চেষ্টা করে। ...মনে পড়ছে মায়ের কিছু গয়নাগাটিও ছিল ওর মধ্যে।

হৈমন্তী যেন চমকে ওঠে। বলে—গয়না ছিল নাকি?

—ছিল মনে পড়ছে। কেন? তোমাকে তো দেখিয়েছিলুম। পরতেও বলতুম। তুমি পরনি।

হৈমন্তী আস্তে বলে—কিন্তু আমি ভেবেছিলুম, তুমি ওগুলো নিয়ে গিয়েছিলে!

—না। নিয়ে যাই নি। মনে ছিল না।

হৈমন্তী কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পর একটু ব্যস্ততার ভঙ্গিতে বলে—তাহলে এস। গয়নাগাটির কথা শুনে আমার ভীষণ অস্বস্তি হচ্ছে। অনেক আগেই তোমার তাহলে নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। কই, ওঠ!

পারু মাথা নেড়ে বলে—থাক্ না। পরে এক সময় নিয়ে যাব'খন।

হৈমন্তী জেদের স্বরে বলে—না।

—কেন? বেশ তো আছে তোমার কাছে। তাছাড়া এখন ফিরে গেলে ডালিম আমাকে আটকাবে।

—ও নেশার ঘোরে ঘুমচ্ছে। সেই নটার আগে ওর ঘুম ভাঙবে না। তুমি এস।

—তুমি হঠাৎ এমন ব্যস্ত হয়ে উঠলে কেন হৈমন্তী?

হৈমন্তীর গলা কাঁপে যেন। সে চাপা স্বরে বলে—এখনই দেখা দরকার, গয়নাগুলো আছে নাকি! আমার বড্ড অস্বস্তি হচ্ছে।

পারু হাসে একটু। —থাকবে না তো যাবে কোথায়? তুমি মেরে দেবার মেয়ে তো নও। তাছাড়া মায়ের বাক্সটার চাবিও নেই। কবে কোথায় হারিয়ে ফেলেছি!

এবার হৈমন্তী প্রায় কাঁদো-কাঁদো স্বরে বলে ওঠে—পারু! লক্ষ্মীটি, জীবনে এই শেষবার তোমাকে অনুরোধ করছি, এস আমার সঙ্গে। এ আমার জীবন-মরণ প্রশ্ন, তুমি জান না।

পারু অবাক হয়ে বলে—কেন বল তো?

হৈমন্তী ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। কান্নাজড়ান গলায় বলে—আমার ধারণা, হয়ত গয়নাগুলো নেই ... হয়ত ...

—হয়ত মানে?

—ওকে কিছু বিশ্বাস নেই। ওকে তো তুমি জান পারু।

—ও, ডালিম! ... বলে পারু স্যুটকেস এবং ফোলিও ব্যাগটা বেঞ্চ থেকে তুলে নেয়। তারপর পা বাড়িয়ে একটু হেসে ফের বলে—তাই বলে তোমার অত কান্নাকাটির কোন দরকার নেই। যদি সত্যি ডালিম ওগুলো লুকিয়ে বেচে থাকে, আমি কিচ্ছু মনে করব না। তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার হৈমন্তী। আমি তো স্ত্রীলোক নই। গয়নার ব্যাপারে আমার কোনও সেন্টিমেন্ট নেই।

হৈমন্তী তার আগে হাঁটতে হাঁটতে বলে—তাহলেও তোমার মায়ের স্মৃতি!

—হ্যাঁ, স্মৃতি। কিন্তু সম্পূর্ণ স্মৃতিহীন হয়ে থাকাই আমার পক্ষে নিরাপদ নয় কি হৈমন্তী?

হৈমন্তী কোন জবাব দেয় না। তার চলার ভঙ্গিতে বিপন্ন মানুষের ঊর্ধ্বশ্বাস গতি আছে। ঘুমন্ত মানুষগুলোকে ডিঙিয়ে সে হনহন করে চলতে থাকে। পারু অনিচ্ছার মধ্যে তাকে অনুসরণ করে। আর বার বার তার মনে হয়, এই হৈমন্তী—ডালিমের কাছ থেকে দূরে চলে আসা হৈমন্তী কী স্বপ্নের, না বাস্তবের? আবার কী এক লোভ জেগে ওঠে মনে। হাত বাড়িয়ে ছুঁতে ইচ্ছে করে ওকে। বলতে ইচ্ছে করে, ক্ষমা কর ... ক্ষমা কর ... ক্ষমা কর। আর হাঁটু ভাঁজ করে স্মৃতির দিকে করজোড়ে প্রার্থনা করতে ইচ্ছে করে।

রাস্তায় নেমে পারু ডাকে—হৈমন্তী!

—উঁ!

—তুমি যদি ভেবে থাক গয়নাগুলো আছে না নেই, তাই দেখার জন্যে ফিরে যাচ্ছি—তাহলে খুব ভুল করবে কিন্তু। ডালিম ওগুলো বেচে দিয়ে থাকলেও আমি ওকে ক্ষমা করব।

হৈমন্তী বিদ্রূপের ভঙ্গিতে বলে—জানি। বন্ধুর জন্যে তুমি সব পার। কত স্যাক্রিফাইস করেছ, সে কি জানি না!

—জান বুঝি?

—কেন জানব না? একদিন বন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়েই তো চলে গিয়েছিলে।

পারু একটু হাসে। —হ্যাঁ। এমন কি নিজের স্ত্রীকে ফেলেই।

—ও কথা থাক।

—থাকবে কেন হৈমন্তী! এভাবে যখন সুযোগ দিয়েছ, আমি তার সদ্ব্যবহার করব না, তা কি হয়?

হৈমন্তী ঝাঁঝাল স্বরে বলে—সে সাহস তোমার আছে?

—আছে।

—শুনে ভাল লাগল। কিন্তু বিশ্বাস করব না।

—কেন বিশ্বাস করবে না?

হৈমন্তী ঘুরে দাঁড়ায়। বলে—তোমার এতটুকু সাহস থাকলে আমাকে ডিভোর্স করতে।

পারু একটু দমে যায়। নিস্তেজ স্বরে বলে—তুমিও ডিভোর্স চাইতে পারতে আদালতে! চাওনি কেন?

—তোমার বন্ধুকে জিজ্ঞেস কর।

—তোমার কথা ওকে জিজ্ঞেস করতে যাব কেন।

হৈমন্তী কিছুক্ষণ চুপচাপ হেঁটে যায়। তারপর বলে—তোমার বন্ধু আমাকে নিষেধ করেছিল। এতে নাকি তোমার নামে অনেক মিথ্যা বদনাম দাঁড় করাতে হবে।

পারু শুকনো হাসে। তারপর বলে—কী আসে যায় এসব মামুলি ব্যাপারে? আমি তো তোমাকে বস্তুত ডিভোর্স করেই চলে গিয়েছিলুম। আইন-আদালতের কোন মানে হয় না। মানুষের মন—তার ইচ্ছে-অনিচ্ছেটাই আসল কথা। তাছাড়া তুমি তো জানই আমার ওসব কোন সংস্কারের বালাই নেই। আমি হাড়ে হাড়ে জড়বাদী। পার্টি ছেড়েছিলুম, কিন্তু ফিলসফিটা ছাড়িনি। এবং সম্ভবত তোমারও তেমন কোন সংস্কার নেই। থাকলে ...

কথা শেষ করে না পারু। হৈমন্তী যেতে যেতে একবার ঘুরে ওকে দেখে নেয়। তারপর বড় একটা নিঃশ্বাস মিশিয়ে বলে—আমিও ওসব মানি নে। সবটাই ভণ্ডামি।

পারু না বলে পারে না—তাহলে সিঁদুর পর যে?

—হয়ত অভ্যাস। হয়ত সৌন্দর্যের খাতিরে। তাছাড়া—তাছাড়া তোমার বন্ধুর তাগিদেও।

—হ্যাঁ, জানি তুমি ওকে কী ভালবাস!

—ভীষণ বাসি।

—আমার তাতে বিন্দুমাত্র ঈর্ষা হচ্ছে না হৈমন্তী।

—অবাক করলে পারু। তোমার ঈর্ষার কথা কেন ভাবতে যাব?

পারু হঠাৎ ফুঁসে ওঠে। —এসব কথা থাক। মুখ তেতো হয়ে যায় এতে। ...বলে সে ফোলিও ব্যাগটা বগলে চেপে রেখে সিগারেট বের করে একটু থেমে বাতাস বাঁচিয়ে এক হাতেই দেশলাই জ্বেলে ধরিয়ে নেয়। ততক্ষণে হৈমন্তী কয়েক হাত এগিয়ে গেছে।

শেষরাতের নির্জন রাস্তায় আর বর্ণহীন জ্যোৎস্নায় হৈমন্তী আবার অনেকটা দূরে সরে গেছে যেন। অগত্যা পারু সেই ঝাল নিজের ওপর ঝাড়ে। —কী, খালি সারাটা রাত আজ ঝগড়াই করে যাচ্ছি! কোন মানে হয় না।

ডাইনে পীরতলা, বাঁয়ে সেই কাঠের সাঁকো। হৈমন্তী এতক্ষণে পিছু ফিরে পারু আসছে নাকি হয়ত তাই দেখে নেয়। পারু এখনও অনেকটা দূরে। পরস্পরের কাছে পরস্পর অস্পষ্ট, প্রতিভাসের মত। তারপর হৈমন্তী বাঁয়ে ঘুরে কাঠের সাঁকোয় ওঠে এবং দাঁড়ায়। চারপাশে গাছপালায় এতক্ষণে একটা দুটো করে পাখিদের ঘুম ভেঙে যাচ্ছে। কুয়াশাও ঘন হয়েছে। রাস্তার বাতিগুলো আরও ম্রিয়মান হয়ে গেছে। গুরুতর নিস্তব্ধতার ওপর ওইসব পাখি নখের আঁচড় কাটছে এবং তাদেরও কী অসহায় লাগে এখন!

কয়েকটা লম্বা আর জোরাল পদক্ষেপে পারু এসে পৌঁছয়। যেন আচমকা ভূতের ভয়ে তাড়া খেয়ে মানুষের সঙ্গ নিল।

হৈমন্তী আবার হাঁটতে থাকে। মির্জাবাড়ির ধ্বংসস্তূপের মধ্য দিয়ে আঁকাবাঁকা সরু রাস্তায় তার দ্রুত মিলিয়ে যাওয়া দেখে পারুর অস্বস্তি হয়। সে স্বপ্নের মধ্যে ফিরে আসছে না তো? স্টেশনে প্ল্যাটফর্মের বেঞ্চে শুয়ে হয়ত এখনও হৈমন্তী-ডালিম পলাশপুরে বৃত্তের মধ্যে হন্যে হয়ে ঘুরছে।

বাস্তবতা পরখ করার জন্যে সে হাতের আধপোড়া জ্বলন্ত সিগারেটটায় জোরে টান দিল। গলা জ্বালা করে কাশি এল। খুব শব্দ করে সে কাশল। তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে এগোল। ...

উঠোনে দাঁড়িয়ে পারু ডাকবে ভাবছিল। তার আগেই ওপরের বারান্দায় হ্যারিকেনের আলো এবং হৈমন্তীকে দেখতে পায় সে। চাপা গলায় হৈমন্তী বলে—এস। আলো দেখাচ্ছি সিঁড়িতে।

এখন আর আলোর দরকার ছিল না। উঠোনে ভোরের ফরসা রঙ ফুটেছে। ওপরের বারান্দার অন্ধকার আর অন্ধকার নয়, বরং ওই আলোটাই অন্ধকারের বেশি মনে হচ্ছে। হৈমন্তী এখন স্পষ্ট। অবশ্য সিঁড়িটা ভাঙাচোরা এবং তার কাছেই রাতের অন্ধকার একটুখানি আটকে আছে। উঠতে উঠতে পারুর মনে হয় একটা পুরনো বনেদি বাড়ির মধ্যে দুজনে কী সাংঘাতিক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত! ওপরের ঘরে ডালিম গৃহকর্তার মত ঘুমিয়ে আছে। আর এইভাবে একটা ডাকাতি চলছে যেন। পারু তাই ইচ্ছে করেই একটু কাশে। কিন্তু হৈমন্তী ফিসফিস করে সিঁড়ির ওপর থেকে কী যেন বলে! হয়ত সতর্কতার সংকেত করে সে।

পারু মেনে নেয়। সত্যি তো, ডালিম জেগে গেলে তাকে যেতে দেবে না।

ওপরের প্রথম ঘরটায়, যে ঘরে তখন হৈমন্তী ঢুকে দরজা বন্ধ করে ছিল, পারু ঢুকে পড়ে—চোর যে ভাবে ঢোকে। পারু ঘরের ভিতরটা দ্রুত চোখ বুলিয়ে দেখে নেয়। একটু অবাকও হয়। কোনার দিকে ঠিক পাশের ঘরের মতই একটা মস্ত সেকেলে খাট রয়েছে। তাতে যে বিছানা পাতা আছে, দেখেই বোঝা যায়, সাময়িক নয়। তার মানে আজ পারু এসেছিল বলেই হৈমন্তী এ ঘরে এ বিছানা পেতে শুতে আসেনি। এবং সেই বিছানায় বিকেলে দেখা সেই বাচ্চা মেয়েটি একপাশে কুঁকড়ে শুয়ে আছে।

হৈমন্তী যে এ ঘরেই থাকে, তার অনেক প্রমাণ পারুর চোখে পড়ছিল। পারু বিছানার মেয়েটির দিকে তাকিয়ে চাপা স্বরে বলে—ও কি তোমার কাছেই থাকে নাকি?

হৈমন্তী আলোটা খাটের ধারে মেঝেয় নামিয়ে বলে—হুঁ। তারপর হাঁটু মেঝেয় রেখে গুঁড়ি মেরে খাটের তলায় হাত বাড়ায়। অস্পষ্টভাবে কিছু বলে।

পারু বলে—উঁ?

হৈমন্তী জবাব দেয় না। সে খুব সাবধানে একটা বাক্স টানছে। ঘষা খেয়ে শব্দ হলেই থামছে। পারুর কিছুতেই মনে পড়ছে না বাক্স কটা ছিল, কী রঙের বাক্স এবং কত বড়, কিংবা আরও কী সব ছিল। না—তেমন বেশি কিছু ছিল না। বাবা-মায়ের মৃত্যুর পর অনেক জিনিস সে পার্টির দুঃস্থ কমরেডদের বিলিয়ে দিয়েছিল। মায়ের শাড়িগুলো পর্যন্ত। বাবার ওভারকোটটা কাকে যেন দিয়েছিল? হুঁ, অনুকূল বাউরিকে। কারণ সে মাঠে শীতের রাতে ফসল পাহারা দিয়ে বেড়াত। বলেছিল, বড্ড শীত লাগে বাবা। বুড়োমানুষ! ওভারকোটটা গোড়ালি অবধি হয়েছিল অনুকূলের। সেই নিয়ে ওকে লোকেরা কী জ্বালাতন না করত!

পারুর মুহূর্তে-মুহূর্তে মনে পড়তে থাকে একটা ভরাট সাজান সংসার কীভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দিয়ে সে নিজেকে যথার্থ আদর্শবাদী কমিউনিস্ট ভেবে গর্ববোধ করত। কাঁসা-পেতলের জিনিসগুলো বেচে বিড়ি-শ্রমিকদের ধর্মঘটের সময় সাহায্য করেছিল। টেবিল চেয়ার ওষুধের আলমারি—সব আসবাব দিনে দিনে ওভাবেই একটার পর একটা ঘুচিয়ে দিয়েছিল। কী বিশাল করে তুলেছিল তখন মনের পরিধি! তুলনায় বসলে এখন নিজের সংকীর্ণতা ও স্বার্থপরতা বড় ভয়ঙ্কর লাগে। কার্ল মার্কসের সিলেক্টেড ওয়ার্কসের প্রথম পাতায় লেখা দেখেছিল : 'বিশ্বের শ্রমিকরা এক হও!' তাকে রোমাঞ্চিত করেছিল, দুলিয়ে দিয়েছিল ওই বাক্যটি। এখন এ মুহূর্তে যদি কেউ পাতাটা তার সামনে খুলে ধরে, সে আর পড়তেই পারবে না। হরফ আর ভাষার প্রত্যক্ষ যোগসূত্র কবে নিজেই গুঁড়ো করে সরে গেছে অন্যখানে—যেখানে বিশ্ব, শ্রমিক, এক হওয়া, মানুষ এইসব শব্দ শৃঙ্খলাহীন পারম্পর্যভ্রষ্ট আঁকজোক মাত্র।

—দুটো বাক্স রেখে গিয়েছিলে। মনে আছে তো?

হৈমন্তী ফিসফিসিয়ে ওঠে এবং পারু চমকায়। বাক্স? হৈমন্তী যেভাবে দুটো প্রকাণ্ড বাক্স বের করেছে, পারু পলকে বুঝতে পারে তার আসার পরই কাজটা অনেকখানি এগিয়ে রাখা হয়েছিল। হুঁ, হৈমন্তী সাংসারিক ব্যাপারে মোটামুটি পরিপাটি। হাতের কাছে কখন কী যুগিয়ে রাখা দরকার সে জানে। হায় রে বরাত হৈমন্তীর! সে পারু এবং ডালিমের মত বাউণ্ডুলে বিবেকহীন নীতিহীন লোকের পাল্লায় পড়ে নিজের জীবনটা নষ্ট করে দিল! একেই কি বলে, 'অতি বড় ঘরণী না পায় ঘর?'

—দুটো ছিল না?

হৈমন্তী আবার বলে। পারু বাক্স দুটোর দিকে তাকায়। কিন্তু অন্য কথা এসে যায় তার মুখে। —তুমি এ ঘরে থাক? সে বলে। কিন্তু হৈমন্তীর মুখের দিকে দৃষ্টি ঘোরায় না।

তার কথার জবাব হৈমন্তী দেয় না। সে একে একে দুটো তালা টেনে পরখ করে। তারপর বলে—দেখ তো এ তালা দুটো তোমার নাকি?

বলার সময় সে পারুর দিকে মুখ তুললে পারু একটু অবাক হয়। এ কি রাতজাগা ক্লান্ত কোটরগত চোখ, নাকি কিসের দীর্ণ চাপা চিৎকার ওই চোখের দৃষ্টিতে জ্বলজ্বল করে উঠেছে? পারু বলে—কেন?

—দুটো তালাই ... হৈমন্তী ঢোঁক গিলে একটু সময় নিয়ে বলে ফের—দুটো তালাই মনে হচ্ছে নতুন! অত লক্ষ্য করিনি তখন!

হৈমন্তী মেঝেয় বসে পড়ে। ওকে সান্ত্বনা দেবার ভঙ্গিতে বলে—তাতে কী হয়েছে! ডালিম হয়ত ভেবেছিল, পুরনো মরচে ধরা সেকেলে তালার চেয়ে ...

হৈমন্তী তাকে বাধা দিয়ে বলে—কিন্তু এ তো আমাকেই চোর সাজান! বলেই সে হঠাৎ প্রচণ্ডভাবে বদলে যায়। তার মুখ দাউ-দাউ জ্বলে। শ্বাসপ্রশ্বাস আটকে যায় বুঝি। নাসারন্ধ্র স্ফীত হয়ে কাঁপে। সে তক্ষুনি উঠে দাঁড়ায়। পারু তার পায়ের কাছে কাপড় খামচে ধরে আটকাতে চায়। কিন্তু পারে না। হৈমন্তী ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বলে যায়—এই শেষ বোঝাপড়া!

তার মানে? এ যেন মগ্নচৈতন্যের ভাষা—স্বপ্নের মধ্যে বলে ওঠা। কার সঙ্গে বোঝাপড়া, কিসের বোঝাপড়া পারু জানে না। সে কান পেতে থাকে, পাশের ঘরে কী ঘটতে পারে ভেবেই। আহা, খামকা এই হুলস্থুলের কোন মানে হয়? বেচারা ডালিমকে ঘুম থেকে উঠিয়ে হয়ত চেঁচামেচি করবে হৈমন্তী। কী ফল হবে তাতে? সত্যি বলতে কি, পুরনো জীবন-সংক্রান্ত কোন কিছুতে পারুর এতটুকু টান নেই। কোন মায়া নেই। পস্তানি নেই। হৈমন্তীর এটা বুঝতে আজও দেরি হবে কেন?

নাকি এভাবে এতদিন পরে এসে হাজির হয়েছে বলে হৈমন্তী ভেবেছে, পুরনো অধিকারের দাবি পারুর পকেটে লুকনো রয়েছে? এ বয়সেও হৈমন্তী কেন তা ভাববে? কী আছে ভেবেছে নিজের—যাতে পারুর মত মানুষকে ভোলান যায়?

পাশের ঘরে আবছা শব্দ আর ডাকাডাকি চলছে কানে এল। তখন পারু ওঠে। আস্তে আস্তে বেরিয়ে যায়। তার স্যুটকেস আর ফোলিও ব্যাগটা মেঝেয় পড়ে থাকে।

প্রথমে সে বারান্দায় যায়। এ ঘরের হ্যারিকেনটা কি নিভে গেছে। অস্পষ্ট হয়ে আছে ভেতরটা। অথচ বাইরে ভোরের আলো ফুটেছে। পাখপাখালির চেঁচামেচি তুমুল হয়ে উঠছে। তারপর দূরে সম্ভবত চালকলে ভোঁ বেজে উঠল। পলাশপুরের ঘুম ভাঙছে। স্টেশন রোডের দিকে মোটরগাড়ির শব্দ শোনা যাচ্ছে। এতক্ষণ পরে রেল লাইনের ইঞ্জিনের হুইশিলও বাজল। যা কিছু গ্রাস করে নিয়েছিল রাতের প্রকৃতি, এখন সব উগরে দিচ্ছে একে একে। কী এক অদ্ভুত রাত না কেটে গেল!

হৈমন্তী ডালিমের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে কি? পারুর তাই মনে হয়। খাটের উপর ঝুঁকে হৈমন্তী অস্পষ্ট স্বরে কী বলছে আর ওকে টানছে সম্ভবত। পারু ঘরে ঢুকে বলে—আঃ, কী হচ্ছে হৈমন্তী!

হৈমন্তী অস্ফুট স্বরে চেঁচিয়ে ওঠে—জানোয়ার। নির্লজ্জ! ঘুমের ভান করে পড়ে আছ এখনও? আজ আমার শেষ বোঝাপড়া জান না? ওঠ, ওঠ বলছি। তারপর সে হিংস্র হাতে খাটের অন্যপ্রান্ত থেকে উবুড় হয়ে শুয়ে থাকা ডালিমের একটা পা হিড়হিড় করে টানে। কিন্তু ডালিমকে এতটুকু নড়াতে পারে না।

ডালিমের মুখ একপাশে কাত হয়ে আছে। বালিশটা বুকের তলায়। একটা হাত খাটের বাজুতে—বাজুটা আঁকড়ে ধরে আছে যেন। অন্য হাত দুমড়ে বুকের তলায়। তার মাথার ওপাশে জানলার ওপরদিকটা খোলা। তাই আলো এসে পড়েছে কিছু অংশে। পারু রাগ করে বলে—ভীষণ বাড়াবাড়ি করছ হৈমন্তী!

হৈমন্তী ঝাঁঝাল স্বরে বলে—এ তুমি বুঝবে না।

—বুঝিয়ে বলারও কিছু নেই। তোমার চেয়ে আমি বেশি চিনি ওকে।

—কেন ও পরের বাক্স ভাঙবে? ওকে তো এতটুকু অভাব বুঝতে দিইনি!

...হৈমন্তী মুখ নিচু করে। তার কথায় কান্নার আভাস। সে ফের বলে—নিরুর হাত দিয়েই এসব করেছে। আসুক বাঁদরটা!

—কে নিরু?

—তুমি চিনবে না। ওর এক চেলা।

পারুর মনে পড়ল, কাল বিকেলে এ ঘরে ঢোকবার সময় ডালিম নিরুকে ডাকাডাকি করছিল। পারু একটু হাসে এবার। —কিন্তু এ জন্যে বাড়াবাড়ি করার কারণ নেই। এমনও তো হতে পারে, গয়নার কথা আমি বানিয়েই বলছি।

হৈমন্তী জোরে মাথা দোলায়। —না। আমার মনে পড়ছে, মাসখানেক আগে নিরুর সঙ্গে ও স্যাঁকরা-স্যাঁকরা করছিল। তারপর থেকে দেখতুম মাঝেমাঝে নিরু একটা করে বিলিতি মদের বোতল এনে দিচ্ছে। এখন সব বুঝতে পারছি।

পারু ফের হেসে উড়িয়ে দিতে চায়। —বেশ তো! মাতাল ছেলেরা মায়ের গয়নাগাটি বেচে এমন করেই থাকে। তুমি তো জান, আমার মা ডালিমেরও মা ছিলেন। অতএব, ওসব ভুলে যাও। বরং এক কাজ কর। যখন ফিরেই এলুম এবং একটা বিরাট রাত এভাবে কাটান গেল, এখন চা খাইয়ে দাও লক্ষ্মী মেয়ের মত। কেমন? আর হৈমন্তী, আবার বলছি, আমার মনে এতটুকু মোহ নেই—কোন গ্লানি

নেই। থাকবে কেন বল তো? আমি বরাবর সংস্কারজয়ী মানুষ। এ আমার পৈতৃক দান। এবং তুমি তো এও জান, মার্কসবাদ একসময় আমাকে বিস্তর ছেঁদো ধারণা থেকে মুক্তি দিয়েছিল। আমি ...

বক্তৃতা হয়ে যাচ্ছে বুঝতে পেরে পারু থামে। ফের বলে—যাক্‌গে। মাথার ভেতরটা খালি লাগছে। কথা বলছি, কিন্তু বুক কাঁপছে। আমি খুব ক্লান্ত হৈমন্তী। তুমি দয়া করে এক কাপ চা খাইয়ে দাও। দেবে না?

হৈমন্তী তবু কয়েক মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। তার এই আলুথালু চুল এবং বিশৃঙ্খল বেশ, তার দুই চোখ কোটরগত, কপালের ভাঁজ, আর অগোচরে বুকের একটা পাশ থেকে শাড়ি সরে গিয়ে খুবই ফিকে সব্‌জে রঙের ব্লাউজ শিথিল একটি স্তনের আভাস তুলে ধরেছে, পারুকে মনে পড়িয়ে দিচ্ছে হৈমন্তীর সেই চেনা শরীরটাকেই। এবং পারু টের পেয়েই দৃষ্টি সরায়। ফের বলে—প্লিজ হৈমন্তী!

নারীর কোন গভীরতর ইন্দ্রিয় আছে, যাতে পুরুষের শরীরখোঁজা দৃষ্টি কীভাবে টের পেয়ে যায়। হৈমন্তী শাড়ি টেনে বুক ঢেকে দ্রুত বেরিয়ে যায়।

পারু বড় একটা নিঃশ্বাস ফেলে উত্তরের জানলার ধারে সেই চেয়ারটায় বসে। শরীরে আর এতটুকু জোর নেই যেন। মাথা ঘুরছে। কী যে একটা বিশ্রী রাত কেটে গেল! হুঁ, হৈমন্তীর সঙ্গে তার পরিচয়ের শুরু থেকে বরাবর তাই গেছে। হৈমন্তীর কাছ থেকে পালিয়ে যাওয়ার পরও নিষ্কৃতি পেতে তিনটে বছর লেগেছিল। তারপর সব সহজ হয়ে উঠেছিল ক্রমশ। আঃ, ঠিক এমনি করে কত রাত সে হৈমন্তীর সঙ্গে ঝগড়া করে পুইয়ে দিয়েছে! 'ফ্রেন্ডস স্টেশনার্সে'র ঘুপটি ঘরে পালিয়ে গিয়েও তো বাঁচোয়া ছিল না। ঝগড়া চলত মনে মনে। স্টেশন বাজারের প্রতিটি ভোরে কী সব শব্দ ক্রমশ শোনা যাবে, মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল তার। ফেরার পথে দোকানটা একবার দেখে যাওয়া উচিত। শুনেছিল, ঘর ভেঙে নন্দীরা বিশাল ডিপার্টমেন্টাল স্টোর্স করেছে। বাজারটা নাকি চেনাই যাবে না আর, এত বদলেছে।

ঘরে এখন আরও আলো। পারু খাটের দিকে তাকায়। ডালিম বরাবর ঘুমকাতুরে ছিল। কুম্ভকর্ণের তাকলাগান ঘুম। চিমটি কেটে কাতুকুতু দিয়ে অনেক চেষ্টার পর তার ঘুম ভাঙান যেত। হরনাথ ওকে মর্নিং স্কুলের সময় অদ্ভুত কায়দায় ওঠাতেন। দেশলাই কাঠি জ্বেলে পুড়িয়ে কালো হবার পর স্ফুলিঙ্গ থাকতে থাকতে সেটা ওর পায়ের আঙুলের ফাঁকে আটকে দিতেন। এবার স্ফুলিঙ্গের উল্টো গতি। পোড়া কাঠি ফের জ্বলতে জ্বলতে নামত এবং মোক্ষম ছ্যাঁকা খেয়ে ডালিম লাফ দিতে বসত। হরনাথ হা হা করে হাসতেন। কিন্তু স্কুলে গিয়ে ক্লাসে বসে-বসেই ফের একদফা ঘুমিয়ে নিত ডালিম। মনে পড়ছে, হৈমন্তীর বাবা মধুবাবু ওর চুল খামচে মুণ্ডু সোজা করছেন এবং ছেড়ে দিলেই ডালিমের মুণ্ডু আবার ডেস্কে হেলে পড়ছে। ক্লাসসুদ্ধ হাসছে মুখ টিপে। মধুবাবু ওকে দু-চোখে দেখতে পারতেন না। মাথা জোরে ঠুকে দিয়ে বিকট গর্জন করতেন। এত জোরে যে পাশের ক্লাসগুলোর সব শব্দ থেমে যেত কিছুক্ষণ। একদিন হেডমাস্টার মশাইও অফিস থেকে দৌড়ে এসেছিলেন। ...

হুঁ, ডালিমের এটা বরাবর অভ্যাস। ওবাড়িতে থাকার সময় হৈমন্তীকেও ডালিমের চা নিয়ে ওর মাথার কাছে সাধাসাধি করতে দেখেছে। রাগ হত পারুর। কিন্তু হৈমন্তী কি তাকে কোনদিনও গ্রাহ্য করত? পারু যদি বলত—আহা, ঘুমক না! উঠে চা খাবে'খন। হৈমন্তী বলত—আমার আর তো কোন কাজ নেই! রান্না নামিয়ে আবার কেটলি চাপাব হাজারবার।

—তাহলে এক কাজ কর। ফ্লাস্কে রেখে দাও।

—ফ্লাস্কের চা খায় নাকি তোমার ফ্রেন্ড? সেদিন উবুড় করে ফেলে দিল, দেখলে না? চা নাকি কালো হয়ে যায়!

যায়। পারু দেখেছে, অতএব কী আর বলবে? বিশেষ করে ডালিমকে সেও তো কম পাত্তা দিত না! ডালিম না এলে পলাশপুরে টিকতে পারত না পারু। ডালিমকে পেয়ে তার সাহস বেড়ে গিয়েছিল। জানত তার ব্যাপার-স্যাপার নিয়ে লোকেরা যতই দূরে দূরে কটূক্তি করুক, তার ক্ষতি করার ক্ষমতা আর হবে না। ডালিম ছিল তার রক্ষাকর্তা।

এবং ঠিক একই কারণে হৈমন্তীর অনেক আচরণ মেনে নিত পারু। ডালিমের প্রতি তার উৎসাহ, আর সহানুভূতি আর আগ্রহকে মনে মনে সইতে না পারলেও বস্তুত সইতে হত।

কিন্তু তাই বলে ডালিমের বিরুদ্ধে কেন যেন কোন অভিযোগই দাঁড় করাতে পারেনি পারু। তার কোন দোষ চোখে পড়ত না পারুর। বরং কিছুক্ষণ ডালিমকে না দেখতে পেলে পারুর খুব খারাপ লাগত। নিঃসঙ্গ মনে হত নিজেকে। কোথাও ডালিমের গলা শুনতে পেলেই সে খুশি হত।

এ কি তার মনের কোন গূঢ় আতঙ্কেরই প্রকাশ, ডালিম সম্পর্কে? নাকি নিছক অভ্যাস? এই যে এতকাল পরে ডালিমের মুখোমুখি হয়ে তার এতটুকু খারাপ লাগেনি, বরং আবেগময় একটা বিহ্বলতা এসেছিল—এবং অন্তত দু-একটা দিন তার কাছে কাটাতেও খারাপ লাগবে না—তা কি সেই ভয়, নাকি অভ্যাস, নাকি কৃতজ্ঞতাবোধ?

তার চেয়ে বড় কথা হৈমন্তী এবং ডালিমের সম্পর্ক। এই সম্পর্ক পারু মেনে নিয়েছিল। মেনে নিয়েই ফিরে এসেছে। কোন ক্ষোভ নেই। কোন অভিযোগ নেই—একটু-আধটু অস্বস্তি আর জ্বালা থাকতে পারে বড়জোর। সেটা নিজেরই মামুলি ব্যাপার নিয়ে—পুরুষত্ব-টুরুষত্ব যাকে বলে, তাই নিয়েই। তার বেশি কিছু নয়।

পারু নড়ে বসে। থাক্, বৃথা বিশ্লেষণ এবং অনুসন্ধানের চেষ্টা। এসবের জন্যে সে এখানে ফিরে আসেনি। হয়ত এসেছে নিছক কৌতূহলেই। খুনি যেমন করে হত্যাকাণ্ডের জায়গায় ফিরে আসে—যে নিয়মে তাকে আসতেই হয়, সেই রকম আসা।

কিংবা এসেছে নিছক পৈতৃক বাস্তুভিটা দেখতে আসার মত—তখন হৈমন্তীর বন্ধ দরজার সামনে ঠিক যে কথাগুলো মনে মনে বলেছিল, এখন আসছে আর আসছে। পারু চেঁচিয়ে বলে—ডালিম! আমি পারু। ...

...ডালিম গলির ওমাথা থেকে বেরিয়ে তার দিকে এগিয়ে আসছে। তার মুখে কেমন ক্রূর হাসি। আর হাতে ওটা কী মস্ত একটা ছোরা। পারু পালাতে চেষ্টা করে। কিন্তু কী ভিড়, গিজগিজ করছে লোকজন! পারু চেঁচিয়ে বলতে চেষ্টা করে—বাঁচাও! ও আমাকে খুন করবে। লোকেরা নির্বিকার হয়ে রাস্তা হাঁটছে—কিংবা পারুকে ঘিরে আছে। ডালিম এগিয়ে আসছে আর আসছে। পারু চেঁচিয়ে বলে—ডালিম! আমি পারু। ...

—চা।

পারু তাকায়। কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকে নিষ্পলক চোখে। হৈমন্তী চায়ের কাপ প্লেট নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ঘরে এখন প্রচুর আলো। হুঁ, সে স্বপ্ন দেখছিল। চেয়ারে এলিয়ে পড়া শরীরকে টেনে তোলে সে। একটু হাসে। তারপর হাত বাড়িয়ে চায়ের কাপ প্লেট নেয়। এবং সেই সময় তার মনে হয়, হৈমন্তী যেন তার কাঁধে হাতও রেখেছিল—একটু ঠেলেছিল। কাঁধের সেই জায়গাটা কয়েক সেকেন্ড আগের অনুভূতি আরও কয়েক সেকেন্ড বয়ে নিয়ে এসেছে মস্তিষ্কের দিকে। পারু কাপে চুমুক দিয়ে খুশি হয়ে বলে—অসাধারণ! কিন্তু ওকে এবার হয়ত জাগান যায়। একা চা খাওয়া উচিত হচ্ছে কি?

হৈমন্তী ততক্ষণে ঘুরে একবার ডালিমকে দেখে নিয়েছে। বলে—যখন উঠবে, খাবে। তুমি চা খেয়ে আমার ঘরে এস। তোমার বাক্স দুটো খোলা দরকার।

—থাক না। পরে হবে। চা খেয়ে আমি কিছুক্ষণ ঘুমতে চাই।

—বেশ তো। পরে ঘুমিও। আগে দেখে নেবে জিনিসগুলো। হয়ত তালা ভাঙতে হবে। আমি একটা হাতুড়ি খুঁজে আনছি।

হৈমন্তী ঘুরে পা বাড়ালে পারু ডাকে—শোন।

—বল। স্থির চোখে তাকায় হৈমন্তী। নির্বিকার মুখ। ঠোঁটের কোণে পুরনো দৃঢ়তার ভাঁজটা আরও তীক্ষ্ণ হয়েছে যৌবনের মধ্যসীমা ছুঁয়ে।

পারু বলে—একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছিলুম, জান! ভাবা যায় না। কিন্তু অবাক লাগছে, এমন স্বপ্ন তো এতকাল একটিবারও দেখিনি। স্বপ্নটা ...

—পরে বোল। আসছি।

—না, শুনে যাও। পারু দ্রুত বলে। ...একটা গলির মধ্যে ব্যাপারটা ঘটেছে। পলাশপুরে নিশ্চয় নয়। এমন গলি তো এখানে ছিল না। তো দেখছি, ডালিম ...হাসতে হাসতে পারু বলে—ডালিম করেছে কি হাতে একটা ইয়া বড় ছোরা নিয়ে আমাকে তাড়া করেছে। আমি ভীষণ কান্নাকাটি করছি। কী অদ্ভুত ব্যাপার দেখেছ? এই চেয়ারে বসে কখন ঘুমিয়ে গেছি—আর একটা মারাত্মক স্বপ্ন!

শেষ বাক্য বলার আগেই হৈমন্তী চলে যায়। বাইরে তার গলা শোনা যায় একটু পরে। সেই মেয়েটি ঘুম থেকে উঠেছে এতক্ষণে। তাকেই কিছু বলছে। পারু হাসিমুখে চা শেষ করে। কাপ প্লেটটা মেঝেয় একপাশে সাবধানে রাখে। তারপর পা দুটো লম্বা করে ছড়িয়ে সিগারেট বের করে। ধরিয়ে টানতে থাকে। ডালিমের দিকে তাকায়। কী ঘুমতে পারে এ বয়সেও! একইভাবে উবুড় হয়ে পড়ে আছে। বাইরে এখন প্রথম রোদের হালকা গোলাপি ছটা খেলছে।

একটু পরে হৈমন্তী বারান্দা থেকে তাকে ডাকে—এস। হাতুড়ি পেয়েছি।

—ভাঙার কী দরকার? পারু অনিচ্ছাসত্ত্বেও ওঠে। ফের বলে—তালা দুটো নতুন হলে চাবি ডালিমের কাছেই থাকার কথা। ও উঠুক না। তাছাড়া তালা খামোকা ভেঙে ফেলে আবার তো আমাকে পয়সা খরচ করে কিনতে হবে!

হৈমন্তী এ কথায় একটু দ্বিধায় পড়েছে। সে ঠোঁট কামড়ে একপলক ভেবে বলে—ও কি সেটা স্বীকার করবে?

পারু হেসে বলে—স্বীকার না করে তো তখন ভাঙব বরং। এত তাড়াহুড়োর কিছু নেই। ওর ঘুম ভাঙুক।

হৈমন্তী মাথা নেড়ে বলে—না। তুমি দেখ, ওকে ওঠাতে পার নাকি!

—বুঝলুম, তুমি দ্রুত আমাকে বিদায় করতে চাইছ, এই তো? পারু হাসিমুখে বলে। আমিও তাতে ভীষণ রাজি। তবে আমার ফ্রেন্ড আমাকে সহজে ছাড়বে না কিন্তু। বিশেষ করে তার সঙ্গে আমার কথা বলা এখনও শেষ হয়নি। তোমার বরাতে এখনও কষ্টভোগ আছে হৈমন্তী।

বলে পারু অবিকল ছেলেবেলার ভঙ্গিতে ঘুমন্ত ডালিমের দিকে ঘোরে। মুখটেপা হাসি। পকেট থেকে দেশলাই বের করে হৈমন্তীর দিকে চোখ টিপে ঠোঁটে আঙুল রাখে। দেশলাই জ্বেলে কাঠিটা অনেকখানি পোড়ায়। তারপর হরনাথের মত স্ফুলিঙ্গ থাকতে থাকতে পোড়া কাঠিটা ওর পায়ের আঙুলের ফাঁকে আটকে দেয়। পাজামা অনেকটা সরে ডালিমের অক্ষত ওই পায়ের রোমশ ডিমটা দেখা যাচ্ছে। দেহের ওপর অংশে তখনও অস্পষ্ট অন্ধকারের রঙ ছড়িয়ে আছে।

স্ফুলিঙ্গের দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করে পারু। ঠোঁটের কোনায় দুষ্টুমির হাসি।

বারান্দায় হৈমন্তী স্থির দাঁড়িয়ে আছে। তেমনি নির্বিকার মুখ।

স্ফুলিঙ্গ বড় ধীরে নামছে। পারু দুটো হাত দু পাশে তুলে ডানা মেলার ভঙ্গিতে তুলে রেখেছে। ছ্যাঁকা লেগে ডালিম ছেলেবেলার মতই লাফিয়ে উঠলে সে হাতদুটো তুলে ধেই ধেই করে নাচতে থাকবে, এই ইচ্ছে।

স্ফুলিঙ্গ পোড়া কাঠির শেষ সীমায় পৌঁছল। তারপর ফুরিয়ে গেল। কিন্তু কিছু ঘটল না।

পারু হতভম্ব হয়ে বলে—অ্যাঁ! তারপর হো হো করে হেসে ওঠে। —শালার গণ্ডারের চামড়া হয়ে গেছে! অ্যাই ডালিম! সে গলা চড়িয়ে ডাকে। ডালিম! ওঠ্ ব্যাটা! এই কথা ছিল নাকি? ঘরে গেস্ট, আর ব্যাটাছেলে ভোঁস ভোঁস করে ঘুমবে? মাল খাওয়া দেখাচ্ছ! মাল কেউ খায় না! ওঠ্ বলছি!

পারু তার পা ধরে টানে। একটুও নড়াতে পারে না। তারপর তার দৃষ্টি যায় ডালিমের মুখের দিকে এবং সে খাটের ওপর একটু ঝুঁকে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে ডালিমের পা তাকে জোরাল শক দেয়। হাত তুলে নিয়ে ফের রাখে। বরফ হয়ে আছে পায়ের ডিমটা।

আর ডালিমের নাকের নিচে রক্তের ছোপ। জমাট বেঁধে আছে একটুখানি রক্ত।

হৈমন্তী বারান্দা থেকে বলে—কী হল?

পারু কোন জবাব না দিয়ে খাটে উঠে যায়। বেশ উঁচু সেকেলে প্রকাণ্ড খাট। ডালিমের বুকের কাছে বসে সে তাকে প্রচণ্ড শক্তিতে চিত করার চেষ্টা করে।

হৈমন্তী এক পা বাড়িয়ে ফের বলে—কী?

পারু জবাব দেয় না। হিংস্রতার যে শক্তি, সেই শক্তি তার মধ্যে ভর করেছে যেন। হাঁটু দুমড়ে বসে অনেক চেষ্টায় ডালিমকে চিত করে শোয়ায়। তারপর দু-হাতে মুখ ঢাকে।

কী বীভৎস দেখাচ্ছে ডালিমের মুখ! চোখের তারা উল্টে রয়েছে। মুখে যন্ত্রণার রেখা আঁকা আছে এখনও। দুই নাকে জমাট রক্ত।

হৈমন্তী ঘরে ঢুকে খাটের ধারে দাঁড়িয়েছে। সেও দেখছে! বুঝতে কি পারছে না? পারু মুখ থেকে হাত সরিয়ে নেয়। তারপর ডালিমের দু চোখের পাতা টেনে বন্ধ করে দেয়। এবং আস্তে আস্তে মাথা কাত করে তার বুকে কান পাতে। তারপর মাথা তুলে ডালিমের ডান হাতের নাড়ি পরখ করে।

হৈমন্তী কাঁপা গলায় এতক্ষণে বল—কী হয়েছে ওর?

পারু জবাব দেয় না। ডালিমের হাতটা সাবধানে নামিয়ে রাখে। তারপর পশ্চিমের জানলার নিচেটা খুলে দেয়। অনেক আলো আসে ঘরে। সে হৈমন্তীর দিকে তাকায়।

আর হৈমন্তীকে এখন অস্বাভাবিক বয়স্কা দেখাচ্ছে। কিন্তু কেন সে কাঁদছে না? কেন এমন নিঃসাড় এখনও? তেমনি নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে আছে ডালিমের দিকে। আশ্চর্য নির্বিকার, পাথরের মুখ! পারুর ইচ্ছে করে, ওকে প্রচণ্ড জোরে চড় মারে।

হৈমন্তী খাটের অন্য পাশ ঘুরে ডালিমের মাথার কাছে আসে এবং হাঁটু দুমড়ে বসে একটা বালিশ ডালিমের মাথার তলায় গুঁজে দেয়। তখন পারু নেমে পড়ে খাট থেকে। তার শরীর জুড়ে ছটফটানি চলেছে।

বাইরে বারান্দায় যায়। রেলিঙের ধারে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা ভাবতে চেষ্টা করে। দক্ষিণে ঘন গাছপালার আড়ালে পলাশপুরের অনেকটা ঢাকা পড়েছে। রোদ কিছুটা উজ্জ্বল এখন। কিন্তু এ সবই সে স্বপ্নের মধ্যে দেখছে। তাই যেন সব কিছু এত দূর আর সম্পর্কহীন, এত স্তব্ধ। ডালিম বলেছিল, লাস্ট সাপার খাচ্ছে। সে কি টের পেয়েছিল পারু এসে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে তার মৃত্যুও কাছে আসছে ক্রমশ? তারপর পারু বুঝতে পারে, তার বুক ঠেলে কী একটা উঠছে। হ্যাঁ, ভীষণ একটা কান্নার চাপ তাকে নাড়া দিচ্ছে। কিন্তু ছি ছি, কান্না আর শোভা পায় না। সে একজন পরিণত মানুষ। অনেক ঝড়-ঝাপটা খেয়েছে। কোনদিনও তো এমন করে কান্না পায়নি। আর কার জন্যে কাঁদবে সে? মহারাজা, না ডালিমের জন্যে? একজন মস্তান গুণ্ডার জন্যে, না বন্ধুর জন্যে? অথচ তার চোখ ফেটে রক্তের ফোঁটা গড়িয়ে পড়ার মত চুপি চুপি কান্না আসে।

হৈমন্তী তার পিছন দিয়ে সিঁড়ির দিকে চলে যাচ্ছে টের পায় সে। তারপর তার চেরা গলার ডাক শোনে—মিলু! মিলু! একবার শোন্ তো। নিরু ঠাকুরপোকে ডেকে আন তো মা! শিগগির। দৌড়ে যা।

পারু বুঝতে পারে, এ সেই হৈমন্তী। বিপদে-আপদে অবিচল, শক্তিমতী মেয়ে। কিন্তু ওর প্রাণভরা ভালবাসার মানুষটির জন্যেও কি এতটুকু চিড় খাচ্ছে না ওর স্থিরতা? শুধু কণ্ঠস্বরের ঈষৎ কাঁপনেই ওর যা কিছু উত্তেজনা প্রকাশ পাচ্ছে। তাহলেও ডালিমের জন্যেই তার এমন করে পলাশপুরে থাকা, এত কাণ্ড—অথচ সেই ডালিমের মৃত্যুতে ওর এমন নির্বিকার আচরণ! পারু গভীর দুঃখে মনে মনে বলে—ধিক হৈমন্তী! তুমি কী? শুনেছি, বেশ্যারাও তাদের বাবুর মৃত্যুতে সিঁদুর মোছে, শাঁখা নোয়া ভাঙে, বিলাপে ভেঙে পড়ে। হৈমন্তী, তোমার মন বলে কোন বস্তু তাহলে নেই। তুমি একটা রোবট। ডালিম তোমাকে চেনেনি। আমি ঠিকই চিনেছিলুম। তাই তুমি কত চিঠি লিখে আমার সাধ্যসাধনা করেছ—আমি সাড়া দিইনি। পাছে তুমি আমার কাছে চলে আসবে, তাই ঠিকানা বদলেছিলাম। দেখছি, তোমাকে ঘৃণা করে কোন ভুল করিনি।

এই সময় সিঁড়ির দিক থেকে হৈমন্তীর আওয়াজ আসে—পারু! তুমি ওঘরে গিয়ে থাক না একটু। আমি এক্ষুনি আসছি।

কণ্ঠস্বর যেন অনেক দূরের এবং ক্রমশ একটু রোগাটে মানুষের মত হয়ে উঠছে। ঈষৎ চিড় খাওয়া—কাঁপন খুব স্পষ্ট হচ্ছে। পারু নাক ঝেড়ে ভাঙা স্বরে বলে—যাচ্ছি। তারপর পাঞ্জাবির পকেট থেকে রুমাল বের করে নাক এবং চোখ মুছে নেয়। আস্তে আস্তে ঘরে গিয়ে ঢোকে।

আর এ ঘর এখন মৃতের। এর মধ্যে মৃত্যুর গন্ধ ছড়ান মনে হয়। খাটে মহারাজা, নাকি ডালিমই চিত হয়ে শুয়ে আছে। নাকের রক্তটা আর নেই। মুছিয়ে দিয়েছে হৈমন্তী। কী বিশাল আর সুন্দর আর বয়স্ক দেখাচ্ছে মৃতদেহটা! একপাশে বেহালা আর ছড় পড়ে আছে। গেলাসটাও কাত হয়ে আছে ওদিকে। হঠাৎ দম আটকে গিয়েছিল হয়ত। হার্টের অসুখের কথা বলছিল হৈমন্তী। তাই স্বাভাবিক।

পারুর এবার গা ছমছম করে। জঙ্গল আর ধ্বংসস্তূপের মধ্যে এই জীর্ণ বাড়িটা ক্রমশ যেন জ্যান্ত হয়ে উঠছে। বাইরে উজ্জ্বল রোদ, অথচ দেওয়ালের ফাটল, ইটের দাঁত বের করে থাকা, আর জানলার ওপরদিকটায় ঘাসের উঁকি দেওয়া, সব মিলিয়ে একটা ভুতুড়ে অস্বস্তিকর ভাব। আর হৈমন্তী তাকে এ ঘরে থাকতে বলে গেল, তার মানে—মৃতের কাছে জীবিতদের পাহারা দেওয়াই নাকি নিয়ম, যতক্ষণ না শেষকৃত্য হয়। এ একটা সংস্কার নিশ্চয়, কিন্তু এ মুহূর্তে সে সংস্কারের কী সত্য আছে। পারু টের পাচ্ছে। আনাচে-কানাচে অশরীরী কারা এসে দাঁড়িয়ে আছে কি? কাল থেকে যারা সারাক্ষণ ওৎ পেতে থেকেছে, এখন তারা একটু একটু করে রূপ নিচ্ছে।

এই অস্বস্তিটা ঝেড়ে ফেলতে চেষ্টা করে পারু। সিগারেট ধরায়। জ্বলন্ত দেশলাই কাঠিটা চোখের সামনে নিভে যেতে দেখে পুরনো অভ্যাসে মনে মনে বলে—মৃত্যু তো ঠিক এরকমই। আবার কী! অথচ অস্বস্তি তাকে আঁকড়ে আছে। খালি মনে হচ্ছে, যদি ডালিমের মরা শরীরটা হঠাৎ উঠে তার দিকে তাকায় এবং হাসে!

বাইরে কারা কথা বলতে বলতে আসছে মনে হল। পারু উত্তরের জানলায় গিয়ে দাঁড়ায়। আমগাছের ওপাশে হৈমন্তী আর একটা যুবক হন্তদন্ত আসছে। তারা বাড়ির ওপাশে অদৃশ্য হলে সেই বাচ্চা মেয়েটি এবং তার পেছনে আরও কারা সব আসছে দেখা গেল। পারু সরে এসে চেয়ারে বসে। এতক্ষণে তার মনে হয়, ডালিমের শেষকৃত্য কী ভাবে হবে? কবরে, নাকি শ্মশানে? ওর স্বজাতি বেদে সম্প্রদায় অবশ্য কবরেই মৃতের সদ্‌গতি করে। কিন্তু পলাশপুরে তো বেদেরা নেই। কে কোথায় চলে গেছে। তাহলে?

হৈমন্তীদের পায়ের শব্দ হচ্ছে সিঁড়িতে। তারপর শব্দটা জোরাল হয়ে ওঠে। সেই যুবকটি প্রায় লাফ দিয়ে ঘরে ঢুকে ভাঙা গলায় কেঁদে ওঠে—মহারাজদা! তারপর সে বাচ্চা ছেলের মত ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে। হৈমন্তী তার কাঁধে হাত রেখে তীব্র স্বরে বলে—নিরু! নিরু! এই নিরু! ছিঃ, কাঁদে না। লক্ষ্মী ভাইটি, কথা শোন।

যুবকটি একটু শান্ত হয়। পারুর দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে কান্না-জড়ান গলায় বলে—আপনার অপেক্ষায় ছিল মহারাজদা। আপনি এলেন, আর চলে গেল। জানেন, প্রায় বলত আপনার কথা! হাসপাতালে থাকার সময় খালি আপনার নাম করত।

হৈমন্তী ঠোঁট কামড়ে জানলার কাছে যায়। আপন মনে বলে—ভদ্রলোকের যা গরজ, আসবেন কি না কে জানে! নিরু, তুমি নিজে গেলেই ভাল হত।

নিরু নামে যুবকটি চোখ মুছে হঠাৎ হিংস্র হয়ে ওঠে যেন। বলে—ওর বাপ আসবে। না এলে আর পলাশপুরে গাড়ি হাঁকাতে হবে না। মহারাজা গেছে, মহারাজার ভাইরা এখনও যায় নি।

হুঁ, এই ধরনের ছেলেরা একদিন পারুর সঙ্গে পার্টি করত। পারুর মনে পড়ে যায়। এই নিরুকেও তার খুব চেনা লাগে। কিন্তু কিছুই মনে করতে পারছে না। সে শুধু বলে—কে? কে আসবে?

জবাব হৈমন্তী দেয়। খুব আস্তে বলে—হাসপাতালের ডাক্তার ভদ্রলোক।

তাহলে কি হৈমন্তী এখনও ডালিমের মৃত্যু মেনে নিতে পারেনি? এখনও আশা করছে কিছু? পারু ব্যস্তভাবে বলে—হ্যাঁ, ডাক্তারের কথাটা আমার মাথায় আসেনি। তা ইয়ে ...অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করা যায় না?

হৈমন্তী অন্যদিকে ঘুরে আছে। তেমনি শান্ত গলায় বলে—না। সেজন্যে নয়, একটা ডেথ সার্টিফিকেট দরকার হবে।

—ও! পারু চুপ করে থাকে।

আবার সিঁড়িতে পায়ের শব্দ হচ্ছে। পারু বুঝতে পারে পলাশপুরে ডালিম হয়ত তত নিঃসঙ্গ ছিল না।...

কতকগুলো ভাসাভাসা অস্পষ্ট দৃশ্য অথবা ঘটনার মধ্যে আঁকুপাঁকু করছিল পারু। স্মৃতি এবং বিস্মৃতির মধ্যিখানে সরে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। তারপর সে নিজের শরীর ফিরে পেল। তাকাল। বুঝল কোথায় শুয়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল ডালিম মারা গেছে। তখন উঠে বসার চেষ্টা করল। কিন্তু মাথার ভেতরটা ফাঁকা লাগল। দুর্বলতা তাকে টেনে আবার শুইয়ে দিল।

এই সময় কেউ বলল—কেমন বোধ করছেন দাদা?

পারু তাকায়।

হৈমন্তীর সেই ঘরে শুয়ে আছে কেন সে? খাটের কোনায় নিরুর বয়সী একটি ছেলে বসে আছে। সে ফের বলে—চুপচাপ শুয়ে থাকুন। ঠিক হয়ে যাবে।

পারু বলে—তুমি কে ভাই?

—আমি? চিনবেন না। ছেলেটি একটু হাসে। সেই এতটুকুন দেখেছেন। আমার বাবাকে হয়ত চিনবেন।

—কে তোমার বাবা?

—মনিরুল মিয়া। স্টেশন বাজারে দর্জির দোকান ছিল। আমার নাম আতিকুল। বাবা তো কবে মারা গেছে...

—হুঁ। পারু ওকে থামিয়ে দিয়ে ফের ওঠার চেষ্টা করে। মাথা ঘুরছে কেন? বিরক্ত হয়ে বলে সে।

আতিকুল বলে—মাথা ঘুরেই তো পড়ে গিয়েছিলেন। ভাগ্যিস রেলিং ছিল।

—তাই বুঝি? কিচ্ছু মনে পড়ছে না!

—ডাক্তারবাবু আপনাকে দেখে গেলেন। ওই দেখুন, ওষুধ দিয়েছেন। আমি নিয়ে এসেছি।

ছেলেটির কথাবার্তা ভারি মিষ্টি। একটু লাজুক যেন। মেয়েলি দৃষ্টি। চোখের দিকে সোজা তাকিয়ে কথা বলতে পারছে না। পারু বলে—বল কী! ওদিকে ওই বিপদ, আর আমি...ভ্যাট্! কোন মানে হয় না।

আতিকুল বলে—আপনার ঘড়ির কাচ ভেঙে গেছে। হাত কেটে রক্ত পড়ছিল।

পারু বাঁ হাত তুলে কয়েকটা টুকরো প্লাস্টার দেখতে পায়। বলে—কী মুশকিল!

—আপনি এবার ওষুধটা খেয়ে নিন দাদা।

—খাচ্ছি। কটা বাজছে বল তো?

—সাড়ে দশটা প্রায়।

পারু বালিশে মাথা কাত করে দরজার বাইরে শুধু একটুকরো নীল আকাশ দেখতে পায়। পাশের ঘরে কোন শব্দ নেই। বারান্দাও ফাঁকা। কেউ যাতায়াত করছে না। নিচে কারা চাপা গলায় কথাবার্তা বলছে। আর বাড়িটার পেছনদিকে কোথায় খট খট শব্দ হচ্ছে। কিছুক্ষণ শব্দটা শোনার পর সে জিজ্ঞেস করে—ও কিসের শব্দ?

—খাটুলি বানাচ্ছে। বাঁশ কাটা হচ্ছে।

—ও। ...বলে পারু চুপ করে। এতক্ষণে যেন এই বালিশটাতে হৈমন্তীর চুলের গন্ধ।

—লাস নামান হয়েছে নিচে। চান করিয়ে দিচ্ছে। ...বলে আতিকুল উঠে যায়। বারান্দায় গিয়ে রেলিঙে ঝুঁকে ব্যাপারটা দেখে এসে ফের জানায়—কাফন পরান হয়ে গেছে।

পারু আস্তে আস্তে বলে—কারা এসব করছে বল তো?

আতিকুল একটু হাসে। —কেন? মহারাজা-ভাইয়ের কি লোকের অভাব?

—কিন্তু তোমাদের সমাজের তো ধার ধারত না ও!

—আজকাল কে ধারে? কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পর আতিকুল ফের বলে—কত লোকের কত উপকার করেছে, তারা এসময় না এসে পারে দাদা? বলুন না?

—হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ।

—গণ্যমান্য মিয়াসাবরা না এলেই বা! দেখবেন, কত ভিড় হবে গোরস্থানে। আশেপাশের গ্রাম থেকেও লোক আসবে দেখবেন। খবর চলে গেছে মুখে মুখে।

পারু হৈমন্তীকে মনে মনে খুঁজতে থাকে। কীভাবে ওর কথা একে জিজ্ঞেস করবে ভেবে পায় না। 'তোমাদের বউদি' বলবে—নাকি 'তোমাদের মহারাজা ভাইয়ের স্ত্রী' বলবে? শুধু 'ও কোথায়' বললে কি আতিকুল বুঝবে? পারু অনেক দোনামোনার পর একটু কেশে বলে—ইয়ে, হৈমন্তী কোথায় জান আতিকুল?

—মানে হিমি ভাবীর কথা বলছেন?

হঠাৎ অকারণ রাগে এবং দুঃখে গা জ্বলে যায় পারুর। হিমি ভাবী! কী ভেবেছে এরা? তারপরই দপ করে নিভে যায় সে। কেন এই হঠকারী আবেগ? সে হাসবার চেষ্টা করে বলে—তোমরা হিমি ভাবী বল বুঝি?

—হ্যাঁ।

বাঁকা ঠোঁটে পারু বলে—তোমাদের এই ভাবীজি কী জাত জান তো?

আতিকুল মুখ নামিয়ে বলে—আপনাদের স্বজাতি।

—আর কী জান?

আতিকুল তার দিকে তাকিয়ে মুখ নামায় ফের। পারু টের পায় তার প্রশ্নটা খামোকা রূঢ় হয়ে গেছে। সে নিজেকে সামলে নেয়। তারপর বলে—ওকে একবার ডেকে দেবে?

—দিচ্ছি। বলে আতিকুল উঠে যায়। সিঁড়িতে তার পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেলে পারু আবার ওঠার চেষ্টা করে এবং জেদের বশেই ওঠে। শরীর প্রচণ্ড দুর্বল মনে হয়। সে খাটের মাথার দিকে হেলান দিয়ে বসে থাকে। দেওয়ালে চোখ পড়ে। একটু অবাক হয়। গা ছমছম করে ওঠে। এ ঘরটার পড়-পড় অবস্থা একেবারে। অজস্র ফাটল। পলেস্তারা সামান্যই টিকে আছে। আর ছাদের দিকে তাকিয়ে সে আরও চমকায়। ঠিক পায়ের দিকটায় একটা কড়িকাঠ ভেঙে রয়েছে। সেখানে একটা মোটা বাঁশের খুঁটি। এই ঘরে কীভাবে কাটায় হৈমন্তী? কেন কাটায়? কতদিন ধরে সে ডালিমের সঙ্গে রাত্রি যাপন করে না?

পরক্ষণে পারুর মুখে বিকৃতি ফুটে ওঠে। ন্যাকামি এবং লোকদেখান সতীপনা ছাড়া আর কী! কিংবা আসলে ডালিমই তাকে এভাবে দূরে ঠেলে দিয়েছে কবে থেকে!

এই কয়েকটা মিনিট সে ভুলে গিয়েছিল ডালিমের মৃত্যুর কথা। তারপর মনে পড়ে। এবং দুঃখিত মনে ভাবে, এতে হয়ত ডালিমের আত্মার অপমান হল। এখন এসব কথা তার উচিত নয়। ডালিমের জন্যে আবার তার কষ্ট হতে থাকে। চোখে জল এসে যায়। কিন্তু সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনে দ্রুত চোখ মুছে ফেলে।

হৈমন্তী দরজার কাছে দাঁড়িয়ে অস্ফুট স্বরে বলে—কেমন বোধ করছ এখন?

পারু মাথা নাড়ে। বলে—ভাল।

—ওষুধটা খেয়েছ?

—ওষুধ কী হবে! তুমি একটু বস হৈমন্তী।

হৈমন্তীর মধ্যে এখন আরও তীব্র রূপান্তর দেখতে পাচ্ছে পারু। কান্না না, শোক না। অবিচল গাম্ভীর্য এবং প্রশান্তির শক্ত খোলসে ঢাকা ওর ঋজু শরীর। হৈমন্তী ভেতরে ঢুকে একটু তফাতে খাটে পা ঝুলিয়ে বসে। তারপর পারুর দিকে বড় দুটো চোখ রেখে বলে—ওষুধটা দেব?

—থাক। ...পারু পাঞ্জাবির পকেটে সিগারেট হাতড়ায়।

হৈমন্তী বলে—কিছুক্ষণ পরে সিগারেট খেয়ো বরং। আর শোন, স্নান করে নিও। ডেডবডি নিয়ে যাক, তারপর মিলুকে বলব জল এনে দেবে।

ডেডবডি! পারু অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে ওর দিকে। এখন ডালিম ওর কাছে একটা ডেডবডি!

হৈমন্তী অন্য দিকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে বলে—ডাকছিলে কেন?

—মনে পড়ছে না। তুমি একটু বস হৈমন্তী। ...পারু সিগারেটের প্যাকেটটা এতক্ষণে বের করে। কিন্তু ধরাবার চেষ্টা করে না। প্যাকেট মুঠোয় ধরা থাকে।

কয়েক মুহূর্তের স্তব্ধতা। তারপর হৈমন্তী বলে—কী ভাবছ?

—তোমার কথা।

—কেন?

—এবার তুমি কী করবে?

—কী করব মানে? যা করছি, তাই করব।

—ও! তুমি তো একটা চাকরিবাকরি করছ।

—তাহলে জিজ্ঞেস করছ কেন?

পারু তার দিকে ঝুঁকে আসে একটু। —কিন্তু ডালিমের জন্যে তোমার কষ্ট হচ্ছে না কেন হৈমন্তী?

—কিসের কষ্ট?

—কিসের! পারু সিগারেটের প্যাকেটটা আচমকা ছুঁড়ে ফেলে মেঝেয়। এক মুহূর্তের হঠকারিতা শুধু। তারপর খুব নিস্তেজ ভঙ্গিতে বলে—কাকে কী বলছি!

হৈমন্তী ঠোঁট কামড়ে ধরে ভুরু কুঁচকে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর ভাঙা গলায় আস্তে বলে—তুমি এতদিন পরে কার ওপর ঝাল ঝাড়তে এসেছ পারু? তুমি...তুমি এত বোকা হয়ে আছ এখনও? আশ্চর্য! আমি সত্যি ভাবিনি। এতটুকু ভাবিনি।

—কী ভাবনি?

—তুমি পুরনো ব্যাপার নিয়ে এখনও বেঁচে আছ, ভাবতেই পারিনি।

—পাশ কাটিয়ে যেও না হৈমন্তী। আমার প্রশ্ন অন্যখানে।

—তোমার বন্ধুর জন্যে শোক প্রকাশ করছি না কেন, এই কি তোমার প্রশ্ন? ...হৈমন্তী এখন যেন আরও সংযত হয়ে উঠল। ঠাণ্ডা গলায় ফের বলে সে—তাতে কী আসে যায় তোমার? তুমি বোকার মত আমাকে পরীক্ষা করতে চাইছ বুঝি? পরীক্ষা কেন দিতে যাব তোমার কাছে?

তারপর সে ওঠে। পারু হাত বাড়িয়ে তাকে আটকাতে যায়। বলে—প্লিজ, বস হৈমন্তী। আমার অনেক কথা আছে।

—অনেক কথা এতদিন ছিল না পারু?

—ছিল। আমার তৈরি হতে সময় লেগেছে।

—খুব বেশি সময় লেগে গেছে। প্রায় এক যুগেরও বেশি। কাজেই ওসব থাক। ...বলে হৈমন্তী দু পা এগিয়ে একবার থামে। ঘুরে ফের বলে—তোমার বোঝা উচিত, এখনও বাড়ি থেকে একটা মৃত্যুর গন্ধ মুছে যায়নি!

পারু বলে—হ্যাঁ, ক্ষমা কর। আমার মাথাটা খালি গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

—আসছি। ততক্ষণ চুপচাপ শুয়ে থাক।

শেষ কথাটা হৈমন্তীর মুখে যেন মানাল না। আপস কিংবা বোঝাপড়ার কথা ওটা। কী যেন গভীরতর মোহের উদ্রেক করে। পারু চোখ বুজে থাকে। হৈমন্তীর পায়ের শব্দ নিচে মিলিয়ে যায়। বাইরে কারা একসঙ্গে গম্ভীর স্বরে মন্ত্র উচ্চারণ করতে থাকে। হয়ত ডালিমের লাস এখনই গোরস্থানে নিয়ে যাচ্ছে।...

পনেরটা বছর খুব সামান্য সময় নয়। হৈমন্তী বলে গেল, প্রায় এক যুগেরও বেশি। মাত্র একটা দিনে কিংবা একটা ঘণ্টাতেই কত সব অদলবদল ঘটে যায়! ঘটে কত জীবন্মৃত্যু, উত্থানপতন, তুমুল

বিপ্লব! আর পনের বছর পরে এসে পনের বছর আগের একটা বন্ধ হয়ে যাওয়া দরজা খুলে পারু ঢুকে পড়েছে হঠকারিতায়। এমন করে পিছু হটে এসে কী খুঁজতে চেয়েছিল সে? খুঁটিয়ে তদন্ত করতে এসেছিল? হৈমন্তীর দুর্বোধ্য অংশটুকুতে পরিণত বয়সের প্রাজ্ঞতা এবং বিচারবুদ্ধি দিয়ে বিশ্লেষণের আলোকপাত করার ইচ্ছে ছিল?

তাহলে কী দেখল? আরও দুর্বোধ্যতা জমেছে হৈমন্তীর। কিংবা বলা যায়, বরাবরকার দুষ্টুমি দিয়ে ডালিমই হৈমন্তীর ওপর কী এক ঘন কুয়াশা ছড়িয়ে দিল—নিজেরই মৃত্যু দিয়ে গুরুতর অস্পষ্টতার দেওয়াল দাঁড় করাল! এপারে পারু যে-দূরে সেই দূরেই রয়ে গেল। ডালিম বরাবর এমনি স্বভাবের মানুষ। ওর মধ্যেকার সেই দুর্ধর্ষ মহারাজাকে মাঝেমাঝে খুঁচিয়ে জাগিয়ে তুলেছে গোখরো সাপের মত পটভূমি ও পারিপার্শ্বকে বিষাক্ত করেছে। আসলে ওর পূর্বপুরুষের সাপুড়ে স্বভাবটা ওর রক্তে ছিল।

কতক্ষণ পরে পারু হৈমন্তীর খাট থেকে নেমে দাঁড়ায়। মেঝেয় বাক্স দুটো এখনও তেমনি রাখা আছে দেখতে পায়। বাক্স খুলে দেখার জন্যে একটু চঞ্চলতা আসে তার। কিন্তু চঞ্চলতাটুকু চেপে আস্তে আস্তে দরজার দিকে পা বাড়ায়। দুর্বলতা আছে এখনও, তবে মাথাঘোরাটা আর নেই। হঠাৎ মনে হয়, তাহলে হুইস্কিটাই কি যত কাণ্ডের মূলে? বিষাক্ত কিছু ছিল না তো ওটার মধ্যে? অবশ্য এখন আর তা জানার কোন উপায় নেই। সে খুব সামান্য খেয়েছিল মনে পড়ছে। প্রায় সবটাই সাবাড় করেছিল ডালিম। হয়ত...

আঁতকে ওঠে পারু। ভাগ্যিস ওর লাস পোস্টমর্টেমে যায়নি! তাহলে পারুকেই বিপদে পড়তে হত। বারান্দায় গিয়ে সে রেলিংয়ের খুব কাছে যেতে ভয় পায়। পাছে আবার মাথা ঘুরে পড়ে যায় তখনকার মত। সে এবার হুইস্কিটার ভালমন্দ নিয়ে ভাবনায় পড়ে। তাহলে কি সে নিজের অজান্তে ডালিমকে মৃত্যু উপহার দিতে এসেছিল? তার পা দুটো কাঁপে। উরু ভারি হয়ে ওঠে। বুক টিপটিপ করে। এতক্ষণ ব্যাপারটা তলিয়ে ভাবেনি। সত্যি তো, হার্টের রোগীর পক্ষে ওই হুইস্কিটাই মারাত্মক হওয়ার কথা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

পারু বাড়িটা লক্ষ্য করে। ভীষণ চুপচাপ হয়ে আছে। হৈমন্তী কোথায় আছে কে জানে! সে নিশ্চয় গোরস্থানে যায়নি। পারু পাশের ঘরটার দিকে তাকায়। দরজায় তালা ঝুলছে। খোলা থাকলে সে হুইস্কির বোতলটা কোথাও ফেলে দিয়ে আসত।

পরক্ষণে সে ভাবে, এসব পাগলামি ছাড়া আর কী! এবং সিঁড়ির দিকে সাবধানে এগিয়ে যায়। দেওয়াল ধরে আস্তে আস্তে নামতে থাকে।

নিচের বারান্দা থেকে উঠোন জলে কাদা হয়ে আছে। কেউ নেই। বারান্দার ওপাশে বেড়াঘেরা কিচেনে একটা বেড়াল চুপচাপ বসে আছে। পারু কাদা বাঁচিয়ে খিড়কির দরজার দিকে যায়।

দুধারে আগাছা আর ইটের স্তূপের মধ্যে সরু রাস্তা দিয়ে সে অন্যমনস্কভাবে এগোতে থাকে। বড় রাস্তার কাছে কাঠের সাঁকোয় হৈমন্তী একা দাঁড়িয়ে আছে। ওখানে কী করছে সে? পারু একটু ইতস্তত করে। তারপর পা বাড়ায়।

হৈমন্তী ঘুরে তাকে দেখে। পারু বলে—কী করছ এখানে?

—কিছু না। তুমি চলে এলে কেন?

—চুপচাপ কতক্ষণ থাকব? পারু একটু বিরতির পর ফের বলে—এখন ফেরার ট্রেন আছে জান?

—অসংখ্য ট্রেন আছে।

—আমি এবার বরং চলে যাই হৈমন্তী! আমার...আমার খুব অসহ্য লাগছে।

—নিশ্চয় লাগবে। কিন্তু স্নানটা করে নাও। আর তোমার খাওয়ার ব্যবস্থা করেছি মিলুদের বাড়ি।

পারু লক্ষ্য করে, হৈমন্তী স্নান করে নিয়েছে কখন। খুব ফিকে নীল একটা তাঁতের শাড়ি পরেছে। কাল এসে সিঁথিতে যে ঘষাখাওয়া সিঁদুরের ছোপ দেখেছিল, তা এখন অস্পষ্ট—কিন্তু মুছে ফেলেনি, তাও বোঝা যায়। শুধু একটা তফাত, কপালে টিপটা নেই। কানে দুল দুটো আছে। হাতে কাঁকনও আছে। শাঁখানোয়া কাল এসে দেখেনি পারু। আশাও করেনি। কিন্তু তার এই সদ্যস্নাত মূর্তিতে যেন

আবছা সন্ন্যাসিনীর আদল ফুটে উঠেছে। হৈমন্তী যেন টের পায় পারু তাকে খুঁটিয়ে দেখছে। হয়ত তাই বলে ওঠে—চল, স্নানের যোগাড় করে দিই। এবং সে সাঁকো থেকে নেমে আসে।

উজ্জ্বল রোদে প্রচণ্ড তাপ আছে। পারু ঘামছিল। কাছেই একটা নিচু গাছের ছায়ায় সরে গিয়ে সে বলে—ইয়ে, তুমি কি কবর দেখতে গিয়েছিলে?

হৈমন্তী মাথাটা দোলায়। তারপর বলে—তুমি যেতে চাইলে যেতে পার। তবে স্নানটা করে খেয়ে নিয়ে তারপর বেরিয়ো। বেশ দূরে কিন্তু। ছাতা আছে, দেব! ওই যে, ওদিকে সেই রেলওয়ে ওয়ার্কশপের পিছনে।

—জানি। পারু বলে। কিন্তু ইচ্ছে করছে না। কী হবে?

—এস। পা বাড়িয়ে ডাকে হৈমন্তী।

পারু তার পিছনে হাঁটতে থাকে। একটু পরে বলে—হৈমন্তী!

—বল।

—একটা কথা খালি মনে হচ্ছে...

—কী?

—হয়ত...হয়ত আমিই ওকে মেরে ফেললুম।

—কেন একথা ভাবছ?

—হুইস্কিটা...

হৈমন্তী দ্রুত ঘোরে। তারপর দৃঢ়স্বরে বলে—না।

পারু দাঁড়িয়ে গেছে। কাঁপা-কাঁপা গলায় বলে—আমার উচিত ছিল না হৈমন্তী। ওর হার্টের অসুখ ছিল—ওই অবস্থায় অতটা হুইস্কি...তাছাড়া, মনে হচ্ছে জিনিসটা হয়ত ভাল ছিল না। মানে, অনেক সময় সাংঘাতিক পয়েজেনাস হয়ে উঠতে পারে তো!

হৈমন্তী বড় একটা নিঃশ্বাস ফেলে ফের বলে—না। তারপর পা বাড়ায়।

পারু তাকে অনুসরণ করে। দুর্বল কণ্ঠস্বরে বলে—তাছাড়া এমনও তো হতে পারত হৈমন্তী, আমি ওকে মেরে ফেলতেই এসেছিলুম! ও আমার পরম বন্ধু ছিল, পরম শত্রুও তো ছিল। ছিল না? হৈমন্তী! তুমি বল!

হৈমন্তী জবাব দেয় না।

পারু বলে—তোমার সন্দেহ হওয়া উচিত ছিল আমার ওপর। আমি ওর গেলাসে...ধর, পটাসিয়াম সাইনাইড মিশিয়ে দিয়েছিলুম কিনা, তুমি সহজেই ভাবতে পারতে।

হৈমন্তী ফের ঘুরে ওকে একবার দেখে নেয়। তারপর হাঁটতে হাঁটতে বলে—তুমি স্নান করে নাও। তারপর ...

—তারপর কী?

—সব বলব।

পারু পা বাড়িয়ে তার কাঁধ আঁকড়ে ধরে। উত্তেজিতভাবে বলে—কী হৈমন্তী কী?

হৈমন্তী খিড়কির দরজার সামনে গিয়ে কাঁধটা আস্তে ছাড়িয়ে নেয়। তারপর শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে মিশিয়ে বলে—ও সুইসাইড করেছে।

পারু চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে কয়েক মুহূর্ত। হৈমন্তী বাড়ি ঢুকে গেছে। একটু পরে যেন অনেক দূর থেকে তার কণ্ঠস্বর ভেসে আসে—এস পারু।

পারু দরজাটা আঁকড়ে ধরে আরও একটুখানি দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর ভেতরে যায়। কাদায় স্লিপার আটকে যায় তার। ওপরের ঘরে দরজা খোলার শব্দ হচ্ছে। পারু অকারণ ডাকে—হৈমন্তী!

—ওপরে এস।

স্লিপার দুটো কাদায় ফেলে রেখেই খালি পায়ে পারু প্রায় দৌড়ে ওপরে ওঠে।

ডালিমের ঘরে ঢুকে হাঁফাতে হাঁফাতে বলে সে—ডালিম সুইসাইড করেছে, বললে না?

হৈমন্তী টেবিলের ড্রয়ার টেনে কী বের করছিল। বলে—চেঁচামেচি কর না। কে শুনতে পাবে!

পারু শূন্যদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। তারপর চেয়ারে বসে একটা ভারি নিঃশ্বাস ফেলে ক্লান্তভাবে বলে—সত্যি সুইসাইড করেছে ডালিম?

হৈমন্তী ড্রয়ার থেকে একটা ভাঁজ-করা কাগজ খুলে তার দিকে এগিয়ে দেয়। চাপা গলায় বলে—ওর বুকের তলা থেকে বালিশ সরাতে গিয়ে চোখে পড়েছিল। ওর জামার বুকপকেটে ছিল এটা। আমার ধারণা, ...আচ্ছা, তুমি আগে চিঠিটা পড়ে নাও।

পারু দ্রুত চিঠিতে চোখ বুলিয়ে নেয়। কিন্তু অক্ষরগুলো অর্থহীন হিজিবিজি মনে হয় তার। ডালিমের হাতের লেখা কত সুন্দর ছিল! মনেই হয় না এ তারই হাতের লেখা। খুব দ্রুত ডটপেনে লিখেছে। চিঠিটা পারুকেই লেখা, এটাই আশ্চর্য। তার মানে, পারু আসার পর লিখেছে। কিন্তু কখন লিখল? সারাক্ষণ তো পারু তার সামনে ছিল!

হ্যাঁ, মনে পড়েছে। খাওয়ার পর নিচে গিয়েছিল পারু। উঠোনে কুয়োতলার পাশে জৈব তাগিদে গিয়েছিল একবার। তাহলে তখনই ঝটপট লিখে থাকবে।

পারু হৈমন্তীর দিকে তাকিয়ে বলে—চিঠিটার কথা আর কাকেও বলেছ?

হৈমন্তী গম্ভীর মুখে বলে—না। বললে কী হত, বুঝতে পারছ না?

—হ্যাঁ। পুলিশ জানতে পারত হয়ত। পোস্টমর্টেম হত। পারু মাথা নাড়ে। ঠিক করেছ। কিন্তু এটা এখনই নষ্ট করা দরকার। আর ওর গেলাসটা...

হৈমন্তী ফিসফিস করে বলে—ফেলে দিয়েছি।

—ডাক্তার সন্দেহ করেননি কিছু?

—করেছিলেন। আমাকে আড়ালে ডেকে বললেন, নিছক হার্টঅ্যাটাক মনে হচ্ছে না। মুখের চামড়ার রঙ, তাছাড়া কষায় ফেনা জমে আছে। সাইনাইড কেস হয়ত!

ওকে নামতে দেখে পারু বলে—তারপর?

—আমি বুদ্ধি করে বললুম, ওর এপিলেপ্সি ছিল। প্রায় ফিট হত। মুখে গেঁজলা ভাঙত। আর ডাক্তার ভদ্রলোক একটু ভীতু জানতুম। তবু দোনামোনা করছেন দেখে নিরুকে লেলিয়ে দিলুম অগত্যা। নিরু বলল—কী হল স্যার? ঝটপট সার্টিফিকেটটা দিন! —তখন লিখে দিলেন।

—পরে হাঙ্গামা করবেন না তো?

—সে-সাহস হবে না। নিরুদের ভীষণ ভয় পায় সবাই।

—চিঠিটা পুড়িয়ে ফেলা যাক।

—পড়লে?

—হুঁ। কিন্তু আশ্চর্য, সাইনাইড কীভাবে যোগাড় করল ডালিম? খেলই বা কখন?

হৈমন্তী একটু চুপ করে থাকার পর জানলার বাইরে দৃষ্টি রেখে বলে—আমার ধারণা, রাতে তুমি চলে যাওয়ার পর তোমার জিনিসগুলোর কথা বলতে আমিও বেরিয়ে গেলুম, হয়ত তখনই খেয়েছিল।

—যাবার সময় তো ওকে মনে হচ্ছিল নেশার ঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছিল!

—হয়ত সত্যি নেশার ঘুম ছিল না।

—ভান করে পড়েছিল বলতে চাও?

—হয়ত। হৈমন্তীর মুখ একটু বিকৃত হয়ে যায়। ফের বলে—ও আমাকে বিশ্বাস করত না। কোনদিন বিশ্বাস করেনি। ভাবত, আমি ওকে ঠকাচ্ছি। নেহাৎ দায়ে পড়ে ওর সঙ্গে বাস করছি।

—কিন্তু আসলে তুমি ওকে ভীষণ ভালবেসে—

বাধা দিয়ে হৈমন্তী বলে—কে জানে। ওকথা থাক পারু। ওঠ, প্রায় একটা বাজে।

—হ্যাঁ, উঠি।

বলে পারু আবার চিঠিটার দিকে তাকায়। ...'পারু, অনেক আগেই সব ঠিক করা ছিল। আমার এভাবে বেঁচে থাকার কোন মানে হয় না। আর তুই তো জানিস, আমার বংশটাই যেন সংশপ্তকের। শুধু হৈমন্তীকে তোর মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেবার অপেক্ষা ছিল। ওকে ক্ষমা করিস। আমাকেও ক্ষমা

করিস। মানুষের এ শরীরই মানুষের শত্রু, ভাই। তাই এই শরীরের হাত থেকে মুক্তি চেয়েছি। কী জঘন্য তাকে নিয়ে বেঁচে থাকা!'...

উল্টো পাতায় লেখা আছে : 'মাননীয় সরকার বাহাদুর, অনেক কষ্ট দিয়েছি আপনাদের। ক্ষমা করবেন। আমার মৃত্যুর জন্য অনুগ্রহ করে কাকেও দায়ী করবেন না। আমি অনেক মানুষের প্রাণ নিয়েছি। এবার নিজের প্রাণ নিজের হাতেই নিলুম।—'

উঠোনের কোনায় ভাঙাচোরা একটা কুয়ো। ধসে পড়া বাড়ির ইটের পাঁজা তফাতে সরিয়ে রাখা হয়েছে। তাতে ঘন আগাছা গজিয়েছে। জল তুলতে মিলুকে ডেকেছিল হৈমন্তী। মিলু আসেনি। সে নাকি এত ভয় পেয়েছে যে আর এ বাড়ি প্রাণ গেলেও আসবে না, হিমি মাসি রাগ করলেও না। তাই মিলুর মা এসেছিল জল তুলতে। তার কাছে জানা গেল। তারপর পারুর সামনে ঘোমটা অনেকটা টেনে বলল—কোমরেড দাদাবাবু ভাল আছেন?

এখনও কমরেড দাদাবাবু? পারু বিরক্ত হয়ে মাথা নাড়ল শুধু। নিচের বারান্দা থেকে হৈমন্তী বলল—তোমার মনে থাকতে পারে। মধুদার বউ। রিকশ ইউনিয়নের মধুদা। বছর পাঁচেক আগে মারা গেছে।

প্রৌঢ়া মেয়েটি কুয়োয় বালতি নামিয়ে বলল—সে এক দিনকাল ছিল, এ আরেক। হ্যাঁ গা, কলকেতায় থাকা হয় শুনেছি? যাক বাবু। এলেন তো এতকাল বাদে। এবারে একটা বিহিত করে যান।

হৈমন্তী ধমক দিয়ে বলল—যা করতে এসেছ, কর তো মিলুর মা!

মিলুর মা দমে গেল তক্ষুনি। প্রসঙ্গ বদলে বলল—রান্না কখন হয়ে গেছে। টিফিনকেরিতে ভরে মিলুকে সাধাসাধি করছি। কিছুতেই কথা শুনল না গো!

—তুমি নিয়ে এলে না কেন?

—জলটা তুলে দিই। তারপরে আসছি। তাড়াহুড়ো করে রাগের মাথায় বেরিয়ে এলুম। খ্যাল নেই। ...বলে মিলুর মা দোতলার দিকটায় একবার চোখ রাখে। ফের বলে—মড়ার বাড়িতে খাওয়াবেন ওনাকে? বরং আমার বাড়িতে যদি কষ্ট করে যেতেন! না-খাওয়া মানুষ তো নন। কী বলেন, কোমরেড দাদাবাবু? কতবার রাতবিরেতে হঠাৎ গিয়ে হাসিমুখে ডেকে বলেছেন—মধুদা, খেতে এলুম। মিলুর বাবা সেই রেতেই হুটোপুটি বাধিয়ে দিয়েছে। হ্যাঁ—সে এক দিনকাল ছেল গা!

কুয়োর ধারে প্রকাণ্ড একটা মাটির গামলা আর একটা বালতিতে জল ভরে দিয়ে মিলুর মা চলে গেল। হৈমন্তী বলল—স্নান করে নাও। আমি ওপরে থাকছি।

বলে সে ওপরে চলে গেল। পারু হিসেব করছিল। পাজামা ভেজাবে কিনা। অবশ্য যথেষ্ট রোদ আছে। সন্ধ্যার আগেই শুকিয়ে যাবে। উঠোনে কাপড় শুকবার তারটার দিকে তাকাল সে। সূর্য দেখে নিল। তারপর হেঁট হয়ে জলে হাত রাখল। কুয়োর জলটা কী ভীষণ ঠাণ্ডা!

পাজামা শেষ পর্যন্ত ভেজাল না সে। আন্ডারপ্যান্ট পরা অবস্থায় দোতলার ঘরের দিকে একটা চোখ রেখে গায়ে জল ঢালল। ডালিমের ঘরের দরজায় শেকল তোলা আছে। পাশে সিঁড়ির মুখে হৈমন্তীর ঘরের দরজা খোলা—কিন্তু ভেতরে ঘন ছায়া। তার মধ্যে হৈমন্তী এখন কী করছে দেখা যাবে না। সে কি পারুর শরীর দেখছে আড়াল থেকে। শরীরের কথাটা ডালিম এমন করে বলে গেছে যে হঠাৎ-হঠাৎ চমক খেলে যায়। সত্যি, কী বিপজ্জনক জিনিস নিয়ে মানুষের বেঁচে থাকা।

শরীরকে শাস্তি দেওয়ার ভঙ্গিতে জল ঢালল পারু।

স্নানের পর এতক্ষণে যেন স্বাভাবিকতা ফিরে এসেছে। অন্যদিকে ঘুরে তোয়ালেতে গা মুছছে, পিছনে দোতলার বারান্দা থেকে হৈমন্তীর গলা শোনা গেল—কাপড়চোপড় ওখানে রেখে এস। মিলুর মা কেচে দেবে।

পারু কোমরে তোয়ালে জড়িয়ে বলল—থাক। খালি এই আন্ডারপ্যান্টটা তো!

হৈমন্তী বলল—সঙ্গে আর জামাকাপড় আননি?

পারু ঘুরে হাসল। —এনেছি। নয়ত স্যুটকেস কেন? বলে সে আন্ডারপ্যান্টটা পায়ের তলায় মাড়িয়ে পাজামার দিকে হাত বাড়াল।

—তাহলে রাতের জামাকাপড় বদলাতে আপত্তি কি?

পারু আবার সূর্য দেখে নিয়ে বলল—সন্ধ্যার আগে শুকিয়ে যাবে মনে হচ্ছে। ঠিক আছে।

রাতে পাঞ্জাবি আর পাজামা পরেছিল। পাঞ্জাবিটা নিচের বারান্দায় থামের হুকে ঝুলিয়ে রেখে এসেছে। গেঞ্জিটাও। সে পাজামাটা কুয়োতলায় ছুঁড়ে দিল। তারপর পায়ে চটি গলিয়ে উঠোন ঘুরে বারান্দায় গেল। পাঞ্জাবির পকেট থেকে রুমাল আর সিগারেট দেশলাই বের করে নিচ্ছে, তখন হৈমন্তী নেমে এল। বলল—আমি নিচ্ছি। তুমি ওপরে গিয়ে কাপড় পর।

পারু রুমালটাও ওর হাতে গুঁজে দিল। তারপর সিগারেট দেশলাই নিয়ে তোয়ালে পরা অবস্থায় ওপরে চলে গেল।

একটু পরে সে আরেক প্রস্থ পাঞ্জাবি-পাজামা পরে হৈমন্তীর আয়নায় চুল আঁচড়ে দরজায় গেল দেখল, হৈমন্তী তার জামা-কাপড়গুলো নিংড়ে মেলে দিচ্ছে রোদে। পারু নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে থাকল।

ডালিমের মড়া ছুঁয়েছে, তাই কি? হৈমন্তীর মধ্যে অনেক বাজে সংস্কার ছিল বরাবর। তার পার্টি করার সময়েও সেটা লক্ষ্য করেছিল পারু। ঠাকুর দেবতায় ভক্তি ছিল খুব। পার্টির ক্লাসে বস্তুবাদের ব্যাখ্যার সময় তাকে অন্যমনস্ক লক্ষ্য করত পারু। এমন কি হৈমন্তীর এই ব্যাপারটা নিয়ে অনেকে ঠাট্টাতামাশা করতেও ছাড়ত না। আসলে হৈমন্তীর মধ্যে অদ্ভুত একটা বৈপরীত্য ছিল—এখনও আছে ওর অনেক আচরণের মানে খোঁজা বৃথা। ও নিজেও কি বোঝে কিছু?

অথচ এ ঘরে কোন ঠাকুর-দেবতার ছবি নেই। ধর্মের কোন চিহ্ন নেই। এই দিয়ে বোঝা যাচ্ছে হৈমন্তী এ পনের বছরে ধর্মটর্ম থেকে দূরে সরে গেছে। সেই অবশ্য স্বাভাবিক ছিল। তবে কিছু মেয়েলি সংস্কার হয়ত তার পক্ষে ছাড়া সম্ভব হয়নি।

কিন্তু হৈমন্তীর তো এ বাড়িতেই আপাতত কিছুদিন জীবন কাটাতে হবে যদি না...

ভাবতে গিয়ে চমকে উঠল পারু। এই পোড়ো বাড়িতে, এই ভাঙা ছাদের তলায়, এই মৃত্যুর তীব্র গন্ধে আচ্ছন্ন পরিবেশে!

অবশ্য মহারাজার চেলাচামুণ্ডারা আছে। হৈমন্তীর তবে কাকে তোয়াক্কা? একটা চাকরিও আছে খাওয়া-পরার অভাব হবে না। ডালিম তাকে অন্তত একটা মাটি দিয়ে গেছে দাঁড়াবার মত।

মিলুর মা এল এতক্ষণে। সঙ্গে মিলুকে টেনে এনেছে। সম্ভব মারধর দিয়েই আসতে বাধ্য করেছে মেয়েটির চোখ এখনও পিটপিট করছে। হাসতে গিয়ে পারুর খারাপই লাগে।

তিনজনে ওপরে এল। হৈমন্তী বলল—মিলু জানলাগুলো খুলে দে তো মা। আর মিলুর মা, তুমি নিরুকে দেখ তো ফিরেছে নাকি!

মিলুর মা বলল—মেঝেটা পোষ্কের করে দিই?

—থাক্। আমি দিচ্ছি।

মিলুর মা মেয়ের দিকে আঙুল তুলে শাসিয়ে গেল—ফের যদি পালাস, হাড়মাস এক করে দেব বলে দিচ্ছি।

এ ঘরের জানলাগুলো জোড়াতালি দেওয়া। খুলে দেওয়ার পর ঘর আলোয় স্পষ্ট হয়েছে। পুবে আগাছার বনের ওধারে স্টেশন রোড দেখা যাচ্ছে। কত যানবাহন আর লোক! দম আটকান ভাব কেটে যাবার পক্ষে যথেষ্ট। আর বসন্তকালের প্রাকৃতিক যা কিছু চিহ্ন, তা চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠছে

—এস। খেয়ে নাও।

পারু তাকাল। মেঝেয় খবরের কাগজ বিছিয়ে ভাত-তরকারি সাজিয়ে বসে আছে হৈমন্তী গতরাতে তার মধ্যে আড়ষ্টতা ছিল। এখন সে সঙ্কোচহীন আর স্পষ্ট।

পারু বলে—তুমি?

—আমি খেয়েছি।

—না। খাওনি।

—আঃ! তুমি খেয়ে নাও তো!

পারু একটু চুপ করে ওর দিকে তাকিয়ে থাকার পর ভাতে হাত রাখে। হৈমন্তী ঠোঁট কামড়ে ধরে ভুরু কুঁচকে কিছু ভাবছে। পারু আস্তে গ্রাস তোলে। রাতে পাশের ঘরের মেঝেয় খাওয়ার কথা মনে পড়ছে। ডালিম তার হাত থেকে মুরগির ঠ্যাং কেড়ে চিবুতে চিবুতে বলেছিল—জানিস, হিমি আমার সঙ্গে কোনদিনও খেতে বসে না? ওর জাত চলে যাবে যেন! হৈমন্তী ঠিক এমনি গলায় তখন ধমক দিয়েছিল।

শরীর! মোক্ষম কথা বলে গেছে ডালিম। শরীরের জন্যেই খাওয়া। নয়ত এখন এখানে এমনি করে হাঁটু দুমড়ে বসে ভাতের গ্রাস তোলা থেকে নিষ্কৃতি মিলত!...

কারা কথা বলছে কোথাও। পারুর তন্দ্রামত এসেছিল, কেটে যায়। বারান্দায় একদঙ্গল যুবক দাঁড়িয়ে আছে। হৈমন্তীর সঙ্গে কথা বলছে। পারু উঠে বসে। একটু বিরক্ত হয় নিজের ওপর। যেন এ বাড়ির জামাই। খাটে ভাতঘুম দিতে লজ্জা করছে না? অথচ খালি ঘুম-ঘুম আচ্ছন্নতা পেয়ে বসেছে। গায়ে একফোঁটা জোর নেই যেন। পারু উঠে বসে। সিগারেট ধরায়।

বাইরে মার্চের বিকেলটা এখন ফিকে গোলাপি রোদ বিছিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। কোথায় ক্রমাগত কোকিল ডাকাডাকি করছে। পারু দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। ওদের মধ্যে নিরু আর আতিকুলকে চিনতে পারে। ওরা সবাই তার দিকে তাকিয়ে থাকে। নিরু একটু হেসে বলে—দাদার শরীর কেমন এখন?

—ভাল। পারু জবাব দেয়।

—একবার গোরস্থানে যাবেন তো?

পারু একটু অপ্রস্তুত হয়। তারপর বলে—দেখা যাক। আচ্ছা, নেক্সট ট্রেন কটায়?

নিরু বলে—ট্রেন অনেক। ভাববেন না। অত তাড়া কিসের? বরং হিমিবউদির সঙ্গে কবরটা একবার দেখে আসুন। আতিকুল নিয়ে যাবে। রিকশায় যাবেন। বেশি দূরে নয়।

হৈমন্তী বলে—যাব'খন। রোদ একটু কমুক।

—ঠিক আছে। আতিকুল, তুই থাক। রিকশ ডেকে দিস।

হৈমন্তী মাথা নেড়ে চলে—না, না। ওর কাজের ক্ষতি যথেষ্ট হয়েছে। তুমি যাও ভাই আতিকুল।

নিরু যেতে যেতে বলে যায়। খ্যাঁদা মিয়া তবু যদি আসে, সোজা থাপ্পড় মারবেন গালে। শালার বাপের বাড়ি! মির্জারা ওর বাপ ছিল!

সিঁড়ির মুখে ওর সঙ্গীদের একজন বলে—না রে, মহারাজদা নাকি ওর কত্তাবাবা ছিল!

হো হো হো হো করে হাসতে হাসতে এবং সিঁড়িতে জোরাল আওয়াজ দিয়ে দলটা চলে যায়। আতিকুল দাঁড়িয়ে ছিল। হৈমন্তী তাকে বলে—বললুম তো, তোমার থাকার দরকার নেই।

আতিকুল কাঁচুমাচু মুখে বলে—কিন্তু...

—না। দরকার হলে ডেকে পাঠাব। মিলু তো আছে।

—কোথায় মিলু? কখন পালিয়েছে!

হৈমন্তী রেলিঙে ঝুঁকে চড়া গলায় ডাকে কয়েকবার। কোন সাড়া না পেয়ে বলে—[illegible]। তুমি এস আতিকুল। নিজের কাজ কর গে।

আতিকুল চলে যায়। তারপর পারু বলে—বাড়ি নিয়ে ঝামেলা করছে নাকি কেউ?

হৈমন্তী মাথা নাড়ে। —খ্যাঁদা মিয়া বলে মির্জাদের এক দূর সম্পর্কের আত্মীয় আছে। সে নাকি বলেছে, বাড়িটা এবার তারাই পাবে।

—বাড়িটা তো ডালিমের নামে সেটলমেন্ট রেকর্ড হয়েছে!

—হ্যাঁ।

—তাহলে...

হৈমন্তী বাধা দিয়ে বলে—ওর বাড়ি হলেও আমার কী? এখানে আমার অধিকার কিসের?

পারু বুঝতে পেরে বলে—ঠিকই। কিন্তু এরপর তুমি কোথায় থাকবে?

—কাল শুনলে তো। স্টেশনের কাছে এক ভদ্রলোক বাড়ি করছেন। একটা বাসা পেয়ে যাব।

—কে তিনি?

—যেখানে চাকরি করছি, মানে মার্কেটিং সোসাইটির সেক্রেটারি।

পারু একটু চুপ করে থাকার পর বলে—গ্যারান্টি আছে কি? তখন হয়ত মহারাজার ভয়ে বলেছিলেন দেবেন। এখন মহারাজা নেই! তাছাড়া ভাড়া যদি তোমার সামর্থ্যের বাইরে চেয়ে বসেন?

হৈমন্তী ভুরু কুঁচকে তীক্ষ্ণদৃষ্টে তাকায়। —তুমি এসব ভাবছ কেন?

পারু চমকে ওঠে। —ভাবব না?

—না।

পারু বিব্রত ভাবে প্রতিযুক্তি হাতড়ায়। একটু পরে বলে—খুব বেশি দেরি হয়ে গেছে নিশ্চয়, তাহলেও তোমার কথা ভাববার অধিকার এখন ফিরে পেয়েছি। ডালিম সে অধিকার দিতেই ডেকেছিল।

—কিসের অধিকার?

—তুমি তো আমার স্ত্রী। আইনত এবং ধর্মত। এবং—

হঠাৎ হৈমন্তীর একটা হাত উঠে আসে। ফণাতোলা সাপের মত। তারপর হাতটা পারুর গালে চড়ে সশব্দে। চড় খেয়ে পারু নিষ্পলক তাকায় ওর দিকে। হৈমন্তীও তাকায়। কয়েকটি সেকেন্ড ওভাবে ওরা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকে।

তারপর দু হাতে মুখ ঢেকে হৈমন্তী ওর পাশ কাটিয়ে ঘরে ঢোকে। পারু ঘুরে দেখে, খাটে আছড়ে পড়ে এতক্ষণে হু-হু করে কাঁদছে হৈমন্তী। তার সারা শরীর থরথর করে কাঁপছে।

কতক্ষণ সে ফুলে ফুলে কাঁদে। তারপর উবুড় হয়ে শুয়ে থাকে। বালিশ দু হাতে আঁকড়ে ধরে স্থির হয় সে। তখন পারু তার পাশে বসে আস্তে পিঠে হাত রেখে ডাকে—হৈমন্তী, শোন।

হৈমন্তী অস্ফুট সাড়া দেয়—কী?

পারু ধরা গলায় বলে—এতক্ষণ তোমাকে বলি-বলি করেও বলতে পারিনি। চিঠিটা ডালিম তোমাকে লিখতে বলেছিল, কিন্তু ওটাতে তোমারও অনেক চিহ্ন ছিল। ছিল বুঝতে পেরেই কী যে খুশি হয়ে ছিলুম! আমাকে বিশ্বাস করতে পার। তা না হলে আসতুম না। কিছুতেই না।

—চিঠি অনেক লিখেছিলুম এক সময়। সেগুলো সবই আমার চিঠি। ...হৈমন্তী জড়ান স্বরে বলতে থাকে। ...তখন কিছু বোঝনি। খুশিও হওনি। অথচ তখন আমার সব ছিল। আশা-আকাঙ্ক্ষা, ভালবাসার সাধ, ঘরকন্নার সাধ, ছেলেমেয়ের মা হওয়ার সাধ। আজ এতকাল পরে তুমি বুঝেছ। খুশি হতে পেরেছ। চলেও এসেছ। কিন্তু এখন আমার তো আর কিছু নেই। না কোন ইচ্ছে, না কোন সাধ।

—শুধু কি আমি একা এজন্যে দায়ী? তুমিও দায়ী নও?

—সে কি স্বীকার করিনি? তোমার পায়ে মাথা ভেঙে ক্ষমা চাইনি?

পারু চুপ করে থাকে। জবাব খুঁজে পায় না। সত্যি তো, সেদিন অমন করে ওকে ফেলে না পালিয়ে সাহসের সঙ্গে ওকে শাসন করতে পারত। জয় করতে পারত।

পারেনি হয়ত শুধু ডালিম অর্থাৎ মহারাজার ভয়ে। তার খালি ভয় হত, কবে হৈমন্তীকে পুরোপুরি গ্রাস করার জন্যে সে তাকে ছুরি মারবে!

সে-ডালিম গতকালকের দেখা ডালিম তো ছিল না।

হৈমন্তী মুখ তুলে বালিশে চিবুক রেখে বলে—আজ তুমি এসে অধিকারের কথা তুলছ বার বার। তখন কোথায় ছিলে, যখন...সে ফুঁপিয়ে কেঁদে আবার বলে—যখন পলাশপুরের ভদ্রলোকেরা বাড়ির আনাচে-কানাচে অশ্লীল ইঙ্গিত করত। টাকার লোভ দেখাত! এক রাতও ঘুমতে দিত না! তখন যদি ও না থাকত, আমি কোথায় ভেসে যেতুম বুঝতে পার না? সেদিন আমার কাছে ও ঈশ্বর হয়ে এসে দাঁড়িয়েছিল। আমাকে অনেক লজ্জা থেকে বাঁচিয়েছিল। না খেয়ে মরতে দেয়নি। আমি কেমন করে অকৃতজ্ঞ হব?

সে আবার বালিশে মুখ গুঁজে নিঃশব্দে কাঁদে। পারু তার দু কাঁধ ধরে ঝুঁকে বলে—হৈমন্তী! শোন! একটা কথা শোন! লক্ষ্মীটি!

কিছুক্ষণ পরে কান্না থামিয়ে হৈমন্তী অস্ফুট স্বরে বলে—তুমি সন্ধ্যার ট্রেনে চলে যাও।

—আমি তোমাকে নিয়ে যাব।

হৈমন্তী দ্রুত মুখ ঘুরিয়ে ওর দিকে তাকায়। তারপর উঠে বসে। বলে—কি বললে?

—আমি তোমাকে নিয়ে যাব।

—গায়ের জোরে বুঝি?

—যদি বল, তবে তাই!

—পারবে না। নিরুদের আমার পাহারায় রেখে গেছে, টের পাচ্ছ না?

—কিন্তু কেন তুমি এখানে এভাবে পড়ে থাকবে? পারু তীব্র স্বরে বলে কথাটা। —এতদিন না হয় আমার বদলে ডালিম ছিল। ডালিম আর আমি আলাদা নই, জান না? ডালিম গেছে, এখন আমি যদি তার অধিকারেই বলি, আমার কাছে থাক?

—আমার কী ভাগ্য! হৈমন্তী চোখ মুছে বাঁকা ঠোঁটে বলে একথা। —তবে শুধু তুমি একা নও, এখন পলাশপুরে আবার অনেকেই করুণা দেখাতে আসবেন, জান তো? এমন কি আমার অন্নদাতা সেই সেক্রেটারি ভদ্রলোকও।

—তবু তুমি এখানে থাকবে?

—থাকব। তখন বয়স আর অভিজ্ঞতা কম ছিল। এখন দুটোই বেড়েছে। হৈমন্তী আত্মবিশ্বাসের দৃঢ়তা ফুটিয়ে-বলে। —এবার নিজে একা লড়াই করতে পারি কি না দেখতে চাই। শেষ অবধি যদি হেরে যাই...

—তাহলে? তাহলে আমার কাছে যাবে তো?

—কথা দিতে পারছি না। চেষ্টা করব। আর তখন...তখন তুমিও তো বদলে যেতে পার!

—বদলাব না। আমি তোমাকে ছুঁয়ে কথা দিচ্ছি হৈমন্তী।

পারু হাত বাড়িয়ে তার ডান হাতটা নেয়। হৈমন্তী বাধা দেয় না। পারু ফের বলে—আমি সব সময় তোমার অপেক্ষা করব। যদি অনুমতি দাও মাঝে মাঝে আসব।

হৈমন্তী শ্বাসপ্রশ্বাস মিশিয়ে বলে—এস।

পারু তবু কতক্ষণ ওর হাতটা মুঠোয় ধরে থাকে। তারপর ছেড়ে দেয়। খাট থেকে উঠে দাঁড়ায়। বাইরের দিকে তাকিয়ে বলে—আমার শাস্তিটা অবশ্য খুব বেশি হয়ে গেল। হোক। কিন্তু আমি সত্যি বড্ড একা হৈমন্তী। এত ভীষণ নিঃসঙ্গতা আমার। বড্ড ভয় হয়, কবে না ডালিমের মত নিজেকে শেষ করে ফেলি!

হৈমন্তী বলে—কথাটা শাসানির মত শোনাচ্ছে। ব্ল্যাকমেল করতে চাইছ বুঝি?

—নাঃ! বলে ভারি একটা নিঃশ্বাস ফেলে পারু। তারপর ওর দিকে ঘুরে বলে—কবর দেখতে আর যেতে ইচ্ছে করছে না। তুমি কি যাবে?

হৈমন্তী খাট থেকে নেমে আসে। মাথা দুলিয়ে বলে—না।

—এখন কোন ট্রেন আছে?

—এখনই যাবে?

—যাই। থাকা মানে সারাক্ষণ তো তোমার সঙ্গে ঝগড়া করা। তাই না?

হৈমন্তী তার দিকে একবার তাকিয়ে মুখ নামায় এবং বলে—তুমি আমাকে ভীষণ দুর্বল করে দিয়েছ হয়ত। ইচ্ছে করছে, অন্তত একটা রাত তোমাকে থেকে যেতে বলি। জান, আজ রাতটা কীভাবে যে কাটাব, বড্ড অস্বস্তি হচ্ছে! তুমি থাকবে?

পারু তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলে—আমারও থাকতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু...

—কিন্তু কী পারু?

—একটা শর্ত। তুমি আমার কাছে থাকবে তো?

হেমন্তীর ফ্যাকাশে মুখে রক্তের ছটা খেলে যায় কয়েক মুহূর্ত। মুখটা দ্রুত নামায়। নাসারন্ধ্র কাঁপে। তারপর খুব আস্তে বলে—থাকব। কিন্তু তোমার খারাপ লাগবে না?

—না, একটুও না। তুমি তো জান কোন বাজে সংস্কার আমার নেই!

পারু সাহস করে ওর দু কাঁধ ধরে আকর্ষণ করে। হৈমন্তী বাধা দেয় না। তার বুকে মুখ রাখে নিঃশব্দে। মাত্র কয়েকটি সেকেন্ড। তারপর নিজেকে আস্তে আস্তে ছাড়িয়ে নিয়ে বলে—ছোট লাইনের ওদিক বেড়াতে যাবে?

পারু বলে—বেশ তো। চল! তারপর ওখান থেকে বরং গোরস্থানটা ঘুরে আসবে।...

শেষরাতে পারুর ঘুম ভেঙে যায় হঠাৎ। হৈমন্তীর ঘরের সব জানলা খোলা। বাইরে জ্যোৎস্নার সঙ্গে ঘন কুয়াশা জড়িয়ে আছে। ঘুমঘুম স্বরে পাখি ডাকছে। হৈমন্তী পাশ ফিরে শুয়ে আছে। একটু উঠে কাচভাঙা ঘড়িটা বালিশের পাশ থেকে তুলে সময় দেখে, সাড়ে চারটে বাজে। সাড়ে পাঁচটায় একটা ট্রেন আছে। সে হৈমন্তীর গায়ে হাত রেখে একটু ঠেলে ডাকে—হিম! হৈমন্তী গাঢ় ঘুমে কাঠ হয়ে আছে। থাক, পরের কোন ট্রেনেই যাবে। সে সাবধানে নেমে আসে খাট থেকে। সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই খুঁজে নেয়। তারপর দরজা খুলে বাইরের বারান্দায় যায়। ডালিমের ঘরের দিকে তাকিয়ে একটু অস্বস্তি হয়। অস্বস্তি ঝেড়ে ফেলে বারান্দার চেয়ারে গিয়ে বসে। কাল অনেক রাত অবধি বসে কথা বলেছে এখানে—হৈমন্তী পাশে রেলিংয়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থেকেছে। পারু সিগারেট জ্বেলে একবার পিছনটা হঠাৎ দেখে নেয়। মনে হয়, কাল রাত থেকে সারাক্ষণ ডালিম তার পিছনে ঘুরছে। যেন সারাক্ষণ তার নিঃশ্বাস কাঁধের কাছে এসে লাগছে। পারু কয়েক টানে সিগারেট শেষ করে উঠে দাঁড়ায়। দ্রুত ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে এবং খাটে গিয়ে শুয়ে পড়ে। তারপর হৈমন্তীকে টেনে নিজের দিকে ঘোরায়। হৈমন্তী ঘুমজড়ান গলায় বলে—কটা বাজছে?

পারু বলে—দেরি আছে এখনও। ঘুমোও।—

বাসস্থান

রেলগাড়িগুলো এখানে এসে কাঁপা-কাঁপা গলায় শিস দিতে দিতে ধনুকের মত বেঁকে যায়। দিয়াড়িদের কাচ্চাবাচ্চারা হেসে কুটিকুটি হয়ে চ্যাঁচায়, ডর বেজেছে! রেলগুড্ডঠো ভয় পেয়েছে। সত্তর বছর আগে এই লুপলাইনের পত্তন। বাবলা নদীর দুই পাড়ে ছিল একটানা বুনো 'কুলের জঙ্গল। তাই থেকে কুলবেড়ের বাঁক।' বিহারে গঙ্গার দিয়াড় বা চর থেকে উচ্ছেদ হয়ে একদল লোক এসে কুলবেড়ের জঙ্গলের ধারে বসত করেছিল। রক্তে চাষবাসের নেশা ছিল বলে সেই রকম একটা মতলবও ছিল। কিন্তু প্রথম-প্রথম জঙ্গল ছুঁতে সাহস পায়নি। পরে এলাকার সাঁওতালদের দেখাদেখি কুলগাছ থেকে লাক্ষা ছিঁড়েখুঁড়ে নিয়ে যেত নবাবগঞ্জের মারোয়াড়ি গদিতে। পয়সার এক ধাড়াদর—অর্থাৎ পাঁচ সের। তখন পয়সায় পাক্কি এক পোয়া চাল। তাতে পেট ভরার কথা নয়। সাহস করে কেউ-কেউ একটু করে জঙ্গল উড়িয়ে কোদাল কুপিয়ে চাষবাসের ধান্দা করত। জঙ্গল কথাটায় যত রহস্য, শিক্ষিতের সৌন্দর্যবোধ এবং রোমান্টিসিজম লেপটালেপটি হয়ে থাক, জঙ্গল ধড়িবাজ সুদখোর মহাজনের মত চোখের জল পাছায় মুছিয়ে ছাড়ে। মুর্শিদাবাদ নবাবি নেজামতে মাটির গন্ধ ভেসে যেতেই সামন্ততন্ত্রের বুড়ো ও আফিমখোর যখ গরগর করে বলল, দেওয়ানজিকো তলব ভেজ। হাতির গলায় ঘণ্টা। হাতির পিঠে ধূসর জীর্ণ মখমলে ঢাকা হাওদা। হাওদায় দেওয়ানজি। নবাবগঞ্জ আর কুলবেড়ের মাঝামাঝি ছিল কাছারিবাড়ি। নবাবগঞ্জের কুদরত মিয়া গোমস্তা সেই ভূতের বাড়ির পাহারাদার। দয়াধর্ম ছিল। সর্বোপরি হৃদয়ে প্রেমরোগ ছিল। কুলবেড়ের দিয়াড়নিদের দিকে চেয়ে-চেয়ে চুলে পাক ধরতে-ধরতে ওই রোগে কলজে পচে যাচ্ছে। দেখেও কিছু দেখেন না। নবাববাহাদুরের হাতির গলার ঘণ্টা শুনে টনক নড়েছিল। দিয়াড়িদের রক্ষককে ভক্ষক হতে হয়েছিল দেওয়ানজির তম্বির চোটে। দেওয়ানজি মণি সিং এলেন, দেখলেন এবং জয় করলেন। কুলবেড়ের ইজারাদার করে গেলেন কুদরত মিয়াকে। লাক্ষাবাবদ বকেয়া শুল্ক পকেট থেকে গুনাগার দিতে হল। [illegible]। হায় প্রেম! মাগীরা এতকাল চোখঠার, একঝিলিক হাসি, দোদুল্যমান বক্ষ এবং পশ্চাদ্দেশ দেখিয়েই কত মণ লাক্ষা ছিঁড়েছে, বলার নয়। কুদরত কুদরতী দেখিয়ে দিলেন শেষ বয়সে। পুরো জঙ্গল সাফ হয়ে গেল। বিঘে প্রতি পঁচিশতংকো সেলামি, বাৎসরিক খাজনা চারি আনা পাঁচ গণ্ডা মাত্র। দিয়াড়িদের বসত উজাড় হয়ে গেল প্রায়। ঘর পাঁচেক থেকে গেল মাটি কামড়ে। আর অ্যাডভেঞ্চার সয় না। বেদখলি মাটির খোঁজে হন্যে হয়ে আর ঘুরতে ভাল লাগে না। পরের মাটি চযে-বোনে। পরের ফসলে আঁটি বাঁধে। শিরিসতলায় সন্ধ্যাবেলায় তাড়ি খেয়ে ঢোল বাজায়। নাচ করে, গান করে। রাতটা কেটে যায়। সকালে দিয়াড়নিরা যায় ঘুঁটে কুড়োতে। শাক তুলতে। মাছ ধরতে। বেচে আসে নবাবগঞ্জের বাজারে। দিয়াড়িরা যায় মুনিশ খাটতে। তারপর এসে গেল রেললাইন।

পাঁচঘরের ছাপোনা বেড়ে বিশঘর হয়েছে এখন। অনেকে তিন-পুরুষ ধরে রেলের গ্যাংম্যান হয়ে বেঁচে আছে। রেল কোম্পানির দয়ায় কেউ কেউ খালাসি বা পয়েন্টসম্যানও। রেললাইনের তলায় দিয়াড়ি মেয়ে-মরদের অনেক মাটির হিস্যা আছে। সেই মাটি পেয়ে রেল খুশি হয়ে কোল দিয়েছিল। তবু ভাত-কাপড়ের অভাব ঘুচল না। মুনিশ খুঁজতে এখনও লোকে কুলবেড়ে ছুটে আসে। এখনও দিয়াড়নিরা নবাবগঞ্জের বাজারে সারবেঁধে বসে শাক বেচে। মাছ বেচে। কাঠ বেচে। হাঁস-মুরগির ডিমও। ভদ্রলোকেরা তাদের অপুষ্টিজনিত বিশীর্ণ শরীরে এখনও অমৃতের আশা করেন এবং চোখের ঝিলিকে দেখেন স্বর্গের জ্যোতি এবং কালো কালো মেয়েগুলোকে ভাবেন খরার তৃষ্ণার দিনে নিটোল

তরমুজ, ভেতরে রক্তিম কোমল রসাল শাঁস। হাঁটু দুমড়ে সামনে বসে সময় নিয়ে দরাদরি করেন। কিন্তু তারা কুলবেড়ের সাপিনীদের সংসর্গে ফোঁস করতে শিখেছে। পলকে ফণা তোলে। জাতের বড় হুঁশ এবং গিদের তাদের। অহঙ্কার।

শুধু একজন বাদে। অহঙ্কার ত্যাগ করল প্রেমে। সন্ধির মেয়ে নির্মলা। আশ্চর্য ঘটনা, সন্ধি তাকে লেখাপড়া শেখাতে পেরেছিল। সন্ধি নবাবগঞ্জের স্টেশনে বাপের জায়গায় খালাসি হয়েছিল। কুলবেড়ের বাঁকের মুখে ডিসট্যান্ট-সিগন্যালের মাথায় চড়ে শেষ-বিকেলে সে এক হাঁক মারত—নিমলি গে! হেই নিরমলা—আ-আ! বাড়ি থেকে বেরিয়ে নাকবরাবর সিধে নয়ানজুলি পেরিয়ে বাপের কাছে চলে আসত ফ্রকপরা মেয়েটা। হাতে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বর্ণবোধ আর স্লেটপেন্সিল। বাপের পেছন-পেছন হেঁটে যেত স্টেশনের দিকে। বাপের হাতে একচোখো ভুতুড়ে লণ্ঠন আর কেরোসিনের টিন। সিগন্যালবাতি জ্বালানো তার কাজ।

স্টেশনঘরের ভেতর বুড়ো স্টেশনবাবু নির্মলাকে যত্ন করে পড়াতেন। বাঙালি সংস্কৃতি এবং সভ্যতা শেখাতেন। নির্মলা সেই থেকে সংস্কৃতি, সভ্যতা এবং পরে অনিবার্যভাবে প্রেম জেনেছিল—ওইটুকু বয়সেই। বুড়োবাবু আর নির্মলাকে জড়িয়ে-মড়িয়ে অশ্লীল ঠাট্টা চলত রেলমহলে। সন্ধির কানে আসত কখন-সখনও। সে গ্রাহ্য করত না। কিছু গ্রাহ্য করার স্বভাব নয় সন্ধি দিয়াড়ির। বিহারে আপন জাত টুঁড়ে-টুঁড়ে তিন-তিনবার মেয়েকে গছিয়েছিল। তিন-তিনবারই নির্মলা পালিয়ে আসে। অগত্যা সন্ধি বলেছিল, তো র'। ঘরকে র'। ফির যদি হামি তোর বিভার কথা কহি তো হাম শালা বেজম্মা আছি। এটা সন্ধির রাগ নয়। ঔদাসীন্য।

নির্মলা, অহঙ্কারী দিয়াড়নি,—তার প্রেম তারই তেইশটা বছর একবার মাত্র হাত ঘষেই স্লেটের লেখার মত মুছে দিল। তার স্মৃতি, সংস্কার, শুওরের মাংস খাওয়া, ঠাকুরবাবার থানে মানত ও শুয়েপড়া ভক্তি, বাধাই পরবে নৃত্যগীত, অন্তত দুখোরা গাঁজন সফেন তালরস পানের আনন্দ, ডিসট্যান্ট-সিগন্যালের মাথায় শকুন দেখে আতঙ্কে বাপের কথা ভাবা, তিন-তিনটি দিয়াড়ি যুবকের প্রধর্ষণ—সব, সব কিছুতে লাথি মেরে ছত্রখান করল প্রেম। বুঝে দেখলে প্রেম সামান্য জিনিস নয়। যেখানে জাতধর্মের বেড়া আকাশছোঁয়া, সেখানে প্রেমের অসামান্যতা তাক লাগিয়ে দেয়। বোঝা যায়, প্রেম কী বিষম বস্তু। কী সাংঘাতিক তার জোর। সেই জোর সন্ধি দিয়াড়ির মেয়েকে মৌলবীর কাছে কলমা পড়িয়ে ছেড়েছে।

নির্মলা হয়েছে লায়লা খাতুন। কুদরত মিয়ার কুদরতি যা পারেনি, তাঁর নাতি আজাই তা পেরেছে এতকাল পরে। কিন্তু হারামজাদা প্রেম একচোখাও বটে। আজাইয়ের বেলা তার এতটুকু ডাল গলেনি। আজাই তার স্মৃতি, সত্তা বর্তমান নিয়ে যা ছিল, তাই আছে। তার একটা মোটরসাইকেলও আছে। পেছনে দিয়াড়নি বউকে চাপিয়ে আওয়াজ দিতে দিতে ধুলিয়ান যায়, নিমতিতা যায়। জঙ্গিপুর ঘুরে আসে। যায় বন্যেশ্বর ঈশানদেবের মেলায় শিবচতুর্দশীর রাতে! কখনও যায় বহরমপুর। কলকাতা বা বোম্বের আর্টিস্ট এলে ফাংশন। একশ-দু'শ টাকার পেট্রন আজাই। লাইনে দাঁড়িয়ে টিকিট কাটতে হয় না। তার চোখে সানগ্লাস। তার দিয়াড়নি বউটার চোখেও সানগ্লাস। হাতাকাটা ব্লাউস আর জর্দারঙের জাপানি সিন্থেটিক শাড়ির জমিনে হলদে চন্দ্রমল্লিকা। বিদেশি লিপস্টিকে ঠোঁটদুটো রাঙা। চামড়ার ভোল বদলে গেছে। ভ্রম হতে পারে আড়ালে মুভি ক্যামেরা ঘাপটি পেতে আছে, সামনে হিরো-হিরোইন। আজকাল কত তামাশা গাঁয়ে-গঞ্জে! ক্ষেতের দিয়াড়ি মুনিশ হাওয়ায় থুথু ছুড়ে বলে, শালি রাণ্ডি...শব্দগুলো লেখার যোগ্য নয়।

সন্ধি একঘরে হয়েছে। শিরিসতলায় খাটিয়া পেতে বসে মাছধরা জাল বুনতে বুনতে বুড়িয়ে যাচ্ছে। বাবলা নদীতে দু-দুটো বন্যা গেল। কার্তিকে জল নামলে মাছের মরশুম। সামনে বছর বেঁচে থাকলে বুড়োদিয়াড়ী একটা চিতল মাছ ধরবেই। পূর্ণিয়া জেলায় গঙ্গার দিয়াড়ে তার ঠাকুর্দা মাঠিয়া একবার একটা চিতল ধরেছিল। কবে শেষ হবে সন্ধির জাল?

ওগে বুঢ়া! দেখ্ দেখ্! তেরা ধৌলি লাইনপর উঠলে গে! হু দেখ, গুড্ডি আ গইল বা!

কুলবেড়ের বাঁকের ওধারে বাবলা নদী পেরুচ্ছে ঝমর ঝম কামরূপ এক্সপ্রেস। ধনুকবাঁকা হবার

আগেই চেরা গলায় শিস দিতে লেগেছে। কাচ্চা-বাচ্চারা অভ্যাসে নয়ানজুলির দিকে দৌড়ে যাচ্ছে। ডর বেজেছে! রেলগুড্ডিঠো ভয় পেয়েছে! বুড়ো দিয়াড়ি জাল ফেলে রেখে ওঠে। কপালে হাত রেখে সূর্য করে তাকায়। ধৌলি গাইটাকে ডিসট্যান্ট-সিগন্যালের গোড়ার সঙ্গে বেঁধে এসেছিল। হাঁটু দুমড়ে হারামজাদি মুখ বাড়িয়ে একহাত জিভ দিয়ে পাথরের ফাঁকে গজান কচি দুব্বো ছোঁবার চেষ্টা করছে। ধাক্কা বাজতে পারে।

সন্ধি দিয়াড়ি নড়বড় করে হাঁটতে থাকে। হাঁক মারে—ধোঃ ধোঃ। তফাত যা, তফাত যা।

ডুমুরদের বাড়িটা কত একলা হয়ে একটেরে পড়ে গেছে, দশবছর আগে সেটা ঠাওর হয়নি মামুনের। এই দশটা বছর এখানকার কোন স্মৃতিই তার মনে নেই। গতরাতে এসে সদর দরজার দিকটা দেখে কিছু বোঝেনি। সকালে পেছনদিকের বারান্দায় দাঁড়িয়ে চারপাশটা দেখে তার খুব অবাক লেগেছে। কাসেম মল্লিকের পোড়ো ইটভাটা পর্যন্ত নজর যাচ্ছে দক্ষিণে। পুবে উঁচু রেললাইন আগাছার মাথায় ঝিকমিক করছে টান-টান রুপোলি ফিতের মত। খানিক দূরে স্টেশনের লাল বাড়িগুলো, মার্কেটিং কো-অপারেটিভের বিশাল গুদাম, সিংহবাহিনীর মন্দির পর্যন্ত ফাঁকা ধানক্ষেত। ভীষণ অবিশ্বাস্য। মিয়াপাড়ার অনেকটা কেউ কামড়ে তুলে নিয়ে গেছে। প্রকৃতি শূন্যতা সয় না বলেই সবুজ রঙের নকসিকাঁথা চাপিয়ে দিয়েছে। ভিটেয় ঘুঘু চরা বলতে কি এইরকম? মামুন কান করে ঘুঘুর ডাক শোনে।

ডুমুর কোমরে আঁচল জড়িয়ে উঠোন সাফ করে এদিকে এল। হাতে ঝাঁটা। এ বারান্দার নিচে টুকরো জমিটায় সবজিফলমূল এবং ফুলের চাষ আছে। ওপাশে বেতের জঙ্গলে ঘেরা ছোট্ট পুকুর। ভাঙা ঘাটের ওপর মঙ্গলতোরণের মত দুপাশে কয়েকটা কলাগাছ। টাটির বেড়া সরিয়ে সিঁড়ির ধাপ। ডুমুর সেখানে মামুনকে দেখে একটু হাসে। মামুন, ওখানে কী করছ?

মামুন ঘুরে চমকানোর ভান করে বলে, আরে! তুমি কি এক্ষুনি ঝেঁটিয়ে বিদেয় করতে এলে নাকি?

যদি ভাব, তবে তাই। ...ডুমুর একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছে। ফের বলে, ওখানে দাঁড়িও না। শুঁয়োপোকা পড়তে পারে গায়ে। চেয়ার নিয়ে বারান্দায় বস না।

সে দ্রুত বারান্দার ওপর ঝাঁটা বোলাতে থাকে। একটু পরে লু হাওয়া শুরু হবে। আবার শুকনো পাতা উড়ে এসে বারান্দায় ঘুরপাক খাবে। গতরাতে মামুন আসার ঘণ্টাদুই পরে একটা ঝড় উঠেছিল। দুচারফোঁটা দিয়ে ঝড়টা চলে গিয়েছিল। এ বাগানে তার চিহ্ন ছড়িয়ে আছে। রজনীগন্ধার ঝাড়ের ওপর ভাঙা নিমের ডগা। বেগুনগাছের ওপর একটা শুকনো তালবাগড়া। বারান্দা জুড়ে একরাশ কোণঠাসা সবুজ পাতা। ফুটোফাটায় পিঁপড়েরা সারবেঁধে ডিম বয়ে আনছে নিচের মাটি থেকে। ডুমুর ঝুঁকে দেখতে থাকে। বারান্দার নিচে দিয়ে সারটা আসছে আর আসছে। একটু পরে সে এই উদ্বাস্তুদের আদি বাসস্থান আবিষ্কার করে। কাঠমল্লিকার গোড়ায় ন্যাড়া মাটির স্তূপে বেচারারা সুখের ঘর বেঁধেছিল।

মামুন কাছে এসে বলে, কী দেখছ? ওরেব্বাস! কত্ত পিঁপড়ে! এই ডুমুর, পেস্টিসাইডস নেই ঘরে?

ডুমুর ঝুঁকে থেকেই বলে, কেন? নেই।

বাঃ! বাগান-ফাগান করেছ পোকামাকড় মারার ব্যবস্থা নেই?

ডুমুর সোজা হয়। একটু হাসে...দেখতেই তো পাচ্ছ! আজকাল পোকামাকড় সাপ-ব্যাঙ আমাদের পড়শি।

মামুনও হাসে। ...তা ঠিক। কিন্তু অতসব লোক গেল কোথায় বল তো?

তুমি যেখানে গিয়েছিলে।

সব্বাই? যাঃ, বিশ্বাস হয় না। মামুন তিনদিকে চোখ বুলিয়ে বলে। আমি যখন গেলাম—থুড়ি, মানে পালালাম, তখনও তো এত ফাঁকা ছিল না। ফারু মিয়ারা ছিলেন ওখানে। রাখুমিয়া ছিলেন—ওই যে নিমগাছের ওখানটায়। ঠিক বলছি না?

ডুমুর একটু চুপ করে থাকার পর বলে, তুমি যাওয়ার পর সে এক কাণ্ড জান? অনেকে চলে এসেছিল খানসেনাদের তাড়া খেয়ে। আমাদের বাড়িভর্তি লোক তখন। তিনমাস ধরে থাকল। আব্বার

স্বভাব জান তো? তবে হিন্দুরাও জায়গা দিয়েছিলেন। বরকত মিয়াদের বাইরের বাড়িটায় লঙ্গরখানা খুলেছিল। সে এক দিন গেছে!

তারপর সে ফিক করে হাসে...মামুন, আজাই কী করেছে জান?

আজাই—মানে বরকত মিয়ার ছেলে?

হুঁ। কুলবেড়ের সন্ধি দিয়াড়ির মেয়েকে ভাগিয়ে এনেছে।

মামুন নড়ে ওঠে। ...সন্ধি? সন্ধির মেয়ে ছিল নাকি?

কুলবেড়েতে তোমাদের আখড়া ছিল। আর সন্ধির মেয়েকে চেন না?

কে জানে! অত কিছু লক্ষ করিনি।

ডুমুর পা বাড়িয়ে বলে, তখন অবশ্যি কচি মেয়ে। ফ্রক পরে বেড়াত। স্টেশন-মাস্টারের কাছে হাতেখড়ি করে সন্ধি ওকে স্কুলে ঢুকিয়েছিল। ক্লাস সিক্সে ফেল করে বিয়ে দিয়েছিল। আঙুরের সঙ্গে পড়ত মেয়েটা।

মামুন বলে, আসার আগে আঙুরের সঙ্গে দেখা করে এলে ভাল করতাম।

তুমি তো ঠিকানা জানতে না?

হুঁ, সেও কথা। ওরা ঢাকায় কোথায় থাকে বল তো?

ধানমণ্ডিতে।

তুমি গেছ?

ডুমুর মাথা দোলায়।

আঙুর যেতে লেখে না, বুঝি?

লেখে। এই তো ওমাসে এসেছিল। সাধছিল সঙ্গে যেতে।

গেলে না কেন?

ডুমুর হঠাৎ চটে যায়। সবাই তো তোমার মত নিনেংটে নয়। হুট করে বেরুলেই চলে না। বাড়ি আগলাবে কোন যক? আর আব্বা এমন মানুষ ; হাত পুড়িয়ে রাঁধার ভয়ে পেটে পাথর বেঁধে পড়ে থাকতে রাজি।

মামুন সায় দিয়ে বলে, হুঁ—তোমার প্রব্লেম। তবে মুনুমিয়ার হোটেলটা নেই?

ডুমুর হেসে ফেলে। ঘরে ঢুকে বলে, কী জান? বাঙাল মুসলমান আমার চক্ষুশূল। এদেশে যদি হিন্দুরা আমাকে মেরেকেটে ফেলে, সেও ভাল।

মামুন সিগারেট জ্বালতে জ্বালতে থেমে বলে, তোমাকে মারবে না। কাটবে না। লুঠ করবে।

বলেই সে একটু অস্বস্তিতে পড়ে যায়। ডুমুর কী ভাবে নিল কথাটা? প্রকারান্তরে 'লুঠের মাল' অনুষঙ্গ এসে যায় না? বারান্দায় দাঁড়িয়ে চুপচাপ সিগারেট টানতে থাকে মামুন। বাড়ির ভেতরটা খুব চুপচাপ মনে হয় এতক্ষণে। চুপচাপ থাকাটাই অবশ্য স্বাভাবিক। মোজাই চৌধুরি—মোজাম্মেল হোসেন চৌধুরি গেছেন থলে হাতে বাজারের দিকে। বাড়িতে ডুমুর একা। ঝি-চাকর রাখার রেওয়াজ ছিল আগে। ডুমুর তুলে দিয়েছে সেটা। শুধু একজন মাহিন্দার আছে। জমিজমা দেখাশোনা করতে তাকে দরকার। সে কুলবেড়ের এক দিয়াড়ি। মামুন তাকে চেনে। চৌধুরি বলছিলেন, সুরেনকে ভাগচাষী বলে খুব লেলিয়ে দিতে চেষ্টা করেছিল। সুরেনের কথা, হামি মাহিন্দার ছে! অপারেশন বর্গার হিড়িক বাবা, বুঝলে তো? ওরা আবার তোমাদের চেয়ে এককাঠি সরেস। বিঘে পাঁচেক জমিতে এসে ঠেকেছে। এটুকুনও বুঝি যায়-যায়।

অনেকটা রাত অবধি কথা বলেছেন চৌধুরি। বড়মেয়ে ডুমুরের কথা। ছোট মেয়ে আঙুরের কথা। তাদের মায়ের কথা। দিব্যি শরীরস্বাস্থ্য ভাল ছিল। হঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই,—বুক গেল, বুক গেল করে পড়ে গেলেন। তারপর আর নেই। বিপদের ওপর বিপদ। সেদিনই ডুমুরের তালাকের দিন। চৌধুরি সকালের ট্রেনে ধুলিয়ান যাবেন তালাকনামা আনতে। ডুমুরকে কদিন আগে রেখে গেছে জামাইয়ের ছোটভাই। এদিকে এই মৃত্যুদূত আজরাইলের হাতে পরোয়ানা এসে গেল। সবই খোদার মর্জি। স্কুলফাইনাল পাশ মেয়ে পড়েছিল এমন লোকের হাতে, যে কি না বিড়ি বেঁধে খেত। পরে

কারিগর রেখে বিড়ির কারখানা করেছিল। পয়সা হল তো, মিয়ার রোয়াব গেল বেড়ে। ফের শাদি চড়ল মাথায়। ডুমুর সতীনের ঘর করার মেয়ে নয়। একালের মেয়ে। শিক্ষিতা। আর তুমি তো দেখেছ বাবা মামুন, সেই অ্যাট্টুকুন থেকে দেখেছ ডুমুরকে। ভালই জান আমার মেয়ের মতিগতি।

জানে মামুন। ডুমুরকে সে ন্যাংটো দেখেছে। ডুমুরও তাকে ন্যাংটো দেখেছে। দাদাপীরের মাজারের নিচে দীঘি আছে। শান-বাঁধান ঘাট। ফ্রক খুললেই মামুন টের পেত, ডুমুর কী করবে। এদিক-ওদিক তাকিয়ে পেন্টুল খুলেই ঝাঁপ দিত। দেখাদেখি মামুনও। কালো জলের ভেতর দুটি পিছল কোমল কাতলা মাছ যেন পরস্পরকে ঢুঁ মেরে খেলত। ঘাটে লোক এলে অনেকক্ষণ জলে থেকে গা দুধের মত সাদা। ঠোঁটের দুপাশে সাদা দাগ।

আঙুর ছিল অন্যরকম। জলে মামুন। ডুমুর বোনের পেন্টুলের ফাঁস ধরে টানাটানি করছে। শেষে ভ্যাঁ করে উঠলে পিঠে থাপ্পড় মেরে বড়বোন তাকে জলে ঠেলেছে। তাই বলে ছোটবোন মরে গেলেও বলবে না যে আপা (দিদি) ধাপে পেন্টুল রেখে জলে নামে। মামুনের সামনেই।

নবাবগঞ্জ তখনও পাড়া গাঁ ছিল। জঙ্গল ছিল। বাঘও ছিল। শেষ বাঘটা মারা পড়েছিল কুদরত মিয়ার বন্দুকের গুলিতে। কিন্তু নবাবি আমলের গঞ্জ জায়গা বলে পাকা বাড়িঘর ছিল অনেক। কো-এডুকেশনের ইস্কুল ছিল। দাতব্য হাসপাতাল ছিল। থানা এবং ডাকঘরও। সপ্তায় দুদিন হাট বসত। বাবুপাড়া আর মিয়াপাড়ার ছেলেদের ক্লাব ছিল। ফুটবল ম্যাচ হত। লাইব্রেরিতে ফাংশন হত।

মামুনের জন্মের মাস ছয়েক পরে ডুমুরের জন্ম। মামুন ক্লাস নাইনে ফেল করলে ডুমুর তার সঙ্গ নিয়েছিল! ডুমুর আড়ালে তার কাছে সিগারেট চেয়ে নিয়ে টানবার চেষ্টা করত। নস্যি নেওয়া শিখত। ছেলেদের প্রচণ্ড ওরে হ্যাঁরে তুই-তোকারি করত। কান টেনে দিত। ওর চাচাত ভাইরা তখনও পাকিস্তানে যায়নি। এ বাড়িতে এসে তাসের আড্ডা বসাত। ডুমুরও খেলত। ওর মা বকলে আব্বা মোজাই চৌধুরি বলতেন, আহা! লাইফে সবরকম জিনিস শেখা ভাল। পরের সঙ্গে তো খেলছে না। আপন ভাই-ভগ্নড় সব। খেলুক।

তবু ডুমুরকে অন্য চোখে দেখা কঠিন ছিল মামুনের। এর একটা কারণ সে বুঝতে পারে। ডুমুরের শরীর ও মনের মধ্যে কী এক দূরত্ব। এটা বরাবর দেখা। বেশির ভাগ মেয়েই তো ঝটপট নিজের শরীরকে চিনে ফেলে এবং শরীরের খুব কাছে মনকে টেনে আনে। কেউ আবার তেলেজলে মেশাবার চেষ্টায় শরীর-মন মাখামাখি করে রাখে। যেমন আঙুর খুব সেজেগুজে থাকত। আলতাও পরত। পরার পর চেয়ারে বসে পাদুটো বাড়িয়ে তাকিয়ে থাকত। বারবার বুকের কাপড় টেনে দিত। চুলের গোছা পিঠে না বুকে ঝোলাবে ভেবেই পেত না। ডুমুর অন্যরকম। উঠোনে কুয়োতলায় দাঁড়িয়ে আছে। ব্লাউজে ঢাকা একটা স্তন পুরো বেরিয়ে আছে। হুঁশ নেই। ওদের ঠাকমা ছিলেন খানদানি গ্রাম সালারের মেয়ে। ভাইরা পাকিস্তানে জজ, রাষ্ট্রদূত। কে নাকি মন্ত্রীও হয়েছিলেন। সেই দাদিবেগম ছড়ি তুলে বলতেন, অই অই! ও কি দাঁড়ান মেয়ের! শয়তানের নজর লাগবে না বেতমিজ কাঁহেকা?

দাদিবেগমের প্রথম মাথায় আসে, ডুমুরের দামাঁদমিয়া (বর) হোক জাকের কাজির বেটা মামুন। মামুন তখনও কলেজের ছাত্র। ট্রেনে ডেলিপ্যাসেঞ্জারি করে বহরমপুর পড়তে যায়। মামুনের বাবা বেঁচে নেই। গার্জেন বলতে মা নাদিরা বেগম। তিনি বড় কড়াধাতের মেয়ে ছিলেন। শুনেই চোখ কপালে তুলে বলেছিলেন, ও মা সে কী কথা! মামুন আমার সেদিনকার ছেলে। আপনার বড়-নাতনির সঙ্গে ওকে মানায়? তাছাড়া এখনও পড়াশুনো করছে। বরঞ্চ আপনার ছোট-নাতনির সঙ্গে কথা হলে ভেবে দেখব'খন। পাস করে বেরুক। চাকরি-বাকরি হোক।

কথাগুলোর কী সুর ছিল, দাদিবেগমের মনে জোর বেজেছিল। কাজির বিবির বড্ড দেমাক হয়েছে রে মোজাই? ভালমুখে কথাটা তুলতে গেলাম। দুচ্ছাই করে ভাগিয়ে দিলে! দেখব, কোন আসমানের পরিকে ঘরে তোলে। আবার বলে, আঙুর হলে ভেবে দেখব'খন। ভাবাচ্ছি। আঙুরের আমার দামাঁদ ঠিক হয়ে আছে না ঢাকায়? ছেলে পাইলট। দেউড়িতে নহবতখানা বেঁধে বে দোব। দেখবি।

মামুনকে বড় ভালবাসতেন দাদিবেগম। সাধটা ধুয়ে গোরে চলে গেলেন তবে মামুন খুব বেঁচে গিয়েছিল, ভাবে এখনও। ডুমুরকে বিয়ের কথা ভাবাই যাবে না। ডুমুর তার বউ হবে কী! ওর সবকিছুই

যেন নামতার মত মুখস্থ মামুনের। এমন মেয়ের সঙ্গে না হয় প্রেম, না বিয়ে। বড় জোর একটা শারীরিক কিছু ঘটান যায়—কদাচিৎ। কিন্তু তাতেও শরীর বা মনের সাড়া জাগান কঠিন। ভাবতেই ইচ্ছে করে না ওসব কথা।

মামুন হিসেব করে বয়সের। সামনে আশ্বিনে বত্রিশ হয়ে যাবে কাঁটায়-কাঁটায়। ডুমুরও বত্রিশে পড়বে। দশবছর পরে এসে ওর মুখে বয়সের ছাপ দেখে নিজের জন্যেও কী এক চাপা কষ্ট ছুঁয়েছে কলজেটাকে। কত দ্রুত হু-হু করে চলে যাচ্ছে দিনগুলো। কত কিছু করার ছিল, হল না। হচ্ছে না। যে দুনিয়াটা বদলাতে গিয়েছিল, বদলানো যায়নি। কাজটা ভারি কঠিন। অসহায় লাগে নিজেকে।

ভেতরে থেকে ডুমুর ডাকছিল, মামুন! মামুন!

মামুন ভেতরে যায়। ডুমুর বলে, দরজা আটকে দাও।

চোর ঢুকবে নাকি দিনদুপুরে? মামুন দরজা আটকাতে আটকাতে বলে।

তা ঢুকতেও পারে। ডুমুর ভেতরের বারান্দায় তক্তাপোশে বসে আটা মাখছে। বলে, আজকাল আর সে ছিঁচকে চোর নেই। তোমার মনে আছে দাদিআম্মার সেই গল্পটা? চোর এসেছে বাড়িতে। তারপর তাড়া খেয়ে পালাচ্ছে। পাঁচিলে যখন উঠেছে, বাড়ির লোক খপ করে তার ঠ্যাং ধরে ফেলেছে। অমনি চোর চেঁচিয়ে উঠেছে, ফোঁড়া! ফোঁড়া? ব্যস! হাত তুলে নিয়েছে। আর চোর...

ডুমুর খিলখিল করে হাসতে থাকে। শেষে বলে, আজকাল চোরের সঙ্গে ড্যাগার পিস্তল থাকে। দাঁড়ালে কেন? বস, গল্প করি।

একটু তফাতে থামের কাছে চেয়ারে বসে মামুন। উঁচু ভিতের ওপর একতলা বাড়ি বয়সের ভারে জবুথবু। তার ওপর মাধ্যাকর্ষণ নিচের উঠোনে একশ বছরের লাইমকংক্রিট বুকের দাগড়া-দাগড়া ঘা ঢেকেছে সবুজ-কালো শ্যাওলায়। খানদানি রীতি অনুসারে জেলখানার মত উঁচু পাঁচিলে ঘেরা মুসলিম ঔরতবর্গের ইজ্জত। ডুমুরদের জমানায় সেই ইজ্জত শব্দটার মানে বদলে গেছে।

উঠোনে এখনও ছায়া। ছায়ার শেষে শিউলি গাছটা খটখটে রুক্ষ শরীরে রোদ নিচ্ছে। শিউলি কুড়িয়ে শুকুতে দিতেন ডুমুরের মা। পোলাও বা বিরিয়ানিতে জাফরান রঙ লাগে। শুকনো শিউলি সেই রঙ যোগাত। তাই নিয়ে মা-মেয়ের সে কী তক্ক! মামুনের মনে পড়ে যায়। ডুমুরের মা বলছেন, হিঁদুরা শিউলি বলে বলুক। আমরা জাফরান ফুল বলি। ডুমুর বলছে, আম্মা, আপনি জানেন না। জাফরান অন্য জিনিস। পেটের মেয়ে জ্ঞান দেয় কোন সাহসে? ডুমুরের মা ক্ষেপে গিয়ে আঙুল তুলে বলেছিলেন, নিকাল! নিকাল! পেটের দুশমন! হিঁদুওয়ালি! হিঁদুর ঘরে যা!

স্মৃতি মামুনকে হাসায়। ডুমুর না বুঝেই বলে, হাসিরই কথা। সে-মাসে এক কাণ্ড হল শোন। টিপটিপ করে সারারাত বৃষ্টি পড়ছে। সালার থেকে ফুফুত (পিসতুত) ভাইরা এসেছে। সলু-ওলুদের মনে পড়ছে তোমার? ওই ঘরের পেছনে চোর সিঁদ কেটে ঢুকেছে। চালের বস্তা খন্দের বস্তা ছিল ও-ঘরে। নিয়ে যাচ্ছে। আব্বার ঘুম খুব পাতলা। বললেন, কে রে? সলু নাকি? চোর বলল, হ্যাঁ। খানিক পরে ফের বললেন, ওলু নাকি রে? চোর বলল, হ্যাঁ। সকালে দেখি ঘর ফাঁকা!

ফের খিলখিল করে হাসে ডুমুর। আটার গোটা বেলতে থাকে। মামুন বলে, ডুমুর! কুলবেড়ের ওখানে নদীর ধারে তোমাদের বাগানটা আছে তো?

যাবে কোথায়? ডুমুর মুখ তোলে। সুরেনের বউ আগলায়। বাগানের কোনায় কুঁড়ের মত ঘর করেছে। ওবেলা চল না। দেখে আসবে। যাবে?

মামুন একটু অবাক হয়ে বলে, তুমি যাও নাকি অতদূরে?

যাই।

একা?

ডুমুর শান্ত হাসে। সুরেনের সঙ্গে যাই মাঝেমাঝে। আম ভাঙল সেদিন। গিয়েছিলাম। ব্যাপারি এসেছিল বহরমপুর থেকে। কাঁচা আম আর পাকতে পায় না আজকাল। চোরে ভেঙে নেয়। যা দুপয়সা পাওয়া যায়, তাই লাভ। এবার খুব জামরুল হয়েছে, জান?

মামুন চুপ করে থাকে। ড়মর চৌধুরির না-থাকা ছেলের কাজগুলো করছে। কিছুক্ষণ আগে সুরেন

গাইগরু আর বাছুরটা নিয়ে গেছে বাগানে। সারাদিন চরবে। সন্ধ্যায় নিয়ে আসবে। বাবলা নদীর কাঁধের ওপর বিঘেদেড়েক বাগানটা বরাবর পিকনিকের জায়গা। ডুমুরের ওপর থাকত রান্নার দায়িত্ব। কোমরে আঁচল বেঁধে নাকমুখ কুঁচকে ঝাঁঝাল ধোঁয়ার ভেতর খুন্তি নাড়ত। দলে বাছাই কজন ছেলেমেয়ে। আট থেকে আঠারোর মধ্যে বয়স কাঠ কুড়োত জঙ্গলের ছায়ায় গান গাইতে-গাইতে। ফেরার সময় সন্ধ্যা। ডাইনে দূরে রেললাইনের ওপর চাঁদমামা। ফিকে জ্যোৎস্নায় আলপথে গান গাইতে-গাইতে বাড়ি ফেরা। একবার ডুমুরের স্যান্ডেলের ফিতে ছিঁড়ে গিয়েছিল। দলটা এগিয়ে যাচ্ছে, পেছনে মামুন। কুলবেড়ের মাঠে শরতকালের সান্ধ্য জ্যোৎস্নায় হঠাৎ প্রেমিকেব গলায় মামুন বলেছিল, আমায় দে। বয়ে নিয়ে যাই।

প্রেম-ট্রেম নয়। ভান। ভানেও আবেগ দরকার হয়। ডুমুর আস্তে বলেছিল, বইবি তুই? নে। খুন্তি নেড়ে হাত ব্যথা করছে।

তালগাছঘেরা পুকুরের কাছে দলের সঙ্গ ধরার সময় ডুমুর কেড়ে নিয়েছিল জুতো দুটো।

কেরোসিন কুকার নিয়ে আসে ডুমুর রান্নাঘর থেকে। তক্তপোশের ওপর রেখে বলে, দেশলাই দাও।

জ্বালতে পারবে? মামুন দেশলাই বের করে ওঠে।

ডুমুর বলে, না পারলে দুবেলা দোজখ জ্বালি কিসে? হাসতে হাসতে বলে অবশ্য।

মামুন দেশলাই ছুঁড়ে দিয়ে ফের বসে। বলে, দোজখ? বল কী!

ডুমুরের কাঠি ঠোকার ভঙ্গিটি কিন্তু আনাড়ির। কুকারের পলতের খোপে ফেলে ফুঁ দেয়। তারপর বলে, আজকাল যারা মহাকাশে যায়, তারা নাকি ট্যাবলেট খেয়ে ক্ষিদে মেটায়। তেমন কিছু বাজারে এলে বাঁচি।

তুমি কিন্তু রান্না করতে ভালবাস!

ভাগ ভাগ।

বাস না?

কক্ষনো না। ডুমুর চাটু চাপিয়ে বোয়েমের মুখের ন্যাকড়া খোলে।

মামুন ভুরু কুঁচকে বলে, রিয়্যাল ঘৃত?

আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর। খাঁটি গব্যঘৃত।

মেহমানের (অতিথি) সম্মানে বুঝি?

কে মেহমান?

আমি—জনাব মামুন।

হঠাৎ বালিকার চাপল্যে বলে, আহা। দেখি দেখি মিয়াসায়েবের চাঁদমুখখানা! অ্যাদ্দিন সর জমিয়ে মাখন ময়ে বোয়েম ভরলাম, যেন কবে বাংলামুলুক থেকে কাজির বেটা আসবে বলে! যাও, তুমি জাত খুইয়ে এসেছ। তোমার মানখাতির কিসের? পরটা উল্টেপাল্টে সেঁকতে সেঁকতে ফের বলে, কাজিবাড়ির ইজ্জত রাখছি। বুঝেছ?

মামুন চুপ করে থাকে। আনমনে সিগারেট ধরায়। সেইসময় চৌধুরির গলা শোনা যায় সদর দরজার ওদিকে। যা যা! দূর দূর! আবার মুখ ভ্যাংচায় দেখ না! অ ডুমুর, বন্দুক আন তো। বন্দুক!

হনুমান এসেছে চুপিসাড়ে। চৌধুরির একহাতে বাজারের থলে, অন্য হাতে একটুকরো ঢিল। হাসতে হাসতে বাড়ি ঢুকে ঢিলটা ফেলে দিয়ে হাত মোছেন তাঁতের ধূসর পাঞ্জাবির নিচেটায়। মিথ্যে বন্দুকের ভয়ে হনুমান একটু সরে যায়। চৌধুরি বারান্দায় উঠে বলেন, সুরেন তো এবেলা আসতে পারবে না দুধ নিয়ে। আমি যাই না। শ্যাওড়াতলায় তিলগুলো মাড়ছে। বস্তা নিয়ে যেতে হবে।

ডুমুর বলে, ছাতা নিতে ভুলবেন না যেন সেদিনকার মত।

চৌধুরি তক্তাপোশে বসে ফোকলা দাঁতে হেসে মামুনকে বলেন, খোকামিয়া যাবে নাকি আমার সঙ্গে?

ডুমুর দ্রুত বলে, মামুন রোদে গিয়ে কী করবে? বরং বিকেলে যাবে আমার সঙ্গে।

তুই যাবি?

হুঁ।

তা যাস। খুব জামরুল ধরেছে। কোনার গাছে বাতাসাভোগ আম রেখেছি গোটাকতক। পাক ধরেছে। পেড়ে দিস ছেলেকে। গাছপাকা আম অন্য জিনিস। ...বলেই মামুনের দিকে ঘোরেন। ...খুলনার মোরেল গঞ্জে গিয়েছিলাম গতবছর। তোমার মামুজির বাড়ি জেয়াফৎ (নেমন্তন্ন) খেলাম। দুধের সঙ্গে পাকা আম মেড়ে খাওয়া শিখেছে বাঙালদের মত। তখনই তোমার মায়ের কাছে শুনলাম, তুমি চট্টগ্রামে আছ। তোমার মা বলছিলেন, দেখাসাক্ষাত নেই অনেক বছর। চিঠিতে যোগাযোগ আছে। খুব দুঃখ করছিলেন। হ্যাঁ বাবা, মায়ের মনে দুঃখ দিতে আছে? আর কটা দিন বা বাঁচবেন—যা শরীর স্বাস্থ্য দেখে এসেছি!

মামুন আস্তে বলে, মা লাস্ট মার্চে মারা গেছেন।

অ্যাঁ! বাবা মেয়ে দুজনেই নিষ্পলক তাকিয়ে থাকে মামুনের দিকে। তারপর চৌধুরি বলেন, মরণকালে দেখাসাক্ষাত হয়নি বুঝি—নাকি হয়েছিল?

হয়নি।

চৌধুরি একটু চুপ করে থাকার পর চশমার কাচ মুছতে মুছতে বলেন, তোমরা আজকালকার ছেলেমেয়ে। মা-বাবার কদর বোঝ না। মা অনেক কষ্টে সন্তানের জন্ম দেন। পেলে-পুষে লায়েক করেন। ডুমুর, নাস্তা দে মা। বেলা বাড়ছে।

চাটু নামিয়ে রেখে বাসি রান্নার মাংস গরম করে ডুমুর। বলে, এক মিনিট সবুর করুন। সুজির হালুয়া করে দিই।

চৌধুরি ব্যস্ত হয়ে বলেন, খোকামিয়া পরে বসবে'খন। যা আছে, তাই দে মা।

অগত্যা ডুমুর চিনেমাটির থালা এনে বাবাকে খেতে দেয়। মামুন সিগারেট আড়াল করেছিল। উঠে ওপাশের বৈঠকখানায় চলে যায়। জানলার পাশে বসে সিগারেট টানে।

একটু পরে সে দেখে, চৌধুরি ছাতি মাথায় বেরিয়ে যাচ্ছেন। কাঁধে ঝোলানো ব্যাগে বস্তা ঠেসে ভরা আছে। বাঁহাতে একটা বেঁটে মোটাসোটা ছড়ি। গায়ে ঢোলা ধূসর রঙের পাঞ্জাবি, পরনে সবুজ লুঙি, পায়ে পাম্পসু।

ডুমুরের ডাক শুনে ফের ভেতরে যায় মামুন। গিয়ে দেখে তক্তাপোশের চেহারা বদলে দিয়েছে ডুমুর। নতুন সতরঞ্চি বিছিয়ে তার ওপর রাতের মত সাদা দস্তরখান পেতেছে—লাল ফুলের নকসায় ভরা। তার ওপর একধারে হাত ধোয়া কুলকুচি করার পাত্র সেলেপ্‌চি। মামুন তাকিয়ে আছে দেখে ডুমুর বলে, কী? বসে পড়।

এত খাতির কিসের ডুমুর? কাজি ফ্যামিলির ইজ্জতের?

ডুমুর একটু হাসে। ...সে তো বলেইছি। তবে...

তবে?

কতকাল পরে দেখা হল। খাতির করতে ইচ্ছে করল। তোমাকে বড্ড তুইতোকারি তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতাম না? তার প্রায়শ্চিত্ত করতে দাও না বাবা!

তুমিও বস আমার সঙ্গে।

জিভ কেটে ডুমুর বলে, ছিঃ! ওকী কথা! পুরুষমানুষের সঙ্গে মেয়েদের খেতে নেই, জান না? শরীয়তে (শাস্ত্রে) মানা আছে না?

তুমি মান নাকি এসব?

হুঁউ।

তাহলে নামাজ-টামাজও পড় বুঝি?

হুঁউ।

যাঃ! বিশ্বাস করি নে।

ডুমুর আস্তে বলে, আছ তো। দেখতে পাবে।...

দুপুরে মামুন সত্যি তাই দেখতে পেল। কুয়োর পাশে উঁচু পাঁচিল-ঘেরা গোসলখানা (স্নানঘর)। দরজায় চটের পর্দা ঝুলছে। ওপরে ছাদ-টাদ নেই। এদিকের দেওয়ালের তলা দিয়ে চৌবাচ্চার মুখ বেরিয়ে আছে। ডুমুর জল ঢেলে ভরেছে। উঠোন পেরিয়ে যেতে যেতে মামুন ঘুরিয়ে দেখতে পায়, এনামেলের বদনা নিয়ে বারান্দার ধারে বসে ডুমুর ওজু (প্রার্থনার প্রক্ষালন) করছে। মাথায় ঘোমটা।

গায়ে সাবান ঘষতে ঘষতে মামুনের হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে যায়। একবার একটা বই দেখেছিল এক ভদ্রলোকের বাড়িতে। সরল দীনিয়াত শিক্ষা। অর্থাৎ ইসলামি নীতিজ্ঞান। একটা পাতায় লেখা ছিল : 'জ্বেনা কাহাকে বলে? জ্বেনা অর্থ ব্যাভিচার। মনে কর, তুমি একজন সুন্দরী যুবতীর সহিত একটি নির্জন বাড়িতে রহিয়াছ। যুবতীকে দেখিয়া তোমার আসক্তি জন্মিল। যুবতীরও হাবভাবে তদনুরূপ আসক্তি প্রকাশ পাইল। এখন তুমি কী করিবে? জ্বেনা মহাপাপ। সুতরাং যুবতীকে তুমি মাতৃরূপে চিন্তা কর। সেজন্য নিম্নোক্ত দোওয়া (মন্ত্র) পাঠ করিতে থাক। তাহাতেও কামভাব না দূরীভূত হইলে তৎক্ষণাৎ সেই গৃহ হইতে পলাইয়া যাও। আল্লাহ জ্বেনাকারীকে কদাচ ক্ষমা করেন না।...' গোটাটাই বোল্ড টাইপে ছাপা। মৌলবী গ্রন্থকার মামুন ও ডুমুরকে এখন দেখলে কী করতেন?

মামুন আপনমনে হাসে। কিন্তু জল ঢালার পর হাসিটা মুছে যায়। কুয়োর জলটা বরফ-গলা একেবারে। জ্বরজ্বারি বাধবে না তো? এমন অবস্থায় পরের বাড়িতে অসুখবিসুখ হলে মুশকিল। দেশের টানে উন্মাদের মত ফিরে এসেছে। গত সন্ধ্যায় দালালের সাহায্যে সীমান্ত ডিঙিয়ে এসে বাস ধরেছে। তখনও মাথায় ছিল না কোথায় উঠবে। নবাবগঞ্জে ঢুকে অনেক দোনামনার পর এ বাড়ির দরজায় কড়া নেড়েছিল।

ডুমুরদের তো তিন-তিনটে ঘর রয়েছে। অন্তত বৈঠকখানায় জায়গা দেবেন না মোজাই চৌধুরি? কথাটা বিকেলে তুলতে হবে। আবার গম্ভীর হয়ে যায় মামুন।

বেরিয়ে এলে ডুমুর বারান্দায় প্রার্থনার আসন থেকে বলে, ভেজা কাপড় রেখে দাও। কেচে মেলে দেব'খন। ও কী করছ?

মামুন উঠোনের তারে লুঙি মেলে দেয়। বলে, তোমার নামাজ হল?

মাথায় ঘোমটা দিয়ে পা দুমড়ে বসে ডুমুর দুহাত তুলে প্রার্থনা করছে। হাত মুখে ঘষে প্রার্থনার আসনটা গোটায়। লম্বা তাকে তুলে রাখে। ঘোমটা পিছলে খোঁপায় আটকেছে। মুখে পবিত্রতা মেখে আছে যেন। মামুন তাকে লক্ষ্য করে। ডুমুর স্লিপারে পা গলিয়ে বলে, কী দেখছ অমন করে?

তোমাকে?

নতুন লাগছে বুঝি?

হুঁউ। ভীষণ নতুন।

ডুমুর আনমনে বলে, তা লাগবে বইকি। প্রায় দশটা বছর। দুনিয়াটাই বদলে যায় তো তুচ্ছ মানুষ...

রোজ বিকেলে সন্ধি দিয়াড়ি জাল বুনতে বুনতে রেললাইন ধরে অনেকটা হাঁটে। বাঁক পেরিয়ে নদীর সাঁকোর মুখে বাঁধের ওপর গিয়ে দাঁড়ায়। নিচে শুকনো নদী। একখানে হাঁটুজল সাবধানে বয়ে যাচ্ছে। জলটা স্বচ্ছ। তলার বালি ঝিকঝিক করে।

শুকুলের বেটি ধনিয়া চেঁচিয়ে কিছু বলছে। কাঁখে কয়লা কুড়নো ঝুড়ি। সন্ধি বলে, ক্যা গে?

হু দেখ্ তোঁহর বেটিয়া! হু দেখ্!

পথর কুড়িয়ে সন্ধি গজরায়। রাণ্ডির বেটি! তোড় দেগা মুখ বা।

ধনিয়া হাসতে হাসতে খেঁকশেয়ালির মত লাইন ডিঙিয়ে ভাগে। ঝোপে ঢুকে যায়। সন্ধি কোনদিকে মুখ তোলে না। শিমুল গাছটার গোড়ায় গিয়ে একটু দাঁড়ায়। পাথরটা ছুঁড়ে ফেলে দেয়। পাছায় হাত মুছে ফের সুতোর খেই পরায় বুননকাঠিতে। দুধারে বিস্তীর্ণ মাঠে আজকাল চাপ-চাপ সবুজ রঙ। শরৎকাল বলে ভুল হয়। বাঁধের মাথায় সেচকেন্দ্র হয়েছে। নদীতে জল যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ নদী থেকে জল টেনে মাঠ ভেজায়। খরার মাসটা পাতালের জল টানে। দু'বছর আগে বাঁধ বেঁধে জল

আটকান হত নদীতে। ভাটির এলাকার লোকের তাতে আপত্তি বলে শেষ পর্যন্ত খরার মাসে পাতালজলের ব্যবস্থা করা হয়েছে কুলবেড়ের মাঠে।

বাপের চোখ। কখন অজান্তে ডাইনে ঘুরে যায়। বরকত মিয়ার ফার্মের ক্ষেতে অবেলায় ট্রা-রা-রা-রা আওয়াজ দিয়ে ট্রাক্টর চলছে। ট্রাক্টরে একদলা তীব্র রঙ নজর হচ্ছে। ওটাই কি? সন্ধির নজর তত চলে না।

তিন একর টানা তিলক্ষেতের তিল উঠে গেছে। সাদা মাটি তুলোধোনা করে দিচ্ছে ডিস্কহ্যারোর সার সার ফলা। সানগ্লাস খুলে আজাই ট্রাক্টর থামিয়ে বলে, দারুণ লাগল, না?

লায়লা বলে, হয়ে গেল এক্ষুনি? ভ্যাট্!

আজাই হাসে। ...মাটির বারোটা বাজিয়ে দিলাম হয়ত। পিতাজি এসে বসন্তকে যা পেঁদাবে দেখবে?

সে লাফ দিয়ে চাঙড় মাটিতে নামে। পায়ে গামবুট। হাত বাড়ায় ভালবাসার বউয়ের দিকে। বউও দু'হাত বাড়ায়। দুই বগলে হাত ভরে শূন্যে তোলে আজাই। সেই অবস্থায় কয়েক পা হাঁটে। লায়লা চেঁচামেচি করে, এই! এই! কী হচ্ছে! নামিয়ে দাও!

কোমল শ্রীচরণে ধুলো লাগবে যে!

যাঃ! ওরা হাসাহাসি করছে! ছাড়!

ছটফটানির চোটে অগত্যা আজাই ওকে নামিয়ে দেয়। দুজনে চাঙড়ে সাবধানে পাশাপাশি হেঁটে যায়। সামনে খানিকটা জায়গায় সবজিক্ষেত আর ফুলবাগিচা করা হয়েছে। তার শেষে সবুজ ভেলভেট ঘাসে ঢাকা একটুকরো লন। তার মাথায় একতলা দুটো ঘর। মন্ত্রী বা অফিসাররা এলে সবুজ লনে বেতের চেয়ার পাতা হয়। এদিকে-ওদিকে কয়েকটা তরুণ ইউক্যালিপটাস আর কৃষ্ণচূড়া লাগান হয়েছে। পেছনে আটচালায় নানান কৃষিযন্ত্র। একটা গুদামঘরও। ইলেকট্রিক লাইন এসেছে খানিকটা দূরে বসান ট্রান্সফর্মার থেকে।

লনে গিয়ে আজাই বলে, বসন্তদা! কেমন বুঝলে?

বসন্ত হাসে। ...একটু উনিশ-বিশ হয়ে গেল মনে হচ্ছে। হোক গে। ক্ষতি কী?

একপাশে লাল হোন্ডা মোটরসাইকেল রাখা আছে। বউয়ের দিকে তাকিয়ে আজাই বলে, এক্ষুনি যাবে? নাকি নদীর ধারে বসবে গিয়ে?

লায়লা দূরে তাকিয়ে কিছু দেখছিল। আনমনে বলে, ওখানে কারা দেখ তো?

কোথায় কারা? ...আজাইয়ের কলজে ধক করে উঠেছে।

ওই যে!

আজাই দেখে নিয়ে বলে, তাই বল। মোজাই মিয়ার মেয়ে। আরে! ওটা আবার কে?

সে দৌড়ে গিয়ে মোটরসাইকেলের হ্যান্ডেলে আটকান বাইনোকুলার নেয়। চোখে রেখে দেখতে দেখতে বলে, খোনকারদের মামুন মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, মামুন।

লায়লা ভুরু কুঁচকে বলে, সে আবার কে?

বাইনোকুলার নামিয়ে আজাই বলে, মামুনকে চেন না? কুলবেড়ের শিরিসগাছে লাল ঝাণ্ডা উড়িয়েছিল কে? সর্বহারার দরদি নেতা কমরেড মামুন জিন্দাবাদ! জিন্দাবাদ!

খিলখিল করে হাসে আজাই। লায়লা শুধু বলে, ও।...

দক্ষিণে যেতে যেতে বাবলা এখানে পুবে বেঁকেছে। তিনকোনা জমিতে বাঁশবন, আগাছার জঙ্গল। এপাশে বিঘে দেড়েক অংশে আম-কাঁঠাল-জামরুলের বাগান। দুটো বাঁজা নারকেল গাছও আছে। বাঁধ না ভাঙলে জায়গাটা ডোবে না। কোনায় ছিটেবেড়ার দেয়াল তুলে খড় চাপান আছে। সুরেনের বউ আর চারটে কাচ্চাবাচ্চা এই সংসারে দিন কাটায়। বর্ষা এলে সাহস পায় না, পাছে বাঁধ ভেঙে ভেসে যায়। শীত থেকে গ্রীষ্ম এই তাদের ঘরদোর। বেঁটে আমগাছে শিকে টাঙিয়েছে। হাঁড়িকুড়ি ঝুলছে। একটা ছাগলও পুষেছে। কয়েকটা মুর্গিও। আজকাল শেয়াল বলতে কিছু নেই। খটাসও নেই। নইলে সাহস পেত না।

সূর্য বাঁশবনের আড়ালে ডুবে গেল। সকাল থেকে হু-হু হাওয়া বয়। সন্ধ্যার মুখে একটু জিরিয়ে নিচ্ছে। নদীর বাঁধে দাঁড়িয়ে মামুন ওপারটা দেখতে দেখতে বলে, সব দেখছি ফাঁকা করে ফেলেছে। কত জামবন ছিল ওখানে।

পুবে মাইলটাক দূরে রেললাইনে একটা মালগাড়ি চলেছে। আবছা ঘটাং ঘট আওয়াজ কানে আসে। ডুমুর সেদিকে তাকিয়ে বলে, তার চেয়ে অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখতে পাচ্ছি আমি।

কী?

হিরো-হিরোইন।

তার মানে?

ওই দেখ, গায়ের জোরে লোকের পাট তছনছ করে বেড়াচ্ছে। ডুমুর গলার ভেতর ফের বলে, পিপীলিকার পাখা ওঠে মরিবার তরে।

দেখতে দেখতে মামুন বলে, এদিকে আসছে। পেছনে ওটাই সন্ধির মেয়ে?

ডুমুর মাথা দোলায়। আবছা ভট ভট আওয়াজ কানে আসছে এতক্ষণে। ডুমুর ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থাকে। সমতল মাঠ কচি পাট আর ধানে ঢাকা। নিচু আলগুলো ডিঙিয়ে ছুটে আসছে লাল মোটরসাইকেল। তারপর ঘুরে বাঁধে ওঠে। ডুমুর বলে, ঢঙ!

সুরেনের সংসারে একটা চেঁচামেচি শোনা যায়। ছাগলটা দড়ি ছিঁড়ে পালায়। মুরগিগুলো কঁক কঁ করে গাছে ও ঘরের চালে ওঠে। ডুমুরদের গাইগরু ও বাছুর কয়েক পা সরে গিয়ে ঘুরে দাঁড়ায়। সুরেন ঘাস কাটতে কাটতে মুখ তোলে। কাচ্চাবাচ্চারা স্লেটে আঁকা মূর্তির মত খড়ি-খড়ি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। সুরেনের বউ ঘেন্নায় মুখ ফিরিয়ে উনুনে কাঠ গোঁজে। মোটরসাইকেল থেকে প্রথমে নামে লায়লা। ডুমুরের উদ্দেশে হাত তুলে বলে, আদাব আপা।

শব্দ দুটো কি শিখিয়ে এনেছে আজাই? আজাই নেমে এসে বলে, হ্যালো কমরেড!

আজাইয়ের আচরণে একটা কিছু আছে। মামুন দেখেছে, ওর ওপর রাগ করা যায় না। একটু হেসে বলে, কেমন আছ আজাই?

যেমন রেখেছ। তুমি কবে এলে?

গতরাতে।

সিগারেট বের করে আজাই বলে, দেখ কমরেড, আর যেন বিপ্লব বাধিও না। আমরা খুব সুখে আছি। তারপর ঘুরে অবাক হয়ে দেখে, তার ভালবাসার বউ চলে গেছে সুরেনের সংসারে। দিয়াড়ি ভাষায় কথা বলছে ওদের সঙ্গে। কিন্তু কোন জবাব পাচ্ছে না। একটা কথা আজাইয়ের কানে আসে। ক্যায়সা ছে গে বহুদিদি?

রাগে আজাই বলে, লায়লা! এদিকে এস তো। আলাপ করিয়ে দিই এনার সঙ্গে।...

ক্রাচে ভর করে লেংচে হাঁটতে হাঁটতে রোজ ভোরে বাজারের দিকে যান সোনামিয়া। আকাশে দৃষ্টি রেখে হেঁটেছেন চিরকাল, এখনও তাই। পায়রাবাজ মানুষ ছিলেন। সব সময় আকাশে নজর। গর্তে পা হড়কে উরুসন্ধি চড়াৎ করে চিড় খেয়েছিল। তবু স্বভাব যায় না মলে।

আজকাল আকাশ হয়েছে আগুনরঙা। চোখের নজরও কমে গেছে। তবু হঠাৎ থেমে কপালে হাত রেখে সূর্য আড়াল করার ভঙ্গিতে আকাশ খোঁজেন। বেণুর চায়ের দোকানের সামনে খোলামেলায় বেঞ্চে বসে থাকেন চুপচাপ। চা বলতে ভরসা পান না। খুকখুক করে কাসেন। বেণুর দৃষ্টি কাড়তে চান। এখন বড্ড ভিড়। সোনামিয়ার ধূসর চোখে ঝাঁকে ঝাঁকে পায়রা বকবকম করে দানাপানি খাচ্ছে। খেয়েদেয়ে পতপত করে ডানা কাঁপিয়ে উড়ছে। চক্কর দিচ্ছে মাথার ওপর। মুসকি, দহলা, টিড্ডি, নরা-নরী হারা। কত জাত—কত রকম উড়নপ্যাঁচ। শিরদাঁড়ায় বাঁধা বোমের বাঁশ মগজ ফুঁড়ে উঠে গেছে নীল আসমানে।

হঠাৎ ঈশানকোণে কালো ফুটকি। ধূসর মাকুর মত পিঙ্গল একজোড়া কুতকুতে চোখ নিয়ে ছুটে আসছে শিকারে বাজ। কলজে ঠাণ্ডা হয়ে যায়। ফোকলা মুখের ভিজে জিভ কড়ের মত শুকনো হয়ে

নড়ে-চড়ে। একটা-একটা করে কোঁচ মেরে তুলে নিচ্ছে আকাশের রুপোলি মাছগুলো কোন এক ধুরন্ধর মাছমারা। সোনামিয়া কষ্টে বলেন, অই, অই!

কী হল বুড়া মিয়া? বেণুর বয়-ছোঁড়াটা ফিকফিক করে হাসে।

সোনামিয়া ফ্যালফ্যাল করে তাকায়। এট্টুকুন চা দিবি বাপ?

ছেলেটা নিজের ডাগর পেট চুলকিয়ে বেণুকে দেখায়। এখনও তার পেটে দানাপানি পড়েনি। বুড়ো লোকটার দিকে কেমন চোখে তাকিয়ে থাকে। গায়ে খাকি হাফশার্ট, পরনে ছেঁড়াখোড়া চেক লুঙি, তামাটে মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি—এই বুড়ো লোকটা নাকি বড়লোক ছিল। লোকে বলে। ছেলেটার অবাক লাগে।

বেণু এক গেলাস চা শেষ পর্যন্ত না দিয়ে পারে না। মুচকি হেসে বলে, কী মিয়াসাব! পোলা টাকা পাঠাইল?

সোনামিয়া মাথাটা সামান্য দোলায়।

আর পাঠাইছে! বেণু বলে বটে, মিয়াসায়েবের পোলা থাকাটার কথা আর তার বিশ্বাস হয় না। বিশ বছর ধরে সে নবাবগঞ্জে আছে। চায়ের দোকান দিয়েছে বছর দশেক হয়ে গেল প্রায়। তার আগে রিকশ চালাত। বড় একটা সংসার টানতে এত ব্যস্ত থেকেছে, এখানকার লোকের ভেতরকার খবর নেওয়ার মত মনমেজাজ ছিল না। এখনও নেই। আসলে এ একটা স্বভাব বেণুধরের। বিশ বছর ধরে সে এখানকার কত লোক দেখছে। সোনামিয়াকেও দেখছে। শুধু জানে, এই লোকটা দিনে দিনে যেভাবেই হোক, ভিখিরি হয়ে গেছে। পায়রাবাজ ছিল বলে? বিশ্বাস হয় না বেণুর। তারও ছেলেবেলায় পায়রা পোষার বড্ড সখ ছিল। যদি বল, পায়রা পোষার অভিশাপ আছে, তাই বেণুকে দেশ পর্যন্ত ছেড়ে আসতে হয়েছে—বেণু তর্ক করতে রাজি। দেশ ভাগ হইল। কুটি-কুটি মাইনষেরা ভিটা ছাড়ল। তারা সক্কলে পায়রাবাজ আছিল কইতে চাও?

বেণু সোনামিয়াকে বিনিপয়সায় একগেলাস চা, এমন কী কখনও একটা নিমকি বিস্কুটও দেয়। এর কারণ সম্ভবত দার্শনিক বোধ। তার চোখের সামনে একটা লোক ভিখিরি হয়ে গেল! এই সোনামিয়াকে একসময় সে রিকশ চাপিয়ে স্টেশন থেকে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছে। উজ্জ্বল ফরসা রঙের মানুষটা বড্ড বিলাসি ছিলেন। আতরের গন্ধে রিকশ মউমউ করত। পরনে ফিনফিনে অরবিন্দ মিলের ধুতি, সাদা আদ্দির পাঞ্জাবি, পরিষ্কার কামানো মুখ—ট্রেন থেকে নেমে গেটে বেরিয়েই হাঁকতেন অ-বেণু! বেণু আছ নাকি গো?

বেণু ছাড়া কারুর রিকশয় চাপবে না মিয়াসাব। পয়সার কথা বলতে হবে না। দুনো দেবেন। দোষের মধ্যে শুধু ওই—আকাশে দৃষ্টি, মুখটা তোলা। তারপর হঠাৎ বলেছেন, রোখো রোখো বেণু। একটু রোখো। কোথায় উড়ন্ত পায়রা নজরে এসেছে।

ওঁর বাড়ির চারদিকে তখন পোড়ো দালানবাড়ি, আগাছার জঙ্গল। লোকেরা সস্তায় ইট কিনে নিয়ে যাচ্ছে। বাড়ি বলতে একটা অক্ষত একতলা ঘর। সোনামিয়ার নাকি অনেক বউ ছিল। শেষ বউটাকে দেখেছে বেণুধর। পাতাচাপা ঘাসের মত ফ্যাকাসে ছিল দেখতে। খুব পান খেত। রিকশ থামলে ভাঙাচোরা দেউড়িতে এসে দাঁড়াত। ওটুকুই দেখা বেণুর। গাছপালার ভেতর একচিলতে সুড়ঙ্গপথে টেনে হিঁচড়ে রিকশ ঢোকাত। ফাঁকায় এসে মনে হত, গুহায় ঢুকেছিল।

কিন্তু দূর থেকে চোখে পড়ত, অশত্থগাছের মাথায় বাঁধা লম্বা বোম। বোমে একঝাঁক পায়রা। ছাদের ওপর কাঠের খোপ-খোপ ঘর ছিল। সেটাও বিক্রি করে খেয়েছেন সোনামিয়া। একতলা বাড়িটাও খেয়েছেন। এখন কিছুদিন করে এর বাড়ি ওর বাড়ি মাথা গোঁজার ঠাঁই চেয়ে নেন।

বেণু বলে, এখন কার লগে আছেন মিয়াসাব?

সোনামিয়া একটু হাসেন। বরকতের দলিজের বারান্দায় শুই রেতের বেলা। দিনে এদিক-ওদিক ঘুরি। ওখানে একটুকুনও ঘুম হয় না, বাপ। বুঝলে?

কেন, কেন?

ওই যে হারামি আজাই। বড্ড জগঝম্প করে সারারাত।

সেডা আবার কী?

রেকর্ড বাজায়। বাজিয়ে নাকি নাচনকোঁদন করে। ...সোনামিয়া গলাটা একটু চেপে এদিক-ওদিক তাকিয়ে ফের বলেন, দিয়াড়ির মেয়েটাও নাচে। ধুপুস ধুপুস আওয়াজ হয়। বুঝলে? বলড্যান্স।

খিকখিক করে ভাঙা দাঁতে হাসে। হাসেন, হাসতে হাসতে গম্ভীর হন। তারিয়ে তারিয়ে চা খেতে থাকেন। শেষ বিন্দুটাও আঙুল ভরে তুলে নিয়ে চোষেন। বেণু বলে, বরকত মিয়া নিষেধ করে না?

সে তো মাঠে থাকে। কুলবেড়েতে ফার্ম করেছে জান না?

হঃ। বলে বেণু নিজের কাজে মন ফেরায়। স্টেশনের পেছনে শুরু হয়েছে বাজার। বেণুর চায়ের দোকানের পেছনে ধু ধু মাঠ—ঢেউ খেলান। ছোট্ট ডোবা মত করে রেখেছে ওদিকে। তার মাটিতে ঘর বানিয়েছিল। ঘরের মাথায় টালি চাপাতে পেরেছে। চারপাশে গাছপালা ঘন হয়ে ফেলে আসা ঘরবাড়ির আদল ফোটানোর চেষ্টা করছে। বেণুর সংসার আজকাল থিতু হয়ে কিছু সুখস্বাচ্ছন্দ্যের মুখ দেখেছে। ছেলেগুলো লেখাপড়া শিখছে। চাকরি-বাকরি পেলে বেণুর শেষ জীবনটা মোটামুটি ভাল কাটতে পারে। এই তার আশা।

তবু কোন কোন সময় সোনামিয়ার কথা ভেবে তার বুকের ভেতরটা কেমন করে ওঠে। চোখের সামনে একটা লোক ভিখিরি হয়ে গেল!

আসি বাপ বেণুধর। মালিক তোমার মঙ্গল করুন। ...বিড়বিড় করে জড়ান গলায় আশীর্বাদ করতে করতে সোনামিয়া ওঠেন। ফোকলা মুখের সব কথা বোঝা যায় না আজকাল। আর সোনামিয়া নিজেও মাঝে মাঝে অবাক হন। তাহলে সত্যি সত্যি ভিখিরি হয়ে গেলেন! এখন তাঁর মুখে কীভাবে আপনা-আপনি গলগল করে ভিখিরিদের বুলি বেরিয়ে আসছে। এসব তো ভেবেচিন্তে বলেন না। এসে যায় অনর্গল। অথচ সারা জীবন বড্ড কম কথার মানুষ ছিলেন তিনি। নিচের দিকে চোখ রেখে পথ হাঁটতেন না। আকাশ দেখতে দেখতে টের পাননি পায়ের সামনে গর্ত।

চাটুকুতে এ-বেলাটা কাটান যায়। দুপুরে রোদের কড়া ভাব ক্ষিদে আনে। আজ দুপুরে কোথায় কার দোরে গিয়ে বসবেন, বুঝতে পারছেন না। বরকতের বাড়িতে আর সুবিধে হবে না, জানা। ওরা চিরকাল বড় হাড়কেপ্পন। বখিলের যাশু। বরকতের বাবার অবশ্য একটু হাত উপুড় করা স্বভাব ছিল। বরকতের মা ছিলেন হিসেবি মানুষ। স্বামীকে কান ধরে ওঠবস করতে পারতেন। মেয়েঘটিত অনেক বদনাম ছিল লোকটার। তাই বলে নিকে করে সতীন ঘরে ঢোকাতে পারেন নি কুদরত ইজারদার। বাইরে বাইরে স্ফূর্তি ওড়াতে চাও, ওড়াও। বরকতের স্বভাব তার মায়ের। কিন্তু নাতি আজাইয়ের মধ্যে আবার কুদরত ফিরে এসেছেন। হাত পেতে চাইলে এ ছোকরা দু-একটা টাকা কখনও-সখনও দিয়েছে সোনামিয়াকে। আজকাল কী হয়েছে, মানুষ বলেই গ্রাহ্য করে না। হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে থাক, হারামিবাচ্চা ভটভটর করে মোটরসাইকেল ছুটিয়ে চলে যাবে। দেখেও দেখবে না সোনামিয়াকে। সন্ধির মেয়েকে বসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সেদিন, সোনামিয়াকে দেখে বলল, ও চাচাজি! বল তো আমার বউ কেমন হয়েছে? সোনামিয়া বললেন, খুব ভাল। খুব ভাল। আজাই আধুলি ছুঁড়ে দিয়ে বলল, মন খুলে বলতে পারলে না চাচাজি?

আবার কত মন খুলে বলবে? সোনামিয়ার ইচ্ছে করছিল, আধুলিটা ছুঁড়ে ফেলে দেন মুখের ওপর। সুযোগ পেলেন না। তাছাড়া পেটে ক্ষিদের কুত্তা কাঁইকুঁই করছে। আরে নাদান উল্লুক! কী বউ দেখাচ্ছিস সোনামিয়াকে! দিয়াড়ির ঘরের কালকুট্টি পেত্নিকে দেখে এ মিয়ার বাচ্চা তারিফ করবে রে? এই নবাবগঞ্জেই মিয়াপাড়ার কত আসমানের পরী জন্মেছে এবং গোরে গেছে। নিজের ঘরের দিকেই তাকিয়ে দেখ অন্ধা কাঁহেকা। আশরাফি খুন বইছে তোর শরীরে। অথচ তোর চোখ গেল দিয়াড়ির ঘরে। ইচ্ছে করলে কত খানদানি ঘরের উচ্চশিক্ষিতা সুন্দরী বউ পেতিস।

জমানা কীভাবে যে বদলে যাচ্ছে চোখের সামনে। আশরাফ-আতরাফ (উচ্চবর্ণ-নিম্নবর্ণ) ভেদাভেদ লোকে মানছে না। মতি মিয়ার বেটির শাদি দিয়েছে সেখের ঘরে। নবাবগঞ্জে মিয়াপাড়ায় বিয়েশাদিতে

মহফিলে সেখপাড়ার লোকেদের জন্য মেঝেয় ফরাশ পাতা হত। মিয়ারা বসতেন তক্তাপোশে। আজকাল একাসনে পাশাপাশি খায়। আড্ডা দেয়। সেখপাড়ার মেহেদি মোল্লা এসে বরকত মিয়ার দলিজে সবচেয়ে ভাল গদি আঁটা চেয়ারে বসে। সোফায় হেলান দিয়ে সিগারেট পর্যন্ত টানে হারুণ ব্যাপারি। এই রকম দিনকাল হয়ে গেছে।

হোক। তাতে সোনামিয়ার আর দুঃখ হয় না। সেখপাড়ার লোকগুলো কিন্তু বড্ড ভাল। এখনও খাতির করে বসতে বলে। দুমুঠো খেতেও বলে। তবে বেশির ভাগই গরিব-গুর্বো মানুষ সব। নিজেদেরই জোটে না তো সোনামিয়াকে খেতে বলবে।

আজ কি সেখপাড়ার দিকে যাবেন সোনামিয়া? একেবারে শেষদিকে মাঠের ধারে পাড়াটা। আজকাল ক্রাচ দুটোও ভারি লাগে। অতদূর হাঁটতে গেলে মাথা ঘুরে পড়ে যাবেন হয়ত। আঠার পাড়া গাঁ। এখন গাঁ বললে লোকের রাগ হয়। শহর হতে বাকি কী? সিনেমা পর্যন্ত হয়ে গেল। কমিউনিটি হলে রোজ মিটিং, গানবাজনা, থিয়েটার-যাত্রা হচ্ছে। সত্যি আর গাঁ নয়।

এদিকে মিয়াপাড়ার দিকটাই যা উজাড়। ঘন গাছ-গাছালি, আগাছায় ঢাকা ভিটে, ঘুঘু পাখির ঘুমঘুম গলায় ডাক। সোনামিয়া বটতলায় দাদাপীরের মাজারের ভেতর ঢোকেন। খাদিম (সেবক) লুল্লু মিয়া তাঁকে দেখলেই নজরে রাখবে। কবরের ওপর বা পাশে দু-চার পয়সা পড়ে থাকে। লুল্লু মিয়া ঘাটের দিকে গেলে ঝটপট হাতিয়ে নেওয়া যায়।

সোনামিয়া উঁচু কবরের একটু তফাতে দাঁড়িয়ে মুখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে খাদিমকে খুঁজতে থাকেন। ঘাটেই গেছে। ওর ঘরটা বন্ধ। শেকলে তালা আঁটা। দাওয়ায় একটা ছাগল বাঁধা আছে। নেদে কালো করে রেখেছে। খুঁটির ওপর দিকে একটা কাঁঠাল ডাল আটকান। ছাগলটা দু' ঠ্যাঙে খুঁটি আঁকড়ে পাতা খাচ্ছে। কিন্তু কবরে কানাকড়িটিও নেই।

হঠাৎ চাপা লোভে ভেতরটা গরগর করে সোনামিয়ার। পা দুটো যদি ঠিক থাকত, ছাগলটা নিয়ে ভেগে যেতেন। কোন মুল্লুকে গিয়ে বেচে আসতে পারতেন। লুল্লু হারামজাদাকে জব্দ করা যেত।

কুতকুতে চোখে সোনামিয়া ছাগলটাকে দেখতে থাকেন। ভাল জাতের খাসি ছাগল। কমসে কম একশটা টাকা দাম হেসে খেলে পাওয়া যাবে। মাজারের পুবদিকটায় কাসেম মল্লিকের পোড়া ইটভাটা। জঙ্গল ভেঙে ওদিক দিয়ে রেললাইন উঠলেই অনেকটা নিশ্চিন্ত। কিন্তু সোনামিয়ার তো ক্ষমতা নেই, এমন একটা তেজি জানোয়ারকে বাগিচায় নিয়ে যাবেন।

তবু এক অসম্ভব আশায় মন চনমন করে। কাঁঠালপাতায় ভরা ডালটা টোপ করে ছাগলটাকে নিয়ে যাওয়া যায় না? ডালটা নিয়ে এগোবে আর ছাগলটা সঙ্গ ধরবে। ছাগল মানেই তো বোকা।

সোনামিয়া জানেন, ক্রাচে ভর করে বেশি দূর যাওয়ার ক্ষমতাই নেই। অথচ লুল্লু মিয়ার ওপর রাগ, ঈর্ষা, এবং ছাগল বেচে টাকা পাওয়ার লোভ তাকে এক অসম্ভবের দিকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। তাঁর মুখ হাঁ হয়ে গেছে। চোখ দুটোর ঘোলাটে ভাব ফুঁড়ে জ্যোতি ঠিকরোচ্ছে। ভাঙা উরুর পেশী ও শিরায় খেঁচুনি উঠেছে।

কয়েক পা এগিয়ে মাজারের ধার দিয়ে সাবধানে হাঁটেন। উঁকি মারেন দীঘির ঘাটের দিকে। লুল্লু মিয়া গাটের ধাপে বসে সবুজ লুঙিতে সাবান ঘষছে। মাথার জটাগুলো খুব নড়াচড়া করছে। গায়ের রক্ত গাঁজার বিষে কালো হয়ে গেছে লোকটার। আগে অত কালো ছিল না। মারফতি পাওয়ার বড়াইবুজরুকিও করত না।

কিন্তু ঘাটের মাথায় যেখানে বটের ছায়া পড়ছে। কেউ সেখানে বসে আছে। তার সঙ্গে গল্পসল্প করছে লুল্লু মিয়া। কথা বলতে বলতে সে মুখ ফেরাল। অমনি সোনামিয়া পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে গেলেন।

দুজনে দুজনকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখছিল। হঠাৎ চুপ করে যাওয়াতে লুল্লু মিয়া বলে, কী গো? কী দেখছ ও-বাগে?

তারপর সোনামিয়া ভাঙা গলায় ডুকরে কেঁদে ওঠেন। মামুন! মামুন রে!

মামুন উঠে দাঁড়ায়। আস্তে আস্তে হেঁটে আসে কাছে। মুখের দিকে তাকিয়ে শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বলে, চাচাজি।

সে ঝুঁকে খোঁড়া পা দুটো তিনবার ছুঁয়ে ঠোঁটে হাত ঠেকায়। সোনামিয়া তাকে ক্রাচসুদ্ধ দুহাত বাড়িয়ে বুকে জড়ান। হাউমাউ করে কেঁদে বলেন, মামুন! মামুন! আমি ফকির হয়ে গেছি ব্যাটা।...

মামুনের জীবনে তার এই কাকা বাকের কাজি লোকটা বরাবর ছিলেন দূরের মানুষ। একটা অস্পষ্ট মূর্তির মত। তার বাবা জাকের কাজির সৎ ভাই। গায়ের রঙের জন্যেই বুঝি সোনামিয়া নাম। কাজি পরিবার এ-পাড়ার অনেকটা জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বাস করত। সম্পত্তি ভাগ হতে হতে বংশানুক্রমে ছিটেফোঁটায় টেকেছিল। তবু তাই নিয়ে শরিকে-শরিকে মামলা-মোকর্দমা চলত। সারা জীবন ধরে মামলা লড়তে-লড়তে কাজিরা ফতুর হয়ে গোরে যেতেন। তবু মামলা থামত না। জাকের কাজি একটা ভাঙা দেউড়ি নিয়ে হাইকোর্টে অব্দি লড়েছিলেন। মামুনের মনে হত, রোগা বাস্তুসাপের পাল ভাঙা দালানকোঠার গর্ত থেকে বেরিয়ে পরস্পরকে কামড়াকামড়ি করে ঢলে পড়েছে। চারদিকে শুধু ফোঁসফোঁসানি আর ফণা। দাঁতের গোড়ায় বিষের থলিতে আর বিষটুকুও নেই। ক্ষয়া ভাঙা দাঁত নিয়ে তবু মরণকামড়ের চেষ্টা।

সোনামিয়া ছিলেন এক আজব মানুষ কাজিবংশে। তাঁকে ঠেলতে ঠেলতে কোণঠাসা করে দিয়েছিলেন জ্ঞাতিরা। একটেরে একানড়ের মত থাকতেন। কারুর ফুঁসলানিতেও মামলার গণ্ডগোলে পা বাড়াতেন না। নিজের ন্যায্য অংশে হাত পড়লে চুপচাপ মেনে নিতেন। বাইরে মেলামেশাটাও করতেন কম। পায়রা আর নারী নিয়েই থাকতেন। সুপুরুষ প্রেমিক চেহারার গুণে নারীরা খুব সহজেই তাঁর প্রেমে পড়ত। সে নিয়ে অশান্তিও হত। মারধর খেয়ে হজম করতেও পারতেন। মামুনের মনে পড়ে, একতলার ছাদে দাঁড়িয়ে ব্যান্ডেজ বাঁধা সোনাচাচাজি হাততালি দিয়ে পায়রা ওড়াচ্ছেন। গায়ে ঝকমক করছে রোদ্দুর। ওপরে বিশাল নীল আকাশ। মুঠো মুঠো খুশির মত সেখানে ছড়িয়ে যাচ্ছে পায়রার ঝাঁক। তখন খুব ফাঁকা আর খোলামেলা ছিল পাড়াটা। এমন করে ঘন গাছপালা আর আগাছার জঙ্গল আকাশ ঢাকতে ওঠেনি।

মামুনের চোখের সামনে কাজিবংশ ক্ষয় পেতে পেতে মাথাচাড়া দিয়েছে ধ্বংসস্তূপ আর জঙ্গল। তাও যে ক'জন ছিলেন, ভিটে বেচে কে কোথায় চলে গিয়েছিলেন। মামুনের মা মামুনের আশায় কোনমতে দিন কাটাচ্ছিলেন, মামুন নিপাত্তা হয়ে গেলে তাঁর ভাইরা খুলনা থেকে এসে তাঁকে নিয়ে যান। মামুন পরে জেনেছিল, মা নবাবগঞ্জের ঘর-বাড়ি জমিজমা বেচে পাকিস্তানে চলে গেছেন। কিন্তু তার কিছু করার ছিল না।

এতদিনে এসে দেখে, বাড়ি বলতে আর কিছু নেই। ইটগুলো পর্যন্ত ছাড়িয়ে নিয়ে গেছেন বরকত মিয়া। ভিতের ওপর গজিয়েছে ঘন জঙ্গল। আজাইয়ের কাছে শুনেছে, ওখানে বরকত শিগগির একটা বাড়ি তুলবেন। তাঁর এখন বেজায় বড় সংসার। পুরনো পৈতৃক বাড়িতে লোকের জায়গা হচ্ছে না।

মোজাই চৌধুরি বলেছেন, শুনেছি বিক্রিকবালা দলিলে তোমার মা তোমাকে নাবালক সাব্যস্ত করে গার্জেন হিসেবে দস্তখত করেছিলেন। তুমি মামলা করলে ডিক্রি পাবে মামুন। শরিয়তি আইনে তোমার মায়ের বখরা দু'আনাই হয়। তোমার চোদ্দ আনা। কথাটা ভেবে দেখ।

মামলা? মামুন দেখেছে মামলা কী জিনিস। তাছাড়া মামলাকে সে ছেলেবেলা থেকে ঘৃণা করতে শিখেছে। মামুন বিশ্বাস করে, ব্যক্তিগত সম্পত্তি পাপ। পৃথিবীর যা কিছু অন্যায় এবং অনিষ্টকর, তার জন্ম ওই পাপের জরায়ুতে। মামুন বরকতের সঙ্গে মামলা লড়তে যাবে না।

কিন্তু দাদাপীরের মাজারে সোনামিয়ার অবস্থা দেখে মামুনের মনে খুব কষ্ট হয়। ভাবে, মামলা-টামলা নয়, বরকতকে একবার বলে দেখবে নাকি—অন্তত মাথাগোঁজার মত একটুকরো জমি, আধকাঠাও যথেষ্ট এতে, যদি উনি দিতে রাজি হন! না—ওটুকু নিজের জন্য নয়। সোনামিয়ার জন্যে। তারপর ক্লাবের ছেলেদের বললে বাঁশ-খড় যোগাড় করে কি দেবে না?

সে-বেলা চাচা-ভাইপো মিলে মুনুমিয়ার হোটেলে খেয়েছে। মুনুমিয়া দুজনকে গম্ভীর মুখে দেখছিলেন। বাড়তি একটা কথাও বলেননি। মামুন ওঁর হাবভাব দেখে গায়ে পড়ে আলাপ জমাবার চেষ্টা করেনি। এ গাম্ভীর্যের কারণ তার জানা। মুনুমিয়ার ছেলে নুরু মামুনদের পাল্লায় পড়ে খুব কষ্ট ভুগেছিল। এখন বাপের সুপুত্তুরটি হয়ে বিড়ি বেঁধে খায়। স্কুলফাইনাল দেবার আগেই 'মুক্তির দশকের' ডাক শুনে ছুটে গিয়েছিল। হোটেলের পাশেই তার পান বিড়ির দোকান। মামুনকে দেখলে নুরু কথা বলত। লক্ষ্য করেনি এদিকে।

অনেকদিন পরে খাওয়াটা ভাল হয়েছে সোনামিয়ার। খাওয়ার পর নিঃসঙ্কোচে ভাইপোর কাছে সিগারেট এবং পাঁচটা টাকা চেয়ে নেন। তারপরেই ভুলে যান ভাইপোকে। বটতলায় নাপিতের কাছে দাড়ি চাঁচতে যান। মামুন একটু দাঁড়িয়ে থেকে চলে আসে। সামান্য টাকাও মানুষকে বিস্ময়কর বদলে দেয়।

ডুমুর অপেক্ষা করছিল। মামুনকে দেখে বলে, না খেয়ে রোদে অমন করে ঘুরে বেড়াচ্ছ—অসুখ বাধবে যে! কোথায় গিয়েছিলে?

তারপর একটু হাসে। ...আমি ভাবছিলাম, পুলিশে ধরল-টরল নাকি?

মামুন বলে, মনে হচ্ছে না। ধরলে বরং একটা হিল্লে হত। কিন্তু একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করছি, জান?

কী?

এক আজাই বাদে কেউ আমার সঙ্গে ভাল করে কথাই বলছে না। দশটা বছরে কী এমন উল্টো-পাল্টা ঘটেছে।

ডুমুর একটু ভেবে বলে, সবাই আজকাল যে-যার ধান্দায় ব্যস্ত।

মামুন হাসে। তা ঠিক। তাছাড়া আমি এমন কিছু ইমপরট্যান্ট লোক ছিলাম না নবাবগঞ্জে।

ডুমুর বারান্দার আলনা থেকে শুকনো তোয়ালেটা নিয়ে বলে, যাও। গোসল করে এসে। আব্বা তোমার সঙ্গে খাবেন বলে পথ তাকিয়ে থেকে এতক্ষণে খেয়েদেয়ে বেরুলেন। গাঁ ঘুরতে বেরিয়েছিলে?

মামুন আস্তে বলে, সোনাচাচাজির সঙ্গে দেখা হল।

ডুমুর নড়ে ওঠে। ...ওই যা! বলতে ভুলেছিলাম, সোনামিয়ার জান—খুব বদ নসিব? বেচারা একেবারে পথে নেমেছেন। এ-বাড়ি ও-বাড়ি চেয়ে-চিন্তে খেয়ে বেড়ান। আমার এত খারাপ লাগে! আগে আব্বা কখনও-সখনও ডেকে এনে দু-মুঠো খাওয়াতেন। তারপর কবে নাকি কী বদনাম রটিয়েছিলেন। শুনে আব্বার খুব রাগ হয়েছিল। তাই...

কী বদনাম?

ডুমুর মুখ নামিয়ে হাসবার চেষ্টা করে বলে, আমার নামে।

মামুন শুকনো হাসে। তুমি কি প্রেম-ট্রেম করেছিলে?

এ মর! তুমি কী অসভ্য হয়ে গেছ! ...ডুমুরের কানের কাছটা লাল হয়ে ওঠে। সামলে নিয়ে ফের বলে, না। আমার শ্বশুরবাড়ির ব্যাপারে। সে তোমার শুনে কাজ নেই।

আহা, শুনিই না বাবা!

পরিষ্কার মুখে হাসে ডুমুর। ...আমি নাকি শ্বশুরবাড়ি থেকে রাতদুপুরে পালিয়ে আসছিলাম। ওরা টের পেয়ে আমাকে পাকড়াও করে বেদম মার দিয়েছে। তবে এতটা না হলেও কিছুটা সত্যি বইকি!

সত্যি পালিয়ে আসছিলে বুঝি?

চেষ্টা করেছিলাম। পারিনি।

ডিটেলস বল।

যাঃ! বেলা বেড়ে গেছে। রান্না জুড়িয়ে হিম হয়ে গেছে কখন।

আমি খেয়ে এসেছি, ডুমুর।

ডুমুর ওর দিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থাকে এক মিনিট প্রায়। তারপর আস্তে বলে, কেন?

সোনাচাচাজি খেতে চাইলেন। মামুন গলার ভেতর বলে। ওঁকে মুনুমিয়ার হোটেলে নিয়ে গেলাম। চাচাজি বললেন, একসঙ্গে খাই এস। কী করব? বললেন যখন।

ডুমুর নিঃশ্বাস ফেলে বলে, নামাজের সময় হয়ে এল। তারপর হাতের তোয়ালেটা আলনায় রেখে দ্রুত নেমে যায় উঠোনে। তারে মেলে দেওয়া শাড়ি টানতে থাকে। কাচা শাড়ি পরে নামাজে বসবে।

মামুন সকালে টের পেয়েছিল, ডুমুর আজ খাওয়ার ব্যাপারে একটা জাঁকজমক কিছু করতে চায়। কসাইখানা আছে নবাবগঞ্জে। মাংস আনিয়েছিল। বিরিয়ানির জন্য মোটা আলুর খোসা ছাড়াচ্ছিল। কোর্মা, কোপ্তা, কালিয়ার সুগন্ধে বাড়িটা মউ মউ করছে। মামুন ভাবে, রাগ করল কি ডুমুর?

ডুমুর কাপড় বদলে মাথায় ঘোমটা টেনে বারান্দার ধারে ওজু করতে বসেছে। এনামেলের বদনাটা চকচক করছে। এখন কোন কথারই জবাব দেবে না ডুমুর। খোদার দিকে হাঁটছে, যখন তখন মানুষের ডাক কানে গেলেও শুনবে না।

বরকতের চেহারা ততকিছু বদলায় নি। সেই সাদা চুল এবং চাঁদিতে টাক, সেই পরিষ্কার করে কামান গাল, কুমড়োর মত তুকো মুখ। বয়স সত্তর কাছাকাছি এসে গেছে। তবু যুবকের মত হাঁটেন স্মৃতিকোষ তাজা। চোখের দৃষ্টিও ঝাপসা হয়নি। মামুনকে দেখেই চিনতে পেরেছিলেন।

বিশাল বাড়িটা দোতলা। প্রাঙ্গণে একটা জিপ দাঁড়িয়ে আছে। বারান্দায় একদঙ্গল লোক আড্ডা দিচ্ছে। মামুন জানে, ওরা মোসাহেব। ওরা নড়বে না। অতএব সোনামিয়াকে উপলক্ষ করেই কথাটা তুলতে হবে।

অভ্যাসমত বরকত নিজের কীর্তিকলাপের বিবরণ শুনিয়ে ছাড়লেন। কৃষিফার্ম, বাস-লরির সংখ্যা, বাজারে হার্ডওয়ার স্টোর্স এবং স্টেশনারি, মার্কেটিং সোসাইটিতে নেতৃত্ব, হাইওয়ের মোড়ে পেট্রল পাম্প, এইসব। গত নির্বাচনে ফের দাঁড়িয়েছিলেন নির্দল প্রার্থী হয়ে। নেমকহারামির দরুন জিততে পারেন নি। সামনেবার বেঁচে থাকলে ফের লড়বেন।

মামুন কথা বলার সুযোগই পেল না। বরকত তাঁর আত্মীয়স্বজনের গল্প জুড়ে দিলেন। কে কোথায় ডেপুটি, সাবজজ, রাইটার্সে সেক্রেটারি—কোন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তাঁর দূর সম্পর্কের নাতজামাই। ওদিকে করাচি এবং ঢাকা পর্যন্ত ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছেন তাঁর বংশের লোকজন। বরকত শেষে প্রাণভরে হাসলেন। তর্জনিটা কাঁধের ওপর চক্কর খাইয়ে বললেন, হোল সাবকিন্টিনেন্টে ছড়িয়ে আছে বাবা। তামাম দুনিয়া জুড়ে। আরও হিসেব নেবে? দু'জামাইয়ের একজন ওয়াশিংটনে, অন্যজন কুয়েতে।

আসি বলে মামুন উঠেছে। তখন বললেন, কিছু কথা ছিল নাকি বাবা?

ভঙ্গিটা অমায়িক সবসময়। মামুন আস্তে বলে, সোনাচাচাজি নাকি আপনার এখানে থাকেন। ওঁর জন্যে...

বার্ধক্যভাতা! বরকত চেঁচিয়ে ওঠেন। বার্ধক্যভাতার জন্যে পঞ্চায়েতে দরখাস্ত করতে কবে বলেছিলাম। সরকার থেকে বাস্তুহীনদের বাস্তুজমিও দিচ্ছে। ঘর গড়ার টাকাও দিচ্ছে। মিয়া বলল, ধুর! কে অত ঝঞ্ঝাট করছে। তাহলেই বোঝ।

মামুন তাকায় মুখের দিকে। বুঝতে পারে না। এক মোসাহেব বলে, রহিমমাস্টারকে ধরলেই হয়ে যেত। আজকাল ওদের হাতেই সব। তবে সোনামিয়ারও বড্ড স্বভাব খারাপ। সবাইকে চটিয়ে রেখেছে যে।

রাগ করে মামুন বেরিয়ে আসে ঘর থেকে। বারান্দার নিচে সিঁড়ির ধাপ। প্রাঙ্গণে শুকনো ঘাসের ওপর জিপের চাকার দাগ এঁকেবেঁকে ছড়িয়ে আছে। ধাপে একটু দাঁড়ায় সে। দাগগুলোর দিকে উদ্দেশ্যহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। এবার বুঝতে পারে, ধুরন্ধর বরকত কেন তাকে ওসব কথা বলছিলেন। দেখছ তো আমি কে? খবর্দার, আমার সঙ্গে মাটি নিয়ে বিবাদ করতে পা বাড়িও না।

মামুন হনহন করে গেটের দিকে হাঁটতে থাকে। গেটের মাথায় বুগানভিলিয়া আগুনজ্বলা হয়ে দাউ দাউ জ্বলছে। সেখানে পৌঁছলে কেউ তাকে ডাকে পেছন থেকে। মামুন ঘুরে দেখে আজাই। গুরুপাঞ্জাবি আর ঢোল পাতলুন পরা আজাইয়ের গলায় মিহি চেন চিকচিক করছে। বাঁ হাতে স্টেনলেস

স্টিলের মোটা বালা। কাছে এসে বলে, কী কমরেড! দেখা না করেই চলে যাচ্ছে যে? শেষপর্যন্ত আমার কুলাক পিতাজি হল তোমার আপনজন, আর এই খাঁটি প্রোলেটারিয়েট তোমার পর?

মামুন একটু হাসে শুধু।

আজাই তার একটা হাত নিয়ে বলে, প্রব্লেমটা কী? ও বুড়ো শয়তানটার কাছে কেন?

মামুন ভীষণ অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকায়। ...আব্বাকে শয়তান বলতে শিখেছ দেখছি! বাঃ!

আজাই খিকখিক করে হাসে। ...আমি শালা সবসময় ফ্র্যাংক। কোদালকে কোদাল বলি, গাছকে গাছ। যাক গে, তোমার প্রব্লেমটা কী?

আমার কোন প্রব্লেম নেই।

চালাকি কর না। প্রব্লেম ছাড়া বরকত সাহেবের কাছে কোন বাঞ্চোত আসে না। ...বলে আজাই তাকে একটু টানে। ...এস, আমার ঘরে একটু আড্ডা দেওয়া যাক।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও মামুন তার সঙ্গে যায়। প্রাঙ্গণ ঘুরে বাড়ির পেছনটায় গিয়ে আজাই বলে, কেমন জায়গায় থাকি দেখছ কমরেড? বাড়ির সঙ্গে কানেকশান থেকেও নেই। এখন ভাবি, দাদু হারামিটা যত মাগিবাজ হোক, ইনটেলিজেন্ট ছিল। নিকে করবে বলে এই মহলটুকু বানিয়েছিল। কাজে লাগাতে পারে নি। দাদিটা ছিল তক্কে তক্কে।

পেছনদিকে খিড়কির পুকুর। পাড়ে কলাগাছ, সবজিক্ষেত। বাড়ির গা থেকে প্রকাণ্ড আবের মত একটা অংশ বেরিয়ে এসেছে। এটাও দোতলা এবং একটুকরো আলাদা উঠোনও আছে। মামুন এ বাড়ি কখনও ঢোকেনি। এদিকেও আসেনি। আশ্চর্য লাগে, এই নবাবগঞ্জে তার জন্ম হয়েছে এবং এখানেই সে বড় হয়েছে। অথচ এখনও কত জায়গা তার অচেনা থেকে গেছে। দরজা খোলাই ছিল। ভেতরে ঢুকে মামুনের মনে হল, শহরের কোন সায়েবসুবোর ড্রয়িং রুম যেন।

শিলিং ফ্যানটা নিঃশব্দে ঘুরছিল। আজাই বলে, বস কমরেড।

তুমি এদিকটায় থাক বুঝি? মামুন দেখতে দেখতে বলে।

হ্যাঁ। এই হচ্ছে লায়লা-মজনুর পীরিতের ডেরা। আজাই বিদেশি সিগারেট বের করে পকেট থেকে। মামুনকে একটা দিয়ে ফের বলে, টুটাফাটা হয়ে পড়েছিল। জিনের আড্ডা বলে এইদিকে কেউ পা বাড়াত না। আমি দেখলাম, অন্তত দাদু হারামজাদাটার মনে শান্তি হোক। গোরে শুয়ে ছটফট করছিল।

মামুন একটু হাসে। ...তোমার লায়লা কই?

ওয়েট, ওয়েট। এক্ষুণি এসে যাচ্ছে ওপর থেকে। ...বলে সে ভেতরের দরজায় উঁকি মেরে ডাকে, লায়লা। জলদি কম অন। কে এসেছে দেখে যাও।

মামুনের পাশে এসে বসে সে। মামুন চুপচাপ সিগারেট টানে। গাছপালার ফাঁক দিয়ে ফাঁকা মাঠ এবং রেললাইন দেখা যাচ্ছে। ওখানটায় শান্টিং ইয়ার্ড। একটা লোকো শেড। ইঞ্জিন শিস দিচ্ছে মাঝে মাঝে। বিকেলের রোদে ঝিমধরা ভাব। আজ তত বাতাস নেই।

আজাই মিটিমিটি হেসে বলে, প্রব্লেমটা বললে না কমরেড?

কমরেড-কমরেড করছ কেন আজাই? আমি কি কমরেড? মামুন একটু বিরক্ত হয়ে বলে। কবে হুজুগে পড়ে কী সব করে ফেলেছিলাম। নিজেরই মনে নেই। বরং তোমার কথা বল।

আজাই জোরে হাসে। তারপর দরজার দিকে হাত তুলে আঙুল ইসারা করে বলে, কাম অন ডিয়ারি! উঁকি মারার কারণ নেই। ...বলেই সে মামুনের কাঁধে থাপ্পড় মারে। ...তোমাকে দেখছে মাইরি। কম্পেয়ার করছে।

ঘোমটা পরা লায়লা ঢুকে হাত তুলে মামুনের উদ্দেশে বলে, আদাব ভাইজান!

আজাই বলে, এঃ। মাইরি এর মোছলমানি দিনে দিনে বেড়ে যাচ্ছে। আরে বাবা, তা যদি করবে, তাহলে আর ওকে বিয়ে করলাম কেন? কমরেড—থুড়ি, মামুন বল তুমি?

লায়লা দাঁড়িয়ে আছে দেখে মামুন বলে, বসুন।

লায়লা বসে না। মুখটা গম্ভীর মনে হয়। আজাইয়ের দিকে তাকিয়ে বলে, ওনাকে এমনি-এমনি বসিয়ে রেখেছ যে? চা-নাস্তা বলে আসি।

মামুন বলে, না, না। আমি চা-ফা খেয়েই বেরিয়েছি।

আজাই বলে, উরে ব্বাস! খানদানি এটিকেট দেখছ? তিনদিনে সব শিখে গেছে। শুধু দুঃখ, আমার লাইন ধরান গেল না।

লায়লা ভুরু কুঁচকে একটা ভঙ্গি করে চলে যায় ভেতরে। মামুন বলে, তোমার লাইনটা কী?

দেখবে নাকি? বলে আজাই ওঠে। কোনার দিকে টেবিলে রাখা রেকর্ডপ্লেয়ার চালিয়ে দেয়। অন্য দুকোণে দুটো স্টিরিও স্পিকার। জগঝম্প বাজনা শুরু হয়। আজাই আঙুলে তুড়ি দিয়ে কোমর বেঁকিয়ে নাচের ভঙ্গিতে বলে, চা চা চা!

মামুন কান ঢেকে বলে, উঃ! আস্তে আস্তে।

আওয়াজ কমিয়ে আজাই এসে বসে সোফায়। পা ছড়িয়ে হেলান দিয়ে বলে, বহরমপুরে পিতাজি একটা বাড়ি তুলছে। হলেই চলে যাব। আমার মাইরি এখানে আর পোষায় না। বড্ড একঘেয়ে জায়গা।

মামুন বলে, বহরমপুরে কেন? কলকাতায় চলে যাও।

আজাই চোখ নাচিয়ে বলে, বলছ?

হুঁউ। তোমার অসুবিধেটা কী?

আছে। আউট অফ সাইট আউট অফ মাইন্ড হয়ে যাব পিতাজির। মালকড়িটা চোখের সামনে আছি বলে পাচ্ছি। হয়ে-হম্মেও নিচ্ছি। দূরে গেলে ব্যাটার নাম পর্যন্ত ভুলে যাবে। ...আজাই হাসতে হাসতে বলে। আমার পিতাজি কী মাল এখনও টের পাও না বুঝি? তোমাকেও না ভিটেছাড়া করে ফেলেছে!

মামুন তাকায় কিছু বলে না।

আজাই নির্মলমুখে বলে, আমি হলে কী করতাম জান?

রুলিং পার্টিতে ঢুকে যেতাম। ভিটে কেন, জমিজমাতেও ফ্ল্যাগ পুঁতে দখল নিতাম।

মামুন বলে, কী সব বলছ?

আজাই গম্ভীর হয়ে যায়। ছাদের দিকে তাকিয়ে বলে, ডুমুরকে বিয়ে করছ নাকি কমরেড?

তোমার মাথায় এসব আসছে কেন?

আজাই পা সোজা করে বসে। চাপা গলায় বলে, আসছে। কারণ তোমার প্রব্লেম বুঝি বলে। তুমি টেম্পোরারিলি ওদের বাড়ি উঠেছ। তারপর? তারপর তো তোমার একটু মাটি দরকার। অবিশ্যি নবাবগঞ্জে যদি থাকতে না চাও, আলাদা কথা। কিন্তু তোমার হাবভাব দেখে আঁচ করেছি, তুমি এখানেই থাকতে এসেছ। কেন থাকতে এসেছ, তা জানি না। তবে মনে হচ্ছে, ডুমুরকে...

কথা কেড়ে মামুন বলে, ডুমুরের সঙ্গে আমার অন্যসম্পর্ক, আজাই।

আজাই ফের হাসে! ...হাসালে কমরেড! যুবতী মেয়ের সঙ্গে যুবকের সম্পর্ক একটাই। নেহাত মায়ের পেটের বোন হলে আলাদা কথা। ডুমুর তোমার চিরকালের গার্লফ্রেন্ড। চালাকি কর না। স্কুললাইফে আমি সব দেখেছি। দুজনে কাট করে ঘুরপথে দাদাপিরের আস্তানার ওখানে গিয়ে জুটতে। কল্কে ফুলের জঙ্গলে বসে দুজনে সিগারেট টানতে। শালা! এ আজাইয়ের চোখ সবদিকে থাকে। মেলা বক না। হাটে হাঁড়ি ভেঙে দেব।

মামুন ঠোঁট ফাঁক করে। একটা জবাব দেবে বলে। কিন্তু সেইসময় লায়লা এসে ঢোকে। দুহাতে ট্রে। পর্দাটা ওঁর কাঁধে আটকে গেছে। বলে, ধরবে তো?

আজাই পর্দা সরিয়ে দেয়। নিচু টেবিলে লায়লা ট্রে রাখে। ট্রেতে ডিমের হালুয়া, চায়ের পট, কাপ-প্লেট, চামচ। দুধের পট, চিনিরও। মামুন অবাক হয়ে ভাবে, সন্ধি দিয়াড়ির মেয়ে কত দ্রুত সভ্যতা আয়ত্ত করে ফেলেছে। মেয়েরা এসব ব্যাপারে হয়ত পুরুষের চেয়ে দ্রুতগামী।

চা খেতে খেতে মামুন আড়চোখে সন্ধি দিয়াড়ির মেয়েকে দেখতে থাকে। বাবলানদীর ধারে অতটা দেখা হয় নি, অন্ধকার হয়ে এসেছিল শিগগির। গায়ের রঙ একটু চাপা এই যা। কিন্তু চোখে মুখে,

গড়নে বা চেহারায়, কী এক আলো আছে। তীক্ষ্ণতা আছে। তারপর সিঁথির দিকে তাকিয়ে মামুন বলে, বাঃ। আপনি সিঁদুর পরেন দেখছি।

হাসতে-হাসতে লায়লা বলে, আপনার বন্ধুর জুলুমে। অন্দরে যতক্ষণ থাকি, ঢেকে রাখি ঘোমটা দিয়ে। মা দেখতে পেলে মুখ করেন।

মেয়েটা মুসলমানি বুলিও শিখে নিয়েছে। মামুন জিজ্ঞেস করে, নামাজ-টামাজ পড়তে শিখেছেন তো?

জবাব দেয় আজাই। ...বাড়ি শুদ্ধ লোক ওকে তালিম দিচ্ছে সমানে। শিগগির হজে না পাঠায়। শালা। শিগগির কাট করতে হবে।

মামুন বলে, ওঁকে নিয়ে বাইরে ঘোরাঘুরি কর। আপত্তি ওঠে না?

সেদিন বললাম কী? আজাই রাগ করে বলে। ...আপত্তি ওঠে বলেই আরও জোর করে নিয়ে বেরোই। মোটরসাইকেলের ব্যাকে বসাই বললে তক্ষুনি বলি, বেশ, তাহলে কার কিনে দাও। যদ্দিন না কার কিনে দিচ্ছে, আরও দেখিয়ে-দেখিয়ে ঘুরব শালা!...

একটু পরে লায়লা বলে, ডুমুর আপাকে একদিন আসতে বলবেন ভাইজান? আঙুরের ঠিকানা জানলে চিঠি দিতাম। কতকাল দেখা নেই। ও মাসে নাকি এসেছিল কখন। জানলে দেখা করতাম।

মামুন এই দুবার সন্ধি দিয়াড়ির মেয়েকে দেখল। তার খুব অবাক লাগে। মেয়েটার সম্পর্কে যতটা শুনেছে, ততটা হয়ত সত্যি না। উচ্ছৃঙ্খল, চালাকচতুর বা স্মার্ট বলে মনে হয় না আদৌ। বরং কেমন শান্ত, সংযত। ভদ্রও বটে। এমন মেয়ে সব খুইয়ে প্রেমের হাত ধরে অন্য জীবনে এসে ঢুকেছে কেমন করে, বুঝতে পারে না মামুন। নিশ্চয় একটা প্রচণ্ড জোর থাকা দরকার এর পেছনে। পুরুষদের কি এমন জোর আছে—পুরুষরা আবহমানকাল ধরে যতই প্রভুত্ব করুক পৃথিবীতে? মামুন বুঝতে পারে, দিয়াড়ির মেয়ে মুসলমানিকে হয়ত খুব জোরে আঁকড়ে ধরতে চাইছে, এ তার অসহায়তারই তাগিদ। কারণ আর তার ফেরার পথ নেই। আসলে মেয়েরা অনেকদূর অব্দি দেখতে পায়।

কিন্তু আজাইয়ের মধ্যে কী দেখেছিল নির্মলা দিয়াড়নি? শুধু পুরুষ-সৌন্দর্য—নাকি টাকাকড়ি? নাকি এরকম চঞ্চল, স্মার্ট, খামখেয়ালি, ঈষৎ তরলমতি এবং বদমাইস পুরুষমানুষই স্ত্রীলোকের প্রেমিকমডেল? মামুনের প্রেমের অভিজ্ঞতা নেই। এই যে আজাই ডুমুরের কথা বলছিল, ডুমুর তাকে ভালবাসে কিংবা সে ডুমুরকে—এসব ভাবতেই অস্বস্তি হয়। ডুমুরকে প্রেমিকা হিসেবে ভাবা অসম্ভব মামুনের পক্ষে। ডুমুর যেন তার পড়া গোয়েন্দা-কাহিনী। পাতা ওল্টাতে গেলেই মনে পড়ে যায়, এ কাহিনীর খুনি কে। রস জমে না।

চা শেষ করে মামুন বলে উঠি।

লায়লা বলে, একী হালুয়াটা খেলেন না। আমার হাতের তৈরি কিন্তু না খেলে রাগ করব।

আজাই বলে, তাহলেই হয়েছে। মোছলমানি প্রেপারেশন হিঁদুর মেয়ের হাতে কী মাল হয়ে উঠবে ভাবা যায় না। মাইরি কমরেড, আমি যত বলি, ওকে ডাল রাঁধতে দাও। কুলবেড়ের মেয়েরা দারুণ ডাল রাঁধে। বিহার মুলুকের ডাল খেয়েছ কখনও? তা—সেই মিয়াগিরি রপ্ত করিয়ে ছাড়বে। দেখি, কী মাল বানিয়েছে?

সে হাত বাড়িয়ে একটু হালুয়া নেয়। লায়লা মিটিমিটি হেসে বলে, ডিমের হালুয়া।

আজাই বলে, মন্দ না। খাও কমরেড। পেট গড়বড় হলে কিন্তু আমার বদনাম দিও না।

লায়লা প্লেটটা দিলে অনিচ্ছাসত্ত্বেও মামুন নেয়। খানিকটা খেয়ে বলে, দারুণ হয়েছে। অপূর্ব!

লায়লা খুশিমুখে বলে, শুনেছ তো?

কিছুক্ষণ পরে মামুন বেরিয়ে পড়ে। আজাই তাকে গেটপর্যন্ত এগিয়ে দেয়। সেইসময় বলে, শোন কমরেড। বুড়োশয়তানটার সঙ্গে লড়াই যখন দেবেই না, তখন একটা পরামর্শ দিই! ডুমুরকে...

মামুন বিরক্ত হয়ে বলে, আবার সেই কথা?

শোন না বাবা! চৌধুরিসায়েবের বয়স হয়েছে। ডুমুরের জন্যে এবার ঘরজামাই দেখতে হবে।

অতএব বলছি, তুমি চান্স ছেড় না। বউকে বউ পাবে। একটা বাড়ি পাবে। তার সঙ্গে কিছু জমিজমা। আখেরটা ভেবে দেখ।

সবাই তোমার মত আখের ভাবে না, আজাই!

আমি আখের ভাবি? আজাই বাঁকা হাসে। শালা। শালুক চিনেছে গোঁসাইঠাকুর।

আচ্ছা, চলি।

আজাই ওর কাঁধে হাত রাখে। ভুরু কুঁচকে বলে, তুমি জান নবাবগঞ্জে আমার আর কোন বন্ধুবান্ধব নেই?

তাই বুঝি?

হ্যাঁ। হিন্দুরা চটেছে ওদের মেয়ে ভাগিয়েছি বলে। হরিজন তো কী হয়েছে? হরিজন তো হিন্দুই। ওদিকে মোছলমানরা চটেছে বউ নিয়ে বেপর্দা করে ঘুরে বেড়াই বলে। খুব ঝড় চলে গেছে কমরেড—তখন কোথায় তুমি? তার ওপর আমি এক যুবশক্তি। নবাবগঞ্জের সব দলের যুবশক্তি ভেবেছিল, তাদের গায়ে চুম্বক আছে। এই যুবশক্তি ওইসব যুবশক্তির শামিল হবে। হয়নি। সুতরাং আমি একা—লোনলি ম্যান।

মামুন তাকিয়ে থাকে। কী বলতে চায় আজাই, বুঝতে পারে না।

আজাই বলে, পিতাজির বাড়িটা শেষ হলেই আমি বহরমপুরে চলে যাব। কিন্তু তুমিও তো কমরেড, লোনলি ম্যান। তুমি কী করবে? এখানে থাকবে তো?

জানি না।

তোমার ভালর জন্যই বলছি কমরেড, ডুমুরকে বিয়ে কর। এদেশে ওই একটিমাত্র বিশুদ্ধ জিনিস। বাদবাকি সব ছেনাল। ডুমুর...ডুমুরকে পারলে আমিই বিয়ে করতাম জান? নিমলিটা হঠাৎ কোত্থেকে সামনে এসে চোখ ধাঁধিয়ে দিলে।

কাঁধ থেকে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে 'চলি' বলে মামুন হাঁটতে থাকে। একটু দূরে গিয়ে ঘুরে দেখে, আজাই তখনও দাঁড়িয়ে আছে এদিকে চেয়ে। মদ খেয়েছে হয়ত। তার নেশায় আবোল-তাবোল

ডুমুরদের বাড়ির কাছে এসে গতি কমায় মামুন। গাছপালাভরা পোড়ো ভিটেমাটির একটেরে জীর্ণ বাড়িটা তার দিকে করুণ মুখে তাকিয়ে আছে। বুকের ভেতর হঠাৎ কেমন চিড়িক করে ওঠে।...

সেরাতে খেতে বসে মোজাই চৌধুরি বলেন, বরকতের কাছে গিয়েছিলে নাকি?

মামুন আস্তে বলে, হুঁ। পাত্তা দিলেন না।

ওনাকে বললে না ও দলিল আইনের ধোপে টিকবে না?

মামুন জবাব দেবার আগে ডুমুর বাঁকা মুখে বলে, ওর নাম বরকত। বদ মতলবের ডেঁপো। আমার তো ভয় হচ্ছে, উল্টে মামুনকে বাংলাদেশের সিটিজেন বলে পুলিশের কাছে খুঁচিয়ে না দেয়।

চৌধুরি চমকে উঠে মেয়ের দিকে তাকালেন। মামুনও একবার তাকায়। তারপর চুপচাপ মাংস ছিঁড়তে থাকে। বড় ভাল রাঁধে ডুমুর! এতদিনে টের পাচ্ছে, ডুমুরের দুটো অংশ। একটা ঘোর সংসারি, অন্যটা প্রচণ্ড বিবাগী। ঘরের বাইরে বেরুলে তখন সেই বিবাগী ডুমুরের রূপ ফুটে বেরয়। আকাশ-বাতাস-মাঠ-নদী-গাছপালা মিলে প্রকৃতির যেদিকটা ব্যাপক ও বহুদূর অব্দি ছড়ান, সেখানে সে পাগলের মত ছোটাছুটি করতে চায়। আর ঘরের কোনায় সে ভীতু, কোমল, হিসেবি এবং শান্ত। মুসলিম মেয়ে বলে একটা সীমাবদ্ধতার জন্য ওর যতটা আফসোস, আবার ততটা সান্ত্বনা। কারণ ওর মতে, মেয়ে হয়ে জন্মে বাড়াবাড়িটা মোটেও ভাল না।

চৌধুরির চশমা নাকের ডগায় ঝুলে পড়েছে। ঠেলে তুলে দেন। দাড়িতে একটা ভাত আটকে আছে। চাপা গলায় ভয়ে-ভয়ে বলেন, হুঁ, বরকতকে কিছু বিশ্বাস নেই।

মামুন হাসবার চেষ্টা করে বলে, প্রমাণ করবেন কীভাবে? যার সঙ্গে দেখা হয়েছে, তাকেই বলেছি কলকাতায় ছিলাম।

ডুমুর বলে, আজাইকে বল নি। ওকে সেদিন গলগল করে তো সব কথা উগরে দিলে।

আজাই অন্য ছেলে। মামুন বলে। জানেন চাচাজি? আজাই বলল, রুলিং পার্টিতে ঢুকে ওদের সাহায্যে জমি ও ভিটের দখল নাও।

আজাই বললে? চৌধুরি অবাক হয়ে যান। তারপর বলেন, ও হারামজাদার কথা ছেড়ে দাও। সমসময় উল্টোপাল্টা বলে। অথচ বাপের সামনে একেবারে কেঁচো! বাপ হেগে সেই গু খেতে বললে খাবে আজাই।

ডুমুর বলে, কেঁচো না হয়ে তো উপায় নেই। মাথার ওপর অমন শক্ত লোক না থাকলে হিঁদুদের হাতে খুন হয়ে যেত না? রায়েট লাগার উপক্রম হয়েছিল দিয়াড়নিকে নিয়ে। বরকত মিয়ার খাতিরে হিঁদু-মোসলমান দু পক্ষের অনেক লোক মাথা ঠাণ্ডা রেখে আগুন নিভিয়েছিল। আমরা তো সারারাত ভয়ে ঘুমতে পারতাম না। ভাবতাম, এই বুঝি হিঁদুপাড়া থেকে হামলা করতে এল! সুরেনদাকে এমন শাসিয়েছিল, বেচারি রাতে লুকিয়ে এ বাড়ি আসত।

চৌধুরি মেয়ের কথায় সায় দিয়ে বলেন, হ্যাঁ—দিনকতক সে এক ঝড় গেছে বাবা।

দিনেরাঁধা বিরিয়ানি আর কয়েকরকম মাংসের সুস্বাদ হঠাৎ কিছুক্ষণ নিরর্থক হয়ে পড়ে বুঝি। পৃথিবীতে এইসব অদ্ভুত তেতো ব্যাপার আছে ভাবলে পৃথিবীকে বাসযোগ্য মনে হয় না। কিছুক্ষণ তিনজনেই চুপ করে থাকে। তারপর চৌধুরি বলেন, তবে কথা কী। এটাই দুনিয়ার আইন। মানুষের আনাচে-কানাচে শয়তান ওলগোলানি (ফুঁসমন্তর) দিয়ে বেড়াচ্ছে। বললে, তুমি বাংলাদেশে ছিলে প্রমাণ করতে পারবে না। প্রমাণের দরকারটা কী? হয়রান করবে। নিয়ে গিয়ে আটকে রাখবে গরাদখানায়।

ডুমুর হঠাৎ হাসে। ...আজাই কিন্তু মন্দ বলেনি।

মামুন বলে, রাজনীতিওলাদের আমি ঘেন্না করি।

ডুমুর চোখ নাচিয়ে বলে, দশবছর আগে আমাকে বোঝাতে চাইতে...

কথা কেড়ে মামুন বলে, মানুষ বদলায় ডুমুর।

চৌধুরি জল খেয়ে গেলাসটা সাবধানে রেখে বলেন, তোমার গায়ের সে-গন্ধটা মুছে গেছে মামুন। থাকলে আঁচ করতে পারতাম। তোমাদের দলের অনেককেই তো দেখলাম, শেষ পর্যন্ত নিজের-নিজের ধান্দায় ব্যস্ত হয়েছে। পুলিশ আর বিশেষ জ্বালাতন করেনি। সে-হাওয়াটা কবে চলে গেছে। কাজেই তোমার জন্যে ভাবনাটা ওদিক থেকে নয়। বরকতের দিক থেকে। আমি একবার ধরব নাকি গিয়ে?

থাক্ গে। আমি চলে যাব। মামুন হাত ধোয়ার পাত্রটা টেনে নেয় কাছে। ফের বলে, সব অচেনা লাগছে নবাবগঞ্জে। ডুমুর জল ঢালতে এলে সে বারণ করে। নিজেই বাঁহাতে গেলাস ধরে এঁটো হাতটা ধোয়।

চৌধুরি তাকিয়ে ছিলেন তার দিকে। বলেন, চলে যাবে?

ডুমুর মুখ নামিয়ে এঁটো সরাতে মন দেয়। মামুন তোয়ালেতে হাত মুছে বলে, যখন আপনাদের জন্য মন খারাপ করবে। এসে দেখে যাব। ডুমুরের হাতের বিরিয়ানি খেয়ে যাব। দারুণ শিখেছ ডুমুর। তোমার দাদিআম্মাকেও ফেল করিয়ে দিয়েছ।

ডুমুর থালা-পেয়ালা সরিয়ে নিয়ে যেতে যেতে বলে যায়, কৃতার্থ হয়ে গেলাম শুনে।

চৌধুরি শুকনো হাসেন। মামুনের আগের কথাটা টেনে বলেন, হঠাৎ মত বদলালে তাহলে? নবাবগঞ্জ অচেনা লাগছে বললে। তা লাগবে। আমারও কি লাগে না? কত বদলে গেল দেখতে দেখতে।

মামুন আস্তে বলে, হুঁ। ভাল লাগছে না।

অনেক মানুষের পায়ে চাকা বাঁধা থাকে অবিশ্যি। দার্শনিকের গলায় চৌধুরি বলেন। আমার দাদুসায়েবের কথাই ধর। কত গাঁয়ে না বাড়ি করেছিলেন। সারাজীবন এখান থেকে ওখানে। শেষে এখানে এসে থিতু হলেন। বড়লোকের মেয়ে বিয়ে করে জমি জায়গাও পেয়েছিলেন বিস্তর। আসলে একটা মাটি জুটে গেলে তখন আর নড়া হয় না। শক্তমতন মাটি, বুঝেছ? আমার দাদুসায়েব ছিলেন মৌলানা মানুষ। কিন্তু যেই একটা শক্তমতন মাটি মিলল, ছেলেমেয়েদের ইংরিজি পড়তে দিলেন। আর্বি-পার্সির লাইন বরবাদ। আব্বা ম্যাট্রিক পাশ করে জঙ্গিপুরে এসডিওর কোর্টে পেশকারি করতেন।

মামুন কান করে না। এ পারিবারিক ইতিহাস সে অনেকবার শুনেছে। দেখতে পায়, বারান্দার

শেষদিকে রান্নাঘরের মেঝেয় বসে পিঠ এদিকে রেখে ডুমুর খাচ্ছে। রান্নাঘরের বাল্‌বটা কম পাওয়ারের। অস্পষ্ট দেখাচ্ছে ডুমুরকে? মামুনের মনে পড়ে যায় আজ্জাইয়ের কথাটা। ভাবতে থাকে, ডুমুরকে বিয়ে করলে কী কী ঘটতে পারে। অন্তত একটা দৃশ্য তার সামনে স্পষ্ট হয়ে ভেসে আসছে। মামুন চৌধুরিসায়েব হয়ে যাবে। অমনি করে রোজ মাঠে ও সেই বাগানে যাবে। সুরেনের সঙ্গে জমি নিয়ে কথাবার্তা বলবে। গাইগরুটার দুধ দুইবে সুরেন। তখন সে বাছুর ধরে দাঁড়িয়ে থাকবে। ব্যাপারিদের খন্দ ওজন করে বেচবে। তারপর সন্ধ্যার দিকে ডুমুর ধরলে তাকে নিয়ে স্টেশনবাজারের ওখানে সিনেমা দেখতে যাবে। কী জীবন বা জীবনযাপন! এমনি করে নবাবগঞ্জে মানুষ বেঁচে আছে বংশপরম্পরা।

মামুনের ঠোঁটে হাসি দেখে চৌধুরী বলেন, তা হাসির কথাই বটে বাবা। তখন লিগ মিনিস্ট্রির আমল। নবাবগঞ্জে মিয়াদের মহা রবরবা। আর বলতে গেলে এ জেলাটা তো বরাবর মোসলমান-মেজরিটি। মোসলমানের দাপট বড্ড। এখন ভাবি, সে ঘটনা এখন ঘটলে কী হত? বল তুমি?

ঘটনাটা কী মামুন শোনেনি। তবু বলে, ঠিক বলেছেন।

চৌধুরি বলেন, তাই বলি, যেমন অবস্থা তেমন ব্যবস্থা। এখন পান্তাভাতে ফুঁ দিয়ে খেতে হবে। যতই বল, পার্টিশান যখন হয়ে গেছে, তখন এটা হিঁদুরই দেশ। এদেশে থাকতে চাইলে ওনাদের সঙ্গে মানিয়ে-গণিয়ে চলতে হবে। বেশি রোয়াব দেখাতে চাও তো বর্ডার পেরিয়ে সিধে চলে যাও। আমি এই বুঝি, বাবা!

ফের মামুন বলে, ঠিকই বলেছেন।

তেতো মুখে নিচের উঠোনের দিকে তাকিয়ে থাকেন মোজাই চৌধুরি। মুখ বাড়িয়ে থুথু ফেলেন। তারপর ঘুরে বসে বলেন, তুমি সত্যি চলে যাবে ভাবছ?

হ্যাঁ। ভাল লাগছে না।

চৌধুরি হাসেন। ...বাপদাদার দেশ ভাল লাগছে না?

না। বলে মামুন উঠে দাঁড়ায়। সিগারেট খাওয়ার জন্যে মন ছটফট করছে। সে পা বাড়ায় বাইরের ঘরের দিকে। যেতে-যেতে ভাবে, এমন করে উঠে আসাটা বেয়াদবি হল না তো—রাতের বিদায়সম্ভাষণ না করেই?

পেছনে চৌধুরি বলেন, যা লোডশেডিং চলছে—ঘুমুতে অসুবিধে হয় না তো মামুন?

মামুন ঘুরে বলে, না না। এমনিতে যথেষ্ট হাওয়া এ ঘরে।

বাড়িতে শিলিং ফ্যান মোটে একটা। পুরনো ঘড়ঘড়ে ফ্যান। ডুমুরের ঘরে ঝুলছে সেটা। চৌধুরি থাকেন বারান্দায় তক্তাপোশটাতে। একটা টেবিল ফ্যান শস্তায় কিনেছিলেন কবে। দরকার হলে মাথার দিকে চেয়ারে বসিয়ে হাওয়া নিতেন। মামুনের জন্যে সেটা বাইরের ঘরে চলে এসেছে। কোনার টেবিলে দাঁড়িয়ে চমৎকার ঘোরে। মামুন একেবারে বাইরের ছোট্ট বারান্দায় চলে যায়। সিগারেট টানতে থাকে। সামনে ঘন অন্ধকার। ডাইনে সামান্য দূরে রাস্তার লাইটপোস্টে বাতি জ্বলছে। গাছপালার ভেতর ঝিকমিক করছে আলো। পোড়ো ভিটেমাটির জঙ্গল তোলপাড় করে হাওয়া বইছে। পুবে সিগন্যালের লাল আলো জুগজুগ করছে রেললাইনে। মামুন ভাবছে, হঠাৎ চলে যাওয়ার কথাটা দুম করে মুখ থেকে বেরিয়ে গেল কেন? চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত তো সে তখন পর্যন্ত করেই নি। সাইলেন্সার লাগান পিস্তলের গুলির মত হিস করে কথাটা ছুটে গেছে আচমকা। কিন্তু তাহলে বলা যায়, ওটা তার মাথার ভেতর আটকে ছিল নিজের অজান্তে। 'চলে যাওয়া' ব্যাপারটা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে সে ঠাহর করতে থাকে। বড় অস্পষ্ট, গোলমেলে আর বিপজ্জনক লাগে।

কিছুক্ষণ পরে পেছনের ঘরে আলো জ্বলে উঠলে সে ঘুরে দেখে, ডুমুর! বাইরের দরজায় এসে সে বলে, অন্ধকারে দাঁড়িয়ে কী করছ?

সিগারেট খাচ্ছি। মামুন একটু হাসে। খাবে নাকি?

ডুমুর সে কথায় কান করে না। বলে, ভেতরে এস। এত রাত অব্দি বাইরের দরজা খুলে রাখা ঠিক না। যা কাণ্ড চলছে আজকাল! কখন কে পিস্তল হাতে করে ঢুকে পড়বে।

মামুন তীক্ষ্ণ দৃষ্টে ওর মুখের দিকে তাকায়। বুঝতে চেষ্টা করে, তামাসা করছে নাকি। বলে, আমাকে ভয় দেখাচ্ছ বুঝি?

মোটেও না। ডুমুর সিরিয়াস ভঙ্গিতে বলে। কিছুদিন থাকলেই টের পেতে। বললে, চলে যাবে। এস, ভেতরে বস। উঠোনে গিয়েও বসতে পার।

অগত্যা মামুন ঘরে ঢোকে। দরজা আটকে বলে, চাচাজি শুয়ে পড়লেন নাকি?

হ্যাঁ। ডুমুর মেঝেয় দাঁড়িয়ে আলগোছে চুলটা বেঁধে নেয়।

ঘড়ি দেখে মামুন বলে, তোমাদের নটা বাজতে না বাজতে ঘুম এসে যায় কেন বল তো?

ডুমুর বলে, আসে। ভোরে উঠতে হয় বলে।

কেন ভোরে উঠতে হয়? শুয়ে থাকতে অসুবিধেটা কী?

অনেক। অনিচ্ছায় একটু হাসে ডুমুর। প্রথমত, ভোরের নামাজ। তারপর সুরেন এসে ডাকে।

অত ভোরে সেই বাগান থেকে চলে আসে সুরেন?

আসে তো। বলে ডুমুর টেবিল ফ্যানের সুইচ অন করে দেয়।

মামুন তক্তপোশে তার বিছানায় বসে বলে, চেয়ারটা টেনে নিয়ে বস। গল্প করি। আমার ঘুম আসতে সেই রাত আড়াইটে-তিনটে।

এ ঘরে একটা বাঁকাটেরা পুরনো টেবিল, দুটো হাতলভাঙা চেয়ার আর একটা ছোট্ট বেঞ্চ আছে। আর দেওয়ালের তাকে কিছু পুরনো পত্রিকা, বই, খবরের কাগজ ঠাসা। দেওয়ালে একটা মক্কার কাবা মসজিদের ছবিওলা ক্যালেন্ডার ঝুলছে। আর এই তক্তাপোশটাও আসবাব বলে গণ্য করতে হয়। কোনার দিকে একটা শাবল খাড়া করে রাখা।

ডুমুর টেবিলে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। বলে, তুমি সত্যি চলে যাবে ভাবছ?

মামুন কোনায় শাবলটার দিকে আঙুল তুলে বলে, কতবার ভেবেছি জিজ্ঞেস করব—মনে থাকে না। ওটা ওখানে কেন বল তো? আমার আত্মরক্ষার জন্যে নাকি।

ডুমুর কান করে না। বলে, হঠাৎ চলে যেতে চাইছ কেন? এই তো এলে!

মামুনও কান করে না তার কথায়। সে উঠে গিয়ে শাবলটা পরখ করতে করতে বলে, আত্মরক্ষার জন্যে জিনিসটা আপাতদৃষ্টে মন্দ নয় হয়ত। কিন্তু তোমার কথামত যদি কেউ পিস্তল হাতে হামলা করতে ঢোকে? সময় বদলে গেছে ডুমুর। বাংলাদেশে কী কাণ্ড। রোজ রাতে শোবার সময় সবাই খাটের তলা দেখে নিয়ে তবে শোয়। এদেশে নিশ্চয় অতটা নয়। আমার ধারণা, এদেশে গভর্নমেন্ট অনেক বেশি সিভিলাইজড।

কথাগুলো সে শাবলটার দিকে তাকিয়ে বলে, হাঁটু দুমড়ে বসে ওটা দুহাতে ধরে মাটি খোঁড়ার ভঙ্গিও করে। তারপর ঘুরে দেখে, ডুমুর নেই।

শাবলটা রেখে সে উঠে দাঁড়ায়। হাত দুটো অকারণ ঝাড়ে। তারপর অকারণেই ডুমুরের উদ্দেশে বলে, কাজিদের ভিটের তলায় গুপ্তধন থাকতে পারে—তাই না?

চৌধুরির সাড়া আসে। ...ও ডুমুর, মামুন কী বলছে দেখ তো মা!

কিন্তু বাড়ি ভীষণ চুপচাপ। মামুন এদিকের দরজা আটকে দেয়।

সকালে মামুন কাজিদের ভিটেয় ঘুরে বেড়াচ্ছিল। গোরস্থানের একটা চেহারা ও চরিত্র থাকে। পোড়ো বাস্তুভিটেতেও তার খানিকটা আদল আছে। অনেকটা জায়গা জুড়ে ছড়ান ঢিবি এবং আগাছা। উঁচু গাছও অনেক। পাখ-পাখালি ও পোকামাকড় ঘুম-ঘুম গলায় ডাকাডাকি করছে। ঠিক কোন জায়গায় তাদের বাড়িটা ছিল খুঁজে পাচ্ছে না মামুন। সব একাকার হয়ে আছে। একটু পরে সে উঁচু গাছগুলোর দিকে তাকায়। বাড়ির উঠোনে পেয়ারা আর জামরুলগাছ ছিল। পেছনে গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ছিল একটা বিশাল কুলগাছ। কী মিষ্টি কুল ছিল তার! সেই কুলের আঁটি গলায় আটকে মামুনের এক খুড়তুতো বোন মারা পড়েছিল। মুরুব্বিরা এক-রা হয়ে গাছটার মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করেছিলেন! কিন্তু কাটবার লোক আর খুঁজে মেলে না। কাঠুরেপাড়ার লোকেরা প্রাণ গেলেও ফলের গাছে কোপ বসাবে

না। শেষে মুনিম কাজি নিজেই কুড়ুল বাগিয়ে কোপ বসাতে এলেন। তাঁরই মেয়ে বুলবুলের প্রাণ নিয়েছে হারামজাদি বুড়ি কুলগাছটা। কিন্তু কোথায় ছিলেন আরেক বুড়ি মনিরা খাতুন—কাজি পরিবারের আশ্রিতা মহিলা, মামুনের দাদুর বাবার বোন। বয়সের গাছপাথর নেই। পালা করে সব বাড়িতে তাঁকে পুষতে হত। তিনি নড়বড় করে হেঁটে এসে গাছের গুঁড়ি আঁকড়ে বলেছিলেন, আমার গলায় কোপ দাও বরং। এ গাছ আমার হাতে পোঁতা।

মনিরাকে সবাই বলত বড়মা। বড়মাকে টানাটানি করেও নড়ানো যায়নি। যখন মুনিম কাজি কুড়ুল ফেলে কাঁচি আর ছাঁট কাপড় নিয়ে তাঁর দর্জিখানায় চলে গেলেন। মৃত্যুশোক ভুলে অনেকে এই পাগলামি দেখে হেসে খুন হয়েছিল। শেষে কুলগাছটার তলায় মৌলবি ডেকে কোরানপাঠ এবং মিলাদ হল। গাছ থেকে শয়তানকে ভাগিয়ে দিতে মৌলবিসায়েব চেষ্টার কসুর করেন নি।

মামুন যখন বাড়ি থেকে শেষবার বেরিয়ে যায়, তখনও গাছটা ছিল। কোথায় গেল সে? বাস্তুভিটের ফাঁকে ফাঁকে বাঁশবন, আমবাগান করার চেষ্টা চোখে পড়ছে। একখানে কেউ ভিত খুঁড়ে রেখেছে বাড়ি করবে বলে। মামুন একটা ঢিবিতে দাঁড়িয়ে খোঁজে। সেইসময় ধুপধুপ শব্দ শোনে পেছনে। ঘুরে দেখে একটা আট-ন বছরের মেয়ে থমকে দাঁড়িয়ে তাকে দেখছে, বুড়ো আঙুল কামড়ানো। জংলা ছিটের ফ্রক পরনে। হাতে কাচের চুড়ি কয়েকটা। কানে দুল চিকচিক করছে। চুলে প্রজাপতি গড়নের সোনালি ফিতে। মামুন মিষ্টি হেসে বলে, কোথায় থাক তুমি?

মেয়েটি নার্ভাস ভঙ্গিতে বলে, আপনাকে মা ডাকছে।

মামুন অবাক হয়ে বলে, তোমার মা? কোথায়?

ওইখানে দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েটি আঙুল তুলে দেখায়।

একটু তফাতে ঘন বাঁশবনের ধারে কেউ দাঁড়িয়ে আছে। মাথায় ঘোমটা টানা। মামুন ঢিবি থেকে নেমে বলে, চল, যাচ্ছি।

কয়েকপা এগিয়ে একটা ডোবা। সবুজ দামে ঢাকা। জলটা তলায় ঠেকেছে। মধ্যিখানে বাঁশের খুঁটি আর কাঁটাগাছের ডালপালা পোঁতা আছে। মাছ আছে তাহলে। চোরের ভয়ে এই জলদুর্গ। পাড় দিয়ে এগিয়ে মামুন দেখে, ঘোমটাপরা মহিলা হাসছেন। মুখে রোদ পড়েছে। মুখটা জ্বলছে। বাচ্চা মেয়েটা দৌড়ে পাশ দিয়ে দাঁড়িয়ে মামুনের দিকে তাকিয়ে আছে।

এতক্ষণে মামুন চিনতে পারে। হাত কপালে ঠেকিয়ে বলে, দুলিভাবী! কেমন আছেন?

ভাল। দুলিভাবী বলেন। তখন থেকে দেখছি আর ভাবছি কে ওটা—জঙ্গলে কী করে বেড়াচ্ছে। তারপর চিনতে পারলাম। কবে এলে?

দিনতিনেক আগে। দিদারভাইয়ের খবর কী!

মুখে হঠাৎ ছায়া পড়ে দুলিভাবীর। আস্তে বলেন, আমাকে দেখে বুঝতে পারছ না কিছু? এস, বাড়ি এস।

মামুন চমকে উঠেছিল। সরু নকশাপাড় সাদা শাড়ি দেখে কিছু বোঝা কঠিন। কিন্তু হাতদুটোর দিকে এতক্ষণে তাকায়। কানের লতির দিকেও। সব ফাঁকা। দুলিভাবী ঘুরেছেন। তাঁর মেয়ে দৌড়ে বাঁশবনের ভেতর একচিলতে পথটা পেরিয়ে যাচ্ছে। মামুন পা বাড়িয়ে ডাকে, ভাবী! কী হয়েছিল দিদারভাইয়ের?

দুলিভাবী হাঁটতে হাঁটতে বলেন, মার্ডার।

খুন! মামুন প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে। শুকনো বাঁশপাতায় মচমচ শব্দ তুলে সঙ্গ নেয়। সারা বাঁশবন জুড়ে বাঁশপাতা ছড়িয়ে আছে। সাতভেয়ে পাখির ঝাঁক পাতা উল্টে খুঁজতে খুঁজতে ঝগড়া করছে। কোথায় একটা বাছুর মাকে ডাকল। সামনে মাটির দেওয়াল দেখা যায়। ফাটা, ভেঙে পড়া। পাঁচিলে কোঙাপাতা চাপান—কোথাও এক ফালি খড় পচে সাদা হয়ে গেছে। মেহেদিগাছ মাথা তুলেছে বাড়ির উঠোন থেকে। ঘরের চালটা টালির। একটা শালিখ বসে গা চুলকোচ্ছে।

দরজায় জীর্ণ বাঁশবাতার কপাট, তলার দিকে খানিকটা টিন। মেয়েটা দরজা টেনে মামুনের জন্যে অনেকটা ফাঁক করে ধরেছে। দুলিভাবী অকারণ বলেন, এস।

উঠোনে একঝাঁক মুর্গি চরে বেড়াচ্ছে। নিচু রান্নাঘরের একটা দিক পুরো খোলা—আটচালার মত। ডাইনে একটা ঘর। দাওয়ায় মাদুর পেতে একটা বছর দশ বয়েসের ছেলে মন দিয়ে লেখাপড়া করছিল। মুখ তুলে তাকিয়ে থাকে। মেয়েটা গিয়ে ধুপ করে সেখানে বসে একটা বই খোলে।

বারান্দার দেওয়ালে একটা বাঁধান ছবি ঝুলছে। ছবিটার দিকে তাকিয়ে থাকে মামুন। লেনিনের ছবি। অক্টোবর বিপ্লবের সময় বক্তৃতারত লেনিনের সেই বিখ্যাত ছবি।

দুলিভাবী বলেন, লেনিন! মঞ্জু! তোমরা ওঘরে গিয়ে পড়। মাদুর থাক। তক্তাপোশে বস গে।

দিদারুল ছেলের নাম লেনিন রেখেছিলেন। মামুনের মনে পড়ে, দুলিভাবীর কোলে এই ছেলেটিকে দেখতে পেত। কিন্তু মেয়ের নাম মঞ্জু কেন? লেনিন আর মঞ্জু বইখাতা নিয়ে পাশের ঘরে চলে যায়। ওদিকে ও পাড়ার একটা সদর রাস্তা আছে। ঠাসবুনোনি ঘরবাড়ি আছে। মামুন মাদুরে বসে বলে, আমাকে কেউ বলেনি। আশ্চর্য তো! ডুমুর অনেক খবর দিয়েছে, অথচ এমন একটা খবর।...

দুলিভাবী দরজার চৌকাঠে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছে। বলেন, তুমি ডুমুরদের বাড়িতে উঠেছ?

হ্যাঁ। কিন্তু দিদারভাইকে মার্ডার করল কারা, কী ব্যাপার?

দুলিভাবী একটু চুপ করে থাকার পর বলেন, সে অনেক কথা। স্কুল থেকে আসছিলেন। ম্যানেজিং কমিটির মেম্বার ছিলেন। মিটিং ছিল সেদিন। বেরুতে একটু মুখ-আঁধারি বেলা হয়েছিল। সাইকেলে চেপে আসছিলেন। বাগদিপাড়ার ওখানে একটা শিবমন্দির আছে—ওই যে ঠাকরানপুকুরের পাড়ে।

মামুন বলে, বুঝেছি। নির্জন জায়গা। তারপর?

ভোজালির কোপ মেরেছিল। ওই অবস্থায় দৌড়ে গিয়ে অনা বাগদির বাড়িতে ঢোকেন। সেখানে গিয়ে শেষ করে।

দুলিভাবীর নির্বিকার মুখের দিকে তাকিয়ে মামুন অবাক। বলে, তারপর?

তারপর আর কী? গভর্নমেন্ট থেকে টাকাকড়ি দিয়েছিল। প্রাইমারি স্কুলে আমাকে মাস্টারিও দিল। চলে যাচ্ছে একরকম। দুলিভাবী হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। বস, আসছি।

ঘরে ঢুকলে মামুন বলে, আমি কিছু খাব না ভাবী। শুনুন।

গরিবের ঘরে এসেছ। কী খেতে দেব ভাই। দুলিভাবী ভেতর থেকে বলেন। একটু চা-ফা অন্তত খাও।

বেরিয়ে আসেন চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে। বারান্দা থেকে নেমে উঠোন পেরিয়ে রান্নাশালে যান। মামুন বলে, কবেকার এ ঘটনা?

বছর তিনেক হল। শ্রাবণ মাস। বৃষ্টি পড়ছিল সারাদিন।

খুনীদের কী হল?

জজকোর্টে জেল হয়েছিল। বরকত মিয়ারা হাইকোর্টে খালাস করে এনেছেন।

বরকত মিয়া?

হ্যাঁ।

দিদারভাইদের পার্টি চুপ করে থাকল?

আজকাল কেউ চুপ করে থাকে না। খুনের নেশায় পাগল হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে লোকে। তোমার ভাইয়ের দলের লোকেরা দিনদুপুরে খুনীদের বাড়ি অ্যাটাক করেছিল। ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছিল। এখনও সে-মামলা চলছে। থাকগে ওসব কথা। তুমি কোথায় ছিলে এতদিন মামুন?

মামুন মিথ্যা কথা বলে। ...কলকাতা, দিল্লি, বোম্বে করে বেড়ালাম।

এমনি ঘুরে বেড়াতে না নিশ্চয়?

নাঃ। চাকরির কাজে।

কদিন থাকছ তো?

দেখি।

দুলিভাবী কেটলি চাপিয়ে উঠোনে এসে দাঁড়ান। বলেন, তোমাদের বাড়ি জায়গা-জমি তো সব বরকত মিয়া কিনেছেন। তোমার মা শুনেছি খুলনায় আছেন। যাবে দেখা করতে, না গিয়েছিলে?

গিয়েছিলাম। মা মারা গেছেন দুলিভাবী!

আহা! কবে? কী হয়েছিল?

মামুন চুপ করে থাকে। দিদারুলের কথা ভাবে। দিদারুল তার চেয়ে বেশ কয়েকবছরের বড় ছিলেন। ছাত্রহিসেবে খুব নাম ছিল। কিন্তু বড় একগুঁয়ে প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। মামুনের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তর্ক করতেন। স্কুলে ছেলেমেয়েদের মাথা খাচ্ছেন বলে ওঁকে তাড়ানোর খুব চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু ধোপে টেকেনি সে-চেষ্টা। শিক্ষক হিসেবে যেমন, তেমনি জনসাধারণের মধ্যেও ওঁর সুনাম ছিল সৎ এবং দরদী মানুষ বলে। ক্লাব, লাইব্রেরি, সমবায় সমিতি, পল্লিউন্নয়ন—এইসব রকমারি কাজে প্রাণ লড়ে দিয়েছিলেন। অথচ সাংসারিক অবস্থা তত কিছু ভাল ছিল না। জমিজমা বলতে শুধু এই বাড়িটা আর পেছনে একটুকরো সবজিক্ষেত। তাঁর বাবা মাথায় করে বেগুন বেচতে যেতেন হাটতলায়। ওই করে লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন ছোট ছেলেকে। বড় ছেলে কম বয়সেই সাপের কামড়ে মারা যায়। দুই মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন বর্ধমানের কোন গাঁয়ে। দিদারুল নিজের সততার মূল্য পেতেন ছোটবেলা থেকেই।

মামুনের মনে আছে দিদারুলের বিয়ের কথা। পয়সাওয়ালা লোকেরা তাঁকে মেয়ে দিতে সাধত। বরকতও নাকি ছোটমেয়ের জন্যে বলাকওয়া করেছিলেন। এম এ বি টি পাস জামাই পেতেন। গরিবের ছেলে তাতে কী হয়েছে? কিন্তু দিদারুল শেষপর্যন্ত এক গরিব দর্জি গফুরমিয়ার মেয়েকেই বিয়ে করেন। এটা নিশ্চয় তথাকথিত লাভম্যারেজ। দুলিকে পড়াত দিদারুল। তাঁর তাগিদেই দুলি নবাবগঞ্জ স্কুলে স্কুল ফাইনাল পাশ করেছিলেন। দুলির বাবা গফুরমিয়া দর্জির মৃত্যুর পর দর্জিখানায় পার্টিঅফিস খুলেছিলেন দিদারুল। কাল বাজারের দিকে গিয়ে মামুন সেই ঘরটা লক্ষ্য করেছে। পতাকা আর সাইনবোর্ড দেখেছে দিদারুলের দলের।

চা খেতে খেতে মামুন দুলিভাবীকে আড়চোখে দেখতে থাকে। চেহারায় আগের দেখা সেই গনগনে আঁচ নেই, চাঞ্চল্য নেই। কিন্তু ক্ষয়েরও তত ছাপ পড়েনি। মনে হচ্ছে, সামলে নিয়েছেন আঘাত। এমন অবস্থায় ভীষণ কান্নাকাটি করার কথা—অন্তত এতদিন পরে মামুনের সামনে। অথচ ডুমুরের সঙ্গে খুব একটা তফাত নেই।

মুসলিম বিধবারা বয়স্কা হলে হিন্দু বিধবাদের মতই। সেই সাদা থান, কিংবা চুলপাড় ধুতি পরনে, গায়ে সাদা ব্লাউজ। গয়নাটয়না পরেন না। তবে খাওয়াদাওয়াতে বাছবিচার থাকে না। বিশেষ কিছু মেনে চলারও নিয়ম নেই। দুলিভাবীর সাদা শাড়িটা দেখে বোঝা যায় না কিছু। কিন্তু হাত কান একেবারে খালি দেখে মামুনের খারাপ লাগে। সে ভাবে, বলবে নাকি—অন্তত একগাছা করে চুড়ি-টুড়ি পড়লে ক্ষতি কী?

দুলিভাবী বলেন, তুমি সময়মত চলে গিয়ে বড্ড বেঁচেছ মামুন।

কেন বলুন তো?

থাকলে তুমিও রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়তে। হয় খুন হতে, নয় তো খুন করতে। তুমি যা ছেলে ছিলে!

মামুন মাথা নাড়ে। কক্ষনো না।

দুলিভাবী একটু হেসে বলেন, বাইরে ছিলে। হাওয়া বোঝ না। তুমি না চাইলেও জড়াতে হত। তোমাকে জড়িয়ে ছাড়ত। আজকাল আর কারুর রেহাই নেই, মামুন।

মামুন বলে, আমার তা মনে হয় না। আজাইকে তো দেখলাম। সে...

কথা কেড়ে দুলিভাবী বলেন, আজাই? আর লোক পেলে না। আজাই বড়লোকের ছেলে। সব দলে চাঁদা দেয় বাপকে লুকিয়ে। না দিয়ে ওর উপায় নেই যে! সন্ধি দিয়াড়ির মেয়েকে ভাগিয়ে এনেছে শুনেছ নিশ্চয়?

মামুন মাথা দোলায়। বলে, ওকে তাহলে ব্ল্যাকমেল করে রাজনীতিওলারা?

ভেবে দেখ, আজাই যদি পয়সাওলা লোকের ছেলে না হত সব দলকে পয়সা দিতে পারত না। তখন ওকে টিকে থাকার জন্যে কোন একটা দলে ঢুকতেই হত। অন্তত সাপোর্টার হতেই হত।

মামুন হাসতে হাসতে বলে, ভয়াবহ অবস্থা তাহলে। আচ্ছা ভাবী আপনি নিশ্চয় দিদারভাইয়ের পার্টির সাপোর্টার।

অগত্যা।

অগত্যা বলছেন যখন, ধরেই নিচ্ছি আপনি রাজনীতি পছন্দ করেন না?

না করলেও রেহাই নেই। দুলিভাবী হঠাৎ গলা চেপে বলেন। দেয়ালের কান আছে, ভাই। এসব কথা থাক। তোমার কথা বল বিয়ে করেছ কোথায়?

পাগল? মামুন জোরে হেসে ওঠে। নিজেরই ভবিষ্যৎ নেই, তো কোন বিচারাকে সঙ্গে জোটাব। আচ্ছা, উঠি ভাবী। সে উঠে পড়ে। খিড়কির দরজার দিকে এগিয়ে যায়। কাজিদের ভিটেয় গিয়ে বসে থাকবে কিছুক্ষণ।

দুলিভাবী পেছনে এসে বলেন, যাবার আগে একবার এস মামুন। আসবে তো? অনেককাল আড্ডা হয়নি তোমার সঙ্গে।

আসব। বলে মামুন বেরিয়ে যায়। বাঁশবনের ভেতরে সেই সরু পথটায় হনহন করে হাঁটতে থাকে। শেষ দিকটায় পৌঁছে গতি কমায়। খেয়ালবশে একবার পেছন ফেরে। দেখতে পায় দুলিভাবী খিড়কির দরজায় বেরিয়েছেন। তার চলে আসা দেখতেই কি?

দৃষ্টির আড়ালে এসে একটা ঝাঁকড়া গেরোচনা গাছের তলায় দাঁড়ায় মামুন। গ্রামের মেয়েরা আজকাল আর আগের মত আবেগের পুতুল নয় হয়ত। দুলি বেগম কেমন সহজে স্বামীর হত্যাকাণ্ডের বিবরণ দিলেন। কিন্তু রাজনীতির কথাটা ভাবলে হাসি পায়। সুবিধাবাদ ছাড়া আবার কী? ডুমুরের বাবাও নাকি কোন দলে চাঁদা দেন। তাদের বড় সভা-টভা হলে চাল ডালেরও বখরা দেন সাধ্যমত। চাচা আপন প্রাণ বাঁচা। দশবছর আগে মামুন প্রচণ্ড আবেগ দিয়ে 'শ্রেণীসচেতনতা'র কথা ভাবত। সে-জিনিস কি আসলে এই সুবিধাবাদ? যে যে-ভাবে যতটা পার, আদায় করে নাও। দিদারুল নিজের প্রাণটার বদলে স্ত্রীকে কিছু টাকাকড়ি আর একটা মাস্টারি পাইয়ে দিয়েছেন।

মনে তেতো স্বাদ নিয়ে মামুন আবার হাঁটতে থাকে। দাদাপীরের মাজারের কাছাকাছি গিয়ে সে থমকে দাঁড়ায়। লুল্লু মিয়ার ঘরের পেছনে দাঁড়িয়ে উঁকি মারছেন সোনামিয়া। কেমন ধূর্ত হাবভাব। মামুন খুক করে কাশতেই চমকে ওঠেন। তারপর নড়বড় করে এগিয়ে আসেন। খটখটে মাটিতে ক্রাচের খটখট আওয়াজ ওঠে ঘোড়া ছুটে আসার মত।

মামুনের মুখোমুখি এসে একগাল হেসে বলেন, এই যে বাবা। খুব খুঁজে বেড়াচ্ছি তোমাকে।

সোনামিয়ার চেহারায় সামান্য পাঁচটা টাকা একটু চাকচিক্য এনেছে দেখে মামুনের ভালই লাগে। সে বলে, ওখানে কী করছিলেন চাচাজি?

সোনামিয়া কাঁচুমাচু মুখে বলেন, লুল্লু বলেছিল চা খাওয়াবে। এসে দেখি হারামি তালাকুলুপ এঁটে কোথায় বেরিয়েছে। ও মামুন, একটা কথা বলব?

বলুন না।

আমাকে দশটা টাকা দেবে? খোদা তোমাকে অনেক দেবেন বাবা। মোটে দশটা টাকা।

মুখের দিকে তাকিয়ে অবিশ্বাস্য লাগে মামুনের। সোনামিয়া তার কাছে টাকা চাইছেন। সে প্যান্টের পেছন পকেট থেকে পার্স বের করে একটা দশটাকার নোট সোনামিয়ার হাতে দেয়। টাকাটা পেয়েই একসেকেন্ড দাঁড়ান না। ঘোড়ার মত খটখট শব্দ করে হাঁটতে থাকেন।

মামুন সামনের দিকে এগিয়ে যায়। মল্লিকদের পোড়ো ইটভাটার ধার দিয়ে কাঠকুড়োনিদের চলাফেরার একচিলতে রাস্তায় আনমনে হাঁটতে হাঁটতে রেললাইনে ওঠে।

নদীর কাঁধে কাত হয়ে থাকে বলে এসব জমিকে বলে কাঁধা। অঘ্রাণে জল নেমে তলায় গেলে কাঁধায় শাকসবজি আর চৈতালির বীজ বোনে খামরুবুড়ো। মাঠের জমিজিরেত আগের পুরুষরা বেচে-খুচে খেয়ে গেছে। খামরুর জীবনে এই কাঠাপাঁচেক কাঁধা জমিই সম্বল। বার তিনেক বিয়ে করেছিল মোটমাট! কোন বউ একটাও কাচ্চাবাচ্চা দিতে পারেনি। শেষ বউকে অবশ্য তালাক দিতে হয়নি।

স্টেশনের এক খালাসির সঙ্গে ভেগে গিয়েছিল। লোকটা ছিল বিহারমুল্লুকের। টুপি মাথায় দিয়ে নামাজও পড়ত, গাঁজাও টানত। খামরুকে সেই গাঁজার নেশা ধরিয়ে তার বউকে ভাগিয়েছিল। সে বছর পঁচিশ আগের কথা।

তাতে বরং বেঁচেই গিয়েছিল। খুব পেট ছিল মেয়েটার। খেয়ে শেষ করে দিচ্ছিল। একা হওয়ার পর কিছুদিন খামরুর রাঁধাবাড়ার কষ্ট হত এই যা। পরে গাঁ ছেড়ে এসে নদীর ধারে উঁচু জায়গাটায় ঘর বেঁধেছিল। ঘর বলতে ছোট্ট একটা কুঁড়ে। একটুকরো উঠোন। উঠোনে একটা গাবগাছের চারা পুঁতেছিল। সেটা এখন ঝাঁকড়া হয়ে ছায়া দিচ্ছে। তার তলায় মাচা বানিয়েছে। আকাশের গতিক ভাল দেখলে সন্ধ্যাবেলা খাওয়াদাওয়া সেরে মাচায় বসে বেদম গাঁজা টানে এবং শুয়ে পড়ে। ওপরে কুঁড়ে ও উঠোন ঘিরে ঘন কাঁটাঝোপের যে বেড়া, তা নিচে তার পাঁচকাঠা কাঁধা জমি পর্যন্ত রেখেছে। এই এক স্বভাব তার। করার মত কাজ না থাকলে কাঁটাঝোপ কাটতে বেরয়। একটা লাঠির ডগায় ঝোপটা এনে বেড়ার ভাঙাচোরা জায়গাটাতে ঠেলে দেয়।

খামরুবুড়ো খরার সময় ফুটি, তরমুজ, ভুঁইশশা ফলায়। সেই লোভে নবাবগঞ্জ স্কুল থেকে ছেলেরা এসে জ্বালাতন করত। কতবার নালিশ করে এসেছে খামরু। জব্দ করা যেত না ওদের। আনাচে-কানাচে দেখলেই যাচ্ছেতাই গালমন্দ করত খামরু। চাঙড় ছুড়ে মারত। ওরা হিহি করে হাসত।

মামুন বাদে। জাকের কাজির এই ছেলেটা ছিল অন্যরকম। পয়সা দিয়ে তরমুজ কিনে খেত। চাচা বলে ডাকত। একবার খামরুর জন্যে একটা নতুন লুঙি কিনে এসেছিল। লুঙির গন্ধ শুঁকে খামরুল বলেছিল, যত খুশি ফলপাকড় খাও বাবা। এক পয়সা নেব না।

কত আর খাবে মামুন? খাওয়ার জন্যে সে খামরুর কাছে আসত না—আসত গল্প শুনতে। কত আজব গল্পই না শোনাত খামরু। গাঁ থেকে দূরে এই নির্জন নদীর ধারে একলা থাকে বলেই লোকটা যেন প্রাণ খুলে কথা বলতে একজন সঙ্গীর জন্য ছটফট করত। তার মন কাড়তে অসম্ভব সব গল্প শুনিয়ে ছাড়ত।

খামরু বুড়ো হাঁটু দুমড়ে বসে কুমড়ো ভাঙছে, সেইসময় কেউ তাকে চাচা বলে ডাকে। খামরু ঘুরে দেখে। তাকিয়ে থাকে। চোখের নজর তত চলে না। আবছা দাঁড়িয়ে আছে তাঁর কুঁড়েঘরের বেড়ার বাইরে একটা ঝকঝকে মানুষ। শার্ট-পেন্টুল পরা। ব্যাপারি হতেও পারে। ব্যাপারিরাও আজকাল ঝকঝকে বাবু হয়ে গেছে। উঠে এসে বলে, কে গো?

আমি চাচা। মামুন।

মামোন! তুমি মামোন! বুড়ো নড়ে ওঠে। থপথপ করে পা ফেলে এসে কাঁটার বেড়াটা খুলে দেয়। তাই বলি, ক্যানে পেরানটা ধড়াস করে উঠল ডাক শুনে? ও ছেলে, কোথায় ছিলে অ্যাদ্দিন? কতকাল চাঁদমুখখানা দেখিনি বাবা!

খামরু ভেবে পায় না কী করবে। কোথায় রাখবে ওকে। এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করে একটা তালপাতার চাটাই এনে গাবতলার মাচানে রাখে। বলে, বস বাবা। আরাম করে বস।

কুঁড়েঘরের ওপর ছায়া পড়েছে গাবগাছের। দাওয়ায় উনুন জ্বলছে। একটা বছর বারো বয়সের ফ্রকপরা মেয়ে উনুনে লড়কি গুঁজতে গুঁজতে বড়-বড় চোখে মামুনকে দেখছিল। মামুন বলে, ওটা কে চাচা?

খামরু হাসে। আমার বহিনের বেটি। কাছে এনে রেখেছি। বুড়ো হয়ে গেছি—মরণকালে মুখে আগুন তো দিতে পারবে।

সে ঘুপটি কুঁড়েঘরে ঢুকে একটা তরমুজ আর হেসো নিয়ে আসে। মাচানে রেখে বলে, আপন হাতে কেটে খাও বাবা। রোদ তেতেপুড়ে এলে। আহা, কতকাল পরে এলে।

মামুন চোখ নাচিয়ে বলে, গাঁজা-টানা ছেড়েছ, নাকি চালিয়ে যাচ্ছ চাচা?

লাজুক মুখে খামরু বুড়ো বলে, অব্যেস। ছাড়ছি বললে কী ছাড়া যায় বাবা? কই, দাও একটা সেক্রেট দাও। টানি।

মামুন সিগারেট দিলে সে আধখানা ভেঙে কানের ওপর দিকটায় গুঁজে রাখে। বাকিটা ঠোঁটে ধরে বলে, আর সে দিনক্ষণ নেই গো। সুখশান্তি নেইকো মোটে। এখানে এসে যে একটুকুন শান্তি পেয়েছিলাম। আজকাল আর তাও পাইনে। দুনিয়াটাতে আগুন লেগে গেছে। কেউ বাঁচবে না। ...

ডুমুরের বকুনি খাবার ভয়ে মামুন বাইরের ঘরে কড়া আস্তে নাড়ে। কিন্তু ডমুরের কী জন্তুর ইন্দ্রিয়। সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির ভেতর থেকে তার সাড়া আসে, খোলা আছে।

কপাট ঠেলে ভেতরে ঢোকে মামুন। উঠোনে ঝাঁটা বুলিয়ে বেড়াচ্ছে ডুমুর। কোমরে আঁচল জড়ান। ভেতরের দরজা খোলা বলে তাকে এ ঘর থেকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। দেখেই মামুন অবাক হয়েছে। ডুমুরের খোঁপায় একঝাঁক সাদা ফুল গোঁজা। উঠোনের মাঝামাঝি রোদ এসে গেছে। ফুলগুলো দেখে মনে হয়, ডুমুর চারদিক থেকে হাসছে।

কিন্তু তার চেয়েও চোখে পড়ার মত ওর দুপায়ে আলতার বেড়। তারপর একবার ঘুরে মামুনকে দেখে নিল। তখন মামুন দেখল, কপালে একটা মোটা লাল টিপ পরেছে ডুমুর।

বাইরের দরজা এঁটে মামুন দেখতে পায়, এ ঘরের টেবিলে একটা লম্বা কাচের জগে একগোছা রজনীগন্ধা। সে ব্যাপারটা বুঝতে পারে না। কাল সারাদিন সারাটা রাত নদীর ধারে খামরুবুড়োর সঙ্গে কাটিয়েছে। মাচানে শুয়ে ঘুম ও স্বপ্নের মাঝামাঝি ঘুরে হন্যে হয়েছে। নিচে অন্ধকারে শূন্য নদীর ছটফটানি শুনেছে। শেষ রাতে ভীষণ শীত করছিল। ফাঁকা জায়গায় এত হাওয়ার মধ্যে শোওয়া। অবশ্য মাথার ওপর গাবগাছটার ঘন ছাউনি ছিল। রাতে গাছ নাকি কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস ছাড়ে। হয়ত হাওয়া সব গ্যাস তাড়িয়ে দিচ্ছিল। তবু শরীর খুব ম্যাজম্যাজ করছে ভোরবেলা থেকে। হাত পা কাঁধ পিঠ বড্ড আড়ষ্ট লাগছে।

হঠাৎ মনে পড়ল, কাল সারারাত অন্ধকারে বারবার চুড়ির শব্দ শুনে চমকেছিল। গাঁজার নেশাটা বেশিক্ষণ ছিল না। তা নাহলে, ভাবত, খামরুবুড়োর গল্পের সেই পরী আনাগোনা করছে সারারাত। হুঁ, বুড়োর বোনঝির হাতে অনেক কাচের চুড়ি আছে। তবু কেন ওই মেয়েটার কথা মাথায় আসেনি তার। প্রতিবার চমকে উঠে ভাবছিল, ডুমুর নাকি? অন্ধকার রাতে নদীর ধারে এই তেপান্তরে মোজাই চৌধুরীর মেয়ে চুড়ির শব্দ করে তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল যেন। কী উদ্ভট ভাবনা।

এখন দেখছে ডুমুরের হাতে বাজনা বাজানোর মত চুড়ি নেই। দুটো সরু সোনার রুলি শুধু। তারপর মামুন আবিষ্কার করে, ডুমুর সাদা পাথর বসান নাকছাবি পরেছে আজ। সঙ্গে সঙ্গে সে ধরে নিল, ডুমুরের ফের বিয়ের কথা চলেছে এবং তাকে ওরা এটা জানাবার দরকার মনে করেনি। আজই হয়ত ডুমুরকে দেখতে আসবে পাত্রপক্ষ।

খুশি হয়ে মামুন ভেতরের বারান্দায় যায়। কুয়োতলা থেকে ডুমুর এদিকে না ঘুরেই বলে, আমরা তো ভাবছিলাম, রেললাইনের ধারে দিয়াড়িরা একটা লাস ফেলে এসেছে। কুড়িয়ে আনতে হবে।

মামুন হাসবার চেষ্টা করে বলে, আমার লাস দেখতে পেলে তোমার খুব আনন্দ হয় বুঝি?

ডুমুর সোজা হয়ে দাঁড়ায়। মুখটা বিকারহীন। বলে, তুমি আমাদের কে? আজকাল অনেকে তো স্বামীর লাস দেখেও দিব্যি সেজেগুজে হাসিমুখে ঘোরে। ছাত্র-ছাত্রীদের নামতা শেখাতে দুয়ে-দুয়ে পাঁচও করে না।

মামুন জোরে হাসে। তুমি নিশ্চয় দুলিভাবীর কথা বলছ?

মুখ ফিরিয়ে ঝাঁটাটা একটু তফাতে ছুঁড়ে ডুমুর কুয়োর ভেতর কলসি নামায়। সেই সময় বলে, দূর থেকে সুরেন তোমাকে দেখতে পেয়েছিল। না বললে আব্বা সারারাত ছুটোছুটি করে বেড়াতেন। অবশ্য তোমার দায়িত্বজ্ঞান বরাবর এমনি।

মামুন কাঁচুমাচু মুখে বলে, ভুল হয়ে গেছে। মাফ করে দাও।

গেঁজেলের সঙ্গে রাত কাটিয়েছ। খুব টেনেছ, না? চোখদুটো তো লাল করে ফেলেছ।

না, না। ওই একটু...মামুন থামে।

ডুমুর শরীর বাঁকা করে মুখ ডুবিয়েছে কুয়োর ভেতর। বালতিটা চাপা তোলপাড় করছে গভীরে দূরে। তারপর সে সোজা হয়ে বালতি তুলতে থাকে। বালতি পায়ের কাছে রেখে হাত দুটো ধুয়ে নেয়। রবারের স্লিপার খুলে রেখে আলতাপরা পাদুটোও ধোয়।

উঠোন পেরিয়ে এসে মামুনের চোখে চোখে রেখে একটু হাসে। বলে ব্যাপার কী?

কিসের?

লাইন লেগে গেছে যে নবাবগঞ্জের মিয়াপাড়ায়।

কিসের লাইন?

বারান্দায় উঠে ডুমুর একটুকরো ছেঁড়া কাপড়ে হাত-পা মুছতে-মুছতে বলে, বিকেলে এলেন শ্রীমতী দুলি বেগম, খুব সাজগোজ করে এসেছিলেন। বিশেষ আসেন-টাসেন না। তো—তাই অবাক হয়েছিলাম। একথা ওকথার পর বললেন, মামুন কোথায়? তখন বুঝলাম।

মামুন সিগারেট জ্বেলে ধোঁয়ার রিঙ বানায়। হাল্কা গলায় বলে, কাল সকালে দেখা হয়েছিল হঠাৎ।

হঠাৎ? ডুমুর চোখ নাচায়। ফের বলে, ভাল। তারপর সন্ধ্যায় এলেন শ্রীমতী দিয়াড়নি।

মামুন একটু চমকায়। বলে, লায়লা—মানে আজাইয়ের বউ?

জী হ্যাঁ বাদশা নামদার। ডুমুর খিলখিল করে হেসে ওঠে।

মামুন চাপা গলায় বলে, ব্যাপারটা কী?

আমিও তো জিজ্ঞেস করছি, ব্যাপারটা কী? ডুমুরের হাসিটা বেঁকে যায় ক্রমশ। ফের বলে, আজাই ছিল না বাড়িতে। ওদের বাড়ির লোকও টের পায়নি নিশ্চয়। নইলে এমন করে একা আসা ঘুচিয়ে দিত।

কী বলছিল?

ওর বলার কথা ছিল তোমাকেই। আমাকে বলবে কেন?

যাঃ। অসম্ভব।

সবই সম্ভব। বলে ডুমুর রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে যায়। সেখান থেকে ফের বলে, তুমি দেখছি ভীষণ জাদুকর হয়ে ফিরেছ। নবাবগঞ্জের বউঝিরা বাড়ি ছেড়ে এসে লাইন লাগিয়েছে। কিন্তু সাবধান, আজকাল হাওয়া অন্যরকম।

মামুন বিরক্ত হয়ে বলে, কী যা-তা বলছ?

চা খাবে তো? নাকি বাজার হয়ে নাশতা খেয়েই ঢুকেছ?

মামুন গম্ভীর হয়ে বলে, চা খামরুর কাছে খেয়েছি। মুড়ি আর চা।

তাহলে আমি একা খাই। কী বল?

ডুমুরের কথার ভঙ্গিতে তখনই মামুনের মুখে হাসি ফোটে। সে থামের পাশে ভাঙা চেয়ারটায় বসে বলে, ক্ষমাঘেন্না করে আমাকেও এক কাপ দিও। খামরুর চা মানে দুধের শরবত। ব্যাটা প্রাণের ভয়ে খালি দুধ খায়। বলে কি জান? এবয়স অব্দি টিকে আছে দুধের জোরে। নইলে গাঁজার বিষে কলজে পচে যেত।

তক্তাপোশের ওপর কেরোসিন কুকার জ্বেলে কেটলি চাপায় ডুমুর। তারপর উজ্জ্বল মিষ্টি মুখে তাকায় মামুনের দিকে। বলে, তোমার খাওয়া আর হল না মামুন। সামনে একে-একে অনেক লোক এসে দাঁড়াচ্ছে। রহিমুদ্দিন মাস্টারও এসেছিলেন তোমার খোঁজে। তখন বেশ রাত হয়েছে। আমরা খেতে বসেছিলাম। নেই শুনে চলে গেলেন, সকালে আসবেন। হ্যাঁ, ভুলে যাচ্ছি—আরেকজন এসেছিল। দেখেই তো আমরা থ।

কে সে?

গলাকাটা কালু।

মামুন তাকায়। আস্তে বলে, হ্যাঁ। ওর সঙ্গে দেখা হয়নি আসা অব্দি। বলে এসেছিলাম ওদের বাড়িতে।

একটা কথা বলব, শুনবে?

বল।

তুমি যদি চলেও যাও সত্যিসত্যি—তবু ওর সঙ্গে মিশো না।

মামুন জোরে মাথাটা দোলায়। বলে, না, না। মিশতে যাচ্ছে কে? অনেককাল পরে এলাম, তাই জাস্ট একবার খবর নেওয়া আর কী! কালু আজকাল নাকি ব্যবসা-ট্যাবসা করছে শুনেছি।

ডুমুর চাপা গলায় বলে, বর্ডারে স্মাগলিং করে বেড়ায়। ব্যবসা, না হাতি। তবে ওইসব করে পাকা ঘর তুলেছে। কবে দেখবে, আজাইয়ের মত মোটরসাইকেল হাঁকিয়ে বেড়াবে।

মামুন খিকখিক করে হাসে। বলে, তাহলে তো মন্দ হবে না। আমার একটা হিল্লে হয়ে যাবে। যাক গে, যে কথাটা এতক্ষণ বলতে পারছিনে, অভয় দাও তো বলি।

ঢঙ করার কিছু নেই। বল না কী বলবে?

তোমাকে আজ দারুণ দেখাচ্ছে।

তাই বুঝি?

তাছাড়া তুমি আজ ওঘরে রজনীগন্ধা রেখেছ...

কথা কেড়ে ডুমুর ঠোঁটের কোনায় হেসে বলে, বললে চলে যাচ্ছি। তাই ভাবলাম একটু বেশি খাতির করা যাক। তবে আসল কথাটা হল, রজনীগন্ধার ডাঁটিগুলো কাটার সময় হয়েছিল। খামোকা ঝরে যায়—অন্তত একবার কাজে লাগাতে ইচ্ছে করল। কাজিফ্যামিলির খাতির আর কী?

মামুন একটু ঝুঁকে চোখ নাচিয়ে বলে, নাকি আজ তোমাকে দেখতে আসছেন পাত্রপক্ষ?

ডুমুর ভুরু কুঁচকে বলে, পাত্রপক্ষ?

মানে, আমি অবশ্য জানি নে—মনে হচ্ছে বলে বলছি।

কী বলছ? তীব্র করে কথাটা ছোড়ে ডুমুর। ভুরু তেমনি কোঁচকানো।

মামুন বলে, না। জাস্ট কথার কথা। ভাবলাম, চাচাজি ফের তোমার বিয়ের যোগাড় করেছেন।

শ্বাসপ্রশ্বাস মিশিয়ে ডুমুর বলে, তোমার ঘরে ফুল দিয়েছি বলে তুমি তাই ভাবলে?

তুমি রাগ করছ, ডুমুর?

করছি।

ডুমুর মুখটা অন্যদিকে রাখে কিছুক্ষণ। সেই সময় মামুন তামাশার ভঙ্গিতে বলে, জান? এসে অব্দি তোমার এমন বিধবা-বিধবা চেহারা দেখে বড্ড খারাপ লাগত। ভাবতাম বলি, কেন নিজেকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য কর ডুমুর? কী ভাববে বলে কথাটা বলিনি। কিন্তু এই যে আজ অন্তত একটুখানি সেজেছ...

ডুমুর ঝাঁঝাল স্বরে বলে, না। সাজিনি!

আমি অনেক নাকছাবি পরা মেয়ে দেখেছি। তাদের মানায় না। নাকছাবিতে নাকটা বেজায় বিশ্রী করে ফেলে। মামুন সেইরকম রসিকতার ভঙ্গিতেই বলতে থাকে। আর কপালে ওই সুন্দর টিপটা! সত্যি বলছি ডুমুর। বাড়ি ঢুকে তোমাকে দেখামাত্র আমার মুণ্ডু ঘুরে গেছে। এতকাল পরে হয়ত ভীষণ ভাবে—প্রচণ্ডভাবে তোমার প্রেমে পড়ে গেছি।

ডুমুর আচমকা হাতের কাছে দেশলাই বাক্সটা তুলে জোরে ওর মুখে ছুঁড়ে মারে। তারপর ছুটে গিয়ে ঘরে ঢোকে। মামুন মুখ সরিয়ে নিয়েছিল। গলার কাছে দেশলাই বাক্সটা লেগে কাঠিগুলো ছড়িয়ে পড়েছে। সে একটা-একটা করে কাঠি কুড়িয়ে বাক্সে ঢোকায়।

ডুমুর ঘর থেকে বেরোয় না। কেটলির নল দিয়ে ভাপ বেরুতে থাকে। কুকারের নীল আগুন দপ্‌দপ্‌ শব্দ করে। নিঃঝুম বাড়ির চারিদিকে কী এক আলোড়ন চলতে থাকে পাখপাখালি আর ঝিঁঝি পোকার ডাকে। কোথায় গাইগরুর হাম্বা ডাক এবং বাছুরের গলায় ঘণ্টার ঠুংঠাং শব্দ হয়। ফেরিওয়ালা ডাকতে ডাকতে বাড়ির বাইরের রাস্তা পেরিয়ে যায়। ডুমুর আসে না।

তখন মামুন তার ঘরের দরজায় যায়। দরজায় পর্দা আছে। পর্দার ফাঁকে দেখতে পায়, ডুমুর জানলার কাছে ঘুরে তার বাগানের দিকে তাকিয়ে আছে। মামুন আস্তে ডাকে, ডুমুর।

ডুমুর জবাব দেয় না। মামুন একটু সাহস করে ঘরে ঢুকে বলে, ডুমুর। মাফ কর ভাই। তোকে কত ঠাট্টাতামাশা করেছি সারাজীবন। এ তো নতুন নয়। আসলে আমি এত ভেবে কিছু বলি নি।

ডুমুর তবু চুপ করে থাকে।

মামুন বলে, তোর কি মনে আছে ডুমুর? মল্লিকদের ইটখোলার কাছে কলকেফুলের জঙ্গলে দুজনে সিগারেট খেতে ঢুকেছিলাম। হঠাৎ তোকে বললাম, আমাকে বিয়ে করবি। তুই আমাকে লাথি মেরে পালিয়ে এসেছিলি। তারপর কতদিন আর কথা বলিস নি। পরে, যখন ভাব হল, বললি, আমার নাকি খারাপ মতলব জেগেছিল। আমি রাগে দুঃখে কেঁদে ফেলেছিলাম। মনে পড়ছে? ডুমুর, তোর সঙ্গে আমার বারবার এই সম্পর্ক। মনে করে দেখ, আমি তোকে কতবার বলতাম—আমরা বন্ধু। তুই বলতিস—না, ভাইবোন। আমি বলতাম কক্ষনও না। তাহলে তোকে ঠাট্টা করা যাবে না। আমরা বন্ধু। তখন, দাদাপীরের মাজারের ওখানে—মনে পড়ছে তো? তুই আমার কথা মেনে নিয়ে বললি—বেশ! আমরা বন্ধু। তাহলে ভেবে দেখ ডুমুর, তোকে আজও বন্ধুর চোখে দেখি বলেই ঠাট্টাইয়ারকি করতে পারি।

ডুমুর নিঃশ্বাসের মধ্যে বলে, ঠাট্টাইয়ারকি আমার ভাল লাগে না।

ডুমুর! তুই কেঁদে ফেলেছিস?

ডুমুর ভাঙা গলায় বলে, কেন তুমি অমন তুচ্ছতাচ্ছিল্য করবে আমাকে? আমি তো মানুষ, না গাছপাথর। এতকাল পরে এসে ফের সেই ঠাট্টাইয়ারকি আর তুচ্ছতাচ্ছিল্য। না হয় আমি দুলির মত, দিয়াড়নির মত রূপসী নই! প্রস সেজে থাকিনে। তাই বলে তুমি আমাকে মানুষ বলে ভাববে না?

মামুন বিব্রত মুখে বলে, আঃ! কী হচ্ছে ডুমুর? আয়, চায়ের পানি ফুটছে। চা খেয়ে ঘুমব। রাতে একটুও ঘুম হয়নি। শরীরটা বড় ম্যাজম্যাজ করছে। কেউ এলে বলবি, বেরিয়েছে কোথায়।

হাত বাড়িয়ে ডুমুরের কাঁধ ছোঁয় সে। ডুমুর হাতটা সরিয়ে দেয়। মামুন দেখতে পায়, নাকছাবিটা খুলে ফেলেছে। কপালের টিপটা রগড়ে মুছেছে ডুমুর।

মামুন বলে, তোকে আমার চড় মারতে ইচ্ছে করছে। জানিস?

বলে সে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। বারান্দা পেরিয়ে বাইরের ঘরে গিয়ে ঢোকে। সটান শুয়ে পড়ে। ফের সিগারেট টানতে থাকে।

চোখ বুজে ব্যাপারটা ভাবতে থাকে সে। প্রেমে পড়ার কথাটা বলা উচিত হয়নি। বয়স হয়েছে ডুমুরের। সব কিছু বুঝতে শিখেছে। পুরুষ ও মেয়ের প্রকৃত সম্পর্ক জেনে গেছে কবে। কথাটা সত্যি উচিত হয়নি বলা। ছোটবেলায় না জেনে না বুঝে অনেক কিছু বলা যায়। তখন বিয়ে, প্রেম, এসব শব্দ নিছক শব্দ। এদের আড়ালে মানুষের হাজার হাজার বছরের ভাবনাচিন্তা সংস্কার অভিজ্ঞতা দাঁড়িয়ে আছে। একেকটি শব্দ একেকটি আলো-আঁধারি বিশাল গুহার দরজার মত। জন্মের পর এই দরজা ঠেলে ঢুকে ক্রমে ক্রমে অনেক জানা হয়ে যায়, অনেক জানা হয় না—চুল পেকে যায়। আয়ু শেষ হয়। মানুষের ভাষাই আসলে মানুষের সব রহস্য, সত্য ও মিথ্যা, প্রকাশ্য ও গোপন যা কিছু—সব লুকিয়ে রেখেছে নিজের মধ্যে। ভাষা ব্যবহারে সতর্ক হওয়া উচিত। খুব ভুল হয়ে গেছে।

চা।

চোখ খোলে মামুন। ডুমুর চায়ের কাপ-প্লেট বিছানায় রেখে চলে যাচ্ছে। মামুন বলে, ডুমুর, শোন। শুনে যা না বাবা!

কী?

তুই যদি নাকছাবিটা ফের না পরিস এবং টিপটাও—আমি চা খাব না। এবং শুধু তাই নয়, এক্ষুনি সব গুছিয়ে নিয়ে চলে যাব।

ডুমুর ঘরে দাঁড়ায়। তার চোখে চোখ রেখে বলে তুই কি আমার সাতপাকের বর, না কলমাপড়া খসম যে তোকে আটকাতে পারব? গেলে যাবি।

মামুন হাসতে হাসতে ওঠে। হাত বাড়িয়ে বলে, সাবাস! হাতে হাত দে।

ডুমুরের হাতটা জোর করে সে নাড়া দেয়। ডুমুর বলে, আঃ! লাগছে যে!

ডুমুর, তোদের ঘরে লুডো নেই? আয় না, আগের মত লুডো খেলি।

আমার সময় নেই। এখন অনেক কাজ।

ধুস! কাজফাজ এবেলা রাখ। আমার কিছু ভাল লাগছে না! একটু খেলি আয়।

দুলিবেগমের বাড়ি চলে যা। পথ তাকিয়ে আছে।

মামুন কাঁচুমাচু হয়ে বলে, এই! যাঃ! ও কী বলছিস! দুলিকে গুরুজন বলে মান্য করি। বয়স কোন কথা না!

ডুমুর কিল দেখিয়ে বলে, কিন্তু সাবধান। দিয়াড়নির পাল্লায় পড় না। আজাইয়ের পিস্তল আছে শুনেছি।

মামুন চায়ে চুমুক দিয়ে বলে, দারুণ! যা—লুড়ো নিয়ে আয়। আর শোন, নাকছাবি এবং টিপ।

ডুমুর বলে, না।

না? কিন্তু পায়ে যে আলতা পরেছিস, তার বেলা? মামুন ঝুঁকে তার পা দুটো দেখতে থাকে। ডুমুর অন্তত একটা পা আমায় দে, বুকে রাখি।

ডুমুর ঘোরে। যেতে যেতে আস্তে বলে, দিতাম। যদি সত্যি করে চাইতিস।

মামুন চুপ করে থাকে। আনমনে চায়ে চুমুক দেয়। চা শেষ করে সে দরজায় গিয়ে ডুমুরকে খোঁজে। দেখে, কুয়োতলায় বসে ডুমুর প্রচণ্ডভাবে একটুকরো ঝামা ইট আর সাবান ঘষছে পায়ে। পাশে জলের বালতি। ওর মুখটা বিকৃত। মামুন সরে আসে। বিছানায় ফের চিত হয়ে শোয়। চোখ বুজে ফের সিগারেট টানতে থাকে।...

বিকেলে বাজারে দেখা হয়ে গেল রহিমুদ্দিনের সঙ্গে। মামুন এড়িয়ে যাবে ভেবেছিল। পারল না। সামনে সাইকেলের ব্রেক কষে দাঁড়িয়েছেন। বললেন, সকালে যাব বলেছিলাম। পঞ্চায়েতের যা ঝামেলা চলছে হে! মাথা খারাপ হবার দাখিল। যাক গে, শোন। এসেছ, সে-খবর অনেক আগেই পেয়েছি। আমাকে দেখা করতে যাবে না, সেও জানি। তবে মাথা থেকে অ্যাডভেঞ্চারিজমের ভূতটা গেছে জেনে আশ্বস্ত হয়েছি। এস, মধুবাবুর ডিসপেন্সারিতে বসে কাজের কথাটা সেরে ফেলি।

রাস্তার দুধারে দোকানপাট। ভিড়ও কম নয়। আজ হাটবার ছিল এখানে। হাটতলার দিকটায় এখনও পসারিরা অনেকে পাত্তাড়ি গুটোচ্ছে। একটা বাস দাঁড়িয়ে ছাদে মাল ওঠাচ্ছে। সামনে মধুবাবুর ডিসপেন্সারি। কম্পাউন্ডার জিতেন বারান্দায় বসে তালপাতার পাখা নাড়ছে। লোডশেডিং।

জিতেন বলে, রহিমদা! দুপুরে হাটতলায় বোমাবাজি করে গেছে। শোনেননি?

শুনেছি। রহিমুদ্দিন একগাল হেসে বলেন। নিজেদের কবর নিজেরাই খুঁড়ছে। আমরা এসবের মধ্যে আপাতত নেই বাবা জিতু। কিন্তু একথাও ঠিক, আমাদের গায়ে হাত পড়লে আমরা ছেড়ে কথা কইব না। এস মামুন, ভেতরেই বসি। গরম লাগে তো কী আর করা!

জিতেন মামুনকে দেখছিল। চিনতে পেরে বলে, আল-মামুন যে? আর চেনার উপায় নেই। একেবারে লায়েক হয়ে গেছ দেখছি। কোথায় থাক আজকাল?

মামুন জবাব দেয়, কলকাতায়।

ভেতরে বসে চাপাগলায় রহিমুদ্দিন বলেন, চৌধুরিসায়েব গিয়েছিলেন। সব বলেছেন। এখন কথা হচ্ছে, শুধু তোমার একখানা রিটন পিটিশন চাই। আমাকেই অ্যাড্রেস করে লিখবে—মানে পঞ্চায়েত প্রধানকে। লিখবে, তোমার অনুপস্থিতিতে তোমার পৈতৃক জমিজমা ও বাস্তুভিটা সব দখল করে নিয়েছে। আর...

মামুন দ্রুত বলে, না, না। মা বিক্রি করে গিয়েছিলেন।

রহিমুদ্দিন মুচকি হেসে বলেন, জানি রে বাবা, সব জানি। কিন্তু তোমার অংশ তো তোমার মা বেচতে পারেন না। বেচলে তা ইললিগ্যাল। কারণ তখন তুমি অলরেডি সাবালক। অতএব তোমার প্রাপ্য অংশ পঞ্চায়েত তোমাকে ফেরত দেবার ব্যবস্থা করবে। কাল সকালের মধ্যে পিটিশান সাবমিট কর। পরদিনই অ্যাকশন নেব আমরা। প্রথমে বাস্তুভিটের অংশটা জরিপ করে বের করে ফেলব। দখল নেব। তারপর তোমাকে হাউসিং লোনের দরখাস্ত করতে হবে। বুঝেছ?

মামুন তাকিয়ে থাকে।

আরে বাবা! এত ভয় পাবার কিছু নেই। তুমি তো লিগ্যালি ক্লেম করছ নিজের সম্পত্তি। আগের যুগ হলে একা লড়তে হত। এখন লড়তে তুমি জনগণকে পাশে পাচ্ছ!

মামুন মুখ নামিয়ে বলে, ঝামেলায় কী লাভ? আমি তো এখানে থাকতে আসিনি!

রহিমুদ্দিন অবাক হয়ে চশমা খোলেন। ধুতির কোঁচায় মুছতে মুছতে বলেন, তোমার এ-কথাটা যেমন ইললজিক্যাল, তেমনি ইমমর‍্যাল। কারণ, ভেবে দেখ—দশ বছর আগে তোমাদের ওই জমিতে যে লোকটা বর্গাদার ছিল, জমি কিনে তাকে উচ্ছেদ করেছে জোতদার। এখন বেচারা হয়ে পড়েছে ক্ষেতমজুর। কেমন তো? দ্বিতীয়ত, জমি সে পাওয়া দূরের কথা, অন্য কোন প্রকৃত চাষী বা গরিব মানুষ পেলেও কথা ছিল। পায়নি। পেয়েছে একজন জোতদার। যার কিনা অনেক জমি। তুমি তো এক সময় কমিউনিস্ট ছিলে হে! অ্যাঃ! প্রচণ্ড বিপ্লবীও ছিলে! তোমার বিপ্লবী বিবেক কী বলছে?

অগত্যা মামুন হাসে। বলছে, ব্যক্তিগত সম্পত্তি পাপ।

রহিমুদ্দিন বিরক্ত হয়ে বলেন, দেখ মামুন—আমাকে মার্কসবাদ বোঝাতে এস না। যে বাক্যটা আওড়াচ্ছ, ওটা একটা নিশ্চয় মৌলিক বিপ্লবী তত্ত্ব। কিন্তু তার ব্যাখ্যাটা কী? পরিপ্রেক্ষিতেই বা কী? এই যে তোমার পরনের পোশাক—এও তো ব্যক্তিগত সম্পত্তি। খুলে ফেলতে পারবে? কোন শব্দ বা বাক্য ব্যবহার করার আগে তার সম্পর্কে ধারণাটা আগে স্পষ্ট থাকা উচিত। ধারণার অস্পষ্টতার জন্যে অ্যাডভেঞ্চারিজম আসে। এক সময় তোমরা ঠিক এই ভুলটাই করেছিলে। মেকানিকাল ইন্টারপ্রিটিশন অফ মার্কসিজম। শ্রেণীদ্বন্দ্ব, শ্রেণীচরিত্র এসব বুঝতে হয়। বুঝেসুঝে দ্বন্দ্বর নিয়ম জেনে তাকে বিপ্লবের কাজে লাগাতে হয়।

মামুন উঠে দাঁড়ায়। ...আমাকে একটু ভাবতে দিন।

মনে মনে রেগে রহিমুদ্দিন বলেন, বেশ। ভাব। ভেবে দেখ।

হঠাৎ সোনামিয়ার কথাটা মনে পড়ে যায় মামুনের। বলে, বরং সোনাচাচাজির একটা ব্যবস্থা করে দিন না! উনি তো নিরাশ্রয় হয়ে গেছেন। ভিক্ষে করে বেড়াচ্ছেন।

রহিমুদ্দিনও ওঠেন। কড়া মুখে বলেন, কবে হয়ে যেত ব্যবস্থা। কিন্তু মিয়াসায়েব যে চরগিরি করে বেড়ান খবর রাখ? পঞ্চায়েত অফিসে বা যেখানে যা কথাবার্তা আমরা বলেছি, সব নিয়ে গিয়ে বরকতের কানে তুললেন। অন্য কেউ হলে অ্যাদ্দিন কঠিন অবস্থা হত। খোঁড়া-টোঁড়া মানুষ বলে পার পেয়ে গেছেন। তুমি জান? ওনাকে আমি মাসে-মাসে সাহায্য করতাম পঞ্চায়েত ফান্ড থেকে? সে-টাকায় মিয়াসাহেব ফের পায়রা কেনা শুরু করেছিলেন। তখন বন্ধ করে দিলাম। পায়রাগুলো কার বাড়ি রেখেছিলেন। সে নাকি জবাই করে খেয়ে ফেলল। নালিশ করতে এসেছিলেন। পায়রা-ফায়রা নিয়ে নালিশ শোনার সময় আমার নেই।

বলেই ঝটপট বেরিয়ে গেলেন রহিমুদ্দিন। সাইকেলে চেপে চলে গেলেন। মামুন অন্যমনস্কভাবে হাঁটতে থাকে।

বিকেলের সূর্য কাত হয়ে রোদের তলানিটুকু ঢেলে দিচ্ছে। সেই কালচে রোদে এদিকটা বড় অস্পষ্ট আর অচেনা লাগে তার। নবাবগঞ্জের যে ম্যাপ তার মনে আছে, তাতে এগুলো নতুন। অম্বিকা টকিজ, সালেহা হার্ডওয়ার্স, বেগম ভাণ্ডার কিংবা জয়তারা স্টোর্স, অথবা ওই পেট্রল পাম্প। শহরের আদল পড়েছে। এবেলা ভিড়টা বাড়ছে। গাঁগেরাম থেকে আমোদগেঁড়েরা এসে জুটছে রাস্তায়, চায়ের দোকানে, অম্বিকা টকিজের চত্বরে। আর সাইকেলরিকশ, ট্রাক, টেম্পো, মোটরসাইকেলের সঙ্গে গরুমোষের গাড়ির গুঁতোগুতি।

বুকের ভেতর পাথরের মত একটা কষ্ট চেপে বসছে। নবাবগঞ্জ তার পর হয়ে গেছে একেবারে। এখন সে এক আগন্তুক এখানে। কেউ তাকে চিনতে পারছে না যেন। মুখের দিকে তাকিয়ে যায় কেউ। কেউ একটু হেসে বলে, ভাল তো? কেউ বলে যায়, কোথায় থাকা হয় আজকাল? বন্ধুবান্ধব যারা ছিল, তাদের অনেকেই কে কোথায় চলে গেছে। দু-চার জন যারা আছে—যেমন আজাই, কালু, হোটেলওয়ালার ছেলে নুরু, তারা নিজের জায়গায় আঁটো হয়ে বসে গেছে। শুধু মামুন ভেসে বেড়াচ্ছে।

কালুর বাড়ির সামনে এসে মামুন থমকে দাঁড়ায়। কালু সকালে যাবে বলেছিল নাকি। যায়নি। ডুমুর ওর সঙ্গে মিশতে বারণ করেছে। হয়ত ঠিকই করেছে। কালু তত ভাল ছেলে ছিল না কোনদিন। তবে ওর গলাকাটা পদবিটা খুব কম বয়সের। রেললাইনের ওপারে আখের জমিতে শেয়াল খেদানোর সে এক মজার খেলা ছিল। গর্ত থেকে শেয়ালের বাচ্চা বের করে কালু তাদের গলা কাটত। সেই থেকে গলাকাটা কালু হয়ে যায় সে। যতদূর মনে পড়ে স্কুলের অংকের স্যার প্রথম তাকে গলাকাটা বলে ডাকতে শুরু করেন। কবে নিশ্চয় দূর থেকে ব্যাপারটা দেখেছিলেন। কিন্তু কালু এতে রাগ করত না।

ভাবতে অবাক লাগে, কালু ছিল দিদারুলের রিক্রুট। পরে মামুনদের সঙ্গে জুটেছিল কিছুদিন। পুলিশের বেদম মার খেয়ে রাজনীতি ভুলে গিয়েছিল। কিন্তু পার্টিসেলের কোন গোপন কথা ফাঁস করেনি। ওর মনের জোর অসাধারণ। নবাবগঞ্জ সেল ছত্রভঙ্গ হওয়ার পর কালু কীভাবে জীবন কাটিয়েছে, মামুন জানে না। ডুমুর বলছিল, আজকাল নাকি বর্ডারে স্মাগলিং করে। ডুমুর অবশ্য সবতাতেই খানিকটা বাড়িয়ে বলে।

কেউ আচমকা চেঁচিয়ে ওঠে, মামদো! ওরে শালা মামদো!

উঁচু বারান্দা থেকে কেউ লাফিয়ে পড়ে। মামুন তাকায়। কালো ছিপছিপে গড়ন, মুখে দাড়িগোঁফ, চোখে সরু স্টিল ফ্রেমের চশমা, গেঞ্জি-প্যান্ট পরা কালুকে সে চিনতেই পারে না। শুধু গলার স্বরে ঢাকের আওয়াজটা মনে পড়িয়ে দেয়, এই সেই গলাকাটা কেলো। ফুটবল খেলতে গিয়ে মাথা ফাটাতে ওস্তাদ ছিল। ভিড়ের গণ্ডগোল ছাপিয়ে তার গলা শোনা যেত।

মামুনকে টানতে টানতে ঘরে ঢোকায় সে। ঘরটা সোফাসেটে সাজান। কিন্তু আজাইয়ের মত দামি কিছু নয়—নেহাত সস্তা আসবাবপত্র। মামুনকে ধরে সে অভ্যাসমত হ্যা হ্যা হ্যা হ্যা করে বিকট হাসে কিছুক্ষণ। তারপর বলে, মামদো, তোকে চেনাই যাচ্ছে না মাইরি?

তোকেও। মামুন আস্তে আস্তে বলে। দাড়ি রেখেছিস কেন?

বেশ করেছি। বলে কালু ফ্যানের দিকে করুণ মুখে তাকায়। ফের বলে, মাইরি সেই সকাল থেকে কারেন্ট বন্ধ। কী করি বল তো। দাঁড়া, হাতপাখা আনি।

মামুন বলে, থাক।

কালু ভেতরে চলে যায়। মামুন সোফায় বসে। ঘরের ভেতরটায় চোখ বুলিয়ে বুঝতে পারে, কষ্টেসৃষ্টে এই একতলা বাড়িটা করেছে কালু। ছেলেবেলায় বাবা-মা মরে বিধবা পিসির হাতে মানুষ হয়েছে। টেনেটুনে স্কুলফাইনাল অব্দি গিয়েছিল। ফেল করে পড়াশুনো ছেড়েছিল। ওর পিসি কি বেঁচে আছেন? ভদ্রমহিলার বড্ড ছোঁয়াছুয়ির বাতিক ছিল। রাস্তায় ময়লা ডিঙিয়ে যেভাবে হাঁটতেন, মনে হত আস্ত পাগল। ছেলেরা দুষ্টুমি করতে রাস্তায় নোংরা ছড়িয়ে রাখত। অশ্লীল গাল দিতেন। কালুও দুষ্টুমি কম করত না। মামুন মুসলমানের ছেলে, একথা পিসিকে জানাতে অনেক দেরি করেছিল কালু। পিসি যখন টের পেলেন, তখন সে এক কাণ্ড। কালু খালি হ্যা হ্যা হ্যা হ্যা করে হাসত।

পাখা এনে কালু মামুনের মাথার ওপর নাড়তে শুরু করে। সেই সঙ্গে ওর হ্যা হ্যা হাসি। মামুন পাখাটা কেড়ে নিয়ে বলে, কাল গিয়েছিলি শুনলাম।

তোর গলা কাটতে গিয়েছিলাম শালা মামদো! কালু চোখ কটমটিয়ে বলে। এত লুকোছাপা কেন রে? কবে কী হয়ে গেছে, তাই নিয়ে দারোগাবাবুদের বুঝি ঘুম নেই চোখে? নতুন-নতুন ট্রাবল এসে সব তলিয়ে দিয়েছে। ঘাবড়াস নে। এখন দুবেলা রুলিং পার্টি ভার্সেস অপজিসন মাথা ফাটাফাটি। হিমসিম অবস্থা।

তারপর গলা চেপে বলে, ওপারে ছিলিস নাকি?

জোরে মাথা নেড়ে মামুন বলে, নাঃ। কলকাতায়। চাকরি-বাকরি করছি। ছুটি নিয়ে...

কথা কেড়ে কালু বলে, কী চাকরি? কত মাইনে পাস?

মামুন হাসে। বলে, সামান্য।

কত মাইনে পাস?

কেন?

কালু গম্ভীর মুখে বলে, চাকরি ছেড়ে দে। আয়, দুই বাঞ্চোত মিলে বিজনেস করি। আমার একজন কম্প্যানিয়ন বড্ড দরকার। একা সামলাতে পারছি না। খুব লোকসান যাচ্ছে। অথচ বিশ্বাসী বুদ্ধিমান লোক কাউকে পাচ্ছি না। আজকাল সব শালা জোচ্চর।

মামুন দুম করে বলে ফেলে, স্মাগলিংয়ের বিজনেস নাকি রে?

কালু ভুরু কুঁচকে বলে, হুঁ! এই তো শালা নবাবগঞ্জের লোক। এসেই তোর কানে ঢুকেছে দেখছি। আমার ইয়ে। বুড়ো আঙুল দেখিয়ে সে ফের বলে, আমার মাথা কাটতে বলিস শালাদের।

মামুন বলে, ব্যাপারটা কী?

বস। বুঝিয়ে বলছি। চা-ফা খা।

না। এই গরমে কিছু ভাল লাগে না।

কালু হঠাৎ সেই হ্যা হ্যা হাসিটা হাসতে থাকে। তারপর বলে, বিয়ে করেছিস মামদো?

না।

আমি করেছি মাইরি! করতাম না, হয়ে গেল।

কই, আলাপ করিয়ে দে!

কালু দাড়িতে হাত বুলিয়ে বলে, এখন ডিউটিতে গেছে। হাসপাতালে নার্সের চাকরি করে।

লাভ ম্যারেজ বল।

ওই রকমই। গোড়া থেকে বলি শোন।

কালু তার প্রেমের গপ্প শুরু করে। গপ্পের মাঝামাঝি মামুন সভয়ে দেখে দরজার পর্দা তুলে মুখ বাড়িয়েছেন সেই পিসিমা। ফোকলা মুখে বলেন, চা করেছি কালো।

কালু উঠে গিয়ে চা নিয়ে আসে। গপ্পের বাকিটা শোনাতে থাকে। ওর পিসি ঘরে ঢোকেন না দেখে মামুন আশ্বস্ত হয়। হাসপাতালের নার্স অনিমা কীভাবে তার প্রেমে পড়ল, বিয়েতে কতগুলো বাধা এল—আদ্যোপান্ত শুনিয়ে ছাড়ে কালু। তারপর আজাইয়ের কথা ওঠে। কালুর মতে, আজাই ভুল করেছে। নিমলিটা বরাবর ব্যাড ক্যারেক্টার মেয়ে। ছেনালটাইপ। স্টেশনের বুড়োবাবুর কাছে কম বয়সেই হাতেখড়ি হয়েছিল। পরে এক ছোটবাবুর সঙ্গে অনেককাল চালিয়ে যায়। শুধু কি এই? কুলবেড়েতে এক ছোকরার সঙ্গেও কারবার ছিল বহুদিন। শেষে আজাই। আজাই কবে খুন হয়ে যাবে দেখবি। লখনা দিয়াড়ি মহা মস্তান। ওয়াগন-ব্রেকিং, রেল ডাকাতি এই সব লাইনের ছেলে। রেলের আপ-ডাউনে সব জায়গায় তার গ্যাংয়ের লোক! ওকে এক জায়গায় গিয়ে খুঁজে পাবে না কেউ। বেশিক্ষণ থাকেই না একখানে।

তারপর কালু বলে, আমার কথাটা শোন। কী শালা পরের কলম চালিয়ে খাচ্ছিস? এখানে চলে আয়। আমি তোকে রাজা করে দেব। মাকালীর দিব্যি, মাসে যদি আড়াই থেকে তিন হাজার না রোজগার হয়, আমার কান মুলে দিস। প্ল্যানটা বলি শোন।...

এ পাড়ায় বিদ্যুৎ আসেনি। সন্ধ্যাতেই নিশুতি হয়ে গেছে। এটা সেখপাড়া। গা ঘেঁষাঘেঁষি মাটির ঘরগুলো ন্যাড়া উস্কোখুস্কো চেহারা। অন্ধকারে এখন ঝিমোচ্ছে। সারাদিন গতর খাটিয়ে ক্লান্ত মানুষগুলো এখনই শুয়ে পড়ার ধান্দা করছে। কোথাও দাওয়ায় চাপাগলায় গল্পসল্প, বিড়ির আগুন, হঠাৎ কোথাও একটু চেঁচামেচি হয়ে ফের সব চুপচাপ। বাঁয়ে ঘুরে মামুন সোজা ডুমুরদের বাড়ি চলে যেতে পারত। গেল না। এগিয়ে গিয়ে একটু দাঁড়াল। বাড়িটা চেনা যাচ্ছে না অন্ধকারে।

একটু পরে ভুসকালো হেরিকেন নিয়ে একটা লোক আসে। জিজ্ঞেস করে, কে গো?

মামুন আস্তে বলে, চিনবে না। দিদার মিয়ার বাড়িটা কোথায় ভাই?

আলোটা তুলে তার মুখ দেখার চেষ্টা করে লোকটা একটু হাসে। চেনা-চেনা লাগে বাবুমশাইকে।

মামুন মনে মনে হাসে। বাবুমশাই ভেবেছে। ভাবুক। সে বলে, দিদারুলের বাড়িটা কোনটা?

এই তো দাঁড়িয়ে আছেন সামনে।

লোকটা ব্যস্তভাবে চলে যায়। গাঁয়ের মানুষ আজকাল অত কৌতূহল দেখায় না। আগের দিনে

একশ জেরা করত। গায়ে পড়ে নিজের খবরাখবরও দিয়ে ছাড়ত। মামুন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। এভাবে দুলিভাবীর কাছে এসে পড়াটা হয়ত ঠিক হয়নি। দিদারুল বেঁচে থাকলে সঙ্কোচের কারণ ছিল না। তার বিধবা বউয়ের কাছে কী এমন কাজ রাতবিরেতে?

আসলে সারাক্ষণ ঘুরতে ইচ্ছে করছে। সারা নবাবগঞ্জ তন্নতন্ন খুঁজে ছেলেবেলার জিনিসগুলো বের করার তাগিদ আসছে। যেন মিলিয়ে দেখার সাধ। মামুন দরজায় কড়া নাড়ে। একটু পরে ভেতর থেকে দুলির গলা শোনা যায়, কে?

অকারণে বুকটা ধড়াস করে ওঠে মামুনের। দরজার ফাঁকে আলো দেখা যায়। তারপর দরজা একটু ফাঁক করে দুলি ফের বলেন, কে?

আমি মামুন।

দরজা খুলে যায়। লম্ফ হাতে দুলি দাঁড়িয়ে আছেন। ঠোঁটে হালকা একটু হাসি। বলেন, এস।

মামুন ভেতরে গিয়ে দেখে, বারান্দায় হেরিকেনের আলোয় লেনিন ও মঞ্জু পড়তে বসেছে। মামুনকে দেখে তাকিয়ে থাকে ভাইবোন। মামুন তাদের কাছে গিয়ে বসে। বলে, কে কী পড়ছ তোমরা?

মঞ্জু আগ্রহ করে তার পড়া দেখাতে। লেনিন মিটিমিটি হাসে। ছেলেটা লাজুক। দুলি লম্ফটা রান্নাঘরের মেঝেয় রেখে এসে উঠোনে দাঁড়িয়েছেন। বলে, কাল বিকেলে ডুমুরদের বাড়ি গেলাম। ডুমুর যেন কেমন হয়ে গেছে। আগের মত হাসিখুশি চঞ্চল দেখলাম না। নাকি আমাকে পছন্দ করল না!

মামুন পাঠ্য বইয়ের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে বলে, পছন্দ করবে না কেন?

অবশ্যি আগেও আমার সঙ্গে বড় একটা ভাব ছিল না।

থাকার কথাও না। আপনি ওর সিনিয়ার ছিলেন না স্কুলে?

তোমারও।

হ্যাঁ, আমারও। তবে আমি নিশ্চয় আপনার চেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ। মেয়েরা কম বয়সেই জ্ঞানী হয়ে যায় সম্ভবত। বলে মামুন মঞ্জুর সঙ্গে ওর পড়াশোনা নিয়ে গল্প করতে থাকে।

দুলি রান্নাঘরে গিয়ে কীসব নাড়াচাড়া করে আসেন। তারপর বলেন, মাস্টারি পরে করবে। এস, আমরা উঠোনে বসে গল্প করি।

একটা মোড়া পেতে দিয়ে ডাকেন, এস। এখানে এসে বস মামুন। ওরা পড়ুক।

মামুন গিয়ে বলে, আপনি বসবেন না নাকি? যাঃ তা হয় না।

বললে যে তুমি বয়োজ্যেষ্ঠ।

কথাটা মিথ্যা নয় কিন্তু। মনে করে দেখুন।

কাজেই বস। বড্ড গরম পড়েছে। গায়ে হাওয়া নিই।

চওড়া উঠোনের ওপর বিশাল আকাশ। নক্ষত্র ঝিকমিক করছে। হাওয়ার শব্দ হচ্ছে বাঁশবনে—ভূতেরা গান গাইছে। দিদারুল কি ভূত হয়ে গেছেন? মামুনকে দেখে কী ভাবছেন? অনেক কথা মনে পড়ে যায় মামুনের। দিদারুল স্কুলে, মামুন এসে আড্ডা দিয়েছে দুলির সঙ্গে। লুডো খেলেছে বৃষ্টির দুপুরে। দিদারুলের সঙ্গে তর্ক বাধালে আড়ালে দুলি মামুনকে চোখ টিপেছেন। খুব রেগে যেতেন দিদারুল। একবার সাম্রাজ্যবাদের দালাল, সি আই এ বলে সে কী চেঁচামেচি! মামুন অবশ্য হাসছিল। জানত, পরে দিদারুল নিজেই বলবেন, রাগ করেছ নাকি মামুন? বরং তোমাকে লেনিনের এই বইটা দিচ্ছি। ভাল করে পড়। ইয়ং গার্ডদের সভায় কী বলেছিলেন, মিলিয়ে দেখে নাও।

মামুন বলে, স্কুলে যাননি আজ?

যাব না তো খাব কী? শান্ত হাসেন দুলি। আমার কথা থাক! তোমার কথা বল। নিশ্চয় ভাল চাকরি-বাকরি করছ। কিন্তু বিয়ে করছ না কেন?

পাত্রী দেখে দিন না!

দেখ মামুন, চালাকি কর না। আজকাল মুসলিম ফ্যামিলিতে কন্যাদায় প্রচণ্ড। কত ভাল ভাল মেয়ের বিয়ে হচ্ছে না। তুমি যদি বল, কালই তোমার বিয়ে লাগাতে পারি।

তাই বুঝি?

নিশ্চয়। বলেই দেখ। হাতের কাছেই আছে ভাল মেয়ে।

বলছি। কিন্তু আনকোরা চাই।

আনকোরা মানে?

মানে, ডুমুর নয়।

অন্ধকারে নিঃশব্দে হাসেন দুলি। ডুমুরের কথাই বলব, ভাবলে কেন? আর বুঝি মেয়ে নেই সংসারে? তবে ওই যে বললে আনকোরা—ওটার গ্যারান্টি দিতে পারব না। আজকাল শহরের মত গাঁয়ের মেয়েরাও প্রেম করার স্কোপ পায়।

বুঝলাম। কিন্তু আপনার পাত্রীটি কে?

আছে। কাল বিকেলে এস, সকালে আমার সময় হবে না। বিকেলে এলে দেখতে পাবে। দেখেই মাথা ঘুরে যাবে কিন্তু। সাবধান!

মামুন হাসতে হাসতে বলে, আচ্ছা—আপনারা, মানে মহিলারা কেন আইবুড়ো ছেলে দেখলে তার বিয়ের ধান্দা খোঁজেন বলুন তো? রাগ না করেন তো বলব, এ এক ধরনের পারভার্সান।

বারান্দায় মঞ্জু হাই তুলে বলে, মা! খেতে দাও। খুব ঘুম পাচ্ছে।

দুলি বলেন, সে কী রে! এখন আটটাও বাজেনি। চোখে পানি দিয়ে আয়! ন'টা অব্দি রেহাই নেই মনে রেখ। টেনেটুনে পাস করেছ, খেয়াল আছে? আর লেনিন! ফের বুঝি ছবি আঁকছ? বই খোল।

মামুন উঠে দাঁড়ায়। বলে, বেচারাদের পড়াশোনা বরবাদ করে দিচ্ছি। আপনি পড়ান বরং। পরে সময় করে আসব গল্প করতে।

ওর কাঁধ চেপে বসিয়ে দেন দুলি। বস তো তুমি! কতকাল পরে আড্ডা দিচ্ছি আগের মত। মুড নষ্ট কর না। চা খাবে?

না। প্রচুর চা খেয়েছি।

প্রচুর চা কে খাওয়াল নবাবগঞ্জে? বাজে কথা বল না।

কালুর ওখানে খেলাম। ওই যে কালু—মানে গলাকাটা কেলো!

দুলি চাপাগলায় বলেন, একটা কথা বলি শোন। ওর সঙ্গে মিশোনা। ওর ভীষণ বদনাম আজকাল। স্মাগলিং করে কতবার ধরা পড়েছে। বরকত মিয়ার তদ্বিরে ছাড়া পেয়েছে।

জানি। কে মিশছে ওর সঙ্গে? নেহাত ছোটবেলার বন্ধু, তাই।

দেখছ? হারামজাদি মেয়েটা সত্যি ঘুমচ্ছে! বলে দুলি তেড়ে যান।

মামুন বলে আমার খাতিরে আজ ওদের ছুটি দিন তো ভাবী। রাতটা ভারি চমৎকার। ওদের খাইয়ে দিয়ে আসুন, বসে আড্ডা দেওয়া যাক। মুড এসে গেছে বললেন না?

দুলির প্রসঙ্গে আড্ডা শব্দটার জন্য অন্য এক মানে আছে মামুনের কাছে। মামুন দেখত, দিদারুল বিয়ে করেছেন বটে, বউ নিয়ে দিন কাটানোর সময় তাঁর ছিল কম। রাজনীতি আর স্কুল, তার সঙ্গে হাজার রকম জনসেবাগোছের ধানাইপানাই। রাতে এই নিঃঝুম বাড়িতে স্বামীর অপেক্ষা করতেন দুলি। তখন বয়স আঠার-উনিশের বেশি নয়। দিদারুল ফিরতে প্রায়ই রাত দুপুর হয়ে যেত। কোন-কোন বার মামুনকে আটকে রাখতেন। মামুন তখন ট্রেনে ডেলি-প্যাসেঞ্জারি করে কলেজে যায়। সন্ধ্যায় ফিরে এসেই বাঁশবন পেরিয়ে এই বাড়িতে ঢোকে। দিদারুল বলতেন, আমার চেলা তোমার পাহারায় থাকে। ভয় করার কী আছে!

সেই সব রাতের একটা রাত বলে কল্পনা করে মামুন। যেন দিদারুল কোন গাঁয়ে মিটিং করতে গেছেন। অন্ধকারে তাঁর সাইকেলের ঘন্টি শোনা যাবে দূর থেকে। তারপর দরজায় এসে জোরে ঘন্টিটা বাজতে থাকে। মামুনই হেরিকেন হাতে দরজা খুলবে। দিদারুল বলবেন, আচ্ছা? বাঁচালে। বড্ড ভাবনা

এখন বুঝতে পারছে মামুন। দিদারুলকে চোখ বুজে অন্তত একটা ব্যাপারে মহৎ এবং উদার মানুষ বলা যায়। মামুনের সঙ্গে নিজের স্ত্রীর মেলামেশা নিয়ে গ্রামসুলভ কোন সন্দেহে ভোগেননি কখনও। স্ত্রীকে যেমন, তেমনি মামুনকেও প্রচণ্ড বিশ্বাস করতেন। জেলার সদরে বা কলকাতায় পার্টি কনফারেন্সে

যেতে হলে আগে মামুনকে বলে রাখতেন। তবে রাতে স্ত্রীর সঙ্গ দেবার জন্যে সেখপাড়ার বুড়িদের কাউকে না কাউকে জুটিয়ে দিতেন। এক সকালে দুলি বলেছিলেন, বুড়িটা সারারাত বড্ড জ্বালিয়েছে জান মামুন? সাত পুরুষের ইতিহাস শুনিয়ে ছেড়েছে। ঘুম এলেই বলে, ও বউবিবি! ঘুমোলেন নাকি গো? শেষ মজাটা শুনুন। রাত শেষ হতে চলেছে, ওর শেষ মজা আর আসে না।

মামুন কোন মুখে বলবে সারা রাত থাকার কথা? দুলিই বা কোনমুখে বলবেন? অথচ দিদারুল নিঃসঙ্কোচে বলেছিলেন, মামুনকে বারান্দায় বিছানা করে দিলে হয়। তুমি ভেতরে থাকলে, ও বাইরে।

দুলি প্রবল আপত্তি করেছিলেন, না না। কাজিবিবি বলবেন ওনার ছেলের মাথা খাওয়া হচ্ছে।

কাজিবিবি মানে মামুনের মা। বুদ্ধিমান মামুনও সায় দিয়েছিল। হ্যাঁ, বাইরে রাত কাটালে মা হইচই বাধাবেন।

কথাটা খুব মিথ্যা। কাজিবিবি ছেলের হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন কবে। মামুন কত রাতে কোথায়-কোথায় কাটিয়েছে। বেশির ভাগ নদীর ধারে খামরুবুড়োর কাছে। গাঁজা টেনে মড়ার মত পড়ে থেকেছে সারারাত। সকালে রেললাইনের ধারে-ধারে হেঁটে বাড়ি ফিরেছে। মাথার খুলির ভেতর তখনও সারারাতের নদীর শব্দ ও অন্ধকার। মাথার ওজন বেড়ে গেছে। পা টলত এবং শরীরে ঝিমঝিম ক্লান্তি।

তিনদিকে দেওয়াল একদিক পুরোটা খোলা রান্নাশালে মেয়ের মুখে ভাত গুঁজে দিচ্ছেন দুলি। ছেলেটা আপনমনে খেতে খেতে হঠাৎ উঠোনের দিকে তাকিয়ে মামুনকে দেখছে। ছেলেটার মুখে দিদারুলের স্পষ্ট আদল। কী দেখছে ও?

মামুনের কেমন অস্বস্তি হয়। সে মুখ তুলে আকাশের নক্ষত্র দেখতে দেখতে সিগারেট টানে।

কতক্ষণ পরে ছেলেমেয়েকে ঘরের ভেতর শুইয়ে রেখে এলেন। মামুন বলে, এদিকটায় ইলেকট্রিক আসেনি এখনও। এলে নিয়ে নেবেন ভাবী!

দুলি বলেন, অনেক লড়াই করেছিলেন। আনতে পারেননি। যা দলাদলি এখানে। যদি বা দয়া করে লাইন আসে এদিকে, আমার কি সাধ্যি আছে নেবার?

ঘরের ভেতর গরম লাগে নিশ্চয়?

তা তো লাগেই। সয়ে গেছে। বলে একটু হাসেন দুলি। অত মায়া যদি, সারারাত পাহারা দাও এখানে বসে—আমি ওদের নিয়ে বারান্দায় শুই।

রাজি। আমি সব পারি।

পার না।

কেন পারব না? রাত জাগা অভ্যাস আছে।

হেরিকেনটা বারান্দায় দম কমিয়ে রাখা আছে। শুধু লম্ফটা রান্নাঘরের মেঝেয় বসে আলো ছড়াচ্ছে। শীষটা এপাশ ওপাশ কাত হচ্ছে। হলুদ একটুকরো শীষের মাথায় কালো ধোঁয়া বেঁকে যাচ্ছে। উঠোনে প্রায় অন্ধকার। খটখটে শুকনো সাদা চত্বর ধপধপ করছে। সেখানে দাঁড়িয়ে কালো এক নারীশরীর নড়ে ওঠে হাসিতে।

মামুন বলে, হাসছেন যে?

অনেকটা সময় চুপ করে থাকেন দুলি। তারপর বলেন, অনেকদিন পরে হাসলাম জান? কতদিন পরে। শোন। দুটো ভাত খাবে আমার সঙ্গে? তরকারি তেমন কিছু না। দিনে একবার রেঁধেবেড়ে রাখি। বিকেলে এসে গরম করি। বেশি রাত হলে গন্ধ ধরে যায়। এস না একসঙ্গে খাই? ভাতটা কিন্তু পান্তা। গরম পড়েছে তো। পানি ঢেলে দিয়েছি বিকেলে।

আমি পান্তা খেতে ভালবাসতাম। ভুলে গেছেন?

না। ভুলিনি। সব মনে আছে।

দুলি ব্যস্ত হয়ে হেরিকেনের দম বাড়িয়ে দেন। রান্নাশালে একটা মাদুর বিছিয়ে দুটো রঙিন টিনের থালায় পান্তাটা ভাগ করে বলেন, কম পড়ে তো পড়ুক। কী বল? হুঁ, এক মিনিট। একটা কাঁচা লঙ্কা পেড়ে আনি।

মামুন বলে, রাতে গাছে হাত দিতে নেই।

আমি ওসব মানি না।

হেরিকেন নিয়ে উঠোনের কোনায় লঙ্কা ঝাড় থেকে কয়েকটা লঙ্কা ছিঁড়ে আনেন। বলেন, এক বর্ষার দিনে কাঁচা লঙ্কা মেখে পান্তা খেলাম। মনে আছে? কাঁচা পেঁয়াজ কামড়ে খেলাম। তুমি বললে, মুখে গন্ধ হয়। ভারি ফাজিল ছেলে ছিলে কিন্তু।

মামুন লঙ্কা মাখতে মাখতে বলে, আমার গলা ফুলে ঢোল হয়েছিল মনে আছে।

এই। করছ কী? ভীষণ ঝাল।

মামুন একগ্রাস ভাত মুখে দিয়েই ঝটপট গিলে বলে, সত্যি তো। উঃ। বাপস্।

তোমার থালাটা আমাকে দাও। বলে দুলি ওর থালাটা প্রায় কেড়ে নেন। নিজেরটা মামুনের সামনে রেখে বলেন, এঁটো করিনি কিন্তু। অবশ্যি হাত দিয়ে মেখেছি। তুমি একবার হাঁ করেছিলে, আমি তোমাকে খাইয়ে দিয়েছিলাম। মনে আছে?

মামুন খেয়ে বলে, অনবদ্য! ওটা কী রেঁধেছেন?

বেগুনচিংড়ি। দেখ, খেতে পারবে নাকি।

ডালের বড়া হলে দারুণ জমত।

জমত—যদি এখন বৃষ্টি শুরু হত।

দুজনেই মুখ ঘুরিয়ে অকারণে আকাশ দেখে নেয়। আকাশে নক্ষত্র ঝকমক করছে। পাঁচিলের ওধারে বাঁশবনে শনশন করছে শেষ জ্যৈষ্ঠের হাওয়া। ভূতেরা তাদের পুরনো সুরে গান গাইছে। আর কোন শব্দ নেই কোথাও। তারপর একটা শব্দ আসে। দূরের শব্দ। রেললাইনে ট্রেন চলে যাওয়ায় চাপা অস্পষ্ট গভীর শব্দ।

দুলিভাবী, মামুন ডাকে।

উঁ?

একটা কথা বলব? রাগ করবেন না তো?

দুলি আনমনে বলেন, না।

আপনি বিয়ে করবেন না তো আর?

দুলি চমকে ওঠার মত তাকান। তারপর কেমন হেসে বলেন, তুমি তেমনি ছেলেমানুষ থেকে গেছ। আমি বুড়ি হয়ে গেলাম। তোমার বয়স বাড়ল না।

রাগ করলেন তো?

না। দুলি স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বলেন। তুমিই ভেবে দেখ, বিয়ে করা সাজে কি না। ছেলেমেয়েকে মানুষ করতে করতে দিনগুলো কেটে যাবে কোন রকমে। বেশ তো আছি।

একটু চুপ করে থাকার পর ফের বলেন, মাস্টারিটা না পেলে অবশ্যি কথাটা ভাবতে হত। কী করতাম? প্রথমে ঠোঙা বানিয়ে বেচতাম অনেক বিধবার মত—নয়তো বিড়ি বাঁধতাম। বাধ্য হয়ে কোন একটা পথ খুঁজতে হত। তাতে পেট না চললে শেষ পর্যন্ত...

দম টেনে ফের বলেন, ভাবতে কিন্তু গা শিউরে ওঠে। ভীষণ ভয় হয়, জান? দুলি হাসিমুখেই বলেন কথাটা। রাতে ভাল ঘুমটুম হয় না। যা গরম পড়েছে। সারারাত এই সব অদ্ভুত-অদ্ভুত চিন্তা আসে। ধর, আমি যদি লেখাপড়া না জানতাম! কী হত আমার! কখনও ভাবি, হঠাৎ যদি অসুখবিসুখে মারা পড়ি, ওদের কী হবে! কে দেখবে? যত রাত বাড়ে, মাথার ভেতর হাজারটা ভাবনার পোকা কটকট করে কামড়ায়।

মামুনের খাওয়া শেষ। গ্লাস নিয়ে উঠোনে নামে। অন্ধকারে নর্দমার ওপর হাতে জল ঢালে। দুলি বলেন, আলো দেখাচ্ছি, দাঁড়াও না বাবা! পোকামাকড় থাকবে কোথায়।...

উঠোনে মোড়ায় বসে সিগারেট টানতে থাকে মামুন। দুলি রান্নাঘর সামলে বেরিয়ে আসেন। বলেন, আগের দিন হলে বলতাম, একটা পান নিয়ে এস মামুন বাজার থেকে। মুখটা কেমন করছে।

হুকুম করলে আনতে পারি।

ভাগ! আমি পান খাই নাকি?

মামুন হাত তুলে কাত হয়ে দূরে রাখা হেরিকেনের আলোয় ঘড়ি দেখার চেষ্টা করে। তারপর বলে, দেখতে দেখতে সাড়ে নটা বেজে গেল। ডুমুরদের এখন দুপুর রাত।

দুলি হাসতে হাসতে বলেন, তোমাকে আটকে রেখেছি জানলে ডুমুর আমাকে জবাই করবে।

না, না। ডুমুর আজকাল ভীষণ ভালমানুষ হয়ে গেছে। ভারি ভদ্র, শান্ত।

মামুন!

কী?

ডুমুরকে...বলেই দুলি থেমে যান। ফের বলেন, ও। তুমি আবার আনকোরা মেয়ে চাও।

মামুন বলে, হ্যাঁ। কাল বিকেলে একটি খাঁটি আনকোরা এবং মুণ্ডু ঘুরিয়ে দেওয়া বস্তু দেখাবেন বলছিলেন।

কী বললে? বস্তু? তুমিও মিয়া ওই দলে। দুলি কপট চটে যাওয়ার ভঙ্গি করে বলেন। মেয়েদের বস্তু ছাড়া ভাব না। এই। মনে পড়ে গেল জান? তোমার দিদারভাই বলত, নাসিম মোল্লারাই খাঁটি বস্তুবাদী। নাসিম মোল্লা বুড়ো বয়সে ফের নিকে করেছে শুনেছ?

মামুন হাসে। আমিও কমপক্ষে চার বিবির পক্ষপাতি।

না মিয়া, সে মুরোদ তোমার নেই। গাল টিপলে দুধ বেরোয়, তার মুখে বড় বড় কথা। থাম!

এই সময় ঘরের ভেতর থেকে ঘুম ও বিরক্তি জড়ান কথা ভেসে আসে মঞ্জুর। ও মা। বড্ড গরম! হাওয়া করবে এস!

দুলি নড়ে ওঠেন।...ওমা! তুই ঘুমসনি? তখন যে ঢুলতে ঢুলতে খেলি। ব্যস্তভাবে চলে যান ঘরে। মেয়েকে বকাবকি করেন। তারপর ডাকেন, মামুন! বারান্দায় মোড়া নিয়ে এস! আমি ওদের একটু হাওয়া করতে করতে গল্প করি।

মামুন বলে, উঠি। রাত হয়ে যাচ্ছে।

দুলি রাগ করে বলেন, গেলে আটকাতে পারব না ভাই।

অগত্যা মামুন বারান্দায় যায়। দরজার পাশে মোড়াটা রেখে হেলান দিয়ে বসে। বলে, সত্যি ভীষণ গরম। ওদের কষ্ট হচ্ছে। এক কাজ করলে পারেন। বারান্দায়...

কথা কেড়ে দুলি বলেন, ভাল বলেছ। সাধে কি বলছি এখনও গাল টিপলে দুধ বেরোয়?

আবার কথা চলতে থাকে। এলোমেলো কথা—অতীত, বর্তমান এবং কখনও ভবিষ্যতের কথা। অনেক খাপছাড়া কথা। এদিকে রাত বাড়ে। কালপুরুষ উঠে আসে উঠোনের ওপর। শনশন করে হাওয়া বইতে থাকে বাইরে। বাঁশবনে ভূতেরা চেরা গলায় গান গায়। কখনও কাজিদের ভিটেয় গাছপালার ভেতর প্যাঁচা ডেকে ওঠে। তখন মামুন বলে খামরুবুড়োর নদীর ধারে গাবগাছটার কথা। সারারাত অন্ধকারে চুড়ির শব্দ শুনে মামুন বারবার চমকে উঠেছিল।

রাত একটায় মামুন বলে, ঘুম পাচ্ছে এবার। উঠি।

দুলি হন্তদন্ত হয়ে বলেন, এত রাতে ওদের গিয়ে জ্বালাতন করবে? বরং ওখানে বিছানা করে দিই। শুয়ে পড়। ঘরের দরজাটা তাহলে খোলা রাখব। আমরাও একটু হাওয়া পাব।

মামুন বলে, ঠিক আছে। কিন্তু চোর ঢুকবে যে? ডুমুর সবসময় বলে চোর ঢুকবে। দরজা এঁটে রাখে।

দুলি বিছানা এনে হাসতে হাসতে বলেন, ওরা জমিজিরেতওলা মানুষ। ঘরে কত কিছু আছে। আমার নেবে কি? গয়নাটয়নাও নেই, চালডালও নেই। রোজ কিনি, রোজ খাই। চোর বাড়ি চেনে।

বারান্দায় দরজা ঘিরে সুজনী কাঁথা আর সুন্দর ফুল আঁকা ধবধবে বালিশের বিছানায় শুয়ে পড়ে মামুন। হেরিকেনের দম কমিয়ে মাথার কাছে রাখে। হাত তিনেক তফাতে ঘরের ভেতর সার সার তিনটে মাথা। মামুনের হঠাৎ মনে পড়ে যায়, দুলি কী একবার চুলে গন্ধ তেল মেখে বলেছিলেন, শুঁকে দেখ তো গন্ধটা কেমন? স্মৃতি হাতড়ে গন্ধটা খোঁজে। মনে নেই। গন্ধের নিজস্ব কোন স্মৃতি নেই—কিন্তু কোন গন্ধ স্মৃতি ডেকে আনে।

মামুন, ঘুমলে?

না। বলুন।

তুমি কলকাতায় যে অফিসে আছ, আমাকে ঢুকিয়ে দিতে পার না সেখানে? এখানে আমার ভাল লাগে না। ও মামুন, স্কুলফাইনালে ফার্স্ট ডিভিসন ছিল। সার্টিফিকেটে এজ কমান আছে। দেখ না ভাই চেষ্টা করে।

করব। ...কষ্ট করে কথাটা বলে মামুন।

তুমি যে বাসায় থাক, কেমন সেটা? একখানা ঘর বুঝি?

মামুন ঠোঁট কামড়ে ধরে। অস্পষ্টভাবে সাড়া দেয় শুধু। নিজেও বোঝে না কী বলল।

আমাদের একবার কলকাতা নিয়ে যাবে বেড়াতে? সেই বার দুই গেছি। ও নিয়ে গিয়েছিল। একবার ওদের কনফারেন্স ছিল। আরেকবার শিক্ষকদের ডেপুটেশন। মিয়া তো আমাকে এক হিন্দু ভদ্রলোকের বাড়ি রেখে ওইসব করে বেড়াচ্ছে। আমি...ঘুমলে?

না বলুন।

দুলির কলকাতার গল্পের ভেতর মামুন মড়ার মত শুয়ে থাকে।...

কুলবেড়ের শিরিসতলায় বসে সন্ধি দিয়াড়ি জাল বুনছিল। এখান থেকে মাটিটা ঢালু হয়ে নেমে গেছে নয়ানজুলিতে। তার ওপর উঁচু রেললাইন। ডিসট্যান্ট-সিগন্যালের মাথায় একটা শকুন বসে আছে। কুলবেড়ের একটা নেড়ি কুকুর রেলে কাটা পড়েছিল। কখন তাকে চেঁছেপুছে খাওয়া হয়ে গেছে। তবু দলছুট হয়ে শকুনটা বসে আছে কিসের আশায়। সন্ধির চোখে সোজেনা অত দূরের কিছু। নইলে ভাগিয়ে দিয়ে আসত। ওই সিগন্যালের ওপর সারা জীবনের মায়া জড়িয়ে আছে। সেই মায়ার বশে এখনও টের পায়, সিগন্যাল-পোস্টের গোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে দশ-বার বছরের ফ্রক পরা মেয়েটা। হাতে একগুচ্ছের বইখাতা!

সন্ধির সামনে একটা সাইকেল এসে থামে। প্রথমে চাকাটা দেখে নিয়ে আস্তে-আস্তে মুখ তোলে দিয়াড়িবুড়ো। সরপড়া ঘোলাটে চোখে তাকায় শুধু।

কালু সাইকেলের সিটে বসে মাটিতে পা ঠেকিয়েছে। রড থেকে মামুন নেমে পাছায় হাত বোলায়। ব্যথা ধরে গেছে। কালু বলে, কী রে বুড়ো! চিনতে পারছিস না যে? ও কি বুনছিস? মাছধরা জাল? হ্যা হ্যা হ্যা হ্যা! এ ব্যাটা ডুবে মরার মতলব করেছে রে! হ্যা হ্যা হ্যা হ্যা!

সন্ধি মুখ নামিয়ে জাল বুনতে থাকে। কোন কথা বলে না।

কালু সাইকেলের সিটে বসে থেকেই চেঁচায়, ভারুয়া আছিস বে? এই ভারুয়া!

এপাশে-ওপাশে ছোট-ছোট মাটির ঘর! খড়ের চাল। কোন ঘরে কোঙাপাতা চাপান। সন্ধির ঘরের চালে কালচে শ্যাওলা ধরা টালি। উঠোন জুড়ে শুকনো ঘাস আর আগাছার ভেতর কিছু ফুলগাছ—একটা জাঁকাল জবাঝোপ লাল ফুলে ডগমগ।

বসতি নিঃঝুম হয়ে আছে। ছেলেমেয়েরা রেলের নয়ানজুলিতে জল ছেঁচে মাছ ধরছে। মাথার ওপর চিল উড়ছে। সাদা বকের ঝাঁক অপেক্ষা করছে আনাচে-কানাচে। দূরে নদীর ওপর ব্রিজ পেরিয়ে আসছে একটা মালগাড়ি। ঝমর ঝম শব্দটা বাড়তে বাড়তে মালগাড়িটা ধনুকবাঁকা হয়ে গেল কিছুক্ষণের জন্যে।

ভারুয়া নামে লোকটা তার ঘর থেকে বেরিয়ে দাঁত বের করেছে। কালু ডাকে, আয় মামদো।

সে সাইকেল চালিয়ে ভারুয়ার উঠোনে ঢোকে। মামুন সন্ধিবুড়োর খাটিয়াতে বসে পড়ে। পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে বলে, খাও সন্ধিকাকা! সিগারেট খাও।

সন্ধি ফের মুখ তোলে। মামুনকে দেখতে থাকে। কোন কথা বলে না।

মামুন বলে, চিনতে পারছ না সন্ধিকাকা? আমি মামুন। নাও, সিগারেট নাও।

সন্ধি গলার ভেতর বলে, হামি সিকরেট খাই না। মাথাটাও জোরে নাড়ে।

মামুন বলে, আমাকে চিনতে পারছ না সন্ধিকাকা? আমি মামুন।

সন্ধি ফের মাথা একটু দোলায়। চিনেছে।

সিগারেট ছেড়ে দিয়েছ? মামুন হাত বাড়ায়। তাহলে নিশ্চয় চুটি খাও। দাও, আমাকে এক চুটি দাও।

শালপাতায় জড়ান কাঁচা তামাককে ওরা বলে চুটি। দিয়াড়িরা মৌজ করে খেত। তবে সন্ধির বাড়তি একটা নেশা ছিল গাঁজা। সোজা নাক বরাবর মাঠে হেঁটে সে চলে যেত খামরুর কুঁড়েয়, কিংবা খামরু চলে আসত সন্ধির বাড়ি। দুজনে প্রচণ্ড ছিলিম টানত। চোখ লাল করে বসে ঝিমত। সন্ধির তখন অফ-ডিউটির সময়।

সন্ধি বলে, চুটিভি খাই না। কুছু না।

সে কী সন্ধিকাকা! মামুন হাসে। খামরু বুড়ো তো তা বলল না? বলল...

কথা কেড়ে সন্ধি বলে, ও হারামি ঝুটবাজ। ওর কাছে হামি যাই না। এ মুল্লুকে সব শালা ঝুটবাজ।

মামুন একটু গলা চেপে বলে, সন্ধিকাকা! তোমার মেয়ের কাছ থেকে একটা খবর নিয়ে এসেছি।

সন্ধি তাকায়। চোখে পলক পড়ে না। চোখের ঘোলাটে ঢ্যালা ফুঁড়ে নীলচে ঝিলিক ঠিকরে পড়ে! জালে তার আঙুল থেমে যায়।

তোমার মেয়ে আমাকে বলতে বলেছে, তোমার সঙ্গে দেখা করবে।

সন্ধি ঘড়ঘড় করে বলে, নাহিক্। না।

শোন কথাটা আগে। মামুন আরও চাপা গলায় বলে। ওই যে ইটভাটার কাছে বটগাছটা, ওখানে আজ সন্ধ্যার পর নির্মলা আসবে। তোমাকে একটু কষ্ট করে বটতলায় যেতে হবে সন্ধিকাকা। তোমার মেয়ে ভীষণ কান্নাকাটি করে বলেছে।

সন্ধি চুপ করে থাকে। চোখ ফেটে পড়ার মত ঠেলে বেরিয়েছে। তারপর দু-ফোঁটা জল টলটল করে ওঠে কোনায়। মুখ নামিয়ে ছেঁড়া নীল শার্টের ডগায় ঘষটে মোছে সে।

মামুন বলে, আমি বাইরের লোক। এখানে থাকি না। তাই আমাকে সাহস করে বা বিশ্বাস করে খবরটা দিতে বলেছে। আর কাকেই বা বলবে? বললে ওদের বাড়ির লোকের কানে তুলবেই। তাই আমাকে বলেছে। সন্ধিকাকা, মেয়ে যাই করুক, বাবাকে ভোলেনি। তোমার জন্যে বুক ফেটে কাঁদছিল আমার সামনে।

সন্ধি আস্তে বলে, হামার বেটিয়া মরে গেছে বাবু!

সন্ধিকাকা! তুমি ঠিকই বলছ হয়ত। মামুন ওকে বোঝাবার চেষ্টা করে। তোমার কাছে নির্মলা এখন মড়াই বটে। তবু তো তোমার বেটি। বেটির মরা মুখটাও অন্তত দেখে এস।

সন্ধি দ্রুত জালবোনা শুরু করে। কোন কথা বলে না। একটু তফাতে ভারুয়ার দাওয়ায় চাটাইয়ে বসে কালু হাতমুখ নেড়ে কথা বলছে ভারুয়ার সঙ্গে। ভারুয়ার বউ এতক্ষণে ঘরের পিছন দিক থেকে এসে উঠোনে দাঁড়িয়েছে। একবার মামুনের দিকে তাকিয়ে মুখ ফেরাল এবং ঘরে গিয়ে ঢুকল। একটা বাড়ির উঠোনে ধান শুকোচ্ছে। পা দিয়ে নেড়ে দিচ্ছে একটি মেয়ে! মাঝেমাঝে সে মামুনকে দেখছে। মনে পড়ে যায়, এখানে একটা পার্টিসেল গড়ার চেষ্টা করেছিল। কুলবেড়ের মাঠের কিছু জমি দখলের প্রস্তাব নেওয়া হয়েছিল। কীভাবে সব ফাঁস হয়ে যায় আগেভাগে। পরদিন মাঠে ভাড়াটে লেঠেলরা মুনিশ সেজে ঘোরাফেরা করছিল। জোতদারদের গরুর গাড়িতে মুড়ির বস্তা, গুড়ের টিন। তার তলায় অস্ত্রশস্ত্র। দিয়াড়িরা গাঁ ছেড়ে পালিয়েছিল। সে এক দিনকাল গেছে।

মামুন দেখে, সন্ধিকাকার চোখের কোনায় জলটা ফিরে এসেছে। কিন্তু মোছে না। কেশে গলা ঝেড়ে বুড়ো বলে, বেটিয়ার জন্যে হামক গাঁওবালা ছুট করে দিয়েছে। আগুন দেয় না। টিউবেল ভি দেয় না। টিশান থেকে জল এনে খাই। হু দেখুন বাবু, সিগনেলপর একটা গিধ্নী বৈঠে আছে হামার জন্যে। হামার সময় হয়ে গেছে বাবু।

শব্দ করে কেঁদে ওঠে সন্ধি দিয়াড়ি। মামুন বুঝতে পারে, এতদিন কেউ তার বক্তব্য শুনতে চায়নি—তাকেই হয়ত সব দোষের ভাগী করেছে। এতদিনে মুখ খুলতে পেয়ে বাঁধভাঙা জল তোড়ে বেরিয়ে এল।

কালু হাত তুলে চেঁচাচ্ছে, কাম অন মামদো! ও বুড়োর কাছে কী ফুসুরফাসুর করছিস? এখানে আয়।

মামুন ওঠে। চাপা গলায় বলে, সন্ধিকাকা! সন্ধ্যায় কিন্তু যেতে ভুলো না। তোমার মেয়ে এসে বসে থাকবে ওখানে।

সন্ধি আপন মনে জাল বুনতে থাকে ফের। জলটা মুছতে ভুলে যায়।

ভারুয়ার উঠোনে গেলে ভারুয়া হাত কপালে ঠেকিয়ে বলে, মামনবাবু আসেন। বৈঠেন। তারপর সে চোখ নাচিয়ে হাসে। রহিমমাস্টারবাবুর পট্টিতে ঢুকেছেন নাকি গো মামনবাবু? ঢুকে পড়েন। হামরাও উনহির পট্টিতে ঢুকেছি অখন। ভুঁইক্ষেতি পাইছি।

ভারুয়া হাত বাড়িয়ে গাঁ দেখায়। কেহুকে ঘরে দেখবেন না এখন। সব গেছে মাটি কোপাতে। গেঁহু পাবে। আটা পাবে। পয়সাভি।

কালু তাকে থামিয়ে দেয়। চোওপ বে দিয়াড়ির ব্যাটা! সকাল থেকে তাড়ি টেনে ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোচ্ছিল। ভুল বকতে শুরু করল এখন।

ভারুয়ার বউ একটা চাটাই বিছিয়ে দেয়। মামুন বসে। কালু চোখ নাচিয়ে বলে, চলবে নাকি রে মামদো?

কী?

দু'-এক গেলাস মাত্র। ভারুয়া, কটা গাছ দিয়েছিস রে এবার?

ভারুয়া একটু দূরে ডাঙার ওপর তালগাছগুলো দেখিয়ে বলে, তিনটে। হবিমিয়ার গাছ। ভারুয়া খ্যাক খ্যাক করে হাসে। মিয়া আর কুলবেড়ে ঢুকতে পারে না। বহুৎ ডর পেয়েছে। নইলে পরথমেই মোচা কেটে দিত। পয়সা চাইত।

কালুর ইশারায় ভারুয়া ঘরে ঢুকে একটা ছোট্ট মাটির হাঁড়ি নিয়ে আসে। মুখে ন্যাকড়া জড়ান। ভারুয়ার হুকুমে তার বউ দুটো কাচের গেলাস ধুয়ে আনে। ভারুয়া তাড়ি ঢালতে থাকে। নিজেরটা ঢালে একটা এনামেলের খুরিতে। মামুন ভাবে, কী করবে।

কালু তার হাতে গেলাসটা তুলে দিয়ে বলে, টান। গায়ে জোর বাড়বে। তোর আবার ভয়টা কিসের? তুই তো শালা স্বাধীন। ভয় করি তো করব আমি। কারণ আমার শালা একটা বউ আছে। একটা পিসিমা আছে। হ্যা হ্যা হ্যা হ্যা।

হাসির মধ্যেই গেলাস তোলে সে। তারপর হাসিটা মুছে ভয়ঙ্কর হতে থাকে। ওর কালো গলার নুড়িটা ধক ধক করে নড়তে থাকে। মামুন গেলাসটা তুলে শুঁকেই মুখ বিকৃত করে। বমির বেগ আসে পেটের ভেতর থেকে। গেলাস রেখে সে বলে, অসম্ভব।

কালু দাড়িগোঁফ মুছে চোখ পাকিয়ে বলে, অসম্ভব? চোর বুড়িয়ে সাধু হয়! খাওনি কখনও বাঞ্চোৎ? গুয়োর ডিম না-ভাঙা বয়সে আমার দীক্ষে নিয়েছিলে ভুলে গেছ? হরা বাগদীর বাড়িতে। হরা বেঁচে থাকলে সাক্ষী দিত।

ভারুয়া টেনেটেনে হাসে। হামার ঠেঁ ভি কভি-কভি পিয়েছে মামনবাবু!

মামুন কাঁচুমাচু মুখে বলে, অভ্যাস নেই অনেকদিন। বমি করে ফেলব।

ভারুয়ার বউ কসিলা ভুরু কুঁচকে হাসিমুখে ব্যাপারটা দেখছিল। বলে, এত্না জুলুম কাহে গে?

কালু তাকে ধমক দেয়। তুই থাম তো দিয়াড়নি! তারপর সে গেলাসটা নিয়ে মামুনের মাথায় একটা হাত রেখে বাচ্চাদের ওষুধ খাওয়ানর ভঙ্গিতে বলে, ছোনা আমার! মানিক আমার! খেয়ে ফেল দিকিনি চুক করে! তবে তো গায়ে জোর হবে। চুঃ! চুঃ চুঃ!

অগত্যা মামুন তার হাত থেকে গেলাস নিয়ে চোখ বুজে এক দমে ঢক ঢক করে গিলে নেয়। মাথা ঝাঁকি দিয়ে মুখ বিকৃত করে। পা টান করে ছড়িয়ে প্যান্টের পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মোছে। তখন কালু তাকে এক কুচি সুপুরি দেয়। সুপুরি চিবুতে চিবুতে মুখের কটু স্বাদটা কেটে যায়।

বাঁকা ডাঙার ওপর বসতি। গাছপালা তত নেই। যা দুচারটে আছে, ক্ষরা-খর্বুটে ঝোপঝাড়। ঢালু মাঠে সবুজ ফসল চোখে দাগ কাটে। ঝাঁ ঝাঁ করে রোদ। কয়েক গেলাস পেটে পড়তেই কালু চাপা গলায় জড়িয়ে-মড়িয়ে সেকেলে লোকগীতি গাইতে থাকে : . .

কুল পাড়িতে দাদা রে কুল পাড়িতে
টোপা টোপা কুল ধরেছে কুলবাড়িতে।।
(ওসে) কুলের বড় কাঁটা দাদা কুলের বড় খোঁটা
একুল ওকুল দুকুল যাবে কুল পাড়িতে
দাদা রে কুলপাড়িতে।।...

ভারুয়া কখন গুঁড়ি মেরে ঘরে ঢুকে ঢোলক এনেছে। ঢোলক যত বাজে, কালুর গলা তত চড়ে। দেখতে দেখতে ভারুয়ার উঠোনে কাচ্চা-বাচ্চারা এসে গেল। বুড়োহাবড়া এবং বিটকেল গড়নের বুড়িও দুচার জন। কয়েকটি কিশোরী ও যুবতী এসে ফিসফিস করে হাসতে লাগল কালুর ভঙ্গি দেখে বা গান শুনে।

দিয়াড়িরা আমুদে মানুষ। মামুন টের পাচ্ছিল, সেই হালচাল এখনও অনেকটা আছে। আগের মত না হলেও আছে। আগের দিন হলে ঢোলকের তালে তালে নাচ জুড়ে দিত অনেকেই। আর মেয়েদের গায়ে ব্লাউস, কারুর পরনের শাড়ির তলায় শাকসায়াও উঁকি দিচ্ছে পায়ের কাছে।

হঠাৎ রসভঙ্গ করে গান থামিয়ে কালু দিল এক বিকট হাঁক—এইয়ো! ভাগ্ সব, ভাগ্! ঠাকুর দেখতে এসেছিস?

মামুন বুঝতে পারে না, কালুর এত দাপট কেন কুলবেড়েতে। একজন দুজন করে চলে যায় ওরা। কাচ্চা-বাচ্চারা যাচ্ছে না দেখে সে গেলাস তুলে ছোড়ার ভঙ্গি করে। ওরা তখন হি হি করে হাসতে হাসতে সরে যায়। শুধু দাঁড়িয়ে থাকে একটা নেড়িকুকুর। কালু তাকে তাড়া করলে সে চেঁচিয়ে প্রতিবাদ করে। নেশার ঝোঁকে তাকে রেলের নয়ানজুলির দিকে ভাগিয়ে তবে কালু ফেরে।

চাটাইয়ে বসে বিদেশি সিগারেট বের করে বলে, দেখেছিস বে মামদো এ জিনিস? হুঁ হুঁ বাবা। আটাশ টাকা দাম। নে ভারুয়া, খা! ও রী কসিলা বহু, তুইও একটা খা।

কসিলা দুহাতের মধ্যে সিগারেটটা নেয়। এখন খাবে না সে। ঘরের ভেতর কোথাও রাখতে যায়। কালু বলে, বুঝলি মামদো? ভারুয়া আমার মাইনেকরা লোক। ওর কাজ হল লালগোলাঘাট থেকে সুপারিগোলাহাট অব্দি পদ্মার ধারে-ধারে যত গঞ্জ আছে—এই ধর, কালীতলা, বাবলতলী, মধুখাঁর দিয়াড়—পাটোয়ারিজিদের সব গদিতে হাজির হয়ে খবর কালেক্ট করা। অর্জুন সিং পাটোয়ারি বে! এখন ওনার কারবার সারা ডিস্ট্রিক্টে। যেখানে যাবি। কই ভারুয়া, ঢাল আর দু'পাত্তর।

তিন গেলাসে মামুন কাবু। মাথা টলমল করছে। গা গুলোচ্ছে। এখনই বমি হয়ে যাবে মনে হচ্ছে। সে জোরে মাথা নাড়ে। বলে, আমি আর না। সুপুরি থাকে তো দে শিগগির!

হ্যা হ্যা করে হেসে কালু সুপুরি দেয়। বলে, হয়ে গেল? খুব বাবু হয়ে গেছিস দেখছি কলম পিষে। সেইজন্যে তো বলছি, কলম ছাড়্। এ কলমের যুগ নয় রে ভাই।...

বহরমপুরে জোরাল ফাংশান। কলকাতা থেকে নামকরা সব আর্টিস্ট আসবে। উদ্যোক্তাদের সঙ্গে আজাই বরাবর জুটে যায়। সকাল থেকে সে মোটরসাইকেল ধুয়েমুছে ফিটফাট রেখেছে। এসব দিনে তার ছটফটানি দেখার মত। দুপুরেই জেল্লা দিয়ে বেরুবে। কিন্তু লায়লার নাকি জ্বর। চুপচাপ শুয়ে আছে। শাশুড়ির সঙ্গে ভোরের নামাজ পড়তে ওঠেনি। আজাই বোঝে, জ্বরটর নয়—গা দিব্যি ঠাণ্ডা। দুদিন থেকে আজাই টের পাচ্ছে, লায়লার মাঝেমাঝে যে বদরাগী মেজাজ ফুটে বেরোয়, তারই মরশুম চলেছে। কিন্তু আজ জব্বর ফাংশান। ঘণ্টায় ঘণ্টায় আজাইয়ের মেজাজ চড়েছে। ঘড়ির দুটো কাঁটা বারটায় জোড় বাঁধলে সে দাঁতে দাঁত চেপে বলে যায় তোমার বরাতে আবার বেশ্যাগিরি আছে। ছোটজাত কোথাকার!

বহরমপুরে আজাইয়ের কত বন্ধু। শিক্ষিতা প্রেমিকা জোটানও তার পক্ষে কঠিন কিছু নয়। তবু

কেন সে এক তুচ্ছ দিয়াড়নির প্রেমে পড়েছিল? হাইওয়ের কংক্রিটে মোটরসাইকেলের গতি আজ শান্ত। সামনে হাওয়া। আজাই অবাক হয়ে ভাবে, জেনেশুনে এক ছেনালের জন্যে এত কাণ্ড করে ফেলল কেন? শুধু আজ এখনই নয়, মাঝে মাঝে একলা হলেই ঠিক সেই কথাটা তার মাথায় আসে। খুব বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে। আসলে এ শালা হারামি দেশের হিন্দু-মুসলমান ঘোঁট পাকিয়ে আজাইকে গণ্ডগোলে ফেলে দিয়েছিল। জেদ চড়ে গিয়েছিল তার। তা না হলে নেহাত ফাঁকতালে একটু মজা লুঠতে চেয়েছিল সে। আর সেই সময় হিন্দুরা চোখ রাঙিয়ে বলেছিল, এইয়ো খবরদার! মুসলমানরা বলেছিল, চালিয়ে যাও! আমরা পেছনে আছি। শেষে 'পিতাজি' বরকতাল্লাও পেছন থেকে চেঁচিয়েছিলেন, সাবাস বেটা! আর ব্যস! নির্বোধ আজাই বিপজ্জনক ট্রাপিজের খেলায় দুলল, ঝাঁপ দিয়ে বেড়াল শূন্যে এবং নিচে দাউদাউ আগুন।

প্রেমট্রেমের ব্যাপার খুব কম, আসল কথাটা হল করুণা। মায়া। আজাইয়ের মনটা নরম। এমন করে সব ছেড়ে, এমন কী কলমা পড়তেও ছুটে আসবে দিয়াড়ির মেয়েটা—সে ভাবতেও পারেনি। অথচ মনের তলায় রাগও পোষা আছে আজাইয়ের। সে নামাজপড়া মুসলিম বউ মোটেও চায়নি। হিন্দু মেয়েদের চালচলন, জীবনযাপন, তাদের সপ্রতিভ মেলামেশার মধ্যে আজাই তার পছন্দসই নায়িকাকে দেখতে পেত। আজাই চেয়েছিল, নির্মলা তাদেরই প্রতিনিধি হয়ে থাক তার জীবনে। তাই আগুন নিভলে সে তাকে মোটরসাইকেলের পেছনে বসিয়ে কোথায়-কোথায় ঘুরে বেড়ায়। অথচ আশ্চর্য, কারুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেই লায়লা খাতুন হয়ে নির্মলা কপালে হাত ঠেকিয়ে বলে, আদাব!

হঠাৎ গতি বাড়িয়ে দেয় আজাই। প্রচণ্ড ঝড়ের শব্দ তুলে মাঠঘাটের নির্জনতা ভাঙচুর করতে করতে ছুটে চলে তার হিংস্র লালরঙের মোটরসাইকেল। দাঁতে দাঁত চেপে সে বলে, ছেনালি!...

লায়লা জানলার পর্দা তুলে নিচের উঠোনটা দেখে নেয়। এটা বাইরের উঠোন। কুদরতের বড় সাধে বানান এই দোতলায় আসতে ওটা পেরুতে হয়। ওপাশে খিড়কির দরজা খুললে অন্দরমহল। ও মহলে বিশাল উঠোন। চারদিকে দোতলা ঘর। মধ্যিখানে ইঁদারা। এখন ইঁদারার জলটা টিউবেলে তোলা হয়। সন্ধ্যা না হতেই বাড়ির দুটো মহলেই আলো জ্বলে উঠেছে। লায়লা চুপচাপ মিনিটখানেক দাঁড়িয়ে থাকে। এখন বাড়ির মেয়েরা দল বেঁধে নামাজ পড়ছে। আজাইয়ের মায়ের কড়া ধর্মবোধ। নামাজের সময় কোন বউবিবির কাচ্চাবাচ্চার কাঁদারও হুকুম নেই।

আজাইয়ের ভাইঝি রেণু ডাকতে এসেছিল ছোট চাচিকে। ছোটচাচি লায়লার জ্বর। শুয়ে ছিল। রেণু বলে গেছে, দুধবার্লি করতে বলছি গে। লায়লা বলেছে, কিচ্ছু খাব না।

বাড়ির বয়স্করা এখনও বাড়ি ফেরেনি। ছোটরা মাস্টারমশাইদের অপেক্ষায় বই খুলে বসে আছে। লায়লা সিঁড়ি বেয়ে নিঃশব্দে নামে। খালি পায়েই বেরিয়ে আসে। বাড়ির লোকেরা জানে, দিয়াড়নির বাপের ঘরে ফেরার পথ নেই। কোথাও যাবার মুখ নেই। আর যাবেই বা কেন? কেমন বউবিবি সেজে নামাজ পড়ে। মুসলমানি আদবকায়দা মেনে চলে। শাশুড়ি সালেমা বেগম ছোট বউকে বেজায়রকমের স্নেহ করেন। দুপুরে মোটা গোলগাল মানুষটি থপথপ করে হেঁটে এ মহলের উঠোনে এসে খবর নিয়ে গেছেন।

সাজানো ঘর থেকে বেরিয়ে লায়লা পুকুর পাড়ে কলাবনে ঢোকে। দরজা ভেজিয়ে রেখেই যায়। কলাবনের ভেতর অন্ধকার ঘন হয়েছে। সে সেখানে দাঁড়িয়ে কোমরে আঁচল জড়ায়। চুলটা ভাল করে বাঁধে। একটু ভাবে। তারপর পা বাড়ায়। কলাবন পেরিয়ে রেললাইন অব্দি আগাছার জঙ্গল। কাঁটাখোঁচে কাপড়ে টান পড়ে। ছিঁড়েও যায়। খালি পায়ে হাঁটা অনেকদিন অভ্যাস নেই। কষ্ট হয়। ঠোঁট কামড়ে ধরে সে। নাকের ফুটো ফুলে ওঠে। রেললাইনের ধারে ধারে এগিয়ে যেতে যেতে সে অনেকদিন পরে নির্মলা দিয়াড়নি হয়ে ওঠে।

দুদিন ডুমুরদের বাড়ি গিয়েছিল এবং বাড়ির লোকে টেরও পেয়েছিল। কিন্তু তত কিছু বকাবকি

করেনি। আজাইয়ের কানে তুলতে দেননি সালেমা। বলেছেন, বাইরে চলাফেরা অভ্যেস। একটু-আধটু পাড়াপড়শিদের কাছে যেতে মন চাইবে বইকি। তবে কখনও অমন করে একলা না। রেণু বা অণুকে সঙ্গে নিও।

ডাইনে একফালি চাঁদ দেখতে পায় নির্মলা। মনটা কেমন করে ওঠে সঙ্গে সঙ্গে। কুলবেড়ের পুরনো সময় এসে সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার ওপর। অসচেতন স্বাধীনতাবোধ তাকে নাড়া দিতে থাকে। খুব কম বয়সে স্বাধীনতা চিনেছিল সন্ধি দিয়াড়ির মেয়ে। এই সন্ধ্যারাতে সেই পুরনো স্বাধীনতা তার আগে হেঁটে তাকে ডেকে নিয়ে যায়।

ডিসট্যান্ট-সিগন্যালের লাল আলো জুগজুগ করছে দূরে। ডানপাশে কয়েকটা হলুদ আলোর ফুটকি। তারপর কানে আসে ঢোলকের শব্দ। থমকে দাঁড়ায় নির্মলা। কুলবেড়ের মাথার ওপর চাঁদের ফালিটা ঝুলছে। ঢোলকের শব্দ আবার ঝাঁপিয়ে আসছে বাতাসের ঝাপটানিতে। ডানদিকে বিশাল কয়েতবেলের গাছ। তার তলা দিয়ে আলপথ চলে গেছে কাঁচা রাস্তার দিকে।

আলপথে চলতে থাকে নির্মলা। স্বপ্নের ঘোরে হাঁটে। নিশির ডাকে বেরিয়ে পড়া মানুষের মত। সামনে ইটভাটার পাশে বটগাছটা কালো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ইচ্ছে করে চেঁচিয়ে ডাকে, বাবা, বাবা গো!

অন্ধকার বটতলায় গিয়ে সে হু হু করে কেঁদে ওঠে। তারপর কাঁপা-কাঁপা গলায় আস্তে ডাকে, বাবা! এ বাবা! তু ছে গে বাবা?

বটতলায় চারদিক খুঁজে বেড়ায় নির্মলা। মামুন খবরটা দিয়েছে তো? নিশ্চয় দিয়েছে। মামুন এখানকার মানুষের মত নয়। নির্মলা জীবনে ঘা খেয়ে-খেয়ে মানুষ চিনেছে। আসলে বাবা বড় গোঁয়ার মানুষ। তাই আসেনি। এখনও রাগ পড়েনি হয়ত।

অথচ নির্মলার মনে হয়েছিল, খবর পেয়েই বুড়ো মানুষটা ছটফট করে উঠবে। না এসে পারবে না।

সে একখানে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ ফুঁপিয়ে কাঁদে। তারপর শক্ত হতে থাকে। চোখের জল মোছে। ভাবে, কী করা উচিত তার। ও-বাড়িতে একটা হইচই হবে নিশ্চয়। সেটা সামলান তত একটা কঠিন হবে না হয়ত। বলবে, ডুমুরদের বাড়ি গিয়েছিল।

কিন্তু ডুমুরদের বাড়ি যদি খুঁজতে যায়? কী বলবে সে?

একটা কিছু বলবে। নির্মলা শক্ত হয়ে ওঠে। কুলবেড়ের দিকে হাঁটতে থাকে। খুঁড়িয়ে হাঁটে সে। পায়ের তলা জ্বলে যাচ্ছে। চাঙড় মাটির এমন কামড় সে টের পায়নি কোনদিন। কাঁচা রাস্তার দুধারে নিশিন্দাগাছের জঙ্গল বেড়ার মত দাঁড়িয়ে আছে। রাস্তাটা ঘুরে-ঘুরে রেললাইনের ফটক পেরিয়ে চলে গেছে দূরের গাঁয়ে।

কুলবেড়ের কাছে এসে সে একটু থামে। উদ্দাম ঢোলক বাজছে শিরিসতলায়। তাড়ি খেয়ে জড়ান গলায় কে গান গাইছে। ধুয়ো ধরছে অনেকগুলো গলা। সব গলা তার চেনা। গান গাইছে রামধনিয়া।

টালিচাপান ঘরের পাশ ঘরে খোলা উঠোনে ঢোকে নির্মলা। উঠোনে জঙ্গল গজিয়ে আছে। সাদা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে আটচালির তলায় ধৌলি গাই আর তার বাছুর। তারপর একটা কুকুর ডেকে ওঠে। কুকুরটা ডাকতে ডাকতে কাছে এসে মুখ নামিয়ে তার গন্ধ শোঁকে। নির্মলা আস্তে ডাকে, বাবা! বাবা গে!

দাওয়ায় দমকমান লানটিন। সন্ধি দিয়াড়ি ঠেস দিয়ে বসে আছে। কোলের কাছে একটা পেতলের গামলায় ছাতু ভেজান। আস্তেসুস্থে খাচ্ছে।

নির্মলা কয়েকপা এগিয়ে ফের ডাকে, বাবা। শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দে বলে, হামি গে বাবা! তেরা বেটিয়া! সন্ধি মুখ ফেরায়। নির্মলা তার পায়ের ওপর পড়ে ফিসফিস করে বলে, তেরা বেটিয়া গে! হামি তেরা বেটিয়া বাবা গে!

সন্ধি ছাতুর গামলাটা সরিয়ে রেখে গলার ভেতর বলে, কাহে? তারপর সে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয় মেয়েকে। উঠে দাঁড়িয়ে সন্ধি দিয়াড়ি কাঁদে বা গর্জন করে, কাহে?

একটু তফাতে অন্ধকারে কে যেতে যেতে থমকে দাঁড়ায়। তারপর দৌড়ে যায় ঢোলকের আসরে।

হঠাৎ ঢোলকটা থেমে যায় একটা চেরাগলার চিলচ্যাচানিতে। তারপর কানে আসে সন্ধিবুড়ো পাগল হয়ে চেঁচাচ্ছে, কাহে...কাহে...কাহে? আসর থেকে সবাই উঠে দাঁড়ায়। দিয়াড়ি ভাষায় চেঁচামেচি চলতে থাকে। অনেকগুলো কুকুর ডেকে ওঠে। এদিক-ওদিক থেকে আলো নাচতে নাচতে আসে। কুলবেড়েয় হুলস্থূল পড়ে যায়।

দিয়াড়িরা ছুটে আসছে। সামনে মেয়েরা। অশ্লীল গাল দিতে দিতে সন্ধির উঠোন ঘিরে ফেলে তারা। নির্মলা কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। জবাগাছের দিকে পিছু হটে সে। রামধনিয়ার বউ, রঘুয়ার মা, এবং আরও কয়েকটি মেয়ে নির্মলার চুল ধরে টেনে আনে। এলোপাথাড়ি কিল চড় মারতে থাকে। সন্ধিও বাদ পড়ে না। মেয়ে-মরদ তাকেও দমাদম মারতে শুরু করে। সন্ধি পড়ে যায়।

নির্মলা দুহাতে মুখ ঢেকে কুঁজো হয়েছিল। এক দিয়াড়নি বুদ্ধি করে কাস্তে নিয়ে এসেছিল। সে তার চুল খামচে ধরে পেঁচিয়ে কাটে। চারদিক থেকে থু থু ছেটায় নির্মলার গায়ে। তারপর কেউ দৌড়ে আসে। প্রচণ্ড জোরে চেঁচিয়ে দিয়াড়ি ভাষায় কী একটা বলে।

লোকটা ভারুয়া। পাতলুন হাওয়াই শার্ট পরা ভারুয়া নবাবগঞ্জ থেকে সাইকেলে এইমাত্র এসেছে। সাইকেল ফেলেই দৌড়েছে। তাকে দেখে এবং তার ধমক শুনে দিয়াড়ি-দিয়াড়নিরা থমকে দাঁড়ায়। বাবা ও মেয়েকে ফেলে একটু সরে আসে। তখন সন্ধি হাঁটুতে ভর দিয়ে ওঠে। টলতে-টলতে দাওয়ায় গিয়ে বসে।

নির্মলাও সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঠোঁটে, কষায়, নাকের ডগায় রক্তের ছোপ। কয়েক খাপচা চুল কেটে নিয়েছে দিয়াড়নিরা। উঠোনে ছড়িয়ে আছে। ভারুয়া নির্মলার উদ্দেশে গর্জন করে বলে, লাজ বা নাহি রী ছোকড়ি? ছোঃ ছোঃ ছোঃ।

তারপর সে ভিড়ের দিকে ঘুরে গালিগালাজ শুরু করে। আবার আগুন জ্বেলে দিলি তোরা? গাঁয়ে পুলিশ ঢুকবে। ঘরবাড়ি তছনছ করবে। বরকত মিয়া এক বাঘ। বাঘের লেজে পা দিলি? তোদের বুদ্ধিসুদ্ধি কবে হবে? দেখিস, আজ রাতেই যদি একশ লোক আর পুলিশ এনে কুলবেড়েতে না হামলা করে তো আমার নামে ইঁদুর পুষিস তোরা।

ভারুয়ার দাপট ইদানীং বেড়েছে গাঁয়ে। লখনা তার মামাত ভাই। সবাই জানে লখনার সঙ্গে নির্মলার পীরিত ছিল কিন্তু লখনা নিমলিকে থু থু করে ত্যাগ করেছিল। তা করুক। ভারুয়া বুদ্ধিমান। সে লখনার কাছের লোক। লখনাও তাকে সমীহ করে চলেছে। লখনা এখন এখানে থাকলেও মুখ নামিয়ে সরে যেত।

ভুলটা ধরা পড়ছে একটু করে। উত্তেজনা থিতিয়ে যাচ্ছে। দিয়াড়ি-দিয়াড়নিদের মনে এখন ভয় ঢুকছে। কাল সকালেই কতজনকে যেতে হবে নবাবগঞ্জে। রুজিরোজগার সবই সেখানে বাঁধা। ওরা একে একে অন্ধকারে লুকিয়ে পড়ার মত চলে যায়। দু-একটা লণ্ঠন ছিল। হয়ত তেলের টানেই কমে আসে কিংবা ইচ্ছে করে নিভিয়ে দেয়।

শুধু সন্ধির লানটিনটা জ্বলে দাওয়ার ওপর। ভারুয়া বাবা ও মেয়েকে দেখছিল। শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে একবার ছোঃ বলে হঠাৎ হনহন করে চলে যায়। একটু তফাতে সাইকেলটা কাত হয়ে পড়ে আছে। সামনের চাকাটা ঘুরছে। সন্ধির লানটিনের আলোর ছটায় ঝিকমিক করছে চাকার রিমগুলো।

নির্মলা ছেঁড়া ব্লাউসের ভেতর হাত ভরে একগোছা নোট বের করে। তারপর সেগুলো সন্ধির সামনে আলোর কাছে রেখে প্রায় দৌড়ে চলে যায়। টাকাগুলোর দিকে নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে থাকে সন্ধি দিয়াড়ি। সে বোবা হয়ে গেছে যেন—শরীরও অবশ। কী করবে ভেবে পায় না।

মামুন ভয়ে ভয়ে ঘাড় নাড়ে। বাইরের ছোট বারান্দায় অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর। মনে পড়ে যায়, ঠিক এমনি করে নিজেদের বাড়ির দরজায় রাতবিরেতে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে দোনামনা করে তবে কড়া ছুঁত। আস্তে ডাকত, মা! মামুনের মা জেগে কান পেতে থাকতেন। ডাকের আগেই দরজা খুলে শুধু বলতেন, বাঁদর!

ডুমুরও কি কান পেতে ছিল? তবে ওর যেন বরাবর জন্তুর ইন্দ্রিয়। দরজা খুলে বলে, কেন এলি? জায়গা দিল না দুলি বেগম?

মামুন কাঁচুমাচু হাসে। ঘরে ঢুকে বলে, তোর দেখছি চারদিকে চোখ। সব দেখতে পাস!

পাই। ডুমুর ঘরের দরজা এঁটে বলে। কিন্তু তোর একটা আক্কেল থাকা দরকার। ও বাড়িতে কোন পুরুষজন নেই। তুই ওখানে রাত কাটালি কোন বুদ্ধিতে? দেখবি, পাঁচকান হবে। তারপর ঠ্যালা টের পাবে দুকানকাটি মেয়েটা।

মামুন বলে, গজগজ করিস নে। আমি কি থাকতে এসেছি তোদের দেশে?

জাঁক দেখাচ্ছিস? ডুমুর চোখ পাকিয়ে বলে। হুঁ, কাকে কী বলছি। তুইও তো দুকানকাটা।

সে চলে যাচ্ছিল। মামুন বলে, শোন্। আমি খেয়ে এসেছি। আর...

ডুমুর ভেতরের দরজার কাছে ঘুরে দাঁড়ায়। তাকিয়ে থাকে।

মামুন বলে, আর শোন্। আমি হয়ত চলে যাচ্ছি না।

বাউণ্ডুলেকে কে জায়গা দিচ্ছে শুনি?

তুই—তোরা দিবিনে?

ডুমুর জোরে মাথা দোলায়। বলে, তোর জায়গা তো খুঁজে পেয়েছিস। দুলি বেগমের দলিজঘরে থাকবি।

বললে হয়ত ভাবী আপত্তি করবেন না।

ডুমুর বাঁকা ঠোঁটে হেসে বলে, তারপর না হয় নিকে করেই ফেলবি!

মামুন ভুরু কুঁচকে বলে, দুলিভাবীর ওপর তোর এত রাগ কেন রে?

রাগ? ডুমুর শব্দ করে হাসে। রাগ নয়। বুঝলি নে? ঈর্ষা। আমি তোর প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছি কিনা।

মামুন চোখ নাচিয়ে বলে, হুঁ। বোঝা যাচ্ছে চাচাজি বাড়ি নেই। তাই তোর এত গলাবাজি। যাক্ গে, বরং আমাকে ধন্যবাদ দে। রাতবিরেতে একা যুবতী স্ত্রীলোক এবং দেশের সাম্প্রতিক হালচাল সুবিধের নয়। আমি না এলে আজ রাত কাটাতিস কী ভাবে, ভেবে দেখেছিস?

ডুমুরের হাতের দিকে এতক্ষণ চোখ পড়েনি মামুনের। ডুমুরের হাতে একটা কাপড়কাটা কাঁচি। কাঁচিটা তুলে সে বলে, এই যে দেখতে পাচ্ছিস অস্ত্র। হাতে নিয়ে ঘুরছি। সে কাঁচিটা ছোরার মত মামুনের পেট ফাঁসানোর ভঙ্গিতে বাড়িয়ে ধরে। ফের বলে, একা পেয়ে বাড়াবাড়ি করতে এলেই বুঝতে পারছিস কী হবে?

মামুন হো হো করে হাসতে হাসতে শার্ট খোলে। বলে, আমার কাছে একটা মাঝারি সাইজের ছুরি আছে। বিদেশি ছুরি। চট্টগ্রামে এক সেলরের কাছে কিনেছিলাম। দারুণ দেখতে। ওটা তোকে প্রেজেন্ট করে যাব। যা, কাঁচি-টাচি রেখে আয়। তোকে একটা দারুণ গল্প শোনাব।

ডুমুর তার কথা শেষ হবার আগেই চলে যায় ভেতরে। মামুন পোশাক বদলে নেয়। পাজামা পরে পাঞ্জাবি চড়িয়ে তক্তাপোশের বিছানায় পা ঝুলিয়ে বসে। সিগারেট ধরায়। একটু তফাতে টেবিলে রাখা ফ্যানের সুইচ অন করে দেয়। এতক্ষণে তার ক্লান্তি আসে। দুপুরে তাড়ির নেশায় কালুর সঙ্গ ছাড়া হয়ে নদীর ধারে খামরু বুড়োর কাছে গিয়েছিল। সেখানে বিকেল অব্দি কাটিয়েছে। কুমড়োশাক আর পুঁটিমাছ দিয়ে ভাত খেয়েছে। সূর্য ডুবে গেলে রেললাইন ধরে হাঁটতে হাঁটতে স্টেশনে গেছে। ওভারব্রিজে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকেছে। তারপর মনে পড়েছে, আজাইয়ের বউ তার বাবার সঙ্গে লুকিয়ে দেখা করতে যাবে।

যাবে, তা ডুমুরও জানে। ডুমুর প্রথমে মানা করেছিল যেতে। শেষে বলেছিল, তোমার মনের অবস্থা বুঝতে পারছি ভাই। জন্মদাতা বাপ। তাকে অসুখী রেখে কি সুখী হতে পারে কোন মেয়ে? কিন্তু সাবধানে যেও-টেও। বাড়িতে একটা হইচই উঠবে তোমাকে না দেখতে পেয়ে। কীভাবে সামলাবে, সেটাও ভেবে দেখ।

শেষ পর্যন্ত কী ঘটল কে জানে? মামুন আপন মনে বলে ওঠে, ধুস! তারপর অন্য কথা ভাবতে থাকে। কিছুক্ষণ আগে মনুমিয়ার হোটেলে খেতে গিয়ে নুরুর সঙ্গে দেখা হয়েছে। নুরু বলেছে, দেশের

ছেলে দেশে থাক মামুন। চাকরি ছেড়ে চলে আয়। নবাবগঞ্জ এখন উঠতি ব্যবসার জায়গা। ব্যবসা-ট্যাবসা কর। এখানে বাতাসে টাকা উড়ে বেড়াচ্ছে।

উড়ে-বেড়ানো টাকার হদিস যা দিয়েছে নুরু, তা শুনে মামুন চমক খায়নি। কালু একা নয়, নুরুও এ লাইনে ঢুঁ মারছে। হাটের দিন নবাবগঞ্জে বিদেশি জিনিসের বাজার বসে যায়। আবার এসব জিনিস চালানও যায় নানা জায়গায়। গরিবগুর্বো ঘরের চালাক-চতুর মেয়েরা—যারা ছোটবেলা থেকে ট্রেনে চাল চালানের কারবার করে পেকে উঠেছে, তারাই মহাজনের কাছে এসব বিদেশি জিনিস নিয়ে বেচতে যায় গাঁয়ে-গাঁয়ে। প্যান্ট-শার্ট-ব্লাউস-শাড়ির বোঁচকা নিয়ে ঘোরে। কয়েকটা ঘড়ি থাকে। কলমও থাকে। আর থাকে নানারকম সেন্ট, মেক-আপের জিনিস। পয়সাওলা লোকের বাড়িতে এসবের খুব আদর। করজ গ্রামে নুরুর মামাকে সবাই বলত হ্যারিকেন হাজি। হ্যারিকেন হাতে ঘুরে বেড়াতেন রাতবিরেতে। সেই থেকে এ নাম। বার তিনেক হজে গেছেন। প্রচুর ঘড়ি এনে বেচতেন। তারপর নাম হয়ে গেল ঘড়ি হাজি। চারবারের হজের বেলায় বাধা পড়ল। সরকারের টনক নড়েছে। এখন ঘড়িহাজি বর্ডারে মহাজনের কাছে প্যান্ট কিনে আনেন। নুরু বলল, আশি টাকা ডজন। বিক্রি হয় প্রায় আড়াইশ টাকা ডজন। ভাবা যায়? মাঠে দেখে আয় গে স্ট্রেচলন পেন্টুল গুটিয়ে পাট নিড়োচ্ছে কত চাষাভূষো। একটা কিনতে পারলে গোর অব্দি চলে যাবে। তখন শুধু কাফন কেন। ব্যস! জীবনে ওই দুবার ইজ্জত ঢাকার পয়সা খরচ কর।...

সিগারেট পায়ের তলায় ঘষটে নেভাতে গিয়ে ডুমুরের ভয়ে অ্যাশট্রে খোঁজে মামুন। অ্যাশট্রে বলতে একটা ভাঙা কাপ। মাথার কাছে জানলার ধারে রাখা আছে। সাফ করে একটু জল ভরে রেখেছে ডুমুর। বাঃ। মামুন হাসিমুখে সিগারেটের টুকরোটা সেখানে ফেলে। তারপর ডাকে, ডুমুর! ও ডুমুর!

ডুমুরের সাড়া নেই। ভেতরের বারান্দায় আলো জ্বলছে। আলোটা আজ হয়ত সারারাত জ্বলবে। চৌধুরিসায়েব কোথায় গেলেন এভাবে মেয়েকে একা ফেলে? এই প্রথম, নাকি দরকার হলে বরাবর এমনি করে একা রেখে যান? সুরেনকে কেন থাকতে বলে যান না? কিংবা পাড়ার কোন বুড়ি-টুড়িকে? দিদারুল বউকে পাহারা দিতে পাড়া খুঁজে বুড়ি যোগাড় করতেন।

বারান্দায় গিয়ে থমকে দাঁড়ায়। ডুমুরের ঘর থেকে চাপা গলায় কথা শোনা যাচ্ছে। কার সঙ্গে কথা বলছে ডুমুর? মামুন একটু দোনামনা করে এগিয়ে যায় ওর ঘরের দরজার সামনে। পর্দাটা হাওয়ায় ফাঁক হয়ে যাচ্ছে বারবার। কিন্তু ওদের দেখা যাচ্ছে না। মামুন ডাকে, ডুমুর।

ভেতর থেকে ডুমুর সাড়া দিয়ে বলে, ভেতরে আয় না? চেঁচাচ্ছিস কেন?

পর্দা তুলেই মামুন থমকে দাঁড়ায়।

দেয়াল ঘেঁষে দাঁড় করানো একটা সেকেলে ড্রেসিং টেবিলের সামনে মোড়ায় বসে আছে আজাইয়ের বউ। মাথা এবং মুখের অনেকটা শাড়ির আঁচলে ঢাকা। সারা শরীরও ঢাকা প্রায়। সেকালের মুসলিম মেয়েদের মত। আয়নায় মুখের প্রতিবিম্ব না দেখলে মামুন চিনতে পারত না।

ডুমুরের একহাতে সেই কাঁচি, অন্যহাতে একটা খবরের কাগজে একরাশ চুলের মোড়ক। মোড়কটা সে মেঝেয় উল্টো করে রেখে একটা কৌটো চাপা দেয়। তারপর কাঁচিটা পাশে সেলাইকলের টেবিলে ড্রয়ারের মধ্যে রাখে। মুখটা গম্ভীর। বলে বস্ না। দাঁড়িয়ে ম্যাজিক দেখার কী আছে?

মামুন ভেতরে ঢুকে উঁচু খাটে ডুমুরের বিছানায় বসে পা ঝুলিয়ে। আস্তে বলে, কী ব্যাপার?

ডুমুর একটু হাসে। সেলুন খুলেছি।

মামুন কিছু বুঝতে পারে না। অবাক হয়ে লায়লার উদ্দেশে বলে, বাবার সঙ্গে দেখা হয়েছে তো আপনার? আমি কিন্তু খুব করে বলে এসেছিলাম। হয়নি দেখা?

লায়লা মুখ ফেরায় না। ডুমুর গলা চেপে বলে, ভীষণ প্রবলেম মামুন। আজাই নিশ্চয় এখনও ফেরেনি বহরমপুর থেকে। ওদের বাড়িতে খুব হইচই হচ্ছে বউবিবি পালিয়েছে বলে। রেণুরা এসেছিল সন্ধ্যাবেলা। আমি তো জানি কী হয়েছে। যা ভেবেছিলাম, তাই। তারপর তুই আসার ঘণ্টাখানেক আগে এই জানলা দিয়ে ডাকছে আপা, আপা! আমি তো ভয়ে অস্থির। ভেতরে এনে দেখি রক্তারক্তি অবস্থা। ডেটল লাগিয়ে রক্ত সাফ করে দিলাম। ব্যান্ডেজ ছিল। আটকে দিলাম।

মামুন দম আটকান গলায় বলল, কী ব্যাপার?

কুলবেড়ের লোকেরা মেরেছে।

সে কী!

ডুমুর বাঁকা মুখে বলে, নিজের জাত। তাদের মতিগতি জেনেশুনেও হতভাগী গেছে আগুনে ঝাঁপ দিতে। বুড়ো বাপটাকেও খুব মেরেছে বলছে।

মামুন রাগে চোয়াল শক্ত করে বলে, হুঁ। চুল কেটে নিয়েছে দিয়াড়িরা?

ডুমুর হাসবার চেষ্টা করে বলে, কী করব, কোনরকমে ববছাঁট করে মিলিয়ে দিলাম। ভাগ্যিস ওপর দিকটা কাটেনি। নিচের দিকে খাবলা-খাবলা করে পেঁচিয়ে কেটেছে। কান একটু চিরে গেছে পর্যন্ত। নির্বোধ মেয়ে আর কাকে বলে? বরং বাপকে যদি আমাদের বাড়িতেই আসতে বলত! চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে। এটা আমার খেয়াল হয়নি কাল। তাহলে সেই বুদ্ধিই দিতাম।

মামুন বলে, হুঁ অতটা ভাবেনি কেউ। আমার অবশ্য একবার মনে হয়েছিল বলি, আজাইকে বুঝিয়ে বললে বাবার সঙ্গে দেখা করিয়ে দেবে। আমিও না হয় বলতাম ওকে।

লায়লা গলার ভেতর বলে, কতবার বলেছি শোনেনি।

ডুমুর ধমকের সুরে বলল, শোনেনি। কেমন স্বামী করেছ যে বউয়ের মন বোঝে না। আমি হলে শুনিয়ে ছাড়তাম। অকৃতজ্ঞ কোথাকার। যার জন্য জাতধর্ম সব দিলাম, সে আমার ব্যথাবেদনা বুঝবে না?

মামুন হাত তুলে বলে, আহা। যা হবার হয়ে গেছে, এখন ওঁকে বাড়ি পৌঁছে দেবার কথা ভাবা যাক্। আমি যাব নাকি বরকত মিয়ার বাড়ি? আজাইয়ের মাকে বুঝিয়ে বলব সব।

ডুমুর ব্যস্তভাবে বলে, তাই বরং যা। তোকে একটা টর্চ দিই। শোন্, সামনের দিকে যাসনে। দলিজঘরে মোসাহেবে ভর্তি থাকে দুপুর রাত অব্দি। তুই পেছনের মহলে গিয়ে রেণু-টেণুকে ডাকিস।

লায়লা শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বলে ওঠে, না না। আমি এমন মুখ দেখাতে পারব না।

ডুমুর বলে, নাকি আমি যাব আজাইয়ের মায়ের কাছে?

লায়লা সাবধানে কাঁদে। কান্নার মধ্যে বলে, ওরা আমাকে মারধর করেছে—চুল কেটে নিয়েছে জানলে আমার শ্বশুর ক্ষেপে যাবেন। ওদের ওপর জুলুম করবেন।

ডুমুর রেগে যায়। বলে, এসব কথা আগে ভাবা উচিত ছিল। বোকা মেয়ে কোথাকার!

লায়লা বলে, আমাকে রাতটা অন্তত থাকতে দিন আপা। সকালে বরং ওকে খবর দেবেন। ও এসে নিয়ে গেলে যাব। এখন এভাবে গেলে আমার গঞ্জনার একশেষ হবে। সে মুখ নামিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলে, হাতের মার সইতে পারি আপা, কথার মার সইতে কষ্ট হয়।

হুঁ, কোন মার বুঝি বাকি আছে তোমার? ডুমুর তার কাছে যায়। ওঠ, কিছু মুখে দেবে। আর মামুন শো গে যা! থাক, আসুক আজাই বহরমপুর থেকে। সকালে যাস্ বরং।

লায়লা বলে, আমার ক্ষিদে নেই। বিশ্বাস করুন আপা, আমার একটুও ক্ষিদে নেই।

ডুমুর হেসে ফেলে। ...এ আপাওয়ালিকে নিয়ে আমার প্রাণ যাবে দেখছি। এতটুকুন ফ্রক পরা মেয়ে—আঙুরের সঙ্গে এসে ডাকত, দিদি। তোমার জন্যে কুল এনেছি। ন্যাকড়ায় বাঁধা একগুচ্ছের ইয়া মোটা-মোটা কুল। কখনও একগাদা বৈঁচি নিয়ে বাড়ি ঢুকত। জান মামুন? স্কুলের ছুটির পর কতদিন আঙুরের সঙ্গে এসে আমাদের বাড়ি খেয়ে যেত? মা দুজনকে পাশাপাশি বসিয়ে খেতে দিতেন। ছোটবেলা থেকেই জাতবেজাতের জ্ঞানটা ছিল না বাঁদরমুখির!

বলে সে দুহাতে লায়লার ঘোমটাঢাকা মাথাটা নিজের পেটে টেনে আনে। আদর করে। বলে, সেদিন এতকাল পরে আমাদের বাগানবাড়িতে দেখলাম। দেখেই মনটা কেমন করে উঠেছিল। কিন্তু ওই আজাই! আজাই আমার দুচোখের বিষ বরাবর। আজাইয়ের রাগে এর সঙ্গে ভাল করে কথাই বললাম না সেদিন। কই ওঠ্, আয়। জ্বালাসনে ভাই। ঘুম পাচ্ছে।

ডুমুরের এই স্বভাব মামুন জানে। ঝটপট সে তুই-তে পৌঁছে যেতে পারে...

রাতে বাড়ি ছেড়ে বাইরে কাটানোর উপায় নেই মোজাই চৌধুরির। বাড়িতে ডুমুর একা থাকবে, তার চেয়েও বড় কথা চুরি-চামারির ভয়। একটেরে নির্জনে পড়ে গেছে বাড়িটা। বিপদে আপদে চেঁচিয়ে ডাকলে তক্ষুনি সাড়া পাওয়া যাবে না। তবে ডুমুরের ওপর তাঁর ভরসা আছে। আদর করে বলেন, হাসিনা আমার মেয়ে নয়, ছেলে। ডুমুরের আসল নাম হাসিনা, সেটা ডুমুর নিজেই ভুলে গেছে। আব্বা বললে মনে পড়ে এবং অবাক হয়। হাসিনা শব্দটার সঙ্গে নিজের সম্পর্ক খুঁজে পায় না ডুমুর। ছোটবেলায় গাব্দাগোব্দা চেহারা ছিল বলে দাদিবিবি ডাকতেন ডুমুর। তারপর হাসিনা ডুমুর হয়ে গেছে। বার-তের বছর বয়সে একবার সাংঘাতিক টাইফয়েডে ভুগেছিল। সেরে ওঠার পর তার গড়ন গেল বদলে। হালকা ছিপছিপে শরীর, শুধু মুখটা ডাগর এবং একটু ডিমাল। কপাল চওড়া। টানা-টানা লম্বাটে চোখ বলে কপালের প্রসার চোখে পড়ে না অতটা। এ বত্রিশ বছর বয়সে ডুমুরের শরীর তাই থেকে গেছে। ছোটবেলার তেজটা কিন্তু বেড়েছে। শুধু কমেছে হাসিখুশি ভাব আর চাঞ্চল্য। মনে অনেক ঘা খেয়েছে মেয়েটা। চৌধুরিসায়েব আজকাল যখনই ওর ফের বিয়ের কথা ভাবেন, তখনই মুষড়ে পড়েন। একা হয়ে যাবেন বলে নয়, আবার কার পাল্লায় পড়ে ভুগবে ডুমুর সেই ভয়। এদিকে দিন চলে যাচ্ছে একটার পর একটা। ডুমুরের জন্যে পাত্র খুঁজছেন না এমন নয়। কিন্তু ঘরপোড়া গরুর মত সিঁদুরে মেঘ দেখতে দেখতে পিছিয়ে আসেন। ডুমুর এসব জানে না। জানলে রাগ করবে।

সালার সমৃদ্ধ গ্রাম। বনেদি মিয়ামোখাদিমের বাস সেখানে। ডুমুরের মামার বাড়িও সালার। ওর মামা মোজাহার হোসেন চিঠি লিখেছিলেন, এক সুপাত্রের খোঁজ পাওয়া গেছে পাশের গাঁয়ে। বিপত্নীক এই পাত্রের বয়স চল্লিশ-বেয়াল্লিশ। স্কুলের মাস্টার। তিনটে ছেলে আছে বটে, তাদের মানুষ করার দায় নেই। লায়েক হয়ে গেছে। মানুষটি বড় ভদ্র। জমিজমা আছে অনেকটা। সুখেস্বচ্ছন্দে থাকার মত।

চিঠিটা বাজারে পিওনের কাছে পেয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন চৌধুরি। ডুমুরকে কিছু জানাননি। দুপুরে খেয়েদেয়ে শ্যালকের বাড়ি যাচ্ছেন বলে বেরিয়ে গেছেন। ডুমুর অবাক হয়েছিল। মামা তো ভুলেও খবর নেন না। এমন কী জরুরি কাজ যে রাতের ট্রেনেও বাড়ি ফেরা হবে না? জিজ্ঞেস করলেও স্পষ্ট জবাব দেননি। হেসে বলেছেন, ফিরে এলে সব শুনিস বাপু। ট্রেন ফেল হয়ে যাবে। আর শোন্, সুরেন গরু নিয়ে এলে বলবি রাত্রিটা থাকতে। থাকতে গাঁইগুঁই করলে বুলির মাকে খবর দিস।

মোজাই চৌধুরি নিশ্চিত জানেন, ডুমুরের কাচ্চাবাচ্চা হবে না এ জীবনে। প্রথম বিয়েতে সেই নিয়েই যত অশান্তি। কলকাতা অব্দি ছোটাছুটি করে ডাক্তার দেখানো হয়েছিল। সব ডাক্তারই বলেছেন, খোদার মার। কোন উপায় নেই। এ অবস্থায় ঘরজামাই হবার মত পাত্র জোটানো গেলেও ভবিষ্যতে একই ঝামেলা আসবে।

কাজেই এমন পাত্র সুপাত্র। তিনটে ছেলে আছে যখন, তখন অন্তত ছেলেপুলের জন্যে বউয়ের ওপর নারাজ হবে না। আর ডুমুরও ভাল থাকবে। ও যা মেয়ে, পরকে আপন করতে দেরি হয় না।

সালার থেকে মাইল দুই দূরে গ্রামটা। শ্যালককে সঙ্গে নিয়ে সেখানে গেছেন। বাস চলে গাঁয়ের পাশ দিয়ে। বড্ড ভিড়। তার চেয়ে হেঁটে যাওয়াই ভাল ছিল। এখনও দারুণ হাঁটতে পারেন মোজাই চৌধুরি। কিন্তু মোজাহার তাঁর চেয়ে বয়সে দশ বছরের ছোট—একপা হাঁটতে পারে না।

ঘরবাড়ি আদবকায়দা দেখে পছন্দ হয়েছে। মোজাহারের কথামত ঠিক ঠিক মিলে গেছে সব। মতিউর রহমান বি. এ. বি. টি. পাশ, গাঁট্টাগোট্টা চেহারা, গায়ের রঙটা একটু কালো। তা হোক। মুখে সবসময় হাসিটি লেগে আছে। নিজেই গারজেন নিজের। মা-বাবা বেঁচে নেই। চার বাপব্যাটা মিলে হাত পুড়িয়ে রেঁধে খায় শুনে খুব কষ্ট হল মোজাই চৌধুরির। ছেলেগুলোকে ডেকে খুব আদর করলেন। বড়র বয়স বছর ষোল হবে। স্কুল ফাইনাল দেবে। মেজ দু বছরের ছোট। সেভেনে উঠেছে। ছোটটি আট বছরের। মতিউর বলল, ওর জন্যেই। বুঝলেন আব্বা? ওর জন্যেই মুশকিলে পড়েছি। বড্ড দুষ্টু। একদম পড়তে বসানো যায় না!

চৌধুরি ছেলেটাকে কাছে টেনে বললেন, আমার তা মনে হচ্ছে না বাবা। তবে মা-হারা ছেলেরা একটু দুষ্টু হয় বইকি।

মতিউর হাসল। ...জী হ্যাঁ। এখন ভিজে বেড়ালটি।

মোজাহার ভাগ্নীর গুণের খবর বিশদ দিলেন। পাওনা-দাওনার কথায় মতিউর জিভ কেটে বলল, তৌবা তৌবা। ও কী কথা! আল্লার দয়ায় আপনাদের দোয়াতে আমার এসব অভাব কিছু নেই। অভাব শুধু একজন দেখাশুনার মহিলার। অন্তত মায়ের অভাব যেন বুঝতে দেবে না। ব্যস! আর কিছু চাই নে।

প্রতিবেশিনীরা এসে পোলাও-কোর্মা রেঁধেছেন। খাওয়াদাওয়াটা ভালই হল। মতিউর একবার গিয়ে মেয়ে দেখে আসবে। মোজাহার সায়েবকে নিয়েই যাবে। আল্লা রাজি থাকলে ওখানেই পাকা দিন ধার্য করে আসবে।

মতিউরের মুখে কথায় কথায় আল্লা-খোদা শুনে চৌধুরি আরও খুশি। ডুমুর ইদানিং খুব নামাজ পড়া ধরেছে। মনে মনে মেয়েকে মতিউরের পাশে রেখে চৌধুরি খোদার উদ্দেশে খুব সাধাসাধি করছিলেন। রাত নটায় সালার ফেরার বাস। কিন্তু এবার মোজাহারকে হাঁটিয়ে ছাড়লেন। দুধারে ফাঁকা বিশাল মাঠ। দ্বিতীয়বার একফালি চাঁদ উঠেছে দক্ষিণ-পশ্চিম কোনায়। পিচের রাস্তা অন্ধকারে ঝকমক করছে যেন।

হেঁটে না এলে কামরূপ এক্সপ্রেস ফেল করতেন না। ফের সেই গয়া প্যাসেঞ্জার রাত দুটোয়। অত রাতে আসতে দেবেন না মোজাহার। অগত্যা রাতটা থাকতে হল।

ভোর পাঁচটায় হাওড়া-ফরাক্কা প্যাসেঞ্জার। নবাবগঞ্জ পৌছতে সাড়ে ছটা বেজে গেল। ডুমুরকে একা রেখে গেছেন, সেই ভয়টার ওপর একগুচ্ছের আনন্দ এসে চেপেছে। কখনও ভয়টা গা ঝাড়া দিয়ে আনন্দগুলো ঠেলে ফেলছে। আবার গুছিয়ে রাখছেন! মনে হচ্ছে, জাকের কাজির ছেলে আজ নিশ্চয় বাইরে কোথাও কাটায়নি। ছেলেটা বরাবর ওইরকম বাউণ্ডুলে। দায়িত্বজ্ঞানহীন। চৌধুরির মা ওর সঙ্গে ডুমুরের বিয়ের চেষ্টা করতেন। খোদা যা করেন ভালর জন্যে। ওর সঙ্গে বিয়েটা হলে ডুমুরের কী অবস্থা হত। বলছে বটে বাংলাদেশে চাকরি-বাকরি করছিল, বিশ্বাস হয় না। তাহলে চলে এল কেন? ওদেশে থাকতে মন চাইল না, দেশের জন্যে টান বাজল—এসব কৈফিয়ত মনে ধরেনি চৌধুরির। দশ বছর আগে এদেশে চরমপন্থী রাজনীতির খপ্পরে পড়ে শেষ পর্যন্ত পালাতে হয়েছিল। ওখানেও নিশ্চয় তেমনি কিছু করে পালিয়ে এসেছে। ছেলেটার বড্ড আগুনঘাঁটা অভ্যেস!

তবে কথা কী, সেই এতটুকুন থেকে চৌধুরিবাড়ি যাতায়াত। বাড়ির ছেলের মত হয়ে উঠেছিল। নিজের বাড়ি খেল তো কুলকুচো করল, হাত ধুল চৌধুরিবাড়িতে। বড় মায়া জেগে আছে সেই থেকে এই যে এত বড়টি হয়েছে, কোত্থেকে ফিরে ও এসে চৌধুরিবাড়িতেই ঢুকেছে, নিজেদের ভিটেয় ঘুঘু চরছে—তাছাড়া সে-ভিটেও আর নিজেদের হয়ে নেই—মুখটা দেখে মনে কষ্ট হয়। ছেলেটা একদিক থেকে বড্ড ভাল। মেয়েদের ব্যাপারে খুব বিশ্বাসী। আজ পর্যন্ত সব ছেলের নামে মেয়েঘটিত বদনাম শোনা গেছে, মামুনের নামে কেউ কখনও বদনাম দিতে পারেনি। এই দেখ না, ডুমুরের সঙ্গে কেমন আপন ভাইবোনের সম্পর্ক। চোখমুখ দেখলেই তো মানুষের চাল-বেচাল টের পাওয়া যায়। ছেলেটার জন্যে তাই মায়া জাগে। থাক, যে কদিন থাকতে চায়। পরের বাড়ি চিরকাল থাকতে তো আসেনি।

সদর দরজায় কড়া নাড়তেই ডুমুর সাড়া দেয়, আব্বা?

মেয়েটার কান আছে। কড়ার শব্দ শুনে টের পায়। দরজা খুললে জিজ্ঞেস করেন, সুরেন ছিল তো? নাকি বুলির মা?

ডুমুর হাসে আজ আমাদের বাড়িতে অনেক লোক। কুটুম এসেছে নাকি? উঠোনে কুয়োতলার দিকে আগে হাত-পা ধুতে যান চৌধুরি। কাঁধের ব্যাগটা ডুমুর নিয়েছে।

শুনবেখন। বলে ডুমুর ঝোলা রাখতে যায়।

হাত-পা ধুয়ে উঠোনের তার থেকে একটা গামছা টেনে নেন চৌধুরি। মুছতে মুছতে বলেন, ট্রেনে আসতে-আসতে দেখলাম কুলবেড়ের ওখানে কে কাটা পড়েছে। সিগন্যালের পাশে। লাসটা কাপড় ঢাকা পড়ে আছে। অনেক দিয়াড়ি দাঁড়িয়ে আছে দেখলাম। ওদের কেউ হবে। অনেক বছর পরে রেলে মানুষ কাটা পড়ল ওখানে। সেই কবে ঝুরুন্ দিয়াড়নি ঝাঁপ দিয়েছিল ইঞ্জিনের সামনে—তখন তুই শ্বশুরবাড়িতে।

উঁচু বারান্দায় ডুমুর দাঁড়িয়ে কথা শুনছিল। তার পাশে একটি মেয়ে এসে দাঁড়াতেই চৌধুরি জিজ্ঞেস করেন, কে গো ওটা? চিনলাম না যে?

ডুমুর দ্রুত বলে, আজাইয়ের বউ। তারপর লায়লার কাঁধে হাত রেখে টানে। অমন করে কোথায় যাচ্ছ?

লায়লা শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে আসছি বলে ছিটকে চলে যায় খিড়কির দরজায়। দরজাটা প্রচণ্ড শব্দ করে খুলে যায়। কপাট দুটো দুপাশের দেয়ালে ধাক্কা খায়। ডুমুর দৌড়ে গিয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে বলে, যেও না! কথা শোন তো! অমন করে কোথায় যাচ্ছ তুমি? আচ্ছা বোকা মেয়ে তো!

সে দরজা থেকে ফিরে এসে মামুনের ঘরে ঢোকে। মামুনের এত সকালে ওঠা অভ্যাস নেই। কিন্তু ভোরে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেছে। একটু আগে চা খেয়ে সিগারেট টানছে। ডুমুর বলে, মামুন। শিগগির যা তো মেয়েটার সঙ্গে। কুলবেড়ের ওখানে রেলে লোক কাটা পড়েছে শুনে দৌড়ে গেল। পাগল না মাথা খারাপ! আবার হাঁ করে বসে থাকে! যা না। দেখবি তো?

মামুন বলে, জ্বালাতন! আমি কোথায় যাব ওর সঙ্গে?

থাপ্পড় তুলে ডুমুর বলে, তুই একটা বুদ্ধু। মেয়েটার মাথার ঠিক নেই। সারারাত বাবা-বাবা করে কেঁদেছে। মারের চোটে ওর বাবা মারা পড়েছে ভেবে অস্থির। আঃ, যা না! নাকি আমাকে ছোটাবি?

অগত্যা মামুন গায়ে শার্ট চড়ায়। চপ্পল পায়ে ঢুকিয়ে বলে, কোন দিকে গেল?

খিড়কি দিয়ে বেরিয়েছে। দৌড়ে যা। ডুমুর অস্থির হয়ে বলে। ...সত্যি ওর বাবা হলে হারামজাদি কী করে বসবে।

চৌধুরি ডাকেন, অ ডুমুর! কী হল তোদের? ব্যাপারটা কী?

ডুমুর শান্তভাবে বলে, বলছি।...

বাবার সামনে আজাই সবসময় কেঁচো। সেদিন ফার্মে অনেকটা জমির মাটি নষ্ট করে এসেছে, সেই থেকে খাপ্পা হয়েই ছিলেন বরকত। পাওয়ার টিলারে হালকা চাষ যে মাটিতে দরকার ছিল, আজাই তা ট্রাক্টরে চ্যাপ্টা ফলাওয়ালা হ্যারোর চোটে একহাত গর্ত করে ওলট-পালট করেছে। ডিস্কহ্যারোর চাষ আজকাল উঠে যাচ্ছে। ওটা বিদেশে চলে, যেখানে একলপ্তে পঞ্চাশ-একশ একর একটানা জমি। ভুট্টা, বাজরা বা অড়হরেও চলে। বরকত সামনে পাচ্ছিলেন না ছোট ছেলেকে। বড় ছেলেরা ব্যবসা বাণিজ্যে আছে। একজন পেট্রল পাম্পের সঙ্গে বাবার দলের রাজনীতিও করে। বরকতের ইচ্ছা ছোট করবে চাষবাস। তাই মাঝেমাঝে ফার্মে যেতে বলেন। টেরও পান, আজাই লুকিয়ে ওখান থেকেই খন্দ বেচে দেয় মাঝে মাঝে। কিন্তু তাতে মাথা ঘামান না।

তিন একর জমিতে তিল ছিল। তারপর আমন চাষ হবে। মাটির বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে। জল দিলে একহাঁটু আঠাল পাঁক জমবে। সেই রাগ ঝাড়ার সুযোগ পাচ্ছিলেন না। আজাই ধুরন্ধর। কদিন বাবার সাড়া পেয়েই গা ঢাকা দিয়ে বেড়াচ্ছিল।

এখন আজাই নিজেই সামনে হাজির। কিন্তু বরকত আজ লৌহমানব। কখনও গর্জে উঠছেন, কখনও আর্তনাদের সুরে আক্ষেপ করছেন, এবং রোবটের মত ধুয়ো ধরছেন, তওবা তওবা, তওবা! দলিজঘরের লাগোয়া একটা ঘর অফিসঘরের মত ব্যবহার করেন বরকত। মন্ত্রী বা অফিসাররা এলে ও-ঘরে নিয়ে যান তাঁদের। সেখানে বিরাট সেক্রেটারিয়েট টেবিল আছে। গদিআঁটা ঘুরন-চেয়ার আছে। সেই চেয়ারে বসে আছেন বরকত। সামনে বসে হকিকত মৌলবি স্ট্যাম্প কাগজে কিছু লিখছিলেন। লেখা শেষ করে কর্তার দিকে তাকান।

বরকত আজাইয়ের ওপর বর্ষাচ্ছেন। আজাই একটু তফাতে সোফার ওপর বসে আছে। মুখটা নিচু। রাতে ফাংশানে জেগেছে বহরমপুরে। এক ইয়ার-দোস্তের বাড়ি শেষ রাতে ঘুমিয়েছে। একজন প্রেমিকা না জুটিয়ে ছাড়বে না এমন পণ করে দুপুর অব্দি কাটিয়েছে। ফিল্মস্টারের চেহারা নিয়ে আলালের ঘরের দুলালরা শহরে ঘোরাঘুরি করলে প্রেমিকা জোটান তত কঠিন না। কিন্তু ফিরে এসে লায়লার খবর শুনে তার মাথায় আগুন ধরে গেছে।

বরকত তার আগুনে মুহুর্মুহু জল ঢালছেন। আজাই ভিজে কাঠ এখন। মুখে হ্যাঁ—না নেই। বরকত ফের ধুয়ো আওড়ান, তওবা তওবা তওবা! তোর জন্যে আমার পলিটিক্যাল কেরিয়ার যেতে বসেছিল। অনেক করে-টরে হাওয়া ঘুরিয়েছি। আর নয়। খোদা যা করেন, ভালর জন্যেই করেন। ওই ছোট জাতের মেয়ে—ছি, ছি, ছি!

আজাই ভেবেছিল, পিতাজি হুকুম দেবেন। এক্ষুনি একশ লোক গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে কুলবেড়ের ওপর। দিয়াড়িদের ঘরে আগুন ধরিয়ে দেবে। কোথায় কী?

বরকত বকবক করে ক্লান্ত। গলার স্বরে চিড় খেয়েছে। ফের বলেন, স্বনামধন্য কুদরত খোনকারের বাড়ির বউ বেপর্দা হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে। তা বেড়াক। স্বামীর সঙ্গেই তো বেড়িয়েছে। আজকালকার যা রীতি তাই করেছে। তাতে আমার আপত্তি ছিল না! কিন্তু এসব কী? বাড়ি থেকে লুকিয়ে ওই কুলবেড়েতে ছোটলোকদের কাছে গেছে। মার খেয়েছে। চুল পর্যন্ত কেটে নিয়েছে। ওঃ! ও হো হো হো!

আজাই আশায় চনমন করে ওঠে। কিন্তু তক্ষুনি বরকত বলে ওঠেন, একশ লোকের সামনে দিন দুপুরে হারামজাদি রেললাইনের ধারে-ধারে দৌড়ুচ্ছে। সোনামিয়া যখন বললে কথাটা, বিশ্বাস করতে পারিনি। বাড়ির মেয়েরা ছাদ থেকে দেখল, হ্যাঁঃ! তাই বটে। তার ওপর খিটকেলে কাণ্ড—জাকের কাজির ব্যাটা তার হাত ধরে টানাটানি করছে! অ্যাঁঃ! এ কী! কী এসব?

বরকত আবার খাপ্পা। গর্জন করেন, কোন কথা না। এর পরও তুই যদি ওই হারামজাদি ছোটজাতকে ঘরে ঢোকাস, তোর জায়গা নেই। আর আমার কোন দয়ামায়া নেই-ই!

ভেতরের দরজায় পর্দার আড়াল থেকে আজাইয়ের মায়ের গলা শোনা যায়। ...রেতের বেলা কোথায় ছিল জান? চৌধুরির বাড়িতে। বেপর্দা হয়ে দৌড়ে গেছে বাপের লাস ভেবে—তা যাক। তাতে কিছু মনে করছি না। বেটির মন বাপের জন্যে টানতেই পারে। তাই বলে ভিন-বাড়িতে রাত কাটাবে? আর ওই বাউণ্ডুলে মাস্তান হারামজাদাটা ফের জুটেছে এখানে। চৌধুরিবাড়িতে ঠাঁই পেয়েছে। চৌধুরি সায়েবের মতলব বুঝছি না? বাঁজা মেয়েটাকে গছাবার তালে আছে। আক্কেলের কথাটা ভাব একবার! জোয়ান বেটির কাছে জোয়ান ছোঁড়াটাকে রেখে কেমন ঘোরাঘুরি করে বেড়াচ্ছে মাঠেঘাটে। মনে তরসা বাজে না? বাজে না। আফলা গাছ পুঁতেছে ঘরে। এই তো চায় চৌধুরিসাহেব।

কান করে স্ত্রীর কথা শুনে বরকত সায় দেন। ...আহা সেই ভেবেই তো ছোকরাকে ধরিয়ে দিচ্ছি না পুলিশের কাছে। চৌধুরির মুখ চেয়েই।

আজাই উঠে দাঁড়ালে বরকত গর্জান, বোস। কাজ আছে। কই মৌলবিসাহেব? হল? একপাতা লিখতে দিন কাবার করলেন যে?

হকিকত মৌলবি হাসেন। ...কখন হয়ে গেছে জনাব। জনা দুই অন্তত সাক্ষীর দরকার এবার।

বরকত গলা চড়িয়ে ডাকেন, মোল্লা আছ নাকি? ও মোল্লা!

নাসিমমোল্লা পাশের দলিজঘরে ছিলেন। তৈরি হয়েই ছিলেন। এসে বলেন, হয়েছে?

ওঘরে আর কে আছে?

বদাই আছে। মোল্লা দরজায় উঁকি মেরে মোসাহেববৃন্দকে দেখে নেন। এসারদ্দি আছে। তফেল আছে। আর আপনার গে—কী যেন নাম, ওই যে জাকের কাজিসাহেবের ছেলে...

শুনেই বরকত তড়াক করে উঠে দাঁড়ান। গলার ভেতর বলেন, কে?

মামুন একটু আগে এসেছে। পেছনের মহলে আজাইয়ের খোঁজে গিয়েছিল। আজাই এখানে আছে শুনে দলিজঘরে ঢুকেছে। নাসিমমোল্লার পেছনে এসে সে বলে, আমি মামুন চাচাজি।

কী দরকার?

আজাইয়ের সঙ্গে কথা আছে।

আজাই উসখুস করে। কিন্তু মুখ খোলে না। মুখ নামিয়ে বসে থাকে। বরকত গরগর করে বলেন, এখন আমরা ব্যস্ত। প্রাইভেট কথাবার্তা হচ্ছে।

মামুন ডাকে, আজাই!

অমনি বরকত হাত তুলে চেঁচান, গেট আউট! স্কাউনড্রেল! তোমাকে পুলিশের হাতে তুলে দেব জান? আবার দাঁড়িয়ে? গলাধাক্কা খাবে? গেট আউট! মামুন বেরিয়ে যায়। বাইরের বারান্দা থেকে সোনামিয়া নড়বড় করে ক্রাচ তোলেন। করুণ স্বরে ডাকেন, মামুন? অ মামুন! কদিন থেকে খুঁজছি বাবা!

মামুন পিছু ফেরে না। গেট পেরিয়ে চলে যায়। নাসিমমোল্লা বারান্দায় উঁকি মেরে একগাল হেসে ডাকেন, ও মিয়া! একবারটি আসবে? বড়সাহেব তলব ভেজেছেন।

সোনামিয়ার রাগ হয়েছিল ভাইপোর ওপর। চোখে আগুন জ্বেলে তাকিয়ে ছিলেন গেটের দিকে! মোল্লার কথা শুনে মুখে হাসি ফোটে। ঝটপট মাদুর আর তেলচিটচিটে বালিশটা গুটিয়ে রেখে ক্রাচে ভর করেন। নড়বড় করে এগিয়ে আসেন। দলিজঘর থেকে পাশের ঘরে ঢুকেই হকচকিয়ে যান।

বরকত শান্তভাবে বলেন, চা-নাশতা পেয়েছ মিয়া?

সোনামিয়া আহ্লাদে মাথা নাড়েন। বলেন, জী হ্যাঁ ভাইজান!

মৌলবি কাগজ টেনে বলেন, এখানে একটা সই দিন তো মিয়া।

সোনামিয়া ভয়ে-ভয়ে বলেন, কিসের সই হুজুর মৌলবিসাহেব?

বরকত আস্তে বলেন, তালাকনামার সাক্ষী থাকুন সোনামিয়া। আজাই দিয়াড়নিকে তালাক দিচ্ছে।

খুব ভাল, খুব ভাল। বলে সোনামিয়া আঁকাবাঁকা ইংরেজি হরফে সই করেন কাজি বাকের হোসেন। তলায় তারিখও লেখেন।

বরকত সস্নেহে ডাকেন, আজাই।

আজাই মুখ তোলে। রাতজাগা লাল চোখে পলক পড়ে না। তার শ্যাম্পুকরা চুল ফ্যানের হাওয়ায় এলোমেলো।

বরকত গলার ভেতর বলেন, তুমি পুরুষ ব্যাটাছেলে। তোমার বাপ এদেশের একজন গণ্যমান্য লোক। তোমার আত্মীয়-স্বজন কেউ কেউ সেন্ট্রালে মিনিস্টার, কেউ জজ-ব্যারিস্টার। তুমি নিজে একজন শিক্ষিত—গ্র্যাজুয়েট ছেলে। দেখতে শুনতেও তুমি পাঁচটার একটা। হাজার লোকের মধ্যে তুমি দাঁড়িয়ে থাকলে তোমাকেই চোখে পড়বে সবার আগে। সই কর তালাকনামায়।

একটু স্তব্ধতা। শুধু ফ্যানের শব্দ তারপরে অন্দরের দরজায় পর্দার আড়াল থেকে সালেমা বেগম উদাত্ত স্বরে ঘোষণা করেন, আমার ছোট বউবিবি ঠিক করাই আছে। কলকাতার পার্ক সার্কাসের মেয়ে। এম এ পাস মেয়ে। আসমানের পরীর মত ছুরত (রূপ)। আজ খবর ভেজলে কালই লোক আসবে।

তারপর দম নিয়ে ফের বলেন সালেমা, মনে কোন কিন্তু রেখ না বাপ। সই করে দাও।

আজাইয়ের চোখ ফেটে জল গড়ায়। ভাঙা গলায় বলে, কই, দিন।

বরকত তালাকনামার কাগজ আর সবচেয়ে দামি কলমটা এগিয়ে দেন। ছেলের হাতে। ছেলে দ্রুত সই করে। তারপর উঠে দাঁড়ায়। বরকত বলেন, সবুর! মোল্লা, আজাইয়ের সঙ্গে যাও। দিয়াড়নির কী সব নিজের জিনিসপত্তর আছে, একটা বাক্সে ভরে দেবে আজাই। তালাকনামা আর বাক্সটা পৌঁছে দিয়ে এস। দেখ গে, মোজাই চৌধুরির বাড়িতেই আছে। না থাকলে খুঁজে দেখ কোথায় আছে। সঙ্গে লোক নিয়ে যাবে কিন্তু।...

বিকেলে কুলবেড়ের ডিসট্যান্ট-সিগন্যালের কাছে দাঁড়িয়ে জাল বুনতে বুনতে লাইনে রক্ত খোঁজে সন্ধি দিয়াড়ি। একরাশ কালো চুল রক্তে দলাপাকিয়ে পড়ে আছে কাঠের স্লিপারে। বিশ্বাস হয় না, চুলগুলো রতিয়ার মাথায় গজিয়েছিল। রামধনের মা রতিয়ার পেটে শূল ছিল। সারারাত বিকট চেঁচাত মেয়েটা! শেষ রাতে ককাতে-ককাতে এসে নিজের জান নিল। বেঁচে ফৈদা কিসের? খালি এই কথা বলত আর মাথা ঠুকত। চিৎকার করত, এ ঠাকুরবাবা! জেরাসে কিরপা কর্! তুই কি অন্ধা হয়ে গেছিস? তো ঠাকুরবাবা অন্ধা হলে মানুষ কী করতে পারে?

সাত সাল পরে আরেক দিয়াড়নি রেলগুড্ডির সামনে ঝাঁপ দিল। সন্ধি শিউরে ওঠে। ভয় পায়। তার হাত থেমে যায়। কাল সারা রাত সন্ধি ভেবেছিল, এমনি করে জান নেবে। শেষরাতে সে দাওয়ায়

বরকত তার আগুনে মুহুর্মুহু জল ঢালছেন। আজাই ভিজে কাঠ এখন। মুখে হ্যাঁ—না নেই। বরকত ফের ধুয়ো আওড়ান, তওবা তওবা তওবা! তোর জন্যে আমার পলিটিক্যাল কেরিয়ার যেতে বসেছিল। অনেক করে-টরে হাওয়া ঘুরিয়েছি। আর নয়। খোদা যা করেন, ভালর জন্যেই করেন। ওই ছোট জাতের মেয়ে—ছি, ছি, ছি!

আজাই ভেবেছিল, পিতাজি হুকুম দেবেন। এক্ষুনি একশ লোক গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে কুলবেড়ের ওপর। দিয়াড়িদের ঘরে আগুন ধরিয়ে দেবে। কোথায় কী?

বরকত বকবক করে ক্লান্ত। গলার স্বরে চিড় খেয়েছে। ফের বলেন, স্বনামধন্য কুদরত খোনকারের বাড়ির বউ বেপর্দা হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে। তা বেড়াক। স্বামীর সঙ্গেই তো বেড়িয়েছে। আজকালকার যা রীতি তাই করেছে। তাতে আমার আপত্তি ছিল না! কিন্তু এসব কী? বাড়ি থেকে লুকিয়ে ওই কুলবেড়েতে ছোটলোকদের কাছে গেছে। মার খেয়েছে। চুল পর্যন্ত কেটে নিয়েছে। ওঃ! ও হো হো হো!

আজাই আশায় চনমন করে ওঠে। কিন্তু তক্ষুনি বরকত বলে ওঠেন, একশ লোকের সামনে দিন দুপুরে হারামজাদি রেললাইনের ধারে-ধারে দৌড়ুচ্ছে। সোনামিয়া যখন বললে কথাটা, বিশ্বাস করতে পারিনি। বাড়ির মেয়েরা ছাদ থেকে দেখল, হ্যাঁঃ! তাই বটে। তার ওপর খিটকেলে কাণ্ড—জাকের কাজির ব্যাটা তার হাত ধরে টানাটানি করছে! অ্যাঁঃ! এ কী! কী এসব?

বরকত আবার খাপ্পা। গর্জন করেন, কোন কথা না। এর পরও তুই যদি ওই হারামজাদি ছোটজাতকে ঘরে ঢোকাস, তোর জায়গা নেই। আর আমার কোন দয়ামায়া নেই-ই!

ভেতরের দরজায় পর্দার আড়াল থেকে আজাইয়ের মায়ের গলা শোনা যায়। ...রেতের বেলা কোথায় ছিল জান? চৌধুরির বাড়িতে। বেপর্দা হয়ে দৌড়ে গেছে বাপের লাস ভেবে—তা যাক। তাতে কিছু মনে করছি না। বেটির মন বাপের জন্যে টানতেই পারে। তাই বলে ভিন-বাড়িতে রাত কাটাবে? আর ওই বাউণ্ডুলে মাস্তান হারামজাদাটা ফের জুটেছে এখানে। চৌধুরিবাড়িতে ঠাঁই পেয়েছে। চৌধুরি সায়েবের মতলব বুঝছি না? বাঁজা মেয়েটাকে গছাবার তালে আছে। আক্কেলের কথাটা ভাব একবার! জোয়ান বেটির কাছে জোয়ান ছোঁড়াটাকে রেখে কেমন ঘোরাঘুরি করে বেড়াচ্ছে মাঠেঘাটে। মনে তরসা বাজে না? বাজে না। আফলা গাছ পুঁতেছে ঘরে। এই তো চায় চৌধুরিসাহেব।

কান করে স্ত্রীর কথা শুনে বরকত সায় দেন। ...আহা সেই ভেবেই তো ছোকরাকে ধরিয়ে দিচ্ছি না পুলিশের কাছে। চৌধুরির মুখ চেয়েই।

আজাই উঠে দাঁড়ালে বরকত গর্জান, বোস। কাজ আছে। কই মৌলবিসাহেব? হল? একপাতা লিখতে দিন কাবার করলেন যে?

হকিকত মৌলবি হাসেন। ...কখন হয়ে গেছে জনাব। জনা দুই অন্তত সাক্ষীর দরকার এবার।

বরকত গলা চড়িয়ে ডাকেন, মোল্লা আছ নাকি? ও মোল্লা!

নাসিমমোল্লা পাশের দলিজঘরে ছিলেন। তৈরি হয়েই ছিলেন। এসে বলেন, হয়েছে?

ওঘরে আর কে আছে?

বদাই আছে। মোল্লা দরজায় উঁকি মেরে মোসাহেববৃন্দকে দেখে নেন। এসারদ্দি আছে। তফেল আছে। আর আপনার গে—কী যেন নাম, ওই যে জাকের কাজিসাহেবের ছেলে...

শুনেই বরকত তড়াক করে উঠে দাঁড়ান। গলার ভেতর বলেন, কে?

মামুন একটু আগে এসেছে। পেছনের মহলে আজাইয়ের খোঁজে গিয়েছিল। আজাই এখানে আছে শুনে দলিজঘরে ঢুকেছে। নাসিমমোল্লার পেছনে এসে সে বলে, আমি মামুন চাচাজি।

কী দরকার?

আজাইয়ের সঙ্গে কথা আছে।

আজাই উসখুস করে। কিন্তু মুখ খোলে না। মুখ নামিয়ে বসে থাকে। বরকত গরগর করে বলেন, এখন আমরা ব্যস্ত। প্রাইভেট কথাবার্তা হচ্ছে।

মামুন ডাকে, আজাই!

অমনি বরকত হাত তুলে চেঁচান, গেট আউট! স্কাউনড্রেল! তোমাকে পুলিশের হাতে তুলে দেব জান? আবার দাঁড়িয়ে? গলাধাক্কা খাবে? গেট আউট! মামুন বেরিয়ে যায়। বাইরের বারান্দা থেকে সোনামিয়া নড়বড় করে ক্রাচ তোলেন। করুণ স্বরে ডাকেন, মামুন? অ মামুন! কদিন থেকে খুঁজছি বাবা!

মামুন পিছু ফেরে না। গেট পেরিয়ে চলে যায়। নাসিমমোল্লা বারান্দায় উঁকি মেরে একগাল হেসে ডাকেন, ও মিয়া! একবারটি আসবে? বড়সাহেব তলব ভেজেছেন।

সোনামিয়ার রাগ হয়েছিল ভাইপোর ওপর। চোখে আগুন জ্বেলে তাকিয়ে ছিলেন গেটের দিকে। মোল্লার কথা শুনে মুখে হাসি ফোটে। ঝটপট মাদুর আর তেলচিটচিটে বালিশটা গুটিয়ে রেখে ক্রাচে ভর করেন। নড়বড় করে এগিয়ে আসেন। দলিজঘর থেকে পাশের ঘরে ঢুকেই হকচকিয়ে যান।

বরকত শান্তভাবে বলেন, চা-নাশতা পেয়েছ মিয়া?

সোনামিয়া আহ্লাদে মাথা নাড়েন। বলেন, জী হ্যাঁ ভাইজান!

মৌলবি কাগজ টেনে বলেন, এখানে একটা সই দিন তো মিয়া।

সোনামিয়া ভয়ে-ভয়ে বলেন, কিসের সই হুজুর মৌলবিসাহেব?

বরকত আস্তে বলেন, তালাকনামার সাক্ষী থাকুন সোনামিয়া। আজাই দিয়াড়নিকে তালাক দিচ্ছে।

খুব ভাল, খুব ভাল। বলে সোনামিয়া আঁকাবাঁকা ইংরেজি হরফে সই করেন কাজি বাকের হোসেন। তলায় তারিখও লেখেন।

বরকত সস্নেহে ডাকেন, আজাই।

আজাই মুখ তোলে। রাতজাগা লাল চোখে পলক পড়ে না। তার শ্যাম্পুকরা চুল ফ্যানের হাওয়ায় এলোমেলো।

বরকত গলার ভেতর বলেন, তুমি পুরুষ ব্যাটাছেলে। তোমার বাপ এদেশের একজন গণ্যমান্য লোক। তোমার আত্মীয়-স্বজন কেউ কেউ সেন্ট্রালে মিনিস্টার, কেউ জজ-ব্যারিস্টার। তুমি নিজে একজন শিক্ষিত—গ্র্যাজুয়েট ছেলে। দেখতে শুনতেও তুমি পাঁচটার একটা। হাজার লোকের মধ্যে তুমি দাঁড়িয়ে থাকলে তোমাকেই চোখে পড়বে সবার আগে। সই কর তালাকনামায়।

একটু স্তব্ধতা। শুধু ফ্যানের শব্দ তারপরে অন্দরের দরজায় পর্দার আড়াল থেকে সালেমা বেগম উদাত্ত স্বরে ঘোষণা করেন, আমার ছোট বউবিবি ঠিক করাই আছে। কলকাতার পার্ক সার্কাসের মেয়ে। এম এ পাস মেয়ে। আসমানের পরীর মত ছুরত (রূপ)। আজ খবর ভেজলে কালই লোক আসবে।

তারপর দম নিয়ে ফের বলেন সালেমা, মনে কোন কিন্তু রেখ না বাপ। সই করে দাও।

আজাইয়ের চোখ ফেটে জল গড়ায়। ভাঙা গলায় বলে, কই, দিন।

বরকত তালাকনামার কাগজ আর সবচেয়ে দামি কলমটা এগিয়ে দেন। ছেলের হাতে। ছেলে দ্রুত সই করে। তারপর উঠে দাঁড়ায়। বরকত বলেন, সবুর! মোল্লা, আজাইয়ের সঙ্গে যাও। দিয়াড়নির কী সব নিজের জিনিসপত্তর আছে, একটা বাক্সে ভরে দেবে আজাই। তালাকনামা আর বাক্সটা পৌঁছে দিয়ে এস। দেখ গে, মোজাই চৌধুরির বাড়িতেই আছে। না থাকলে খুঁজে দেখ কোথায় আছে। সঙ্গে লোক নিয়ে যাবে কিন্তু।...

বিকেলে কুলবেড়ের ডিসট্যান্ট-সিগন্যালের কাছে দাঁড়িয়ে জাল বুনতে বুনতে লাইনে রক্ত খোঁজে সন্ধি দিয়াড়ি। একরাশ কালো চুল রক্তে দলাপাকিয়ে পড়ে আছে কাঠের স্লিপারে। বিশ্বাস হয় না, চুলগুলো রতিয়ার মাথায় গজিয়েছিল। রামধনের মা রতিয়ার পেটে শূল ছিল। সারারাত বিকট চেঁচাত মেয়েটা! শেষ রাতে ককাতে-ককাতে এসে নিজের জান নিল। বেঁচে ফৈদা কিসের? খালি এই কথা বলত আর মাথা ঠুকত। চিৎকার করত, এ ঠাকুরবাবা! জেরাসে কিরপা কর্! তুই কি অন্ধা হয়ে গেছিস? তো ঠাকুরবাবা অন্ধা হলে মানুষ কী করতে পারে?

সাত সাল পরে আরেক দিয়াড়নি রেলগুড্ডির সামনে ঝাঁপ দিল। সন্ধি শিউরে ওঠে। ভয় পায়। তার হাত থেমে যায়। কাল সারা রাত সন্ধি ভেবেছিল, এমনি করে জান নেবে। শেষরাতে সে দাওয়ায়

উঠেও বসেছিল আচমকা। কিন্তু টাকাগুলোর কথা মনে পড়ে গেল। গাইগরুটার কথা মনে পড়ল। তিনপোয়া করে দুধ দেয়। স্টেশনে বেচে আসে। এ মাসের টাকাটা এখনও আদায় হয়নি। তাছাড়া আর তিনদিন পরে তার পেনসনের টাকা পাওয়া যাবে। জংশনে গিয়ে টাকাগুলো প্রতি মাসে দস্তখত করে নিয়ে আসে। কত কাজ সন্ধির! তার মরার জো আছে? তার ওপর এই জালখানা! জালখানা শেষ না হলে চলে?

পোস্টাপিসেও অনেকগুলো টাকা জমিয়েছে। কত টাকা সন্ধির! তার মরা সাজে না। আরে, অবুঝ লড়কি জাত দিয়েছে তো কী হয়েছে? বড়লোকের ঘরে ইজ্জতওয়ালি হয়ে পালঙ্ক পর নিদ যাচ্ছে? ছোট জাত বলে সবাই ছি-ঘিন করে বলেই না লেখাপড়া শিখতে দিয়েছিল সন্ধি? রেলের কাজে থেকে সন্ধির চোখটাই আলাদা।

সকাল থেকে পথ তাকাচ্ছিল সে। নবাবগঞ্জ থেকে গাঁক গাঁক করে বাঘের মত দৌড়ে আসবে বরকতের ছেলে। একশ লোক নিয়ে আসবে। আগুন জ্বেলে দেবে দিয়াড়িদের ঘরে! সন্ধি দিয়াড়ি বগল বাজাবে। কিন্তু কোথায় তারা?

সন্ধি বড় আশা করেছিল। নিরাশ হয়ে সে আবার ধৌলি গরু আর বাছুর নিয়ে কাটিয়েছে। আজ দুধটা দিতে যাওয়া হয়নি। থাক গে, নিজেই খাবে। মার খেয়ে শরীর দুর্বল হয়ে গেছে। পিঠে ব্যথা বাজছে। কাল অব্দি ব্যথাটা থাকলে জংশনের হাসপাতালে যাবে। শরীর ঠিক রাখতে দুধটা সবই তার খাওয়া দরকার।

স্টেশনের দিকে চলতে থাকে সন্ধি দিয়াড়ি।

চারদিকে লক্ষ্য রেখে ছোট্ট রেলইয়ার্ড পেরিয়ে যায়। প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে সে কৃষ্ণচূড়া গাছটার দিকে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ। গোড়ার গোল চত্বরটায় দৃষ্টি ফেরায়। তারপর স্টেশনঘরে ঢোকে। বড়বাবু নলিনীকান্ত বলেন, সন্ধি যে? খবর কী? হ্যাঁ হে সন্ধিচরণ, সুইসাইড করল মেয়েটা কে? চিনি বলে তো মনে হল না!

সন্ধি বলে, রামধনিয়ার মা স্যার। রতিয়া। পেটে শূলের বেমার ছিল। তো কী করবে! জান লিয়ে লিল।

অ। তা তোমাকে যে আজকাল দেখতে পাইনে?

সন্ধি একটু হাসে। কপালে হাত ঠেকিয়ে বলে, একঠো বাত করতে এল স্যার। হামাকে একঠো দরখাস্ত লিখিয়ে দেন। হামি প্ল্যাটফর্মে দুকান দিব। চা-পানি বেচব। সিগ্রেট পান ভি বেচব। হামি আর গাঁয়ে থাকব না বড়াবাবু! সন্ধি হঠাৎ কেঁদে ফেলে। হামাকে গাঁওবালা মারছে, বহুত মারছে।

সে কাঁদতে কাঁদতে পা জড়িয়ে ধরে বড়স্টেশনবাবুর। বুড়োমানুষের কান্না দেখলে বড় খারাপ লাগে। বড়স্টেশনবাবু ব্যস্ত হয়ে বলেন, আহা! ওঠ, ওঠ! এতে আর কথা কী? তবে বুঝলে সন্ধিচরণ সব তোমার মেয়ের জন্যে। একখানা মেয়ে বটে বাবা! বুড়ো বাপটার কী হবে ভাবলে না পর্যন্ত। গুলি করে মারা উচিত। বুঝলে?

তোবড়ান পাঁচিলের গায়ে টিনের দরজাটা কোনমতে আটকান আছে। তার ওপর থাপ্পড় মেরে রহিমুদ্দিন ডাকছিলেন, দুলি! অ দুলি!

তারপর—অ লেনিন! মঞ্জু! তার সঙ্গে সাইকেলের ঘন্টি ক্রিং ক্রিং ক্রিং!

মামুন উঠে দাঁড়াল। বলে, আমি যাই ভাবী।

দুলির চোখে হাসি। চাপা গলায় বলেন, কেন? অত ভয় কিসের তোমার? ভাবীর বাড়ি নতুন আসছ নাকি?

এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দেন। সাইকেল ঢুকিয়ে উঠোনে দাঁড় করিয়ে রহিমুদ্দিন তাকান এদিকে। ওটা কে? মামুন নাকি হে?

মামুন আস্তে বলে, জী।

রহিমুদ্দিন হো হো করে হাসেন। রোবটের মত বলেন, জী কী হে কমরেড? বজ্রমুষ্ঠিতে লাল

সেলাম। আঁা? মেকানিক্যাল ইন্টারপ্রিটেশন অফ ডায়ালেটিক্যাল অ্যান্ড হিস্টোরিক্যাল মেটিরিয়ালিজম মানুষকে কোথায় পৌঁছে দেয় দেখ। খাঁটি রিঅ্যাকশনারিদের চিন্তাধারায়। জী? আমি মোল্লা না মৌলবি?

মামুন মুখ ঘুরিয়ে বাঁশবনের মাথায় দাঁড়কাক দেখতে থাকে। দুলি একটা মোড়া এনে উঠোনে রাখেন। উঠোনে বিকেলের ছায়া পড়েছে। রহিমুদ্দিন মোড়ায় বসে বলেন, লেনিন মঞ্জু ওরা সব কোথায় গেল?

দুলি বলে, লেনিন স্কুল থেকে এসেই খেলতে যায়। মঞ্জুকে বাজারে পাঠিয়েছি।

অ। রহিমুদ্দিন অভ্যাসমত চশমা খুলে ধুতির খোঁচায় কাচ মোছেন। ...দুলি, তুমি বড্ড ভুল করছ। মহিলা কৃষক সমিতির সেলে নেতৃত্ব দেবার মত আর কে আছে বল তুমি ছাড়া? দিদারের নিজের হাতে গড়া সেল। তার স্বপ্ন কী ছিল আমরা জানি না? তুমি বড্ড ভুল করছ। কোন মিটিংয়ে সভাপতি উপস্থিত থাকছে না, এটা কেমন কথা? তাছাড়া তোমার নিজেরও তো একটা কর্তব্যবোধ থাকবে। তোমার স্বামী প্রাণ দিয়েছে যাদের হাতে, তাদের বিরুদ্ধে তুমি লড়াই করবে না? না—এ লড়াই হাতিয়ার নিয়ে নয়। পলিটিক্যাল লড়াই। আমরা ওধরনের ব্যক্তিগত প্রতিশোধে বিশ্বাস করি না। ওসব বিশ্বাস করে অ্যাডভেঞ্চারিস্টরা—একে লেফ্‌টিস্ট ডেভিয়েশান বলি আমরা। জনগণকে পাশে নিয়ে লড়ি আমরা।

দুলি বলেন, আমি গেলে ওরা একা থাকতে ভয় পায়। তাছাড়া...

রহিমুদ্দিন কথা কেড়ে বলেন, বেশ তো। তোমার বাড়িতেই ডাকবে মেয়েদের। ওই তো বাইরের ঘরটা পড়ে আছে। ওখানে অফিস কর। অসুবিধেটা কী?

দুলি পা বাড়িয়ে বলে, বসুন। চা করি।

চা-ফা আমার চলে না। হাত নাড়েন রহিমুদ্দিন। শোন, পরশু মিটিং ডাক তোমার সেলের। কতকগুলো জরুরি প্রস্তাব নেবার আছে। আমি খসড়া করে দেব'খন। উঠি।

তারপর মামুনের উদ্দেশে বলেন, কী মামুন? সেদিন যা বললাম, কী ঠিক করলে?

মামুন বলে, আমি এখানে থাকতে আসিনি। চলে যাব।

রহিমুদ্দিন চোখ নাচিয়ে বলেন, আমাদের হাতে খবর আছে, ছত্রভঙ্গ এক্সট্রিমিস্টরা রিঅরগ্যানাইজড হবার চেষ্টা করছে। তুমি আশা করি এলাকার অবস্থা সার্ভে করতে এসেছিলে। গিয়ে তোমার নেতাদের কাছে রিপোর্ট দিও বাস্তব অবস্থাটা কী। হ্যাঁ হে, তুমি লিন পিয়াও গ্রুপের লোক ছিলে। এখনও তাই আছ তো?

জবাবের আশা না করেই রহিমুদ্দিন সাইকেল ঠেলতে ঠেলতে বেরিয়ে যান। দুলি দৌড়ে গিয়ে কপাটটা টেনে রাখে। রহিমুদ্দিন ফের তাকে বাড়িতে মিটিং ডাকার কথা বলে চলে যান।

দুলি ফিরে এসে বামকা মুখে বলে, শুনলে?

মামুন বলে, শুনলাম। আপনাকে নেতা না বানিয়ে ছাড়বে না। মন্দ কী! হয়ে পড়ুন নেতা। চালিয়ে যেতে পারলে এলাকায় ভোটে দাঁড়াবেন। জিতলে অনেক লাভ। আপনার পার্টি সবকার গড়লে, মন্ত্রীও হবেন। মুসলিম মেয়েদের অনেক স্কোপ। পুরো মন্ত্রী না হলেও হাফ মন্ত্রী ঠেকায় কে?

দুলির কপালে একটা রেখা আছে। মামুন ঠাট্টা করে বলত, সৌন্দর্যরেখা। এখন রেখাটা দেখতে দেখতে মনে হচ্ছে, ওটা বিষাদরেখা। মুখে বিষাদের ছায়া। দুলি বলেন, এবার আমি সত্যি বিপন্ন, মামুন।

কেন? এই তো সুযোগ।

দুলি জোরে মাথা নাড়েন। আমি ওদের কথা না শুনলে কী হবে বুঝতে পারছ?

পারছি। তাই তো বলছি...

থাম!

আচ্ছা থামলাম।

অনেকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকেন দুলি। মামুনও চুপচাপ সিগারেট টানতে থাকে। দাওয়ায় মাদুরে বসে আছে। উঠোনে পা। তারপর দুলি বলেন, তুমি কবে কলকাতা ফিরছ?

মামুন অন্যমনস্ক ছিল। চমকে ওঠে। ...কলকাতা?

হ্যাঁ। তোমাকে বলেছি না, কলকাতায় আমার একটা ব্যবস্থা করে দিও। দেবে?

মামুন চুপ করে থাকে।

কী? পারবে না? ...দুলি কয়েক পা এগিয়ে আসেন। ...বস্তি হোক, যেখানে হোক...আগে অন্তত একটা বাসা ঠিক করে দাও। গিয়ে মাথাটা গুঁজি অন্তত। কিছু টাকাকড়ি আছে ব্যাঙ্কে। যদ্দিন চাকরি না পাব, চালিয়ে নেব কষ্ট করে। ও মামুন, চুপ করে আছ কেন?

মামুন মুখ তোলে। বলে, মাথা ঠাণ্ডা রাখুন ভাবি। রহিমমাস্টার যা বলছে, শুনুন। তালে তাল মিলিয়ে চলাটা এমন কিছু কঠিন না। রাজনীতি-ফিতি আসলে তামাসা। জাস্ট একটা খেলা। হইহই করে খেলুন।

দুলির চোখ ফেটে জল আসে। ...রাজনীতি আর খেলা নয় মামুন। বাইরে ছিলে, বোঝ না কিছু। এখন রাজনীতি মানেই খুনোখুনি। আমার কিছু হলে লেনিন-মঞ্জুদের কে দেখবে?

আহা। আপনাকে কেউ খুন করবে না। মামুন শুকনো হাসে।

তুমি বুঝতে পারছ না? সামনের ভোটে এরা হেরে গেলে বরকত মিয়ারা পাওয়ারে আসবে তখন আমার অবস্থা কী হবে? দুলি চাপা গলায় ফের বলেন, তুমি অনেককাল ছিলে না। গ্রামাঞ্চলে এখন ভয়ানক অবস্থা। কথায়-কথায় খুনোখুনি, হাঙ্গামা, লুঠপাট। আইনকানুন আগে যদি বা একটু-আধটু ছিল, এখন তা একেবারে নেই। জোর যার, মুলুক তার চলছে। মানইজ্জত রেখে চলা কঠিন আজকাল। ও মামুন, আমাদের কলকাতায় একটা ব্যবস্থা করে দাও। লক্ষ্মী ভাই আমার।

মামুন কী ভেবেছিল দুলিকে দেখে। এখন টের পাচ্ছে, যা সাহস আর আত্মবিশ্বাস বলে মনে করেছিল, তা নেহাত সাজানো। স্বামীর হত্যাকাণ্ডের পর দুলির ভেতরটা ফাঁপা হয়ে গেছে।

কিন্তু মামুন কী করতে পারে? সেও তো অসহায়। সিগারেটটা পায়ের তলায় ঘষটে সে তাকায় দুলির দিকে। বলে, আপনাকে মিথ্যা বলেছি, ভাবী। আমি কলকাতায় থাকি না।

দুলি নড়ে ওঠেন। শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বলেন, থাক না?

না। আমি বাংলাদেশে ছিলাম। চট্টগ্রামে।

দুলি ঝুঁকে যান তার দিকে। ফিসফিস করে বলেন, চলে এলে কেন? ফিরে যাবে না আর?

মামুন মাথা দোলায়।

যাবে না? কেন? কী করে এসেছ সেখানে?

মামুন উঠে দাঁড়ায়। বলে ডুমুরকেও বলিনি কিছু। আমি জানি, ডুমুর খুব চাপা মেয়ে। ওর পেটে কথা থাকে। তবু বলিনি।

দুলি নিশ্বাস ফেলে বলেন, তাহলে আমাকে বা কেন বলবে? থাক। বললেও শুনব না?

রাগ করবেন না, ভাবী। আমি সত্যি বড্ড অসহায়।

কোথায় যাচ্ছ?

মামুন হাসে। ...অনেকক্ষণ তো বসলাম। যাই কোথাও। মাথাটা ধরে আছে।

দুলি সামনে দাঁড়িয়ে বলেন, চিরকাল এই করেই কাটাবে তুমি? এদেশে তাড়া খেয়ে ওদেশে। ওদেশে তাড়া খেয়ে ফের এদেশে। এবার কোন দেশে যাবে মামুন?

কোন দেশই যে আমাকে নিচ্ছে না, ভাবী। কী করব বলুন?

নিচ্ছে না সেটা তোমার নিজের দোষ।

তাই কি? মামুন স্থির দৃষ্টে সোজাসুজি তাকায় দুলির চোখের দিকে। ...নিজেরটা দেখে বলুন। আপনি নিজেই টের পাচ্ছেন, পায়ের তলার মাটিটা টলমল করছে। আপনিও পালাতে চাইছেন। অথচ এ আপনার নিজের দোষ নয়। আচ্ছা আসি।

শোন মামুন! কী?

দুলি আস্তে বলেন, চৌধুরিসায়েবকে বলব একটা কথা?

কী কথা?

যাতে তোমার এখানে নিশ্চিন্তে থাকা হয়। আর এমন করে বাউণ্ডুলে হয়ে বেড়িও না মামুন। বয়স তো বসে নেই। তারপর কি একদিন তোমার [illegible] মত...

হঠাৎ থেমে দুলি সুর বদলে বলেন আবার, বালাই ষাট! খোদা তা না করেন। মামুন, লক্ষ্মী ভাই ডুমুরকে তুমি বিয়ে কর। আমি ঠিকঠাক করে দিই সব। তোমার খুব ভাল হবে মামুন।

যাঃ! ননসেন্সের মত কথাবার্তা! বলে মামুন পাশ কাটিয়ে খিড়কির দরজাটা জোরে খুলে বেরিয়ে যায়। দুলি চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকেন।

বাঁশবন পেরিয়ে কাজিদের ভিটেয় পৌঁছে মামুন একবার ঘোরে। দুলিকে দেখতে পায় না, দরজার বাইরে সেদিন যেমন দেখেছিল। অথচ দেখার তীব্র আশা ছিল। হাঁটতে হাঁটতে তবু মনে হয়, দুলি পেছনে দাঁড়িয়ে আছেন। গাছপালার তলায় ছায়ার রঙ কালো হয়েছে। এখনই পোকামাকড় ডাকতে শুরু করেছে। মামুন আবার সিগারেট ধরায়। গেরোচনা গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে সিগারেট টানে।

একটু পরে তার চোখ পড়ে দাদাপীরের আস্তানার দিকে। একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে পায়। সোনামিয়া একটা কাঁঠালের পাতাভরা ডাল নিয়ে ক্রাচের সাহায্যে লেংচে আগাছার জঙ্গলে ঢুকছেন। একটা কালো ছাগল পাতা কামড়াতে কামড়াতে সঙ্গ ধরেছে। ঘুরে একবার করে দেখছেন সোনামিয়া। আবার এগিয়ে যাচ্ছেন। গাছের আড়ালে চলে গেলে মামুন দৃশ্যটার মানে খোঁজে। কিন্তু বুঝতে পারে না। খাদিম লুল্লু মিয়ার পাত্তা নেই। ঘরের দরজা বন্ধ।

মামুন ভিটে পেরিয়ে রাস্তায় ওঠে। বাঁদিকে ঘুরে হনহন করে এগিয়ে যায়। ডুমুরদের বাড়ির কাছাকাছি এলে দেখতে পায়, ডুমুর বাইরের ঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে এদিকে তাকিয়ে আছে।

মামুনকে দেখেই সে হাত নেড়ে ডাকে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও মামুন তার দিকে হেঁটে যায়। কাছাকাছি এলে ডুমুর বলে, কোথায় ছিলি? আয়। এক কাণ্ড হয়েছে।

মামুন বলে, আবার কী কাণ্ড হল?

আজাই তালাক দিয়েছে সন্ধির মেয়েকে। ডুমুর হাঁসফাঁস করে বলে। নাসিমমোল্লা এসে তালাকনামা দিয়ে গেল। ওর জিনিস-টিনিস কী ছিল, দিয়ে গেল। আয় ভেতরে আয়। কথা আছে।

মামুন তার পেছন-পেছন ভেতরে ঢুকে বলে, তালাকনামা লেখার সময় আমি ওখানে ছিলাম।

ডুমুর ফোঁস করে ঘোরে। ছিলি তুই।

যা বাবা! এমন করে বলছিস যেন আমি আটকাতে পারব।

ডুমুর শান্ত হয়। নিঃশ্বাস ফেলে বলে, আজাই সই করতে পারল! আমি যতবার ভাবছি কথাটা, ততবার, জানিস, ভারি অবাক লাগছে। এত সহজে যাতে দাঁড়ি পড়ে যায়, তার জন্যে দেশে আগুন জ্বলতে বসেছিল। রায়টের ভয়ে আমরা ঘুমতে পারতাম না। অথচ দেখ্ মামুন, ভেবে দেখ তুই। কত তুচ্ছ একটা সই।

মামুন বিরক্ত হয়ে বলে, তুই যে ফিলসফি আওড়ান শুরু করলি। কী কথা আছে বলে ডেকে আনলি মিছিমিছি।

তোর কী হয়েছে? অমন করে কথা বলছিস কেন? বলে ডুমুর নিঃসঙ্কোচে তার হাত ধেরে টেনে ভেতরের বারান্দায় যায়। তারপর হাতটা ছেড়ে দেয়। নিজের ঘরের পর্দা তুলে বলে, ভেতরে আয়।

নির্মলা ডুমুরের উঁচু খাটের বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে ছিল। ধুড়মুড় করে উঠে বসে। ঠোঁটের কোনায় এবং নাকে দু টুকরো ব্যান্ডেজ ছিল। খুলে ফেলেছে। ক্ষতরেখা শুকিয়ে লালচে ছোপ জমে আছে। ওষুধেরই। সে তার ছাঁটা চুলগুলো ঢাকে না। সিঁথির জায়গাটা পরিষ্কার। মুখে একটা নির্বিকার ভাব ঘন হয়ে আছে—অথবা ওটা তাচ্ছিল্য। চাপানো মুসলমানির আলখাল্লা কত সহজে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। মামুন টের পায়। সে আড়চোখে দেখে, নির্মলার কানে দুল নেই, হাতে বালাও নেই। গলায় কিছু ছিল নাকি, লক্ষ করেনি।

ডুমুর ড্রেসিং টেবিলের সামনে রাখা মোড়াটা টেনে বলে, বস এখানে। তারপর সে খাটের বাজুতে হেলান দিয়ে দাঁড়ায়। তার পায়ের কাছে দেয়াল ঘেঁষে একটা সুদৃশ্য লাল পলিথিনে মোড়া মাঝারি সাইজের স্যুটকেস। তার ওপর একটা লালরঙের ভ্যানিটি ব্যাগ পড়ে আছে। দুজোড়া মেয়েলি চটিও।

ডুমুর এগুলো দেখিয়ে বলে, মোল্লার হাতে পাঠিয়ে দিয়েছে। গয়নাগাঁটি দেয়নি। নির্মলা বলছে, গয়না ওরা কিনে দিয়েছিল। হাতে কানে গলায় যা পরা ছিল, সব খুলে মোল্লাকে দিয়েছে। হারামজাদা মোল্লাও এমন মানুষ দিল তো চুপচাপ হাত পেতে নিয়ে চলে গেল। ইচ্ছে হল বলি ওর দেন-মোহরের টাকা দিয়ে পাঠায় নি। তালাক সিদ্ধ হবে না যে।

বলে সে নির্মলার দিকে ঘোরে। ...আচ্ছা, তুমি যে অত শরিয়তি শিখেছ ওদের বাড়িতে—এটা জান না, বিয়েতে বউকে দেনমোহর লাগে? স্বামী নিজে থেকে তালাক দিলে দেনমোহর বাবদ টাকা ফেরত দিতে হয় বউকে।

নির্মলা বলে, ওসব বুঝি না।

মামুন, শুনছিস কথা? ডুমুর রাগ করে বলে। শুনতাম সন্ধির মেয়ে মহা চালাক-চতুর। দুনিয়া ঘুরে বেড়ায়। এদিকে দেখছি, কচি খুকি। গাল টিপলে দুধ বেরোচ্ছে। জিজ্ঞেস করছি। বিয়ের কাগজ হয়েছিল, না মুখে-মুখে কলমা পড়ে বিয়ে হয়েছিল? বলছে, জানি না। এ হতভাগি মেয়ের কী হবে গো! ডুমুর নিজের কপালে থাপ্পড় মারে।

মামুন বলে, আইনকানুন রাখ্ তো বাবা। উনি এখন কী করবেন, সেটাই প্রবলেম। বলে সে নির্মলার দিকে তাকায়। ফের বলে, যা হবার তা তো হয়ে গেল। এবার কী করবেন ভাবছেন?

ডুমুর ধমক দেয়। ওকে আপনি-টাপনি করিস নে তো। ন্যাকামি লাগে। তোর থেকে কমপক্ষে দশবছরের ছোট, জানিস?

বেশ। তাই হল। তুমিই বলছি। মামুন মেনে নেয়। ফের বলে, আর তো আজাইয়ের বউ নয়।

তুই হাসতে পারছিস! ডুমুর তেড়ে যায়। তুই কী রে মামুন!

আহা, হাসলাম কোথায়?

শোন। ওর কাছে একেবারে পয়সাকড়ি নেই। ব্যাগে নাকি কিছু টাকা ছিল বলছে। বের করে নিয়েছে সব। নিক। আমি কুড়িটা টাকা দিচ্ছি। আজ রাতে ট্রেনে ওকে মোতিহারিতে রেখে আয়। আমাদের এখানে দুতিনটে দিন না হয় রাখলাম। ভেবে দেখ, চিরকাল তো রাখতে পারব না ভাই। বরকত হারামি জুলুম করবে। তুই ওকে রেখে আয়, মামুন।

মামুন বলে, মোতিহারিতে, সে তো বিহারে।

হ্যাঁ। বলেছে, ওখানে ওর মেসো আছে। তারা এসব কিছু জানে-টানে না।

এক কাজ করা যায়। মামুন ভাবতে ভাবতে বলে। ধর্, কয়েকটা দিন এখানেই রাখলি। আমি ইতিমধ্যে আজাইয়ের সঙ্গে...

এ পর্যন্ত শুনে ডুমুর নিজের চওড়া কপালে ফের চটাস করে থাপ্পড় মেরে বলে, মামুন! মামুন! কী কথা রে তোর! ওম্মা! কথা শোন বুদ্ধু নাবালকের। তালাক দেওয়া বউ আবার নেবে কী রে? আরেকজন একে বিয়ে করে যদি স্বেচ্ছায় তালাক দেয়, তবে ফের আজাই নিতে পারবে। ফের বিয়ের কলমা পড়তে হবে আজাইকে। তবেই না!

মামুন হাসে। ...তুই একেবারে মেয়ে মৌলবি দেখছি!

হ্যাঁ। তাই নিয়ম। মোসলমানের ছেলে হয়ে এটুকুও জানিস নে?

বেলা পড়ে আঁধার ঢুকছে ঘরে। সুইচ টিপে আলো জ্বালে ডুমুর। বাইরে সুরেন ডাকাডাকি করছে। গরু নিয়ে এসেছে। ডুমুর বেরিয়ে যায়।

নির্মলা জানলার দিকে তাকিয়ে আছে। মামুন আস্তে বলে, লায়লা বলব, না নির্মলা?

যা খুশি আপনার।

মোতিহারিতে সত্যি কি মাসি আছে আপনার?

হ্যাঁ।

ওরা কিছু জানে না ধরে নিলেন কেমন করে?

সাত-আট বছর আর যোগাযোগ নেই। তাই মনে হচ্ছে, ওরা কিছু জানে না।

কী করেন আপনার মেসো?

হাসপাতালে সুইপার। নয়নসুখ জমাদার নাম।

আচ্ছা। ...মামুন চুপ করে থাকে। একটু পরে ফের বলে, একটা কথা বলি। প্লিজ, কিছু মনে করবেন না।

মনে করব কেন?

আজাইয়ের সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। বাবার চাপে পড়ে কাজটা করে ফেলেছে বেচারা। আমি ওর সঙ্গে কথা বলব?

কেন? নির্মলার গলার স্বরটা এবার চিড় খেয়েছে। আবার বলে, কেন?

যদি ওর সাহস থাকে, আপনাকে নিয়ে যাবে। বাড়িতে না ধরুন—বহরমপুরে নিয়ে গিয়ে রাখবে। ওর বন্ধুবান্ধব তো কম নেই। মামুন ব্যাখ্যা করার ভঙ্গিতে বলতে থাকে। দেখুন, জাত-ধর্ম এসব ঠুনকো জিনিসে আমার বিশ্বাস নেই। ওসব তালাক-টালাক-বিয়ে-ফিয়ে—ওসব আবর্জনা আজেবাজে মানুষদের জন্যে। একজন পুরুষ আর একজন মেয়ের মধ্যে যতদিন ভালবাসা থাকবে, ততদিন তারা একসঙ্গে থাকবে। সেটা তাদের ইচ্ছা। নিজেদের ব্যাপার। তো কথা হচ্ছে...

ডুমুরের মন পড়েছিল এ ঘরে। চৌধুরি সায়েব কাঠের মাঠের বাগান থেকে ফেরার পথে মসজিদে ঢুকেছেন। তাই এখনও ফেরেননি। সুরেন খবর দিয়েছে গরু গোয়ালে ঢুকিয়ে সে চলে গেছে। ডুমুরের কাল থেকে নামাজ পড়া হচ্ছে না। এই ঝামেলা না ফুরুলে মন বসছে না খোদার কাছে। সে অস্থির।

ঘরে ঢুকতে ঢুকতে মামুনের কথাবার্তা অনেকটা কানে গেছে। ঝাঁঝাল গলায় বলে, কী ফুসমন্তর দিচ্ছিস ওকে? নিজে লেজকাটা শেয়াল কি না, অন্যদের লেজ কাটতে বলছিস।

নির্মলা বলে, না ডুমুরদি। উনি ঠিক কথাই বলছেন।

ডুমুর হেসে ফেলে। ...আপা বলা বাদ? এখন ডুমুরদি! সেও ভাল।

নির্মলা বিব্রতমুখে বলে, বেরিয়ে গেছে মুখ ফসকে।

ডুমুর হঠাৎ গম্ভীর হয়। ...মুখ ফসকানই ঠিক, নির্মলা। আমিও তোমাকে কখন থেকে হঠাৎ-হঠাৎ নির্মলা বলে ফেলছি। দেখ, মাসির বাড়িতে ভুল করে মুসলমানি বুলি বলে ফেল না!

সে ঘড়ি দেখে। ফের বলে, সাতটা বাজে প্রায়। ট্রেন সাড়ে বারোটায়। মোতিহারিতে ভোর হয়ে যাবে। আচ্ছা মামুন ধর, হঠাৎ পথে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে তোমরা কারা—কী বলবি?

মামুন বলে, যা হয় বলব'খন। চা খাওয়া তো! এতক্ষণ বাজারে থাকলে কাপ তিনেক হয়ে যেত।

বলবি, ছোট বোনকে নিয়ে মাসির বাড়ি যাচ্ছি।

মামুন হাসে। ...চেহারায় আকাশপাতাল তফাত। কেউ বিশ্বাস করবে না।

করবে। ...জোরে কথাটা বলে ডুমুর বেরিয়ে যায়। বাইরে থেকে ফের বলে, বারান্দায় আয় না তোরা। কথা বলি।...

চা খেয়ে বাইরে বেরিয়ে মামুন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। ডুমুরের এ এক চেহারা বেরিয়ে পড়েছে আজ। মামুন মনে মনে বলে, বাপ্‌স! দাদিবুড়ি যেন। চব্বিশ ঘণ্টা ধরে ফিলজফি আওড়াচ্ছে। কান ঝালাপালা একেবারে। এজন্যেই ওকে বিয়ের কথা ভাবা যায় না।

আনমনে মামুন এগিয়ে যায় বরকতের বাড়ির দিকে। কোথায় সেই মোতিহারি—রাত জেগে একটা মেয়ের সঙ্গে ছোট! তার চেয়ে আজাই যদি রাজি হয়ে যায়, ঝামেলা থেকে বাঁচা যাবে। বরকত একমনে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছেন মামুনকে! বেহায়া হওয়া যাক না একটু। আজাই নিশ্চয়ই পেছনের মহলে নিজের ঘরে বউয়ের শোকে কাতরাচ্ছে। অনেক আশা নিয়ে মামুন হাঁটে। দাদাপীরের আস্তানার পাশ দিয়ে খোয়াঢাকা রাস্তাটা এগিয়েছে। কাঠের খুঁটিতে কিছুদূর অন্তর বাল্‌ব জ্বলছে। এদিকটায় ঘরবাড়ি বিশেষ নেই। আমকাঁঠালের বাগান। আগাছার জঙ্গল। আস্তানায় পীরের সম্মানে একটা বাল্‌ব জ্বলছে। সেই সুযোগে ভাঙাচোরা ঘরটাতে খাদিম লুল্লু মিয়া ইলেকট্রিক আলো পেয়ে গেছে। ভ্যাপসা গরম সারাদিন। সন্ধ্যা থেকে আজ হাওয়া বন্ধ। একটু দূর থেকে লুল্লু মিয়ার চেঁচামেচি শুনে মামুন দাঁড়ায়। পাগলের মত হাত পা ছুঁড়ে কাকে গালি দিচ্ছে সে। জটাগুলো ভীষণ নড়ছে। মুখের চেহারা রাক্ষসের মত ভয়ঙ্কর।

মামুন কাছাকাছি গিয়ে শোনে লুল্লু মিয়া বুক চাপড়ে কাঁদতে কাঁদতে অভিশাপ দিচ্ছে। পীরের খাসি যে হারামি খাবে, মুখে লৌহু উঠে মরবে। তামাম নবাবগঞ্জ লৌহতে ভেসে যাবে। ও হো হো! বাবা গো! আমার কলজে যদি চাইত, দিতাম গো!

নির্জন মাজারে তার বুকফাটা কান্না শোনার লোক কেউ নেই। মামুনের বুক ধড়াস করে ওঠে। সন্ধ্যার আগে সোনামিয়া তাহলে লুল্লুর খাসিটা চুরি করে নিয়ে যাচ্ছিলেন? অবাক হয়ে যায় মামুন। সেই সুপুরুষ শান্ত অমায়িক ভদ্র মানুষটি ছাদে দাঁড়িয়ে হাততালি দিয়ে পায়রা ওড়াতেন! এখন বগলে ক্রাচ নিয়ে কষ্টে হাঁটেন। লুল্লুর খাসি তিনিই চুরি করেছিলেন, অবিশ্বাস্য লাগে। কী দরকার ছিল চুরি করার? মামুন তো যখনই চেয়েছেন, কিছু-না-কিছু টাকা দিয়েছে!

রাগে দুঃখে মামুন কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। লুল্লু মিয়া হয়ত ভাবতেও পারছেন যে তার খাসিটা চুরি করেছে সোনামিয়ার মত মানুষ—ক্রাচ ছাড়া হাঁটতেও পারেন না যিনি। জানতে পারলে লোকেরা হয়ত পিটিয়ে মেরেই ফেলবে সোনামিয়াকে।

মামুন আর দাঁড়ায় না সেখানে। হনহন করে এগিয়ে যায় বাড়ির দিকে।

গেট এখনও বন্ধ হয়নি। লনের ওধারে উঁচু বারান্দায় কয়েকজন মোসাহেব আড্ডা দিচ্ছে। ডাইনে ঘুরে মামুন বাড়ির পেছনে চলে যায়। আজাইয়ের ঘর ওপরে-নিচে অন্ধকার। দরজায় কলিং বেল আছে। মরিয়া হয়ে মামুন বোতাম টেপে। বারবার টেপে।

কতক্ষণ পরে ভেতরে চলাফেরার শব্দ হয়। এ ঘরে আলো জ্বলে ওঠে। তারপর দরজা খুলে যায়। অচেনা এক বুড়ি মুখ বের করে বলে, কি গো? সদরে যাও না বাপু। দেখতে পাচ্ছ না ছোট মিয়া নেই? থাকলে ঘর আঁধার থাকে কখনও?

মামুন বলে, কোথাও গেছে আজাই?

তা বলে যায় কখনও? ভটভটে নিয়ে দুপুরবেলা বেরিয়ে গেছে। কে বটে বাবা আপনি?

তোমাদের ছোটমিয়ার বন্ধু। আচ্ছা, চলি।

ঝিবুড়ি দরজা আটকাতে আটকাতে বলে, দুনিয়াসুদ্ধু ছোটমিয়ার বন্ধু। ওই বন্ধুতেই বুকে ছুরি মারবে।

মামুন ঘুরে দাঁড়িয়েছিল। দরজা বন্ধ হয়ে গেল। আলোটা নিভে গেল। 'বন্ধুতেই ছুরি মারবে' কথাটার মানে কী? এরা কী ভেবেছে আজাইয়ের সঙ্গে লায়লার ছাড়াছাড়ির ব্যাপারে তার কোন ভূমিকা আছে?

গেটের কাছে পৌঁছলে পেছনে কেউ বলে, কে যাচ্ছে গো?

যাবার সময় দেখতে পায় নি ব্যাটাছেলেরা। এমন চোখ পড়েছে। মামুন ঘুরে বলে, আমি মামুন।

মিঠে গলায় মোসাহেবটি বলে, কাজিসায়েবের ছেলে? অ। আজাইকে খুঁজছিলেন বুঝি? সে তো বহরমপুরে গেছে। ওর এখন মাথার ঠিক নেই।

মামুন চলে আসে। পেছনে মোসাহেবরা হাসাহাসি করছে। মামুনকে নিয়ে নয়, আজাইকে নিয়ে। বোঝা যায়, বরকত ধারেকাছে নেই। হতভাগা আজাইটা বরাবর লোকের হাসিতামাসার পাত্র হয়ে রইল। নিজে যদি টের পেত সে একালের এক মফস্বলী ভাঁড়। ওর জন্যেও মামুনের করুণা হয়।

হঠাৎ রাস্তার আলো নিভে গেল। মামুন দাঁড়িয়ে পড়ে। এও ভাঁড়ামি। অন্ধকারে নবাবগঞ্জের পুরনো ভূতেরা চারপাশে ফিকফিক করে হাসছে। আবার খুব ভেতরে একটা ধাক্কা খায় মামুন। কোথায় এসেছে সে? কেন এসেছে? সময়ের উল্টোদিকে মনকে ছুটিয়ে দিয়ে যত ক্লান্তি তত কষ্ট। অথচ চারপাশ থেকে ভুতুড়ে গলায় ফিসফিস করে কথা বলে তার ছোটবেলা। পুরনো বাসস্থান থেকে বারবার কেউ তার নাম ধরে ডাকে। একলা হলেই এসব উপদ্রব ঘটতে থাকে।

অন্ধকারে দাঁড়িয়ে অদ্ভুত সব অনুভূতি তারপর সব আচ্ছন্নতা কেটে যায়। মনে পড়ে, দুপুর রাতে ট্রেনে সন্ধির মেয়েকে নিয়ে যেতে হবে। কেন? একা যেতে পারে না। নিশ্চয় পারে। ডুমুরটার বড় আদিখ্যেতা। ঝামেলায় ফেলে দিলে দেখছি। মামুন বিরক্ত হয়ে সিগারেট ধরায়। একটু পরে তার মাথায় একটা প্ল্যান আসে। সন্ধি দিয়াড়ির কাছে গিয়ে সব কথা বলবে কী?

সে হন্তদন্ত হাঁটতে থাকে কুলবেড়ের দিকে। মল্লিকদের ইটভাটার পাশ দিয়ে এগিয়ে কাঁচা রাস্তায় পড়ে। দুধারে নিশিন্দাঝোপ কালো হয়ে ঘিরেছে রাস্তাটাকে। কিছুদূরে ফাঁকা মাঠ। রাস্তাটা রেললাইন বেরিয়ে যাবার মুখে ডাইনে আলপথে সে ঘোরে। শিরিসতলায় ঢোলক বাজছে। দিয়াড়িদের রাতের আসর বসেছে। ভেসে আসছে কুকুরের চেঁচামেচি। ডিসট্যান্ট-সিগন্যালে আলো নীল হয়েছে। মামুন দোনামোনা হয়ে হাঁটে। ভারুয়াকে আগে ডেকে সব কথা বললে কেমন হয়?

হয়ত এখন নেশার ঘোরে আছে ভারুয়া। দিয়াড়িদের মন বোঝা সহজ নয়। শুধু নির্মলাই এক দলছাড়া প্রাণীর মত অন্য রকম। ছোটবেলায় মামুন দেখেছে, পোষা শালিকপাখি বুনো শালিকপাখিদের কাছে গেলেই ওরা তাকে চারদিক থেকে ঠুকরে মেরে ফেলে। সন্ধি দিয়াড়ি উঠোনে খাটিয়া পেতে শুয়েছিল। মামুন ডাকলে সে বাঘ দেখে চমকে ওঠা গরুর মত নড়েচড়ে বসে। ভয় পাওয়া গলায় বলে, কৌন বা?

মামুন ওর খাটিয়াতেই বসে পড়ে। বলে, আমি মামুন সন্ধিকাকা।

হুঁঃ। মামনবাবু?

হ্যাঁ। আমি মামুন। মামুন চাপা গলায় বলে। সন্ধিকাকা, তোমার মেয়েকে আজাই ছাড় দিয়েছে আজ। শুনেছ?

সন্ধি ঘড়ঘড় করে বলে, শুনা। বিকালে টিশনে গেলাম। তো শুনলাম।

তোমার মেয়ে মোজাই চৌধুরিদের বাড়িতে আছে। তাকে নিয়ে এস!

মামুন অন্ধকারে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে সন্ধি। তারপর বলে, কাহে? কেন?

বারে। তোমার মেয়ে যাবে কোথায়?

সে কথা হামি কেমন করে বলব বাবু? উ ঘর ছোড়ে ভেগেছে। জাত ভি ছোড়েছে। সন্ধি নির্বিকার গলায় বলে। হামার কুছু নাই বাবু। সাফ কথা। হামি ওকে ঘরে লিলে ফির ভি হামাকে মারবে। তো হাম টিশনে চলে গিয়ে দুকান দিব। বেটিকে লিতে পারব নাই।

চুপ করে মুখটা আকাশের দিকে তুলে রাখে সন্ধি। মামুন বলে, একটা কথা বলছি সন্ধিকাকা। তুমি মেয়েকে নিয়ে বরং মোতিহারিতে রেখে এস।

সন্ধি জোরে মাথাটা দোলায়।

তোমার নিজের মেয়ে, সন্ধিকাকা!

হামার সাফকথা, বাবু। সন্ধি গোঁ ধরে বলে।

বেশ তো! স্টেশনে দোকান করবে বলছ। সেখানেই মেয়েকে নিয়ে থাকবে। তাহলে এরা কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

সন্ধির মুখটা অন্ধকারেও টের পাওয়া যায়, কী ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে। সে ভয়ঙ্কর গলায় বলে, হাঁ। আমি ওকে লিয়ে থাকব আর হামার দুকানঠো হবে খানকি বেউশ্যার ঘর। তামাম হারামি হল্লাবাজি করবে। মারদাঙ্গা হবে। রেপোর্ট ভেজবে টিশানবাবুরা। তুমি যাও মামোনবাবু। হামার নিদ পাচ্ছে।

সে শুয়ে পড়ে। মামুনের গায়ে পা লাগে। মামুন উঠে দাঁড়ায়। আরেকবার কথা বলবে ভাবে। কিন্তু সন্ধি পাথরের মত শক্ত হয়ে আছে টের পায়।

শিরিসতলায় এ রাতে ঢোলকটা তুমুল বাজছে। দিয়াড়িরা জেনে গেছে, বরকতের লোকেরা আর ঝামেলা করতে আসবে না। নিশ্চিন্ত হতে পেরে আনন্দটা বেড়ে গেছে। তাড়ির নেশায় চুর হয়ে অনেকে এখনই শুকনো মাটিতে গড়িয়ে পড়েছে। স্খলিত স্বরে গান গাইছে একটা লোক। দোহারদের তাল কেটে যাচ্ছে। তবু আসর ভাঙবে না।

কাঁচা রাস্তায় পৌঁছে মামুনের ইচ্ছে করে, ডুমুর মেয়েটাকে নিয়ে যা খুশি করুক—সে চলে যাবে নদীর ধারে খামরুবুড়োর কাছে। রাতটা কাটাবে গাবতলায় মাচানে শুয়ে। এত যদি মাথাব্যথা ডুমুরের তাহলে সে নিজেই মোতিহারি গিয়ে রেখে আসুক না নির্মলাকে। না হয় বাবাকে পাঠিয়ে দিক। খামকা মামুনের ঘাড়ে ঝামেলা কেন?

তারপর ভাবে, এই এক মুশকিল—অন্তত ডুমুরের কাছে ছোট হয়ে যেতে অথবা স্বার্থপর হয়ে উঠতে সে পারবে না। কোনদিন পারে নি। ডুমুর তাকে ভালবাসে, মামুন বুঝতে পারে। মামুন তাকে ভালবাসল কি না, তা নিয়ে ডুমুরের মাথাব্যথা নেই যেন। তাই ডুমুরকে কষ্ট দিলেও শেষে নিজের বুকে কষ্ট এসে বাজে। সেদিন ডুমুর একটু সেজেছিল। তারপর মামুনের বোকামিতে সাজটুকু ঘষে মুছে দিল। পরে মামুনের মনে কষ্ট হয়েছিল। কিন্তু ও যা জেদি মেয়ে।

অথচ প্রতারণা করতে পারে না, ডুমুরের সঙ্গে। ডুমুরকে ভাল না বাসতে পারলেও তাকে নিষ্ঠুর হয়ে আঘাত দেওয়া সম্ভব নয় তার পক্ষে।

সে মনে-মনে ডুমুরের উদ্দেশে বলে, ডুমুর। তোর জন্যে মোতিহারি কেন, উত্তর মেরুই না হয় যেতে রাজি। কিন্তু দোহাই তোর আমার আশা করিস নে।

সোনামিয়া কাল থেকে মাথায় একটা পায়রার খাঁচা ঢুকিয়ে ফেলেছেন। মামুনের কাছে দশটা টাকা চাইলেই পাওয়া যাবে ভাবতে পারেননি। টাকাটা পেয়ে ঝোঁকের মাথায় গেছেন কিংকর ছুতোরের বাড়ি। কিংকর একসময় তাঁর পায়রার খাঁচা বানিয়ে দিত। এখন বুড়ো হয়ে গেছে তাঁর মত ছেলেরাই কপাট-জানলার কাজ করে। একটা ফার্নিচার স্টোর খুলেছে নিজেরা। পায়রার খাঁচা তৈরি তাদের পোষায় না। কিন্তু কিংকর ব্যথা বোঝে সোনামিয়ার। সে নিজেই দায়িত্বটা নিয়েছে। বাড়ির রোয়াকে বসে খুটখাট হাতুড়ি ঠুকে পেরেক মেরে খুব জাঁকজমকের সঙ্গে খাঁচা বানাতে মন দিয়েছে কিংকর। বাতিল টুকরো-টাকরা কাঠ খুঁজে এনেছে ছেলেদের কাছ থেকে। জোড়াতাড়া দিচ্ছে। সোনামিয়া কাল থেকে গিয়ে দেখে আসছেন। বসে থাকছেন কতক্ষণ। পাঁচটা টাকা পেয়ে কিংকরও ভারি খুশি। এবয়সে সে সংসারের আবর্জনা। গতর খাটিয়ে এখন পাঁচটা টাকা রোজগার করায় তার খুব আনন্দ। খাটিয়ে মানুষদের এই স্বভাব।

আগামিকাল ফের হাটবার। হাটে কোন-কোন দিন পায়রা বেচতে আসে অনেকে। পেটের জ্বালা বড় জ্বালা। সোনামিয়াও পেটের জ্বালায় একটা-একটা করে সব প্রিয় পায়রাকে বেচে দিয়েছিলেন। চোখের জলে টাকা ভিজে যেত।

কিন্তু খাঁচা তো ঝোঁকের মাথায় বানাতে দিলেন, রাখবেন কোথা? কিংকরের সামনে বসে থাকতে থাকতে একটা ঘর খুঁজে ছটফট করছিলেন। সেই সময় মনে পড়েছিল দিদারুলের বউয়ের কথা। ওদের ছোট্ট দলিজঘরটা খালি পড়ে থাকে দেখেছেন। বললে মাথা গোঁজার ঠাঁইটা যদি দেয়, পায়রার খাঁচাও রাখতে পারেন। কাজেই সদরু হাজির বাঁশবন আছে। হাজি দয়ালু লোক। চাইলে একটা বাঁশও দেবেন না কি?

দিদারুলের বউয়ের কাছে গিয়ে বলতেই রাজি হয়ে গেছে। মেয়েটা বড় ভাল। তাছাড়া সারাটা দিন স্কুলে থাকে। ছেলে-মেয়ে দুটোও স্কুলে পড়ে। বাড়ি পাহারা দেবার লোক পাওয়া তো ভালই। রাতবিরেতেও খানিকটা নিশ্চিন্ত। খোঁড়া হলেও মানুষ এবং চেঁচাবার ক্ষমতা আছে। কাল রাতটা ও ঘরে আরামে কেটেছে সোনামিয়ার। দুলি একটা কাঁথা দিয়েছে তাঁকে। রাতে একমুঠো খেতেও দিয়েছে।

সোনামিয়া অস্থির। খাঁচাটা হয়ে গেলে হাটবারে একজোড়া পায়রা কিনে ফেলবেন। তিন টাকার বেশি নেবে না। দুদিন ধরে বরকত খেতে দিচ্ছেন। বাকি পাঁচটা টাকা খরচ হয়নি। রিকশা করে খাঁচা নিয়ে দিদারুলের বাড়ি হাজির হবেন। সারারাত এই চিন্তা সোনামিয়ার মাথায়। সারারাত পায়রার ডানার শব্দ। দুটো বোকা-সোকা পায়রা ক্রমশ কীভাবে ঝাঁকে-ঝাঁকে বাড়তে থাকলে সোনামিয়ার মনে লোভ জেগেছে। মনে পড়ে গেছে লুল্লু মিয়ার খাসির কথা। কুলবেড়ের মটরু দিয়াড়ির ছাগল চোর বলে বদনাম আছে। চুরি করে কোথায় গিয়ে বেচে আসে। কতবার মারধর খেয়েছে। মটরু রোজ নবাবগঞ্জের বাজারে খেজুরপাতা বেচতে আসে। তালাই করার জন্যে চাষাভূষো মানুষরা কিনে নেয়। সোনামিয়ার কথা শুনে তার বয়রা বেড়ালচোখে ঝিলিক উঠেছে। গোঁফের ডগা তিরতির করে কেঁপেছে।

মটরু পঞ্চাশ টাকা দাম ধার্য করেছে খাসিটার। পঁচিশ টাকার বেশি দেব না মিয়াসাহেবকে। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে দেবে কোত্থেকে? বেচে এসে দেবে। সে-বিশ্বাস রাখতে হবে মটরুর ওপর।

সোনামিয়া তাতেই রাজি। পঁচিশটাকায় ঘর ভরে যাবে ঝাঁকে-ঝাঁকে পায়রায়। পত পত করে উড়ে গিয়ে চক্কর মারবে খোদাতালার বিশাল আসমানে।

পীরের দীঘির দক্ষিণ-পূর্ব কোণে বাঘনখা গাছটার তলায় মটরু সন্ধ্যাবেলা আসবে। ওদিকে মল্লিকদের পোড়ো ইটভাটা। জলা আর জঙ্গল। তার পেছনে রেলের নয়ানজুলি। খাসিটা কাঁঠালপাতা খেতে খেতে বাঘনখা গাছ অব্দি আসতেই সোনামিয়া বসে পড়েছেন। তারপর খপ করে গলায় দড়ি আটকে দিয়েছেন। খাসিটার গ্রাহ্য নেই। কচমচ করে পাতা চিবুচ্ছে। বেলা পড়ে গেছে। অন্ধকার এগিয়ে এসে ঘিরে ধরেছে দুটি প্রাণীকে। পাতা শেষ হয়ে গেলে এবার খাসিটা ছটফট করছে। মাঝে মাঝে চেঁচিয়ে উঠছে। মুখ চেপে ধরতে গেলে লাফ দিচ্ছে। আর ওকে সামলানো যাচ্ছে না।

কিন্তু মটরু কোথায়? সন্ধ্যা ঘন হল। পোকামাকড় ডাকতে থাকল। মটরুর পাত্তা নেই। নাকি সে পীরের খাসি বলে ভয় পেয়ে পিছিয়ে গেল? এদিকে খাসিটা লাফালাফি শুরু করেছে। প্রচণ্ড চেঁচিয়ে উঠছে থেকে-থেকে। ছাগলি হলে কানে তালা ধরান ডাক ডাকত। খাসি বলে গলার স্বরটা চাপা।

অস্থির সোনামিয়া উঠে দাঁড়ান। মনে মনে অশ্লীল গাল দেন মটরুকে। লুল্লু মিয়ার খাসি অন্ধকারে এদিক-ওদিক লাফ দিয়ে ছুটতে চায়। সোনামিয়া কী করবেন ভেবে পান না। খাসিটাকে কি তাহলে ছেড়ে দিতে হবে? হঠাৎ মনে পড়ে যায়, নয়ানজুলির ওপারে রেলইয়ার্ডের শেষ দিকটায় অনেকদিনের একটা কামরা দাঁড় করান আছে। মাল গাড়ির কামরা। লাইন তুলে পাশে কাত করে রেখেছিল রেলের লোকে। গ্যাং-ম্যানরা তার ভেতর বসে গাঁজা-তাড়ি খেত। ক্রমশ মরচে ধরে ভেঙে পড়ার দাখিল হয়েছে। গা ঘেঁষে জঙ্গল গজিয়েছে। ভেতরেও ঘাসের বন।

এমন সময়ে অসম্ভব সম্ভব করার নেশা পেয়ে বসে মানুষকে। মরিয়া হয়ে ওঠেন সোনামিয়া। খাসিটা ওখানে ভেতরে ঢুকিয়ে বেঁধে রাখবেন। রেল লাইনের ধারে-ধারে হেঁটে কুলবেড়ে যাবেন। হারামি মটরুকে পাকড়াও করবেন। লুল্লুর খাসির বিহিত না করলে সব্বাইকে বলে দেবেন। মটরুই লুল্লুর খাসি চুরি করে লুকিয়ে রেখেছে মালগাড়ির কামরায়।

দড়িটা গাছের গোড়া থেকে খুলে খাসিটাকে টানতে টানতে নিয়ে চলেন নয়ানজুলির দিকে। গোঁ ধরে দাঁড়ালে ক্রাচ তুলে খট করে ঘা মারেন। খাসিটা আর্তনাদ করে ওঠে। অন্ধকারে কতবার আছাড়া খান। খোঁড়া পায়ে ব্যথা কটকট করে ওঠে। নয়ানজুলিতে রেলের বেড়া গলিয়ে দিয়ে হ্যাঁচকা টান মারেন। আবার গেঙিয়ে ওঠে হতভাগ্য জীবটি। অমানুষিক হিংস্রতায় সোনামিয়া হাঁচড়ে পাঁচড়ে করে উঁচু রেললাইনে ওঠেন। ওপরে বসে দড়ি টানেন দুহাতে। খাসিটা শুয়ে পড়েছে। জিভ বেরিয়ে গেছে। গেঙাচ্ছে। পাথরের মত মাটিতে পড়ে যাওয়া অসহায় খাসিটাকে হেঁচড়ে ওপরে তোলেন। রেলইয়ার্ডের এদিকটায় খাবলা-খাবলা আলো পড়েছে। সব দেখা যাচ্ছে। ওপরে এসে খাসিটা চার ঠ্যাংয়ে দাঁড়িয়ে যায়। সোনামিয়া উঠে ক্রাচ দুটো বগলে ঢুকিয়ে লাইনে ওঠেন।

মাঝামাঝি পৌঁছেছেন, হঠাৎ দড়িটা পট করে ছিঁড়ে লুল্লু মিয়ার খাসি দৌড়ে পালায়। হাঁফাতে হাঁফাতে খটখট বিকট শব্দ তুলে সোনামিয়া দৌড়ে তাকে ধরার চেষ্টা করেন। একটা ক্রাচ স্লিপারের ফাঁকে আটকে আছাড় খান। সেই সময় পেছনে ডিসট্যান্ট-সিগন্যালের কাছে ট্রেন ধনুকবাঁকা হয়েছে।

পা দুমড়ে প্রচণ্ড চোট লেগেছে। যন্ত্রণায় ককিয়ে ওঠেন সোনামিয়া। পেছনে ইঞ্জিনের চেরাগলার তীক্ষ্ণ শিস। ঘুরেই দেখতে পান জোরাল আলোর মধ্যে ধরা পড়ে গেছেন। লাইনে শব্দ হচ্ছে। কাঁপছে। আবার হুইসল ছুটে এসে কানে বেঁধে। উজ্জ্বল আলোয় হাজার পায়রা ওড়ে—তাদের ডানার শব্দ হতে থাকে। হাঁটু ভর করে পায়রাগুলো ধরার জন্যে শূন্যে হাত বাড়ান। ক্রাচের কথা মনে পড়ে না। লুল্লু মিয়ার খাসিটা হারিয়ে গেছে কোথায়। চারদিকে পায়রা। ঝাঁকে ঝাঁকে সাদা পায়রা। ডানার শব্দ বাড়তে বাড়তে কানে তালা ধরে যায়। দুহাত তুলে আবার ওঠার চেষ্টা করেন। সোনামিয়া। পায়রাগুলো আগুনের রঙ ধরে। দুটো সাদা শীর্ণ হাত সেই আগুন পায়রার ডানা ছুঁয়ে-ছুঁয়ে নড়ে-চড়ে।

কামরূপ এক্সপ্রেস স্টেশনের কাছাকাছি গিয়ে থেমেছে। কুলবেড়ের শিরিসতলায় তখন ঢোলকের তালে তালে মাতাল মটরু নাচছে। ঝোঁকের মাথায় কথাটা বলেছিল বলেই তত বোকা নয় মটরু। পীরের খাসিচুরি দৈবাৎ জানাজানি হলে নবাবগঞ্জে আর ঢোকা যাবে না। গাঁ ছেড়ে পালাতে হবে।

ক্যাঃ নাম বোলা।

নইনসুখ।

এ লোকটাও জোরে মাথা নাড়ে। মোতিহারি হাসপাতালের আনাচে-কানাচে এমনি করে নির্মলার মেসোর নামে প্রত্যেকটি মাথা নড়ে যায় এবং চোখগুলো দুজনের মাথা থেকে পা, পা থেকে মাথা অব্দি দৃষ্টি ফুঁড়ে টুঁড়ে বের করতে চায় রহস্যর মূল সূত্র। ঝোপড়ির সারি থেকে গুহামানুষদের মত ওরা বেরিয়ে আসে। জেরা করতে থাকে, নৈনসুখ বা নয়নসুখ যেই হোক, তাকে এদের কী দরকার। মামুন বিব্রত হয়ে কেটে পড়তে চায়। নির্মলা হঠাৎ যদি এদের ভাষায় কথা বলতে শুরু করে, না জানি কী অঘটন ঘটে যাবে বলে তার ভয় হয়। কিন্তু নির্মলা সেটুকু বোঝে বলেই হয়ত বাংলা বুলি বলছে।

নয়নসুখের বউয়ের নাম ছিল ধরতি—নিশ্চয় কথাটা ধরিত্রী। ধরতিয়া জমাদারনির কথা জিজ্ঞেস করলে কয়েকটি মেয়ে একগলায় কলকলিয়ে ওঠে অবশেষে। হ্যাঁ, হাঁ। ধরতিয়াকে তারা চেনে। ধরতিয়া তার ছেলেদের কাছে আছে শুনেছে। সাহেবগঞ্জে, নাকি মোকামাঘাটে সঠিক জানে না কেউ। ধরতিয়া জমাদারনি বুড়ি হয়ে গিয়েছিল। ছেলেরা এসে তাকে নিয়ে যায়। সে তিন-চার সাল আগের কথা। অত মনে নেই কারুর।

মামুন নির্মলাকে বলে, চলুন। ওদের অফিসে জিজ্ঞেস করা যাক্।

নির্মলা তাকায়। আস্তে বলে, থাক্।

একটু তফাতে অ্যাম্বুলেন্সের গায়ে ঠেস দিয়ে খাকি উর্দি পরা একটা গুঁফো লোক সিগারেট টানছিল। সে ভিড় দেখে এগিয়ে আসে। তার আসার ভঙ্গি দেখে মামুনের অস্বস্তি হয়। সে দ্রুত বলে ওঠে, রাম রাম ভেইয়া! শুনিয়ে তো প্লিজ!

লোকটা ড্রাইভার। থমকে দাঁড়িয়ে জবাব দেয়, রাম রাম বাবুসাব। কাঁহাসে আতা আপলোক? হুয়া ক্যা?

জবাব ভিড় হইচই করে দেয়। বাঙালসে আয়া ইনলোক। নবাবগঞ্জ থেকে। ধরতিয়া জমাদারনির খবর পুছ করছে।

লোকটা ভুরু কুঁচকে মামুন ও নির্মলাকে দেখতে দেখতে বলে, হাঁ। নৈনসুখকা বহু ধরতিয়া। নৈনসুখ পাঁচ-ছ সাল আগে মারা যায়। তার ছেলেরা বহত চোট্টা ছিল। এক ছেলে তো এখনও জেল খাটছে। এক ছেলে সাহেবগঞ্জে না কোথায় চলে গিয়েছিল। ধরতিয়ার চাকরির মেয়াদ খতম হলে সে তার কাছে চলে গেছে। আরও গোটাকতক ছেলে-মেয়ে ছিল ওদের। তারা কোথায় থাকে জানা নেই। এখানে মোতিহারিতেও থাকতে পারে। তো ধরতিয়া বুড়ির কাছে কী দরকার?

নির্মলা ঠোঁট ফাঁক করেছিল। কিছু বলার আগে মামুন ভাঙাচোরা হিন্দিতে ঝটপট বলে, ধরতিয়ার এক বোন থাকে নবাবগঞ্জে। সেই বোনের ছেলে আমাদের বাড়ি কাজ করত। গয়নাগাঁটি চুরি করে পালিয়েছে। শুনেছি এখানে ওর মাসি থাকে। তাই ভেবেছিলাম...

কথা কেড়ে ড্রাইভার হা হা করে হাসে। ভিড়ও হাসে। ড্রাইভার দার্শনিকের গলায় সুর ধরে বলে, একহি পেড়োকা ডাল বাবু! নৈনসুখভি বহত হারামি ছিল। ধরতিয়াভি। তো পুলিশ কো বলিয়ে।

নির্মলা গলার ভেতর বলে, চল।

চলুন বলে না বলেই মামুন একটু চমক খায়। অবশ্য এদের সামনে আপনি—আজ্ঞেটা হয়ত সন্দেহ ছড়াবে। নির্মলা বুদ্ধি খাটিয়েই চল বলেছে। গেটের বাইরে অশথগাছের তলায় দাঁড়িয়ে সে বলে, তাহলে?

নির্মলা একটু চুপ করে থাকার পর বলে, স্টেশনে ফিরে যাই চলুন।

মামুন হাসে। দু মিনিট আগে চল বললেন, শুনে খুব আনন্দ হচ্ছিল।

আমাকে আর আপনি-টাপনি করবেন না তো! কই, স্যুটকেসটা দিন এবার। থাক্। বেশ ভারি আছে। রিকশ ডাকি।

সাইকেল রিকশয় উঠে মামুন বলে, সাড়ে দশটা বাজে প্রায়। নবাবগঞ্জে ফেরার ট্রেন ফের সেই দুটোয়। স্টেশনের কাছাকাছি নিশ্চয় হোটেল আছে। খেয়ে নেওয়া যাবে।

নির্মলা কোন কথা বলে না। সামনে হাওয়া। রিকশওয়ালা সিট থেকে পাছা তুলে কুঁজো হয়ে প্যাডেলে চাপ দিচ্ছে। দুধারে বাজারে ভিড়। অসংখ্য টাঙ্গা বা এক্কাগাড়ি চলছে রাস্তায়। রাতের ট্রেনের ক্লান্তি দুজনেরই মুখে ফুটে আছে।

মামুন ডাকে, নির্মলা!

উঁ?

তাহলে কী করবে ভাবছ?

হঠাৎ হাসে নির্মলা। শুকনো মুখের এ হাসিতে মরিয়াপনা আছে বলে মনে হয় মামুনের। নির্মলা বলে, আমার অবস্থায় পড়লে আপনি কী করতেন?

মামুন ওর চোখে চোখ রেখে পাল্টা হাসি হেসে বলে, আমাকে কী ভেবেছ? আমিও তোমার মত জান না?

ও, হ্যাঁ। শুনেছি। নির্মলা একটু গম্ভীর হয়ে বলে। কিন্তু আপনি তো ইচ্ছে করলেই ফিরে যেতে পারেন।

কোথায়?

যেখানে ছিলেন এতদিন।

পারি না। মামুন মাথা দোলায়। আমি তো নবাবগঞ্জে থাকব বলেই এসেছিলাম।

থাকা না হলে ফিরে যান সেখানে।

মামুন বিরক্ত হয়ে বলে, বললাম তো। পারি না।

কেন।

অত কথা বলা যাবে না। শুধু জেনে রাখ, আমার ফেরার পথ বন্ধ।

মানুষ খুন করে এসেছেন বুঝি?

মামুন তাকায় ওর দিকে। নির্মলার মুখটা নির্বিকার। সামনের দিকে দৃষ্টি। মামুন আস্তে বলে, ধর তাই। মানুষ খুন করে পালিয়ে এসেছি।

আপনাকে দেখে তা মনে হয় না।

বাইরে-বাইরে মানুষকে দেখে কিছু বোঝা যায় না নির্মলা।

তা ঠিক। গলার স্বর নামিয়ে নির্মলা ফের বলে, বোঝা যায় না বলেই ঠকেছি আমি।

দুজনে চুপ করে থাকে। স্টেশনের চত্বরে রিকশ থেকে নেমে মামুন ভাড়া মেটায়। তার কাঁধে কীটব্যাগ, নির্মলার স্যুটকেসটা হাতে। এদিক ওদিক তাকিয়ে হোটেল খোঁজে। ওপাশে একটা ঘরের মাথায় সাইনবোর্ড, বাংলায় লেখা আছে 'পবিত্র বাঙালি হিন্দু হোটেল'। সে পা বাড়িয়ে বলে, এস। খেয়ে নেওয়া যাক্। ভীষণ খিদে পেয়েছে।

নির্মলা বলে, আমার খিদে নেই। তখন একগাদা শিঙাড়া খেয়ে পেট ভার। আপনি খেয়ে আসুন। আমি প্ল্যাটফর্মে গিয়ে কোথাও বসি।

বাজে কথা বল না। মামুন ধমকের সুরে বলে। একটা শিঙাড়া খেয়েই পেট ভার! এস।

বিশ্বাস করুন, খিদে নেই।

মামুন হাসে। অত নার্ভাস হয়ে পড়ার কি আছে? এখনও তো সঙ্গে আছি—না কী?

কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না যে!

খেয়েদেয়ে গায়ে জোর ঢুকিয়ে নাও। নইলে লড়াই করবে কেমন করে? সামনে লড়াই। বলে মামুন বাঁহাতে তাঁর ঘাড়টা ছুঁয়ে আলতো করে ঠেলে দেয়। ফের ফিসফিস করে বলে, লোকে দেখছে কিন্তু! ঠেলাঠেলি করা কী ভাল হচ্ছে?

নির্মলা পা বাড়ায় অগত্যা। হোটেলে ঢুকলে হোটেলওলা দারুণ অভ্যর্থনা করে। নিজে উঠে এসে

কোনার দিকে খালি টেবিলে বসিয়ে হাঁকডাক জুড়ে দেয়। একটু পরে খেতে-খেতে মামুন মুচকি হেসে চাপা গলায় বলে, মিয়াবাড়ি অনেকদিন কাটিয়েছ। ভুল করে পানি বলে ফেল না যেন।

নির্মলা বলে, নিজেকে সামলান আগে।

মামুন হঠাৎ বলে, তোমার সিঁথি শূন্য। হোটেলওলা কী ভাবল বল তো?

কী ভাববে? আজকাল কেউ এসব ভাবে না।

সায় দিয়ে মামুন বলে, তুমি আমার পিসতুতো বোন হতেও তো পার! এই! শোন?

নির্মলা তাকায়।

ডুমুর কিন্তু নাপিতের দিদিমা? তোমার চুলটা যা ছেঁটেছে, একেবারে মডার্ন ফ্যাসান! অনবদ্য!

কাল ডুমুরদি দুপুরে আমাকে ওদের গোসলখানায়...

সঙ্গে সঙ্গে মামুন জিভ কাটে। ...এই! বাথরুম, বাথরুম!

নির্মলা হাসে। ...ভীষণ রগড়ে ধুয়েছে। চুলে শ্যাম্পু পর্যন্ত। আবার বলে কী? ওদের বাড়ির গন্ধ মুছে দিচ্ছি। থাম, চেঁচাসনে। চুপ করে থাক। এই বলে বালতি-বালতি...

মামুন দ্রুত বলে, জল জল!...

শেষ পর্যন্ত নির্মলা মন দিয়ে খেয়েছে। স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের শেষ দিকটায় গোড়াবাঁধানো ঝাঁকড়া একটা বকুলগাছের তলায় গিয়ে বসল দুজনে। ঝাঁঝাল লু হাওয়া বইছে। মামুন সিগারেট টানছে। এখন তার মুখে চিন্তা-ভাবনার ছাপ ঘন হয়ে ফুটেছে। নির্মলা চোখে সানগ্লাস পরেছে এতক্ষণে। সানগ্লাসটা কলকাতায় 'হনিমুন'-গোছের একটা কিছু করতে গিয়ে কিনেছিল নির্মলা—আজাই কিনে দিয়েছিল বলাই উচিত। আসলে দিনকতক ঝড়ঝাপটা সামলাতে অজ্ঞাতবাসে চলে গিয়েছিল। ওর এক আত্মীয়দের বাড়িতে থাকত। সারাক্ষণ দুরুদুরু বুকে ভাবত, এই বুঝি পুলিশ এসে ধরল। কিন্তু সন্ধি থানা-পুলিশ করতে যায়নি। জানত, বরকতের অনেক টাকা।

মামুন সিগারেট ছুঁড়ে ফেলে বলে, হুঁ। এবার সিরিয়াসলি ভাবা যাক। কী বল!

নির্মলা নিজেকে সানগ্লাসের আড়ালে রেখে বলে, কিসের?

তুমি কী করবে কিছু ভেবে ঠিক করলে?

ও। নির্মলা বুঝতে পারার ভান করে। তারপর বলে, আমার জন্যে আপনাকে ভাবতে হবে না।

মামুন হেসে ফেলে। ...তা ঠিক। নবাবগঞ্জে ফিরে তো চল! ফের একবার তোমার বাবাকে বলি গিয়ে।

না। আমি জঙ্গিপুরে নেমে যাব। আপনি নবাবগঞ্জে ফিরে যাবেন।

জঙ্গিপুরে? তারপর?

সেখান থেকে বাসে চেপে কালীতলা বলে একটা জায়গা আছে...

মামুন কথা কেড়ে বলে, চিনি। আমি কালীতলার বর্ডারে পদ্মা পেরিয়ে এসেছিলাম। দালালকে টাকা দিতে হয়েছিল। কালীতলা আমি চিনি। সেখানে কার কাছে যাবে?

আছে একজন।

আত্মীয় নাকি?

হ্যাঁ।

মামুন চিন্তিত মুখে বলে, কালীতলা তো নবাবগঞ্জ এলাকা থেকে দূরে নয়। তোমার আত্মীয় সব কথা শুনে থাকতেও পারে। যদি জায়গা না দেয়?

কেন দেবে না? দেবে।

ধর দিল না। তখন কী করবে?

নির্মলা ঝাঁঝাল গলায় বলে ওঠে, অত আমি ভাবছি না। আমার কথা আপনাকেও ভাবতে বলছি না।

ও। আচ্ছা। ...মামুন চুপ করে থাকে।

কিছুক্ষণ পরে নির্মলা বলে, রাগ করলেন মামুনদা?

না রাগ করার কী আছে? কে কার কথা ভাবে! সত্যি তো।

যে-যার নিজের ভাবনা ভাববে। দেখ না, আমারও তো একই সমস্যা। মামুন হালকা স্বরে বলে। তবে আমি পুরুষমানুষ। একটা ডিগ্রি-টিগ্রি আছে। শেষ পর্যন্ত লড়াই করে একটা জায়গায় হয়ত দাঁড়াতে পারব।

আমি পারব না।

মামুন চমকায়। নির্মলার গলার স্বর ভাঙা। কান্নাজড়ান গলায় ফের বলে, আপনার ডিগ্রি আছে। আমার আর কিছু না থাক, এ গতরটা তো আছে মামুনদা। বেচে খাব। এতেয়ারির বোন লালির মত কলকাতা চলে যাব। বেশ্যাগিরি করে খাব।

নির্জন বকুলতলার লু হাওয়ার মধ্যে বসে নির্মলা হু-হু করে কাঁদে। রেলের উর্দিপরা একটা লোক তাকাতে-তাকাতে চলে যায়। মামুন ওর পিঠে হাত রেখে বলে, ছিঃ? লোকের চোখে পড়লে কী ভাববে? সে শুকনো হাসে। ভাববে, এ ব্যাটা কার মেয়ে ফুঁসলে ভাগিয়ে এনেছে। ধরে পিট্টি দেবে।

সানগ্লাস খুলে ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে রুমাল বের করে সন্ধি দিয়াড়ির মেয়ে চোখ মোছে। তারপর ফের সানগ্লাসটা চোখে পরে।

বলে, ট্রেন কটায়?

সওয়া দুটো। তবে রেলের যা অবস্থা দেখছি। আসার সময় তিন ঘণ্টা লেট করল। এও দেখ কখন আসে।

আবার কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর নির্মলা বলে ডুমুরদির দেওয়া কুড়ি টাকা খরচ হয়নি। আমাকে জঙ্গিপুরের টিকিট এ থেকে কিনে দেবেন।

তুমি ভীষণ হিসেবি দেখছি।

সে কথায় কান করে না নির্মলা। ডানহাতটা বাড়িয়ে বলে, এই ঘড়িটার কত দাম হতে পারে বলুন তো?

মামুন ঘড়ির দিকে তাকায়। ঢ্যাপসা ঘড়ি। নীলচে ডায়াল। স্টিলের কেস। ঘড়ি দেখতে তার চোখ আটকায় হাতের মোটা লালরঙের বালায়। ডুমুর জোর করে পরিয়ে দিয়েছিল।

নির্মলা ফের বলে, এটা ফেরত দিইনি। আজাই কিনে দিয়েছিল নাকি, যে ফেরত দেব? আর এই স্যুটকেসটা আমার নিজের কেনা। কয়েকটা জামাকাপড় ওদের দেওয়া। ফেলে দেব।

হুঁ। ফেলে দিয়ে ভৈরবী সেজে গঙ্গার ঘাটে গিয়ে বসবে। একটা ত্রিশূলও নিও। চ্যালার দরকার হলে আমি আছি।

ঠাট্টা না। বলুন না কত দাম হতে পারে ঘড়িটার?

নিজের কেনা। দাম জান না?

নির্মলা একটু হাসে। বলে, এটা একজন প্রেজেন্ট করেছিল। আজাইয়ের দেওয়া ঘড়ি ওদের ওখানে পড়ে আছে। মামুন অন্যদিকে মুখ রেখে বলে ওঠে, লখনা প্রেজেন্ট করেছিল?

নির্মলা চমকায় না। আস্তে বলে, হ্যাঁ। বলুন না কত দাম হতে পারে? বেচে দেব।

আচ্ছা নির্মলা?

কী?

হঠাৎ মনে পড়ে গেল। কালু—মানে গালকাটা কেলো বলেছিল, লখনা পদ্মার বর্ডারে কোথায় যেন গা ঢাকা দিয়ে আছে। কালীতলায় নাকি?

নির্মলা কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর অন্যদিকে ঘুরে বলে, ঠিক জানি না। কিন্তু আগে ওখানেই ওর একটা ঘাঁটি ছিল। পাটোয়ারিদের গদি আছে কালীতলায়। ও পাটোয়ারিদের লোক।

মামুন সিগারেট ধরায়। তারপর বলে, বুঝলাম। কিন্তু এতকাণ্ডের পর সে তোমাকে খাতির করবে কেন? দেখ নির্মলা, শুনেছি তুমি প্রচণ্ডভাবে সিনেমা-টিনেমা দেখ। সিনেমার প্রেম-ভালবাসা তোমার কাঁচা মাথাটা সম্ভবত কম বয়স থেকেই চিবিয়ে খেয়েছিল। শোন, আমার বয়স কম হয়নি। আমি

তোমাকে বলছি, ওসব ছেঁদো কথা। কী বোগাস সব প্রেম ভালবাসা-টাসা! ওই আজাই—শুওরের বাচ্চা আজাই—বাপের এক কথায় সুড় সুড় করে তালাকনামায় সই করে দিল। তারপর তক্ষুনি মোটরসাইকেল হাঁকিয়ে বহরমপুরে স্ফূর্তি মারতে গেল। নিশ্চয় আরেকটা মেয়ে খুঁজতেই গেল—যাকে ব্যাকসিটে হিরোইন সাজিয়ে বসাবে। কী তুমি লখনার কথা বলছ? আমি চিনি নে লখনাকে? স্কুলে ক্লাস সিক্স অব্দি পড়েছিল আমার সঙ্গে। দশ বছর আগে আমরা ক'জন যখন বিপ্লব করে বেড়াচ্ছি, তখন লখনা ওয়াগন ভেঙে রেল ডাকাতি করে পুলিশের তাড়া খেয়ে বেড়াচ্ছে। তুমি কী বলতে চাও নির্মলা? লখনা তোমাকে দেখেই প্রেম-ভালবাসার বান ডাকাবে? তুমি কি এত ঘা খেয়েও শিখবে না? আমাকে বল তুমি—আর তো কচি মেয়েটি নও। বল? বল?

আধপোড়া সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দেয় মামুন। উত্তেজনায় তার মুখ লাল হয়ে যায়। ফের বলে, তুমি যদি ডুমুর বা আঙুর হতে, তোমার সঙ্গে যদি বিন্দুমাত্র সম্পর্ক থাকত, আমি এখন তোমাকে প্রচণ্ড একটা থাপ্পড় মারতাম।

নির্মলা ভাঙা গলায় বলে, আমি কোথায় যাব তাহলে? কী করব আমি, বলুন?

মামুন তক্ষুনি শান্ত হয়। দেখে, নির্মলা ফের কাঁদছে। মামুন তখনকার মত ওর পিঠে হাত রেখে বলে, চেষ্টা করা যাক। নবাবগঞ্জে ফিরে যাই চল। আমি যেমন করে পারি, সন্ধিকাকাকে ধরে এনে তোমার মুখোমুখি দাঁড় করাব। কালুকে বুঝিয়ে বলব। কালু ভারুয়াকে বলবে। ভারুয়া এখন কুলবেড়েতে মোড়ল হয়েছে। যদি প্রায়শ্চিত্ত করে-টরে ফের তোমাকে জাতে নেয় ওরা, সে চেষ্টাও করা যাবে। আর, শেষ পর্যন্ত যদি তাতেও তোমার গতি না হয়...

নির্মলা কান্না থামিয়ে মুখ তোলে।

মামুন ফের বলে, যদি সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়, তাহলে...একটু থেমে শ্বাসপ্রশ্বাসের মধ্যে সে বলে, তাহলে আমি তোমাকে বিয়ে করতে রাজি।

নির্মলা মুখটা নামায়। শ্বাসপ্রশ্বাস পড়ছে কিনা বোঝা যায় না, এমন চুপচাপ সে।

কী? একটা কিছু বলবে তো—হ্যাঁ কিংবা না?

নির্মলার ঠোঁট কাঁপে। কষায় সেই কালচে ক্ষত রেখাটা বেঁকে থাকে দীর্ঘ একমিনিট। তারপর আস্তে বলে, কোথায় রাখবে আমাকে? তোমারই তো দাঁড়াবার জায়গা নেই মামুনদা।

খুঁজে নেব জায়গা। সে ভাবনা তোমার নয়, আমার।

নির্মলা মুখ ফিরিয়ে বলে, আমি জানি না। কিচ্ছু জানি না কী করব।

মামুন শক্ত হয়ে বলে, বেশ। আমাকে বিয়ে করতে হবে না। তুমি জাত দিয়ে মুসলমান হয়েছ। আমি তোমার জন্যে ভাল মুসলমান পাত্রই খুঁজে দেব। ডুমুরের কাছে তুমি থাকবে। আমি বললে ডুমুর আপত্তি করবে না। আর ডুমুর বললে ওর বাবারও আপত্তি হবে না। আমাকে বিশ্বাস কর, নির্মলা! আমি সব পারি।

নির্মলা কিছু বলে না। আবার সিগারেট ধরায় মামুন। ধোঁয়ার রিঙ বানাবার ব্যর্থ চেষ্টা করে বলে, চিরদিন এই স্বভাব আমার। চোখের সামনে এভাবে কাউকে অসহায় হয়ে ভেসে যেতে দেখলে আমার ভীষণ রাগ হয়। একটা কিছু করতে ইচ্ছে করে। কেন চট্টগ্রাম থেকে চলে এসেছি শোন। আমি ছিলাম পুলিশ ফোর্সে এস আই। একটা গাঁয়ে ডাকাত ধরতে গিয়েছিলাম চারজন কনস্টেবল নিয়ে। দাগী ডাকাতটা ছিল একজন নমশূদ্র। রাত তখন প্রায় একটা। ডাকাতটাকে পাওয়া গেল না। বাড়ি সার্চ করা হল রুটিনমাফিক। হঠাৎ দেখি, কনস্টেবলরা একটা মেয়েকে টানাটানি করছে। টর্চের আলোয় দেখলাম মেয়েটাকে উলঙ্গ করে ফেলেছে। সঙ্গে সঙ্গে টর্চ নিভিয়ে ওদের বাধা দিলাম। শুওরের বাচ্চারা তখন জানোয়ার। বলে কী, আপনি বাইরে গিয়া খাড়ান স্যার। আমার মাথায় আগুন ধরে গেল। রিভলভার বের করে শাসালাম। কানে ঢুকল না। তখন পর পর চারটে জানোয়ারকে গুলি করলাম।...

নির্মলা আস্তে বলে, তারপর?

তারপর আর কী? নিজের জীবনের ওপর আমার বড্ড মায়া, নির্মলা। তাছাড়া ওদেশে মন টিকছিল না। প্রায়ই ভাবতাম চলে যাই। একটা সুযোগ পাওয়া গেল এভাবে। তা না হলে আর আসা হত না।

মামুন একটু হাসে। ...এখনও বুঝতে পারি না, চার-চারটে মানুষকে মেরে পৃথিবীর কতটুকু উপকার করেছি। হয়ত এই আমার স্বভাব। দশ বছর আগেও তো মানুষ মেরে পৃথিবীটাকে বদলাতে গিয়েছিলাম। কে জানে কিছু মানুষ মারলে কতটা বদলায় পৃথিবী। আরও লক্ষ লক্ষ মানুষ তো বেঁচে থাকে। তারা আবার সব কিছু ওলট পালট করে দেয়। যাকগে এসব বড় বড় কথা। বাজে কথা। তুমি বস। দেখে আসি, ট্রেন লেট করবে নাকি।

মামুন কাঁধের কিটব্যাগটা রেখে হন হন করে এগিয়ে যায় স্টেশন ঘরের দিকে।...

এই লুপ লাইনের ট্রেন চলে ছ্যাকড়া গাড়ির মত। ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে চলেছে এবং যেখানে থামছে, সেখানে থেমেই থাকছে। আর নড়াচড়ার নাম নেই। নবাবগঞ্জ পৌঁছতে রাত এগারটা বাজিয়ে ছাড়ল। স্টেশন নিঃঝুম। রাতে ডাউন ট্রেনে যাত্রী তত নামে না, যত ওঠে। কিন্তু এটা যাবে কাটোয়া জংশন অব্দি। কাটোয়া যাবার জন্যে এত রাতে ট্রেন ধরার গরজ কারুর নেই। মামুন আগে নামে। কিটব্যাগটা তার কাঁধে। নির্মলা স্যুটকেসটা দরজায় ঠেলে দেয়। মামুন তুলে নিয়ে চোখ টিপে বলে, ঘোমটা দিয়ে নাও কাল রাতের মত।

দুজনেই হাসে একটু। কিছু লোক স্টেশন ঘরের বারান্দায় কাঠ হয়ে ঘুমচ্ছে। গেটে টিকিট নেবার জন্যে কোন রেলবাবু দাঁড়িয়ে নেই। ওরা প্ল্যাটফর্ম ধরে সোজা এগিয়ে যায়! তখনও গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। ইঞ্জিনের পাশ দিয়ে প্ল্যাটফর্ম থেকে নেমে লাইনের ধারে ধারে চলতে থাকে। প্রথম সিগন্যালের কাছাকাছি ডাইনে ঘোরে। বেড়ার তার কবে ওখান থেকে লোপাট হয়ে গেছে। শুকনো নয়ানজুলির ওপর দিয়ে একফালি পায়ে চলা পথ নক্ষত্রের আলোয় চকচক করছে।

আগাছার জঙ্গল পেরিয়ে ডুমুরদের ছোট্ট পুকুর। তার পাড় দিয়ে হেঁটে ওরা বাইরের ঘরের সামনে পৌঁছয়। বারান্দায় উঠে মামুন কড়া নাড়তে নাড়তে চাপা গলায় ডাকে, ডুমুর।

একটু পরে মোজাই চৌধুরির সাড়া আসে ঘুম ভাঙা গলায়। মামুন বলে, আমি মামুন চাচাজি!

ঘরে আলো জ্বলে ওঠে। দরজা খুলে চৌধুরিসায়েব জড়ানো স্বরে বলেন, রেখে এলে? তারপরই দেখতে পান সন্ধির মেয়েকে। সঙ্গে সঙ্গে মুখের চেহারা বদলে যায়। বলেন, আবার ঝামেলা ঢোকাতে এলে? তোমার কোনকালে বুদ্ধিসুদ্ধি হল না মামুন। আমরা নিরীহ শান্তিপ্রিয় মানুষ। কারোর গণ্ডগোলে নেই। খামোকা এ কী উটকো বিপদ এনে ফেললে বাপু।

ডুমুরের জন্তুর ইন্দ্রিয়। তার ঘরের দরজা খোলার শব্দ শুনে চৌধুরি থেমে যান। ডুমুর গায়ে কাপড় জড়াতে জড়াতে 'মামুন এলি' বলে বারান্দায় আসে। মাথার চুল ঠিকঠাক করতে করতে সে ও ঘরে ঢোকে। তারপর মামুনের পাশে নির্মলাকে দেখে উদ্বিগ্ন মুখে বলে, কী হল? জায়গা দিল না মাসি?

মামুন বলে, পাত্তাই পেলুম না তাদের।

ডুমুর নির্মলাকে বলে, ভেতরে এস।

মোজাই চৌধুরি একটু সরে দাঁড়িয়েছিলেন। বলেন, ডুমুর! তোর বড্ড বাড় বেড়েছে। তুই খামোকা ঝামেলা কাঁধে নিয়ে শেষে আমাকেও বিপদে ফেলবি—নিজে তো পড়বিই। বরকত মিয়া দুনিয়াসুদ্ধ শুনিয়ে শাসাচ্ছে আমাকে। আমরাই নাকি বাপ-বেটি মিলে আজাইয়ের বউকে ভাংচি দিয়ে বের করেছি।

আঃ আব্বা! আপনি চুপ করুন তো। ডুমুর ধমক দেয়। আপনি শোন গিয়ে। আমি দেখছি।

চৌধুরি গজগজ করতে করতে ভেতরে যান। ডুমুর মামুনকে চোখ রাঙিয়ে বলে, ভেতরে আয় না। নির্মলা, আয়!

মামুন গম্ভীর মুখে ঢোকে। স্যুটকেস আর কিটব্যাগটা টেবিলে রাখে। সেদিনকার রজনীগন্ধার তোড়া শুকনো হয়ে এখনও দাঁড়িয়ে আছে। নির্মলাকে টেনে ভেতরে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে ডুমুর। ভেতরের বারান্দায় চৌধুরি তাঁর বিছানায় বসে সমানে গজগজ করছেন। ...ভাল জায়গায় সম্বন্ধ দেখে বিয়ে লাগালাম। এ কিছুতেই হতে দেবে না বরকত—কানে যদি যায়। নানা রকম বাগড়া দেবেই দেবে।

ডুমুর দ্রুত ঘুরে বলে, কার বিয়ে লাগালেন আবার?

চৌধুরি আরও চটে বলেন, আমার ঘরে বারগণ্ডা মেয়ে আছে। কথা বলে শোন!

আমি খুব ভারি হয়ে গেছি। তাই না আব্বা?

মামুন বলে, আঃ! রাতদুপুরে ঝগড়া করিস নে তো বাবা! ঠাণ্ডা হয়ে বসে কথা শোন। প্ল্যান বাতলে দে। আমার মাথায় কিছু আসছে না।

চৌধুরি চুপ করে গেছেন। এবার শুয়ে পড়লেন। ডুমুর ঘুরে দুজনকে দেখে নিয়ে বলে, খেয়েছিস?

হ্যাঁ। পথে এক জায়গায় খেয়ে নিয়েছি।

ডুমুর নির্মলাকে বলে, দাঁড়িয়ে কেন? বস।

নির্মলা লক্ষ্মী মেয়ের মত তক্তপোশে বসে পড়ে। মামুনের বিছানাটা গুটানো রয়েছে। ডুমুর তার পাশে বসে। মামুন ভাঙা চেয়ারটায় বসে সিগারেট ধরায়। ডুমুর বলে, ওখানে তোমার মেসো-মাসি কেউ নেই?

মামুন চাপা গলায় সবটা বলে। ডুমুর চুপচাপ শোনে। একটু ভাবে। তারপর নিঃশ্বাস ফেলে বলে, তাহলে এই ব্যাপার?

তারপর অকারণে নির্মলাকে বলে, আর কোথাও তোমার যাবার জায়গা নেই, তাই না?

নির্মলা কোন জবাব দেয় না। মুখ নামিয়ে হাতের আঙুল দেখতে থাকে। মামুন সিগারেটের ধোঁয়ার রিঙ বানিয়ে রিঙটার দিকে তাকিয়ে বলে, জানিস? ওকে আমিই বিয়ে করব বলেছি।

ডুমুর দ্রুত ওর মুখের দিকে তাকায়।

মামুন একটু হাসে। একটা শর্ত আছে। যদি ওর কোন গতি না হয়, তবে। আগে নয়।

ডুমুর ঠোঁট কামড়ে কথাটা শোনার পর বলে, তুই ওকে বিয়ে করে রাখবি কোথা?

লেজে বেঁধে নিয়ে বোম বোম করে ঘুরে বেড়াব। আমাকে তো জানিস!

চড় খাবি মামুন!

বাঃ! আমার বউ আমি যেখানে রাখি, তা নিয়ে তোর ব্যথা কিসের? মামুন তামাশার ভঙ্গিতে বলে। অবশ্য এখন নিশ্চয় ওর সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। তাই ওকে তোর কাছে ফেরত নিয়ে এসেছি। এখন কী করা যায় বল্। তোর বুদ্ধির ওপর ভরসা রাখি।

ডুমুর বলে, নির্মলা। তুই ওর কথা শুনলি তো?

নির্মলা মুখ নামিয়ে আছে। কোন কথা বলে না সে।

ডুমুর ওকে দেখতে দেখতে বলে, পথে তোদের ভাব হয়েছে। ভালই তো। আমার ভীষণ ভাল লাগছে ভাই! কিন্তু তোরা দাঁড়াবি কোথা ভেবে পাচ্ছিনে। আঃ, কাঁদে না! যা বলছি, মন দিয়ে শোন। জাত দিয়ে মুসলমান হয়েছিস। আর মাথা ভাঙলেও হিন্দু হতে পারবিনে—হিন্দুরা তোকে নেবে না। নিলে আশ্রম-টাশ্রমে সন্ন্যাসিনী করে রাখবে। এখন কথা হচ্ছে তালাকের পর মেয়েদের 'ইজ্জৎ' পালতে হয় তিন মাস দশ দিন। কারণ পেটে আগের স্বামীর সন্তান আছে কি না দেখে তবে দ্বিতীয়বার বিয়ের কথা। বাচ্চা পেটে থাকলে যতদিন না প্রসব হচ্ছে, ততদিন আর বিয়ে করা যাবে না। কাজেই...

মামুন চটে গিয়ে বলে, তুই এক হাজিবিবি! আস্ত মেয়েমৌলবি! ওসব ছেঁদো কথা রাখ।

তুই তো বরাবর নাস্তিক রে! তুই তো বলবি ওকথা। ...ডুমুর পাল্টে চটে গিয়ে বলে। তাহলে আর বিয়ের অনুষ্ঠানেরই বা দরকার কী? স্বামী-স্ত্রীর মত বাস করগে দুজনে!

ডুমুর উঠে দাঁড়ায়। মামুন হাসতে হাসতে বলে, সেটাই তো প্রবলেম। বাসস্থান যে নেই রে?

তাহলে অত লম্বা লম্বা বাত করিস নে।

কোথায় করলাম?

বারান্দা থেকে মোজাই চৌধুরি বলেন, অ ডুমুর! রাত জাগিসনে শুয়ে পড় গে। ভোরে মাঠে যাবি যে! সুরেন একা সামলাতে পারবে না। কোনদিক দেখবে?

মামুন আস্তে বলে, তোকে মাঠে যেতে হবে কেন?

জ্বর হয়েছে আব্বার।

মামুন জিভ কাটে। ...আহা। জ্বর গায়ে উঠে এসে দরজা খুলেছেন! তোর জানলায় গিয়ে ডাকলে পারতাম।

ডুমুর সে কথায় কান করে না। গলা চেপে বলে, শোন। রাতটা ও এখানে থাক্। কাল তুই ওকে নিয়ে দুলির কাছে যা। দুলির কাছে ও থাকবে। ইতিমধ্যে তুই একটা চাকরি-বাকরির চেষ্টা কর। রহিমুদ্দিনকে ধরলে একটা মাস্টারি হয়ে যাবে। ওরা এখন দেশের লিডার।

মামুন বলে, দুলি ওকে আশ্রয় দেবেন কেন?

তোর খাতিরে দিতেও পারেন। আর জানিস? দুলির বাড়িতে থাকলে বরকত মিয়া ওর কোন ক্ষতি করতে পারবেন না। কারণ রহিমুদ্দিন আছেন দুলির মাথার ওপরে। তাছাড়া...ধুরন্ধর মানুষের ভঙ্গিতে ডুমুর বলতে থাকে। তাছাড়া রহিমুদ্দিন বরকতের বিরুদ্ধে লড়াই করার একটা ছুতো পেয়ে দেখবি খুশিই হবেন।

দুলির কাছে আমি যাব না রে! দুলি আমাকে আর পাত্তা দেবেন্ না।

কেন? তোর সঙ্গে কতকালের ভাব ওর।

ভাব কী তোর সঙ্গেও কম ডুমুর? মামুন গম্ভীর মুখে বলে। ভাব দিয়ে কিছু হয় না।

ডুমুর ক্ষুব্ধ হয়ে বলে, তুই বরাবরকার নেমকহারাম আর স্বার্থপর!

হয়ত।

ডুমুরের চোখ ফেটে জল আসে। মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে বলে, নির্মলা! শোবে তো এস। তোমাকে ভোরে উঠতে হবে।

মামুন বলে, একটা রাতের জন্যে শুয়ে কী করবে ও?

ডুমুর ওর চোখে চোখ রেখে বলে, তুই কি ভেবেছিলি আমার কাছে ওকে রেখে তুই...

স্ফূর্তি ওড়াব বলবি তো? তোর মুখে কিছু আটকায় না। বল না।

অসভ্য। ইতর কোথাকার!

ডুমুর ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। বারান্দা দিয়ে এগিয়ে নিজের ঘরে ঢোকে। জোরে কপাট বন্ধ করার শব্দ শোনা যায়। মামুন দেখে, নির্মলা তার দিকে তাকিয়ে আছে।

নির্মলা বলে, খামকা ডুমুরদির সঙ্গে ঝগড়া করলে কেন?

মামুন চোখে হাসে। বলে, ওর সঙ্গে বরাবর আমার ঝগড়া হয়। সকালে দেখবে আবার ভাব হয়ে গেছে। সে হাই তোলে। উঠে দাঁড়িয়ে আড়মোড়া দিয়ে ফের বলে, ঘুম পাচ্ছে। যাও, শোও গে। সকাল হলে দেখা যাবে।

নির্মলা আনমনে কিছু ভাবছিল। বলে, ডুমুরদি দরজা বন্ধ করে দিল যে।

গিয়ে ডাক। খুলে দেবে।

নির্মলা ওঠে। স্যুটকেসটা হাতে তুলে নিয়ে চলে যায়। ডুমুরের দরজায় গিয়ে কপাটে আস্তে ধাক্কা দিয়ে ডাকে। যতক্ষণ না সে দরজা খোলে, মামুন লক্ষ্য রাখে। নির্মলা ঢুকে গেলে আবার বন্ধ হয়। তখন মামুন তক্তপোশে বিছানাটা ছড়িয়ে দেয়। জামা-কাপড় বদলাতে থাকে ধীরেসুস্থে। ট্রেনের ধকলে শরীরে এতটুকু জোর নেই মনে হয়। মাথাটা টলমল করছে। একটা লম্বা ঘুম দরকার।...

নদীর ধারে মোজাই চৌধুরির বাগানে খানিকটা ফাঁকা জায়গায় ঘাস চেঁচে খামার করা হয়েছে কবে সেই ফাল্গুন মাসে। সুরেনের বউ গোবর লেপে তকতকে করে রাখে। চৈতালি খন্দ মাড়া হয়েছিল সেখানে। এখন এক বিঘে জমির বোরো ধান মাড়াই হচ্ছে। মধ্যিখানে বাঁশের খুঁটি পোঁতা আছে। ভাড়া করে আনা দুটো বলদ খুঁটিকে কেন্দ্র করে ঘুরছে। বলদের পায়ের চাপে ধানগুলো ঝরে পড়ছে। সুরেন একটা লগি দিয়ে নেড়ে নিচ্ছে শীষাল খড়ের পাঁজা। তারপর বলদ ডাকাচ্ছে। সুরেনের বউ রোজকার মত সাতসকালে উনুন ধরিয়ে ভাত রাঁধছে। ওর কাচ্চাবাচ্চারা গাছপালার ভেতর খেলে বেড়াচ্ছে। আজ সকাল থেকে আকাশ মেঘলা। পুবের হাওয়া বইছে তোড়ে। একটু দূরে পাটক্ষেতের আলে

দাঁড়িয়ে আছে ডুমুর। হাওয়ায় তার শাড়ি সামলান এক ঝামেলা। পাটক্ষেতে নিড়ান দিচ্ছে সার বেঁধে হাঁটু দুমড়ে বসা চারজন মুনিশ। দাঁড়িয়ে থেকে কাজ না করলে ফাঁকি দেবে। গ্রাম্য প্রবাদ আছে :

'খাটে, খাটায়, দুগুণ পায়
বসে খাটায় অর্ধেক পায়
ঘরে থাকে, মুনিশ পাঠায় মাঠ
চিরটাকাল তার কপালে হা-ভাত।।'...

ভোর পাঁচটায় অ্যালার্ম দিয়ে রেখেছিল ঘড়িতে। বাবার জন্যে কেরোসিন কুকারে দুমুঠো চাল ফুটিয়ে রেখে এসেছে। বাসি মাংসের তরকারি আছে। গরম করে নেবেন। সামান্য সর্দিজ্বরে ভাত খাওয়া চলে। চৌধুরি মেঠো মানুষ। সহজে অসুখ বিসুখ হয় না। ওষুধ খাওয়াও খুব অপছন্দ। তবে আসার সময় দেখেছে, জ্বরটা ছেড়ে গেছে।

নির্মলা কুঁকড়ে শুয়ে ঘুমচ্ছিল। আজাই ওকে কতকগুলো খারাপ অভ্যাস ধরিয়েছে। মেয়েদের অত বেলা অব্দি ঘুমুনো উচিত? আটটা-নটা অব্দি নাকি দুজনে ভোঁস ভোঁস করে ঘুমত। বিছানায় শুয়েই বাসি মুখে নাকি চা গিলত। ওটা নাকি বেড-টি খাওয়া। তারপর সাবান দিয়ে মুখ ধুয়ে সাজতে বসত। ওদের জীবনযাত্রার ব্যাপার-স্যাপার জেরা করে জেনে নিয়েছিল ডুমুর—প্রথম যেদিন এল মামুনের খোঁজে। সব শুনে তো ডুমুর হতভম্ব। এ কী দায়িত্বহীন উড়নচণ্ডী জীবন কাটান! সুখের পায়রা আর কাকে বলে তাহলে?

সেই মেয়েকে বিয়ে করবে আরেক উড়নচণ্ডী বাউণ্ডুলে মামুন। দু রাত আগে একজন পুরুষের গলা ধরে শুয়ে থেকেছে। সেই মেয়েকে নিয়ে শুতে মামুনের বুঝি তর সইছে না। ঘেন্না ধরে যায় পুরুষ জাতটার ওপর। ডুমুর বিশ্বাস করতে পারছে না নিজের কানকে। কাল রাতে মামুন কি সত্যি সত্যি কথাটা বলল, নাকি ওর আরও সব কথার মত এও এক তামাশা? গাড়ল কোথাকার! মেয়েটার পেটে যদি আজাইয়ের বাচ্চাই থাকে?

মামুনকে বিশ্বাস নেই। ও সব পারে। ভালমানুষি করে ওকে নির্মলার সঙ্গে মোতিহারি পাঠানো বড্ড ভুল হয়ে গেছে। আসলে মেয়েটাও তো বরাবর বাজারিটাইপের। ছোটবেলা থেকেই নষ্ট হয়ে আছে। এক বুড়ো স্টেশনবাবু নাকি ওকে লেখাপড়া শেখানোর ছলে নষ্ট করে ফেলেছিল। আজাইকে ছেড়ে মামুনকে দেখে হামলে পড়েছে সঙ্গে সঙ্গে। স্বভাব যাবে কোথায়?

কিন্তু মামুনের আর যত দোষ থাক, মেয়েঘটিত ব্যাপারে সে চিরকাল উদাসীন প্রকৃতির ছেলে। বোঝা যায়, মোতিহারি যাওয়া এবং আসার মধ্যে হারামজাদি ওর মাথাটা খেয়ে ফেলেছে। মামুন বুঝতে পারছে না, আবার কাউকে দেখে সে মামুনকে ছাড়তেও দেরি করবে না। ছলছুতোর অভাব কী? আজাইকে ছাড়তে মতলব এঁটেছিল বলেই না এতদিন পরে অমন করে কুলবেড়ে গিয়ে হাজির হল! কী? না—বাপের জন্যে মন মানছিল না। এতদিন মানল, আর মামুনকে দেখার পর হঠাৎ বাপের জন্যে দুঃখ উথলে উঠল? সবটাই চালাকি। বেশ্যা? বাড়ি ফিরে যদি দেখে তখনও দূর হয়ে যায়নি, ঝাঁটা মেরে তাড়াবে। বড় কপাল করে ডুমুরের মত মেয়েকে আঁকড়ে ধরার সুযোগ পেয়েছিলি হারামজাদি! দুলি হলে কী করত? ঢুকতে দিত বাড়িতে?

মুখ বাঁকা করে ডুমুর একটু ঘুরে বাগানের দিকে তাকাতেই দেখল মামুন আসছে।

চোখ জ্বলে গেল যেন। মিয়া একেবারে আজাইটি সেজেছে। খয়েরি প্যান্টের ওপর নীল স্পোর্টিং গেঞ্জি। দাড়ি কেটেছে। গাল চকচক করছে। একটা মোটর সাইকেল চাই এবার। ব্যাকে বসার মত দুকানকাটি মেয়ে তো পেয়েইছে।

মামুন হাসতে হাসতে আসছে চাঙড়ে পা ফেলে। ডুমুর মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়ায়। মুনিশদের উদ্দেশে অকারণ বলে, অত র-ঠ করে কাজ করলে চলে? একটা 'পাই' শেষ করতে আড়াই ঘণ্টা লাগিয়ে দিলে বাপু! এ কেমন কাজ করা? মজুরি তো সরকারি রেটে নেবে। না—কী?

মুনিশরা কান করে না। চৌধুরিসায়েবের মেয়ের মেজাজ আজ সকাল থেকে চড়ে আছে।

মামুন এসে বলে, ডুমুর! জীবনে যা করিনি, তাই করে এলাম জানিস?

ডুমুর ভুরু কুঁচকে তাকায়।

মামুন কপাল দেখিয়ে বলে, ধুলো দেখতে পাচ্ছিস নে? ভাল করে দেখ। দাদাপীরের থানে কপাল ঠুকে এলাম।

ডুমুর বাঁকা ঠোঁটে বলে, তা তো আসবিই। অনেক ভাগ্যে একটা মেয়ে জোটাতে পেরেছিস এতদিনে।

মামুন খিকখিক করে হাসে। ...আরে না না। নির্মলা কেটে পড়েছে। ঘুম থেকে উঠে কুয়োতলায় মুখ ধুতে গেলাম। দেখি, চাচাজি ঠিক তোর মত উঠোন ঝাঁট দিচ্ছেন। বললাম, ও কী করছেন? আপনার না জ্বর? থামুন, নির্মলাকে বলছি। ঝাঁট-ফাট মেয়েদের কাজ। চাচাজি গাঁক গাঁক করে বললেন, সন্ধির মেয়ে বাক্স-পেঁটরা নিয়ে চলে গেছে।

ডুমুর আস্তে বলে, চলে গেছে? গেল কোথায় মুখপুড়ি?

তোর গা ছুঁয়ে বলতে পারি, আমি খুঁজতে যাইনি। মামুন হাত বাড়িয়ে ডুমুরকে না ছুঁয়ে হাত নামায়। খুব বেঁচে গেছি বাবা! সত্যি সত্যি বিয়ে করতে হলে বড্ড মুশকিলে পড়ে যেতাম। একে নিজের পা রাখার জায়গা নেই।

ডুমুর আনমনে বলে, কিন্তু যাবে কোথায় ও? সন্ধি দিয়াড়ি তো জায়গা দিতে পারবে না জাতনাশা মেয়েকে। দিয়াড়িদের আর বরকতের ভয় নেই। পিটিয়ে মেরে ফেলবে বাপ-মেয়েকে।

মামুন বলে আমার ধারণা নির্মলা কালীতলা গেছে। কালীতলা যাবে বলে খুব ঝোঁক ধরেছিল কাল। বুঝিয়ে সুঝিয়ে আটকেছিলাম।

কালীতলা? ডুমুর অবাক হয়ে বলে। সে তো পদ্মার ধারে বর্ডারে।

হ্যাঁ। ওখানে নাকি লখনা দিয়াড়ি আছে। মরুক গে! চেষ্টা তো করেছিলাম। তুইও করেছিলি।

ডুমুর গলার ভেতর বলে, শেষ পর্যন্ত আবার গোয়ালে ঢুকতে গেল?

যাক্ না। কী করবি তুই? আয় একটু প্রকৃতির মধ্যে ঘোরাফেরা করি। মন শুদ্ধ হয়ে যাবে। মামুন পা বাড়িয়ে। ...আয় না বাবা! ওরা কাজ করুক। ওহে মুনিশভাইরা, ফাঁকি দিও না যেন। আসমানে যদিও আজ মেঘের পর্দা টাঙানো আছে, আড়াল থেকে কিন্তু তোমাদের খোদা-ভগবান কড়া নজর রেখেছেন। চার জোড়া চোখ—হুঁশিয়ার ভাইসকল।

মুনিশরা হ্যা হ্যা করে হাসতে থাকে। অনিচ্ছার ভঙ্গিতে ডুমুর মামুনের পেছনে পেছনে হাঁটে। বাঁশবনের পাশ দিয়ে বাবলা নদীর বাঁধে পৌঁছে মামুন প্রকাণ্ড হিজল গাছটার তলায় দাঁড়ায়। পদ্যের সুরে আওড়ায়, আমাদের ছোট নদী চলে বাঁকে বাঁকে/বৈশাখ—থুড়ি! জ্যৈষ্ঠ মাসেতে তার হাঁটু জল থাকে। ...ডুমুর! বৃষ্টি হচ্ছে না কেন রে? অত মেঘ জমেছে, তবু বৃষ্টি নেই

তারপর একটু নড়ে ওঠে সে। ফের বলে, ওঃ হো! বুঝেছি ও ডুমুর, তোর বিয়ের দিন দেখবি দারুণ বৃষ্টি নামবে। এত বৃষ্টি যে তোর বরের পোশাক ভিজে জবুথবু হয়ে যাবে।

ডুমুর বাঁধের হলুদ মাটিতে বসে পড়েছে। আঙুলে আঙুল আঁকড়ে রেখেছে। ওর চওড়া কপালের তিনটে ভাঁজ গভীর দেখাচ্ছে। সে নদী দেখছে, না আকাশ—নাকি ওপারের সবুজ মাঠ, বোঝা যায় না।

মামুন একটু তফাতে বসে বলে, চলে তো যাবই। আজই যেতাম হয়ত। চাচাজি বললেন, আর কটা দিন থেকে যাও। ডুমুরের বিয়েটা অব্দি। দাঁড়িয়ে থেকে দেখাশুনাটা করবে। আমি একা মানুষ। কতদিক সামলাব। ও ডুমুর, যেখানে থাকব—এবার থেকে তোকে চিঠি লিখব। তোর হবু-শ্বশুর বাড়ির ঠিকানাটা নিয়ে যাব। তোর বর যদি রাগ করে, বলবি ...কী বলবি বলত?

ডুমুর হিসহিস করে বলে, থামবি বাঁদর?

যা বাবা! ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেললি যে! মামুন হঠাৎ চটে যায়। বুড়ো বয়সে কান্নাকাটি করতে লজ্জা করে না।

আমি বুড়ি আর তুই জোয়ান!

আলবাৎ জোয়ান। আরে তুই ভীষণ—ভীষণ রকমের বুড়ি। বুড়ি না হলে কেউ খোদার কাছে

মাথা ঠুকে ঠুকে মরে? দেখে রাগে পিত্তি জ্বলে যায় আমার। শালুকে চিনেছে গোপাল ঠাকুর।

মামুন উঠে দাঁড়িয়েছে। ডুমুর টের পায়, আগের সেই মামুন খোলস ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে। দশ বছর নিপাত্তা হয়ে থাকার পর যখন এল, তখন কত ভদ্র কত শান্ত দেখাচ্ছিল ওকে। নবাবগঞ্জের হাওয়া গায়ে লেগে কয়েকদিনের মধ্যে সেই খোলস খসে পড়ল। সেই চিরচেনা দুর্দান্ত, রুক্ষ, ডানপিটে চেহারা অবিকল।

ডুমুর আস্তে বলে, কোথায় যাচ্ছিস ঢঙ দেখিয়ে?

ঢঙ তো তুই দেখাচ্ছিস। কান্নাকাটি আমার ভাল লাগে না।

কাঁদছি রাগে—তোর কথা শুনে। তুই কেমন করে ভাবতে পারলি মামুন, আমি আবার কনে সেজে বিয়ের পিঁড়িতে বসব?

মামুন ভুরু কুঁচকে বলে, বসবি না। সারা জীবন এমনি করে কাটাবি? একা-একা?

তুই তো বললি আমি বুড়ি হয়ে গেছি।

ওটা কথার কথা। নির্মলার পাশাপাশি তোকে এমন কিছু বেশি বয়সের লাগে না।

ডুমুর একটু হাসে। আমার কপাল! তাও মিলিয়ে দেখেছিস তাহলে?

দেখেছি। তাছাড়া তুই কত ফর্সা ওর চেয়ে। সেদিন একটুখানি সাজলি, বয়স হাফ কমে গিয়েছিল। ফুল সাজলে তুই হিরোইন।

একটু শুকনো কাঠি কুড়িয়ে ডুমুর ছুড়ে মারে। ...তুই একটা বাঁদর। একটা হনুমান।

তারপর সে ঘাড় ঘুরিয়ে বাঁশবনের ওপাশে পাটক্ষেতটা দেখে উঠে দাঁড়ায়। বলে, দেখছ? একপা সরে এসেছি আর বসে গপ্প জুড়েছে। মানুষ যে কী নেমকহারাম আর স্বার্থপর হয়েছে দিনে দিনে।

ডুমুর চলে যাচ্ছে দেখে মামুন বলে, চলে যাচ্ছিস কেন, আয়, নিরিবিলি প্রকৃতির মধ্যে বসে একটু প্রেমালাপ করি!

ডুমুর ঘুরিয়ে দাঁড়িয়ে বলে, কী বললি?

কিছু না। তুই যা।

ডুমুরের মুখটা মেঘলা সকালের ধূসর আলোয় অস্বাভাবিক লাল দেখাল কি? মামুন বুঝতে পারে না। ডুমুর আবার ঘুরেছে পাটক্ষেতের দিকে। যেতে যেতে হঠাৎ দাঁড়াল। একটা পা তুলে ঝুঁকে কাঁটা ছাড়াল। পায়ে হালকা রবারের চটি আছে। কাঁটা বিঁধল কীভাবে? কিংবা নেহাত ঢঙ। তবে লজ্জার চোটেই পালিয়ে গেল। প্রেম-ট্রেম না বললে কিছুক্ষণ বসে থাকত।

মামুন বাঁধ ধরে সোজা হাঁটতে থাকে। খামরুবুড়োর কুঁড়েতে গিয়ে আড্ডা দেবে। ওখানে নদীর তলায় ডোবার মত একটা দহ আছে। জলটা স্বচ্ছ। সেই জলে রান্নাকরা ভাতের স্বাদই আলাদা। ওর বোনঝি রেলের নয়ানজুলি ছেঁচে চুনোমাছ ধরে আনবে। ক্ষেতের কুমড়ো বেগুন টমাটোর সঙ্গে চুনোমাছের ঘ্যাঁট। দারুণ লাগে!

পাটক্ষেতের আলে দাঁড়িয়ে ডুমুর ঘুরে তাকে দেখছে। মামুনের বুকটা ধড়াস করে ওঠে। ডুমুর দূর থেকে যেন চিরকাল অমন করে তার দিকে নজর রেখেছে। ডুমুর কি তার অস্তিত্বের অপরাংশ—নাকি শুধু ছায়ার মত সত্যমিথ্যাময় এক প্রতিভাস? যত দূরে যাক, যত আড়ালে থাক, ডুমুরের হাত থেকে তার রেহাই নেই। সে মামুনের শৈশব, কৈশোর এবং প্রথম যৌবনের সঙ্গে মিশে রয়েছে।

যেতে যেতে যতবার ঘোরে, দেখে ডুমুর তেমনি দাঁড়িয়ে। মামুনের গলায় কী এক কষ্টের ডেলা আটকে যায়। কী আশ্চর্য! ওই মেয়েটিই তো তার চিরকালের বাসস্থান। সেখানে মামুন ছাড়া আর কেউ বাস করতে এলে মামুন তাকে জবাই করে ফেলবে।...

বাবলানদীর ব্রিজে আর যায় না সন্ধি দিয়াড়ি। স্টেশনে এসে বসে থাকে। প্ল্যাটফর্মে ঘোরাঘুরি করে সকাল-বিকেল। জাল বোনা শেষ হয় না। কিন্তু আগামী মরশুমে বাবলার জলে চিতল মাছ ধরার স্বপ্নটা আর দেখে না। জালটা শেষ হলে হাটবারে বেচেই দেবে বরং। এখন তার স্বপ্ন চা-পান-বিড়ি-সিগারেটের দোকানটার। অবিকল দেখতে পায়. সেই ছবি। চাকা লাগান দোকান-গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।

ট্রেন এসে থেমেছে। কত ভিড়। সন্ধি মস্ত কেটলি থেকে চা ঢালছে। পয়সা গুনছে। কত সাদা ঝকঝকে পয়সা। সন্ধি টাকাপয়সার বেশি মূল্য দেয় জীবনে।

গোড়াবাঁধান পিপুলগাছের তলায় বসে চোখ বুজে সন্ধি তার দোকান দেখছিল। ঢং ঢং করে টিকিটের ঘণ্টা পড়ল। নটা পাঁচের আপ গাড়ি আসছে। জঙ্গিপুর ধুলিয়ান নিমতিতা ছাড়িয়ে চলে যাবে বারহারোয়া অব্দি। চাকা টেনে টেনে ঠুকুস ঠুকুস করে যাবে। জংধরা সেই লোহালক্কড় পুরনো আমলের। সন্ধির জীবনে এ লাইনে আর নতুন গাড়ি এল না। শুধু প্ল্যাটফর্ম উঁচু হয়েছে। বিজলিবাতি হয়েছে। এই যা।

ঘণ্টা শুনে চোখ খোলে সে। সেই সময় কেউ এসে তার সামনে দাঁড়ায়। বলে, হামরে রূপেয়া দে।

সন্ধি ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায়।

দে হামরে রূপেয়া!

সন্ধি ঘোলাটে চোখে তাকিয়ে থাকে। রূপেয়া সঙ্গে নিয়ে ঘোরে নাকি কেউ? পোড়ো উনুনের তলায় কৌটোর মধ্যে রেখেছে। পোস্টাপিসে জমা দেয়নি। মাল-উল কিনতে হবে না দোকানের? রেল-কনট্রাক্টরকে বলে দিয়েছেন বড়বাবু। চাকা-লাগান দোকানগাড়ি শিগগির এসে যাবে। তার জন্যে আগাম বিশ টাকা আদায় দিয়েছে। বাকি টাকা মেটাতে হবে।

তোঁহার গে পাঁচ শও রূপেয়াকা লোট দেইলা। তোঁহ বাবা না ছে। দে হামরে রূপেয়া।

সন্ধি ঘড়ঘড় করে বলে, বৈঠ রী। একহি বাত শুন্।

নাহিক। রূপেয়া দে। হাম টেরেনমে চড়হলবে।

বেটিয়া!

কৌন তোহার বেটিয়া বা? দে হামরে রূপেয়া।

বাতহি শুন রী বেটিরা। সন্ধি ভাঙা গলায় বলে। নীল জামা তুলে নাক মোছে। দিয়াড়িভাষায় বাপের গলায় বলে, সব শুনেছি। তোকে ছাড় দিয়েছে। সব গয়নাগাঁটি কেড়ে নিয়েছে। তোকে মোতিহারিতে রাখতে গিয়েছিল, তাও শুনেছি সুরেনের কাছে। তো তুই জাত দিয়েছিলি। তোকে এখন ছাড় দিয়েছে। আর কিসের জাত তাহলে? দেখ্ বেটি, তুই যখন জাত দিয়েছিলি, তখন আমারও জাত গিয়েছিল। কাহে কী, তোঁহ হামরে বেটিয়া!

নির্মলার মাথা থেকে ঘোমটা খসে গেছে। ভারি স্যুটকেস নামিয়ে রেখে হিংস্র ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছে সন্ধি দিয়াড়ির দিকে। নাকের ফুটো ফুলে উঠেছে। চোখ থেকে সানগ্লাসটা খুলে মুঠোয় ধরে হিসহিস করে বলে, নাহিক।

হ্যাঁ। তোঁহ হামরা বেটিয়া। সন্ধি ফের বলে। তুই কোথায় যাবি? আমার তোর দুজনেরই জাত গেছে না? হামি মলে ওরা মড়া ছোঁবে না। বেটিয়া, হামারে ইঁহ দুকান দিব। রেলের জায়গায় একটা ছোট করে ঘর বানাব। তুই আমি মিলে বেওসা করব। আ, সাথ ঘর আ।

সন্ধি নড়বড় করে ওঠে। নির্মলা বলে, নাহিক্।

ডর কিসের বেটি? কুলবাড়িওলা গায়ে হাত দিতে আসুক না, দেখি। বড়বাবু বলেছে, থানায় রেপোর্ট ভেজবে। সন্ধি আঙুল দেখায়। দো দিন—ব্যস! টিশনে চলে আসব আমরা! চায়কা দুকান দিব। ধৌলির দুধও আছে। ওই দেখ্, ওখানে কত ঘাস।

সন্ধি নির্মলার স্যুটকেসটা কেড়ে নেয়। পা বাড়ায়। তারপর ঘুরে দেখে নির্মলা কাঁদছে। পিছিয়ে এসে তার পিঠে হাত রেখে ঠেলে। বলে, আ আ।...

হাওড়া-বারহারোয়া প্যাসেঞ্জার ট্রেন বাবলানদী পেরিয়ে ধনুকবাঁকা হয়েছে। ডিসট্যান্ট-সিগন্যালের কাছে যেতে যেতে ট্রেনটা বাবা-মেয়েকে পেরিয়ে যায়।

ওপাশে ইয়ার্ডের দিকে জালধরা হাতটা তুলে সন্ধি মেয়েকে বলে, খুব জান দিচ্ছে লোকেরা আজকাল। কাল সন্ধ্যাবেলা ওখানে এক মিয়াসাব জান দিয়েছে বেটি। খোঁড়া সেই মিয়াসাব—চিনলি না?

নির্মলা বলে, হুঁ।

সন্ধি সিগন্যালের পাশে দাঁড়িয়ে বলে, ওদিন রতিয়া জান দিল। কী করবে? মানুষের কষ্ট যখন বেড়ে যায়, আর কিছু উপায় থাকে না, তখন জান দেয়। রতিয়ার চুলগুলো ওখানে পড়ে ছিল। কুকুর টেনে নিয়ে গেছে।

নির্মলা আস্তে বলে, হামরে শোচা তোঁহর লাস। দৌড়কে আইলা ইঁহতক্। দেখলা রতিয়াকি।

সন্ধি একটু হাসে। ...হ্যাঁ হ্যাঁ। হামরে দেখা বা। আমার চোখে নজর যত কমে যাক্, আমি কি তোকে চিনতে পারব না বেটি? একদিন তুই ট্রেক্টরে বৈঠা ছিলি, হামরে দেখলা।

নির্মলা বলে, ছোড় গে।

কুলবেড়ের দিয়াড়ি-দিয়াড়নিরা যে-যেখানে ছিল, সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে বাপ-বেটিকে। তাজ্জব হয়ে গেছে। ঠাকুরবাবার দুনিয়াতে এসব কী হচ্ছে গে? পুবের সূরয কি পশ্চিমে উঠছে গে?

সব্বাইকে শুনিয়ে-শুনিয়ে সন্ধি দিয়াড়ি ঘোষণা করে, স্টেশনে দোকান দেব। স্টেশনে থাকব। গাঁওবালার সঙ্গে কিসের সম্পর্ক? আমি রেলের লোক। তু হামরা বেটিয়া, তো তোঁহকি রেলকি। আ, আ।

দিয়াড়নিরা তফাতে দাঁড়িয়ে বলাবলি করে, সুটকঁইস ভরকে রূপেয়া লাইলে গে! রূপেয়াসে মুহা বনধ কারলে। বুঢ়া সন্ধিয়ার চিরকাল রূপেয়ার লাল্‌চ কে না জানে? বেটিকে দিয়ে খানকিগিরি করাত পর হাসিমুখে রূপেয়া গিনত। সেই জন্যেই তো বহু মরে গেলে আর বিডা করেনি। তো ইঁহসে খানকিবাজি নাহিক চল বৈ। এ ভারুয়া! এ শুকুল! ওগে ধনপতিয়া! আর কতকাল এসব সহ্য করবি তোরা?

ভারুয়ার বউ কসিলা বলে, চুপ রী! টিশনে ভেগে যাবে বাবা-বেটি। গাঁও ছেড়ে চলে যাবে।

ভারুয়া সন্ধির বসতবাটি কিনে নেবে। কথা হয়ে আছে। কসিলার লোভ ছিল গাইগরুটার ওপর। কিন্তু ধৌলিকে বেচবে না সন্ধি। ধৌলি এখন মেঘলা আকাশের নিচে মাথা গুঁজে নয়ানজুলির ঘাস খাচ্ছে। তার লেজের দিকে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে আছে ধনিয়া ছোকড়ি। তার কাঁখে গোবর কুড়নো ঝুড়ি। হাতে একটা ছোট্ট কঞ্চি। ধৌলিকে দুদিন থেকে ডিসট্যান্ট-সিগন্যালের পাশে লাইনের ধারে বাঁধে নি সন্ধি। ওখানে রতিয়ার রক্তমাখা চুলের চাবড়া পড়ে ছিল। অনেকটা জায়গা জুড়ে চাপ চাপ রক্ত ছিল। রক্তের ওপর নাদলে সে গোবর কুড়ুত না ধনিয়া। মানুষের রক্ত যে।

বাবলানদীর দিকে শব্দ। ব্রিজ পেরুচ্ছে ঝমর ঝম এক মালগাড়ি। পেরিয়ে এসে ধনুকবাঁকা হতে হতে চেরা গলায় কাঁপা-কাঁপা হুইসল দিচ্ছে। কুলবেড়ের বাঁকের মুখে ডিসট্যান্ট-সিগন্যালের মাথায় আজ সেই শকুনটা নেই। দিয়াড়িদের কাচ্চা-বাচ্চারা হেসে কুটি কুটি হয়ে চেঁচাচ্ছে, ডর বেজেছে! রেলগুড্ডিঠো ভয় পেয়েছে! কুলবেড়ের বাঁকে একটা করে রেলগাড়ি আসে আর ধনুকবাঁকা হয়ে কিছুক্ষণের জন্যে কুলবেড়ের জীবনের দুঃখ-রাগ-হিংসা-শোক-আক্রোশ-ক্ষোভ-অনুশোচনাকে ঝমর ঝম শব্দের দৈর্ঘ্যে চাপা দিয়ে যায়। কিছুক্ষণ সবাই চুপ করে থাকে। গতি দেখে। গতি টের পায়। ক্রমে ক্রমে ঝমর ঝম সেই গতি রক্তে ঢুকে যায়। ভেতরের অন্ধকার রেলপথে ডিসট্যান্ট-সিগন্যালের লাল জুগজুগে আলো কখনও সবুজ হয়ে যাবে একদিন...

প্রেম-ঘৃণা-দাহ

সকালের দিকে কিছুক্ষণ প্রত্যেকে যেন একলা হয়ে পড়ে। রুচি— সে ভোর ছ'টায় উঠে ব্যাপারটা বেশ টের পায়। তাছাড়া আরও একটা অদ্ভুত ঘটনা সে লক্ষ্য করে। দোতলার পুবের ব্যালকনি সমেত দু'কামরা ফ্ল্যাটটা নিয়ে পৃথিবীও খানিকটা অস্পষ্ট আর অবাস্তব হয়ে পড়ে। ঘষা কাচের ভেতর দিয়ে দেখা দৃশ্যের মত।

তখন কিছুক্ষণ তো তার কথা বলতেই ইচ্ছে করে না কারো সঙ্গে। ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে সূর্য ওঠা এবং রেলপথের ধারে প্রচুর কুরুচিকর কর্মও রুচি নির্বিকার চোখে দেখতে পায়।

কিচেনে অশ্রুর খুটখাট শব্দ পেলে রুচির সেই বিচ্ছিন্নতার বোধটা সরে যায়। এক পেয়ালা চা রুচিকে বাস্তবতার দিকে টেনে আনতে যথেষ্টই। এবং এসময় তার কষ্ট হয়। কারণ, এতক্ষণ তাকে এত অসহায় ও এত ছোট্ট মনে হয়েছিল— শুধু একলা লাগা নয়, মনে হয়েছিল যেন তার বেঁচে থাকার কোন উদ্দেশ্যই নেই।

অশ্রু ওঠে সাড়ে ছ'টায়। ন'টায় ওর স্কুল শুরু। বেরোতে হয় সাড়ে আটটায়। আগের সন্ধ্যায় বাজারটা করা থাকে। একটা পুরনো ও গর্জনকারী ফ্রিজ আছে ডাইনিং স্পেসের এককোণে। কিচেনে গ্যাসের উনুন আছে। কেরোসিন কুকার ও হিটার আছে। এক ঘণ্টায় চারটি মেয়ের রান্নার পক্ষে যথেষ্ট উপকরণ।

অশ্রুকেই গৃহিণী বলা যায়। তাই ওর গিন্নিদি নামও চালু আছে। তবে ওইসব উপকরণের আদি মালিক বিবিদি অর্থাৎ বৈজয়ন্তী ব্যানার্জি। অত বড়ো নাম উচ্চারণ করার ঝামেলা আছে বলে অশ্রু প্রথম আদ্যক্ষর নিয়ে 'বিবি' চালু করে।

ফ্ল্যাটটা বিবিদির স্বামীর নামে। সেই ভদ্রলোক নাকি হঠাৎ স্ত্রীকে ছেড়ে চলে যান— আর পাত্তা নেই। তা বলে বিবিদি খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেননি, কিংবা থানায় যাননি। তিনি যেন জানতেন, নীতীশবাবু কোথায় কী উদ্দেশ্যে গেছেন।

বিবিদি ওঠেন সাড়ে সাতটায়। বেরোন সেই বিকেল তিনটেয়। ফ্লাস্কভর্তি চা ওঁর পাশের টেবিলে অশ্রু রেখে যায়— নিঃশব্দে। এই ভদ্রমহিলার সম্পত্তি ভোগদখল করছে বলেই কি এভাবে খাতির করে চলতে হয়? রুচি প্রথম যখন আসে, এরকম ভেবেছিল পরে কিন্তু বুঝতে পারে, না— বিবিদি এক অক্ষয় বটের মতো। তাঁর বিশাল বুকে অনেক ক্লান্ত পাখির জন্যে ঠাণ্ডা ছায়া ও নিরাপত্তা আছে। অত সুন্দর করে কেউ বলতে জানে না, কেউ অমন সুখে কিংবা দুঃখে বাঁচাতেও জানে না। রুচি তার আঠারো বছরের জীবনে— যে জীবন অনেক পোড়খাওয়া, অনেক গোপন কদর্যতার ক্ষত-চিহ্নে ভরা— এমন মানুষ দেখেনি। রুচির এত বল এসেছে বুকে, এত সুখ।

বিবিদি কী, তার প্রমাণ গত রাতে আবার নতুন করে পাওয়া গেছে। ঋতু অর্থাৎ জাহানারা বেগম ফিরে এসেই ফের নিজের জায়গাটি পেয়ে গেছে। বিবিদির ঘরের দ্বিতীয় খাটটি দু'মাস ফাঁকা পড়েছিল ঋতুর অভাবে। মেয়ের জন্যে অশ্রু আর রুচি বরাবর তাগিদ দিচ্ছিল বিবিদিকে। বিবিদি মৃদু হেসে বলতেন— 'ব্যস্ত হয়ো না, দেখছি।'

উনি যেন জানতেন, ঋতু ফিরবে। চোখের জলে নাকের জলে একাকার হয়েই যেন ফিরবে। ফিরেছে সেভাবেই। তবে জলের সংখ্যা একটু বাড়তি। সেটা হচ্ছে বানের জল। হুগলি জেলার যে পাড়াগাঁয়ে স্কুলের চাকরি নিয়ে ঋতু চলে গিয়েছিল, সেখানে এখন এই সেপ্টেম্বরে অগাধ বানের জল।

মুণ্ডেশ্বরী নদী ফেঁপে উঠেছে। গত ক'দিন ধরে খবরের কাগজে সেখানকার ছবি বেরিয়েছে। আর, তাই কি বিবিদি গত কয়েকদিন ধরে ঋতুর কথা বলছিলেন সবসময়?

অশ্রু বা রুচি কিন্তু ভাবেইনি এদিকটা। ঋতু বানের জলে নাকানি-চোবানি খাচ্ছে, এটা তাদের মাথায় আসেনি। আসলে গ্রাম সম্পর্কে দু'জনের কোন ধারণা তো নেই।

ঋতু দারুণ ঘুমোচ্ছে আজ। রাতে বৃষ্টি হয়েছিল। আবহাওয়া বেশ ঠাণ্ডা। মশারি ছাড়া শোওয়া যায় না, এত মশা এদিকটায় বারোমাস। পাশেই খাটাল আর রেলপথের দু'ধারে খাল অর্থাৎ নয়ানজুলি। প্রচণ্ড মশা হয় এর ফলে।

ঋতু ঘুমোচ্ছে এখনও— সে কি ওর লজ্জাভাবের দরুন মশারির মধ্যে আত্মগোপন? রুচির মনে প্রশ্নটা আবছাভাবে এসেছে। ঋতু বরাবর খানিকটা নাটুকে মেয়ে— যাকে বলে, হুট করে 'সিন ক্রিয়েট' করে। রাত ন'টায় আচমকা এসে সে কি কান্না, সে কি কান্না! কাঁদতে ঋতুর লজ্জা নেই, সবাই জানে। কিন্তু পরে বেচারা বড্ড মুষড়ে যায়। লজ্জা পায় যেন। চুপচাপ বই-টই নিয়ে একলা থাকার চেষ্টা করে।

তাই রুচির মনে হল, ঋতুকে আগের মত সহজ হতে দেওয়া দরকার। ঋতু ফিরেছে বলে আনন্দ তো তারও কম নয়। যদিও একটু আগে রাতের ব্যাপারটা অবান্তর লাগছিল। এখন চায়ের পেয়ালা হাতে তার স্নায়ুগুলো তীক্ষ্ণ আর সজাগ, রুচি পা টিপে টিপে বিবিদির ঘরে গেল।

ঘরের দু'দিকে জানালার পাশে দুটো নিচু খাট। বোঝাই যায় একসময় ও-দুটো জোড়া লাগিয়ে স্বামী-স্ত্রী শুত। সে আগের ব্যাপার। রুচির কাছে খুব স্পষ্ট কিংবা বাস্তব নয় তা।

ঋতু তার সুন্দর নেটের মশারিটা খুইয়ে আসেনি বানের জলে। পাছে বিবিদির ঘুম ভাঙে (ভদ্রতাবোধের দরুন), রুচি আস্তে মশারি তুলে ওপরের শরীরটা সাবধানে ঢোকাল। দেখল, ঋতু জেগেছে। মশারির বাইরে থেকে ভেতরের কিছু দেখা যায় না— কিন্তু ভেতর থেকে বাইরের সব দেখা যায়। তাই ঋতু দেখছিল রুচি আসছে বা কী করতে যাচ্ছে।

আশ্চর্য লাগল রুচির— ঋতু নিঃশব্দে ফুলো-ফুলো মুখে হাসছে। অবশ্য চোখদুটো লাল। রুচি ফিসফিস করে বলল, 'ওঠ।'

ঋতু হাসছে। ওর হাসির মধ্যে একটা স্বাভাবিক ব্যর্থতার ভাব আছে, যা ওর পক্ষে ব্রহ্মাস্ত্র।

রুচি চায়ে চুমুক দিয়ে বলল, 'কাল এতক্ষণ কী করছিলে? নিশ্চয় ঘুমোচ্ছিলে, না?'

'বেহুলার ভেলায় ছিলুম।' আস্তে ঋতু জবাব দিল।

'যাঃ।'

'হ্যাঁ। সত্যি বলছি। কলাগাছ দেখেছ তো? ওখানে সব মোটা মোটা কলাগাছ হয়। তাই দিয়ে সেক্রেটারির লোকেরা মাচার মত করে ভেলা ভাসিয়ে আনল। ওতে চেপে আড়াই মাইল দূরে একটা উঁচুমত জায়গায় গেলুম। সে এক থ্রিলিং ব্যাপার। দারুণ অভিজ্ঞতা হল কিন্তু!'

রুচি একটু নিস্পৃহ ভঙ্গিতে বলল, 'অমন থ্রিল কলকাতায় সারা সিজন পাচ্ছি। তুমি জানো কিছুদিন আগে নৌকো চলেছিল অনেক রাস্তায়? ওঠা।'

'উঠি' বলে ঋতু ওর পেটের কাছটায় আঙুল বোলাতে থাকল।... 'রুচি, তুমি আমার চিঠির জবাব দাওনি কিন্তু!'

'খুব রেগেছিলে তো?'

'হুঁ-উ। বিবিদি হপ্তায় একটা করে লিখেছেন। অশ্রুদি অবশ্য ব্যস্ত থাকে। টিউশনি, — নানারকম। কিন্তু তুমি?'

'সত্যি বলছি, আমার কী হয় জানো— একেবারে কথা আসে না লিখতে। তুমি আবার সাহিত্য বোঝো কি না — ভুল-টুল করে ফেলবো ভাষায়, হাসবে! ঋতু, এই দু'মাসে কী সব করলে?

ঋতু বলল, 'ভ্যাট! সে এক জাহান্নাম— মানে, নরক জায়গা। সব শোনাব ডিটেলে। তাকে বানের জলে ভাসিয়ে দিয়ে এসেছি। গান-টানও। আমার গলায় হঠাৎ...'

'তুমি যাওয়ার পর সেই ভদ্রলোক একদিন এসেছিলেন। ঠিকানা চাইতে। দিইনি।'

ঋতু প্রায় উঠে বসল। — 'কে? কামাল? কবে, কখন?'

'কী ব্যাপার? ব্যস্ত কেন?' রুচি মিটিমিটি হাসতে লাগল।

ঋতু ধুপ করে এলিয়ে পড়ল বিছানায়।... 'ব্যস্ত না হাতি! বিবিদি ছিলেন না তখন?'

'না। ছুটির দিন। আমি একা ছিলুম।'

'তুমি ভেতরে বসতে দিলে নাকি?

'উঁহু। ডিসিপ্লিন।'

আচমকা বিবিদির আওয়াজ এল— 'পরশু কামালের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, ঋতু— বুঝলি? এসপ্ল্যানেডের ওখানে। ওর সঙ্গে সেই ছেলেটাও ছিল — পলিটিক্যাল ওয়ার্কার...'

এরা দু'জনে হতচকিত হয়ে একবার মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। তারপর ঋতু উঠে বসে চুল গোছাতে গোছাতে বলল, 'আপনার ওঠার হ্যাবিট বদলে গেছে দেখছি বিবিদি।'

'না রে। আজ কে জানে কেন, ভালো ঘুম হল না। ছাইপাঁশ সব স্বপ্ন।' — বলে মশারি থেকে মুখ বের করলেন বিবিদি— 'কামাল জিজ্ঞেস করছিল তোর কথা। বললুম, জানি না কোথায় আছে। মুখ দেখে মনে হল, বিশ্বাস করল না।'

ঋতুর আগে রুচি বেরিয়ে বিবিদির মশারি তুলতে থাকল। ঋতুও বেরিয়ে নিজের মশারি তুলতে তুলতে বলল, 'কামালদা কিছু বলল নাকি?'

'তেমন কিছু না। খোঁজ করছিল। তবে কামাল বলল, তোর মা নাকি একবার চুপি চুপি দেখা করতে চেয়েছেন তোর সঙ্গে। কি কথা আছে।'

ঋতু স্থির দাঁড়িয়ে বলল, 'বাবা আগে কবরে যান, তারপর মায়ের সঙ্গে বোঝাপড়া করব।'

বলেই সে হনহন করে বেরিয়ে বাথরুমের দিকে চলে গেল।

বিবিদি হাসছিলেন। রুচি বলল, 'বেড-টি খাবেন তো? ঢেলে দেব?'

'দে।' বলে চিত হয়ে শুলেন বিবিদি। — 'জানিস রুচি, ভাগ্য বলে একটা ব্যাপার আছে— এতদিন মানিনি, মানতুম না। এখন মনে হয়, কী যেন একটা যোগ বিয়োগ গুণ ভাগের অঙ্ক কষা চলেছে আড়ালে। ঋতুটার কিছু সইছে না।'

ফ্লাস্ক থেকে চা ঢালতে ঢালতে রুচি বলল, 'ঋতু একটু তেজী।'

'বরং মেজাজী বল্। হুট করতেই জ্বলে ওঠে, আবার পরক্ষণে কান্নাকাটি।'

অশ্রু এল। — 'ইস! কী ব্যাপার বিবিদি?'

'কী রে অশ্রু?'

'এরি মধ্যে আপনার রাত পোহাল যে?'

'আজ কেন যেন ভালো ঘুম হল না। তার ওপর পাশের একটা দাঁতে কী হয়েছে, দেখাব ভাবছি।'

ঋতু বলল, 'উঁহু! খবরদার বিবিদি, ডেন্টিস্টের কাছে কক্ষনো যাবেন না। ঠিক তুলে দেবে।'

বিবিদি সস্নেহে বললেন, 'তুলে দিলে কী হবে? কথায় বলে না— খারাপ দাঁত গোড়া সুদ্ধ উপড়ে ফেলতে হয়।'

'উঁহু, চোয়াল বসে যাবে।'

'তাতে কী? বয়স তো হয়েছে।' বলে কাত হয়ে পেয়ালায় শান্ত চুমুক দিলেন বিবিদি।

অশ্রু কপট রাগে ও ঝাঁজে বলল, 'ফের বয়সের কথা। আপনি আমার সমবয়সী তা জানেন? ঋতু, তুই বল্ না— পাশাপাশি কাকে বড়ো দেখায়? আমাকে, না বিবিদিকে?'

রুচি নির্বিকারভাবে বলল, 'বিবিদিকে।'

অশ্রু সিরিয়াস মুখে বলল, 'ওটা পারসোনালিটির ছাপ। বিবিদি তো আমার মতো হইচই করা মেয়ে নন।'

বিবি-বৈজয়ন্তী হুড়মুড় করে উঠে বলল। — 'কী বললি, কী বললি? ন্যাকামির জায়গা পাসনি? এই রুচি, কী বলছে রে ও! যেন স্টেজে আমাকে কখনো দেখেই নি। খুব তো ফুর্তির বড়াই করছিস— পারবি একদমে দেড়ঘণ্টা পা চালিয়ে যেতে?'

অশ্রু না দমে বলল, 'সে আপনি অন্য একজন।'

বিবি ভেংচি কেটে বলল, 'হুঁ-উ! সে আমি উর্বশী!' তারপর হাসতে লাগল।

রুচি বলল, 'রবীন্দ্রসদনে আপনার ফাংশনটা কবে হবে.য়েন?'

'কেন? তুই যেতে চাস?'

'হুঁ-উ!'

'যাস।'

সেই সময় ঋতু অদ্ভুত কায়দায় বাংলা-ইংরেজি খবরের কাগজদুটো নিয়ে তোয়ালেতে মুখ মুছতে মুছতে এ ঘরে এল। ইংরেজিটা বিবির খাটে রেখে বাংলাটা নিয়ে নিজের খাটে বসল। অশ্রু বলল, 'ঋতু, নতুন হয়ে গেছ বলে খাতির নেই। ডাইনিংয়ে গিয়ে চা-টা খাবে তো খেও। রয়েছে। আমি এখন বাথরুমে ঢুকব।'

ঋতু কাগজ দেখতে দেখতে বলল, 'রুচি এনে দেবে। ইস! বিবিদি, ফ্লাডের খবর! ভাবা যায় না— আমিও এই লোকগুলোর মধ্যে ছিলুম। ঠিক একই অবস্থায়। রুচি, এই দেখে যা সেই বেহুলার ভেলা।'

রুচি কিছু না বলে চলে গেল এবং অনুগত মেয়ের মতো ডাইনিং টেবিল থেকে চায়ের পেয়ালা আর চারটে টোস্ট এনে ঋতুর বিছানায় রাখল। ঋতু হঠাৎ খিলখিল করে হেসে বলল, 'বাড়িতে আমরা কখনও বিছানায় বসে খেতুম বলে শ্যামলদা রাগাত— মুসলমানী ফুডস্ ভালো, কিন্তু ইটিং সিস্টেম বড্ড নোংরা!'

বিবি বলল, 'হ্যাঁ রে, তোর স্কুলের সেক্রেটারি তো হিন্দু?'

'হ্যাঁ। ভদ্রলোকের নামটা গালভরা। ভবার্ণব ভট্টাচার্য!'

এমনভাবে উচ্চারণ করল ঋতু, যে ওরা দু'জনে হেসে ফেলল। আর ঋতুর এই সরল হাসিখুশি হাবভাবে একটা উদ্ধারের সুখ খেলা করছে জেনে দু'জনেই খুশি হয়েছে। না— ঋতু বদলায়নি। যা ছিল, তাই আছে। প্রাণবন্ত, মেজাজী, চঞ্চল। ঋতু বলতে থাকল, 'এই ভবার্ণব ভট্টাচার্য মশায়ের দু'পক্ষের আঠারো-উনিশটা ছেলেমেয়ে। আপন্ গড— আপনার দিব্যি বিবিদি!'

রুচি বলল, 'সব ইনট্যাক্ট রয়েছে— মানে ছেলেমেয়েরা?'

'নিশ্চয়। অবশ্য বানের জলে ভাসছে— এই যা।'

'অবিশ্বাস্য!'

'কেন, কেন?'

'এ যুগে— যাঃ! কোথাও শুনিনি, কারো অতগুলো বাচ্চা হয়!'

'পক্ষ যে দুটো— কৃষ্ণ আর শুক্ল।'

'তার মানে অ্যাভারেজ ন'টা— ভ্যাট!'

বিবি বলল, 'ঋতুর বাড়াবাড়ি ধরে নিয়েও বলছি, তা সম্ভব। আমার ঠাকুমার তেরটা বাচ্চা— সব ছেলে। আমার বাবা সবার ছোট অবশ্য।'

রুচি বলল, 'ওরে বাবা'! আপনার জ্যেঠামশাইরা কোথায় এখন?'

'ফরিদপুরে ছিলেন। দেশভাগের পর কে কোথায় আছেন, জানি না। খোঁজও রাখি না।'

ঋতু বলল, 'রুচি, রুচি'! তুই শিশু, শিশু! আমার ঠাকুরদার মোট বিয়ের সংখ্যা কত জানিস? বারো। সন্তান সংখ্যা গড়ে চার— দ্যাট ইজ, ফরটি এইট।'

বিবি বলল, 'ঋতুটা সবকিছু বেলুনের মতো ফুঁ দিয়ে ফোলায়। এজন্যেই ও মাঝে মাঝে ঝামেলায় পড়ে'।

'পড়ি— আপনি আছেন, তাই।' বলে ঋতু টোস্টে আলতো কামড় দিল।

বিবি ওর কথার সুর আঁচ করে একটু সিরিয়াস হয়ে বলল, 'আসলে পলিগেমি মধ্যযুগের কারবার। কি মুসলমান, কি হিন্দু — সবাই একগাদা বিয়ে করত। কেন? আমাদের কুলীনরা? হ্যাঁ — ভাল কথা, মনে পড়ে গেল। জাহানারা, তোর সেই পার্কসার্কাসের বন্ধুরা এসেছিল মধ্যে একবার। কোথায় কী সভা-টভা করবে বলছিল— মুসলিম পারসোনাল ল'এর ব্যাপারে।'

'পারসোনাল ল'তে আমার মাথাব্যথা নেই।'

রুচি সকৌতুকে বলল, 'এই ঋতু! ধর— তুই বিয়ে করলি। তোর কর্তা তো আইন অনুযায়ী অনেক বিয়ে করতে পারে—'

কথা কেড়ে বিবি বলল, 'অনেক নয়— একেবারে চারটে অব্দি।'

'বেশ— চারটে। তো তুই তখন কী করবি রে?

ঋতু বলল, 'বিয়ে যদি করি— মুসলমানকেই করব, তার মানে আছে?'

বিবি হেসে উঠল। — 'হল হল তো! রুচি, এখন কী জবাব দিবি?'

রুচি বলল, 'মুসলমান বর ছাড়া অত তেজী মেয়ে ট্যাকল করতে পারবে না কেউ।'

অমনি ঋতু বলে উঠল, 'তুই কী করে জানলি মুসলমান বরের হালচাল— ট্যাকল করার শক্তি? বিবিদি, এখন অনায়াসে রুচিকে আমরা সন্দেহ করতে পারি না?'

'পারি। রুচি, জবাব দে।'

রুচি মিটিমিটি হাসছিল। বলল, 'কথাটা স্বয়ং জাহানারা বেগমেরই। একদিন বলেছিল, টুকে রেখেছি।'

ঋতু বলল, 'অর্থাৎ পরস্মৈপদী ধারণা বলতে চাস?'

'নিশ্চয়!'

বিবি বিছানা থেকে নেমে বলল, 'আজ আর আসন করতে ইচ্ছে হচ্ছে না। থাক গে! কী হবে! মেদবৃদ্ধি হচ্ছে হোক, সারাজীবন নেচেনেচে কাটাব— তার দিব্যি তো কেউ দেয়নি! কী বলিস তোরা?'

রুচি আকাশ দেখে নিয়ে বলল, 'বৃষ্টি হলে আজ অফিস কামাই করব। তারপর...'

ঋতু কিছু বলল না— তার ঠোঁটে গূঢ় হাসি। বিবি বলল, 'তারপর?'

'হারানো ঋতু ফিরে এল। গান-টান শোনা যাবে।'

বিবি হাসতে হাসতে বেরুল। এখন কিছুক্ষণ ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। নোংরামি ও সৌন্দর্যে সাজানো পৃথিবীকে দেখবে চুপচাপ। এসময় মানুষকে এত একলা আর দুঃখী লাগে।

ঋতু গলায় হাত রেখে বলল, 'গান-টান ভুলে গেছি রে।'

'কেন? তুই তো গানের দিদিমণি হয়ে গিয়েছিলি। গান শেখাতিস না?'

'অল্প-স্বল্প। যত সব গেঁয়ো ভূতের কারবার। জানলায় ভিড়, দরজায় ভিড়— হেডমাস্টার ভদ্রলোক একেবারে অথর্ব মানুষ। সে এক বিশ্রী পরিবেশ। তার ওপর হঠাৎ নতুন জায়গায় ক্লাইমেট ধাক্কা দিল একেবারে গলায়। গলাটা গেছে। ভয়েস শুনে বুঝতে পারছিস না?'

'মোটেও না।'

'আমার টনসিলে দারুণ কি ব্যাপার হয়েছে-টয়েছে। মধ্যে আরামবাগে এক ভালো ডাক্তারের কাছে গেলুম। দেখে বলল, অপারেশন ছাড়া উপায় নেই।'

'সেকি! গলা গেলে তোর চলবে কী করে?'

'জানি না।'

একটু চুপ করে থেকে রুচি বলল, 'সত্যি বলছিস?'

'হ্যাঁ। মাস্টারিটা যেতই — তবে ফ্লাড এসে পড়ে তাড়িয়ে দেবার অপমান থেকে বাঁচাল।'

'গলায় কী অসুবিধে হয়?'

'কেশে ফেলি। জ্বালা করে। তাছাড়া দম রাখতে পারিনে।'

'ঋতু! অত সুন্দর তোর ভয়েস ছিল রে!'

'গেছে।' বলে ঋতু ম্লান হেসে খুক খুক করে কেশেও ফেলল। — 'সারারাত প্রায় কেশেছি। শোনিসনি?'

'না তো!'

'বিবিদির ঘুম হয়নি তো ওজন্যেই। বলতে পারলেন না— এই যা। ভোরের দিকে একটুখানি কমেছিল— তখন যা একটু আধটু ঘুম হয়েছে।'

'সব সময় কাশি হয় নাকি?

'না। রাতে শোবার পর— কিম্বা গান গাইতে গেলে।'

'শিগগীর ডাক্তার দেখা, ঋতু। এ তো মারাত্মক ব্যাপার!'

এই সময় বাইরে অন্যমনস্ক একটা মেঘের ছায়া ঘনিয়ে এল। তার ফলে ঘরের ভেতরটাও হাল্কা অন্ধকারে ভরে গেল। কি যে একটা নৈরাশ্য ও বিষাদের ভাব ছিল প্রকৃতির এই সরল আকস্মিকতায়। কিছুক্ষণ দুটি মেয়েই চুপচাপ বসে রইল।

রুচি বয়সে ঋতুর চেয়ে ছোট। ঋতু ছোট অশ্রুর চেয়ে। আর বিবি তো বলে, তার নাকি বয়সের গাছপাথর নেই। কিন্তু সে সবই বাইরের চোখে। ওদের নিজেদের চোখে বেশির ভাগ সময় ওরা সমবয়সী। প্রত্যেকের স্বাতন্ত্র্য যা কিছু, বাইরের জগৎটা নিয়েই। এই ছোট ফ্ল্যাটে স্বাতন্ত্র্যগুলো রঙিন ছাতার মত গুটিয়ে আলনায় রেখে ওরা একাকার হয়ে ওঠে। এবং বাইরে পা দিলেই স্বভাবত যে যার সেই রঙ-বেরঙের ছাতা খুলে রাস্তা পার হয় বা হেঁটে যায়।

রুচি ঋতুর দিকে তাকিয়ে আড়চোখে তার কণ্ঠার হাড় দেখছিল। দু'মাস আগে যখন ঋতু বিদায় নিয়ে চলে যায়, তখনকার চেয়ে চেহারা টেঁসে গেছে। ঋতু বলেছিল সার্টিফিকেটে তার বয়স কাঁটায় কাঁটায় চব্বিশ— সেই জুনের শেষ হপ্তায়। ঋতুকে এখন অশ্রুর বয়সী দেখাচ্ছে। চামড়া কিছু ঢিলে হয়ে গেছে যেন। চোখের নিচে হাল্কা বাদামী ছোপ পড়েছে। অবশ্য ঋতু বরাবর খুব একটা সুন্দরীগোছের ছিল না। রুচির চেয়ে বেঁটে, হাড়গুলো মোটা, রঙটা যাকে বলে উজ্জ্বল শ্যাম। কিন্তু ওর চোখ দুটোর কোন তুলনা হয় না।

আর ঋতুর একটা স্বভাব— সে বেশি সাজগোজের পক্ষপাতী নয়। ওর শখ বা ফ্যাশন যা কিছু, তা চুলে। মাসে একবার করে কোত্থেকে চুলের ডগা ছেঁটে এসেছে বরাবর। যাকে বলে ববছাঁট। ঝুলহাতা সাদা ব্লাউস আর ফিকে একরঙা শাড়ি পরা ওর অভ্যাস। তবে ওই চুলের দরুন ওকে সাদাসিধে দেখায় না— বরং মনে হয়, কোথাও ওর একটা ঔদ্ধত্য রয়েছে।

রুচি এই আস্তানায় ওঠে একবছর আগে। ঋতুর সঙ্গে তখনই পরিচয়। প্রথমে দিনকতক তো বুঝতেই পারেনি ও মুসলমান মেয়ে। পরে সেটা টের পেয়ে একটুখানি অকারণ অবাক আর অস্বস্তিতে পড়েছিল। ক্রমশ সব ঠিক হয়ে যায়। ঋতুর মধ্যে আপত্তিকর কিছু দেখেনি সে।

তেমনি অশ্রুর বেলাও একই ব্যাপার। অশ্রুকণা সরকার — কার সাধ্য বোঝে ও খ্রীস্টান মেয়ে। মাথার কাছে যীশু বা মেরীর ছবি রাখে না, গীর্জায় যায় না। নিজের কমিউনিটির সঙ্গে কোন যোগাযোগ নেই। কেবল বড়দিনে মহাসমারোহে কেক বানায়। তাতে কী? হিন্দু বাড়িতেও তো এসব হয়ে থাকে বড়দিনে। কিন্তু তাই বলে রঙিন বাল্ব, ফুলের ঝালর, বেলুন, সান্টা ক্লজ কিংবা খ্রীস্টমাস ট্রি নয়। ভাবতে অবশ্য খারাপই লাগে, এত বড় শহরে এমন কেউ কি নেই, যে অশ্রুকে বড়দিনের উপহার পাঠাতে পারে?

অশ্রু নরম এবং চাপা মেয়ে। কেউ কোনদিন ওকে ভারি বা ভিজে মুখে দুঃখিত হতে দেখেনি। ওর পেছনের জীবনে কিছু রহস্য আছে, রুচি আঁচ করে — কিংবা ঋতুও, কিন্তু তাই বলে তো কেউ কারও জীবনী দাবি করতে পারে না।

আবার ঋতু বা অশ্রুও ভাবে, রুচির পেছনের জীবনটা যত স্বল্প পরিসর হোক, তার কোন সাংঘাতিক রহস্যে ভরা। কিন্তু তারা কেউ কোনদিন রুচিকে সেটা জানাবার জন্য জোর করবে না। তবে মনে হয় সবার সব রহস্যের চাবিকাঠি বিবির হাতে। যেন বিবি সবই জানে। ঋতু যেমন ভাবে, অশ্রু আর রুচির জীবনীগ্রন্থ বিবিদির করতলগত— অশ্রু বা রুচিও তেমনি ভাবে, ঋতুরটা বিবিদির কব্জায় রয়েছে। বিবির ভূমিকা যেন অন্তর্যামী ঈশ্বরের মত।

কিন্তু বিবিরও তো জীবনী রয়েছে, রহস্যও থাকা সম্ভব। অবশ্যই।

তবে বিবি যেন কোথায় একটু উঁচু জায়গায় রয়েছে, তাই তার পেছনের দিকটা মুখ তুলে দেখতে ঘাড়ব্যথার কষ্ট আছে। সে কষ্ট পোয়াতে চায় না ওরা।

রুচি এই তিনজনের চেয়ে অন্তত এনাটমির ক্ষেত্রে সুন্দর। বিবির অমন ঝলমলে রঙ, একরাশ

আলুথালু চুল, ছন্দিত শরীর (নৃত্যচর্চার দরুন)— অথচ রুচি পাশ দাঁড়ালে বিবিকে ফ্যাকাশে বিধবা লাগে। এই মহিলা মেসে রুচি একটা শান্ত সৌন্দর্য— সে নিজেও জানে।

ভাগ্যিস, পাড়াটা একদিক থেকে ভালো যে, এখানে নিম্ন বা মধ্যবিত্ত বঙ্গীয় পরিবার নেই বললেই চলে। পূর্বে রেলপথ, উত্তরে প্রসারিত অবাঙালি মুসলমানদের বস্তি এলাকা— খোলার ঘর, দক্ষিণে উচ্চবিত্ত ব্যবসায়ী অবাঙালি হিন্দুদের বিশাল ছাড়া-ছাড়া উঁচু সৌধ এবং পশ্চিমে কতিপয় কারখানা। আর আছে হরেক বৃক্ষ। তারা অনেকে পুষ্পপ্রসবা। শিমুল, কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া এবং দেবদারু, পাম, জামরুল, পেয়ারা। বসন্তের শুরু থেকে চোখ জুড়িয়ে যায়। রেল-ফটকের ধারে কৃষ্ণচূড়া-বটের পরামাশ্চর্য অঙ্গসমন্বয়ের নিচে খোপড়িতে এক ভৈরবী থাকে— তার নাম সুশীলা। সুশীলাও তার জটায় কৃষ্ণচূড়া গোঁজে। ধাবমান রেলগাড়ির দিকে সুতীব্র প্রণয়ে সেই ফুল ছুঁড়ে মেরে খিলখিল করে হাসে।

এই তিনতলা বাড়িটায় বাঙালি বলতে আর দুটি পরিবার। এক রিটায়ার্ড ডাক্তার আর তার বউ পাশের ফ্ল্যাটে। তার ওপাশে এক বত্রিশ-তেত্রিশ বছরের মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ আর তার দারুণ সুন্দরী বউ— যে ভীষণ সাজতে ভালবাসে, আর তাদের একটি তিনবছরের ছেলে। তিনতলায় দুটো ফ্ল্যাটে চারটে মাদ্রাজী পরিবার মিলেমিশে পার্টিশন করে থাকে। একতলায় চারটে ফ্ল্যাটে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের আস্তানা।

রুচি ঋতু অশ্রু নিচের রাস্তা দিয়ে হেঁটে বড় রাস্তায় পৌঁছনোর সময় শিস দেবার কিংবা ফক্কুরি করবার মত যুবক থাকলেও তাদের সময় নেই। সবাই কাজের ছেলে। আর বিবির পেছনে লেগে আজকালকার মস্তানরা কোন ইন্টারেস্টই পাবে না। অবশ্য এ ভাষণ স্বয়ং বিবির। তাছাড়া অশিক্ষিত মস্তান বা তথাকথিত সমাজবিরোধীরা মেয়েদের পেছনে ওভাবে লাগে না। তারা ডিরেক্ট অ্যাকশনের পক্ষপাতী।

'হ্যাঁ, তোর গলাটা তাহলে সমস্যা।' বিবি ব্যালকনিতে আলোচনার ঢঙে ঋতুকে বলল। অশ্রু স্কুলে চলে গেছে। রুচি একটু পরেই খেয়েদেয়ে বেরোবে, এখন বাথরুমে ঢুকেছে। — 'রাতে তুই আসামাত্র ভাবছিলুম, ভালই হল। মনীশবাবুর সঙ্গে কথা বলল। ওরা আনকোরা প্লে-ব্যাক শিল্পী খুঁজছে। তোর গান তো মনীশবাবু শুনেছিল। খুব প্রশংসা করেছিল। তা তখন তুই গাঁয়ে? ভাবলুম থাক— বেচারাকে আর ভাঙচি দেব না। একটা অনিশ্চয়তার রিস্ক তো এ লাইনে আছেই।'

ঋতু শুধু ম্লান হাসল।

— 'সবই ভাগ্য! আগে মানতুম না— এখন মানি।' বিবি ভুরু কুঁচকে খালপোলটা দেখতে দেখতে বলল। 'ওই গান-গান করে তোর ফ্যামিলির সঙ্গে ঝগড়া — আর.. হ্যাঁ রে, ইতুর খবর রাখিস?'

'কিছুটা। জানো বিবিদি, ইতু আমাকে চিঠি লিখেছিল?'

'ঠিকানা পেল কোথায়?'

'যে গাঁয়ের স্কুলে ছিলুম, সেখানে একটা ছোট্ট বাজার মতো আছে। বাজারে একদিন শওকতের ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হ'ল। পাশের গাঁয়ে আত্মীয়ের বাড়ি এসেছিল। চিনতে পেরেছিল আমাকে। বলল, আপনি ভাবির (বৌদির) দিদি না? ইতুর খবর জানতে ইচ্ছে করছিল। তাই আলাপ করলুম। ইতু এখন বহরমপুরে রয়েছে। শওকত ওখানকার কলেজে লেকচারার হয়ে গেছে।'

'তাই বুঝি! বাঃ ইতুর ভাগ্য দেখছি তোর চেয়ে ঢের ভাল।'

বিবি হেসে উঠল।

'অমন ভাগ্য-টাগ্য তো চাইনি।' ঋতু মুখ নামিয়ে বলল।

বিবি একটু চুপ করে থেকে বলল, 'কিন্তু তোকে নিয়ে কি করা যায় বল্ তো? একটা কিছু তো করতে হবে। না— মেসের টাকাকড়ির কথা তুলছি না, সে কথা পরে।' আপাতত একটা চাকরি তোর দরকার। আর গলার চিকিৎসা....' বলেই একটু চঞ্চল হল বিবি।... 'ইউরেকা! আরে, এখানেই তো আমাদের জগন্নাথবাবু রয়েছেন! আয়, কথা বলে আসি। ভদ্রলোক নীলরতনে হার্ট স্পেশালিস্ট ছিলেন। তাহলেও ডাক্তার তো!'

ঋতু উৎসাহ দেখাল না। বলল, 'গান না হলেও আমি বাঁচব। আপনি বরং কোথাও একটু চেষ্টা করুন। দু'একটা মাস চালানোর মতো টাকা আমার আছে।'

'কিসের চেষ্টা?'

'চাকরির। যা হোক কিছু— এনি ড্যাম জব।'

বিবি রেগে গেল। '— তুই বড্ড নেমকহারাম। সেকথা তোকে বলতে হবে?'

দু'মিনিট চুপচাপ থাকল ওরা তারপর বিবি ওর দিকে তাকিয়ে কড়ামুখে বলল, 'আর দ্যাখ, আপনি বলাটা এখন ছেড়ে দে।'

ঋতু রোগা মিনমিনে গলায় বলল, 'বেশ তো। ওরা ছাড়ুক!'

'ওদের কথা পরে। বল্, তুই ছাড়বি কি না!'

'কি বলব?'

'তুমি বলবি।'

রুচি ঘর থেকে শুনছিল। এবার বেরিয়ে এসে ধুয়ো ধরে বলল, 'বিবিদি, তুমি কেমন আছ?

তোমার খবর ভাল তো?

দু'জনে হেসে উঠল। বিবি বলল, 'তুই এতক্ষণ ধরে স্নান করছিলি রুচি! কাল বললি না — জ্বর-জ্বর লাগছে, হাতে-পায়ে ব্যথা হয়েছে?'

'হরবল্লভ না ব্রজবল্লভবাবু — ওই যে এম আর না কি ভদ্রলোক, বিজয়াদির কর্তা....'

বিবি কথা কেড়ে বলল, 'তোকে ট্যাবলেট দিয়েছেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'তুই ভদ্রলোককে খিস্তি করছিস?'

'কেন, কেন?'

'ওর নাম হরবল্লভ বা ব্রজবল্লভ কোনটাই নয়!'

'নয়? তবে কী?'

'দাঁড়া — বলছি। এক মিনিট....' স্মরণ করতে চেষ্টা করল বিবি।

রুচি হাসল। — 'আশ্চর্য, আশ্চর্য! আমরা ওঁর স্ত্রী ভদ্রমহিলার নামধাম জানি, ওঁরটা জানি না। কি বোকা, কি বোকা আমরা।'

বিবি বলল, 'আসলে হয়েছে কি জানিস? ভদ্রমহিলাটি নিজে আস্ত পোশাক— রঙচঙে পোশাক। কেমন এলার্জি লাগে না? বড্ড— কেমন যেন অহঙ্কার আছে। না রে ঋতু?'

ঋতু বলল, 'তোমাকেও অহঙ্কার দেখাতে পারে কেউ?'

রুচি বলল, 'পারে, তা জানতে পারলুম। কিন্তু আমি বাবা ডোন্ট কেয়ার। ফুঃ, ফুঃ। বিবিদি, ভদ্রলোকের নাম হিরণবাবু!'

'হ্যাঁ— হিরণবাবুই বটে। তা হিরণবাবু তোকে কি ট্যাবলেট দিলেন? তুই চাইতে গিয়েছিলি নিশ্চয়? কেন নিজে নিজে ডাক্তারি করতে যাস রে?'

'নিচের লনে দেখা হ'ল কাল বিকেলে। পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিলেন, যেমন যান। বড্ড লাজুক যেন ভদ্রলোক। মেয়েদের দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারেন না!'

'তুই ট্যাবলেট চেয়ে বসলি?'

'হুঁ-উ!'

'ওঁর বউ দেখলে কী বলবে জানিস?'

'বিজয়াদি তো দেখছিলেন— জানলায় মুখ বাড়িয়েছিলেন।'

বিবি হতাশার ভঙ্গি করে বলল, 'হায় রুচি! তুই করেছিস কি!'

ঋতু বলল, 'বিজয়াদি বলছিস কেন রে? ভাব হয়ে গেছে বুঝি?'

রুচি মাথা অদ্ভুত ভঙ্গিতে দুলিয়ে বলল, 'হুঁ-উ। তোমরা বলছ পোশাক — পোশাকের মধ্যে হৃদয় থাকে সবার। থাকে না? সে বস্তুটি আমি টাচ করেছি।'

রুচি ভিজে শাড়িটা ব্যালকনিতে ঝুলিয়ে দিয়ে চলে গেল ভেতরে। বিবি বলল, 'রুচিটা অদ্ভুত! যাক গে— যা বলছিলুম। কাজের কথা হোক। তুই আমার সঙ্গে আয়। একটু কনসাল্ট করে দেখতে দোষ কি! আফটার অল, অভিজ্ঞ ডাক্তার তো বটে।'

ঋতু বলল, 'জানি কি বলবেন। ই এন টি-তে দেখানোর পরামর্শ দেবেন।'

'বেশ তো। তখন তাই করবি।'

'বিবিদি, গলা আমার সমস্যা নয়।'

বিবি আবার চটে গেল। — 'নিজের সমস্যা যদি বুঝবি, তাহলে .... যাক। কথা বাড়াসনে। ঋতু, জানিস নে— কী অপূর্ব উপহার ঈশ্বর তোকে দিয়েছিলেন!'

'সে কি এখন আবিষ্কার করলে?'

ঋতুর মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক হল বিবি। ... 'তুই এমন ইমোশনাল কেন সব ব্যাপারে? ইমোশনই খাবে তোকে— খাচ্ছে। পাজি মেয়ে কোথাকার।'

ঋতু কিছু বলল না বা নড়ল না দেখে বিবি ফের বলল, 'আবিষ্কার বল, যা-ই বল — তুই চলে যাবার পর অনেক ভাবনার মধ্যে দিয়ে এটা আমার এসেছে। জানিস, কি কষ্ট পেয়েছি তোর জন্যে! শুধু পস্তেছি — কেন ঋতুর জন্যে একটু বেশি অ্যাটেম্পট নিইনি?'

এবার ঋতু বিবির দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমিও কম ইমোশনাল নও দেখছি।'

'ইমোশন? যাঃ। আমি কত প্র্যাকটিক্যাল — অ্যাদ্দিনেও টের পাসনি? আয়।'

বিবি ওর হাত ধরে নিয়ে গেল।

রুচি চুল আঁচড়াচ্ছিল বড় আয়নার সামনে। বিবি তাকে বলে গেল— 'পাশের ফ্ল্যাট থেকে এক্ষুণি আসছি। এখনও তোর আধঘণ্টা সময় আছে রুচি।'

রুচি কোন প্রশ্ন করল না। মনে মনে হাসল। যাও না বাবা, বুড়ির জ্বলন্ত রাক্ষুসে চোখের দৃষ্টিতে ঝলসে ফিরে এসো। এই সব সেকেলে ভদ্রমহিলারা বড্ড অদ্ভুত। একদা অনেক চেষ্টা করেছিলেন নাক গলাতে — কি ব্যাপার, এভাবে রয়েছে কেন এরা, গারজেনরা কেউ খবরাখবর নেয় কি না, ইত্যাদি ইত্যাদি। দ্বিতীয় দফায়, নিজেও গারজেন হতে অফার দিয়েছিলেন। বিবিদিটা দারুণ সামলে নিয়েছিল। তার ওপর ঋতুটা ভারি ঠোঁটকাটা মেয়ে। সোজা বলে দিয়েছিল, 'আমরা ভালই থাকি, মাসিমা। বেশি খোঁজখবর নিলে তাই বিরক্তি বোধ করি।' আর— এখন সেই ঋতু গেল ওঁর ফ্ল্যাটে! পরিণতিটা কদ্দুর গড়াবে কে জানে!

খাবার টেবিলে অশ্রুদি প্রত্যেকের খাবার সযত্নে ঢেকে রেখে গেছে। খানিকটা পুডিং বানিয়েছিল — তা ফ্রিজে। রুচি খেতে বসল।

অর্ধেক খাবার পর হঠাৎ সে শিহরিত হল। তাপস চ্যাটার্জি যদি কালকের কথামত ফের অফিসের রিসেপশনে গিয়ে মাতলামি শুরু করে?

খাওয়া মুহূর্তে বিস্বাদ ঠেকল। কি ভুল, কি ভুল। কেন লোকটাকে এত বেশি পাত্তা দিয়েছে সে?

অবশ্য উপায় ছিল না। বসের হুকুম। তাপস চ্যাটার্জি একজন দালাল, সিনহা অ্যান্ড বোস কন্ট্রাক্টারের অনেক টেনডার পাস হওয়ার মূলে নাকি সেই। রুচির মনটা তেতো হয়ে গেল। কথাটা বিবিদিকে বলা উচিত ছিল। বিবিদিই তো এই রিসেপশনিস্টের চাকরিটা জুটিয়ে দিয়েছিল। তা না হলে .... ওঃ, সে অন্ধকার দুঃস্বপ্নের একটানা রাতের কথা ভাবতে বুক টিপ টিপ করে।

রুচি খাওয়া ছেড়ে উঠল। তখন তার মুখে একটা দৃঢ়তার ভাব। আজ একটা হেস্তনেস্ত করতেই হবে— তাতে যা হয় হোক।

বাইরে এসে রুচি দেখল আকাশ জোড়া নীল ঝলমল করছে। অনেক রোদ গায়ে নিয়ে ছটফট করছে একটা ব্যতিব্যস্ত কাজের দিন। খটখটে শুকনো রাস্তাটার দু'ধারে কোন কোম্পানির লোকেরা ভিজে পিচবোর্ড রোদে দিয়েছে। মাঝে মাঝে রেলব্রীজ থেকে নেমে আসছে দু'একটা গাড়ি। রুচি পিচবোর্ড মাড়িয়ে হাঁটছিল। কাঁধে রঙিন জাপানি ছাতাটা ঘোরাচ্ছিল। আজ তার পা ফেলার ভঙ্গিতে অন্যদিনের আনমনা ঢঙটুকু নেই। ইচ্ছে করেই রাখেনি সে। আজ কি একটা দিন!

খুব গভীর এক স্বাধীনতার বোধ রুচিকে কেন চাপা উত্তেজনায় অস্থির করছে, সে বুঝল না। মোড় ছাড়িয়ে এসে তার মনে হল, কোথাও একটা আবেগ এতকাল তার জন্য অপেক্ষা করছিল— আজ এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছে শিকারের ওপরে। নিজেকে জেনে অবাক হল সে। অস্বস্তিও বোধ করল খব। এত সাহস ভাল নয়। মনে মনে একটু হেসে বলল সে।

পানের দোকান থেকে চেনা মস্তান টাইপ ছেলেটি হেসে বলল, 'কি দিদি? খবর ভাল তো? বড়দি ভাল আছেন তো? নমস্কার!'

রুচি রাগল না। অন্যদিন রেগে গুম হয়ে যায় সে— মাথা দুলিয়ে হন হন করে চলে যায় বাসস্টপের দিকে। আজ সে মৃদু হেসে সাড়া দিল। এই ছেলেটির মাঝে মাঝে তাদের মেসে গিয়ে চাল বেচে আসে। আজ ভাল করে তাকিয়ে দেখল, ওর পোশাকে উন্নতির লক্ষণ দেখা দিয়েছে। বেশ পরিষ্কার প্যান্টশার্ট পরেছে। তারপর ... আরে এ কি! চশমাও নিয়েছে যে! রুচি হাসল।

পেট্রোল পাম্পের কাছে যেতেই সে টের পেল, ছেলেটি পান চিবোতে চিবোতে তার সঙ্গে আসছে। আড়চোখে নতুন সাদা বকলেসওয়ালা স্যান্ডেল জোড়াও দেখতে পেল। কেন যেন ছেলেটির উন্নতিতে তার আনন্দ হচ্ছিল। — 'বড়দিকে বলবেন — খুব ভাল পাটনাই চাল আছে। কাল সক্কালে দিয়ে আসবো।'

ছেলেটি তার সঙ্গে কথা বলতে চায়। ফিরে গিয়ে হয়তো দিব্যি গল্প করবে— 'আরে শালা, জানিস বে? ওই মেয়েটা দিব্যি কথা বলল আজ মাইরি'— এই রকম কিছু। আর, এর চাল ছাড়া রুচির সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যম কি-ই বা আছে? ও ফার্স্টকেলাস চালের কথা নিয়ে একতরফা আলোচনা করতে করতে এগোচ্ছে। রুচি কেসটা একটু কনসিডার করবে ভাবল। স্টপে এসে বলল, 'চশমা নিয়েছ দেখছি! শখ — না সত্যি চোখ খারাপ?'

'না দিদি। ডাক্তার দিয়েছে। একবার চোখে জখম হয়েছিল— ছোটবেলায়।' আঠারো-উনিশ বছরের বস্তিবাসী তরুণ শশব্যস্তে জানাল। — 'অত শখের পয়সা কোথায় বলুন?'

রুচির সমবয়সীই হবে। মুহূর্তে একটা অবাঞ্ছিত অন্যমনস্কতা তাকে কয়েক সেকেন্ডের জন্য ভাসিয়ে নিয়ে গেল স্মৃতির দিকে। হরিমুদি লেনের ছেলেগুলো— ঠিক এই স্তরের ছেলে সব, কেউ কেউ ফুটপাথবাসীও ছিল — সরু এক মিটার গলির অন্ধকার তাকে একলা পেলে বুকে খামচে দিত। তখন রুচির বয়স দশ-এগারো মাত্র। সবে বুকের ওপর শক্ত মাংসের একটা স্তর ঠেলে উঠছে, বোঁটার কাছটা কেমন সুড়সুড়ি লাগত, একটু ব্যথা-ব্যথা ভাবও যেন ছিল। রুচি ভয় পেত, কিন্তু কি যেন সুখও ছিল ওই সব আক্রমণে। তবে শেষ অব্দি স্কুল ছাড়তে হয়েছিল। বাবা বাসা বদলে শ্যামপুকুরের দিকে আরেকটা গলিতে চলে গেলেন। কিন্তু সে পাড়ার ছেলেগুলো আরও ওস্তাদ। কারণ ভদ্রলোকের ছেলেপুলে তো সব।

মুখটা উঁচু হয়ে গেল রুচির। স্লিপারের তলায় পৃথিবীকে ঠেসে ধরল সে। সিনহা অ্যান্ড বোসের রিসেপশনিস্ট কোম্পানির গাড়ির জন্য অপেক্ষা করছে এখন। তার ঠোঁটে হালকা গোলাপি রঙ, উদ্ধত খোঁপা, হালকা নাইলন-জর্জেটের সবুজ জংলা ছোপওয়ালা শাড়ি শরীরের অনেকগুলি সুখকর স্থান রহস্যে ভরে রেখেছে। তার কাঁধের উজ্জ্বল রঙিন মাংসে বৃষ্টি ধোয়া রোদ নেমেছে। রুচি ভুরু কুঁচকে ঘড়ি দেখল।

'ট্যাকসি ডেকে দেব দিদি?' ছেলেটি বলল।

'না। আমার গাড়ি আসবে।'

গাড়ি বাসা অব্দি যেতে পারে — বসের এমনও নির্দেশও আছে। কিন্তু না — রুচি সেটা সহ্য করতে পারবে না। চমৎকার চকোলেট রঙের স্টেশনওয়াগনে যারা বসে থাকবে — মিসেস মিচেল, মিস সুভদ্রা, মিসেস স্যানাল আর বুড়ি মিস জেভিয়ার — তাঁদের কথা ভেবেই পারে না। তাঁরা সবাই বড় রাস্তা থেকে ওঠেন।

আমার গাড়ি আসবে— কথাটা কিন্তু নিষ্ঠুর ধাক্কা মারল বুকে। অফিসের সম্ভাব্য দিনটা ভেসে এল চোখের সামনে। পাঁচ বছর আগে শ্যামপুকুরের নির্জন বাসায় দোতলার রাজেনদা নামে এক ব্যাঙ্কের

কেরানি তাকে গায়ের জোরে প্রেম দিয়েছিল, সেই নিষ্ঠুর ধর্ষণের আগের কয়েকটা মিনিটের মত আজ সারাদিনের অফিসটা তার সামনে দাঁড়িয়েছে।

'চলি দিদি। বড়দিকে বলবেন।'

ছেলেটি হঠাৎ লম্বা পা ফেলে চলে গেল। রাস্তা ডিঙিয়ে কাকে ডাকতে লাগল— 'আবে ইউনুস! ইউনুস! ইধার আ' এবং একটা বাস এসে তাকে আড়াল করল। কি বিস্ময়! বাসটা খালি— এই পিকআওয়ারে? কিছু না ভেবেই রুচি উঠে পড়ল। 'হাওড়া যাবে না— ইসপ্লেনেড, ইসপ্লেনেড।' চাপা ষড়যন্ত্রসংকুল গলায় দু'বার আওয়াজ দিল কণ্ডাকটার। বলল, 'ভেতরে যান, অনেক জায়গা।'

বাসে খুব কমই চাপে রুচি— অন্তত একটা বছর সিনহা বোসে চাকরি পাবার পর থেকে। অফিস যেতে আসতে তো নয়ই। কোন ছুটির দিন কোথাও বেরোলে বেশিরভাগ সময় ট্যাকসি করে। রুচির এখন অনেক পয়সা। সঙ্গে অবশ্য বিবি থাকলে বাসে চাপা ছাড়া রেহাই থাকে না। বিবি বাজে পয়সা খরচ করতে দেয় না ওদের। বলে, 'সেভ করো— যতটা পারো। আজ আমি বুঝতে পারছি সেভিংয়ে কি আছে। আমার কি হত তোমার ভাবতে পারো? ভাবতে ভয় পেয়ে যাই। ভাগ্যিস, ছেলেবেলা থেকে ওই বুদ্ধিটুকু ছিল!' ওদের ধারণা বিবিদির অনেক টাকা আছে ব্যাঙ্কে।

বাসটা কিন্তু স্টপে স্টপে ক্রমশ বোঝাই হয়ে চলেছে। ধর্মতলায় পৌঁছে রুচির তখন দম আটকানোর অবস্থা। তার গা ঘিন ঘিন করছিল। কি সব পুরুষ আর স্ত্রীলোক — ঘামের দুর্গন্ধ, চ্যাঁচামেচি, অনেকগুলো কামজর্জর চোখের দৃষ্টি, এমন কি নিশ্বাসও ঝাপটা দিল কাঁধে। রুচি একটু অস্বস্তিতে পড়ে গেল। রিসেপশনিস্টের নিটোল-নিখুঁত চেহারাটি নিয়ে বেরনো সম্ভব হবে তো? ঘামে জবজব করছে শরীর। পিঠে আর পেটের কাছে ভিজে ভাবটা টের পেল সে। তারপর মনে মনে একটু চমকাল। তার এই খামখেয়ালি আচরণের জন্যে ড্রাইভারটার চাকরি যাবে না তো? অবশ্য মিস মিচেলরা বলবেন, রুচিকে দেখতে পায়নি — অপেক্ষা করা হয়েছিল। কিন্তু একটা কৈফিয়ৎ তো দিতেই হবে অন্তত ভদ্রতার খাতিরে। কি বলবে সে?

বাসটা এসপ্লানেড টারমিনাসে পৌঁছবার আগেই খালি হয়ে গেছে। আশ্বস্ত হল সে। সবশেষে নেমে এল। তারপর মনে পড়ল, ভাড়া চায়নি তো কেউ? সে ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখল, বাসটা নির্জন! কণ্ডাকটার দুটো দৌড়ে ক্যানটিনের ওদিকে ভিড়ে মিশে গেল। অন্তত এক মিনিট ইতস্তত করে সে পা বাড়াল।

এবার কি করবে? একটা ট্যাকসি করা দরকার! ফি স্কুল স্ট্রীট যেতে অনেকখানি হাঁটতে হবে ফের। কিন্তু এদিক-ওদিক তাকিয়েই বুঝল, ট্যাকসি পাওয়া এখন অসম্ভব। খুব বিব্রত বোধ করল এবার। ঝোঁকের বসে কাজটা ভালো করেনি। নিজেকে অসহায় লাগল। ঠিক সময়ে পৌঁছনো যাবে না। তবে দুর্ভাবনা সে জন্য নয় — মিস রুচি চ্যাটার্জির দেরিতে পৌঁছনোটা বসের কাছে বা অফিসের কাছে প্রয়োজনের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ নয়। মিস মিচেল রয়েছে। এর গুরুত্ব ব্যক্তিগত। মিঃ বোস প্রৌঢ় অমায়িক মানুষ। মদ, সৌন্দর্য ও স্ত্রীলোকে এই ভদ্রলোকের প্রচণ্ড আসক্তি থাকলেও মিঃ সিনহাকে রুচির ব্যাপারে লিপ্ত থাকার অনুচ্চারিত পরোয়ানা তিনি জারী করেছেন বরাবর! মিঃ সিনহাকে এখন ফেস করতে হবে।

আশ্চর্য, বাসা থেকে বেরোবার সময়কার সেই অসামান্য সাহস, স্বাধীনতা ও জোরটা কোথায় গেল রুচির? চারপাশে কলকাতাকে এখনকার মত বিশৃঙ্খল কখনো মনে হয়নি। একটা যুক্তিহীন নৈরাজ্যের বিকৃতি চলেছে যেন চাদিকে। বাড়িগুলোর আগাপাছতলা বিজ্ঞাপন, কথা ছবি রঙ নিয়ে অ্যাবসার্ড নাটকের মঞ্চসজ্জার মত — যেমন পাত্র-পাত্রীদের সংলাপগুলো অর্থহীন কিছু শব্দের ট্রেন। রুচি চৌরঙ্গী পার হবার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। কি ক্লান্তিকর ট্রাফিক প্রবাহ! শেষ হয় না, শেষ হতে চায় না! ট্রাফিক পুলিশটাও ড্রামের ওপর থেকে বিরক্ত হয়ে হাত নামিয়েছে।

তখন রুচির মনে পড়তে লাগল আগের দিনগুলো। আশ্চর্য, তখন তো সে পায়ে হেঁটে বা বাসে-ট্রামে ঘুরত, তখন তো তার চোখে পড়েনি এই নৈরাজ্যময় বিশৃংখলা, এই উৎকট অ্যাবসার্ডিটিজ! তখন এইসব ঘাম ও কামজর্জরিত মানুষজনের সঙ্গে তার রক্তের যোগাযোগ ছিল যেন। বস্তুত, কতদিন বাসে-ট্রামে তাকে ঠেসে ধরে অন্যমনস্ক অশ্লীলতা প্রকাশ করেছে পুরুষগুলো— অথচ ইচ্ছে হয়নি

চড়া কথা বলে শাসায় কিংবা সরে দাঁড়িয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করে। ওই চালওয়ালা বস্তির তরুণটির সঙ্গেও গভীর সংযোগ অনুভব করতে আপত্তি হত না তার। হুঁ, তাই তো! গলির মধ্যে দাঁড়িয়ে ছেলেদের সঙ্গে ফিল্মস্টার বা হিট গান নিয়ে দিব্যি আলোচনা করতে পারত। আর 'জয় মা কালী স্টোর্সে'র রথীনবাবু দুপুরবেলা একলা পেলেই ভুরু কাঁপিয়ে বলতেন, 'হবে নাকি রে?' — এবং কি হবে, তা বুঝতে খুব দেরিও হত না রুচির। তার বয়স খুব পাকিয়ে দিচ্ছিল সেই গলি ও আগের গলিটা। কলকাতার সব গলিই তা করে থাকে। প্রায় ধাক্কা দিয়ে একটা প্রৌঢ় লোক হাঁটতে শুরু করেছে দেখে রুচি টের পেল, এবার জেব্রালাইন মুক্ত। লোকটা এই গরমে টেরিলিন স্যুট পরেছে। সামনে যেতে যেতে আশ্চর্য কায়দায় পাশে চলে এল সে। তারপর রুচিকে বিস্মিত ও শিহরিত করে একটা চোখ বুজল ও খুলল। রুচি তাকিয়েছিল তার দিকে। এই রকম লোক কে বা কি, তার স্বল্প অভিজ্ঞতা তা বলে দিতে পারে। সম্ভবত ছোট কারখানার মালিক — যার লেদ-মেসিন আছে কিংবা ট্রেডিং এজেন্ট — হয়ত কোন এক্সপোর্ট এজেন্সির কমিশনভোগী দালাল। হঠাৎ লোকটা চাপা ফিসফিসে স্বরে কি বলল, রুচি বুঝল না। না— বুঝল। কারণ অতীতের একটা আবছা অংশ তখনও তার মধ্যে আলতো ভেসে বেড়াচ্ছিল।

রুচি এই মুহূর্তে ছাতাটা মারতে পারত মুখে, কিন্তু গোটাতে সময় লাগবে। তাছাড়া ছাতাটার অনেক দাম — ছিঁড়ে যেতে পারে। স্লিপার খুলতে অনেকটা হেঁট হতে হয় — কিন্তু রাস্তার মধ্যে জেব্রালাইনে সেটা বেশ অস্বস্তিকর। ট্রাফিক পুলিশগুলো কেন যেন বড্ড খামখেয়ালি হয়। কিছু গাড়ি সমুদ্রের ঢেউয়ের মত গর্জে গর্জে কেবলই জেব্রালাইনে ঢুকে পড়ছে।

লোকটা এবার একটু স্পষ্ট করে বলল, 'হোটেল হিন্দুস্থান, স্যুট নাম্বার সি — থার্ড ফ্লোর। ভেরি নাইস প্লেস। এ লার্জ সাম অফ মানি — অ্যাজ ইউ লাইক।'

শিহরিত হল রুচি। তাহলে কি তার চেহারার মধ্যে তেমন বিশেষ কোন লক্ষণ ফুটে বেরিয়েছে? কিন্তু এ তো তার অফিসের চেহারা — মিঃ অরুণ সিনহার ভাষায় 'দিস ইজ বিজনেস!' বোঝা যাচ্ছে, লোকটা বাইরে থেকে এসেছে। কাগজে একবার লেখা হয়েছিল মনে পড়ল। বাইরের লোকেদের নাকি ধারণা আছে, কলকাতার মেয়ে খুব সস্তা — 'অ্যাভেলেবেল লাইক ড্যাম থিং, সো চিপ!' মিঃ সিনহাই একদিন এক অ্যামেরিকান ভদ্রলোকের সঙ্গে এ নিয়ে কৌতুক করছিল।

একটা প্রকাণ্ড গরু এল সেই সময়। লোকটা আর রুচিকে দু'ভাগ করে চলে গেল হেলতে দুলতে। লোকটা সস্নেহে গরুটার পিঠে হাত রেখে ঠেলে দিল—'ইফ ইউ ড্রিঙ্ক, আই ড্রিঙ্ক—ইফ নট, আই নট — অ্যাজ ইউ লাইক ...'

ঢাকা ফুটপাতে উঠেও সে সঙ্গ ছাড়ল না। —'আই লিভ অ্যাট বোম্বে— ইফ ইউ লাইক, ইউ ক্যান গো উইথ মি। বোম্বে ইজ এ ভেরি বিগ সিটি— সো মেনি গ্র্যাণ্ডার অ্যান্ড বিউটি। মাই নাইস লজ অ্যাট বান্দ্রা — ওঃ! ইউ উইল এনজয় — দ্য লং সী বীচ ... বিউটিফুল! মাই — নো ফ্যামিলি — নান টু ডিসটার্ব ...'

এবার একটা সিন ক্রিয়েট করা চলে। কিন্তু রুচির ঠিক এমনি একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল। উল্টে মহিলাটিকে কি অপমানিতই না হতে হয়েছিল! ভিড়ের ধারণা, মহিলাটি বিশেষ চরিত্রের। এরা নাকি ওইভাবে ফাঁদ পাতে। আচমকা কোন ভদ্রলোককে বিব্রত করে বসে। ব্ল্যাকমেইল করার একটি চমৎকার পদ্ধতি এটা। ভয়ে ভয়ে ভদ্রলোক যথাসর্বস্ব তুলে দেন হাতে — নয়ত সে চেঁচিয়ে লোক ডাকার ভয় দেখায়। হুঁ, এইসব ঘটনা এত বেশি আসছে যে, প্রতিক্রিয়া কোনদিকে গড়াবে বলা খুব কঠিন। রুচি সেই ঘটনাটা দেখছিল, তাতে মহিলাটিকে বিশেষ চরিত্রের ভাবেনি সে। তার অপরাধ সম্ভবত — উগ্র ধরনের প্রসাধন ও সাজসজ্জা! কেন কে জানে, তাবত পুরুষ সমাজ আজকাল এই অতি আধুনিক সজ্জা ও প্রসাধনে ভূষিতা মহিলাদের ওপর যেন প্রচণ্ড স্যাডিস্ট হয়ে পড়ে। রুচি জানল আজ নিশ্চয় তারও সাজসজ্জা ও প্রসাধনে খানিকটা বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে। সে কি মাতাল তাপস ব্যানার্জিকে ফেস করতে? আধুনিক মহিলা— ব্যক্তিত্বের চটকদার অস্ত্রে একটা দালাল মাতালকে ঘায়েল করতে? তা যদি হয়, তাহলে অনেকটা ভুলই করে ফেলেছে। বরং ঋতুর মত — অশ্রুর মত

সাদাসিধে থাকলে কি প্রতিরোধ ও প্রত্যাঘাত হানার মত শক্তিময়ী ব্যক্তিত্ব তার প্রকাশিত হত না? কই, ঋতু বা অশ্রু তো আজও এসব ব্যাপারে কোন অভিযোগ করেনি!

না কি রুচির এই বয়সটাই যা কিছু গোলমেলে! তার দেহের অ্যানাটমিতে মদন মূর্ছাকারি কোন রতিতরঙ্গ খরতর বইছে? পাশে শো-কেসের কাচে নিজেকে প্রতিবিম্বিত দেখল রুচি। একটু দাঁড়াল। ফুলসাইজ বিলিতি মডেলের গায়ে জড়ানো মোদি ফ্যাব্রিকসের নমুনা দেখতে লাগল। 'লট অফ মানি — বাট নোবডি টু এনজয়, বিলিভ মি—বাট—আই লাভ ক্যালকাটা গার্লস! সো চার্মিং সো গুড...'

'রুচি না?' সবেগে আসতে আসতে যুবকটি থমকে দাঁড়িয়েছে। '— আমার নিশ্চয় ভুল হয়নি! কি? ভুল হয়েছে?' হাসতে হাসতে সে সিগারেটের প্যাকেট বার করল। কামার্ত লোকটির চেয়ে অন্তত ছ'ইঞ্চি উঁচু, রঙটা তামাটে, লালচে চুল, পরনে সাদা জিনের প্যাণ্ট, হাতা গোটানো ধবধবে সাদা শার্ট, খাড়া নাক, উদ্ধত চোয়াল, সরু গোঁফ, আর ঢিলে লাল টাই, কোমরে চওড়া বেল্ট। ভুরুর ওপর কাটা দাগটা স্পষ্ট আছে। ঠোঁটের কোনায় সেই ভাঁজটাও। রুচি ভুরু কুঁচকে দেখছিল।

'কি? চিনতে পারছ না? আমি কিন্তু তক্ষুণি চিনে ফেলেছি।'

রুচি দেখল, সেই প্রৌঢ় বোম্বাইওয়ালা—যার আরব সমুদ্রের ধারে চমৎকার লজ আর লট অফ মানি আছে, হনহন করে যাচ্ছে। আর একবারও এদিকে ঘুরল না।

'কি দেখছ ওদিকে?'

রুচি মুখ টিপে হেসে তাকাল। —'তুমি তো ভীষণ লম্বা হয়ে গেছ। অতো চওড়া বেল্ট পরেছ কেন?'

'ভুঁড়ি সামলাচ্ছি। তোমার খবর বলো। কোথায় আছ—কি করছ? তোমার দিদিমা কেমন আছেন? চেহারা দেখলেই টের পাচ্ছি — বাসা বদলেছ। সাউথে?'

রুচি বলল, 'এক গাদা প্রশ্ন করলে জবাব দেওয়া যায় না। তোমার সঙ্গে মনে হচ্ছে এক বছর পর দেখা। লাস্ট কোথায় যেন — এই মেট্রোর নিচে। খুব বৃষ্টি হচ্ছিল...'

'হ্যাঁ। এখনও বৃষ্টি হচ্ছে।'

রুচি চমকাল। তাই তো! হঠাৎ ঝিরিঝিরি বৃষ্টি শুরু হয়েছে অতর্কিতে। চারপাশের সেই নৈরাজ্য আরও কুৎসিত হয়ে উঠেছে। পাগলের মত দৌড়াদৌড়ি চলেছে। মাঠের দিকে কিন্তু ঝকমকে রোদ — উঁহু, রোদটা পালিয়ে যাচ্ছে গঙ্গার দিকে। দেখতে দেখতে সব ধূসর হয়ে গেল। তখন রুচি বলল, 'বিকাশ, চলো— ওই রেস্তোরাঁয় ঢুকি।'

বিকাশ আঁতকে উঠল। 'অফিস যে! দশটা পনেরো হয়ে গেছে।'

'কোথায় তোমার অফিস?'

বিকাশ আঙুল তুলে একটা বাড়ির ওপরতলা দেখাল। রুচি বলল, 'অফিস তো আমারও!'

'বাঃ! কোথায়?'

'ফ্রি স্কুল স্ট্রীট।'

'খুব গ্র্যান্ড চাকরি মনে হচ্ছে!'

'মোটামুটি!' বলে রুচি একবার বৃষ্টিটা দেখে নিল। — 'চলো, বসি গিয়ে। এই বৃষ্টিতে আর অফিস গিয়ে কাজ নেই।'

'পাগল! খুব জরুরী কাজকর্ম আছে সব—'

'বিকাশ, তুমি এক সময় আমাকে লোভ দেখাতে — আজ আমি দেখাচ্ছি!'

'যাঃ যা-তা বোলো না! আমি তোমাকে কিসের লোভ দেখাব?'

'তুমি বড্ড আশ্চর্য তো! এতদিন পর দেখা— আর অফিস-অফিস করছ! অফিস বুঝি আমার নেই?'

'তোমাদের বেলায় বস সাতখুন মাপ করে দেয়।'

'জীবনে একটা দিন অফিস কামাই করলে জীবন নষ্ট হয় না— এস।'

'যাবো? কিন্তু —'

রুচি দেখল, তার মধ্যে একটা হঠকারী আবেগ এসে গেছে। চারপাশের ওই বিশৃঙ্খলার সুরে সুর মিলিয়ে গা ভাসানোর তীব্র তোলপাড় নিয়ে সে অস্থির। কি যে হয়েছে কাল রাত থেকে — ঋতু আসার পর থেকেই যেন — ইচ্ছে করছে যা খুশি করার, নিয়মকে পায়ের তলায় দাবিয়ে চলার। কোথায় যেন এক বছর ধরে মেলানো সুরের তারটা কেটে গেছে অজান্তে। কিছু ভাল লাগে না, কিছু ভাল লাগে না।

আর ওই একটা লোক—নৈরাজ্যময় পৃথিবীর আরো একজন প্রতিনিধি, তাকে কি সব বলে লোভ দেখাচ্ছিল এতক্ষণ। বিকাশ না এসে পড়লে কি ঘটে যেত কে জানে! বিকাশকে মনে হচ্ছে দেবদূতের মত — একটা উজ্জ্বল উদ্ধারের মত। বস্তুত এইসব সময়ে মেয়েদের মন সহজে নিতে পারে পুরুষেরা। — শিভালরি দিয়ে। অবশ্য, বলা যায় না—এই ভাবটা কতক্ষণ থাকবে। বিকাশের সঙ্গ কতক্ষণ ভাল লাগবে তার গ্যারান্টি আপাতত নেই। এক সময় যখন প্রায়ই দেখা হত দু'জনের, তখনও কোন গ্যারান্টি ছিল না। বিকাশ যেন বুদ্ধিমান— শুধু বুদ্ধিমান নয়—হিসেবিও। তাই আগ বাড়িয়ে কিছু চায়নি, কখনও দাবি করেনি কিছু। তাকে কি ভালবেসে ফেলেছিল? ওই রকম মনে হত বটে রুচির। কিন্তু আজ বিকাশের অফিসমুখী মন দেখে হিসেবি মানুষের ধারণাই হল— যে ভালবাসতে জানলেও তার জন্য বাজি ধরতে সম্মত নয়। অর্থাৎ এইরকম ছেলেরা মোটামুটি সুন্দরী ও চলনসই মেয়ে পেলেই বিয়ে করে দিব্যি ঘর-সংসার চালায় বা বাজার করে ও অফিস যেতে থাকে। এবং সেজন্যই বিকাশকে প্ররোচিত করতে এত জেদ পেয়ে বসেছিল রুচির।

বিকাশ সঙ্গে এল অবশেষে। রেস্তোরাঁয় ঢুকে মুখোমুখি বসার পরই কিন্তু তাকে বদলানো দেখল রুচি। বাইরে তখন আকস্মিক বৃষ্টিটা জোর ধরেছে। রুচির মনে হল, একটা চমৎকার সময় ডেকে এনেছে এই বৃষ্টিটা—খুব সুসময়। নৈতিক বোধের বিরুদ্ধে সঙ্গত কৈফিয়তের একরাশ বাক্য যেন ঝরে পড়েছে।

'তুমি তখন কিন্তু ভীষণ ফেরোশাস মেয়ে ছিলে, রুচি।'

'এখন?'

'তাই বলতে যাচ্ছি। তুমি বদলাওনি বিশেষ— অবশ্য চেহারার কথা আলাদা। নিশ্চয় বড় কনসার্নে পি এ টি এ হয়েছ?'

'বোস অ্যান্ড সিনহার রিসেপশনিস্ট।' রুচি আস্তে বলল।

'মাই গুডনেস! আমি একদিন বলেছিলুম কিন্তু — তুমি রিসেপশনিস্ট হলে চমৎকার মানাবে।'

'তুমি?'

'কেরানি। বাঙালির স্বর্গে আছি।' বিকাশ হাসল।

হুঁ, এই বিকাশের কাছে একবার দশটা টাকা ধার চেয়েছিল, বিকাশ অদ্ভুত ভদ্রতায় বিনীত হয়ে বলেছিল, 'নেই—তোমার দিব্যি। থাকলে কেন দেব না তোমাকে?'

তখন সবার কাছে টাকা ধার চাইতে ইচ্ছে করত রুচির। তবে কথা হচ্ছে, বিকাশ দেয়নি। অথচ রুচির ধরণা ছিল, বিকাশের টাকা ছিল—দিল না। সে কৃপণ কিংবা বড্ড হিসেবি। আর প্রেম ভালবাসা বা হৃদয়সংক্রান্ত 'অ্যাপ্রোচের' কথা তুলতে হলে বলা যায়, বিকাশের প্রতি সব কিছু সত্ত্বেও রুচির একটা রুচির একটা আলতো অনুরাগ যেন ছিল। সেটা প্রকাশের সুযোগ কেন কে জানে, একবারও আসেনি। হয়ত বিকাশ উৎসাহী হলে সেটা সম্ভব ছিল। কিন্তু ভালবাসা কি বার বার এক জায়গায় জন্মায়? মোটেও না।

বছরখানেকের জন্যে হাজরার ওদিকে একটা বাসায় রুচিকে যেতে হয়েছিল— ছোট ভাই নরুকে নিয়ে। সে তার দূর-সম্পর্কের এক দিদিমার বাসা। এই বৃদ্ধা রুচি আর তার ভাইয়ের পড়ার খরচ চালাতে রাজি ছিলেন। কিন্তু রুচির দুর্ভাগ্য, হঠাৎ তিনি মারা গেলেন। আর কোত্থেকে এসে জুটল সব বৈধ দাবিদার, ঝামেলা বাড়তে লাগল। তার মধ্যে নরুও একদিন হঠাৎ নিখোঁজ হল। রাতেও যখন বাড়ি ফিরল না সে— তখন রুচি বেরোল। কাউকে কিছু না বলেই বেরোল। আর ফিরল না। ইতিমধ্যে

এক বন্ধুর মারফত বৈজয়ন্তী ব্যানার্জির সঙ্গে তার চেনা হয়েছিল। খুঁজে খুঁজে রুচি যখন তার কাছে হাজির হল, তখন রাত নটা। বিবিদি চমকে উঠে বললেন, 'কোথায় তোমায় দেখেছি বলো তো?'

রুচি স্মরণ করছিল, ওই দিনগুলোয় বিকাশ বাইরে ছিল—সে কোথায় তা জানা নেই। বিকাশের কোন সাহায্যই সে পায়নি। তবে পরে মনে হয়েছিল, বিকাশ থাকলেও কতখানি সাহায্য করত সন্দেহ আছে। কলেজে পড়াশুনোর ব্যাপারে বিকাশ তাকে নিজের পায়ে দাঁড়ানো অর্থাৎ টিউশনির সদুপদেশ দিত। তাই বলে সে নিজে রুচিকে টিউশনি খুঁজে দেবে, এমন আশা করেনি রুচি। অথচ বিকাশের মধ্যে ভালবাসবার মত কি যেন ছিল এবং কত কি যেন ছিলও না।

রুচি বলল, 'নিশ্চয় বিয়ে করেছ?'

বিকাশ হেসে উঠল। — 'মেয়েরা ওই খবরে এত ব্যগ্র থাকে কেন বল তো? বিয়ে করলে কি জাত চলে যায়?

রুচি সকৌতুকে বলল, 'না, অন্তত আমার বেলায় বলতে পারি যে, কিভাবে কথা বলব বা অ্যাপ্রোচ করব, সেটার সম্পর্কে সিওর হওয়া চলে।'

'তুমি সিওর হতে পারো। বিয়ে-টিয়ে করিনি। যা পাই মাসে, নিজেরই কুলোয় না তো'...

'কেন? চাকরি করা মেয়ে খুঁজে নিলেই পারতে।'

বিকাশ সিরিয়াস হয়ে গেল তক্ষুণি।... 'ওসব ব্যাপারে আমি ভীষণ সেকেলে... তা তোমার অনুমান করা উচিত ছিল। আমি নিজে শালা চাকর হয়ে হাজারটা হিউমিলিয়েশানে দিন কাটাচ্ছি, আবার আমার বউকে শালা অফিসের লোক ডাঁট দেখাবে, হুকুম করবে, কৈফিয়ত নেবে— ইস! এ আমি ভাবতে পারি না। অসহ্য লাগে। আমার বউ— আমি বকব বা আদর করব, তোরা শালা কে?'

রুচির তর্ক করতে ইচ্ছে করল না। অন্যমনস্কভাবে বলল, 'তুমি ঠিকই বলেছ। আমার এক বন্ধু ঋতু— মুসলিম মেয়ে। সে বলে, মেয়েদের আসবাবপত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। আমার অবশ্য অবাক লাগে, ও কেমন করে জানল যে, সত্যিই মেয়েদের ফারনিচার হিসেবে ব্যবহার করা হয়?'

বিকাশের বুদ্ধি যেন মোটা। রুচির ইঙ্গিতটা উল্টো বুঝে সমর্থন ভেবে জোর দিল নিজের কথায়। — 'ঠিকই তো। মেয়েদের চাকরি করতে যাওয়াই হচ্ছে নিজেকে আসবাবপত্র হিসেবে ব্যবহার করতে দেওয়া।'

রুচি মৃদু হাসল। — 'এই বয় দু'বার ঘুরে গেল। কিছু তো অর্ডার দিতে হয়। কি খাবে?'

আঁতকে উঠে বিকাশ ঘড়ি দেখল।... 'না না। এইমাত্র তো খেয়ে বেরিয়েছি। অম্বল হয়ে যাবে। রুচি, প্লিজ — উঠি।'

হঠাৎ বিকাশের ওপর মনটা তেতো হয়ে গেল রুচির। তার সামনে একটা সুন্দর জড়ভরত বসে রয়েছে। না, জড়ভরত ঠিক নয়। একটা রোবোট। যার নিজস্ব বুদ্ধিশুদ্ধি অনুভূতি আবেগ খুব কম। ওই সব অবাঙালি ব্যবসায়ীগুলোর মত। যত দিন যাচ্ছে, মানি মেকারদের জন্ম হচ্ছে হু-হু করে—বিবিদি যেমন বলে। এর প্রস্রাব-পায়খানা আহার-নিদ্রা ইত্যাদি জৈবিক নিয়ম মেনে যেমন চলে, তেমনি একই নিয়মে স্ত্রীলোককে উপভোগ করে থাকে। হুঁ, এরা গাড়ি চাপে, বাড়ি সাজায়, ভাল খায়—সেও একরকম নিয়ম, এই সভ্যতার নিয়ম।

সেই প্রৌঢ় লোকটির কথা মনে পড়ল। অচেনা শহরে গিয়ে কারো পায়খানা পেলে যেমন ব্যতিব্যস্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়, তেমনি ও স্ত্রীসঙ্গের প্রচণ্ড বেগ নিয়ে ঘুরছে। এই তুমুল বৃষ্টিতে কোথায় আটকে পড়েছে লোকটা এতক্ষণ। ওর সাধ কি মিটবে? হুঁ-উ—এ শহরে সবই মেলে। রুচি নির্বিকার মুখে বলল, 'তুমি উঠতে চাও তো ওঠ। আমার কফি খেতে ইচ্ছে করছে।' বিকাশ যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। কিন্তু ওঠার সময় একটু ঝুঁকে হাসতে হাসতে চাপা গলায় বলল, 'এখানে কিন্তু আর কিছুও মেলে। রেস্তোরাঁ-কাম-বার, কি নয়! বিকেলের ছুটির পর হলে দেখা যেত। তুমি নিশ্চয় একটু-আধটু খাও। আই মিন—তোমাদের যা চাকরি, নিশ্চয় বড় হোটেলে পার্টি-ফার্টি দেওয়া হয় এবং অনারেবল গেস্টবর্গের সামনে .... হেঁঃ হেঁঃ হেঁঃ .....', বলে সে উঠে দাঁড়াল।

চকিতে রুচির মুখে রক্তচাপ প্রবল হল—নিশ্চয় তার কান দুটো লাল হয়ে গেল। মাই গুডনেস! এতক্ষণে বিকাশকে ধরে ফেলেছে সে। বিকাশ তাকে একটা কিছু ভেবেছে! ভাববারই কথা। এই চৌরঙ্গীর বদনাম অসামান্য। রাতের পরীরা এখন দিনদুপুরেও ঘুরে বেড়ায়—কাগজের রিপোর্টার। আর সেই গরিব হ্যাংলা মেয়ে রুচির এই উগ্র 'সভ্যতার' প্রতীক পরীমূর্তি হয়ে অফিসের তাড়ার সময় চৌরঙ্গীর ফুটপাতে দাঁড়িয়ে থাকা এবং বিকাশকে নিয়ে রেস্তোরাঁয় ঢোকার মধ্যে বিকাশ একটা ডিডাকশনে পৌঁছেছে। সত্যি তো! এত কমবয়েসী মেয়ে অতোবড় নামকরা একটা সংস্থার রিসেপশনিস্ট? চালাকির জায়গা পাওনি রুচি?

রুচি তারপরই নিজেকে সামলে নিল। চোয়ালের আঁটো ভাবটা ঢিলে হল। সে বলল, 'হ্যাঁ—খেতে শিখেছি।' পরক্ষণে ফিক করে হাসল, কেন হাসল জানে না—মিঃ তরুণ সিনহার ভঙ্গিতে ফের বলে উঠল, 'দিস ইজ বিজনেস।'

বিকাশ তার হালকা ঘিলু নিয়ে বেরিয়ে গেল। বাইরে বৃষ্টির শব্দ হচ্ছিল। রুচি পর্দা তুলে তাকে আর দেখল না, দেখতে চাইল না। এবার বয়স্ক বয়টা এসে তৃতীয়বার সপ্রশ্ন তাকালে রুচি একটু ইতস্তত করে বলল— 'একটা হাফ জিন, উইথ লাইম। বয়ফ দেবে।'

বয় চলে গেলে সে শিহরিত হল। অস্বস্তিতে পড়ে গেল। ঝোঁকের বশে সারাজীবন অনেক দুর্ঘটনা সে ঘটিয়েছে। কষ্টও পেয়েছে। কিন্তু নিজের এই হঠকারিতাকে ঠেকাতে সে পারে না। না—একবছর আগের মত ড্রিঙ্ক সম্পর্কে উৎকট ভীতি তার নেই। অনেকবার ছোট-বড়ো পার্টিতে সম্মানভাজন অতিথি প্রধান ব্যক্তির পাশে দাঁড়িয়ে তাকে একটু আধটু চুমুক দিতে হয়েছে — না দিলেও পারত, তবু দিয়েছে— ওটাই রুচির হঠকারী সেই অসচেতন অন্ধ আবেগ। সে কোকোকোলা কিংবা অন্য কোন সফ্ট ড্রিঙ্ক নিলেও মহাভারত অশুদ্ধ হত না। কিন্তু রুচি তা না করে স্রেফ জিন কিংবা হুইস্কির গেলাসেও আপত্তি করেনি।

তবে সে আর কতটুকু? দু'চারটে ছোট্ট চুমুক মাত্র। ওতেই অবশ্য মাথাটা কেমন করে ওঠে তার। উত্তেজনা অনুভব করে। ফূর্তি আসে কিছুক্ষণের জন্য। বাসায় ফিরতে ফিরতে সেটা আর থাকে না। তখন ক্লান্তি আর মাথা ধরায় ভুগতে হয়। বিবির হুঁশিয়ারি আছে এসব ব্যাপারে। কিন্তু বিবিও যেন অসহায় হয়ে ভাবে, রুচিকে ওখানে লাগিয়ে দেওয়া ঠিক হয়নি। আর কতদিন রুচি ওখানে টিকতে পারবে, সে সন্দেহও প্রকাশ করে মাঝে মাঝে। তবে রুচি সোজা বলে দেয় — 'কোনো অসুবিধে হয় না।'

হাফ পেগ জিনে তেমন কিছু হবে না, রুচি জানে। জিন তো ওয়াইন নয়। এ নাকি স্ত্রীলোকের নেশা। সিনহা সাহেবের ভাষায় ... জিন একটি হাল্কা গড়নের ফর্সা লম্বাটে মেয়ে, সুন্দরী— কিন্তু হিস্টেরিক। ঝট করে বিবি রেগে যায়, ঝট করে শুয়ে পড়ে শান্তভাবে।

তরুণ সিনহা সোডাওয়াটার মেশান না। পেটে গ্যাস হবে। স্রেফ জল কিংবা ডাবের জল মেশান। মনে পড়তে রুচি সোডার বোতলটার জন্যে আপত্তি জানাল। বয়টা তুলে নিয়ে গেল। এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল আনল। লোকটা বয়স্ক বলেই মুখ অমন ভাবলেশশূন্য। চলে গেলে রুচি চুমুক দিল। খারাপ লাগল না আজ। লেমনের মিঠে স্বাদে অপরূপ একটা ফ্লেভার এসেছে। রুচি একটু করে লেবুও টিপে দিল। তারপর—অপূর্ব।

এবং বাইরে বৃষ্টি, চাপা সব কণ্ঠস্বর, একটা স্বাধীন উচ্ছৃঙ্খল মন, খুব রহস্যময় হয়ে ধরা দিল তার কাছে।...

ফ্ল্যাটটার দুটো দরজা দিয়ে ভেতরে ঢোকা যায়। ডাইনে একটা দরজা বিবির ঘরের, অন্যটা হল সামনে— ডাইনিং-এ ঢোকার। দুটো তালা—চারটে চাবি। বিবির ওই দরজার চাবি বিবি আর ঋতুর কাছে, অন্যটার অশ্রু ও রুচির কাছে। কোন অসুবিধে নেই। তাছাড়া অশ্রু ফেরে চারটের মধ্যে। বিকেলে সে বেরোতে পারে। অন্যরাও পারে— যখন খুশি।

অশ্রুর আজ থেকে এক ঘণ্টা দেরি হবে ফিরতে। নতুন একটা টিউশনি পেয়েছে। অসময় নিশ্চয়। কিন্তু টিউশনিটা অন্যরকম। এক বাঙালি হাউস ওয়াইফকে (হাসিফ) ইংরেজি সেখানো। মাসে একশো টাকা ফি। ভদ্রলোক একটা বিজনেস ফার্মের একজিকিউটিভ— স্ত্রী এক সুপ্রাচীন ব্যবসায়ী বংশের মেয়ে। ম্যাট্রিক পাস—সুন্দরী তো বটেই। সামান্য দেমাক থাকা স্বাভাবিক, আছেও। তবে বিরক্তিকর নয়।

অশ্রু যখন ফিরল, তখন সওয়া পাঁচটা। সে এসে দেখল, তার দরজার তালা পেতলের হাঁসকলে আলাদা আটকানো—তার মানে রুচিই ফিরেছে। এত সকাল সকাল রুচি ফেরে না। প্রায়ই তো ওদের পার্টির ব্যাপার থাকে। রুচির চাকরিটা অশ্রু খুব ভাল মনে করে না। যেমন সে বরাবর রুচিকেও খুব একটা নির্ভেজাল মেয়ে মনে করে না। কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না।

রুচিকে তার ভালও কি কম লাগে? রুচি যখন বাসায় থাকে, তখন তার মধ্যে একটা কেমন যেন বিষণ্নতা, বালিকাসুলভ ছন্দ আর অসহায়তার আমেজ থাকে— যা রুচির সাতখুন মাফ করতে ওস্তাদ।

অশ্রু বোতাম টিপল। বার চারেক টেপার পর আলুথালু অবস্থায় রুচি দরজা খুলল। একটা আঁচল মাটিতে লুটোচ্ছে, ঘষাখাওয়া টিপ এবং চোখের কৃত্রিম রেখা ধ্যাবড়ানো, শুকনো রঙচটা ঠোঁট, চোখদুটো লাল। রুচি ফিরে এসে সাজপোশাক বদলায়নি দেখা যাচ্ছে। অশ্রু চমকে উঠে বলল, 'জ্বর হয়েছে নাকি? কালই তো বললে হাত-পা ব্যথা...'

রুচি হাসল না। মুখটা গম্ভীর। মাথা দোলাল মাত্র। তারপর টলতে টলতে গিয়ে নিজের বিছানায় শুয়ে পড়ল।

দরজা বন্ধ করে অশ্রু আগে ব্যাগটা রাখল। তারপর রুচির পাশে বসে কপালে হাত দিল। ... 'একটু জ্বর-জ্বর মনে হচ্ছে। মাথা ধরেছে? টিপে দেব?'

রুচি আস্তে বলল, 'মাথা ঘুরছে।'

'সে কি!' অশ্রু উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল।... 'কতক্ষণ এসেছ? কিসে এলে? পৌঁছে দিয়ে গেছে তো ওরা?'

'আজ আপিস যাইনি।'

'আপিস যাওনি? কোথায় ছিলে? কেন কি ব্যাপার?'

অশ্রু ব্যস্ত হয়ে ওঠে। রুচি ভুরু কুঁচকে বলল, 'এমনি যাইনি। বিষ্টি হচ্ছিল— ভাল্লাগল না। ঘুরে বেড়ালুম — যাদুঘর, চিড়িয়াখানা—কোথায় কোথায়।'

অশ্রু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। এবার মুখটা নামিয়ে নিয়ে গেল সন্দেহবশে। তারপর হেসে ফেলল। — 'তাই বলো!' তারপর উঠে গিয়ে সে নিজের শাড়িটা খুলে ফেলল। সায়া বদলাল, অন্য একটা শাড়ি টেনে নিল। জামা বদলাল— শুধু ব্রেসিয়ারটা রইল। তোয়ালেটা বালিশের তলা থেকে নিয়ে এবার সে রুচির দিকে ঘুরল। বলল, 'মনে হচ্ছে, এবার তুমি বিবিদির প্রহার খাবে। হুঁ-উ— তৈরি থাকো।'

রুচি কি বলতে যাচ্ছিল, সজোরে মাথা দুলিয়ে এবং জিভ কেটে ও চুকচুক শব্দ করে অশ্রু বাধা দিল।— 'ড্রিঙ্ক করাটা কিছু না। তুমি বুঝতেই পারছ — আমার ফ্যামিলিতে কি ছিল, বা কিভাবে আমরা মানুষ হয়েছি। প্রশ্নটা সেখানে নয়।'

রুচি এতক্ষণে মৃদু হাসল। — 'কোথায় তবে?

'ড্রিঙ্ক হচ্ছে বাইরের একটা এনার্জি কিংবা একসাইটমেন্ট বলতে পার— তোমার ভেতরকার ব্যাপার নয়। কেমন—নয় তো? এবার তোমাকে ভাবতে হবে—তুমি তাকে কতটা কন্ট্রোল করতে পারবে। আমি জানি, তুমি পারবে না।'

'তুমি কিছু জানো না। যাও, আমার মাথা ঘুরছে— বাথরুম থেকে ঘুরে এসো!'

'রুচি, মনে অনেকের কষ্ট পুষতে হয়। পৃথিবীতে এমন কাকেও দেখাতে পারো, যার মনে সবই পিসফুল — সবই হেলদি? কারো নেই। কিন্তু তাই বলে এই দেবদাসী মেথড আমার বড্ড বিশ্রী লাগে।' বলে অশ্রু দরজার দিকে এগোল।

রুচি বলল, 'কথা বলতে ইচ্ছে করছে না—তবু বলছি। অশ্রুদি, তুমি কেন ড্রিঙ্ক করো?'

অশ্রু ঘুরে প্রশান্ত হাসল। —'অস্বীকার করছিনে। কখনও সখনও করি। তোমার বিবিদিও তো করে। কিন্তু ভাই, আমাদের দু'জনেরই পৃথিবীর সব রকম ধকল সামলানোর বয়স হয়েছে...'

বাধা দিয়ে রুচি বলল, 'ফুঃ ফুঃ! যাও, যাও। বড়াই করতে হবে না।'

অশ্রু চলে গেল বাথরুমের দিকে। ডাইনিং স্পেসের লাগোয়া বাথ আর পাশেই প্রিভি। প্রথমে প্রিভিতে ঢুকল সে; বেরিয়ে বাথে ঢুকল। চৌবাচ্চার জলের দিকে তাকিয়ে রইল অন্যমনস্কভাবে। হঠাৎ নিজেকে এত অসহায় লাগল কেন, সে বুঝতে পারল না। আজ থেকে সে বাড়তি একশো টাকা রোজগার করবে। সন্ধ্যার টিউশনিটা কি ছেড়ে দেবে তাহলে? এক অবাঙালি মুসলমান ব্যবসায়ীর দু'টি ছেলেমেয়ে পাশের একটা মিশনারী স্কুলে পড়ে। তাদের পড়াতে হয়। মাত্র পঞ্চাশটা টাকা মেলে। অ্যাদ্দিন যথেষ্ট মনে হত। আজ খুব তুচ্ছ লাগছে। গৃহকর্তাটির ব্যবহার অসম্ভব ভদ্র — কিন্তু ওর অশিক্ষিতা বউটি যেন পাইপয়সা উসুল করতে চায়; সবসময় পাশে দাঁড়িয়ে ছেলেমেয়ের উদ্দেশে বলে— পড়ো, পড়ো। দিদিকো পুছো ঔর পড়ো। দিদিকে একমুহূর্ত চুপ করে থাকতে দিতে চায় না। অনর্গল তাকে বক বক করতে হবে। একদিন বউটি—ঈদ পরবের পরদিন, চুপিচুপি চাপা হেসে জিজ্ঞেস করেছিল — 'খেরেস্তান লোকরা তো গরুর গোশতো খায়—তো দিদি খাবেন? দিদির চালচলন বাঙালি হিন্দুর মতন কিনা—তাই সে গোপনে পুছ করছে।'

ওর দোষ নেই—অনেকে জানে না যে, দেশী খ্রীস্টানদের অনেকেই গোমংস খান না। অশ্রুর পরিবারে শুধু গরু কেন শুয়োরও খেত না কেউ। এটা সম্ভবত পূর্বপুরুষের সংস্কার। তা—অশ্রু সেদিন সবিনয়ে জানিয়েছিল, না—সে খায় না। সম্ভবত বউটি একটা অদ্ভুত ধরনের আত্মীয়তার সূত্র খুঁজছিল — পেল না বলে চটে গেল মনে মনে। খ্রীস্টান হয়ে কেউ হিন্দুর মত ব্যবহার করে নাকি? তারপর কি একটা বিদ্বেষ বউটিকে পেয়ে বসেছে। ওর দোষ নেই। মুসলিম খ্রীস্টান সবখানেই পাশাপাশি বাস করে। ওদের বাসায় পালায়-পরবে অ্যাংলো বা দেশী খ্রীস্টান ছেলেরা এসে খেয়ে যায়। অশ্রু খাবে না—এটা সে ঔদ্ধত্য বলেই মনে করেছিল সম্ভবত। তারপর থেকে অশ্রুকে লক্ষ্য করে সে বলে— 'গরু খায় না বলেই তো হিন্দুলোক অত ভীতু। মুসলমানদের ভয় পায়। ওই পাড়ায় নাকি হিন্দুরা আসতে সাহস পায় না।'

অশ্রু জানে — তার কারণ অন্য। কিন্তু একটা অশিক্ষিতা (অবশ্য বউটি আরবী-ফারসী পড়াতে পারে নাকি) মেয়ের ধারণা ভাঙবার উৎসাহ তার নেই। অশ্রু একবার এক বাঙালি মুসলিম পরিবারে মাস ছ'য়েক টিউশনি করেছিল। অবাঙালি আর বাঙালি মুসলিমের তফাৎটা কত বড়ো— তার অনেকখানি জানা হয়ে গেছে। অবাঙালি মুসলিমের কালচার বলতে একাংশ ধর্মীয়, বেশি অংশ হিন্দী ফিল্ম, কিছু অংশ অবশ্য এখনও উর্দু শায়েরি, গজল ইত্যাদিকে নিয়ে টিকে রয়েছে। কিন্তু বাঙালি মুসলিমের কালচার মুখ্যত হিন্দু-মুসলিম কালচারের একটা সমন্বয়। শিক্ষিত বাঙালি মুসলিম বাংলা সাহিত্য-নাটক-সঙ্গীত, বাঙালি বেশভূষা ও জীবন-ধারণে অভ্যস্ত। অন্তত রবীন্দ্রনাথ-নজরুল তার গর্ব।

হ্যাঁ— ওই হাঁফিয়ে-ওঠা টিউশনিটা ছেড়ে দিতে হবে। অত টাকার কি দরকার অশ্রুর! যে স্কুলে দিদিমণি হয়েছে তা বাঙালি স্কুল — মেয়েদের। সে ইংরেজি পড়ায় ক্লাস এইট অব্দি। মাইনে পেতে প্রায়ই গণ্ডগোল হত অবশ্য—কিন্তু তার মত হিসেবি মেয়ের পক্ষে চালিয়ে নেওয়া কিছু কঠিন নয়।

কঠিন নয়— কিন্তু .... কিন্তু তারপর? জীবনে তার পরেরটা কি? বাথরুমে অশ্রুর বরাবর দেরি হওয়ার কারণ এই। এই তীব্র আকস্মিক প্রশ্ন। এর মুখোমুখি বিব্রত বোধ করে অশ্রু। কোথায় পৌঁছতে চায় সে এইরকম ভাবে নিজেকে চালিয়ে নিয়ে অর্থাৎ নিছক বেঁচে থেকে? তবে পৌঁছবার একটা জায়গা কেন সে খুঁজে পাচ্ছে না? নিজের উপর রাগ হয়, দুঃখ হয়।

না— ছিল একটা জায়গা; সে অনেকদিন আগে। যৌবনের প্রথম সময়ে যখন মেয়েরা সারা পৃথিবীকে তাদের সামনে হুকুমবরদার দেখতে পায়। যখন সব কথাই গান হয়ে ওঠে— সব ইচ্ছাই আলাদীনের বাতির মত লাগে। যেন শুধু হুকুমের অপেক্ষা মাত্র, —তুমি পেয়ে যাবে এক বিপুল নির্ভরতা।

যোসেফ এস সি বিশ্বাস— ষষ্ঠিচরণ বিশ্বাসের কথা চকিতে মনে পড়ে গেল অশ্রুর। শিউরে উঠল। রিপন লেনের ছোট্ট সংসার, অজাত সন্তানের ভ্রূণ, যোসেফের ক্যানাডা পালিয়ে যাওয়া, কলগার্ল টাইপ মেয়ে মিস রিটার সঙ্গে —আচমকা এককুচি খড়কুটোর মত কিছু মুখে এসে পড়তেই অশ্রু মগে জল তুলে ব্যস্তভাবে মুখ ধুতে শুরু করল। তাকে অন্ধকারে ভয়-পাওয়া মানুষের মত দেখাচ্ছিল।

তিন

'বিবিদির মাথায় একবার কিছু ঢুকলে তো রেহাই নেই!' বলে ঋতু চুলে ব্যস্তভাবে চিরুনি চালাতে থাকল।

রুচি আরামে শুয়ে আছে, আর শান্তভাবে ঋতুর ব্যস্ততা লক্ষ্য করছে। এবং দু'একটা প্রশ্ন ছুঁড়ে মারছে—অন্যমনস্কভাবে কাগজের কুচি ছোঁড়ার মত। বিবি এখন বাথরুমে। বেরিয়ে এসেই যেন চোখের পলকে তৈরি হয়ে যাবে।

ঋতু ফের চাপাস্বরে বলল, 'বুঝলে রুচি, এবার আমার ভাগ্যে বেগমের খ্যাতি আছে। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। আমার টনসিল হু-হু করে সেরে যাবে। আমি স্টেজে উঠব। আঃ, কি সুখ। আমার মন ভরে যাচ্ছে... বলতে বলতে সে প্রায় থিয়েটার করে ফেলল। ... রুচি আমি নাচতে পারব না ভাবছ? দেখ তো, এই পোজটা কেমন হবে?' সে না জেনে একটা মুদ্রা আনল আঙুলে এবং একটা মোটামুটি সুন্দর ফিগার। আয়নার সামনে নিজেকে হয়ত ভালও লাগল। আর রুচি কেমন নির্বিকার যেন। বালিশে চিবুক বিঁধিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে রইল। শুধু বলল, 'তুমি এক সময় নাচতে, বলেছিলে।'

'হুঁ—নাচতুম তো। সে বালিকা বয়সে।' বলে ঋতু নাচের ফিগারটা গুটিয়ে একটু সিরিয়াস হল। 'আশ্চর্য, বাবা কিন্তু তখন কেমন যেন ছিলেন। নিজে কষ্ট করে নাচ-গানের স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিলেন দু'বোনকে। আমাদের থিয়েটার হলে আগের সারিতে গিয়ে বসতেন। কত উৎসাহ দিতেন। অথচ যেই একটু বড় হলুম, তখন— ঢোকো ঢোকো, পর্দায় ঢোকো— দেখে ফেলবে, পাপ হবে, শয়তানের চোখ লাগবে!' ... হাসতে হাসতে ঋতুর চোখে জল এসে গেল।

রুচি আস্তে বলল, 'এখন তুমি যা ইচ্ছে করতে পারো। কে আর আটকাবে?'

'পারি তো।'... ঋতু চুলে ফিনিসিং টাচ দিয়ে গুন্‌গুন্ করে গেয়ে উঠল। তারপর বুকের চাপা আবেগটা পুরো খুলে ফের একবার নাচের ভঙ্গিতে বাহু দুটো ছড়াল। —'রুচি, রুচি! আমাকে দেখ— দেখ আমাকে!' তখন বিবি বাথরুমের দরজা নিঃশব্দে খুলে বেরিয়েছে এবং থমকে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা দেখে চাপা হাসছে। রুচির চোখ গেল সেদিকে। বলল, 'ঋতু! বিবিদি তোমার নাচ দেখছে।' অমনি ঋতু লজ্জায় পড়ে গেল। দৌড়ে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল। বিবি রুচির কাছে এসে বলল, 'কি রে? আজও আপিস কামাই করবি নাকি?'

রুচি বলল, 'হুঁ-উ। বিবিদি, প্লিজ —তুমি তো বেরুচ্ছ, কোথাও থেকে সিনহা সায়েবকে একবার ফোন করে বলে দিও না!'

'কি বলব?'

'আমার জ্বর।'

'বিশ্বাস করবেন তরুণবাবু?'

রুচি অবাক হয়ে বলল, 'কেন? আমার জ্বর হবে না? হতে নেই বুঝি?'

বিবি হাসল। —'কাল বিকেলে আমাকে উনি রিং করেছিলেন ক্লাবে।'

রুচি শুয়ে থেকেই বলল, 'তাই বুঝি? বলনি তো?

'তার ধারণা, তুই ওখানকার চাকরি ছেড়ে দিবি। ইদানীং নাকি তোর মধ্যে সেরকম কিছু সিম্পটম লক্ষ্য করেছেন ভদ্রলোক।

কাল রাত্তিরে তোকে কিছু বলিনি, ভেবেছিলুম, এ নিয়ে পরে আলোচনা করব'খন। তাপস না কি সাম ব্যানার্জি তোকে অপমান করেছিল নাকি— ওদের একজন ইমপরট্যান্ট লোক সে। কি হয়েছিল? আমায় বলিসনি কেন?'

'ও সামান্য ব্যাপার। তার জন্য আমি চাকরি ছাড়ব নাকি? যাঃ!' বলে রুচি শুকনো হাসল।

বিবি একটু কড়া স্বরে বলল, 'তোকে তো সব বলে-কয়ে তবে ওখানে নিয়ে গেলুম। এমন একটু-আধটু হওয়া খুব অস্বাভাবিক না। তবে তরুণবাবুকে আমি ভালই চিনি। না চিনলে ওর অফিসে ঢোকাতাম না। তার দিক থেকে কোন রকম অবাঞ্ছনীয় ব্যবহার পেলে অবশ্য আলাদা কথা।'

'তরুণ সিনহা গ্র্যান্ড লোক।' .... রুচি হাসবার চেষ্টা করল।

'গ্র্যান্ড হোক বা না হোক — তোর পেছনে আমি আছি। তাই সে কোরকম আজেবাজে ব্যবহার করবে বলে আশা করি নে। ওঠ, আপিসে যা।'

রুচি করুণভাবে বলল, 'তোমার দিব্যি, বিশ্বাস কর, শরীর খারাপ।'

'শরীর খারাপ তো ওষুধ খাচ্ছিসনে কেন? যাবার পথে সেনগুপ্তকে বলে যাব? এসে দেখে যাবেন!'.... বলে বিবি পাশের ঘরের দিকে এগোল।

রুচি উঠে বসে বলল, 'রক্ষে করো বাবা! তোমার সেনগুপ্তের টেপাটিপি আমার বরদাস্ত হবে না।'

বিবি ধমক দিল ঘুরে। কিন্তু হাসলও।... কি যা তা বলছিস। ভদ্রলোক পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছেন। ছেলেমেয়ের বাবা। ঘরে সুন্দরী বউ রয়েছে।

'হুঁ-উ। সেজন্য এসেই পেট টিপতে শুরু করেন। আর কোথাও নয়— দেখি, দেখি, পেটের কাপড় ঢিলে করুন তো— বুকটা দেখি— হাঁ করুন তো!'... রুচি অবশ্য কৌতুকের ভঙ্গিতেই বলল কথাগুলো।

বিবি হাসতে লাগল— 'কি মুশকিল! সে তো ডাক্তারদের প্রফেশনাল প্রিভিলেজ রে বাবা। তুই ইনটেলিজেন্ট মেয়ের মতো ওই সময়টুকু অহল্যা হয়ে পড়ে থাকলেই পারিস। সবাই তাই থাকে।'

'অহল্যা হয়ে মানে?'

'পাষাণ—নিরেট পাষাণ।' বলে বিবিদি চলে গেল।

রুচি ফের শুয়ে থাকার চেষ্টা করল। কিন্তু ভাল লাগল না। উঠে ওদের ঘরে গেল। ঋতু সেজেগুজে তৈরি। বিবি তার ব্যাগে হাত ভরে কি গোছাচ্ছে। রুচি বলল, 'তোমরা ফিরবে কখন বিবিদি?'

বিবি বলল, 'কিছু ঠিক নেই। ল্যান্সডাউন রোডে ডক্টর মৌলিকের ওখানে যাচ্ছি ঋতুর গলা দেখাতে। তারপর যাব একবার টালিগঞ্জ পাড়ায়। সেখান থেকে আমার আখড়ায় ফিরব। তারপর...'

'আমি ততক্ষণ একা থাকব! মা গো!'

'কেন? একা থাকোনি বুঝি কখনও?'

'থেকেছি তো। কিন্তু...'

'খারাপ লাগলে তোমার এম-আর বউদিটিকে ডাকবে—নয়তো ওর বাচ্চাটাকে নিয়ে এসে খেলবে। আয় ঋতু।' ... বিবি পা বাড়াল।

ঋতু বলল, 'ইয়ে, রুচি আমার খোঁজে কেউ আসতেও পারে। তুই বলবি, সকালে আসতে। মনে হচ্ছে, কামাল আসতে পারে—নয়ত শ্যামলদা।'

বিবি ও ঋতু বেরিয়ে গেল। রুচি দরজা আটকে ঘরের দিকে ঘুরে কয়েক মুহূর্ত শূন্যতাকে অনুভব করল। তারপর নিজের বিছানায় পা ঝুলিয়ে বসল। এতক্ষণ অসুখের অজুহাতে স্নান করা হয়নি। এবার নিশ্চিতভাবে করা যাবে। তারপর খিদেও পেয়েছে জোর। খেয়েদেয়ে লম্বা একটা ঘুম— এমন ঘুম যে অশ্রু এসে না ডাকলে যেন না ভাঙে। তারপর তো যথারীতি অশ্রু চা করে খাওয়াবে। বাঃ, চমৎকার প্ল্যান! কিন্তু বৃষ্টি হলে দারুণ জমে যায়। বৃষ্টি, বৃষ্টি! একবার এসো না... রুচি খুব সাময়িক হিট বাংলা গানটা দ্রুত ঠোঁটে আনল এবং শাড়িটা নাচের ছন্দে খুলতে থাকল। ... 'এই, এস—কাছে এস — এস না ....' ইত্যাদি। তারপর হঠাৎ — খুবই আচমকা টের পেয়ে গেল, ঘরটা আকাশের হাঁ-হাঁ করা শূন্যতা হয়ে উঠেছে এবং আরো কত রকম কথা মনে এসে গেছে, নির্জন ছোট স্টেশনে মালগাড়ি এসে পড়ার মত—সে হুট করে গানটা থামাল। মনটা তেতো হয়ে গেল। ভ্যাট ভ্যাট! কি যে বিচ্ছিরি লাগে সব! স্কুল ফাইনালে রাত জেগে 'আকবর ওয়াজ এ গ্রেট কি' মুখস্ত করার মত।

সায়া ও শুধু ব্রেসিয়ার পরা অবস্থায় ধুপ করে সে বসে পড়ল ফের তার বিছানায়। স্নান? —হচ্ছে। সময় চলে যায়নি। সবে তো এগারোটা বাজে। কিন্তু একটা কিছু করতে ইচ্ছা করছে। কাপড় কাচবে? ভ্যাট! পত্রিকা পড়বে? খবরের কাগজ পড়বে? সে ফের উঠল। বিবির ঘরে গেল। এটা-ওটা নাড়াচাড়া করল। তারপর দেখল, তার মধ্যে একটা পুরনো আবছা অন্ধকারে ভরা স্বভাব ফিরে আসছে দ্রুত। সে একটু অস্বস্তিতে পড়ল। দোনামুনা বোধ করল। তারপর সেই অবাঞ্ছিত স্বভাব তাকে বাগে পেয়ে গেল।

রুচি খোলা জানলা দুটো দ্রুত দেখে নিল। পুবেরটার বাইরে অনেকদূর খোলা আকাশ ধূ-ধূ নীল। দক্ষিণেরটার বাইরেও অনেকদূর ফাঁকা— রেলব্রীজের সড়কটা, তার ওধারে উঁচু উঁচু সব বাড়ি। অতদূর থেকে কেউ এ ঘরের ভেতরকার দৃশ্য দেখতে পাবে না। তখন নিশ্চিন্ত হয়ে সে বিবির বিছানার কভার তুলল। অনেক সব কাগজপত্র ভাঁজ করা, বা দোমড়ানো খোলা অবস্থায় রয়েছে। কয়েকটা খুচরো পয়সাও রয়েছে। আর আছে খাম, ইনল্যান্ড লেটার, কার্ড। কারা সব বিবিকে চিঠি লেখে। চিঠিগুলো এলোমেলো পড়ল সে। পরিচিতদের মামুলী কুশল প্রশ্ন। কিছু নাচগানের ফাংশন সক্রান্ত। রুচি শিউরে উঠল— এটা নির্ঘাত প্রেমপত্র। হুঁ-উ—কে এক শিবনাথ খুব গ্যাস দিয়েছে বিবিকে। আর একটা লিখেছে কোন মন্টু ভট্টাচার্য। 'বিবি, তোমার ব্যাপার বুঝতে পারছি না। তোমার জন্য কাল অতক্ষণ অপেক্ষা করেও...' ভ্যাট, সব বোকাবোকা চিঠি। বিছানার তলায় মাঝখানে হাত চালিয়ে আরও কিছু কাগজ পেল। ষোলপাতা চিঠি! অবিশ্বাস্য! কে ধানবাদ থেকে লিখেছে— সম্ভবত কোন আত্মীয়। সবটাই পারিবারিক প্রসঙ্গ। তারপর—এটা কি? ক'টা হাল্কা পুস্তিকা 'আমার প্রেম'। প্রথম পাতার শেষদিকে যেতে যেতে রুচি বার বার শিহরিত হল। ভুলভাল আছে ছাপায়। কিন্তু একরাশ নোংরা জঘন্য কথায় ভর্তি। লোভ সামলাতে পারল না সে। পড়তে পড়তে ঠোঁটে সূক্ষ্ম হাসি ফুটল। এবং অদ্ভুত একটা জ্বরভাব দেখা দিল তার শরীরে। সেক্সুয়্যাল ইন্টারকোর্সের এমন কুচ্ছিত বর্ণনা দেওয়া যায়! এগুলো ছাপানোও হয়? কারা ছাপায়, কে কম্পোজ করে? সে লোকটি যখন হরফগুলো সাজায় তার কি এমনি জ্বরভাব আসে শরীরে? হয়ত লোকটি যন্ত্রের মত কাজ করে যায়— নিঃসাড়, অনুভূতিহীন তার মগজ। রুচি ঘুরে-ফিরে লাইনগুলো পড়ল। তার মধ্যে একটি শারীরিক উপদ্রব শুরু হয়েছে সে টের গেল। কানদুটো গরম হয়ে উঠল। মনে হল, দ্রুত একটা সুখকর বিপর্যয়ের স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে না দিলে সে ফুসফুস ফেটে মরে যাবে। সব স্নায়ু ও কোষগুলি ছটফট করতে লাগল তার। বার বার পড়লো আর কল্পনা করল দৃশ্যটা। তারপর একটা চওড়া পুরু খাম তুলে নিল হাতে। ইস্, ভাবা যায় না। বিবির বিছানার তলায় এই সব রয়েছে। পরক্ষণেই ডজন খানেক ফটো বেরিয়ে এল খামটা থেকে। চোখে আগুন ধরে গেল রুচির। এ কি বাস্তব? হ্যাঁ—ফটোগুলো নগ্ন নরনারীর নানাভঙ্গিতে মিথুনলীলার দৃশ্য। বিবিদি তার বিছানার তলায় এই পশুজগৎটা নিয়ে বাস করছে? হুঁ, পশুজগৎ ছাড়া কি! এ জগৎ রুচি ছেলেবেলা থেকে চেনে, কিন্তু নিজেকে ওই স্রোত থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চেয়েছে। প্রচণ্ড ভয়ে যেন ক্ষতিকর কিছু ঘটে যাবে। ঘৃণা করতে চেয়েছে ঠিক এ কারণেই। কিন্তু তবু তো নিজেকে বাঁচাতে পারেনি—এ যেন এক অভিশাপের প্রবাহ তলায় তলায় ড্রেনের মত বয়ে যাচ্ছে।

বিবির উপর বিস্মিত ঘৃণায় সে অস্থির হল। তারপর আস্তে আস্তে সেই ঘৃণাটা ফিকে হয়ে যেতে দেখল এক অজ্ঞাত শক্তির চাপে। কোত্থেকে জোর বাতাস এসে যেন ঘরের দুর্গন্ধি ধোঁয়া তাড়িয়ে দিল—এতক্ষণ বিবির মাংস পুড়ছিল আগুনে, সেই উৎকট ধোঁয়া!

তখন হাসি পেল রুচির। বেচারা বিবিদি! একটু সেক্সিটাইপ মেয়ে তা আগেই বোঝা উচিত ছিল তার। বিবি হাসতে হাসতে বলে, 'জানিস তোরা? বাথরুমে ঢুকলেই কেন যেন ভীষণ সেক্সি হয়ে পড়ি!' সরলভাবে বলার জন্যই হয়ত কথাটা গুরুত্ব পায় না কারো কাছে। বিবি বলে, 'আমার বয়সটাই হয়তো দায়ী। দ্রুত যৌবন শেষ হয়ে আসছে কি না— তাই কি যে সব ইচ্ছে করে! অবশ্য নিষ্ফলা গাছের আবার ইচ্ছে!'

রুচির মনে হল সত্যি বেচারার একজন শক্তসমর্থ পুরুষ মানুষ থাকা দরকার। এইসব বই

আর ফটো দিয়ে কি আর হবে! মন সবসময় জল্পনায় তো সুখ পেতে চায় না—বাস্তবেও কিছু দাবি করে।

শ্যামপুকুরে যে ভদ্রলোক রুচির কৌমার্য বিধ্বস্ত করেছিল, তার কথা ভোলেনি রুচি। 'এতে কোন দোষ নেই — কোন দোষ নেই লক্ষ্মীটি। ঈশ্বর যা দিয়েছেন তাতে মানুষের লজ্জারই বা কি আছে, দুঃখ পাবারই বা কি আছে?' ... ঠিকই তো। সবার সামনে যদি খেতে লজ্জা না করে, থুথু ফেলতে বা ঘুমোতে লজ্জা না থাকে তাহলে এর বেলাই তা কেন থাকবে? ওর এক অধ্যাপিকা কৃষ্ণা দত্ত ঠিক তাই প্রকারান্তরে বলতেন। তাঁর মতে মেয়েদেরই বেশি করে সেক্সোলজি পড়ে রাখা দরকার। কারণ, এ তো এসেনসিয়ালি হোমসায়েন্স।

এইসব ভালমন্দ অজস্র ভাবনা রুচির মাথায় এল। বই, কাগজ-পত্তর, খামটা যথাস্থানে ঢুকিয়ে সে বিছানার তলা ফের হাতড়াল। আর তেমন কিছু নেই। দু'বার সে মুখ টিপে হেসে ঋতুর বিছানার তলা খুঁজতে গেল। তোষকের তলায় নারকোল-ছোবড়ার গদী। গদীর খাপ নীল কাপড়ের। তার ওপর একি! শুধু চিঠি, চিঠি আর চিঠি! অগুনতি খাম আর ইনল্যান্ড লেটার। এলোমেলো পড়ে রয়েছে। শুধু একটা গুচ্ছ গার্টার আটকানো।

নানা ভঙ্গিতে, চাপা ও প্রকাশ্য প্রেমপত্রের এত নিদর্শনের কথা ভাবা যায় না। রুচি যতটা পারে গুনতে চেষ্টা করল, প্রেমিকের সংখ্যা—চার, না পাঁচ, উঁহু আরো বেশি। প্রায় আধা-আধি হিন্দু, বাকি মুসলমান। ইস্, একটার তারিখ তখন ঋতু তো বালিকা ছিল! সব রেখে দিয়েছে ঋতু। যাদুকর যেন ঋতুর পেছনের জগৎটা প্রেমে গিজ গিজ করছে। বিছানার তলায় শত শত প্রেম নিয়ে সে ঘুমোয়।

ঋতুর কোন পর্নোগ্রাফির কালেকশন নেই। অনেক খুঁজেও পেল না। পেল শুধু কিছু ফটো। প্রেমিক ও ঋতু, কিংবা একা ঋতু অথবা একা প্রেমিক না, ঋতু আর তার দুই বান্ধবীর কাঁধ ধরাধরি ফটোও রয়েছে কিছু। অ্যালবামে রাখে না কেন? নষ্ট হয়ে যাবে যে সব। একটা ফটো সম্ভবত তার বাবার। কারণ নিচে যে নামটা লেখা, তা শোনা মনে হল। বাঃ, ভদ্রলোককে মুসলমান বলে চেনা যায় না তো! টাই-পরা ভদ্রলোকের চেহারা কেমন রাশভারি যেন। ঋতুর মায়ের কোন ছবি খুঁজে পেল না রুচি।

সব ঠিকঠাক করে রেখে উঠল রুচি। শরীর ক্লান্ত লাগছে। চোখ দুটো জ্বালা করছে। সে বিবির বিছানার দিকে তাকাল শূন্য দৃষ্টিতে। মনে হল কাজটা ঠিক হয়নি। বিবিদির ইমেজটা কেমন যেন বদলে গেছে এখন। কিছুতেই আগের মত ফুটছে না। সে দেয়ালে—তিনদিকে ও হোয়াটনটের মাথায় ও জানালার ওপরকার প্যানেলে বৈজয়ন্তী ব্যানার্জির নর্তকী মূর্তিগুলো লক্ষ্য করতে থাকল। কি আশ্চর্য সুন্দর ভঙ্গিতে ছবিগুলো তোলা হয়েছে এবং যত্ন করে বাঁধানো হয়েছে! সৌন্দর্য আর পবিত্রতার একেকটি প্রতীক সব। অথচ...

রুচি মাঝে মাঝে টের পায়, তার মনের ভীষণ বকবক করা বদ অভ্যেস। চেষ্টা করেও এটা শোধরানো যায় না। খুব ছেলেবেলা থেকে নানারকম কীটের মগজে ঢুকে পড়ার ব্যাপার আছে তার। রেহাই নেই। অনবরত নানা কথা, নানা দৃশ্য ও ঘটনা, মানুষ ইত্যাদি কখনও স্পষ্ট কখনও আবছা, কখনও বিমূর্ত হয়ে ভাসে আর জ্বালাতন করে থাকে। বোধশূন্য হওয়ার মত শান্তি কোথাও নেই, সে এই বয়সেই জেনে গেছে।

নিজের ঘরে এলো সে। অশ্রুর বিছানার তলা একদিন চুপিচুপি দেখে নিয়েছিল। বেচারা অশ্রুদি! তার ফটো আছে অনেক—তবে সেগুলো অ্যালবামে ভরতি। বাক্সে রাখা আছে। সবাইকে দেখিয়েছিল। হ্যাঁ, অশ্রুদিকে ভীষণ দুঃখী লাগে। আর রুচি—রুচির বিছানার তলায় কি আছে? তারও তো কোন প্রেমপত্র নেই। কেউ তাকে কোন চিঠি লেখে না। স্কুল-কলেজের বন্ধুরা হয়ত লিখত—কিন্তু কেউ তো তার ঠিকানা জানে না। নিজেকে কেমন রিক্ত মনে হল তার। তারপর সতর্কভাবে নিজের বিছানার তোষকটা একদিকে একটুখানি তুলল। একটা ছোট্ট প্যাকেট রাখা ছিল অনেকদিন থেকে। কেন কিনেছিল, কেন রেখেছিল—ভুলেও গিয়েছিল এবং এখনই মনে পড়ল, রুচি বুঝল না কিছুক্ষণ। প্যাকেটটা হাতে নিয়ে অন্যমনস্কভাবে সে বসে রইল। হ্যাঁ—চাকরি হওয়ার দিনই ফেরার পথে কিনেছিল একটা ড্রাগস্টোর থেকে। কলেজে পড়ার সময় কোন কোন মেয়ে এসব কিনত, সে বরাবর

দেখেছে। যৌনতার জন্য আজকাল সব মেয়েকেই প্রস্তুত থকতে হয়। কারণ স্বাধীনতার বোধ ক্রমশ প্রচণ্ড চাপ দিচ্ছে সবাইকে। —তাহলে কি তরুণ সিনহাকে দেখার পরই কিনেছিল এগুলো? এই সতর্কতা তার সহজাত বোধ থেকেই এসেছিল নিশ্চয়। হঠাৎ কোন বিপাকে পড়লে — কোন আকস্মিক অবস্থা এসেগেলে যখন আত্মরক্ষার উপায় থাকবে না তখন প্যাকেটটা সে নাছোড়বান্দা প্রেমিকটিকে শর্ত হিসেবে দেবে এবং বলবে—'প্রভাইডেড ইউ ইউজ ইট..' ইত্যাদি। অবশ্য এই প্যাকেটটা নিয়ে তার এখন বিব্রত হওয়ার কিছুই নেই। এটা কি খুব নির্লজ্জ তা হচ্ছে? তাহলে আকাশবাণীকে নির্লজ্জ বলতে হয় এবং তাহলে মাননীয় ভারত সরকার কম নির্লজ্জ নন, যেহেতু সবখানে দিনরাত ঘোষিত হচ্ছে 'মাত্র পনের পয়সার তিনটি'র সুসমাচার। এবং বিরাট খরচে বিশ্বের হাতিও পোষা হচ্ছে। তবু রুচি এখন লজ্জা পেল। একটা শুদ্ধতার বাতিকে তাকে চেপে ধরল।

তার মনে হল এই ফ্ল্যাটের কোনায় কোনায় বড় আবর্জনা জমে রয়েছে—যেখানে হাত পৌঁছয় না কারো। প্যাকেটটা একটা কাগজে জড়িয়ে সে শাড়িটা ফের পরে নিল। তারপর ব্যালকনিতে গেল। নীচে একটু তফাতে আগাছার জঙ্গল, তারপর রেলের নয়ানজুলি। খুব জোরে ছুঁড়ে ফেলল সে। কিন্তু ঝোপের আগে ফাঁকা জায়গায় গিয়ে পড়ল। বস্তির একটি বাচ্চা মেয়ে কাছে কোথাও ছিল। ঝাঁপিয়ে পড়ল সেটার ওপর। তারপর এদিকে ঘুরল। অমনি রুচি সাঁৎ করে ঘরে ঢুকে পড়ল। মেয়েটি কী করছে আর দেখার সাহস হল না। সে শাড়িটা খুলে সটান বাথরুমে গিয়ে ঢুকল।

অশ্রু স্কুলের গেট পেরিয়ে এল। গেটের বাইরেই বড় রাস্তা। বাস-স্টপও ওখানে। কিন্তু এখন বাসে ওঠার ক্ষমতা তার নেই। সে পা বাড়াল।

পেছনে হেডমিস্ট্রেস প্রভা গাঙ্গুলি আসছেন, সে লক্ষ্য করেনি। মিস গাঙ্গুলির আকার-প্রকার বিশাল বলে তরুণ দিদিমণিরা ওকে আড়ালে মিস মাউন্টেন বলে থাকেন। ভদ্রমহিলার দাপট অসামান্য। এলাকার সব স্কুলে কম গোলমাল হয়নি—কিন্তু অশ্রুদের স্কুল আশ্চর্য শান্ত ছিল। তবে কিছু মিস্ট্রেস ওকে প্রভাদি বলে ডাকেন। এমনিতে ভারি অমায়িক ভদ্রমহিলা।

মিস গাঙ্গুলি কাছাকাছি থাকেন বলে হেঁটেই ফেরেন। কোনদিন রিকশা করেও যান। রিকশাওয়ালার জন্য ছাত্রী এবং দিদিমণিরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করার কথা বলে তামাশা করে।

অশ্রু পেছন থেকে মিস গাঙ্গুলির ডাক শুনে দাঁড়াল। —'হেঁটেই যাচ্ছেন প্রভাদি?'

'তাই তো যাই।' মিস গাঙ্গুলি বললেন, 'তুমিও তো যাও লক্ষ্য করেছি। এত বরং ভাল। ইয়ে —তুমি তো তোমাদের সেই মেসেই রয়েছ?'

অশ্রু মাথা দোলাল।

'চলো, কথা বলতে বলতে যাই।'

মিস গাঙ্গুলি অকারণ ছাতি খুলেছিলেন, এবার যেন অশ্রুর গোটানো ছাতি দেখে নিজেরটা গোটালেন। —'ইয়ে—অশ্রু, একদিন এসো আমার বাসায়। বাই দা বাই, শুনেছ তো—তোমাদের এরিয়ার ডি-এর টাকাটা এসে গেছে আজ। কাল ড্রাফটটা ব্যাঙ্কে দেব। কাল শনিবার। কাজেই মঙ্গলবারের আগে কেউ পাচ্ছে না।'

অশ্রু শুনেছে। ফের মাথা দোলাল।

'অশ্রু, ইয়ে—তাহলে আমি যাই। আবার দেখা হবে—কেমন?'

বাঁয়ের গলিতে ঘুরলেন মিস গাঙ্গুলি। অকারণ ফের ছাতিটা খুললেন—অথচ গলিতে ঘন ছায়া। কোন কোন সময় কোন কোন মানুষকে খুব দুর্বোধ্য লাগে। অশ্রু আনমনে অন্তত তিন মিনিট দাঁড়িয়ে ওঁর চলে যাওয়া দেখল। তারপর হঠাৎ এত ভাল লেগে গেল মিস গাঙ্গুলিকে। এই প্রৌঢ় মহিলার সঙ্গে যেন কোথাও তার ভীষণ মিল আছে। সে মিল কি নিঃসঙ্গতার? সে কি লুকানো বিষাদের? অশ্রু একটা ভারি নিশ্বাস ফেলে আবার পা বাড়াল। কিছুদূর চলার পর বাঁক নিল।

এই রাস্তাটা দিয়ে হাঁটলে কলকাতার কথা মনে পড়ে না। দু'ধারে বর্ষার সতেজ দেবদারু আর কৃষ্ণচূড়ার সার—কোথাও বিশাল শিরীষ, চওড়া ফুটপাত ঘন ছায়ায় ঢাকা থাকে। অশ্রুর পক্ষে এটাও

বাড়তি লাভ বই কি। বিকেলে স্কুল থেকে বেরিয়ে একটা মাদ্রাজী রেস্তোরাঁয় ঢোকে সে। কিছু খেয়ে নেয়। তারপর হাঁটতে হাঁটতে প্রায় হাফ কিলোমিটার এসে এই সুদৃশ্য রাস্তায় পৌঁছায়। ওখানকার পার্কে কিছুক্ষণ বসে। রাস্তাটার আরেক গুণ নির্জনতা। মধ্য কলকাতার এই এলাকায় গাড়ি না থাকলে বাস করা যায় না। আজ বর্ষার উপদ্রব আর দেখা যাচ্ছিল না। বিকেলের দিকে গোলাপি রঙের রোদ মাথায় নিয়ে গাছগুলো দেবদূত হয়ে উঠেছিল—যেন কী সুসমাচার দেবার জন্য অশ্রুর প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিল তারা। অশ্রুর মনে হল একটা কিছু ঘটতে চলেছে—একটা কিছু হবে, সুখ ও শান্তির কোন সূচনা। সে গুনগুন করে দু-একটা কলি গাইল, ঋতুর গলায় শোনা রবীন্দ্রসঙ্গীত। মাঠের ঘসে যেমন করে গাব্দাগোব্দা ফুটফুটে বাচ্চা মেয়েরা রঙিন বল নিয়ে ছোটাছুটি করে, অশ্রুর মনটাও তেমনি বেপরোয়া সরলতায় অস্থির হল।

একটা সুসময়ের মধ্যে যেন অশ্রুর এই বিকেলের যাওয়া। একটু পরেই দোতলার ব্যালকনিতে সুন্দর বউটিকে দেখতে পেল সে। তারই প্রতীক্ষা করছিল যেন। অশ্রুর এত ভাল লেগে গেল ওকে! কিন্তু আবেগ সে শান্তভাবে সামলাতে জানে। প্রাইভেট টিউটরের ব্যক্তিত্ব নিয়ে সিঁড়িতে উঠে গেল। বোতাম টেপার আগেই দরজাটা খুলল। হাসিমুখে তার ছাত্রী মধুছন্দা বলল, 'আসুন'। অশ্রু গেল।

যতক্ষণ পড়াল, আসলে কিন্তু এই সুন্দর সাজানো ফ্ল্যাটের হৃদয় তার মন জুড়ে রইল। শোবার ঘরে কোণের সোফায় বসে ইংরেজি শেখানোর ক্লাস। অদূরে ডবলবেড বর্ণাঢ্য খাটটা অশ্রুর চোখের কোনায় আটকে রইল। নিজেকে এত শিগগীর কি খুব বেশি জড়িয়ে ফেলছি এখানে? অশ্রু মনে মনে প্রশ্ন করল। তার মনে হল বুকের হ্যাংলা ধরনের পুরনো খিদে চাপা আছে—সূঁচ ফোটাচ্ছে বার বার।

সৌমেনের ফিরতে দেরি হবে। অশ্রুর সঙ্গে সেই একবার দেখা হয়েছে ভদ্রলোকের। বলেছে, মিস সরকারকে পেয়ে সে খুব খুশি এবং স্ত্রী মধুছন্দাকে ভ্রূ নাচিয়ে বলেছে, 'দেখছো তো আমার ডিটেকশন কী তীক্ষ্ণ! পনের জনের মধ্যে ওঁকে আমার পছন্দ কেন হয়েছিল, এবার টের পাচ্ছ তো? তাছাড়া—রিয়্যালি, কিছু মনে করবেন না মিস সরকার, রিয়েল মেমসায়েব অর্থাৎ ইংরেজি যাদের মাতৃভাষা, তাদের কাছে বাঙালি গৃহস্থবধূর ইংরেজি শিখে কোন লাভ নেই। লাভ নেই—মানে দু'পক্ষেরই প্রচুর অসুবিধে হতে পারে। ছন্দাও কম অস্বস্তিতে পড়ত না। তবে সবচেয়ে বড় কথা—আমি মনে মনে প্রচণ্ড বাঙালি!'

বিদেশি ফার্মের একজিকিউটিভ ভদ্রলোক। কোম্পানি চব্বিশ ঘণ্টার জন্য একটা চমৎকার বিলিতি গাড়িও দিয়েছে। আর—সুখ কি এই ঝকমকে চেহারায়, সুখ কি ব্যক্তিত্বে? সৌমেন বোসের সারা শরীরে সুখ গলে গলে পড়ছে।

আর তার ছাত্রীটি—বনেদী ব্যবসায়ীর একমাত্র মেয়ে, একটু আদুরে টাইপ নিশ্চয়ই, কিন্তু সব সুখ বংশগত অভ্যাসে যেন জমানো টাকার মত আড়ালে ঢেকে রাখতে অভ্যস্ত। বয়সে রুচির দু'তিন বছর বড় হতে পারে।

একদিন টের পেয়েছে, মধুছন্দা ঠিক সেকেলে নয়। অথচ কী যেন নেই—যা বিবি কিংবা ঋতু কিংবা ওই রুচিটা ও আছে। সেটা কি রবীন্দ্রসঙ্গীত বোঝা, সে কি সাহিত্যের বোধ, না কি কোন বিশেষ জীবনদর্শন? পাঞ্জাবী কিংবা আর সব অবাঙালি পরিবারের সঙ্গেও অশ্রুর পরিচয় আছে। তাদের পরিবারের মেয়েদের সঙ্গে মধুছন্দার কেমন আশ্চর্য মিল আছে। এরা ফ্রিজ বোঝে, স্ন্যাক্স গারারা গোগো চশমা ইত্যাদি সব লেটেস্ট পোশাক-আসাক বোঝে, রফি, রাজেশ, মুকেশ ও অজিত ওয়াড়েকার নিয়ে ভাবিত হয়— এবং বড়জোর হ্যারল্ড রবিনস হাত তুলে নিতে জানে, এরা হিন্দী ফিল্মস্টারের স্ক্যান্ডাল নিয়ে সিরিয়াস আলোচনা করে। অশ্রু এদের দুচোখে দেখতে পারে না। এই জীবনের কিছুটা তার জীবনের ওপর দিয়েও বয়ে গেছে—সভ্যতার একটা স্রোতের মত। এবং অনুভূতিহীন সংবেদনশূন্য নিঃসাড় এইসব মানুষের মিছিলে কয়েক পা সেও একদা হেঁটেছে। তাই মধুছন্দাকে সে বদলাতে চায়। অশ্রু মনে মনে ষড়যন্ত্র-সংকুল হয়ে পড়েছে ক্রমশ।...

ইংরেজি সিনট্যাক্স দিয়ে পড়ানো শুরু, শেষ হল শেলীর কবিতায়। আবেগ এসেছিল অশ্রুর গলায়। একটু পরে মধুছন্দা বলল, 'আপনি কোনদিন অভিনয় করেছেন অশ্রুদি?'

অশ্রু অবাক হল। —'কেন?'

মধুছন্দা ফের প্রশ্ন করল, 'আপনি ব্লো হট ব্লো কোল্ড দেখেছেন নিশ্চয়ই?'

'না তো!'

'দারুণ পিকচার। আমি তিনবার দেখেছিলুম নিউ এম্পায়ারে।'

'তাই বুঝি!'

'হ্যাঁ। বিয়ের পর তো ইংরেজি ছাড়া কিছু দেখি নে। সত্যি অশ্রুদি, যা করে না সব!'

'কী করে শুনি?'

মধুছন্দা ফের হুট করে প্রসঙ্গ বদলাল, 'ও কয়েকটা নতুন পপ রেকর্ড এনেছে। শুনবেন? আপনার নাচতে ইচ্ছে করবে কিন্তু!' বলে তক্ষুণি উঠে রেকর্ড প্লেয়ার খুলল। রেকর্ড চালাল। তারপর হাসিমুখে এসে বসল। উদ্দাম বিলিতি পপ বেজে উঠল।

অশ্রুর অসহ্য লাগছিল। তার মনে হল, বউটি এবার নাচতে না শুরু করে। তার সারা দেহে চঞ্চলতা টের পাচ্ছিল অশ্রু।

একের পর এক রেকর্ডগুলো বেজে চলল। মধুছন্দা ফাঁকে ফাঁকে প্রশ্ন করে চলল, 'দারুণ! কী বলেন?' কখনও বলল, 'কথা লিখে মানে বুঝিয়ে দেবেন।'

অশ্রু শুকনো হাসল শুধু।

'মেট্রোর বইটা দেখেছিলেন— সরি, সেই পিকচারটা—কী ডটার যেন... স্কুল মাস্টারের বউ—হ্যাঁ—রেয়ানেস ডটার—'

অশ্রু শান্তভাবে বলল, 'না।'

'এতে একটা সেক্সের সিন ছিল—না, একটা কী বলছি?' বলে সে ভুরু কুঁচকে হিসেব করল। —'হুঁ—প্রথমে তো বিয়ের রাতে স্বামীর সঙ্গে, তারপর জঙ্গলে খোঁড়া মিলিটারি ভদ্রলোকের সঙ্গে —অশ্রুদি, সত্যি সত্যি ওসব করে নাকি? একেবারে অবিকল —ঠিকঠাক!' চাপা লজ্জায় মুখটা লাল মধুছন্দার।

অশ্রু বলল, 'অবিকল বুঝি!'

'হুঁ। তাই তো! আচ্ছা অশ্রুদি, তখন তো পরিচালক—সরি, ডিরেকটার, ক্যামেরাম্যান সবাই থাকে। তাদের সামনে ওইসব করতে লজ্জা করে না ওদের?' পরক্ষণে নিজেই যেন সদুত্তর খুঁজে পেয়ে বলল, 'টাকা পাচ্ছে একগাদা। লট অফ মানি! অশ্রুদি, আপনি ক্যাবারে ড্যান্স দেখেছেন?'

অশ্রু মাথা দোলাল।

'স্টীপট্রিজ?'

'উঁহু।'

'যান! দেখেছেন, লুকোচ্ছেন। আজকাল সবাই দেখে। একটা করে ড্রেস খুলতে খুলতে শেষে যেই নেকেড হয়ে পড়ে, অমনি আলো নিভে যায়—নয়তো স্টেজ থেকে দৌড়ে পালায় ড্যান্সার। অশ্রুদি, বেলিড্যান্স আপনার কেমন লাগে?'

অগত্যা অশ্রু বলল, 'ভালো।'

'আমি আপনার কাছ ইংরেজিটা শিখে ফেললে তখন ও আমাকে বড়ো পার্টি-ফার্টিতে নিয়ে যাবে বলেছে। ও বলে কি জানেন? পার্টি দু'রকমের হয়—আমিষ আর নিরামিষ! আমিষ ইংরেজি, ওয়েট বলছি—ভেজে—সরি, নন-ভেজিটারিয়ান, তাই তো?'

'ঠিক। নিরামিষ ভেজিটারিয়ান, আমিষ নন-ভেজিটারিয়ান।'

'ভেজিটারিয়ান পার্টি কোন্‌গুলো জানেন তো? যেখানে দিশী মাথামোটা সব বড়বাজারের হোঁদলকুতকুতগুলো যায়। আমি দু'একটায় গেছি। কিন্তু সায়েবী পার্টিতে এখনও যাওয়া হচ্ছে না—ওগুলোই তো নন-ভেজিটারিয়ান। ইংরেজিতে চৌকশ না হলে নাকি অসুবিধে আছে।' বলে মধুছন্দা মনের সুখে হাসতে লাগল। —'অশ্রুদি, আমার হবে তো?'

'কী?'

'আবার কি? আঃ, বলুন না—ইংরেজিতে কথা বলতে পারব না কি?'

'নিশ্চয়ই পারবেন। আপনাকে স্পোকেন ইংলিশটা বেশি শেখাব।'

'জানেন? আমাদের বংশে মেয়েদের লেখাপড়া শেখানো, বাইরে যাওয়া এসব বারণ ছিল দাদুর আমলে। বাবাও কতকটা তাই। আমার স্কুল ফাইনালটা তো মায়ের চাপে হয়েছিল। বাজে স্কুল—সব বাংলায়। জানেন অশ্রুদি, আমি বেশ ড্রিঙ্ক করতে শিখে গেছি।'

অশ্রু বলল, 'তাই বুঝি?'

মধুছন্দা চাপা স্বরে বলল, 'হুঁ উ। শোবার আগে ও মেপে গ্লাসে ঢেলে দেয়। তবে বাবা বা মা যদি টের পান, আর মুখই দেখবেন না হয়তো।' কণ্ঠস্বর আরও একটু চাপা করল মধুছন্দা। 'আপনাকে বললুম, আর কাউকে বলা যাবে না তো!' সে হেসে উঠল।

অশ্রু টের পাচ্ছিল, মধুছন্দার মধ্যে সম্ভবত বয়স ও পারিবারিক কালচারজনিত একটা প্রবল সরলতা আছে, আস্তে আস্তে সেই টানটান সরলতার সাদা ফিতেটা কুঁচিয়ে ময়লা হতে হতে অজস্র গিঁট পড়বে, আরো কুঁচকে তা জটিল হবে এবং তাকে বলা হবে 'সফিস্টিকেটেড!' তার ওপর নকল রঙ বুলিয়ে বলা হবে—এটা স্মার্টনেস। অশ্রু হঠাৎ বলল, 'এস্টাব্লিশমেন্ট কি জানেন?'

'কী বললেন, কী বললেন?' মধুছন্দা ছটফট করে উঠল। 'এক মিনিট —কথাটা ওকে বলতে শুনেছি। লিখে নিই।' সে খাতা-কলম নিয়ে তৈরি হল।

অশ্রু সেদিকে মনোযোগ না দিয়ে বলল, 'দ্য সেলফিশ্ জায়েন্ট নামে একটা গল্প আছে।...'

'হুঁ উ। পড়া। আমার মুখস্থ আছে গল্পটা।'

'এস্টাব্লিশমেন্ট সেই সেলফিশ জায়েন্টের নাম।'

'তাই নাকি? জানতুম না তো!'

অশ্রু মুখ টিপে হেসে বলল, 'সে বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়েদের দু'চোখে দেখতে পারে না। কারণ বাচ্চারা খুব সরল হয় তো। সরলতা তার দু'চোখের বিষ।'

'আপনি ইংরেজিতে বলুন না গল্পটা। আমার অনেকটা ইংরেজিও শেখা হবে।'

অশ্রু ঘড়ি দেখল। সওয়া ছ'টা হয়ে গেছে। আধঘণ্টার বেশি সময় অকারণ সে এখানে বসে রয়েছে। বলল, 'আজ উঠি, আমার তাড়া আছে।'

মধুছন্দা তার কব্জির ব্যান্ডের মস্তো ঘড়িটা দেখে বলল, 'সরি! আপনাকে কতক্ষণ আটকে রেখেছি। এবার কিন্তু বড় খারাপ লাগবে কিছুক্ষণ। একা একা!'

সেই মুহূর্তে টং করে দরজার ঘণ্টা বাজল। অবাঙালি ঝি মেয়েটি দরজা খুলে দিয়েছে। হাসিমুখে সৌমেন সেন শিস দিতে দিতে এ ঘরে এসে ঢুকল। অশ্রুকে দেখে বলল, 'ওয়ান্ডারফুল! আপনি রয়েছেন দেখছি! ভাবছিলুম ছন্দা একা কাটাচ্ছে! সত্যি আর পারা যায় না। অফিস থেকে এমনিতেই বেরোতে দেরি হয়। তার ওপর এ সময় রাত আটটা অব্দি এখানে-ওখানে ট্রাফিক জ্যাম! কলকাতা ক্রমশ বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়ছে। বসুন, বসুন মিস্ সরকার!'

অশ্রু উঠে দাঁড়িয়েছিল। বলল, 'না, তাড়া আছে, আজ চলি।'

'কী মনে হচ্ছে ছাত্রীটিকে?' বলে স্ত্রীর দিকে হাসিমুখে চোখ নাচাল সে।

অশ্রু মধুছন্দার দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বলল, 'ভালো।'

'সেপ্টেম্বরের শেষাশেষি আমাকে হয়তো একবার স্টেটসে যেতে হবে। হয়তো নয়—মোটামুটি প্রোগ্রাম ফিক্সড। ভাবছি, ছন্দাকে নিয়ে যাব। এই তিনটে মাসে ফিট হয়ে উঠবে—কী মনে হচ্ছে আপনার? অবশ্য, একজন গভর্নেসও রাখব ভাবছি—চব্বিশ ঘণ্টার জন্য। এটিকেট অ্যান্ড কালচার ইত্যাদির ব্যাপারে।'

অশ্রু বলল, 'স্টেটস মানে আমেরিকা যাবেন?'

'হ্যাঁ। লস এনজেলস—না, আগে ওয়াশিংটন—তারপর লস এনজেলস। অবশ্য, ফরেন, এক্সচেনজের ব্যাপারে কোম্পানী এখনও সিওর হতে পারছে না। তবে—আটকাবে না।'

মধুছন্দা সব শুনছিল বড়ো বড়ো চোখে। এবার একটা পত্রিকা টেনে ছবি দেখতে লাগল।

অশ্রু বলল, 'আসি।'

'আচ্ছা, আর আপনাকে আটকানো ঠিক নয়।'—বলে দরজা পর্যন্ত তাকে এগিয়ে দিয়ে গেল সৌমেন। মধুছন্দাও হয়তো এল।

অশ্রু যখন রাস্তায় নামল, তখন তার উরু দুটো কেমন ভারি বোধ হল। খুব ক্লান্তি অনুভব করল সে। মাথাটা কেমন করছে যেন। তাহলে মোটে তিনটে মাসের টিউশনি! পঞ্চাশ টাকারটা ছেড়ে দিয়ে কী ভুল না হল!

এটাই হয়ে আসছে অশ্রুর জীবনে বরাবর। সুখের ঘরে সে পা দেয়, কিন্তু বেশিক্ষণ থাকা হয় না। বেরিয়ে এসে আবার যে কে সেই।

দু'ধারে সন্ধ্যার আলো লাগা দীর্ঘ সতেজ দেবদারু এখন পায়ে বাঁধা ঘোড়ার মত ক্লান্তভাবে বিশ্রাম নিচ্ছে। পার্কের দিকটায় আবছায়া জমে রয়েছে। কাচের আড়ালে দেখা দৃশ্যের মত কিছু মানুষের নড়াচড়া দেখা যাচ্ছে। পার্কে গিয়ে একবার বসবে কি?

ইচ্ছে করল না। পপ গানের বাজনাটা মাথায় তেড়ে এল হঠাৎ। —'একশো মাইল দূরেও যদি থাক, আজ রাতে গিয়ে তোমাকে চুমু খাবোই...'

বিবিদির রেকর্ড প্লেয়ার আছে। কিছু ওয়েস্টার্ন মিউজিকের কালেকশানও আছে। কিন্তু সবই ক্লাসিক। মোৎসার্টের আটটা সিম্ফনি, বীঠোফেনের কিছু অর্কেস্ট্রা, জাজ। বাকি সব রবীন্দ্র নজরুল কীর্তন আর ভারতীয় ক্লাসিক। অশ্রু হন্ হন্ করে হাঁটতে থাকল।

বোতাম টিপল ফ্ল্যাটের দরজায়। রুচি খুলল।—'ইস, এত দেরী! কোথায় ছিলে?'

অশ্রু বলল, 'এত সকাল সকাল ফিরেছ যে আজ?'

'ভ্যাট! আজও কামাই করেছি!'

'মেয়েটা নির্ঘাৎ মরবে।' অশ্রু ঢুকে দরজা বন্ধ করল। তারপর চমকে উঠে বলল, 'ও কে?'

রুচির খাটে একটি ষোল-সতের বছরের ছেলে বসে রয়েছে। অবিকল রুচির মত চেহারা। রুচি গম্ভীর মুখে বলল, 'আমার ভাই।'

এরকম ছেলেদের আজকাল রাস্তাঘাট অলিগলি সবখানে দেখতে পাওয়া যায়। খসখসে বড় বড় চুল, জ্বলজ্বলে বসা চোখ, গোঁফ আর আঁটো পাতলুন। অবশ্য রুচির ভাইয়ের সবে গোঁফের রেখা ফুটেছে। রুচির মুখে হারানো ভাইকে ফিরে পাওয়ার খুশি কিংবা অন্য কিছু ছিল, অশ্রু সেটা ধরতে পারল না। তাই যেন খেই ধরিয়ে দিতেই সে খানিকটা চঞ্চল হল—'ইস! কী কাণ্ড! রুচি, তুমি ভাইকে পেয়ে চুপচাপ বসে রয়েছ? কী মেয়ে রে বাবা! ধূমধাম ফুর্তি খাওয়া-দাওয়া হবে তো—না কি? তোমার নাম কি ভাই? অ্যাদ্দিন কোথায় ছিলে তুমি? দিদির খোঁজ নাওনি কেন?'

রুচির ভাই নরু হাসতে হাসতে বলল, 'আমি খোঁজ নেব—না, ও নেবে? জিজ্ঞেস করুন না —কী বলে গিয়েছিলুম?'

রুচি বলল, 'চালাকি করিস নে। তুই কিছুই বলে যাসনি।'

'যাইনি? আপন গড বলছ?' লাফিয়ে উঠল নরু। তারপর অশ্রুর উদ্দেশে বলল, 'বুঝলেন দিদি, দিদিটা বরাবর অমনি। সকালে উঠেই বলেছিলুম—তারকদার সঙ্গে বাইরে যাচ্ছি, কবে ফিরব ঠিক নেই। তারপর ও বেরোল কোথায়, একটু পরে আমিও বেরোলুম। চলে গেলুম বোম্বে। সেখান থেকে আমেদাবাদ, তারপর এখান থেকে সেখানে—কত জায়গা!'

অশ্রু বলল, 'দিদিকে চিঠি দিলেই পারতে। বেচারা ভাবত না।'

নরু ফিক করে হেসে আঙুল তুলল রুচির দিকে—'কে ভাববে? দিদি? হুঃ তাহলেই হয়েছে। ও নিজের কথা ভাবতে ভাবতে পাগল, তো আমি কোন্ ছার। আর চিঠির কথা বলছেন? হপ্তায় হপ্তায় চিঠি লিখেছি। তেমন ছেলে আমি নই।'

রুচি আস্তে বলল, 'পাইনি।'

নরু বলল, 'পাবে কি করে? তুমিও তো তখন বেরিয়ে পড়েছ আমার মত। আমি কলকাতা ফিরেই

প্রথমে ওবাড়ি গেলুম। গিয়ে দেখি কারা সব রয়েছে। শালা, বাপের জন্মেও দেখিনি। তারপর কাল সারাটা দিন নানান চেনা জায়গা খুঁজে খুঁজে ...'

অশ্রু বলল, 'রুচি, ভাইকে কী খাওয়ালে?'

নরু ফের একটা লাফ দিল প্রায়। হাসতে হাসতে বলল, 'কে খাওয়াবে? দিদি? মাইরি, কী যে বলেন দিদি। ও তো আমাকে দেখে এত ফাণ্টুস মেরে গেছে যে, কথাই ফোটে না মুখে।'

অশ্রু ব্যস্ত হয়ে উঠল। —'রুচিটা অদ্ভুত। বসো ভাই, বসো। আসছি।' বলে ব্যাগটা নিজের বিছানায় ছুঁড়ে দিল! তারপর যেতে যেতে পিছু ফিরে ফের বলল, 'তুমি উঠেছ কোথায়?'

নরু পলকে গম্ভীর হয়ে বলল, 'কোন্ চুলোয় উঠব বলুন? কাল ভোরবেলা নেমেছি হাওড়ায়। তারপর থেকে তো পথে পথে এ-জায়গা ও জায়গা ওর খোঁজে ঘুরে বেড়াচ্ছি। রাত বারোটায় হন্যে হয়ে বিকাশদার ওখানে গেলাম। দিদির খোঁজ পেলুম। কোথায় চাকরি করছে বললে। কিন্তু শালা বিকাশদা বলে কী জানেন? সব চাও দেব ভাই নরু, কিন্তু শোবার জায়গাটি বাদে। তখন হাজরা পার্কে গিয়ে শুলুম। তো শালা বেধড়ক বিষ্টি। তারপরে...'

রুচি রেগে গেল—'খুব হয়েছে। চুপ কর এখন।'

অশ্রু চলে গেল খাবার ঘরের দিকে। হ্যাঁ,কোন তারকদার সঙ্গে বোম্বে-টোম্বে প্রচুর ঘুরেছে ছেলেটি, তারপর ফিরেছে ক্লান্ত বিধ্বস্ত হয়ে। চেহারা আর পোশাকেই বোঝা যাচ্ছে, কিছু সুবিধে করতে পারেনি। রুচির ঠিকানা যে রুচির অফিস থেকেই পেয়েছে,তা অনুমান করা যায়। অশ্রু ফ্রিজ খুলে কিছু কলা আর একটা আপেল বের করল। বিকেলে খাবে বলে একবাটি পুডিং রেখেছিল, সেটাই নিল। ....হুঁ, রুচি বিরক্ত আর অপ্রস্তুত হয়েছে। একে তো তার এরকম অর্ধশিক্ষিত বা কুশিক্ষিত ভবঘুরে ভাই থাকা সম্ভবত প্রেস্‌টিজের বিপদস্বরূপ, তার ওপর ছেলেটি যেন আশ্রয়প্রার্থী। অশ্রুও একটু উদ্বিগ্ন হল। এক মুহূর্ত অন্যমনস্কতায় সে ভাবল, ধরা যাক—ও তার নিজের ভাই, তাহলে কী করত অশ্রু?

অশ্রুর মনটা খাঁটি মায়ের মন। সে যখন নরুকে ডকতে গেল, দেখল রুচি কখন নিঃশব্দে তার পেছন দিয়ে চলে গেছে পুবের ব্যালকনিতে। চুপচাপ দাঁড়িয়ে রয়েছে। নরু ভুরু কুঁচকে ঘরের জিনিসপত্র দেখছিল। অশ্রু ডাকল, 'এস ভাই। হাতমুখ ধুয়েছ তো?'

নরু কেমন হাসল। —'নাঃ।'

'ধুয়ে নাও। সঙ্গে জামাকাপড় রয়েছে? বদলে নাও তাহলে।' নরুর পায়ের কাছে একটা এয়ারব্যাগ রয়েছে। সে তার চেন খুলল, কিন্তু ফের চেনটা টেনে বন্ধ করে বলল, 'থাক।'

'না না। কোথায় কোথায় ঘুরেছ। হাতে-মুখে জলটা দাও অন্তত।'

'তা দিচ্ছি।' বলে বাথরুমের দিকে চলে গেল নরু।

অশ্রু ডাইনিং ঘর থেকে রুচিরই উদ্দেশে বলল,'রুচি, শোন্!'

রুচি ঘুরল না। শুধু 'কী' শব্দটা শোনা গেল তার মুখ থেকে।

অশ্রু ক্ষুব্ধ হল। কিন্তু আর কিছু বলল না। নরু বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল রুমালে মুখ মুছতে মুছতে। তারপর অশ্রুর বলার অপেক্ষা না করেই সোজা এ ঘরের টেবিলে এসে বসে গেল। তার দু'চোখে জানোয়ারের লোভ টলটল করেছ। —'এসব খাবো?' বলে সে কৃতার্থ মুখটা তুলে হাসল —'ভাত—ভাত নেই আপনাদের? কদ্দিন পরে ফিরলুম এখানে—ইচ্ছে ছিল প্রচণ্ড ভাত খাব।'

অশ্রু বলল, 'না তো ভাই। ওই খেয়ে নাও। আমরা অবশ্য একবারই ভাত খাই—রাতে রুটিফুটি।'

নরু দ্রুত পুডিংটা গিলতে গিলতে বলল, 'সেই দেখছি। শালা একটা হোটেলে গেলুম দিদির অফিস থেকে বেরিয়েই—বলে এখন আর ভাত নেই। অথচ আপন গড, বোম্বে-টোম্বেতে কী চাল কী চাল, কত সস্তা! যত খুশি ভাত খান, গভমেন্টের আপত্তি-টাপত্তি নেই!'

অশ্রু ঈষৎ স্নেহে বলল, 'ওখানে কোন কাজকর্ম করতে তো?'

করতুম। তবে শালা তারকদাটা বড্ড টেঁটিয়া। ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে গেল—বলে ওখানকার ফিলিম লাইনে ওর খুব জানাশোনা আছে। স্টুডিওতে টেকনিক্যাল হ্যান্ড অনেক লাগে। সেই আশায় নিয়ে গেল। এখানে তো বড্ড গণ্ডগোল চলছিল—তাই ভেবেছিল, বরাত যদি ফেরে বোম্বে গিয়ে।

আমাকেও সঙ্গে নিল। কেন নিল, প্রথমে বুঝিনি—পরে বুঝলুম। শালা আমার টাকায় বোম্বে যাবার মতলব করেছিল। গিয়ে দেখি, হ্যাঁ, বান্দ্রাতে ফিলিমের লোক অনেক জানাশুনা আছে ওর। কিছুদিন থাকার পর যেই আমার টাকা ফুরুল, অমনি ছল-ছুতো করে আমাকে তাড়িয়ে দিল! তারপর আমার সে এক হিস্‌ট্রি, দিদি।' —তার চোখে জল এসে গেল কাশতে কাশতে।

অশ্রু বলল, 'তোমার বুঝি অনেক টাকা ছিল?'

নরু একটু চমকাল যেন। ইতস্তত করে বলল, হ্যাঁ—পিসিমা আমার স্কুলের মাইনে যা দিতেন, সব রেখে দিতুম। আর—'

রুচি এসে রুক্ষস্বরে বলল, 'খুব হয়েছে। নিজের কীর্তির কথা আর ফাঁস করো না। খেয়েদেয়ে যেখানে যাবার আছে, চলে যাও তো।'

নরু ওর মুখের দিকে নিষ্পলক তাকাল কয়েকটা মুহূর্ত। তারপর মুখ নামিয়ে বলল, 'আমি কি থাকতে এসেছি নাকি তোর মেসে? এখানে ছেলেদের অ্যালাউ করে না—সে খবর আমি রাখি। মায়ের পেটে জন্মেছিলি, তাই দেখতে এলুম—'

রুচি গজগজ করতে করতে নিজের ঘরে গেল। —'ডেঁপোমি চিরকাল আছে! কথা শুনে বয়স টের পাওয়া কঠিন।'

অশ্রু হেসে উঠল, 'পিঠোপিঠি ভাইবোন হলে নাকি একেবারেই বনে না।'

'বনে না তো। ও চিরকালের কুচুটে মেয়ে। সেজন্যেই তো নাকের জলে চোখের জলে হয়েছে কতবার। বলে—আমার কীর্তির কথা ফাঁস করছি! কীর্তি কারো কম নেই। শালা এ বয়সে তো কম দেখলুম না—।' বলে নরু কলার টুকরোগুলো গিলতে থাকল।

অশ্রু পাশের ঘরে এসে দেখল, রুচি শুয়ে পড়েছে চিত হয়ে। চোখ বুজে রয়েছে। অশ্রু পাশে বসে ফিসফিস করে বলল, 'অ্যাদ্দিন পরে ভাইকে ফিরে পেলি—খুশি হবি তা নয়, যেন ভীষণ খাপ্পা হয়ে গেছিস। এমন কেন রে? বরাবর তো ওর কথা বলে প্রশংসা করতিস! মেরিটোরিয়াস ছেলে ছিল স্কুলে—কুসঙ্গে পড়ে খারাপ হয়ে যাচ্ছিল—তুই নিজেই তো বলতিস।'

'বলতুম! কিন্তু ...' রুচি থেমে গেল।

'কিন্তু কী? নিজের হিল্লে তো ভালই হয়েছে—এবার ভাইটার শিগগীর একটা কিছু জুটিয়ে দে সিং সায়েবকে বলে। ব্যস, কোন ঝামেলা নেই।'

রুচি চাপা স্বরে বলল, 'সে আমি পারব না।'

'পারবি না কী? নিজের ভাই না খেয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াবে?'

'তুমি যা বোঝো না, বকো না। খাইয়েছ—হিউম্যানিটির চূড়ান্ত দেখিয়েছ, এবার শিগগীর বিদেয় করো।'

অশ্রু অবাক হয়ে গেল। —'কী বলছিস তুই? আর—আমি কীভাবে বিদেয় করব? ও এসেছে তোর কাছ।'

রুচি বলল, 'আশ্চর্য! আমার অফিসের লোকেরাও বড় অদ্ভুত তো! বারণ করা আছে কাকেও ঠিকানা দেবে না। অথচ ওকে তক্ষুণি দিয়ে বসেছে।'

'বা রে! পরিচয় দিয়েছে—তাই দিয়েছে।'—অশ্রু একটু হাসল। 'তোর চেহারার সঙ্গে ভীষণ মিল যে! শাড়ি পরিয়ে—খোঁপা বসিয়ে দিলে তোর বিকল্প বলে চালানো যায়।'

'হ্যাঁ। তুমি দেখছি ওর বেজায় প্রেমে পড়ে গেছ, অশ্রুদি।' রুচি ক্ষিপ্ত হয়ে বলল।

তাতে অশ্রু রেগে গেল এবার!—'কী অভদ্র তুই! ছিঃ!'

'কেন? যা দেখছি—বলছি।'

'থাম। আমার ছেলের মত—আর তোর যা-তা বলতে মুখে আটকাচ্ছে না?'

রুচি হেসে উঠল সঙ্গে সঙ্গে—'দিয়েছি তো রাগিয়ে! কেমন! কেমন? আর একটু রাগাব? রাগাই? মরো—চেনা নেই, জানা নেই হুট করে যাকে-তাকে খাতির করে খাওয়া না, খবরাখবর নেওয়া—অশ্রুদি, এগুলি কিন্তু—ভালো লক্ষণ নয় সচরাচর। অবশ্যি নরুর কথা বলছিনে।'

অশ্রু স্তম্ভিত ও আহত মুখে তাকাল ওর দিকে।

'আরেক ডিগ্রি চড়িয়ে দিই ব্যারোমিটারের পারা! কেমন? ঋতুর সেই শ্যামল না ক্যামল, আর কে সব আছে—কিংবা বিবিদির কাছে কেউ ধরো এল। তারপর? অশ্রুদির তখন সাজো-সাজো রব পড়ে গেল। ফ্রিজ খুলল ব্যস্ত হয়ে। চয়ের কেটলি চড়াল। এজন্যে বিবিদি কী বলে জানো? আসলে মিস অশ্রুকণা একটু ইয়ে... তোমার দিব্যি, অশ্রুদি, ওই যে কিসের দোষ-টোষ থাকা বলে... বিবিদিটা পুরুষমানুষেরও অধম—যা স্ল্যাং ঝাড়ে না'... হাসতে হাসতে রুচির চোখে জল এসে গেল।

অশ্রু চুপচাপ শুনছিল। এইসব তার নামে বলাবলি হয় তাহলে! তার কাছে তো কেউ আসে না—আসে এদেরই কাছে! তার হাতে খাওয়া-দাওয়ার বা কিচেনের দায়িত্ব আছে বলেই সে এদের পক্ষ থেকে আপ্যায়ন করে। এটা মানুষের স্বাভাবিক ভদ্রতাবোধের ব্যাপার। অথচ এরা তার আড়ালে এসব কথা বলাবলি করে!

রুচি কী নিষ্ঠুর নির্বিকার মুখে কথাগুলো আওড়ে গেল বলেই অশ্রু অবাক হল। নতুন লাগল রুচিকে—বিবিকেও। আশ্চর্য! মানুষকে কী একটুও বোঝা যায় না! অশ্রু কোন কথা বলল না। উঠে কিচেনে ঢুকল সোজা। ময়দার টিনটা নামাল। ময়দা মাখতে হবে। অনেকগুলো রুটি করতে হবে। যন্ত্রের মত—অভ্যাসে। সে ময়দা মাখতে বসল বটে, কিন্তু টের পেল একটি প্রচণ্ড কান্নার ঝড় বুকের মধ্যে ঘুরপাক খেতে খেতে গলা ঠেলে বেরুতে চাইছে। হু-হু করে না কেঁদে ফেললে সে দম আটকে মরে যাবে।

সেই সময় তার মনে পড়ল ফাদার পিয়েরের কথা—'আমি যদি তুমি হতুম, অশ্রু, তাহলে কী করতুম জানো? স্রেফ নান হয়ে যেতুম—সন্ন্যাসিনী হতুম। স্বাধীন, মুক্ত জীবন—ঈশ্বরের ভাবরাজ্যে তো কোন দায়িত্ব নেই, ভক্তি আর আত্মনিবেদন ছাড়া।' ফাদারের সঙ্গে অনেকদিন দেখা হয়নি। শ্যামবাজারে ওদের সেটলমেন্টে অনেকদিন যাওয়াও হয়নি। ফাদারকে অবশ্য মাঝে মাঝে সাইকেলে চেপে কলেজে যেতে দেখেছে দূর থেকে। কিন্তু কী জানি কী একটা অস্বস্তি বরাবর থেকে যায় বলেই হয়ত এড়িয়ে থাকতে চেয়েছে অশ্রু। এখন মনে হল—একটা উদ্ধার যেন ওখানেই নিহিত। নান হয়ে যাওয়া উচিত তার। এই উদ্দেশ্যহীন জীবনকে ভাবরাজ্যের ফুলে ফলে বিকশিত করা যেত তাহলে। সত্যি মানুষ জন্মপাপী—পাপ নিয়েই সে জন্মেছে। মনটা ছটফট করে উঠল অশ্রুর। কিন্তু একটু পরেই দেখল, তার অভ্যস্ত হাত ময়দা মাখতে কোন ভুল করছে না।...

রুচির ঘর থেকে কথাবার্তার আওয়াজ কানে আসছিল তার। নরুল বলছে, 'তুই তো এখন বড় চাকরি করছিস দিদি! তোর তো টাকার অভাব নেই শুনলুম—বিকাশদা বলছিল। দে না —আপন গড, কোথাও মেসফেস দেখে নিয়ে থাকব। ফ্রিজের কাজ শিখে এসেছি। আমার শালা ভাবনা নেই —জুটে যাবে একটা! কিন্তু তদ্দিন শালা খাব কী, থাকব কোথায়?'

'ঝামেলা করিস নে। এই দশটা টাকা দিচ্ছি, নিয়ে বিদেয় হ শিগগীর।'

'দশ টাকা! তুই মায়ের পেটের দিদি, না আমি শালা বেজন্মা, যে তোকে খোসামোদ করতে হবে? তুই কী মাইরি? চিরকাল একরকম থেকে গেলি?'

'ভালো হবে না বলছি, নরু। নিবি তো নে—নিয়ে চলে যা।'

'দ্যাখ দিদি, যখন তোর চাকরি ছিল না—কলেজে পড়তিস, তখন দশ টাকা চেয়েও পেয়েছি। এখন মোটা মাইনের চাকরি করছিস, এখনও দশ টাকা দিবি?' নরু হাসল।

'বলছি তো—নেই। থাকলে দিতুম।'

'যাঃ! তোর কখনও টাকার অভাব থাকে? বললেই বিশ্বাস করব ভাবছিস? তোর শালা কত সব বন্ধুবান্ধব বরাবর। এই, মাইরি দে না। আমি কাজ পেলেই শোধ দেব—চোখের দিব্যি। বরং—তোদের তো ফ্রিজ আছে দেখলুম। খারাপ হয়নি? সারিয়ে দেব—বল না ওদের!'

'না—না। ফ্রিজ খারাপ হয়নি। তুই চলে যা বলছি।'

'দিদি, আশ্চর্য! মাইরি আশ্চর্য! আজ ন'দশ মাস পরে তোর সঙ্গে দেখা হল—মায়ের পেটের ভাই, ভেবেছিলুম — দেখা হলেই কেঁদে ফেলবি ভ্যাঁ করে। তার নয়—যাঃ! কোন মানে হয় না!'

নরু খিকখিক করে হাসতে লাগল।

'নরু, এবার মারব কিন্তু!'

'বেশ, দশটা টাকাই নিলুম। আমাকে রাত্তিরটা থাকতে দে। শোব কোথায়? এতবড় সিটিতে কোন শালা শোবার এতটুকু জায়গা দ্যায় না। কাল রাত্তিরটা যা গেছে, বলার নয়। একটা বারান্দায় শুলুম, তো পুলিশ এসে তাড়ালে। তখন হাঁটতে হাঁটতে, গিয়ে শেয়ালদা স্টেশনে....'

'এখানে শোবার জায়গা নেই। মেয়েদের মেস—অ্যালাউ করবে না।'

'সে তো জানিরে বাবা! এক কাজ কর না। ওই যে খেতে দিল, ওই দিদির পারমিশান নে। আমার শালা কত আর বয়েস হয়েছে। এখানটায় মেঝেয় শোব। মেয়েটা খুব ভাল মনে হচ্ছে। আপত্তি করবে না।'

'তা হয় না।'

'আহা, বলেই দ্যাখ না। উনি খুব ভাল।'

'হবে না। চলে যা।'

'এক কাজ কর তাহলে। ওই বারান্দাটায়—'

'না।'

'দরজা আটকে দিবি তোরা।'

'ব্যালকনিতে বৃষ্টির ছাঁট আসবে।'

'আসুক না! তাও তো একটা ঘরে থাকব—তোদের কাছে।'

'নরু, জ্বালাস নে! চিরদিন জ্বালিয়েছিস, এবার দয়া করে আমাকে রেহাই দে। চলে যা।'

কিছু স্তব্ধতা। তারপর নরুর গলা শোনা গেল।—'দশ টাকা! দশ টাকায় কী হয়!'

রুচি বলল, 'অনেক হয়। দশ টাকা থেকেই কতজনের গাড়িবাড়ি হয়।'

'আচ্ছা, দিদি, তোর যেখানে কাজ হয়েছে, বলে কয়ে সেখানে আমাকে লাগিয়ে দিতে পারিস নে?'

'চেষ্টা করব।'

'তাহলে যাব তোর আপিসে কালই।'

'কাল রোববার।'

'পরশু?'

'যাস, দেখব।'

দরজা খোলা ও বন্ধ করার শব্দ হল। তারপর রুচি নিজের বিছানায় গিয়ে শুল। তার কিছু পরেই বৃষ্টি এল।

অশ্রু মনের ভেতর দেখল, বৃষ্টির মধ্যে ফুটপথে ধরে দৌড়ে যাচ্ছে একটি কিশোর—ঠিক কিশোর নয়, যৌবন আচমকা পিছু হটে ঝাঁপিয়ে পড়েছে দেহেমনে তার, অকালপক্ক তথাকথিত মস্তান মার্কা চরিত্র হয়ত—কিন্তু দয়ামায়া করুণার ব্যাপার ঠিক নয়, মনে হল, আমরা সবাই মনে মনে যেন ওই রকম। ওই রকম বিভ্রান্ত, বদমাস, আশ্রয়চ্যুত, লক্ষ্যহীন এবং বৃষ্টির মধ্যে ভিজতে ভিজতে পথ ধরে রাতের আস্তানার খোঁজে দৌড়ে যাচ্ছি।...

বিবি আর ঋতু ফিরল দশটার কাছাকাছি। অশ্রু এতক্ষণ নরুর ঘটনা সামলাতে পারছিল না যেন, তাই হুড়মুড় করে উগরে দিল। তখন বিবি রুচিকে একটু বকল। ... 'ছেলেমানুষ—নিজের ভাই। বরং ডাইনিং ঘরে শোবার ব্যবস্থা করা যেত। নিয়ম একটা করা হয়েছে বলেই তো কথা নয়। নিয়ম তো আমাদের হাতে।'

রুচি বলল, 'ভ্যাট! ওকে জানো না! ওর স্বভাব-চরিত্র ভাল নয়। থাকতে দিলে—তারপর কিছু একটা করে বসল! ফ্রাংকলি বলছি, তখন আমার কি অবস্থা হবে বুঝতে পারছ? মুখ দেখাতে পারব তোমাদের কাছে?'

অশ্রু বলল, 'ওসব বাজে কথা! রুচি আমাদের ঠিক রোবোট ঠাউরেছে রে!'

'কী ভেবেছি? রোবোট? বাজে কথা বলো না।'

'তাছাড়া কী? এরপর—ধরা যাক, বিপদে পড়ে আমারই কেউ এলে—কিংবা তোমাদের কেউ—আশ্রয় দিতে পারব না। সে পথ বন্ধ করা হ'ল আর কী!'

রুচি রেগে কী বলতে যাচ্ছিল, বিবি তাকে থামিয়ে বলল, 'চুপ করো সব। বলাই তো আছে, কোন অ্যাকসিডেণ্টাল ব্যাপার নিয়ম নাস্তি। একেবারে জায়গা না থাকে, তো আলাদা প্রশ্ন। জায়গা তো রয়েছে রে বাবা! উঁহু—এটা ঠিক করোনি রুচি, এই বৃষ্টির রাতে বেচারাকে ছেড়ে দেওয়া উচিত হয়নি।'

রুচি বলল, 'ও ভীষণ চোর যে!'

ঋতু ওর গলাদুটো টিপে দিয়ে বলল, 'তুই এত ঠোটকাটা মেয়ে তা জানতুম না। নিজের ভাইকে কেউ চোর বলে নাকি?'

বিবি সকৌতুকে ভুরু কুঁচকে বলল, 'চুরি করে?'

'হ্যাঁ।'

'জেল খাটেনি তো?'

'কে জানে!'

'জেল না খাটলে চোর-টোর কিছু কথা নয়।'... বলে বিবি হেসে উঠল। ঋতুও হাসল। অশ্রুও। এবং ঘরে এতক্ষণে একটা হাল্কা হাওয়া এল বাইরে থেকে। গুমোট ভাবটা কেটে গেল।

তখন রুচি ঋতুকে বলল, 'গলা দেখানো হল?'

ঋতু হাই তুলে বলল, 'হঁউ।' তারপর ধুপ করে নিজের বিছানায় বসল। তাকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। রুচি তার কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রয়েছে। রুচির একটা হাত টেনে সে পাশে বসিয়ে দিল। ফিসফিস করে বলল, 'কাল রোববার, যাবি ডক্টর মৌলিকের ওখানে? রোববারেও উনি চেম্বারে বসেন। সত্যি অদ্ভুত ডাক্তার।'

'কেন? আমার আবার কী হ'ল যে, তোদের সেই অদ্ভুত ডাক্তারের কাছে যেতে হবে?'... বলে রুচি হাসল।

বিবি বাথরুমে ঢুকেছে এবং অশ্রু ডাইনিং-এ টেবিল সাজাচ্ছে। ঋতু বলল, 'খুব বড়ো গায়নোকলজিস্ট। আমাকে দেখেই একটা ব্যাপার বলে দিলেন, ভাবা যায় না!'

'ওরা অমন বলে।'

'না রে! সত্যি।' .... বলে ঋতু তার পার্সটা বালিশের তলায় ঢুকিয়ে দিল।...'তোর তো প্রতি মাসে বরাবর কী সব গণ্ডগোল হয়! আপিস কামাই হয়! হয় না?'

রুচি ঠোঁটের কোণ বাঁকা করে বলল, 'এখন হয় না।'

'চালাকি! সে জন্যেই তো আপিস যাচ্ছ না।' ... বলে ঋতু হঠাৎ হেসে উঠল। ফের বলল, 'এক সময় নারীপ্রগতি করতুম কলেজ লাইফে। আমাদের মুসলিম মেয়েদেরই উৎসাহটা বেশি ছিল ওতে। অধ্যাপিকা কৃষ্ণা দত্ত তার চেয়ারম্যান—উঁহু চেয়ার উওম্যান বলি—কী বলিস? তাঁর বক্তব্য ছিল—পথে যেতে যেতে ছেলেরা দিব্যি গাইতে গাইতে গেলেও কেউ ভ্রূক্ষেপ করে না। কিন্তু মেয়েরা গাইতে গাইতে যাক—সে এক সীন ক্রিয়েট হয়ে যাবে। কেন হবে? আমরা ওর সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলতুম—সত্যি তো, কেন হবে? উনি বলতেন, মেয়েরা রকবাজি করলেই সমাজ কেন রসাতলে যাবে? আমরা কোরাসে বলতুম—ঠিকই তো, কেন যাবে? কিন্তু বুঝলি রুচি? এখন বয়স হয়েছে তো, এখন টের পাই—মেয়েদের পুরুষ হয়ে ওঠাটা প্রগতি নয়। মেয়েদের ডেভালাপমেন্ট হবে অন্য রকম। যাতে মেয়েদের মেয়ে বলেই চেনা যাবে। কারণ, প্রকৃতি কিছু গণ্ডগোল রেখে দিয়েছে মেয়েদের বেলায়।'

রুচির ভাল লাগছিল না এসব গম্ভীর তাত্ত্বিক আলোচনা। তবু বলল, 'ভ্যাট! পুরুষের কারো ধর, অর্শ বা আমাশা হয়েছে—গিয়েছে তোদের ডক্টর মৌলিকের চেম্বারে। সীন ক্রিয়েট হবে না কেন তার বেলা?'

ঋতু খিলখিল করে হেসে ওর পিঠে কিল মারল।..'গ্র্যান্ড বলেছিস!'

রুচি বলল, 'তোর সেই পলিটিক্যাল দাদার সঙ্গে দেখা হ'ল?'

'শ্যামলদা? হ্যাঁ। বিবিদির নাচের আখড়ায় গিয়ে হাজির আজ।'

'তোর কপাল দেখে হিংসে হয়, ঋতু!'

ঋতু হেসে খুন হ'ল।... 'এ মা! তুই কী ভেবেছিস ওকে? ও বড্ড সেয়ানা। ও কেন খুঁজছিল জানিস? বললে তো বিশ্বাস করবি নে—'

'করব বল।'

'ওদের পার্টি একটা উওম্যানস জার্নাল বের করছে। আমাকে তার গ্রাহক করে দিতে হবে। মুসলিম মেয়েদের মধ্যে। কপাল দ্যাখ, হিংসে কর এবার।

একটু চুপ করে থেকে সে ফের বলল, 'কী ভাবে সবাই আমাকে! কিছুদিন ওদের সাপোর্টার হয়ে যাতায়াত করতুম, ইডিওলজিটা টানত, তাই। আজকাল আমার অবাক লাগে, বরাবর যেন ভাল ভাল কথার বড্ড ভক্ত ছিলুম। একটা মহৎ-টহৎ কিছু করে ফেলতে ইচ্ছে করত। মনে হত, দুনিয়াটা বড্ড বাজে—এটাকে বদলে বাসোপযোগী করা উচিত। কিন্তু...' খুব ক্লান্তভাবে হঠাৎ থামল ঋতু।

রুচি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কাল মর্নিংশোয়ে সিনেমা যাই চল।'

'ইচ্ছে করে। অনেকদিন সিনেমা দেখিনি।'

'এলিটে একটা কাউবয় ছবি আছে—দারুণ!' রুচি প্ররোচনা দেওয়ার ভঙ্গিতে বলল।

'কাউবয় ছবি!' ঋতু অবজ্ঞার সুরে বলল। ...'এখনও তুই ওসব ট্রাশ ছবি ভালোবাসিস! নাঃ রুচির রুচিবদল আর এ জন্মে ঘটবে না। যত সব বদমাইসি, খুনখারাপি আর রাখাল-টাখাল—'

রুচি শান্ত হেসে বলল, 'মাল আছে রে, ওর মধ্যে খাঁটি মাল আছে।'

'হাতি আছে! ঘোড়ায় চেপে বন্দুক-পিস্তল নিয়ে কতকগুলো খুনে গুণ্ডা বজ্জাত অশিক্ষিত চোয়াড় মার্কা লোক! মেয়ে লুঠ, রেপ!'

রুচি বলল, 'তুই ভোঁতা। রসকষ নেই তোর মধ্যে।'

'রক্ষে করো বাবা! ওসব বীভৎস রসে আমি নেই। বরং চল না—প্রাচীতে মর্নিংয়ে সত্যজিৎ রায়ের পথের পাঁচালী দিচ্ছে। ভীষণ ভিড় হবে নিশ্চয়। চা খেয়েই সকালে গিয়ে লাইন দেব।'

রুচি ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল, 'ভ্যাট, ভ্যাট! ন্যাকামি সব।' বলে সে হঠাৎ ওকে ধরেই বিছানায় অর্ধেক শরীর ফেলল।

ঋতু ওর টানে শুয়ে পড়ছিল, সামলে নিয়ে বলল, 'এই! ওঠ! অশ্রুদি বেচারা একা খাটছে আর আমরা বিয়ের কনের মতো বসে রয়েছি। রিয়েলি, অশ্রুদি যা মেয়ে! অন্য কেউ হলে আমরা—অন্তত আমি তো মরেই যেতুম। ওঠ।'

সেই সময় বিবির আওয়াজ এল, 'ঋতু, রুচি, চলে এস।'

ওরা হুড়মুড় করে উঠে ডাইনিং ঘরে ঢুকল। দেখল বিবি বসে গেছে।

অশ্রু সবে চেয়ার সরিয়ে তার পাশে বসেছে। ঋতু আর রুচি পাশাপাশি টেবিলের আরেক দিকে বসল। ঋতু বলল, কী আইটেম, অশ্রুদি?'

অশ্রুর মুখটা কেন যেন গম্ভীর আজ। সংক্ষেপে বলল, 'সকালের তরকারিটা।'

বিবি বলল, 'মাত্র হাফ কেজি মাংসের স্টু। দু'বেলা কী করে চালাচ্ছ, আমার পক্ষে বোঝা অসম্ভব অশ্রু।'

রুচি মাংসের একটা কুচি তুলে দেখাল।...'লিলিপুট সাইজ! তাই এখনও একশোজন খাবে।'

অশ্রু গম্ভীর হয়েই বলল, 'না পেলে কী করব? শনিবার থেকেই মাংসের দোকানে লাইন পড়ে যায়। দেরী করে গেলুম। হাফ কেজি পেলুম মাত্র।'

বিবি ধমকের সুরে বলল, 'আনবে না। মাছ আনবে।'

অশ্রু বিপন্ন মুখে বলল, 'বা রে! শনি-রবি তুমি মাংসের বাজেট করেছ—পর পর দু'দিন। খেতে বসে না দেখলেই তো চোখ ছানাবড়া করবে।'

'অশ্রুটাকে নিয়ে পারা যায় না!'... বলে বিবি হাসতে হাসতে রুটি ছিঁড়ে মুখে গুজল। চিবুতে চিবুতে বলল ফের, 'ওকে অনেক ভাগ্যে পেয়েছি—সে তো রুচি-ঋতু এখন টের পাচ্ছে না।'

দু'জনে কোরাসে বলল, 'খুব পাচ্ছি।'

বিবি রুটি গিলে বলল, 'আজ তোদের নিয়ে বসে কিঞ্চিৎ আনন্দ করব রে! মনে মনে প্ল্যান এঁটেছি।'

রুচি বলল, 'কী আনন্দ?'

'দেখবি' খন। আক্কেল গুড়ুম হয়ে যাবে। পরশু আমার নামে একটা অদ্ভুত খাম এসেছে। লেটার বক্সে কে দিয়ে গেছে। তোদের দেখাইনি—বলিনি কিছু।'

অশ্রু সপ্রশ্ন তাকাল। ঋতু বলল, 'ফের বেনামী চিঠি-ফিটি নাকি?'

'ওইরকমই।' ... বলে বিবি খেতে শুরু করল।

কিছুক্ষণ নীরবতা। সবাই ভাবছিল বেনামী চিঠির কথা। আগে প্রায়ই লেটার-বক্সে বেনামী অশ্লীল চিঠিপত্তর পাওয়া যেত। কিছুদিন পরে নিজের বুড়ো অ্যাংলো ভদ্রলোক মিঃ জেভিয়ার একটি ছেলেকে লেটার-বক্সে চিঠি ফেলতে হাতেনাতে ধরে। বিবি বলে রেখেছিল ওঁকে। পিয়ন নয়, এমন কেউ চিঠি ফেললেই যেন খোঁজখবর নেওয়া হয়। জেভিয়ার সাহেব আসলে বাড়িটার কেয়ারটেকার। মিলিটারির অবসরপ্রাপ্ত লোক। একটা ইজিচেয়ারে সিঁড়ির পাশে চুপচাপ বসে সারাদিন বইপত্তর পড়ে সময় কাটায়। বিবি ঠিকই করেছিল।

ছেলেটি বড় রাস্তার ওপারে থাকে। খুব হইচই করে তাকে শাসিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। সেই থেকে চিঠি বন্ধ হয়ে যায়। মেয়েরা মেস করে আছে—এটা যেন কেউ মেনে নিতে পারে না সহজে। কত সব স্ক্যান্ডাল প্রথম প্রথম রটানো হয়েছে—পাশের ফ্ল্যাট থেকেই, সংখ্যা নেই তার। হঠাৎ বিবি খিকখিক করে হেসে উঠল। ...'অশ্রু, তোমাদের মনে পড়ছে গত বছরকার সেই মজার কাণ্ড?'

অশ্রু আন্দাজে সায় দিল, 'হুঁ উ। মনে—সেই পুলিশ অফিসারদের হামলা!'

ঋতু হাসতে লাগল। 'তাই বলো, ওরে বাবা, আমার তো ভয়ে পিলে ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল। আর রুচিটা করেছে কী জান? বাথরুমে লুকিয়ে দরজা এঁটেছে।'

রুচি প্রতিবাদ করল শশব্যস্তে—'মোটেই না। ওটা কোইনসিডেন্স। ওই সময় আমার বাথরুম পেয়েছিল তো কী করব?'

বিবি বলল, 'সেটা যে পাশের ডাক্তার গিন্নীর কীর্তি—তা আমি হলফ করে বলতে পারি। পুলিশ অফিসারই আমাকে বলেছিলেন—এক ভদ্রমহিলা ফোন করেছিলেন, এই ফ্ল্যাটে নাকি সকাল থেকে মড়াপচা গন্ধ বেরুচ্ছে। দরজায় তালায়...'

ঋতু বলল, 'হ্যাঁ—আমরা সবাই তোমার রবীন্দ্রসদনে ফাংশানে গিয়েছিলুম।'

'ভাগ্যিস, সকাল সকাল ফিরেছিলুম রে। নইলে পুলিশ দরজা ভাঙত।' অশ্রু বলল, 'অবশ্য যে-ই ফোন করুক, কোন দোষ নেই। ব্যালকনিতে কাকে মাংস নাড়িভুড়ি ফেলেছিল যে, গন্ধ হবে না?'

রুচি উঠে গেল বেসিনের দিকে। তাই সবার চোখ পড়ল ওর থালায়। প্রথমে ঋতু বলল, 'এ কি রুচি! তুমি খেলে না?'

রুচি অস্পষ্টভাবে জবাব দিল বেসিন থেকে, 'খেলুম তো।'

তিনজনে মুখ-চাওয়াচাওয়ি করল পরস্পর। তারপর অশ্রু তেতো গলায় বলল, 'এ আদিখ্যেতার কী মানে হয়! এ যেন আমাদেরই শাস্তি দেওয়া।'

রুচি বেসিনের ওপরের ব্রাকেট থেকে ছোট্ট তোয়ালে নিয়ে মুখ মুছছিল। বলল, 'শাস্তি দেওয়া মানে? কী বলছ তার মাথা মুণ্ড নেই। কাল থেকে শরীর খারাপ বলছি না? সকালেও তো খেতে পারিনি দেখেছ!'

অশ্রু কানে নিল না। গজগজ করে বেসিনের দিকে এগোল। '... কেন খেলে না তা তো বুঝতেই পারছি। কিন্তু সে তোমার নিজের ধারণা! আমরা নিশ্চয় আপত্তি করতুম না...'

বিবি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, কী ব্যাপার?'

রুচি হুট করে নিজের ঘরে চলে গেল। অশ্রু চাপা গলায় বলল, 'বুঝতে পারছ না? ওর ভাইয়ের ব্যাপারে...'

বিবি বাধা দিয়ে বলল, 'অশ্রু, বড্ড বাড়াবাড়ি করে সব ভাবো।'

ঋতু ও অশ্রু চলে বিবির এল ঘরে। বিবির বিছানায় বসে হাসিমুখে বলল, কই, তোমার অ্যাননিমাস লেটারটা দেখি"

বিবি বলল, 'দেখাচ্ছি। রুচি—ও রুচি! কী করছিস? চলে আয়।'

রুচি এল না। বিবি আর একবার ডাকল। তারপর ঋতু উঠে গেল। সেই সময় বিবি বলল, 'অনেকদিন পরে আজ একবার সিগ্রেট টানব। ভীষণ ইচ্ছে করছে সকাল থেকে। তাই আসবার পথে সিগ্রেট কিনেছি। এই দ্যাখ!' বলে সে একটা ক্যাপস্টানের প্যাকেট ব্যাগ থেকে বের করে অশ্রুর হাতে দিল।

অশ্রু সেটা সযত্নে খুলে বিবিকে একটা সিগ্রেট বের করে দিল। প্যাকেটটা ওর বালিশের পাশে রাখল। তারপর বলল, 'দেশলাই লাগবে তো?'

'হ্যাঁ—নিয়ে আয় কিচেন থেকে। আছে তো?'

'আছে। বলে অশ্রু চলে গেল। অশ্রু দেশলাই এনে জ্বেলে দেবার ব্যর্থ চেষ্টা করছিল। সে অবশ্য আবহাওয়ার আর্দ্রতার দরুন। অশ্রু দেশলাই জ্বালতে অভ্যস্ত। তখন বিবি ওর হাত থেকে কেড়ে নিল দেশলাইটা। বলল, 'তুই একটা অকম্মা! দ্যাখ, আমার কী ম্যাজিক হাত!' তারপর অদ্ভুত চালিয়াতি ভঙ্গিতে সিগ্রেটের ডগায় দেশলাই রেখে ফস করে জ্বালল। টানতে থাকল।

ঋতু এসে দাঁড়াল। মুখটা গম্ভীর। ...'রুচি আসবে না। কাঁদছে।'

হুস হুস করে ধোঁয়া উগরে হাত দিয়ে সরিয়ে বিবি বলল, 'কাঁদছে—না কী বললি?'

ঋতু মাথা দোলাতে বিবি তেড়ে বলল, 'স্রেফ ঢঙ—না কী বলল? কাঁদুক। তোরা বস।' তার মুখে পরক্ষণে একটা চটুল হাসি ঝলমল করে উঠল। সে তোষকের তলায় হাত চালিয়ে দিল। ... 'বা রে! এখানেই তো রেখেছিলুম। উবে গেল নাকি?' তারপর তোষক তুলে কাগজপত্রের তলা থেকে একটা পুরু খাম বের করল। 'এই যে, রয়েছে। আয় ঋতু, তোদের তৃতীয় নয়ন খুলে দিই। যে পাঠিয়েছে,তার প্রতি আমার প্রেমচুম্বন।'

একটা ছবি বের করেছে বিবি। অশ্রু ও ঋতু দেখামাত্র একসঙ্গে অস্ফুট চীৎকার করে উঠল, 'এ মা? এ কী!' এবং বিবি খিলিখিল করে হাসতে লাগল। বৃষ্টিও এসে গেল সেই সময় আরও জোরে। একটা মালগাড়ি শিস দিতে দিতে এসে দীর্ঘ একঘেয়ে শব্দ ও কাঁপন ছড়িয়ে যেতে থাকল। কিছুক্ষণের জন্যে ওরা ভুলে রইল যে, পাশের ঘরে একজন অন্ধকারে শুয়ে নিঃশব্দে কেঁদে চলেছে। আর তারা দেখছে একের পর এক বিভিন্ন ভঙ্গিতে মিথুনলিপ্ত সায়েব-মেমের নগ্ন ছবি।...

পাঁচ

শ্যামবাজার এলাকায় একটা চারতলা বাড়ির ছাদে এই ছোট্ট ঘরে ঋতু বরাবর এসেছে। বাড়িটা বেশ বড়। তাই ছাদটাও চওড়া। কোণের এই ঘরটা শ্যামলের পক্ষে উপযুক্ত। ঋতুর তাই মনে হয়েছে। কারণ তার ধারণা—যারা আদর্শবাদী মানুষ, তারা অনেকটা ওপরে থাকবে। নিচের কিছুর ছোঁয়া লাগলে আদর্শবাদিতা কলঙ্কিত হবে হয়ত। অবশ্য শ্যামল জনসাধারণ নিয়েই কাজ করে। কলঙ্কিত নিশ্চয় তাকে হতে হয় পদে পদে। বেচারা! মনে মনে ঋতু এসব ভেবেছে।

শ্যামল অবাক হল ঋতুকে দেখে। ইলেকট্রিক হিটারে চায়ের কেটলি চাপিয়েছে সবে, ঋতু হাসিমুখে ঢুকল।

শ্যামল বলল, 'আরে! এস, এস।' পরক্ষণে মুচকি হাসল। —'তোমার বিবিদি সঙ্গে নেই তো?'

'না। বিবিদি ফাংশান নিয়ে ব্যস্ত।' ঋতু ব্যাগটা শ্যামলের বিছানায় ছুঁড়ে ফেলে বসল। জানলা দিয়ে ঝুঁকে সে নতুন করে কলকাতাকে দেখতে থাকল।

শ্যামল বলল, 'চা খেয়েই বেরোতুম। মাখনদা আর. জি. করে রয়েছেন। দেখে আসব ভাবছিলুম।'

'মাখনদা কে?'

'সে তুমি চিনবে না। যাকগে, তোমার খবর বলো। কী ঠিক করলে?'

ঋতু মুখ না ফিরিয়ে বলল, 'কিসের? কী?'

'যা বলেছি কাল।' .... শ্যামল বিছানায় তার কাছাকাছি বসল.... 'তোমার পক্ষে কাজটা মন্দ হবে না। আমাদের পারটির সমর্থকরা তো পত্রিকা নেবেনই—লিস্ট করা আছে। বাইরের গ্রাহক যোগাড় করা অসম্ভব হবে না তোমার কাছে। বছরে দশটা টাকা চাঁদা এমন কিছু নয়। তবে তোমার দিক থেকে আসল ব্যাপার হল...'

ঋতু কথা কাড়ল। ....'দেশসেবা!'

শ্যামল হাসল না। ....'তা যদি বলো, তো তাই। জীবনটা একবারই দেওয়া হয় মানুষকে।'

ঋতু ভুরু কুঁচকে বলল, 'তুমি জন্মান্তর মানো না?'

'কেন? জন্মান্তর আসছে কোত্থেকে?'

'ওই যে বললে—জীবন নাকি একবারই দেওয়া হয়!'

শ্যামল কী ভাবতে ভাবতে বলল, 'না—টেক ইট সিরিয়াসলি। একটা কিছু করো, ঋতু। বরাবর তোমাকে এ কথা বলে আসছি। তোমার স্পিরিট আছে—সেটা কাজে লাগাও। শুধু খেয়ে পরে বেঁচে থেকে এখন একটা তাজা জীবন নষ্ট করার কী মানে হয়, আমি বুঝিনে।'

ঋতু একটু হাসল। —'তোমার প্ররোচনায় উদ্দীপ্ত হবার জন্য রোববারের সকালটা খরচ করতে আসিনি!'

শ্যামলও এবার না হেসে পারল না। কেটলির দিকে এগিয়ে বলল, 'তুমি জ্ঞানপাপী। যাক গে। ফ্লাড কমলে সেই গাঁয়ের স্কুলে আবার ফিরতে চাও যদি—সে কথা আদালা। আর যদি থেকে যাও কলকাতায়, তাহলে একটা কিছু করা তো দরকার। তোমার বিবিদিকে অবশ্য জানি। ওর অনেক স্কোপ রয়েছে হাতে—আই মিন, জানাশোনা আছে অনেক কিছু ব্যবস্থা যদি করতে পারেন, আমি প্ররোচনা দিতে চাইনে তোমাকে।'

ঋতু অধৈর্য হয়ে বলল, 'ভ্যাট। ওসব রাখো তো! আমি এলুম কতদিন বাদে এই চিলেকোঠা থেকে কলকাতার সৌন্দর্য দেখতে, আর তুমি শুরু করলে কী সব! স্কুলের বইতে এক সুখী রাজপুত্রের কথা আছে, পড়োনি?'

'আমাকে তুমি সুখী রাজপুত্র ভাবো বুঝি?'

'নিশ্চয়।'

শ্যামল কেটলির ঢাকা তুলে চা দিল। তারপর সুইচ অফ করে বলল, 'ঋতু, পৃথিবীটা খুব রোমান্টিক নয়। এতদিনে যদি না শিখে থাকো, বলার কিছু নেই।'

'শ্যামলদা, বাড়িওলা তোমার ঘরের ভাড়া বাড়ায়নি?'

'না। কেন?'

'এমনি বলছি। ইস্, এমন ঘরটা যদি আমি পেতুম!'

'কী করতে?'

'শুয়ে শুয়ে কলকাতার সৌন্দর্য দেখে জীবন কাটিয়ে দিতুম।'

শ্যামল কাপে চিনি দিয়ে বলল, 'কলকাতার কোন সৌন্দর্য নেই। তাছাড়া কোন অবিবাহিতা স্ত্রীলোককে বাড়িওলা এ ঘরটা দেবেন বলে বিশ্বাস করিনে।'

ঋতু ব্যস্তভাবে নেমে এল বিছানা থেকে। —'আরে! করছ কী! আমাকে বলো। যাও, হটো—ভাগো! আমি চা করে দিই।'

ঋতু তার হাত থেকে চামচ কেড়ে দিল। শ্যামল সরে এসে বিছানায় বসল। খবরের কাগজটা টেনে নিল। বলল, 'তুমি এলে একটা হুলস্থূল পড়ে যায় যেন। দেখো, সাবধান।'

'আমি সব সময় সাবধান'—বলে ঠোঁটের কোণে হাসি রেখে ঋতু চা করতে ব্যস্ত হল।

শ্যামল খবরের কাগজে চোখ রেখে বলল, 'হ্যাঁ—কাল তোমাকে বলতে ভুলে গেছি। ক'দিন আগে তোমার বাবার সঙ্গে দেখা হয়েছিল ডালহৌসিতে। আমাকে ভদ্রলোক চিনতে পেরেও না চেনার ভান করে এড়িয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু দেশসেবার দৌলতে আর কিছু না হোক, একটা জিনিস তো পেয়েছি। সেটা কি, স্পষ্ট বোঝাতেও পারব না, তুমি একে বেহায়াপনা কিংবা নাছোড়বান্দা হওয়া বলতে পারো।

খানিকটা সাংবাদিকদের স্পিরিটও এর মধ্যে আছে।'

শ্যামল হাসতে লাগল।

ঋতু কোন কথা না বলে চায়ের কাপটা এগিয়ে দিল।

শ্যামল বলল, 'আমি সোজা গিয়ে বললুম—কেমন আছেন স্যার? উনি অগত্যা ধরা দিলেন। আজেবাজে কিছু কথা হল। তারপর সোজা তোমার কথা বললুম। শ্রীমতী ঋতুর খোঁজ-খবর রাখেন কিনা জানতে ইচ্ছে করছিল। অমনি ক্ষেপে গেলেন ভদ্রলোক। বললেন, সে খবর তো আপনাদের রাখবার কথা! ওর সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই! তারপর—'

'শ্যামলদা, মর্নিং শোয়ে সিনেমা যাবে?'

'মলো ছাই। যা বলছি, শোন! তারপর—'

'টিকিটের পয়সা আমি দেব। এখন জাস্ট সাড়ে ন'টা। চা খেয়ে চল হাঁটতে হাঁটতে সারকুলার রোড ধরে প্রাচীতে চলে যাই!'

'ঋতু আর কতদিন ছেলেমানুষী করবে?'

ঋতু অসমাপ্ত চায়ের কাপটা টেবিলে দ্রুত রাখল। ওর চোখ দুটো জ্বলজ্বল করতে থাকল কয়েক মুহূর্ত। তারপর হঠাৎ স্বাভাবিক হল। হঠকারী ক্ষিপ্ততাটুকু দমন করার পর সে বলল, 'আমার বরাত। যেখানে যাই—একজন করে গারজেন দিব্যি জুটে যায়। সবাই আমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, সবাই চায়, আমি ভাল হই। অথচ জানিই না যে, কোথায় আমি খারাপ হয়ে যাচ্ছি।'

শ্যামল কোন মন্তব্য না করে চা খেতে লাগল। কাপটা অন্যহাতে ধরে চোখ রাখল তাতে।

ঋতু বলল, 'আমার অস্বাস্থ্যটা কোথায় তা যদি জানতাম! আশ্চর্য! বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছি, এই তো? আমার যদি খাঁচা ভাল না লাগে! আমি যদি বাইরে গিয়ে হাঁফ ছাড়তে চাই!'

'তোমার দোষ ওখানে নয়।'

ঋতু তেড়ে গেল। 'তবে কোথায়, শুনি?'

শ্যামল একটু বিরক্ত হয়েই বলল, 'বাইরে হাঁফ ছাড়ার মানেটা কী? বলতে পারো, জীবনের একটা নিশ্চিন্ত উদ্দেশ্য ছিল—তা চরিতার্থ করতেই বেরিয়ে পড়েছ।'

'তোমার জীবনের উদ্দেশ্য কী? তুমিই বা কেন এভাবে বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করে এখানে একা পড়ে আছ?'

'খুব স্পষ্ট, ঋতু। সেটা কি এতদিনেও বুঝতে পারোনি?'

'দেশসেবা?'

'তোমার যা খুশি ভাবতে পারো, আপত্তি নেই।'

'হুঁ, মনে পড়েছে। প্রথম আলাপের সময় বলেছিলে বটে—আসুন, দুনিয়াটা বদলে মানুষের বাসযোগ্য করতে আমরা হাত লাগাই।' ...ঋতু হাসল—কিন্তু বাঁকা হাসি। .... 'আর আমি কী বলেছিলুম মনে আছে তো? বলেছিলুম— এসব মানুষটানুষের ব্যাপারে আমার বিশ্বাস নেই। তখন তুমি রবিঠাকুর আওড়ে মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, ইত্যাদি কী সব বলেছিলে।'

শ্যামল মৃদু হেসে বলল, 'অথচ মানুষকে বিশ্বাস না করেও তো উপায় নেই, ঋতু। প্রতি পদে মানুষকে বিশ্বাস করেই বেঁচে আছ। তাই নয় কি?

'ওটা বিশ্বাস নয়, চালাকি। ওটা আমাদের ভান। মনের তলায় অবিশ্বাস নিয়েই ওই বিশ্বাসের মুখোশ পরে থাকা।'

'ঋতু, যে রাতে তুমি জানালা ভেঙে বাড়ি থেকে পালিয়ে আমার এই ঘরে উঠেছিল, তোমার মনে আছে কী বলেছিলে?'

'হুঁ-উ'। কিন্তু আমি সারারাত ঘুমোইনি। তুমিও ঘুমোতে পারোনি। আমার ভয় করছিল—যেন তক্ষুণি কী একটা ঘটে যাবে।'

'অর্থাৎ আমাকে বিশ্বাস করতে পারছিলে না?'

'তাই-ই তো।'

'কিন্তু ঠকেছিলে কি?'

ঋতু সকৌতুকে বলল, 'ঠকিনি। কিন্তু ঠকলেও আঘাত পেতুম না। এখনও সেই অদ্ভুত রাতটা ফিরে পেতে ইচ্ছে করে। যা ঘটবার আশঙ্কায় ঘুমোতে পারিনি সে-রাতে, তা সত্যি সত্যি ঘটলে হয়তো জীবনটা বদলে যেত।'

শ্যামল জানালার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, 'তোমাকে আমি সত্যি বুঝতে পারিনে।'

'আচ্ছা শ্যামলদা, ঘরে স্ত্রীলোক নিয়ে রাত কাটিয়েছ জানলে তোমার পার্টি তোমাকে শাস্তি দিত না?'

'কে জানে! হয়তো দিত শাস্তি। টের পায়নি। অবশ্য তুমিও সে-রাতে বড্ড বেঁচে গিয়েছিলে। রক থেকে পাঁচিলে উঠে নিচের প্যাসেজে ঝাঁপ দেবার সময় রাস্তায় কিংবা এই বাড়ির ভেতর কেউ টের পেলে কী ঘটে যেত, ভাবতে ভয় করে। তোমার সাহসের তুলনা নেই। তবে কি জানো? ওই সাহস বড্ড বাজে ব্যাপারে তুমি খরচ কর। এটাই আমার অনুযোগ।'

'স্মৃতিচারণা না করে এখন বেরিয়ে পড়লে ভাল হয় না?'

'হ্যাঁ—বেরোব।'

শ্যামল উঠল। পাজামাটা ছেড়ে আলনা থেকে একটা খয়েরি প্যান্ট নিয়ে পরল—ঋতুর সামনেই। পাঞ্জাবীটা গায়ে থেকে গেল। কাঁধে একটা ব্যাগ ঝুলিয়ে নিল।

একটু পরেই দু'জনে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামল। রাস্তায় বেরিয়ে ঋতু বলল, 'সময় আছে। হাঁটতে হাঁটতে যাবো কিন্তু।'

শ্যামল ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কোথায়?'

'কোথায় মানে? প্রাচীতে!'

'ঋতু, প্লিজ! এখন মাখনদাকে অ্যাটেন্ড না করলেই নয়। আর. জি. করে আমাকে যেতেই হবে। সোমবার ওঁকে বেলেঘাটার ওখানে কারা গুলি করেছিল—খুব বরাত জোরে বেঁচে গেছেন। গুলিটা হাঁটুর নিচে লাগে। তুমি তো জানো না, কী চলছে দেশে এখন!'

ঋতুর মুখটা মুহূর্তে সাদা হয়ে গেল। সে শূন্যদৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে শুধু বলল, 'আচ্ছা! ঠিক আছে। চলি।' তারপর হন্‌হন্ করে হাঁটতে শুরু করল।

শ্যামল তাকে অনুসরণ করার চেষ্টা করে ডাকছিল—'ঋতু, এই ঋতু! শোন—শোন!'

ঋতু ঘুরেও তাকাল না। রাস্তার অনেকে চকিতে চোখ ফিরিয়েছে ওদের দিকে — সেটা টের পেয়ে শ্যামল ঘুরল। তারপর হাসপাতালের দিকে পা বাড়াল।

ঋতু অনেকটা দূর সমান বেগে হেঁটে আসার পর গতি কমাল। তার পেছনে তাকাতে তীব্র ইচ্ছে—শ্যামল কি অনুসরণ করছে? কিন্তু তাকাতে কষ্ট হচ্ছিল। আর —কী ক্লান্তি না লাগছে এখন! গত রাতে বেশ শীত শীত লাগছিল, হয়ত জ্বর এসেছিল। এখন মনে হচ্ছিল, সে চাপা জ্বরটা এইমাত্র সরে গিয়ে প্রচুর ঘাম আর দুর্বলতা দিয়ে গেল। এতক্ষণে সেই কাশিটাও পেয়ে বসল তাকে। বারকতক চাপা কেশে টের পেল আজ গলার ব্যথাটা যেন বেড়েছে। ব্যাগ থেকে একটা ট্যাবলেট বের করে মুখে দিল সে। চুষতে থাকল।

ছুটির সকালে চমৎকার রোদ উঠেছে আজ। ফুটপাতে স্টপগুলোয় লোকেরা কোথাও যাবে বলে দাঁড়িয়ে আছে। প্রত্যেকটা মুখ খুঁটিয়ে দেখে নিয়ে আস্তে আস্তে হাঁটছিল সে। সব মুখেই একটা নিশ্চিন্ত নির্লিপ্ত আর দ্বিধাহীন ভাব জ্বল জ্বল করছে। এই বিশাল শহরে কতজন কতজনের অপেক্ষা করছে বলে ওরা সব বেরিয়ে পড়ছে। কত আত্মীয়তা চারদিকে—কত সম্পর্ক। অথচ তার কিছু নেই—কেউ তার অপেক্ষা করছে না। অপেক্ষা করার মত আত্মজ যারা, তারা জানে সে ফিরবে না—আশা ছেড়ে দিয়েছে ওরা। আর কে আছে ঋতুর? কোন পুরনো বা নতুন বন্ধু? ঋতু তাদের কাছে গেলে বা না গেলে কি কারও আসে যায়? ওদিকে তাদের মেসের বিবিদির আজ রবীন্দ্রসদনে অনুষ্ঠান। বিবিদি সকালেই তার ক্লাবে বেরিয়ে গেছে। অশ্রুও কোথাও বেরিয়েছে। রুচির রাত থেকে ভায়ের জন্য মন খারাপ—চুপচাপ শুয়ে কাটাচ্ছে। ঋতু সিনেমায় যাবার প্রসঙ্গটা রাতের কথামত তুলেছিল। সে বলেছে, শরীর ভাল না। অতএব ঋতু এখন ভীষণ—ভীষণভাবে একা। না—সিনেমায় যাওয়াটা কোন মূল

ব্যাপার নয়। কিছু এনটারটেনমেন্ট চেয়েছিল—এও সত্য নয়। ঋতু আজ একটা কিছু চেয়েছিল—যার নাম সঙ্গ। একটা কমপ্যানিয়নশিপ। কলকাতায় আসার পর সারাক্ষণ বিবিদির সাহচর্য সে বরদাস্ত করতে পারছিল না। শুধু অসুখ অসুখ অসুখ —আর এ ডাক্তার। বিবিদি তাকে অস্থির করে মারছিল।

লেডিজ পার্কের কাছে এসে একটা ট্রাম-স্টপের সামনে সে দাঁড়িয়ে গেল। সেই সময় তার মনে একটা পুরনো সংস্কার ছুরি তুলল আচমকা। তাহলে কি তার এই অসহায় নিঃসঙ্গতার পেছনে রয়ে গেছে তার মুসলমানত্ব? সে যদি হিন্দু মেয়ে হত, তাহলে কি প্রচুর গভীরতার সঙ্গ পেত তাকে ভালবাসবার মত? খুব কম মুসলিম ছেলের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ তার হয়েছে... তারা ঋতুর বিদ্রোহী ভাবটা বরদাস্ত করতে পারেনি কেউ; এমন কি অনেক হিন্দু ছেলের কাছেও তার আচরণ বাড়াবাড়ি মনে হয়েছে, সে জানে। তারাও যেন বলতে চেয়েছে, ঋতু, তুমি নিজে মুসলমান মেয়ে। এতখানি তোমার সাজে না! কিছুকাল রথীন নামে একজনের খুব অনুরাগিনী হয়ে পড়েছিল ঋতু। একদিন কথায় কথায় সে বলে বসেছিল, 'আমাদের সমাজের মুশকিল কি জানো? অন্য ধর্মের মেয়েকে বউ করে ঘরে তুলতে চায় না। পরিবারও চায় না। ডক্টর বিমল আচার্যকে তো তুমি জানো। উনি সাকিনা নামে এক মুসলিম অধ্যাপিকাকে বিয়ে করেছেন। কিন্তু পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করতে হয়েছে ভদ্রলোককে।'

ঋতু পাল্টা বলেছিল, 'কিন্তু মেমসায়েবের বেলা নিশ্চয়ই আপত্তি নেই?'

রথীন বলেছিল, 'তা নেই। সেটার কারণ পৃথিবীব্যাপী এখন সাদা চামড়ার আধিপত্য। সাদা চামড়ার প্রতি মোহ দুশো বছরে ব্রিটিশ আমাদের পেরেক পুঁতে বসিয়ে দিয়েছে। তবে আসল কথা হচ্ছে—সমাজ এখনও নেই নেই করেও আছে। সেটা সমাজ ঠিক নয়—একটা সিসটেম বলতে পার। ওটা টিকে থাকবে এখনও। এই যে কত সব মড ছেলে ঘুরছে, লম্বা চুল, জুলপি—হাড়ে হাড়ে সব এদেশী বনেদী মাল। বিয়ের সময় দিব্যি সুপুত্তুর। পণ নিয়ে বিয়ে করতে পিছু-পা নয়। দারুণ পিতৃ-মাতৃভক্ত কাজের বেলা। সাহসী আভাগার্দের পোশাক পরিলে কী হবে? ভেতরে সব একেবারে প্রিমিটিভ আর পিতৃতান্ত্রিক সমাজের খাঁটি উত্তরাধিকারী। সত্যিকার আভাগার্দে বা বিদ্রোহী সব কালেই মুষ্টিমেয়।'

ঋতু একটু চুপ করে থাকার পর বলেছিল, 'মানুষ এটা কেন বোঝে না যে, আগে পৃথিবীতে মানুষ এসেছিল, তারপর ধর্ম বা সম্প্রদায়?'

রথীন বলেছিল, 'ওসব কাকে বোঝাবে? বাবার ধর্ম ছেলের ওপর জবরদস্তি চাপানোই নিয়ম। বাবা ডাক্তার হলে ছেলে ডাক্তার না হতেও পারে। কিন্তু হিন্দু বা মুসলমানের ছেলে হিন্দু বা মুসলমানই হবে। আশ্চর্য, বড় আশ্চর্য লাগে আমার!'

এই রথীন অতসব ভাল ভাল কথাবার্তা বলত। অথচ হঠাৎ একদা ঋতু আবিষ্কার করল পরস্পর একটা অতল খাদের দু'পারে দাঁড়িয়েছিল। রথীন চুঁচুড়ায় অধ্যাপক হয়ে যাবার একমাস পরেই ঋতু জানল, সে তার এক গাব্দাগোব্দা ছাত্রী সুচরিতাকে বিয়ে করেছে। তাই স্বাভাবিক ছিল। ঋতু এমনি করেই হেরে আসছে বারবার। অথচ অনেকে এখনও প্রেমপত্র গোছের চিঠি লেখে। মাঝে মাঝে চুপিচুপি ঋতু সেগুলো বের করে পড়ে। বিছানার তলায় রেখে ঘুমোয়। আর—রথীন, রথীনও লেখে। প্রেমপত্র বলা ঠিক হবে না—স্মৃতিচারণার উপলক্ষে নিজেকে নিন্দা করেই লেখে। সে লেখে—'আমিও একজন চিরকালের হেরে যাওয়া মানুষ। আমাকে ক্ষমা করো। আমি এত তুচ্ছ, এত ছোট্ট — আর এই দেশটা এত বড়। এত বেশি মানুষ আমার বিরুদ্ধে যে নিজের মড়া বয়ে চলা ছাড়া কিছু করার নেই।' ঋতু একটারও জবাব দেয়নি। কলেজের ঠিকানায় কোন অধ্যাপককে ওই সব চিঠি লেখার প্রবৃত্তি হয় না তার।...

একটা ট্রাম এসে পড়ল। ঋতু চাপল। কিন্তু ভাবনাটা তার মাথায় রয়েই গেল। সে শিক্ষিতা মুসলমান মেয়ে। তার একটা বক্তব্য ছিল। কিন্তু কেউ শোনবার নেই। সমর্থন করার নেই। শুধু বি ব্যানার্জি—হ্যাঁ, বিবিদি আছে। কিন্তু সে তো একটা রোবোটের মত যেন। সে ঋতুর গলায় প্রতিভা খুঁজে পেয়েছিল। তা না হলে তো পরিচয়ও হত না। তার সঙ্গে এভাবে ডেকে ঘরেও নিশ্চয় তুলত না।....

প্রাচীর সামনে এসে সে নামবে ভাবল। কিন্তু নামল না। মৌলালিতে নামল। তারপর কিছু না

ভেবেই পিছনে পার্ক্রসার্কেলের ট্রামে গিয়ে উঠল।

পনের মিনিট পরে ঋতু দেখল, সে হন্ হন্ করে সার্কাস এভেনিউ ধরে চলেছে। এক মুহূর্ত ইতস্তত করল। উজ্জ্বল রোদের সকাল। দু'ধারে বিশাল গাছে বর্ষার রস পেয়ে তীব্র উজ্জীবন ঝকঝক করছিল। সতেজ পাতার সঞ্জীবনের খর আবেগ মৃদু বাতাসে চঞ্চল হয়ে উঠছিল। রাস্তাটাকে তার এত ভাল লেগে গেল। মাঝে মাঝে দু'একটা গাড়ি স্যাঁৎ করে চলে যাচ্ছে। প্রায় নির্জন পরিবেশ। ঋতু বাঁদিকে ঘুরে একটা ছোট রাস্তায় ঢুকল। তারপর আরও কিছু না ভেবেই একটা বাড়ির তিন তলায় উঠতে শুরু করল।

ফুসফুসের জোর কমে গেছে হয়ত। অনেকটা সময় লাগল সিঁড়ি ভাঙতে। তারপর পরিচিত ফ্ল্যাটের দরজায় বোতাম টিপল সে।

কামালের বোন জ্যোৎস্না দরজা খুলে বলল, 'আরে আপনি! কোথায় ছিলেন অ্যাদ্দিন? আসুন, আসুন!'

ঋতুর মনটা ভরে গেল বলা যায়। জ্যোৎস্না মেয়েটি খুব মনখোলা টাইপ। কামালের কোন সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। হয়তো বেরিয়েছে। রোববার কেউ চুপচাপ বাড়ি বসে থাকে না। জ্যোৎস্নাকে পেয়ে বরং ভালই হল। গল্পসল্প করা যাবে। ঋতু কামালের কথা সরাসরি জিজ্ঞেস করতে বরাবর একটু দ্বিধায় পড়ে যায়।

কামালের বাবা বড় সরকারি অফিসার ছিলেন। রিটায়ার করার পর গত বছর মারা যান। এই বাড়িটা তিনি কিনেছিলেন। বর্ধমানের গ্রামে কিছু পৈতৃক জমিজমা ছিল। তা বেচে দিয়ে কলকাতার স্থায়ী বাসিন্দা হয়েছিলেন। কামালের বড় ভাই মনসুর সেন্ট্রাল এক্সাইজের বড় চাকুরে। মনসুরের বিয়ে হয়েছে ঋতুদের পাড়ায়—ঋতুর চেনা মেয়ের সঙ্গে। সেই সূত্রেই কামালের সঙ্গে ঋতুর আলাপ। অবশ্য ঋতু এ বাড়িতে বরাবর এসেছে মনসুরের স্ত্রী হেনার অজুহাতে।

এই পরিবারের মুসলমানী ধাঁচটা বড্ড কম। কামালের বাবার তথাকথিত 'হিন্দুয়ানির' জন্য নাকি এপাড়ার মুসলিম সমাজে বেশ বদনাম ছিল। ভদ্রলোক ছেলেমেয়েদের ডাক নামটা অন্তত বাংলা রেখেছিলেন। 'আপা' ও 'ভাইজানে'র বদলে তাদের দিদি ও দাদা বলতে শিখিয়েছিলেন। মনসুরের ডাকনাম প্রভাত, কামালের হল বাদল। একমাত্র মেয়ে জ্যোৎস্নার মুসলমানী নাম শামসুন্নাহার বেগম। কামাল কী জানি কেন শত চেষ্টাতেও বাদল হয়ে উঠতে পারেনি—কিন্তু শানসুন্নাহার জ্যোৎস্না হয়ে রয়েছে।

হেনা বউদি আর প্রভাত বেরিয়েছে কোথায়। জ্যোৎস্না সটান নিজের ঘরে নিয়ে গেল ঋতুকে। তারপর জানাল, কামাল মাকে নিয়ে তালতলায় তার অসুস্থ 'ফুফু' অর্থাৎ পিসিকে দেখতে গেছে। শিগগীর ফিরবে। কারণ তার আজ কোথায় কী সব প্রোগ্রাম রয়েছে—জ্যোৎস্না স্পষ্ট জানে না।

জ্যোৎস্না বলল, 'মাঝে মাঝে আপনার কথা জিজ্ঞেস করতুম বাদলদাকে। ও বলত জানি না। তবে হেনা বউদি....' বলেই সে চেপে গেল। —'বসুন, আসছি।'

ঋতু ব্যস্ত হয়ে বলল, 'না—আমার তাড়া আছে ভাই। বসো তুমি। হেনা বউদি বলে কী বলছিলে যেন?'

জ্যোৎস্না চাপা হাসল। —'সে একটা আজেবাজে কথা। আমরা কেউ বিশ্বাসই করিনি!'

ঋতু টের পেয়ে আগ্রহ দেখাল। ...'শুনিই না! তুমি তো আমাকে ভালো জানো, জ্যোৎস্না।'

'হ্যাঁ, —জানি।' বলে জ্যোৎস্না ওর দিকে হাসিমুখে তাকাল। 'সত্যি নাকি, আপনি বাড়ি থেকে চলে গিয়ে বিয়ে করেছেন?'

'কী সর্বনাশ! তাই রটেছিল বুঝি?'

'হেনা বউদি বলছিল। তবে আমরা কেউ বিশ্বাস করিনি। বাদলদা বলেছিল, আপনি কোথায় চাকরি পেয়ে চলে গেছেন।'

'তোমরা ঠিক শুনেছিলে খবরটা। তবে সেটা আমার ব্যাপার নয়।' ঋতুর মুখটা হঠাৎ কঠিন আর লাল হয়ে উঠল। —'ইতু বাড়ি থেকে চলে গিয়েছিল—শওকত নামে একটি ছেলের সঙ্গে। শওকত

এখন বহরমপুর কলেজের লেকচারার। ইতু সেখানেই আছে।'

জ্যোৎস্না হেসে গড়িয়ে পড়ল। —'এ মা! ইতুদি তো গোবেচারা টাইপ মেয়ে।'

ঋতু হাসল না। কোন মন্তব্যও করল না।

জ্যোৎস্না বলল, 'ইতুদির সঙ্গে একবার না দু'বার আলাপ হয়েছিল। বউদিদের বাড়িতে। তবে যাই বলুন, ওর তাহলে আপনার চেয়েও সাহস আছে। এই ঋতুদি, আসুন না খানিকক্ষণ লুডো খেলি! ইস, কতদিন যে আপনার সঙ্গে খেলিনি!'

ঋতু ঘড়ি দেখে বলল, 'না ভাই। আজ আমার তাড়া আছে।'

জ্যোৎস্না বলল, 'বসুন না বাবা!' তারপর কিচেনের দিকে চেঁচিয়ে বলল, 'মুন্নীর মা, শুনে যাও।'

ঋতু বলল, 'না—না। খাবো না কিছু। আমি উঠি।'

'পাগল! আমি সেকেন্ড ডিভিশনে পাস করেছি জানেন? তার খাওয়া আপনার পাওনা আছে।'

'তাই বুঝি? হায়ার সেকেন্ডারির রেজাল্ট বেরিয়েছে বটে—তোমার কথা মনে ছিল না!'

'আপনার কার কথাই বা মনে থাকে!'

'তোমার তো সায়েন্স ছিল?

'হ্যাঁ। একমাস আমাকে পড়িয়েছিলেন—তাও বুঝি ভুলে গেছেন?'

মুন্নীর মা পর্দার ফাঁকে মুখ বাড়াচ্ছিল। ঋতুকে যেন চেনার চেষ্টা করছিল সে। জ্যোৎস্না বলল, 'কী সব খাবার-টাবার আছে, নিয়ে এসো ঋতুদির জন্য। আর কেটলিতে জল চাপাও।'

ঋতু অগত্যা উঠে গিয়ে ওর বিছানায় হেলান দিল। জানালার বাইরে একটা বিশাল শিরীষ গাছ। সে কিছুক্ষণ গাছটার দিকে তাকিয়ে থাকার পর বলল, 'হেনাদির বাচ্চাকাচ্চা এখনও হয়নি বুঝি?'

জ্যোৎস্না চুপচাপ ওকে দেখছিল। জবাব দিল, 'নাঃ। খুব ডাক্তার-টাক্তার দেখাচ্ছে প্রভাতদা। তাছাড়া টালিগঞ্জ পীর সায়েবের মাজারেও মা কতবার নিয়ে গেলেন। তা নিয়ে বাদলদার সে কী ঠাট্টা! ও আবার নাস্তিক কি না! কিচ্ছু মানে না—তা জানেন তো?'

ঋতু ঠোঁটের কোণে হাসল।

'আচ্ছা ঋতুদি, আপনি ওসব বিশ্বাস করেন?'

'কী সব?'

'আল্লা, পীর, ভগবান এইসব?'

'তুমি বিশ্বাস করো?'

জ্যোৎস্না মুখ টিপে হেসে বলল, 'একটু-একটু। জানেন, পরীক্ষার আগে মা আমাকে নমাজ পড়তে জেদ করতেন।'

'পড়েছিলে নিশ্চয়?'

'না পড়ে পার আছে! তবে ঋতুদি, নমাজে বসলে কিন্তু সত্যি মনটা হাল্কা হয়ে যায়—এত ভাল লাগে, কী বলব! ঋতুদি, আপনি কখনও নমাজ পড়েছেন?'

'হুঁ-উ।'

'ওই রকম লাগে না?'

'মনে নেই।' বলে ঋতু ফের জানালার বাইরের বয়স্ক রহস্যময় গাছটাকে দেখতে থাকল।

জ্যোৎস্না লাফিয়ে উঠল। —'এই রে! আপনিও বাদলদার দলে!'

ঋতু কোন মন্তব্য করল না। সে ব্যাপারটা ভাবছিল। মানুষের ওইরকম একটা গভীর বিশ্বাস থাকা জীবনে দরকার কি? অলৌকিকের অস্তিত্ব সত্যি কি অনেক স্বস্তি নিয়ে আসে? তার ধর্মপরায়ণা মায়ের কথা মনে পড়ল। নমাজে মৌন প্রার্থনারত সেই মূর্তিটি স্মৃতিতে ভেসে উঠল। পরক্ষণেই মনের মধ্যে একটা জ্বালা টের পেল সে।

ছটফট করে উঠল সে। —'জ্যোৎস্না, আমি যাই!'

জ্যোৎস্না তার কাছ ঘেঁষে এল—'কী শুধু যাই যাই করেছেন তখন থেকে? তাহলে আসা কেন বাবা? বুঝেছি—বাদলদা নেই, হেনাবউদি নেই, আমার সঙ্গে জমবে কেন?'

কিন্তু জ্যোৎস্নাকে অবাক করে সে হন্তদন্ত হয়ে উঠল। চকিতে দরজা খুলে সিঁড়ি ভাঙতে থাকল

দ্রুত।

দরজা খুলে রুচি কাঠ। সে কী করবে বুঝতে পারছিল না। কয়েক মুহূর্তে সে ফ্যালফ্যাল করে লোকটাকে দেখল। আইহোলে চোখ রেখে তারপর দরজা-খোলার নিয়ম। অথচ ঝোঁকে বা আনমনে যেভাবেই হোক হুট্ করে দরজা খুলে বসাটা ভুল হয়েছে।

তাপস চ্যাটার্জি! ধবধবে সাদা প্যান্ট পরা দালালটা সামনে দাঁড়িয়ে মৃদু মৃদু হাসছে। যেন রুচির সামনে একটা বিস্ফোরণ ঘটছে।

রুচি অস্ফুটস্বরে শুধু বলতে পারল, 'কী? কাকে চান?'

সে একটু ঝুঁকে বাও করল। —'কোন চাওয়া-টাওয়ার ব্যাপার নয়। স্রেফ এসে গেলুম। আপনি নাকি আমার বেয়াদপির জন্যে চাকরি ছাড়তে ডিসাইড করেছেন, ইজ ইট ট্রু?'

এই কথাগুলো এবং বলার ভঙ্গিতে কিছু ছিল। রুচি ভাবল—ভীষণ হেসে তারপর দরজা বন্ধ করে দেবে মুখের উপর। কিন্তু লোকটা এমনভাবে দাঁড়িয়েছে যে, তার গায়ে কপাটের ধাক্কা লেগে যাওয়ার সম্ভাবনা।

তাপস চ্যাটার্জি বেহায়া লোক, তাতে কোন ভুল নেই। সে সবিনয়ে ফের বলে উঠল, 'ড্রিঙ্ক না করেও পার নেই। অথচ ড্রিঙ্ক করার পর আমি নিজের অজানতে বদলে যাই। রিয়েলি মিস রায়, এই ব্যাপারে মানুষের অসহায়তা আপনি ভাবতেও পারবেন না, সেদিন আপনাকে আমি নিশ্চয় খুব অপমান করেছিলুম—পরে তরুণ আমাকে সেটা বলেছে। কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমি আপনাকেই মিন করে কিছু বলিনি।'

সেদিন রুচি ভদ্রতার চাপে মুখ বুজে ওর ইতরামি বরদাস্ত করতে বাধ্য হয়েছিল। এখন নিজের ঘরের দরজায় পেয়ে প্রতিশোধ নিতে পারত। কিন্তু কার্যত দেখা যাচ্ছে, তা অনেক সময় সম্ভব হয় না। এইভাবে সৌম্যমূর্তিতে ও এসেছে, আর কী বলা যাবে ওকে বুঝতে পারল না। সুতরাং সে হাসল একটু। —'ঠিক আছে। আমি কিছু মনে করিনি। আপনি আসুন।'

তাপস জেদের সঙ্গে বলল, 'উঁহু হু। নিশ্চয় মনে করেছেন। তরুণ আমাকে বলেছে আপনি নাকি চাকরি ছেড়ে দেবেন। ... দেখুন মিস রায়, আফটার অল আমি বয়সে আপনার চেয়ে অনেক বড়। জীবনে অনেক পোড় খেয়েছি। এখনও খাচ্ছি। মানুষ সম্পর্কে আমার ধারণাটা ভীষণ তেতো হয়ে গেছে। কিন্তু রিয়েলি বিশ্বাস করুন, কেউ আমার জন্য এ বাজারে চাকরি ছেড়ে দেবে, এটা আমার পক্ষে হরিবল! আমি ভাবতেই পারিনি! কথাটা শোনার পর থেকে আমি ঘুমোতে পারিনি।'

দরজার বাইরে এভাবে কথা বলা—কখন পাশের ফ্ল্যাটের কেউ বেরিয়ে পড়বে, রুচি অস্বস্তিতে পড়ে গেল। লোকটা চলে যাবার মুডে নেই, তা বুঝতে পারছিল রুচি।

'...আমার কিছু বক্তব্য আছে। সেটা বলতেই ঠাণ্ডা মাথায় চলে এসেছি। প্লিজ, প্লিজ মিস রায়—একটু সময় দিন আমাকে। কেউ মিছিমিছি আমাকে ভুল বুঝবে, এ আমি কিছুতেই সইতে পারিনে। হ্যাঁ—এটাই আমার স্বভাব। আপনাকে আমার একটা সিক্রেট বলে দিই, শুনুন। যখন কাকেও তেতো কথা শোনাবার দরকার হয়, আমি ড্রিঙ্ক করে তারপর তার কাছে যাই এবং শুনিয়ে আসি। সুস্থ মস্তিষ্কে তো সবসময় সবকথা বলা যায় না। বলুন, যায় নাকি?'

রিটায়ার্ড ডাক্তারবাবুর ফ্ল্যাটের দরজায় শব্দ হল। কপাট ফাঁক হচ্ছিল। অমনি রুচি বলে উঠল—'ভেতরে আসুন।'

তারপর সাঁৎ করে সরে এল।

তাপস ভেতরে ঢুকল। রুচি দরজাটা বন্ধ করে দিল। তারপর কোণের দিকে আলমারিটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

তাপস ঘরের ভেতরটা দেখে নিয়ে বলল, 'আপনি এখানে থাকেন?'

রুচি বলল, 'বসুন।'

একটা চেয়ার ছিল ডাইনিং-এর দরজার পাশে। সেটা টেনে নিয়ে তাপস বসল। সিগ্রেট ধরাল।...

'আর কাকেও দেখছিনে যে? আপনি একা আছেন বুঝি?'

রুচি মাথা দোলাল।

'আগে বলুন, আপনারা কে কে সব থাকেন এখানে। মা-বাবা নিশ্চয় আছেন?'

রুচি শুধু বলল, 'কেন?'

'আপনার রাগ পড়েনি দেখছি।' তাপস খিকখিক করে হেসে উঠল? 'রিয়েলি? মাঝে মাঝে যা সব ঘটে, ভাবা যায় না। আমার বয়স কত বলুন তো? আহা, বলুন না!'

রুচি একমুহূর্ত দেখে নিয়ে বলল, 'জানি না।'

'জাস্ট বিয়াল্লিশ পেরিয়েছি। আপনার বস তরুণ সিনহা আমার চেয়ে দশ-বারো বছরের ছোট। ওকে হাফ প্যান্ট পরতে দেখেছি। ভাবতে পারেন! ওর বাবা নরেন্দ্র সিনহা ছিলেন আমার বাবার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। যাকগে, যা বলছিলুম। বিয়াল্লিশ বছর বয়সে তাপস চ্যাটার্জি একটা বাচ্চা মেয়েকে কদর্য কথা বলে গালমন্দ করে বসল, তারপর এল তার কাছে সুস্থ মস্তিষ্কে ক্ষমা চাইত!'.... সে ফের হেসে উঠল সকৌতুকে।

রুচি আস্তে বলল, 'ক্ষমা চাওয়ার কী আছে? মাতালদের আমি জানি।'

তাপস যেন আহত হল। 'হ্যাঁ, মাতাল নিশ্চয় বলতে পারেন। তবে কি জানেন? এখন আমি পরিপূর্ণভাবে সুস্থ। তাই কষ্ট হচ্ছে শুনতে। আমি সেদিন আপনাকে শুধু বলেছিলুম, আপনি বোস অ্যান্ড সিনহার মারাত্মক গ্ল্যামার—জ্যাস্ট দিস ওয়াজ দা সেন্টেন্স। এই তো? আমি উইথড্র করছি। ব্যস, চুকে গেল।'

রুচি বলল, 'ঠিক আছে। এবার তাহলে আসুন।'

'অবশ্যই। আমি থাকতে আসিনি। কিন্তু আপনি প্রতিশ্রুতি দিন যে, চাকরি ছাড়বেন না!'

রুচি বাঁকা ঠোঁটে বলল, 'আমার চাকরির ব্যাপারে আপনার এত মাথাব্যথা কেন, বলুন তো?'

তাপস নিষ্পলক তাকাল কয়েক মুহূর্ত। তারপর উঠে দাঁড়াল।...আপনার বয়স কম। মানুষের অনেক ব্যাপার বুঝতে দেরি আছে। আচ্ছা, চলি। উইশ ইউ গুড লাক।'

সে বেরিয়ে গেল। দরজাটা বন্ধ করল রুচি। তারপর একটু ইতস্তত করে বিবির ঘরে গেল। জানলার পর্দাটা একটু ফাঁক করল। ওখান থেকে নিচের রাস্তা দেখা যায়। গেটটাও খানিক নজরে পড়ে। সে দেখল, ক্রিমরঙা একটা গাড়ি গেটের বাইরে দাঁড় করানো রয়েছে। তাপস চ্যাটার্জির গাড়ি আছে, জানত না সে। অবাক লাগল। ওকে আজেবাজে নিছক গরিব দালাল ভেবেছিল, তা নয় দেখা যাচ্ছে না—গাড়ি থাকলেই মানুষের দাম বেড়ে যায় না। রুচি ভাবল এ কথা। কিন্তু গাড়ি থাকায় তাপস চ্যাটার্জির একটা দিক স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। সে হল তার বৈষয়িক ব্যাপারে গভীর নিষ্ঠা। এই ধরনের নিষ্ঠা না থাকলে বৈষয়িক প্রতিষ্ঠা আসে না এ সমাজে। অথচ লোকটাকে সে উড়নচণ্ডী ছন্নছাড়া ভেবেছিল। শুধু অবাক লাগল যে, সচরাচর এইসব লোকেদের আত্মসম্মানের যতখানি থাকার কথা, তাপসবাবুর তা যেন নেই। লোকটার সম্পর্কে একটু কৌতূহল অুভব করল রুচি। হুঁ—জীবনে কোথাও লোকটার একটা শক্ত জায়গা আছে।

গাড়ির কাছে এসে তাপস একটা সিগারেট ধারাল। কালো কুচকুচে একরাশ চুলে একবার হাত বোলাল। এই বাড়িটার দিকে তাকিয়ে রইল মুহূর্ত। তারপর ঘুরে দরজা খুলে গাড়িতে ঢুকল। এবং স্টার্ট দিয়ে জোরে বেরিয়ে গেল। ব্যাকফায়ারের পোড়া তেলের গন্ধ যেন রুচির নাকে এসে ঢুকল।

রাস্তাটা যখন শূন্য, তখনও রুচি তাকিয়ে আছে। একটা খালি ট্রাক নড়বড় করে চলে গেলে রুচি সরে এল।

ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়াল সে। রেলব্রিজের ধারের ভৈরবী ক্ষেপে গিয়ে কাকে গালমন্দ করছে। কতকগুলো বস্তির ছেলেমেয়ে ভিড় করে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। রেললাইনের ওপারে খালের ধারে শুওর চরাচ্ছে একটি যুবতী। আকাশ প্রচণ্ড নীল।

ঘণ্টা বাজল দরজায়। আবার কে এল? রুচি দরজার আইহোলে চোখ রেখে দেখল, পাশের ফ্ল্যাটের বউদি বিজয়া। বিজয়া এ ফ্ল্যাটে দু'একবার মাত্র এসেছে। রুচির এখন ভালই লাগল। দরজা

খুলল হাসিমুখে।

বিজয়ার খোকাটা রুচির পায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তেই রুচি তাকে তুলে নিল। বিজয়া বলল, 'আপনি কি এখন বেরোবেন?'

'না। কেন?'

'ঘণ্টা দুই মিতুলকে একবার দেখবেন? আমার ননদ এসেছে—আমাকে নিয়ে এক জায়গায় যাবে। বারোটার মধ্যেই ফিরব। ও কাঁদবে না। কাঁদলে এই দুধটা খাওয়াবেন।'

রুচি ব্যস্তভাবে বলল, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে। অত বলতে হবে না।'

মিতুল সবে হাঁটবার চেষ্টা করছে। রুচি মেতে উঠল ওকে নিয়ে। সোজা ব্যালকনিতে চলে গেল ফের। মিতুল কোলে থাকবার পাত্র নয়। অগত্যা ওকে নামিয়ে দিল। খেলতে থাকল দু'জনে। কথা বলতে থাকল পরস্পর। রুচি দেখল, একটা কিছু পাওয়া গেছে।

কিন্তু বিবিদি জানলে রাগ করবে। পাশের ফ্ল্যাটের লোকেদের সাথে বেশি মেলামেশা কঠোরভাবে নিষেধ করেছে সে। ওতে নাকি অহেতুক সমস্যা এসে জট বাঁধায়। আবার দরজায় বেল বাজল।

বিরক্ত হয়ে রুচি এগিয়ে গেল। আইহোলে চোখ রেখে দেখল বিজয়া বউদির স্বামী হিরণবাবু—সেই মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ ভদ্রলোক। মুচকি হেসে রুচি দরজা খুলল। হিরণ বলল, 'ইয়ে—মিতুলকে বরং নিয়ে যাই। আমি তো কোথাও বেরোচ্ছি না খামোকা আপনাকে ঝামেলায় ফেলা কেন?'

রুচি বলল, 'মোটেও ঝামেলা না। আসুন, দেখে যান—আমরা কি করছি। আহা, আসুন না মশাই! প্রতিবেশীদের এত তুচ্ছতাচ্ছিল্য করতে নেই। পায়ের ধুলো দিন।'

রুচি বুঝল, সুখে থাকার জন্য মানুষকে কিছু না কিছু নিয়ে পড়ে থাকতেই হয়—নৈলে সব শূন্য লাগে।

ছয়

তরুণ সিংহের হাবভাবে রুচি টের পায়নি যে, কোথাও একটা তাল কেটে ছিল। মিস অ্যারাথুন বারবার তার দিকে আড়চোখে তাকাচ্ছিল অবশ্য। সেইসঙ্গে আরও অনেকেই। কিন্তু রুচি কখনও কাকেও পরোয়া করে চলে না। রিসেপশন কাউন্টারে বসে রাজ্যের যত দালাল আর সাপ্লায়ারদের সঙ্গে তরুণবাবুর দেখা করিয়ে দেওয়া রুচির মুখ্য কাজ। এই লোকগুলোকেই তার অসহ্য লাগে। চটের কুঞ্চিত থলেতে নাটবল্টুর নমুনা, নয়ত আস্ত লোহার একটা ফ্রেম হাতে নিয়ে অনেকে বসে থাকে। কাঠের ব্যবসায়ীরাও আসে। লেবার সাব-কন্ট্রাক্টাররা আসে। এরা সবাই কেউ হোমরাচোমরা নয়। কিন্তু একটা জায়গায় মিল সবার—চোখের লোভে। দু'চোখে জ্বলজ্বল করে সব ধূর্ত জন্তুর শিকার খোঁজার ব্যস্ততা। রুচি খালি ভাবে—কেন এরা অত টাকা চায়? শুধু বেঁচে থাকবার জন্য নিশ্চয়ই নয়। এরা কি ভালবাসতে জানে? এরা কি জানে ভালবাসা সৌন্দর্য এসব কী জিনিস? এরা স্ত্রীসম্ভোগ করে এবং আরও কিছু ধূর্ত জন্তুর জন্ম দেয়—যারা আমৃত্যু শুধু টাকা রোজগার করে যায়। সিনহা অ্যান্ড বোস বড় কনট্রাক্টার কোম্পানি। দেশের নানান জায়গায় তাদের কাজ হয়। ব্রীজ, ব্যারেজ, কারখানার স্ট্রাকচার থেকে শুরু করে বাড়ি অব্দি বানাতে তারা ওস্তাদ। ডজন ডজন ইঞ্জিনিয়ার, স্থপতি, টেকনিকাল স্টাফ তাদের অধীনে রয়েছে। রুচির মত একটা মেয়ের তোয়াক্কা তারা থোড়াই করে। তরুণ সিংহ হয়ত নেহাৎই বিবি ব্যানার্জির খাতির তার চাকরি ছাড়া নিয়ে একটু অনুযোগ করেছিলে। রুচি তাই ভেবেছে অবশেষে।

সত্যি তো! রিসেপশনে মিস অ্যারাথুনের মত ঘড়েল বয়স্কা মহিলা থাকতে তার কতখানি গুরুত্ব? অবশ্য, রুচির চেহারা! হুঁ, সেও একটা কথা। প্রথমদিন যেমন বিবি ওকে এখানে দেখতে এসে বলেছিল, 'গ্রান্ড মানিয়েছে। তরুণকে বলে যাই কথাটা। তার রিসেপশনে ফ্লাশলাইট জ্বলছে।'

কিন্তু ভাত ছড়ালে তো কাকের অভাব নেই। এ শহরে শয়ে শয়ে সুন্দরী স্ত্রীলোক ঘুরে বেড়াচ্ছে—তারা যে-কেউ এমন আলো জ্বালতে পারে সিনহা অ্যান্ড বোসে। অনেকে হয়ত বেশি পারে। চটুল হাসি, মিঠে প্রেম-প্রেম ফ্লার্টিং আর সিডিউল করার মত। চপল কণ্ঠস্বর দিয়ে কোম্পানিকে

ফুলে-ফলে ভরিয়ে দিতে পারে। হোটেলের পার্টিতে সরকার আমলারা তাদের একটি বিলোল কটাক্ষে অবশ হয়ে কোটি কোটি টাকার টেন্ডার পাস করে দিতে পারে। রুচি কি সবটা পারে এখনও? রুচি জানে, সে পারে না। অন্তত তার আসার পর খুব বড় আর নতুন কোন সরকারি বা বেসরকারি কনট্রাক্ট পায়নি কোম্পানি।

তবে হ্যাঁ, বুড়ো বোস সাবের ভাষায়—ফিউচার প্রসপেক্ট আছে রুচি, একদা সে হয়ে উঠতে পারে কোম্পানির একটা মারাত্মক অ্যাসেট। বোস সাহেব পার্টিতে মাতাল হয়ে পড়লে ওই সব খোলাখুলি রুচিকে বলে—অবশ্য সবার কান বাঁচিয়ে।

ক'দিন পরেই হোটেল হিন্দুস্থানে কোম্পানি বড় একটা পার্টি দিল। বিদেশি মূলধন নিয়ে সুকৌশলে এক দেশি কোম্পানি যন্ত্রাংশ তৈরির কারখানা বসাচ্ছে। তাতে বিদেশি প্রতিনিধি, কনসাল অফিসের কর্তা থেকে শুরু করে দেশি সরকারি বেসরকারি আধা সরকারি অনেক মাতব্বর ব্যক্তির সমাগম হল। ককটেল, অর্কেস্ট্রা, ড্যান্স। রাত নটার পর ইচ্ছে করলে মাননীয় অতিথিরা ক্যাবারে ড্যান্স আর পনের মিনিট স্ট্রিপটিজও উপভোগ করতে পারেন।

এসব ক্ষেত্রে অনেকে খুব শিগগির মাতাল হয়ে পড়েন। অনেকে অবশ্য নাচেও নামলেন। মৃদু নীলচে আলোয় কার্পেটের ওপর ছায়াগুলো জোড়ায় জোড়ায় চঞ্চল হল। আফ্রিকান লোকগীতির সঙ্গে ওয়েস্টার্ন মেলডি মিশে কী একটা উদ্দাম আবেগ এনে দিচ্ছিল অর্কেস্ট্রা—যত প্রিমিটিভ, তত মর্ডান। এ সময় রুচি লাউঞ্জের দিকে কেটে পড়ল। তার দিকে এক ভদ্রলোক আড়চোখে তাকিয়ে উসখুস করছিলেন। রুচি টের পাচ্ছিল, এক্ষুণি এসে নাচতে আমন্ত্রণ জানাবেন।

লাউঞ্জের এক কোণে তরুণ সিংহ একজনের সঙ্গে চাপা গলায় কথা বলছে। বোস সাহেব যথারীতি পার্টি সামলাচ্ছেন ভেতরে—হোস্টদের একজন না থাকলে চলে না। রুচি একটু ইতস্তত করছিল। এ সময় তার একটা বিশেষ ভূমিকা থাকা উচিত পার্টিতে। কিন্তু এখনও যেন অভ্যাস হয়ে ওঠেনি এই পরিবেশ। সে পালাতে পারলে বেঁচে যায় যেন।

তরুণ মুখ ঘুরিয়ে তাকে দেখতে পেল। হাসল একটু।.... 'আসুন। আলাপ করিয়ে দিই।' অগত্যা রুচিকে যেতে হল। তারপরই সে চমকে উঠল। কয়েক মুহূর্তের জন্যে তার মাথার মধ্যে একটা তীব্র আগুন ঝিলিক দিয়ে নিভে গেল। তারপর অবশ লাগল শরীরটা।

'মিঃ চন্দ্রভানু আয়ার। ফ্রম বোম্বে। এ বিগ মার্চেন্ট। মিঃ আয়ার, শি ইজ মিস রুচি রায়—আওয়ার মোস্ট...'

কথা কেড়ে আয়ার সাহেব বলে উঠলেন, 'এ লাভলি লেডী! হাউ ডু ইউ ডু মিস রায়? সো গ্ল্যাড টু মিট ইউ।' .... বলার পরই ওঁর চোখদুটো একটু সঙ্কুচিত হ'ল। '...আই থিঙ্ক, আই মেট ইউ সামহোয়ার!'

রুচি দাঁতের ফাঁকে আস্তে বলল, 'ইয়েস।'

'কোথায় বলুন তো? ঠিক মনে করতে পারছিনে। কলকাতায় আমি সত্যি বলতে কী একেবারে নতুন। কিন্তু....'

আয়ার সাহেব খানিকটা মাতাল, তা চেহারায় আর হাবভাবে বোঝা যাচ্ছিল। রুচি এক মুহূর্ত দ্বিধা না করে বলল, 'কদিন আগে বেলা দশটায় চৌরঙ্গী ক্রস করার সময় আপনার সঙ্গে আলাপ হ'ল মিঃ আয়ার!'

ভুরু কুঁচকে বুকে আঙুলের টোকা দিচ্ছিলেন আয়ার সাহেব। এবার ঘোলাটে চোখ দুটো তুলে রুচির দিকে তাকাতে চেষ্টা করলেন।... 'তাই নাকি? কিন্তু আমার তো মনে পড়ছে না কীভাবে আলাপ হ'ল বলুন তো?'

রুচি ঠোঁটে হাসি রেখে গড় গড় করে বলে গেল, 'ক্রসিং-এ আপনার আর আমার মধ্যে একটা গরু ছিল। আপনি ওপাশ থেকে গরুর পিঠে হাত রেখে বললেন, কলকাতায় গরু নাকি ভীষণ সস্তা।'

'ইজ ইট? বলে খাবি খাওয়ার ভঙ্গিতে হাসতে লাগলেন আয়ার সাহেব। তরুণও হেসে উঠল।

আয়ার বললেন, 'বাট ইউ আর রং মিস রয়। আমি মাত্র গতকাল এসেছি।'

ঝানু লোক নিঃসন্দেহে। রুচি টের পেল, এখন তার রাগটা কেমন মিইয়ে পড়ছে। কী হাস্যকর আর তুচ্ছ দেখাচ্ছে বিশাল লাউঞ্জে রাতের আলোয় একটা মোটামোটা গুবরে পোকার মত কামার্ত লোকটাকে! রুচি তবু বলল, 'সমুদ্রের ধারে আপনার বাড়ি নেই একটা?'

আয়ারের চোখদুটো এক মুহূর্তের জন্যে জ্বলে উঠল যেন। —'দ্যাটস রাইট। বাই দা বাই মিঃ সিনহা, নাও লেটাস হ্যাভ অ্যানাদার ড্রিঙ্ক। মিস রয়, উইল ইউ জয়েন আস?'

'থ্যাঙ্কস।' বসে হাত তুলল রুচি।

তরুণ বলল, 'চলুন, টেবিলে যাই। আসুন মিস রায়!'

তরুণের ডাকটা অবশ্য রুচি এড়াতে পারল না। সঙ্গে গেল। ভিতরে নাচ বাজনা জমে উঠেছে। এখানে ওখানে টেবিলে কিছু অতিথি পুরুষ ও স্ত্রীলোক গ্লাসে ড্রিঙ্ক নিয়ে বসে আছে। চাপা কথাবার্তা বলছে। কোণের টেবিলে বসল তিনজন। রুচিকে বসতেই হ'ল। ড্রিঙ্ক আসার পর তরুণ বাংলায় বলল, 'আপনি এখনও মনে হচ্ছে শুকনো যাচ্ছেন। ব্যাপার কী? রাগ পড়েনি?'

রুচি অবাক হয়ে বলল, 'কিসের রাগ?'

'তাপস ঘটিত।' বলে হাসল তরুণ।

রুচি মাথা দোলাল। তারপর বলল, 'এই ভদ্রলোককে কোথা—'

সঙ্গে সঙ্গে তরুণ জিভ কেটে চোখ নামাল। আয়ার সাহেব গ্লাসটা হাত নিয়ে নাচ দেখছেন উজ্জ্বল চোখে।

ড্রিঙ্কটা নিয়ে রুচি একটু হাসল। '... তাপসবাবুকে দেখছিনে যে?'

'সেই তো ভাবছি।' বলে ঘড়ি দেখল তরুণ। 'ওকে ভীষণ দরকার ছিল। বিকেলে ফোনও করেছিল, আসবে। অথচ সাড়ে আটটা বেজে গেল! দেখি, আরেকবার রিঙ করে।' গ্লাসটায় চোঁ-চোঁ করে চুমুক দিয়ে সে উঠে গেল তক্ষুণি।

রুচি অস্বস্তিতে পড়ে গেল। তার সামনাসামনি আয়ার বসে আছে। দুলছে। আশ্চর্য, এই নবাগত ব্যবসায়ীটি কলকাতায় এসে স্ত্রীলোকের জন্যে খুব ঘোরাঘুরি করেছে। পেয়েছে নিশ্চয়। তাই যেন এখন গভীর তৃপ্তিতে বুঁদ হয়েছে। কিন্তু এখানে জুটল কীভাবে? রুচির মাথায় কৌতুক ঝিলিক দিল—'মিঃ আয়ার! কেমন লাগছে?'

আয়ারের চমক ভাঙল। —'ইয়েস মিস রয়?'

'কলকাতায় কেমন কাটাচ্ছেন? এই হোটেলেই তো উঠেছেন—স্যুট নাম্বার সি, থার্ড ফ্লোর!'

আয়ার এবার টেবিলের ওপর ঝুঁকে এল। ... 'আপনি ভুল করছেন।'

'তাহলে আপনার ঠিকানা জানলুম কীভাবে?'

'সেটা যোগাড় করা কঠিন নয়। আমি আপনাদের কোম্পানিকে মহারাষ্ট্রে বড় কাজ পাইয়ে দিচ্ছি।'

রুচি এক চুমুক খেয়ে হাসতে লাগল। '...আপনার স্যুটে আমি গেলে আপত্তি করবেন নাকি?'

আয়ার জ্বলে উঠল। 'দ্যাটস ইনসাল্টিং।'

'মিঃ আয়ার, প্লিজ! সেদিন কিন্তু আমার সঙ্গে অনেক কথা বলেছিলেন। আপনার প্রচুর টাকা, খরচ করার লোক নেই। তাই না?'

আয়ার দ্রুত গ্লাসে চুমুক দিয়ে খালি গ্লাসটা সশব্দে টেবিলে রাখল। তারপর অন্যদিকে মুখ ফেরাল।

'নিশ্চয় কালো টাকা, মিঃ আয়ার?'

আয়ার খাপ্পা হয়ে বলল, 'ইউ লুক নাইস, বাট ইউ টক ননসেন্স।'

'আমি আপনার টাকা খরচ করতে চাই, মিঃ আয়ার। আপনি রাজী?'

আয়ার ইশারায় বয়কে ডেকে ড্রিঙ্ক আনতে বলল। তারপর সিগ্রেট ধরাল। রুচি মিটিমিটি হাসছিল। কাজটা নিশ্চয় ঠিক হচ্ছে না। নির্ঘাৎ সিনহা-বোসের এক দুঁদে পার্টি। তরুণ ভীষণ রেগে যাবে। অথচ এই এক অর্ধশিক্ষিত নির্বোধ মানিমেকারটিকে নিয়ে তার খেলার ছলে পীড়ন করতে তীব্র ইচ্ছে হচ্ছে। এক পেগেই রুচি মনোবল পেয়ে গেছে ইতিমধ্যে। আরেক পেগ নিয়ে নিল সে। ফের ডাকল—'মিঃ

আয়ার কি আমার ওপর রাগ করলেন?'

'লিভ ইট। আই ডোণ্ট লাইক দ্যাট।' বলে আয়ার চোঁ চোঁ করে গ্লাসের অনেকটা খালি করে ফেললেন।

রুচি বলল, 'সত্যি বলছি মিঃ আয়ার, বোম্বে কখনও যাইনি আমি। আমাকে নিয়ে যাবেন? বান্দ্রায় সী বীচে তো আপনার চমৎকার কটেজ আছে!'

এ সময় ব্যান্ডে খুব জোরালো একটা বাজনা বেজে উঠল। প্রিমিটিভ আবেগে থরথর করে কাঁপতে থাকল বাড়িটা ভিতসুদ্ধ। আরও কিছু পুরুষ ও স্ত্রীলোক উঠে গিয়ে নাচে যোগ দিলেন। আয়ার পা ঠুকছিল। ওঁর প্রৌঢ় গ্রাম্য ধাঁচের তেলতেলে মুখটা ভারবাহী ঘোড়ার মত ক্লান্ত দেখাচ্ছে। বোঝা যায়, মাতাল অবস্থায় না থাকলে এতক্ষণে উঠে পালিয়ে যেতেন।

রুচি ফের বলল, 'আপনার নাচতে ইচ্ছে করছে না? আসুন, নাচবেন আমার সঙ্গে। আমার ভীষণ নাচতে ইচ্ছে করছে।'

আয়ার মুখ ফেরালেন তার দিকে। রুচি টের পেল, লোকটা যে খুবই সাধারণ আর নির্বোধ (তবু এদের এত টাকা আসে কীভাবে?) তা ঠিকই। ওর চোখে লোভ আর দ্বিধার লড়াই চলেছে।'

দ্বিতীয়বার রুচি তার দিকে চটুল দৃষ্টিতে চাওয়ামাত্র আয়ার সাহেব কেমন হাসলেন। '...আমি নাচতে পারিনে, দুঃখিত মিস রয়। আমার হার্ট ঠিক নেই!'

'খুব চমৎকার আছে। আসুন না, শিখিয়ে নেব এক সেকেন্ডে!' বলে নেশার ঝোঁকে রুচি উঠে দাঁড়াল। তখন আয়ার সাহেবও উঠলেন।

তারপর নাচের মত একটা কিছু ঘটতে থাকল। রুচি চাপা হাসছিল। এতক্ষণে তরুণ ফিরে এসে নিশ্চয় অবাক হল। কিন্তু রুচির চোখে চোখ পড়ামাত্র সে সোৎসাহে সমর্থন জানাল। রুচি দেখল, তাপস চ্যাটার্জি এসেছে। তরুণ আবার সে টেবিলে বসল। তাপস রুচির দিকে একবার তাকিয়ে মুখটা ঘুরিয়ে নিল।

আয়ার সাহেব ক্রমশ ভালুক হয়ে পড়েছেন ততক্ষণে। থপথপ করে বেতালে পা ফেলে নাচবার চেষ্টা করছেন, আর রুচিকে খুব কাছে টানবার তালে আছেন। রুচির কোমরের মাংসে ওঁর থ্যাবড়া হাতটা চেপে বসছে ক্রমশ। অন্য হাত রুচির হাতটা পিষে ফেলছে।

হঠাৎ রুচি কী করল, আয়ার সাহেব পড়ে গেলেন কার্পেটের ওপর। হলসুদ্ধ লোক চকিতে একবার দেখে নিল। সামান্য হাসি শোনা গেল। কিন্তু জোরালো অর্কেস্ট্রার শব্দেও আবেগের জোয়ারে ব্যাপারটা গুরুত্ব পেল না। আয়ার সাহেব টলতে টলতে এসে টেবিলে বসলেন। তরুণ তার হাতটা নাড়া দিয়ে বলল, 'গ্রান্ড! কনগ্রাচুলেশন!'

রুচি একটু একটু হাঁপাচ্ছিল। ঠোঁটে স্মিত হাসি। তাপসের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এই ভদ্রলোকের জন্যে আমরা কতক্ষণ অপেক্ষা করছিলুম না?'

তরুণ বলল, 'তাপস আমাদের চেয়েও বড় পার্টিতে ঘোরে আজ-কাল। ও শাহানশায় ছিল এতক্ষণ। সেন্ট্রাল মিনিস্টারের সঙ্গে আঁতাত। আমাদের পাত্তা দেবে কেন?'

তাপস গ্লাস তুলে বলল, 'চিয়ার্স!' তারপর চুমুক দিয়ে গ্লাসটা কোলে রেখে রুচির দিকে ঘুরল। —'বাই দা বাই রুচিরা, আপনার কোন ভাই আছে?'

রুচি টের পাচ্ছিল, আজ তার খাওয়াটা বেশি হয়ে গেছে—বেশ টালমাটাল লাগছে, কিন্তু চমকে ওঠার মত এখবর। সে ভুরু কুঁচকে বলল, 'ভাই! আমার?'

'হ্যাঁ। আপনার।'

'কেন?'

'এখানেই বলব?' বলে তাপস তাকাল তরুণের দিকে।

তরুণ বলল, 'তোমার সব ব্যাপারই অদ্ভুত।'

তাপস একটু হাসল। 'সরি, পরে বলব 'খন। হ্যাল্লো মিঃ আয়ার, কেমন চলছে?'

আয়ার সাহেব হাত বাড়িয়ে বললেন, 'হ্যালো হ্যালো হ্যালো হ্যালো!'

'কলকাতার প্রসপেক্ট কি রকম মনে হচ্ছে?'

'চমৎকার! আপনি তো আর এলেন না?'

'আসব। আপনি তো এখনও আছেন?'

'থাকব। পনের দিন তো বটেই!'

তরুণ বলল, 'মিস রয়, খুব ক্লান্ত মনে হচ্ছে আপনাকে!'

রুচি সামলে নিল—'মোটেও না! বিশেষ করে তাপসবাবুকে দেখে এনার্জি ফিরে পেয়েছি। কই তাপসবাবু, আজ জমিয়ে তুলছেন না? বুঝেছি, আপনি ঘরে যতটা নির্জীব, বাইরে—'

'সজীব?' বলে তরুণ হেসে উঠল। —'কেন? বাইরে সজীব অবস্থায় কি ওকে দেখা গেছে কোথাও?'

'হ্যাঁ। সিনহা-বোসের রিসেপশন কাউন্টারে!' রুচি বলে দিল সোজা।

তাপস কিছু বলল না। তরুণ বলল, 'মিস রয়, বেচারাকে আর উত্ত্যক্ত না-ই বা করলেন! ওর কিছুদিন থেকে ভীষণ ধরনের ট্রানজিসন পর্ব চলেছে। কী? লুকিয়ে বিয়ে করলে নাকি চ্যাটার্জি।'

তাপস একটু হেসে গ্লাসটা শেষ করল।

তরুণ বলল, 'মিস রয়, আপত্তি আছে? নাকি—থাক, সামলাতে পারবেন না!'

রুচি জবাব দিল, 'থ্যাঙ্কস।'

আয়ার সাহেব গ্লাস শেষ করার পর চেয়ারে হেলান দিলেন। দুটো হাত দুদিকে ঝুলে পড়ল। লোকটাকে এখন ভাসমান মড়ান মত দেখাচ্ছে। তরুণ তাপস আর রুচির দিকে চোখ নাচাল। অর্থাৎ ঘায়েল হয়ে গেছে মাল। তারপর তরুণ বলল, 'মিঃ আয়ার কি অসুস্থ বোধ করছেন?'

আয়ার হেঁচকি তুলে হাসবার চেষ্টা করল।

তরুণ দূরের দিকে কাকে ইশারা করল। কোম্পানির দু'জন লোক এসে আয়ার সাহেবকে প্রায় ধরাধরি করে নিয়ে গেল। তরুণ বলে দিল, 'লিফটে নিয়ে যাও। থার্ড ফ্লোর, স্যুট সি।'

আরও একটু পরে তরুণ অন্য টেবিলে উঠে গেল।

এবার তাপস আর রুচি সামনাসামনি। রুচি বলল, 'আমার ভায়ের কথা কী বলছিলেন মিঃ চ্যাটার্জি?'

তাপস একটু চুপ করে থেকে বলল, 'দৈবাৎ আমি আজ বিকেলে লালবাজারে একটা কাজে গিয়েছিলুম। এক পুলিশ অফিসারের ঘরে বসে কথা বলছি। সেইসময় একটি ছেলেকে নিয়ে আসা হল। আমি চমকে উঠলুম, কারণ অবিকল আপনার মতো চেহারা। ওর নাম বলল গৌতম—ডাক নাম নরু। পুলিশ এক জায়গায় হানা দিয়ে একদল সমাজবিরোধীর সঙ্গে ওকে আড্ডা দিতে দেখে ধরে এনেছে। ছেলেটি বোঝা গেল, এ লাইনে সবে ঢুকেছে বা ঢুকতে যাচ্ছে। সব বলে দিয়েছে পুলিশকে। অ্যাদ্দিন বাইরে মহারাষ্ট্র না গুজরাট কোথায় কোথায় ঘুরেছে শুনলুম। তারপর আমার সামনেই আপনার রেফারেন্স দিল। কোম্পানির নাম, আপনার মহিলা মেসের ঠিকানা—হুবহু সব জানাল। অফিসার জানেন আপনার কোম্পানির সঙ্গে আমার যোগাযোগ আছে। জিজ্ঞেস করলেন, আমি ওর দিদির নামে কাকেও চিনি নাকি।'... একটু থেমে তাপস হাসল। ... 'যাক গে। ওকে আমি নিজের রিস্কে ছাড়িয়ে আনলুম। আপাতত আমার বাসায় আছে। ভাবছিলুম পরে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করব।'

রুচি স্তব্ধ হয়ে শুনছিল। কিছু বলল না।

'বলুন তাহলে?' তাপস তাকাল তার দিকে।

'কী বলব?'

'আপনার নরু বা গৌতম নামে ভাই আছে একজন?'

'হুঁ।'

'বাঃ! তাই মনে হচ্ছিল। ছেলেটি বেশ বুদ্ধিমান আর ভদ্র। আমার গোড়াতেই সন্দেহ হয়েছিল—যাক গে। ভালই হল। তা রুচিরা, আপনি এক কাজ করলেই পারেন। ওকে নিয়ে আলাদা ফ্ল্যাট নিয়ে থাকাই তো ভাল হত। ওকে স্কুলে ভর্তি করে দিন না ফের। নয়ত কোন টেকনিক্যাল

কনসার্নে অ্যাপ্রেন্টিস করে দিন। ও তো দারুণ ছেলে! পুলিশ অফিসারের সামনে সোজা বলে দিল দিদি ওকে জায়গা দেয়নি। বৃষ্টির রাতে পথে তাড়িয়ে দিয়েছে। তখন সে কী করে? একটা থাকা-খাওয়ার জায়গা তো ওর চাই!' তাপস হাসতে লাগল।

রুচি আস্তে বলল, 'আপনি পরোপকারী মানুষ, মিঃ চ্যাটার্জি!'

'ঠাট্টা করছেন! কোন অন্যায় নিশ্চয় করিনি? আপনার সঙ্গে আমার চেনাজানা না থাকলে কি আমি মাথা ঘামাতুম ভাবছেন? হাজার হাজার সুন্দর ছেলে আজকাল জাহান্নামে যাচ্ছে। আমি তো ত্রাণকর্তা প্রফেট নই!'

ব্যান্ডে এখন অন্য সুর। বোধহয় ক্যাবারে নাচ শুরু হবে—মঞ্চে প্রস্তুতি চলেছে। নাচিয়েরা সবাই নিজের নিজের টেবিলে চলে আসছে। রুচি সেদিকে তাকিয়ে রইল। কোন কথা বলল না।

'রুচিরা!'

'বলুন'

'আপনার বয়স কম—হয় তো আমার বয়সের অর্ধেক। কিন্তু এই পৃথিবীটা খুব সহজ জায়গা নয়।'

'হঠাৎ একথা কেন?'

'আপনার সম্পর্কে এতদিন কিছুই জানতুম না। একটা আবছা অনুমান করতুম। গৌতম আমাকে সব বলেছে। শুনে—সত্যি বিশ্বাস করুন, আমার কষ্ট হয়েছে। আপনি ভাববেন, এই একটা আজেবাজে ওল্ড মাস্তান, একটা জঘন্য মাতাল, একজন মানিমেকার দালাল এই শুওরের বাচ্চা তাপস চ্যাটার্জি—এরও কষ্ট হয়? হয়, শুনে রাখুন। কারণ, আমি এই শালা পৃথিবীটা, সমাজটাকে, মানুষকে ঘেন্না করি। বলবেন, এ আমার ভাঁড়ামি। তা না হলে কেন আমিও বাস্টার্ড হয়ে এই চাকায় নিজেকে বেঁধে রেখেছি? পারি না রুচিরা—সে জোর হারিয়ে ফেলেছি। আমি এখন অভ্যাসের দাস। আর কী জানেন? আই হ্যাভ গট টু একজিস্ট! যে কোন মূল্যে আমাকে এখনও বহুকাল বাঁচতে হবে। কেন? ঘেন্না করার জন্যে।'

রুচি টের পেল, এতক্ষণে তাপস চ্যাটার্জি মাতাল হয়ে পড়ছে।

*　　　*　　　*

সে রাতে অশ্রু চুপচাপ শুয়ে সৌমেন ও তার ছাত্রী মধুছন্দার কথা ভাবছিল। আজ বিকেলে একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটেছে। তাই নিয়ে ভেবে ভেবে সে উত্যক্ত হচ্ছিল। এমন সুন্দর টিউশনিটা নির্ঘাৎ চলে গেল তাতে কোন ভুল নেই। এ হয় না, হতে পারে না। সৌমেন অশ্রুকে চিনতে ভুল করেছে।

ক'দিন থেকে মধুছন্দার মধ্যে একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করেছিল সে। মুখটা গম্ভীর, পড়াশোনায় মন নেই, অন্যমনস্কতা এবং দীর্ঘশ্বাস। সৌমেন এসে বাইরের ঘরে কোথাও থাকে, তাদের কাছে আসে না। অশ্রু টের পাচ্ছিল, কিছু দাম্পত্য অশান্তি ঘটেছে। কিন্তু তা নিয়ে যত কৌতূহলই থাক, প্রশ্ন করা অশোভন।

মধুছন্দা কিন্তু আর চেপে রাখতে পারেনি। খুলে সব বলেছিল তাকে। সৌমেন নাকি আজকাল কথায় কথায় তাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে ঝি-চাকরের সামনেই। বলে, তার কিছু হবে না। সে আসলে একটা গেঁয়ো ভূত থেকে যাবে। কারণ মধুছন্দার নাকি কোন কালচারাল ব্যাকগ্রাউন্ডই নেই। আগে জানলে সৌমেন একটু ভাবত। এদিকে তার বিপদ হয়েছে, এই বউ নিয়ে সোসাইটিতে গিয়ে অস্বস্তিতে পড়ে। পার্টিতে গিয়ে মেলামেশা করতে দিতে ভয় পায়। কখনও মধুছন্দা বোকার মত কী বলে বসবে আর তাই নিয়ে হাসাহাসি হবে। তাছাড়া নাকি মধুছন্দার মাথায় গোবর পোরা!

বলতে বলতে সরলমনা বউটি কেঁদে ফেলেছিল। 'আবার বলে কি জানেন? বলে—আমার চৌদ্দপুরুষ শুধু বেনেগিরি করেছে, কালচারের কী বুঝব আমরা? আমাকে দিয়ে ওর চলবে না। আমাকে মাকাল ফল বলেও। বেশ তো আমি তাই হয়েই থাকব। এটিকেট আর কালচারে আমার দরকার নেই।'

অশ্রু মনে মনে অবশ্য একটু কৌতুকও অনুভব করেছিল। কিন্তু এদিকে তার টিউশনির ভবিষ্যৎ তাহলে খতম হচ্ছে, সেই সংশয়ে আড়ষ্ট হয়েছিল। তাই বলেছিল—'তাহলে আমি বরং কাল থেকে...'

মধুছন্দা বাধা দিয়ে বলেছিল, 'না না। আপনি না এলে আমি সত্যি বড় একা হয়ে যাব অশ্রুদি। আপনাকে আসতেই হবে। পড়াশোনা হোক আর না হোক, আপনি এসে বসে থাকলেই আমার ভাল লাগবে। মনে জোর পাব।'

মনে জোর দেবার জন্য রোজ বিকেলে যাওয়া এবং মাসের শেষে টাকা নেওয়া নিশ্চয় সঙ্গত ব্যাপার নয়! অশ্রু সেদিন ভেবেছিল, থাক, এখানেই শেষ হোক। আর আসবে না সে।

মধুছন্দা বলেছিল, 'এসব কিছু না। আমি বেশ বুঝতে পেরেছি, ও কোথাও আটকে গেছে। আমি সত্যি সত্যি তো বোকা নই—সব বুঝি। খুব মডার্ন আর টপলেসে ওর তো যত রুচি। তারা কারা আমার বেশ জানা গেছে। বেশ—আছে তো আছে। আমার কিছু নেই, কেউ নেই ভেবেছে নাকি? আমি চলে যাব, দেখবেন!'

তাতে অশ্রু আরও উদ্বিগ্ন হয়েছিল। পরে ভেবেছিল, সৌমেন-মধুছন্দার দাম্পত্য অশান্তির ব্যাপারে তার কোন মাথাব্যথা নেই, আসল উদ্বেগ হচ্ছে একশোটা টাকা।

এইরকম বিকেল বেশ কয়েকটা কেটেছিল। অশ্রু তৈরি হয়েই ও বাসায় যাচ্ছিল প্রতিদিন। কিন্তু আজ যা ঘটল, তা অভাবিত।

মধুছন্দা সত্যি চলে গেছে বাপের বাড়ি। ঝির মুখে খবরটা জেনেই চলে আসছিল সে। হঠাৎ ভিতর থেকে সৌমেন এসে ডাকে তাকে। সৌমেন তাহলে আজ অফিস যায়নি! বেচারা! মুখটা গম্ভীর আর উস্কোখুস্কো চেহারা দেখবে ভেবেছিল অশ্রু। কারণ, যাই বলুক—অশ্রু যেন টের পেত, সৌমেন সুন্দরী বউটিকে ভালবাসত খুবই।

কিন্তু সৌমেনের চেহারায় সে ভাব একটুও নেই। মুখে হাসি আর কী একটা আছে। অশ্রু সন্তর্পণে টের পেল, সৌমেন সম্ভবত ড্রিঙ্ক করেছে।

সেও স্বাভাবিক। বউ রাগ করে বাপের বাড়ি গেলে আজকাল পুরুষমানুষেরা ড্রিঙ্ক করবে, ফুর্তি ওড়াবে—এটা খুবই সাধারণ ব্যাপার।

অশ্রু বলল, 'উনি তো হঠাৎ চলে গেছেন শুনলুম। কবে ফিরবেন, তখন আসব 'খন।'

ঝি নিজের কাজে সরে গেছে কর্তাকে দেখে। সৌমেন বলল, 'ও নই—কিন্তু আমি আছি। আসুন।'

ডাকটার মধ্যে আদেশের সুর ছিল যেন। তাই অশ্রু গেল। নিয়োগকর্তাদের প্রতি অশ্রুর বরাবর একটা দুর্বলতা আছে। আনুগত্যের বোধটা তার বরাবর তীব্র। তা না হলে যেত না।

সোফায় আড়ষ্টভাবে বসল অশ্রু। সৌমেনও মুখোমুখি বসল। তারপর একটু হেসে বলল, 'অফিসে ছিলুম। হঠাৎ ঝি মেয়েটি ফোন করল—শিগগীর বাসায় আসুন। ওর গিন্নি এইমাত্র নাকি চলে গেল। বলে গেল যে, সাহেবকে বলিস, আর আসব না। হাস্যকর ব্যাপার! একটা ঝি এভাবে ফোন করল আমাকে! অবশ্য ওর দোষ নেই। বেচারা হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল—এ কি সম্ভব একটা ভদ্রপরিবারে? তারপর তো তক্ষুণি এসে দেখি, সব লণ্ডভণ্ড। জিনিসপত্র তছনছ হয়ে পড়ে আছে। শুনলুম, দেয়ালে মাথাটাথা ঠোকাঠুকি করেছিল! জাস্ট এ হিস্টিরিক টাইপ! বুঝলেন? বরাবর আই হ্যাভ স্মেল্ট দ্যাট। ভাবতুম, ওদের বংশে নিশ্চয় কারো এসব রোগ ছিল। সাইকোথেরাপির কথাও ভাবতুম।'

অশ্রু অস্ফুটে বলেছিল, 'সে কী! দেখে তো তেমন মনে হত না ওকে!'

'ওটা ওর মুখোশ। আমাকে কি কম জ্বালিয়েছে—আপনার কাছে ফ্রাঙ্ক হওয়ার অসুবিধে নেই, যদিও এসব পার্সোনাল অ্যাফেয়ারস! ভীষণ ভুল করেছি আমি—রিয়্যালি! দেখুন—ব্যাকগ্রাউন্ড, আই মিন ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড ভালভাবে না জেনে কোথাও এসব সম্পর্ক করতে নেই, একথা আমাদের পূর্বপুরুষরা সব সময় বলতেন। আমরা মডার্ন, আমাদের আউটলুক অন্যরকম। আমরা ভাবি, মানুষটা কী বা কেমন, সেটাই আসল কথা। আজ ঠকে শিখলুম, ওটা ভুল। ভীষণ ভুল। একটা মানুষ তো আকাশ থেকে পড়ে না, তার এনভায়রনমেন্ট তার পারিবারিক ধ্যানধারণা..'

হঠাৎ সৌমেন তেতো মুখে বলল—'লিভ ইট। যত ভাবব, খারাপ লাগবে। আপনাকে আমি বলছি, ছন্দা ফিরে আসতে চাইলেও আমি হেলপলেস—দরজা বন্ধ করে দিয়েছি। নো—নেভার।'

অশ্রু কী বলবে, ভেবে পেল না। দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা কিছু নেই—পরোক্ষ যা আছে, তা খুবই সামান্য।

সৌমেন বলল, 'অ্যান্ড নাও, অ্যাবাউট ইউ মিস সরকার। এখন বলুন, আপনি আসবেন কি না?'

অশ্রু হতভম্ব হয়ে বলল, 'আমি...আমি এসে কি করব?'

'কিছু করবেন না। চুপচাপ বসে থাকবেন এই ঘরে। রেডিওগ্রাম বাজাবেন। প্রচুর কালেকশন আছে। ওই সব বইপত্তর রয়েছে, পড়বেন। জাস্ট ফর অ্যান আওয়ার। তারপর চলে যাবেন। ইউ মাস্ট কনটিনিউ।'

পাগল নাকি! অশ্রু হেসে ফেলল অস্বস্তির মধ্যেই। —'সে কি হয় নাকি? এমনি এমনি আসব, আর টাকা নেব কেন?'

সে ভেবেছিল, সৌমেন নেশার ঘোরে এসব বলছে। কিন্তু এখন আর তা মনে হল না। সৌমেন আস্তে আস্তে বলল, 'আপনাকে বোঝাতে পারব না—কী বিরাট সব ড্রিমস অ্যান্ড ইন্সপিরেশনসের একটা জগৎ গড়ে তুলেছিলুম দিনে দিনে। সব আজ হঠাৎ চুরমার হয়ে গেছে। এত হাস্যকর লাগছে এখন! এই যে ঘরটা দেখছেন, ইফ ইউ আর সেন্সেটিভ এ বিট, বুঝতে পারবেন যে, এর মধ্যে আমার কত ইচ্ছে কত সব ব্যাপার কাজ করেছে—জাস্ট এ ক্রিয়েশন! আপনার মনে হয় না মিস সরকার? দেখুন, ভাল করে খুঁটিয়ে দেখুন। মনে হয় না ইট ইজ এ ক্রিয়েশন অফ মাই আইডিয়াজ? জাস্ট একটা পরিবেশ।'

অশ্রু বলেছিল, 'তা আমি কী করতে পারি?'

সৌমেন চোখ বুজে ছিল। ঘরে তখন আবছা অন্ধকার এসে জমেছে। আলো জ্বলে উঠেছে বাইরে—পাশের ঘরেও। সৌমেন চোখ বুজে শান্তভাবে—হঠাৎ বলে উঠল—'আপনাকে আমার ভাল লাগে'। অনেক কথা ফ্রাঙ্কলি তাই বলতে ইচ্ছে করে।' অশ্রু চমকে উঠেছিল সঙ্গে সঙ্গে। মুহূর্তে তার চোখদুটো জ্বলে উঠেছিল। কী বলতে চায় লোকটা? সে হয়ত যথার্থ স্মার্ট মেয়ে নয়—রুচি বা ঋতুর মত—বিবি ব্যানার্জির মত। তাই কী বলা উচিত ভেবে না পেয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল।

আর সৌমেন তার দিকে ঝুঁকে এল। ... 'হ্যাভ আই ডান এনিথিং রং? নো —নেভার। আমি জানি, আপনি আমাকে কী ভাবলেন! কিন্তু আমি কী করব বলতে পারেন? দা সিলি ক্যাট হ্যাজ স্পয়েল্ড এভরিথিং। ওঃ, আমার ইচ্ছে করছে...' হাত দুটো মুঠো হয়ে যাচ্ছিল সৌমেনের।

অশ্রু বলল, 'তা আমি কী করব? আমি চলি।'

'নো। প্লিজ! আপনি যাবেন না, মিস সরকার। আমি অন্যায় কিছু বলিনি। প্লিজ, ডোন্ট টেক ইট আদার ওয়াইজ!'

অশ্রু ক্ষুব্ধ স্বরে বলল, 'বাট দিস ইজ ইনসাল্টিং!'

'ইনসাল্টিং! কী বলছেন? আপনি প্রতি বিকেলে—আমি থাকি বা না থাকি, এ ঘরে এসে একটি ঘণ্টা কাটিয়ে যাবেন এবং আপনার ফি যথারীতি পাবেন। এত অপমানের কী আছে, আমার মাথায় ঢোকে না। আপনি কি ভাবছেন, আমি আপনাকে...' সৌমেন হঠাৎ হেসে উঠল।

অশ্রু তর্কে এগোল না—কোন মানে হয় না তর্কের। অগত্যা সেও হেসে ফেলল। —'দেখুন, টাকা নিশ্চয় আমার দরকার। কিন্তু কাজ না করে কেউ টাকা দিক, আমি তা চাইনে।'

'বারে! কাজ তো আমি দিচ্ছি। ধরুন, কেউ যদি আপনাকে বলে, আপনি রোজ একঘণ্টা করে গাছের পাতা গুনবেন, আমি আপনাকে টাকা দেব। আপনার কী? আপনি এ কাজ করবেন না কোন্ যুক্তিতে? বলুন, কী লজিক আছে? বুঝেছি, দা ওল্ড অ্যান্ড ড্যাম রটন এথিক্স ইন ইওর হেড।'

আবার অশ্রুর মনে হল সে একজন মাতালের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। রুচির মত মেয়েও নাকি এদের ট্যাকল করতে পারে না অনেক সময়, তো সে কোন্ ছার। নগণ্য এক স্কুল মিস্ট্রেস! অশ্রু বলল, 'দুঃখিত। আমি চলি।'

'আপনি আসবেন না তাহলে?'

'না।'

'কেন?'

'আপনার প্রোপোজালটাই ইনসাল্টিং!' বলে অশ্রু বেরিয়ে এসেছিল। বাইরে এসে কিন্তু তার মনে হয়েছিল, সত্যিই কি অপমানজনক কিছু ছিল প্রস্তাবটার মধ্যে? টাকা পাওয়াটা যখন আসল কথা এবং এতে তার চারিত্রিক কোন ক্ষতি যদি না ঘটে, তাহলে তো ভালই বলা উচিত। কিন্তু লোকের হাতে

এত বেশি টাকা হয়েছে যে, তারা তা নিয়ে কী করবে ভেবে পাচ্ছে না—এভাবে ব্যাপারটা দেখলেই ঢুকে যায়।

অশ্রু এইদিক থেকে এখন যত ভাবল, তত মনে হল—অফারটা নেওয়া উচিত ছিল।

সাত

ক'দিন থেকেই একটা আবছা ধরনের আরামদায়ক জ্বর ঋতুর গায়ে কিছুক্ষণ জড়িয়ে থাকছিল আর চলে যাচ্ছিল। জ্বরটা বেশ আদুরে। রোদের মধ্যে এক টুকরো হালকা মেঘের ছায়ার মত। ঋতু হাই তোলে, আড়মোড়া দেয়, শরীরটা শিরশির করে ওঠে গভীর উত্তেজনায় এবং হিমভাবটুকু নিয়ে সে চুপচাপ শুয়ে থাকে। বিবি ব্যস্ত। দিল্লিতে তার দলের প্রোগ্রাম আছে। বেরিয়ে যাবার সময় সে বলে যায়, 'ওষুধগুলো টাইমলি খাবি। খবরদার, বেরোবিনে ঘর থেকে।' ঋতু শান্ত মেয়ের মত ঘাড় নাড়ে।

কিন্তু বিবি চলে যাওয়ার পর শূন্য ফ্ল্যাটটা তাকে কামড়াতে থাকে। চারদিক থেকে দাঁত বেরিয়ে আসে যেন। তখন সে বাইরে যাবার জন্যে চঞ্চল হয় না। কিন্তু এই শীতভাব, আরাম আর কী যেন জড়তা—এইসব নিয়ে শরীর জোর আপত্তি জানয়। সে বাধ্য হয়ে শুয়ে পড়ে। সে ভাবে। আবোলতাবোল সব ভাবনা, কতরকম দিবাস্বপ্ন—ভাল ও মন্দ। তারপর হঠাৎ মনে হয়, কেন যেন তার ভীষণ কাঁদতে ইচ্ছে করছে। এতদিন যা মনে হয়নি, এখন হচ্ছে—এই বিরাট জটিল যন্ত্রময় পৃথিবীতে একটা তুচ্ছ পোকার মত বুকে হেঁটে সে কেন ঘুরে বেড়াচ্ছে? নিজের যে অসহায়তার দিকে আগে সে সকৌতুকে তাকাত, এখন তাকাতে ভয়ে বুক কেঁপে ওঠে। তার চোখ ফেটে জল আসতে চায়, কিন্তু দাঁতে দাঁত চেপে তা আটকায়।

জ্বরটা তারপর বেশ ঘন হয়েই দেখা দিল। রাতের দিকে সে টের পায় তার নিঃশব্দ ও ধূর্ত ভীষণতা। গায়ে চাদর জড়িয়ে নেয়। জলতেষ্টা পায়। হাঁফাতে হাঁফাতে উঠে হাত বাড়িয়ে জল খায়। বিবি ঘুমোচ্ছে বেঘোরে। সে কিছু টের পায় না—ইদানীং বিবি তার দিল্লির প্রোগ্রাম নিয়ে এত ব্যস্ত হয়ে উঠেছে যে, আগের মত ঋতুকে নিয়ে সারাক্ষণ জড়িয়ে থাকে না। তবে পুরনো প্রেসক্রিপশনের বরাদ্দ মতো ওষুধ ট্যাবলেট আনতে ভোলে না।

অশ্রু মাঝে মাঝে ঋতুর শরীরের খোঁজ-খবর নেয়। ...'তুমি ভীষণ শুকিয়ে যাচ্ছ, ঋতু! খাওয়া-দাওয়া কমিয়ে দিয়েছ—ফূর্তি নেই, ব্যাপার কী?'

ঋতু মৃদু হেসে বলে, 'কোন ব্যাপার নেই। বেশ তো আছি।'

'তোমার কাশিটা তো কমল না।'

'ও আর কমবে না।'

'কমবে না কী! তাহলে নিশ্চয় ঠিকমত ডায়গনোসিস হয়নি। বিবিদিকে বল, অন্য কোথাও ব্যবস্থা করুক।'

ঋতু জ্বলে ওঠে হঠাৎ। 'বিবিদি আর বিবিদি! সে কি আমার ত্রাণকর্তা যে, সব সময় সে-ই ব্যবস্থা করবে!'

বিবি তখন নির্ঘাৎ বাথরুমে। রুচি ওঘর থেকে বলে, 'এই! জেন্ডার ভুল হল। বল, ত্রাণকর্ত্রী!'

তখন হাসি ফেরে ঘরে। কিছুক্ষণের অসুখ-বিসুখ আবহাওয়াটা কেটে যায়। তখন হয়ত ঋতুর গায়ে সারারাতের জ্বরটাও ফেলে-যাওয়া আবর্জনার মত ক্লান্তি, আড়ষ্টতা আর ব্যথা-বেদনার ডাঁই জমে রয়েছে, কথা বলতে ভাল লাগে না—তবু ঋতু কথা বলতে চেষ্টা করে। নানারকম কথা। এরা সবাই বেরিয়ে গেলে তো আর কিছু বলা যাবে না, তাই দ্রুত বলে নিজেকে খালি করতে চায় যেন। প্রচণ্ড হাসতে চায়। আর তেমনি সে নিজের এই চাপা জ্বরটার ব্যাপার লুকোতে সতর্ক থাকে।

তবু বিবি মাঝে মাঝে বলে, 'কীরে! ঘুষঘুষে জ্বরটর হচ্ছে না তো? বলবি কিন্তু—চেপে রাখিস নে।'

ঋতু বলে না। বলতে তার ভয়ও করে। মনে হয়, কিছু একটা ঘটে যাবে তাহলে। কারণ জেনে ফেলেছে—একটা গোপন দারুণ আর ভয়ঙ্কর ঘটনা ততদিনে তার শরীরের ভিতর ঘটতে শুরু করেছে। সে দাঁতে দাঁত চেপে ভাবে—না, না! এ কথা কাকেও জানতে দেবে না সে। শুনলে এরা হয়ত ভয় পেয়ে যাবে। তাকে বলবে—তুমি হাসপাতালে চলে যাও এক্ষুণি!

পরক্ষণে মনে হয়, এরা কি অত নিষ্ঠুর হতে পারে? বিবিদি তো তার মায়ের মত। মনে মনে বিবিদির এই রকম নিষ্ঠুর মূর্তি কল্পনা করতে চেষ্টা করতে চেষ্টা করে সে। কিন্তু দেখে, তেমন কোন চেহারাই কল্পনায় আসছে না। বিবিদি মিঠে হাসছে নিঃশব্দে এবং স্নেহে, তার উজ্জ্বল মুখে পৃথিবীর ময়লা ও অসুখ-বিসুখের কোন ছায়াই পড়ে না। রুচি... হ্যাঁ, তার পক্ষে সম্ভব। নিজের ভাইকে বৃষ্টির রাতে বের করে দিয়েছিল। রুচি খুব স্বার্থপর টাইপের মেয়ে, কুচুটে, সারাক্ষণ তার মনে অন্য এক চালাকচতুর মন নিয়ে সে থাকে—কাকেও জানতে দেয় না। খেতে বসলে সে আড়চোখে অন্যদের ঝোলের বাটিগুলো দেখে নিতে ভোলে না। এই রুচিই তো একবার ঋতুর একটা বেয়ারিং চিঠি দশপয়সা দিয়ে ছাড়িয়ে নেয়নি পিওনের কাছ থেকে! ফের আসতে বলেছিল। ঋতুর এই সব মন পড়ে। আরও কতদিনের কত ছোটখাটো ঘটনা খুঁটিয়ে স্মরণ করে সে। যেগুলো বরাবর এড়িয়ে ছিল, এখন এই বিপন্ন সময়ে স্পষ্ট ফুটে ওঠে আর ঋতু বিচলিত হয়। রুচিকে অন্যভাবে আবিষ্কার করে। রুচির ইমেজটা অদ্ভুতভাব বদলে যেতে থাকে তার সামনে। হুঁ...আজকাল প্রায় বেশি রাত করে ফেরে রুচি। কারো সঙ্গে কথা বলে না তখন। বাইরে খেয়ে আসে নাকি! আর বাইরে একটা গরগর গুরুতর শব্দ শোনা যায়, কারো গাড়ি চলে যায় নিচের গেট থেকে। অশ্রু চুপিচুপি বলেছে তাকে, 'কে এক তাপস ব্যানার্জি রুচিকে পৌঁছে দিয়ে যায়। প্রেমটেম চলছে নিশ্চয়! আর—ভীষণ—ভীষণ ড্রিঙ্ক করে আসে ও। গন্ধে ঘরে টেকা দায়।'

অতএব সব মিলিয়ে রুচি এই রকম। আর অশ্রু! সে তো বরাবর একটু হিসেবী মেয়ে। ঘরকন্নার বাতিক আছে জোর। টাকা-পয়সার ব্যাপারে উদ্দেশ্যহীন মোহ আছে। বাজে পয়সা খরচ করে না। ঋতু তার দিক থেকে কোনদিনই কোনকিছুর আশা করেনি। এখনও করে না। ঋতুর অসুখটা সাংঘাতিক জানলে অশ্রু ভীষণ ভয় পেয়ে যাবে, তা তো জানাই। একটুতেই ডেটলজলে হাত ধোয়, ঘরে একটা মাছি দেখলে ফ্লিটের পিচকিরি আনতে দৌড়ায়। অশ্রুর মৃত্যু-ভয় খুব তীব্র—ঋতু টের পেয়েছে কতদিন।

এদিকে আশ্চর্য ব্যাপার, কামালটা এল না। এমন তো হওয়া উচিত ছিল না। ওদের বাড়ি গিয়েছিল ঋতু, কামালকে কি তা বলেনি জ্যোৎস্না?

নাকি কামাল...

ভাবতে ভয় পেল সে। এতদিন যেন মনে মনে চরম সময়ের নির্ভরতা হিসেবে এই একটি ছেলেকেই সে আশা করেছে।

আবার একবার যাবে নাকি ওদের বাড়ি? নাঃ, ঋতু অত বেহায়া নয়। অভিমানে এখন তার চোখে জল আসে। তারপর টের পায়, মনও দিনে দিনে খুব দুর্বল হয়ে পড়ছে। চারপাশের মানুষ আর দুনিয়াটাকে সে আগের মত তুচ্ছতাচ্ছিল্য করতে পারছে না। জ্বরের মধ্যে সে টের পায় সারাটি রাত সব কিছুতে যেন অতিমাত্রায় বেড়ে যাওয়ার জোয়ার লেগেছে। বাড়িটা বাড়তে বাড়তে বিশাল হচ্ছে। বিবিদির খাটটাও বড় হতে হতে দূরে সরে যাচ্ছে ক্রমশ। আর রুচি অশ্রু ডাইনিং রুম এবং ঘর বাড়ি রাস্তাঘাট শহর পৃথিবী অতিকায় হতে হতে স্ফীত হতে হতে একটা থেকে অন্যটা দূরে সরতে সরতে একটা চরম বিপুলতায় পৌঁছানোর ব্যাপার চলেছে। সে একটা ছোট্ট পোকার মত একজায়গায় আটকে থেকে এই স্ফীতি দেখতে দেখতে ভয়ে বিস্ময়ে বোবা হয়ে যাচ্ছে।

এখন তার চেঁচিয়ে উঠতে ইচ্ছে করে শিশুর মত। মাকে খোঁজে, বাবাকে খুঁজে দেখে। তাঁরাও এখন বহু দূরে কোথায় ছড়িয়ে পড়ছেন এই ব্যাপক স্ফীতির বন্যায়। আর অন্ধকার! কিছু দেখা যায় না। তার চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে পড়তে চায়। তারপর গলার ব্যথাটা হঠাৎ যন্ত্রণাদায়ক চুলকানিতে ভরে ওঠে। সে প্রচণ্ড কাশতে থাকে।

ঘুম ভেঙে গেলে বিবি জড়ানো গলায় বলে, 'ফের বেড়েছে। ট্যাবলেটটা খেয়ে নে।' ফের ঘুমোতে থাকে বিবি। আবছা শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দে ঘর ভরে যায়। সেই সব রাতে বাইরে বৃষ্টি আর অনাবৃষ্টির মধ্যে ট্রেন কিংবা মালগাড়ি বিরক্তিকর শিস দিতে দিতে চলে যায়। ঋতু গলায় হাত দিয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে ভাবে, কোথাও যদি চলে যেতে পারত—অন্য কোনখানে! এখানে তার আর একটুও ভাল লাগে না, একটুও না।..

কিন্তু জ্বরটা চাপা দেওয়া গেল না। কয়েক দিনের মধ্যেই বিবির কাছে ব্যাপারটা ধরা পড়ল। প্রথমে সে রেগেমেগে খুব বকাবকি করল। তারপর তক্ষুণি ট্যাক্সি ডেকে ঋতুকে জোর করে ওঠাল। ঋতুর গায়ে চাদর জড়ানো। অশ্রুও গেল সঙ্গে।

ডাক্তার মৌলিক অনেকক্ষণ পরীক্ষা করার পর গম্ভীর মুখে বললেন, 'আমার মনে হচ্ছে—আগের এক্সরেটায় গোলমাল ছিল। গলার ভেতরটায় আলসার মত হয়েছে—কিন্তু রক্ত টক্ত পড়ে না বলছেন। অথচ ব্যথা বাড়ছে, জ্বর হচ্ছে!'

বিবি উদ্বিগ্ন মুখে বলল, 'কি বিপদ দেখুন ডক্টর মৌলিক! এদিকে পরশু আমাদের দিল্লি যাবার দিন। ওকেও নিয়ে যাব ভেবে টিকিট-ফিকিট কেটে ফেলেছি!'

কথাটা শুনে ঋতুর কী যে ভাল লাগল! সে হাসবার চেষ্টা করে বলল, 'আমি যাবই কিন্তু!'

ডাক্তার হাসলেন। 'আমি তো আপনাকে কিছুদিন আটকে রাখবার কথা ভাবছি। শুনুন মিসেস ব্যানার্জি, আমি লিখে দিচ্ছি—আপনি একবার ইয়েতে নিয়ে যান এক্ষুণি। আই মিন— একটু ইতস্তত করে ফের বললেন, 'আজকাল এসব হচ্ছে । ভয় পাবার কিছু নেই। তাহলেও সিওর হওয়া ভাল।' বলে তিনি খস খস করে কী সব লিখতে ব্যস্ত হলেন।

বিবি কৌতূহলি হয়ে বলল, 'কী ব্যাপার?'

ডাক্তার কিছু বললেন না। কাগজটা এগিয়ে দিলেন ওর হাতে। সেটায় একবার চোখ বুলিয়েই বিবি চমকে উঠে ডাক্তার মৌলিকের দিকে তাকাল। বলল, 'ডু ইউ সাসপেক্ট দ্যাট?'

'হ্যাঁ। মনে হচ্ছে, আমার ভুল হয়নি।'

ঋতু দেখল বিবির হাতের মুঠোটা কেমন শক্ত হয়ে গেল। নিষ্পলক হয়ে উঠল তার চোখ দুটো।

ঋতু হাসতে হাসতে বলল, 'আমার কী হয়েছে?'

বেরিয়ে এসে ট্যাক্সি চেপে ফেরার পথে কোন কথা বলল না বিবি। অশ্রু যা মেয়ে, ও কিছু জিজ্ঞেস করতে বিব্রত বোধ করে। ঋতু দু'একবার জিজ্ঞেস করল, কিন্তু বিবি গম্ভীর। কোন জবাব দিল না।

বাসায় পৌঁছে ওরা দেখে, তাপস আর রুচি বসে রয়েছে।

অশ্রু তাই বিবির ঘরে এসে বসল। ঋতু শুয়ে পড়েছিল। ঠোঁটে শান্ত হাসি। অশ্রু দেখল, বিবি তার খাটের কাছে দাঁড়িয়ে আছে, সেইরকম নিষ্পলক চোখ। তারপর সে অবাক হল। বিবির চোখে জল! এ যে অবিশ্বাস্য! বিবি মুখটা জানলার দিকে রেখেছে। ঋতু দেখতে পাচ্ছিল না অবশ্য। অশ্রু বিবির পাশে গিয়ে দাঁড়াল। তখন বিবি হঠাৎ তার হাত ধরে ব্যালকনিতে নিয়ে গেল।

অশ্রু রুদ্ধশ্বাসে বলল, 'কী? কী হয়েছে ঋতুর?'

বিবি জবাব দিতে গিয়ে মুখ ফেরাল। ঋতু করেছে কী, হঠাৎ উঠে বসে রেডিওগ্রাম বাজাতে শুরু করেছে। রবীন্দ্রসঙ্গীত বেজে উঠল। ... 'আমার সকল দুঃখের ধারা, তোমাতে আমাতে হয়েছে হারা....'

বিবি আস্তে বলল, 'ঋতুর গলায় ক্যানসার হয়েছে।'...

আর সেই সময় দরদী ও মরমী গায়ক জর্জ দেবব্রত গম্ভীর উদাত্ত গলায় ব্যাপক গভীরতর দুঃখকে একটা প্রশান্তির দিকে নিয়ে যাওয়ার ডাক দিচ্ছিলেন।

রুচি আর তাপস কথা বলছিল আর হেসে উঠছিল।

একটা সবুজ রেলগাড়ি খুব ধীরে চলে যাচ্ছিল দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার দিকে।

সৌমেনের অদ্ভুত প্রস্তাবটা অশ্রুর মনে প্রথম কিছুদিন অস্বস্তি সৃষ্টি করার পর মিইয়ে পড়েছিল। কিন্তু কৌতূহল থেকেই যাচ্ছিল একটা—সেটা মধুছন্দা সম্পর্কে। মধুছন্দা কি ফিরেছে? মাঝে মাঝে ভাবে। সৌমেন আগের মতই নিতে পেরেছে কি তাকে? উদ্বেগ আর কৌতুক দুই-ই খেলা করে অশ্রুর মনে। সে অবশ্য টিউশনি খুঁজতেও ছাড়ে না। এটা তার অভ্যাসে দাঁড়িয়েছে, বলা যায়। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে চিঠি লেখে। কখনও ইনটারভিউ গোছের দিয়েও আসে। কিন্তু একটাও মনের মত নয়। কিংবা সেই গৃহকর্তা বা কর্ত্রীর মনের মত হয় না।

অথচ স্কুলের বাইরে তার যে জীবন এবং সময়, তা বড্ড শূন্য ঠেকে—হাঁপ ধরে যায়। ঋতুর তো ওই অবস্থা, রুচির সাহায্য আজ-কাল আর মাথা খুঁড়লেও মিলবে না। বিবিরও না। সবাই নিজের তালে রয়েছে। এখন সে দিনে-দিনে ভীষণ রকমের একা হয়ে যাচ্ছে।

এই একাকিত্ব আরও জোর ঝাঁপিয়ে পড়ল, যখন ঋতুকে হাসপাতালে রেখে এল বিবি।

প্রথম কয়েকটা দিন বিকেলে নিয়মিত ঋতুকে দেখে আসা তার ভালই লাগছিল। তারপর খারাপ লাগল। ক্যানসার হাসপাতালটা অনেক দূর, তাছাড়া বিকেলে ভিড় ঠেলে পৌঁছতেও ফিরতে দেরি হয়ে যায়। পথ ও ভিড় তার অনেকটা সময় কেড়ে নেয়। আর সবচেয়ে বড় কথা—ওই হাসপাতালটা তার কাছে একটা ভয়ঙ্কর অস্বস্তি হয়ে ওঠে ক্রমশ ক্যানসার নিয়ে ভাবতে গেলেই বুকের ভিতরটা ঠাণ্ডা হয়ে পড়ে। ঋতুর গলায় ক্যানসার হয়েছে এবং অপারেশন অসম্ভব—তার ফলে ঋতু মরে যাবে। মরে যাওয়ার অনিবার্যতায় অসহায় একটি মেয়েকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখার সাহস ও জোর অশ্রুর নেই। সে বাঁচতে চায়, কিন্তু তার চাওয়ার মধ্যে একটা ভীরুতা ও সঙ্কোচের ভাব আছে, সে নিজেই টের পায়।

একদিন অশ্রু হঠকারী হয়ে উঠল। সেই সুন্দর রাস্তাটা দিয়ে আসতে আসতে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। মনে পড়ল, মধুছন্দার কথা—সৌমেনের কথা। সে ফ্ল্যাটটার দিকে তাকাল।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। ফ্ল্যাটে ব্যালকনিতে আবছা আলোয় সৌমেন দাঁড়িয়ে রয়েছে। ঘরে আলো জ্বলছে, কিন্তু ব্যালকনিতে আলো নেই। রাস্তার কিছু আলোর ছটা গাছপালার ফাঁক দিয়ে গিয়ে ছুঁয়েছে সৌমেনকে। অশ্রু একটু ইতস্তত করল। তারপর দ্রুত সিদ্ধান্ত নিল। একবার গেলে ক্ষতি কী? সৌমেন কি তাকে অপমান করবে? মনে হয় না। কারণ, এমন কিছু সে অপরাধ করেনি। আর যদি মধুছন্দা এসে থাকে, তাহলে তো মন্দ হবে না। টিউশনির সম্ভাবনা আছে কি না, এ প্রশ্ন অবান্তর। অশ্রু একটু স্মার্ট হওয়ার চেষ্টা করল। কী বলবে বা করবে ভেবে নিয়ে সে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল। কিন্তু সে টের পেল, তার উরুদুটো ভারি হয়ে পড়েছে। খানিকটা শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। বুক টিপটিপ করেছে। একটুখানি সামলে নিয়ে কাঁপাকাঁপা আঙুলে সে বোতাম ছুঁল।

দরজা খুলে দিল একটা নতুন লোক। লোক মানে কমবয়সী একটি ছোকরা। তার দিকে তাকাল জিজ্ঞাসু চোখে। অশ্রু একটু কেশে বলল, 'ইয়ে—কে আছেন? কর্তা না গিন্নি?'

'সাহেব আছেন। আপনি ভেতরে এসে বসুন। ডেকে দিচ্ছি।'

তাহলে মধুছন্দা আসেনি এখনও। অশ্রু তবু নিশ্চিত হবার জন্য প্রশ্ন করল, 'তোমাদের মেমসাহেব নেই?'

'আজ্ঞে? মেমসাহেব? না তো!'

আসলে পারিবারিক ঘটনা এখনও নিশ্চয় টের পায়নি ও। অশ্রু বলল, 'তাহলে চলি।'

সেই সময় পিছন দিকে পর্দার আড়ালে সৌমেনের গলা শোনা গেল—'কে রে—চানু?'

আর চলে আসবার উপায় রইল না। অশ্রু ভিতরে পা বাড়িয়ে বলল, 'আমি। কেমন আছেন? যাচ্ছিলুম হঠাৎ মনে হল, একবার দেখা করে যাই।'

সৌমেন যেন ভদ্রতা করেই বলল, 'আসুন।'

অশ্রু তার পিছন পিছন এগোল। কিন্তু পরক্ষণে অশ্রুর খারাপ লাগল। কারণ, সৌমেন বাইরের এই বসার ঘরেই তাকে বসতে বলল—আগের মত সেই বেডরুমে নিয়ে গেল না। ভাবতে গেলে এর মধ্যে দোষের কিছু নেই। ছাত্রী মধুছন্দা যখন নেই এবং অশ্রুও আর টিউশনি করতে আসেনি এখানে—তখন এটাই তো সঙ্গত। তাছাড়া কোন অনাত্মীয় ভদ্রলোকের সঙ্গে তার বেডরুমে গিয়ে বসার আকাঙ্ক্ষা—এটা কি খুব শোভন অশ্রুর পক্ষে?

কয়েক মুহূর্ত এগুলো চিন্তা করার পর অশ্রু নিজের আকাঙ্ক্ষাটার প্রতি অবাক হল। অথচ বাইরের ঘরে বসে থাকার মধ্যে একটা চাপা ক্ষোভও কেন যেন ফুঁসে উঠছে মনে! সে কি খুবই জড়িয়ে পড়েছিল এ বাড়ির জীবনের সঙ্গে? সে যেন এখন নিতান্ত পর হয়ে গেছে এদের।

সৌমেন আজ অসাধারণ গম্ভীর ও পোশাকী মানুষ।... 'বসুন।' বলে সে নিজেও বসল।

অশ্রু একটু ইতস্তত করে বলল। বসল, 'কেমন আছেন? প্রায়ই ভাবি—আমার ছাত্রীর খবর নেব'—বলে হেসে উঠল সে, কথাটা অসমাপ্ত রয়ে গেল।

সৌমেন বলল, 'আপনার খবর বলুন।'

'আমার আর কী? যা ছিলুম, তাই।'

সৌমেন চুপ করে থাকল।

অশ্রু বলল, 'আপনার বাইরে যাওয়ার কী হল? এ মাসেই তো যাবেন বলেছিলেন?'

'দেরি হবে।'

হঠাৎ উঠে চলে যাওয়া কেমন হবে বুঝতে পারছিল না অশ্রু। এদিকে আর কী বলবে, তাও খুঁজে পাচ্ছে না। সৌমেন কী ভাবছে? অশ্রু লক্ষ্য করল, চানু নামে ছোকরা চাকরটা ট্রেতে দুটো কাপ ইত্যাদি নিয়ে এগোচ্ছে। বসামাত্র চা আসবার কথা নয়। নিশ্চয় সৌমেন খেতে চেয়েছিল।

সৌমেন বলল, 'কফি খান।' তারপর নিজেই পট থেকে কফি ঢালতে শুরু করল। এ সময় তাকে খুবই ভদ্র আর সুন্দর দেখাচ্ছিল।

অশ্রু এবার কিছুটা সপ্রতিভ হতে পারল। বলল, 'আপনি কিন্তু ভীষণ গম্ভীর আজ।' তারপর হেসে উঠল।

'নাঃ এমনি।'

কিন্তু এভাবে তো কিছু হয় না। অর্থাৎ বসে থাকা যায় না। অশ্রু ছন্দার কথা তুলতে চাইল—'আপনাদের এখনও মেটেনি সমস্যা?'

'কিসের? বলে সৌমেন মুখ তুলল।

'দাম্পত্য?'

সৌমেন কোন জবাব দিল না।

'ছন্দার খবর বললেন না কিন্তু!'

'তেমন কোন খবর নেই।'

'ছন্দার ঠিকানাটা দেবেন?'

'কেন?'

'বা রে! আমার ছাত্রী আফটার অল। আমি কি তার মরাল গার্জেন নই?' অশ্রু হাসতে হাসতে বলল।

'ঠিকানা—মানে আপনি যাবেন সেখানে?'

'আপত্তি আছে আপনার?'

'মোটেও না। আমার কিসের আপত্তি?'

কফিতে দ্রুত চুমুক দিচ্ছিল অশ্রু। এ কফি খাওয়া নয়—মামুলী ভদ্রতা রক্ষা। পালাতে পারলে বেঁচে যায়। এদিকে মনে মনে ক্ষোভের ঝড় হু-হু করে বয়ে যাচ্ছে। অশ্রু নিজের এই হঠকারিতাকে একশো বার গাল দিচ্ছিল। তারপর হঠাৎ উঠে দাঁড়াল সে। .....'চলি। দেরি হয়ে যাবে—একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।' বলে সে পা বাড়াল দরজার দিকে।

সৌমেন বলল, 'ঠিকানা নেবেন না আপনার ছাত্রীর?'

অশ্রু ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'থাক। এমনি বলছিলুম। সময় করে উঠতে পারব না হয়ত।'

সৌমেন শুধু বলল, 'সে তো ঠিকই।'

অশ্রুর পিছনে সেই ছোকরাটা দরজা বন্ধ করে দিল। তারপর সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে অশ্রু টের পেল তার মধ্যে একজন অপমানিত স্ত্রীলোক থরথর করে কাঁপছে। নিজের আচরণের জন্যে লজ্জায় দুঃখে রাগে সে ছটফট করছিল। রাস্তার খোলামেলায় পৌঁছে তার শরীরটা ভীষণ ক্লান্ত আর ভারি লাগল আগের মত। কী বেহায়া আর লোভী মেয়ে সে ধিক্কার দিল নিজেকে। দ্রুত হাঁটতে থাকল।

বাসায় ফিরে দেখল, রুচি আজ সকাল সকাল ফিরেছে। রুচি তাকে দেখে বলল, 'ঋতুকে আজ দেখতে যাব ভাবছিলুম, হল না। তুমি গিয়েছিলে নাকি?'

অশ্রু বলল, 'হ্যাঁ।'

রুচি ওর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, 'কী ব্যাপার? তোমার অসুখ করেছে নাকি অশ্রুদি?'

'অসুখ! না তো? ট্রাম-বাস পাইনি, হাঁটতে হাঁটতে এলুম। টায়ার্ড!' বলে অশ্রু বাথরুমে চলে গেল।

একটু পরে ফিরে এসে সে বলল, 'তুমি আজ বড্ড সকাল সকাল যে? আজ পার্টি ছিল না?'

রুচি ভুরু কুঁচকে বলল, 'রোজ পার্টি থাকে নাকি?'

অশ্রু কাপড় বদলাতে ব্যস্ত হল। তারপর সকৌতুকে বলল, 'এই! আজ এক কাজ করা যাক। পাশের ডাক্তার বুড়োকে এনে বিবিদির বিছানায় শুইয়ে রাখি। সত্যি, রাত্রে ভয়ে আমার ঘুম হয় না।'

'অশ্রুদি! বিবিদি কবে ফিরবে বলেছে?'

'ঠিক নেই। টেলি করে জানাবে।' রুচি একটু হেসে বলল, 'সত্যি, আমরা এখন কেমন অনাথ মার্কা হয়ে গেছি, না? কী রকম ফাঁকা ফাঁকা! বিবিদি বলেন, 'আছি, তাই টের পাও না'.. সে পরশুরামের ভাষায় পূর্ববঙ্গীয় উচ্চারণে 'জানতি পার না' বলে জোর হেসে উঠল।

অশ্রু হাসবার চেষ্টা করল। এখন হাসি ও চপলতা তার খুবই দরকার। কিছুতেই সৌমেনের ব্যাপারটা সে মন থেকে সরিয়ে দিতে পারছে না। সে বলল, 'বিবিদি না থাকলেও ঋতুটা যদি থাকত, এতক্ষণ এক গাদা গল্প বলে জমিয়ে রাখত। বেচারা ঋতুটা!'

'ঋতু—আচ্ছা অশ্রুদি, ঋতু কি সত্যি...' রুচি থামল হঠাৎ।

'কী ঋতু?'

রুচি শিউরে উঠে মাথা দোলাল। —'না বাবা, ওসব ভাবতে নেই। আমরা অন্য কথা বলি!'

অশ্রু টের পেল, ঘরে কী একটা আবছা ত্রাস এসে ঢুকে পড়েছে হঠাৎ, ঋতুর কথাটা তোলা ঠিক হয়নি। সে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল। পাশের ঘরের দরজা বন্ধ। বিবি তালা দিয়ে দিল্লি গেছে—ও ঘরে এদের কোন জিনিসপত্র নেই, এবং দখলও নেই। তবে একটা চাবি অশ্রুর কাছে আছে। অশ্রুর মনে হল, এখন যদি সে ওই ঘরটা খোলে—ঋতুর বিছানা দেখে ভয় পাবেই পাবে! তার একটা হাত অসচেতন বিহ্বলতায় বুকে ক্রশ আঁকল, রুচির আড়ালে।

রুচি বলল, 'তোমাকে সেই যে আয়ার সাহেবের কীর্তি বলেছিলুম, তাঁর দ্বিতীয় কীর্তি শোন। ভেরি—ভেরি ইন্টারেস্টিং।'

অশ্রু তাকাল।

'আজ হোটেলে আয়ার সাহেবের স্যুটে পুলিশ হামলা করেছিল। ভীষণ সব কেলেঙ্কারী বেরিয়ে পড়েছে।

'তাই বুঝি?'

'হ্যাঁ। মেয়েঘটিত ব্যাপার। বেচারা আয়ার!'

'তোমার প্রেমেই তো পড়েছিল!'

'পড়েছিল। তো শোন—তাপসদা বললে, সব নাকি আমার বসদের কীর্তি। জাস্ট একটা ষড়যন্ত্র!'

'সে কী!'

'হ্যাঁ! কী নিয়ে আয়ারের সঙ্গে বনল না। তাই নিজেরা মেয়ে সাপ্লাই করে নিজেরাই ধরিয়ে দিল। তার মানে—কলকাতা থেকে তাড়াবার চেষ্টা! কী সব লোক রে বাবা! ভাবা যায় না!'

'দেখো—তুমি আবার কোন গোলমালে পড়ো না।'

রুচি অশ্রুর বোকামিতে হাসল।... 'ভ্যাট! আমার গোলমালে পড়ার কী আছে? ওসব ওদের কারবারের ব্যাপার!'

অশ্রু একটু হেসে চাপা গলায় বলল, 'আচ্ছা রুচি, একটা কথা জিজ্ঞেস করব?'

'একশোবার করবে। আজ আমার চমৎকার মুড আছে।'

'তাপসবাবুর জন্যে চাকরি ছাড়তে চাইছিলে—এখন দেখছি সেই ভদ্রলোককেই নিয়ে ভীষণ...' অশ্রু থামল, ঠোঁটে দুষ্টু দুষ্টু হাসি।

ভীষণ কী? প্রেম তো?'

'সে তুমিই জানো।'

'জানি না। তাপসদা মাতাল, কিন্তু অনেস্ট—এইটুকু জানি, ব্যস!'

'ইন হোয়াট সেন্স, অনেস্ট, শুনি?

রুচি ভুরু কুঁচকে বলল, 'মরালিটি নিয়ে তুমি খুব ভাবো, জানি। তোমাদের দিদিমণিদের এসব ন্যাকা ন্যাকা বাতিক আছে। অনেস্টির অনেক ডেফিনেশন আছে।'

অশ্রু হাসতে হাসতে বলল, 'ইস! ভীষণ রেগে গেলে তো!'

'তুমি যে আমায় যখন-তখন রাগিয়ে দাও। তার বেলা?'

থাক বাবা, ওঠ। রুটিটা করে ফেলা যাক। খিদে পাচ্ছে।'

রুচি কী জবাব দিতে যাচ্ছিল, ঘণ্টা বাজল। সে অশ্রুর দিকে তাকাল। অশ্রু বলল, 'দেখে দরজা খুলবে কিন্তু। এখন সব আসে কেন বুঝি না!'

রুচি গিয়ে দরজা খুলল। তারপর বলে উঠল, 'তুই! এখন? কী ব্যাপার?'

নরু বলল, 'তাপসদা পাঠালেন। চিঠি দিয়েছেন।'

রুচি চিঠিটা নিয়ে খুলে পড়ল, তারপর বলল, 'ঠিক আছে। তোর তাপসবাবুকে বলবি, সকালে একবার সময় করে আসতে। আমার যাওয়ার কিছু ঠিক নেই।'

নরু বলল, 'তুই তো ভারি অবাক মেয়ে রে! অসুখ—আসবেন কেমন করে? অসুখ না হলে তো নিজেই আসতেন। চিঠি পাঠানোর কী দরকার ছিল?'

রুচি বলল, 'মেলা বকিস নে! কিছু অসুখ না। কাল তো দিব্যি ছিল—হঠাৎ অসুখ করে বসল!'

'যা বাবা! অসুখ কি নোটিশ দিয়ে আসে নাকি মানুষের! ঠিক আছে—তুই চিঠি লিখে দে।'

'ভাগ্‌। এখন চিঠি-ফিঠি লেখা যাবে না। মুখে বলবি।'

নরু হতাশ মুখে অশ্রুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'বুঝুন! যার ব্যাপার, তার গরজ নেই—অন্যের মাথাব্যথা পড়েছে! এযুগে তো এমনি হয়। শালা—এমন চান্স হাতে পেয়ে ছাড়তে চায়, তার মত বোকা..'

রুচি তার জামার কলার ধরে বলল, 'বেরো বলছি এক্ষুণি! দালাল কোথাকার। এঁচোড়ে পেকে ভুট হয়ে গেছে, বড় বড় বুলি শিখেছে!'

নরু লালমুখে বলল, 'কলার ছাড়। চলে যাচ্ছি। তোর মুখ জীবনে দেখতুম নাকি? নেহাত তাপসদা পাঠাল—তাই! মর তুই নরকে পচে! যে লাইন ধরেছিস—এরপর তোকে ঠেকায় কোন শালা?'

রুচি তার গালে এক চড় মারল। নরু অমনি হন হন করে বেরিয়ে গেল। রুচি গিয়ে দরজা বন্ধ করে হাঁফাতে হাঁফাতে বলল —'ইতর! অসভ্য!'

অশ্রু হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। এবার বলল, 'কী সব করো, একটুও বোঝা যায় না।'

রুচি বলল, 'তোমার বোঝার কী দরকার? চলো, রুটি করবে বলছিলে।'

তারপর রুচি একটু হাসল।... 'তাপসবাবু ফিল্ম প্রডিউসার হবেন। বুঝেছ? স্টোরিও কবে কেনা হয়ে গেছে। ডাইরেক্টর ঠিক হয়ে গেছে। এখন ডাইরেক্টর ভদ্রলোক কাল সকালে ওঁর ওখানে আসবেন। অতএব আমাকে যেতে হবে।'

অশ্রু বলল, 'নায়িকা হতে?'

'আবার কী? মানাবে না আমাকে?'

'খুব মানাবে।'

'অশ্রুদি!'

'উঁ?'

'নায়িকা হব? কী হল? কথা বলছ না যে?'

অশ্রু মুখ ফেরাল।

রুচি চমকে উঠে বলল, 'ও কি। তুমি কাঁদছ? কেন? কী হল হঠাৎ?'

আট

সেদিন অশ্রুর চোখে একটুখানি ছলছল ভাব দেখা দিয়েছিল, কেন, রুচি তার যেমন জবাব পায়নি, অশ্রু নিজেও কিন্তু পায়নি। কেন হঠাৎ অমন হয়েছিল তার? বেশ মনে পড়ে, দারুণ স্যাঁতসেতে একটা ভাব নিয়ে সেদিন বাসায় ফিরিছিল। তারপর নরু ছেলেটা এল, রুচি তাকে চড় মারল। তারপর কী একটা হল অশ্রুর। হঠাৎ কান্না পেল যেন। না, তার সঙ্গে ঘরের কোন ঘটনারই যোগসূত্র নেই, এটা স্পষ্ট বুঝতে পারে। অথচ বাইরে থেকে ফেরার পর ভীষণ ভেঙে কাঁদতে ইচ্ছে করছিল তা ঠিকই। সে কি নিজের জন্যে? নাকি হতভাগা মেয়ে ঋতুর জন্যে? বিবি দিল্লিতে। তার চিঠি এসে গেছে যথারীতি। ফিরতে সপ্তাহ দুই দেরি হবে। কয়েকটা খবরের কাগজের কাটিং পাঠিয়েছে। দিল্লিতে তার দলের জয়জয়কার চলছে। অশ্রু ঋতুকে দেখতে গিয়ে জানল, তাকে বিবি ওই সব পাঠিয়েছে। বেচারা ঋতু আনন্দে উৎসাহে যেমন, তেমনি দুঃখ আর হতাশায় টালমাটাল হয়েছে। আহা, এই সুসময়ে তাকে বিছানায় শুয়ে থাকতে হচ্ছে কিন্তু না—অশ্রুর মত সে কাঁদে না—যেন কাঁদতেই জানে না। অশ্রু শুধু অবাক লাগে, ঋতু তো ভালই জানে যে তার ক্যানসার হয়েছে এবং হয়ত, এ বিছানা ছেড়ে আর তার ওঠার সুযোগ হবে না। অথচ সে দিব্যি স্বাভাবিক আছে। এত বোকা তো সে নয়।

এসব ভাবলেও অশ্রুর মন অস্থির হয়। কিদুঃখ, কী দুঃখ এই পৃথিবীতে! কোথাও মৃদুতম সুখ নেই। আর, নিরন্তর দুঃখ দুঃখ করতে করতে অশ্রু সুখের স্বাদ যেন ভুলে যাচ্ছে দিনে দিনে এত। একা আর অসহায় লাগে নিজেকে আজকাল! প্রথম প্রথম মনে হয়েছিল, বিবিদি নেই—তাই। ক্রমশ কিন্তু বুঝতে পারে যে, এই অতর্কিত একাকীত্বের পিছনে অন্য কোন গূঢ় কারণ আছে। সে ঘরে একা থাকলে ছটফট করে বেড়ায়। এটা ওটা নাড়াচাড়া করে, বার বার পুবের ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়ায়, ফের ঘরে আসে, হাতে তুলে নেয় কোন বই বা পত্রিকা, পড়তে ভাল লাগে না, তখন রেডিও খোলে কিংবা রেকর্ড প্লেয়ার বাজাতে বসে। একটু পরে তাও ভাল লাগে না। তখন ফের ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়ায়। পুজোর ছুটির দিনগুলোয় অশ্রু এমনি করে ছটফট করছিল। সে যেন ভেসে চলেছে কোন অনির্দিষ্ট দিকে—উদ্দেশ্যহীন, অসহায়। স্কুলে খুলবে সেই অক্টোবরের শেষে। দিনগুলো যায় না, রাস্তাগুলো দীর্ঘতর হতে থাকে। রেললাইনের ধারের ছাতিম গাছটা থেকে ফুল ফোটার মিষ্টি গন্ধ আসে। সকালে নিচের গাছ বা ঘাসের ওপর পরিচ্ছন্ন রোদ এসে পড়তেই মনে হয়,আজ একটা কিছু ঘটবে—কিন্তু ঘটে না, কিছুই ঘটে না!

ওদিকে ঋতুর অবস্থা দিনে দিনে খারাপ হচ্ছিল।

জ্বর ও যন্ত্রণা বাড়ছিল। মাঝে মাঝে শ্যামল এসে দেখে যায়। শ্যামল তাকে আশ্বাস দেয়, কিছু ভয় নেই—সব ঠিক হয়ে যাবে। এখন শ্যামলের কত কাজ। শীত আসছে। রাজনীতির সুসময় আসন্ন। শীত শ্যামলের সুসময় বয়ে আনছে। খুবই আশাবাদী ও ব্যস্ত চাষা যেমন করে এ সময় মাঠের দিকে তাকায়, শ্যামলের দু'চোখের সেই চাহনি। ঋতু জ্বর ও যন্ত্রণার মধ্যে হেসে হেসে তাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে ছাড়ে না। শ্যামল গায়ে মাখে না।

কামাল বাইরে কোথায় ছিল এতদিন। মহিলা মেসে গিয়ে অশ্রুর কাছে সব খবর জেনে হন্তদন্ত হয়ে হাসপাতালে হাজির হল একদিন। দু'জনের দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে থাকল অন্তত দু'মিনিট। তারপর ঋতুই বলল, 'কেমন আছ?'

কামাল উদ্বিগ্ন মুখে বলল, 'আমি একটুও জানতুম না—বিশ্বাস করো। ইউ পিতে একটা কাজে ছিলুম। মামার ব্যবসার ব্যাপারে যেতে হয়েছিল। কাল ফিরেছি। তারপর...'

ঋতু বাধা দিয়ে বলল, 'জ্যোৎস্না বলেনি আমি একদিন গিয়েছিলুম?'

'বলেছে। কিন্তু তোমার হঠাৎ এ কী হল, ঋতু?'

কথা বলতে কষ্ট কচ্ছিল ঋতুর। শুধু হাসল। এমন হাসি সে ছাড়া পৃথিবীতে খুব কম মেয়েই হাসতে পারে সম্ভবত।... 'কিছু না। এই তো জীবন, কামাল!'

কামাল ব্যস্তভাবে বলল, 'নিকুচি করেছে জীবনের! এম্নি করে তুমি কষ্ট পেয়ে শেষ হয়ে যাবে, আমাকে তা দেখতে হবে! অসম্ভব, এ হয় না। আমি হতে দেব না!'

ঋতুর ঠোটে হাসিটা ফুরোয়নি। তার মন কি এখন কোন সুখে স্নিগ্ধ কোন গর্ব দেখা দিচ্ছিল—যা অশ্রু পায়নি, পেল না? ঋতু বলল, 'মনে হচ্ছে খুব হঠাৎ আমাকে তুমি ভীষণ ভালবেসে ফেললে কামাল! ব্যাপার কী? হাতের বাইরে চলে যাচ্ছি বলে?

কামাল গম্ভীর মুখে বলল, 'তুমি আমাকে ক্ষমা কর, ঋতু। এতদিন বেকার ছিলুম, পরের কাঁধে বসে খাচ্ছিলুম। অনেক ইচ্ছে থাকলেও কিছু করে উঠতে পারিনি। তুমি ভেবেছ, সে সব আমার অবহেলা—কিন্তু বিশ্বাস কর, মন থেকে কোন মুহূর্তেও তোমাকে সরে যেতে দিইনি। তুমি গ্রামের স্কুলে চলে গেলে, তখন আমার দিনগুলো যা গেছে—আমিই জানি!'

ঋতু বাধা দিল।...'ওসব কৈফিয়ত তো আমি চাইনি। তুমি অন্য কথা বল।'

'না—আমার অন্য কথা নেই।' কামাল অস্থির হয়ে বলল।..

'তোমার এই অবস্থাটার জন্যে হয়ত আমিই দায়ী। সাহস ছিল না একটুও। তাই তোমাকে হন্যে হয়ে বেঁচে থাকবার জন্যে ঘুরতে হয়েছে। ইস, সেই তো মামা আমাকে নিলেন, ছ'মাস আগে নিলে...'

ঋতু হাসল।... 'শুনতে বুক ভরে যাচ্ছে সুখে।'

'ঋতু, আমাকে বিশ্বাস কর!'

'যা বাব্বা! বললুম তো, করেছি।'

'কোন্ ডাক্তার তোমাকে দেখছেন?'

'কেন?'

ওঁর সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই।'

'কোন লাভ নেই। থ্রোট ক্যানসার ভাল হয় না। যাকগে, তোমার বাড়ির খবর বল।'

'কামাল ওর মাথায় হাত রাখল। তারপর আস্তে বলল, 'তোমার বাবা-মা খবর পেয়েছেন?'

'না।'

'ইতুদি বা তার স্বামী?'

'না।'

'না! এটা ঠিক হয়নি। আফটার অল, নিজের আত্মীয়স্বজনকে কেউ খবরটা দিল না? ভারি আশ্চর্য তো!'

ঋতু একটু চুপ করে থেকে বলল, 'আমি দিইনি, দেবও না। তবে বিবিদি থাকলে হয়ত দিতেন। উনি তো দলবল নিয়ে দিল্লিতে।'

কামাল হঠাৎ অসহিষ্ণু হয়ে বলল, 'দেখ ঋতু, আমি বরাবর বলেছি এখনও বলছি—এ জাতধর্ম জিনিসটা একটা সাংঘাতিক ব্যাপার মানুষের। তোমার বিবিদি যে তোমাকে হাসপাতালে ফেলে দিয়ে রঙ-তামাসা করতে বাইরে যাবেন, এটা খুব স্বাভাবিকই। যদি তুমি ওঁর স্বজাতি হতে...'

ঋতু ভুরু কুঁচকে অস্ফুট স্বরে বলল, 'কামাল! বিবিদির নিন্দে করার অধিকার তোমার নেই। হুঁ, খুব জাতধর্মের পরিচয় আমার জানা হয়ে গেছে, আর বল না। বিবিদি যা করেছেন, আমার নিজের মা-বাবার পক্ষেও সম্ভব ছিল না।'

ঋতু হাঁপাচ্ছিল। তার কষ্ট বেড়ে যাচ্ছিল। গলায় হাত দিয়ে সে মুখটা ঘোরাল। কামাল অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল। সে ওর পিঠে হাত রাখল। পিঠের চামড়ায় যেন মৃত্যুর ধূসর রঙ এরই মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। মরে যাবে ঋতু! এত ভাল মেয়ে, এমন চমৎকার মন! কামালের চোখে জল এসে গেল।

একটু পরে খুব আস্তে ঋতু বলল, 'এরপর আর কথা বলতেও পারব না। আমি জানি। আর হয়ত সাতটা দিন—তারপর আমাকে বোবা হয়ে যেতে হবে। এক নার্স ভদ্রমহিলা আমাকে দিদির মত যত্ন করেন। হয়ত বলা উচিত ছিল না—কিন্তু খুব মিশুকে আর মনখোলা মেয়ে তো। কী কী লক্ষণ ক্রমশ দেখা দেবে, সব বলেছেন।'

'তোমার কষ্ট হচ্ছে ঋতু, কথা বল না।'

ঋতু ঘুরল। ঠোঁটে হাসি—কিন্তু কপালে যন্ত্রণার রেখা ফুটে উঠেছে। সে নিষ্পলক তাকিয়ে কামালকে দেখতে লাগল।

'ঋতু, কোন ভয় কর না। আজকাল ক্যানসারের অনেক ওষুধ বেরিয়েছে। তাছাড়া রেডিয়াম তো অব্যর্থ। তোমার রেডিয়াম ট্রিটমেন্ট হচ্ছে না কেন?'

'এবার হবে হয়ত। কেন হচ্ছে না আমি জানি না।'

'আমি জানি। সবখানে শালা ঘুষের ব্যাপার। তারপর তুমি...'

ঋতু সকৌতুকে বলল, 'আমি মুসলমান, তাই?'

'কিছু অবিশ্বাস নেই।'

'কামাল, তোমার মনের ওই কাঁটাটা এখনও রয়েছে দেখছি! ওটা নিয়ে আমি তোমার সঙ্গে কত তর্ক করেছি, মনে পড়ে?'

'হ্যাঁ। তুমি বলতে মাইনরিটি কমপ্লেক্স!'

ঋতু হাসতে গিয়ে কেশে ফেলল এবং ফের যন্ত্রণায় গলায় হাত চেপে ঘুরল।

সেই সময় অশ্রু এসে গেল। প্রতি বিকেলে সে আসে। না এসে থাকতে পারে না। এসেই বলে উঠল, 'মিঃ কামাল, ওর কিন্তু কথা বলা একদম বারণ।'

কামাল কাঁচুমাচু মুখে বলল, 'হ্যাঁ—কষ্ট হচ্ছে।'

অশ্রু বলল, 'কতক্ষণ এসেছেন?'

'বেশ কিছুক্ষণ। আপনার ওখান থেকেই তো চলে এলুম। ঢুকতে দিচ্ছিল না। সময় হলে, তবে দিল। আচ্ছা দিদি, ওকে রেডিয়াম স্টীক দিচ্ছে না কেন?'

অশ্রু বলল, 'একেবারে সার্টেন না হয়ে রেডিয়াম ট্রিটমেন্ট তো করে না। এখনও ওকে আন্ডার অবজার্ভেশন রেখেছে। দুম করে কিছু করে বসলে তো উল্টে ক্ষতি হয়ে যাবে।'

কামাল একটু আশ্বস্ত হয়ে বলল, 'তাহলে ক্যানসার কিনা এখনও সার্টেন নয়?'

'আপনি বরং ডাক্তার পালিতের সঙ্গে কথা বললে বুঝতে পারবেন।'

'উনি কি আছেন এখন?'

অশ্রু হাসল।... 'আমি কেমন করে জানব? আপনি জিজ্ঞেস করুন না ওদের।'

কামাল তক্ষুণি বেরিয়ে গেল। অশ্রু ডাকল,'ঋতু!'

ঋতু ঘুরল।

'কেমন আছিস আজ? গলাব্যথা আছেই, দেখছি।' বলে অশ্রু তার বুকে হাত বোলাতে থাকল।

ঋতু বলল, 'কামালকে তুমি তাড়িয়ে দিলে মনে হল?'

'দিলুম। ছেলেটা যেন কীরকম। আমার ওখানে গিয়ে কী সব বড় বড় কথা বলতে শুরু করল, খুব খারাপ লাগছিল। বলে—অসুখ হয়েছে তো ওর বাবা-মায়ের কাছে দিয়ে এলেন না কেন? রাস্তার মেয়ের মত হাসপাতালে ফেলে দিলেন কেন?'

'কামালটা বড্ড কমপ্লেক্সে ভোগে।'

'যাক গে, রুচি আসবে বলেছে আজ।'

'আমার ভাগ্য।'

'রুচি আসাটা ভাগ্য বই কি! ও আজকাল ফিল্মের নায়িকা হতে চলেছে, ডাঁট বেড়ে যাচ্ছে। সপ্তাহে একটা দিনও তোকে দেখতে আসার সময় করতে পারে না? আর কী যে বদলেছে, ভাবা যায় না।' বলে অশ্রু হাসতে লাগল।

ঋতুও একটু হেসে বলল, 'হঁ—লক্ষ্য করেছি। গত শনিবার এসেছিল, ওর সেই তাপসবাবুর সঙ্গে।'

দু'জনেই কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। কিন্তু মন চুপচাপ থাকবার নয়। দু'জনেই রুচির কথা ভাবছিল। আগে ভাবত, রুচির অনেক সমস্যা আছে। এখন ভাবে, রুচি এত উঁচুতে বাস করে যে, কোন সমস্যাই

ওকে ছুঁতে পারে না। আর, এখন কী চমৎকার দিনগুলো না কাটাচ্ছে রুচি! হয়ত, এটাই ঈশ্বরের বিচার বিবেচনা। রুচির স্বাস্থ্য সৌন্দর্য তো ঈশ্বরেরই দান।

এক সময় ঋতু বলে উঠল, 'রুচিকে আমার ভীষণ হিংসে হয়।'

অশ্রু বলল, 'আমার কিন্তু ওকে আজকাল আগের মত ভাল লাগে না। এ তো জানা কথাই—মেস ছেড়ে চলে যাবার দিন গুনছে রুচি। হয়ত কালই আমি এসে তোকে সে সুখবর দেব, দেখবি ঋতু।'

ঋতু দেয়ালের দিকে তাকিয়ে বলল, 'হারাধনের দশটি ছেলের মত একে একে সব হারাবে। বেশ লাগে ভাবতে। আমি তো হারিয়েছিই, রুচি হারাতে যাচ্ছে। বিবিদিও তাই—রইল বাকি অশ্রুকণা সরকার। তারপর?'

'কথা বল না, ব্যথা বাড়বে।' বলে অশ্রু ওর চোখে চোখে তাকিয়ে রইল। 'বিবিদি হারাবে কোথায়? ঘর তো তারই। ফিরে আসতেই হবে। কিন্তু আমার ওখানে আর সহ্য হচ্ছে না রে! হাঁফিয়ে উঠেছি।'

'কেন?'

অশ্রু সে প্রশ্নের জবাব দিল না। বলল, 'আমি আজ একটা তাড়াতাড়ি চলে যাব, ঋতু। একটু জরুরি কাজ আছে।'

'টিউশনির খোঁজ পেয়েছে নিশ্চয়?'

'না। সে অন্য। টিউশনি আর আমি করব না ভাই! অত খেটে কী হবে?'

এই সময় কামাল ফিরে এল। একটা টুল টেনে নিয়ে বসে বলল, 'সব মামদোবাজীর ব্যাপার! ডক্টর পালিত বললেন, ওঁর প্রাইভেট চেম্বারে একবার দেখা করতে।'

'যাব 'খন।' বলে অশ্রু উঠে দাঁড়াল।.. 'ঋতু, আমি চলি। কাল আবার আসছি। তুই কিন্তু বেশি কথা বলবিনে। মিঃ কামাল, প্লিজ...'

কামাল ঘাড় নেড়ে বলল, 'ঠিক আছে।'

অশ্রু বেরিয়ে গেলে ঋতু বলল, 'কাল জ্যোৎস্নাকে একবার আসতে বলবে? ভাবিসায়েবাকেও বলতে পার। অনেকদিন দেখিনি ওঁদের।'

কামাল ওর কপালে হাত বুলিয়ে বলল, 'থাক। যা করার করব, ভেবো না। আমি এসে পড়েছি যখন, তখন আর তুমি আগের মত অসহায় নও।'

ঋতু চোখ বুজল। তার ঠোঁট ফাঁক হল একবার, কী যেন বলতে চাইল—কিন্তু বলল না। তার মুখ দেখে মনে হচ্ছিল, পৃথিবীর উদ্দেশে বলার মত তার আর একটিও কথা নেই।

কামাল আরও কী সব বলে যাচ্ছিল তার কানে ঢুকছিল না—সে অন্য কিছু ভাবছিল। ছেলেবেলা, কিংবা প্রথম যৌবনের অনুভূতিগুলো—অনেক সব স্বপ্ন। আশ্চর্য, কত আগে দেখা কোন স্বপ্ন এখনও মনে থাকে মানুষের!...

রুচি অফিস থেকে তাপসের সঙ্গে বেরিয়েছিল। কথা ছিল, ঋতুকে দেখতে যাবে। কিন্তু বাইরের বড় রাস্তায় তাপসের গাড়িটা এসে পড়তেই রুচি মত বদলাল। আকাশ ঝকঝকে আজ। মাঠের দিকে খোলামেলায় অনেক মানুষ ঘুরছে। রুচির ইচ্ছা হল, কোথাও সন্ধ্যা অবধি বসে থাকবে। তাপস রেড রোড হয়ে ঘুরে চলল। তারপর একখানে রাস্তার পাশের মাঠে গাড়ি রাখল।

একটু এগিয়ে ঘাসের ওপর বসল ওরা। তাপস আঙুলে চাবির রিঙ ঘোরাতে ঘোরাতে বলল, 'তরুণকে বলেছ নাকি?'

রুচি শান্ত চোখ তুলে বলল, 'কী?'

'তোমার বাইরে যাওয়ার কথা?'

'ছুটি?'

'হ্যাঁ।'

'না।'

তাপস শশব্যস্তে বলল, 'সে কী! সব প্রোগ্রাম যে ভেস্তে যাবে!'

'যা বাব্বা! আমি তো যাচ্ছিই!'

'কিন্তু...'

'আমার চাকরি যাবে না।'

তাপস হাসতে লাগল।...'চাকরি-বাকরি নিয়ে তুমি কোন সময়ই মাথা ঘামাও না, এটাই তোমার চরিত্রে একটা মহৎ গুণ। রিয়্যালি, দায়িত্ববান লোকদের আমার কেন যেন বড্ড ঘেন্না হয়!'

রুচি বাঁ কনুই মাটিতে রেখে আধশোয়া ভঙ্গিতে বলল,'অশ্রুদি ঋতুকে বলবে আমি যাচ্ছি—অথচ গেলুম না। এও একটা ইররেসপনসিব্লিটির পরিচয় অর্থাৎ আমার চরিত্রের মহৎ গুণ। ভ্যাট! আমার কী যে হচ্ছে আজকাল!'

তাপস ঘড়ি দেখে বলল, 'এখনও সময় ফুরিয়ে যায়নি। কিন্তু তোমার বান্ধবী—আই মিন্, ঋতু অদ্ভুত মেয়ে!'

'কেন?'

তাপস একবার কোন জবাব দিল না। সে সিগ্রেট ধরিয়ে বলল, 'আজ ওয়েদারটা এত ভাল হবে, আশাই করিনি। তাহলে দুপুর থেকে মাল-ফাল খাওয়া যেত। বাই দা বাই, রুচি, বরুণদা সেই স্নিগ্ধা গাঙ্গুলিকেই সিলেক্ট করেছেন—তোমাকে বলতে ভুলেছি! স্কিন, ভয়েস সব কিছুতে চমৎকার উতরেছে।'

রুচি হাসল। 'কিন্তু সব ইম্‌পরট্যান্ট রোলে খালি নতুন মুখ নিলে ডিসট্রিবিউটর টাকা দেবে তো?'

'আলবাত দেবে। হিরোকে দেখে দেবে।'

'হিরো এখনও নিমরাজী।'

'রাজী হয়ে যাবে। ভোম্বলদাকে লাগিয়েছি। দরকার হলে স্ক্রিপ্ট বদলে দেবে ওঁর ইচ্ছে মত।'

'কিন্তু আমাকে মানাবে তো?'

রুচির মুখের দিকে তাকিয়ে তাপস শিশুর মত শুধু হাসল।

রুচি বলল, 'হেসো না। দিস ইজ সিরিয়াস।'

'আরে বাবা। মাঝে তো দুটো দিন। তারপর দেখবে সুবর্ণরেখার বালিতে তুমি হিরোর সঙ্গে লাভ গেম নিয়ে ছুটোছুটি করছ। ফ্রেশ হিরোইন আজকাল সব হিরোই চায়। ওকথা ছাড়, আমি খালি ভাবছি তরুণ শালা আবার কোন অজুহাতে বাগড়া দেয় নাকি! আয়ারটাকে নিয়েও ঝামেলায় পড়েছে। কথাবার্তায় যা বুঝলুম, আয়ারকে পটাতে তরুণ তোমাকেই...'

রুচি ঠাণ্ডা চোখে তাকিয়ে বলল, 'তোমার রসিকতা প্রশংসা করতে পারব না।'

তাপস একটু অপ্রস্তুত হল। 'নাঃ, এস আকাশ দেখা যাক।'

একটু পরেই রুচি হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। ...'ওঠ। ঋতুকে দেখতে যাই। বেচারা আমার অপেক্ষা করছে।'

'যাবে?'

'তোমার আপত্তি থাকলে যাবে না। আমি ট্যাকসি করে চলে যাব।'

দু'জনে গাড়িতে গিয়ে বসল। গাড়ি চলতে থাকল। ক্যানসার হাসপাতাল পর্যন্ত আর কেউ কোন কথা বলল না।

অশ্রু ইলিয়ট রোডে মিস হেওয়ার্থের কাছে গিয়েছিল। ভদ্রমহিলার বয়স পঞ্চাশ পেরিয়েছে। কিন্তু চেহারায় বয়সের ছাপ একটুও পড়েনি। শক্ত-সমর্থ গড়ন, একটু তামাটে রঙ। ওঁর মা ছিলেন মাদ্রাজী, বাবা ক্যানাডিয়ান। নিজের উদ্যমে এই এলাকায় একটা কিন্ডারগার্টেন স্কুল করেছেন। বিয়ে করেননি—কেন করেননি, তা জানার উপায় নেই। অশ্রু শুনেছিল, উনি একজন টিচার চান—মাইনে সরকারি স্কুলে চেয়ে অনেক বেশি। অবাঙালি ব্যবসায়ীদের ছেলেমেয়েরা ওঁর স্কুলের পড়ে। প্রচণ্ড বেশি মাইনে দেয়। মিস হেওয়ার্থ স্কুলের পরিচালিকা হিসেবেও জাঁদরেল মহিলা।

অল্পস্বল্প পরিচয় ছিল অশ্রুর সঙ্গে। সেই সূত্রে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছিল সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায়। অনেকক্ষণ কথাবার্তা হল। ভীষণ ভদ্র মিস হেওয়ার্থ। কিন্তু অশ্রু বুঝতে পারল না, তাকে নেবেন কি

না। বললেন, পরে খবর দেবেন। তবে ফরম্যাল ইন্টারভিউতে ডাকা হবে। তাছাড়া জানাতে ভুললেন না যে, ওঁর স্কুলের টিচারেরা ওয়েস্টার্ন পোশাক পরেন। সুতরাং অশ্রুকে ভারতীয় পোশাকের ব্যাপারে আগে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

সারা পথ অশ্রু সেটাই ভাবছিল। তার এই শরীরটা গাউন পরলে কেমন দেখাবে কিছুতেই চোখের সামনে স্পষ্ট হচ্ছিল না। পরে বাসায় ফিরে একা ঘরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে একটু চেষ্টা করল সেই চেহারাটা ফোটানোর। শুধু ব্লাউজ আর শায়া পরা অবস্থায় দেখল নিজেকে। হাসি পেল। খুব হাসল আপন মনে। তারপর রাগ হল তার। কী অদ্ভুত প্রস্তাব! দেশী খ্রীস্টানরা এতদিনে ভারতের পরিবেশে অনেক মানিয়ে নিয়েছে, কিন্তু অ্যাংলো ইন্ডিয়ানরা পারছে না। অনেকেই তাই বাইরে চলে যাচ্ছে।

রাগে বিরক্তিতে অশ্রু অস্থির হল।কেন তার মন থেকে এখনও টাকার লোভ যাচ্ছে না? বেশি টাকা নিয়ে সে কী করবে? সেই সময় দরজায় ঘণ্টা বাজল। অমনি দ্রুত সে শাড়িটা পরে নিল। তারপর দরজা খুলে দেখল, বোরখাপরা এক ভদ্রমহিলা আর একটি ছেলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। অশ্রু বলল, 'কাকে চান?'

ছেলেটির বয়স কুড়ির এদিকেই। লাজুক ছিমছাম প্রকৃতির। বোরখাপরা মহিলার দিকে সে একবার তাকিয়ে নিয়ে বলল, 'ঋতু নামে কেউ এখানে থাকে?'

অশ্রু তাই আশা করেছিল। একটু হেসে বলল, 'তোমরা ভেতরে এস ভাই।'

ঘরে ঢুকে মহিলাটি একটু ইতস্তত করে একটা মোড়ায় বসলেন। বোরখার কালো পটভূমিতে তার মুখটা খুব ধবধবে সাদা দেখাচ্ছিল। মুখের পর্দাটা মাথার ওপর দিয়ে তুলে দিয়েছেন অনেক আগেই। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ঘরের ভিতরটা খুঁটিয়ে দেখছেন তিনি। কোন কথা বলছেন না। অশ্রু মুখটা লক্ষ্য করছিল। অনেকদিন ধরে ঢাকা থাকলে যেমন ঘাসের সবুজ রঙ ফিকে হতে হতে সাদা হয়ে যায়, এও তাই। না, তার চেয়েও বেশি। এ মুখ কোন জীবিত মানুষের হতে পারে না। 'ঋতু, এখানেই থাকে বুঝি?' বলে মহিলা ফের ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সবকিছু দেখতে থাকলেন। অশ্রুর মনে হল, উনি ঋতুর কোন পরিচিত চিহ্ন খুঁজছেন। সে ভাবছিল, ঋতুর কোন খবরই এঁদের জানা নেই। এখন কীভাবে কী বলবে-টলবে, সেই একটা সমস্যা।

ছেলেটি বলল, 'ঋতু খালা নেই?' (খালা মানে মাসি)

অশ্রু মাথা দোলাল। তারপর ভদ্রমহিলার উদ্দেশে বলল, 'আপনাকে ঠিক চিনলুম না কিন্তু!'

এবার উনি যখন মুখ ফেরালেন, তখন চোখের কোনাটা একটু ছলছল করছে যেন। বললেন, 'আমি ঋতুর মা।'

ঋতুকে এতদিনে তার মা দেখতে এসেছে, ঋতুর এই ভয়ঙ্কর দুর্দিনে একটা চমৎকার পুনর্মিলনের সম্ভাবনা, এইসব কথা কিংবা অন্য কিছু আচমকা অশ্রুর মনে ধুড়মুড় করে এসে পড়ল এবং নিজের মধ্যে একটা আবেগ অনুভব করল সে। পরক্ষণে একটু রাগও এসে গেল তার। বলতে ইচ্ছে করল—এতদিন কী করছিলেন?

ঋতুর মা একবার ঠোঁট কামড়ে নিজেকে যেন সামলে নিলেন। তারপর খুব আস্তে বললেন, 'ও আপিস থেকে ফেরেনি এখনও?'

'কে? ঋতু?' বলে অশ্রু একটু অবাক হল। এঁরা তাহলে ঋতুর কোন খবরই রাখেন না। এঁদের ধারণা, ঋতু কোথাও চাকরি-বাকরি করে এবং এই বাড়িটায় থাকে।

ঋতুর মা সপ্রশ্ন তাকিয়ে আছেন। অশ্রু টের পেল, এবার তাকে ঋতুর ভয়ঙ্কর খবরগুলো দিতেই হবে এবং কেমন করে দেবে, তার প্রতিক্রিয়াই বা কেমন হবে, তা সে আঁচ করতে পারছিল না। একটু ইতস্তত করে সে বলল, 'ঋতুর শরীর ভাল নেই। তাই—'

বাধা দিয়ে ঋতুর মা কেমন হাসলেন। 'ওর শরীর কবে আর ভাল থাকে? সেই এতটুকুন থেকে কেবল রোগ, রোগ আর রোগ! ডাক্তার কবরেজ করতে করতে তো আমরা চিরটা কাল হাল্লাক (ক্লান্ত) হয়ে গেছি মা। তবে মেয়ের তেজের কথা আর বল না। কী তেজ, কী রাগ! আর বাবা যদি বলেন,

এপথে হাঁটবে, ও যাবে ঠিক তার উল্টো। বরাবর ওই ধাত। এত মারধোর খেয়েছে বলার নয়, মা। কলেজে পড়ার সময়ও বাপের সঙ্গে মুখোমুখি করেছে —আর বাপও তো এক নমরুদ বাদশা! (পৌরাণিক বিধর্মী সম্রাট—মিশরের ফ্যারাও) যাই বল মা, ওই বয়সে মেয়ের গায়ে হাত তুলতে আছে? যে কাল পড়েছে, আসমান হয়েছে জমিন (মাটি), আর জমিন হয়েছে আসমান। ঋতু যে বাপের গায়েই পাল্টা হাত তোলেনি সেই এক ভাগ্যি ওনার! তুমিই দেখ তো মা বিচার করে—দোষটা মেয়ের না বাপের। এদিকে তুমি মেয়েকে বোরখা ছাড়িয়ে স্কুল-কলেজে পড়াবে, আবার তার পায়ে দড়ি বেঁধে সর্বক্ষণ আড়ি পেতে থাকবে—ওই দ্যাখ, কোথায় কী করলে! আমার ছোট মেয়ে ইতুর বেলায় তুমি কী কেলেঙ্কারি না করলে! তাকে পাস দিতে পাঠিয়েছ, রাস্তায় নামতে দিয়েছ—এখন যদি বয়সের বশে কোনদিকে মন টলিয়েই ফেলে—বেশ তো! সেখানেই বিয়ে সাদী দিয়ে দাও। তা সে ছেলেকে মিয়াসায়েবের পছন্দ হল না। বলে, ছ্যা ছ্যা, ওরা গাঁয়ের চাষাভুষো পরিবার—ওখানে বিয়ে দিলে জাত থাকে, না বংশ-মর্যাদা থাকে? দিলে না মা। তারপর করলে কী, ইতুকে দোতলার ঘরে তালা লাগিয়ে বন্দি করলে। তখন যা হওয়ার হল। জানলার রড খুলে পাইপ বেয়ে মেয়ে পালাল। নে! এখন জাতবংশ নিয়ে ধুয়ে ধুয়ে খা!'

একটু চুপ করে থেকে ফের ঋতুর মা বললেন, 'তা ইতু এখন ভালই আছে। ছেলেটা কলেজে মাস্টারি করে। ছেলেপুলেও হয়েছে। লুকিয়ে চিঠি লেখে আমাকে। কিন্তু হারামজাদী কী দিয়ে গড়া মা? তুমিই বলো! আমি ঘরবন্দি মেয়েছেলে—আমি কী করতে পারি? বাড়ির কর্তা যেদিকে যাবে, আমার সেদিকে যাওয়া ছাড়া কি গতি আছে? আচ্ছা—গেলি, গেলি, বাপ-মায়ের মুখে তুইও না হয় কালি ছিটোলি—কিন্তু খোঁজখবরটা তো দিবি মাকে। মায়ের জান কি মানে মা? না—মানতে চায়?'

ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল ঋতুর মা। অশ্রু কি বলবে, সান্ত্বনা দেবে কীভাবে, বুঝতে পারছিল না। গভীর অস্বস্তিতে পড়ে গেল সে। চোখের জল হাতের রুমালে মুছে ঋতুর মা বললেন, 'আর মন মানল না। অনেক খোঁজখবর করে পার্কসার্কাসের জ্যোৎস্না বলে একটা মেয়ের কাছে ওর ঠিকানা পেলুম। তা আমি তো কলকাতায় আছি না সাগরে আছি, কিছুই চিনি না জানি না। তাই আমার ফুফুতো (পিসতুতো) বোনের নাতিকে বলে কয়ে চুপিচুপি চলে এলুম, মা। একবার মেয়েটাকে চোখের দেখাও অন্তত দেখে যাই।'

অশ্রু আস্তে বলল, 'ওকে আর বাড়ি ঢুকতে দেবেন না আপনারা?'

ঋতুর মা করুণ মুখে তাকালেন। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথাটা দু'পাশে দোলালেন। তারপর বললেন, 'বাড়ি কি আমার মা? আমি তো বাঁদীর বাঁদী! ঋতুর কি আসতে দেরি হয়? আমাকে আবার জলদি ফিরতে হবে। ফুফুতো বোনের বাসায় যাচ্ছি বলে বেরিয়েছি। এতক্ষণে হয়ত বুড়ো রেগে টং হয়ে বসে আছে।' বলে উনি ছেলেটির দিকে তাকিয়ে হাসবার চেষ্টা করলেন।

অশ্রু জিজ্ঞেস করল, 'ঋতুর বাবা কী করেন?'

'সরকারি চাকরি করত। এখন রিটায়ার করেছে। বলছি না—ওই তো হয়েছে আরও জ্বালা। অ্যাদ্দিন দশটা-পাঁচটা বেশ শান্তিতে কাটাতুম। এখন সারাক্ষণ বাড়ি বসে বকবক আর হাজারটা ঝামেলা বাধানো। আর বলবে না। যত দিন যাচ্ছে, ওনার ন্যাকামি যেন বাড়ছে। আর ওই খবরের কাগজ হয়েছে কাল। সক্কালে মিয়ার কাগজখানা পড়া হল—তারপর লেকচার শুরু হল। দেশ জাহান্নামে যাচ্ছে, মেয়েরা সব বেশ্যা হয়ে যাচ্ছে, ধর্মটর্ম মানছে না কেউ, পয়গম্বর যা যা বলছিলেন সব ঠিকঠাক মিলে যাচ্ছে! মানুষের চোখের পট্টি (লাজলজ্জার পর্দা) নেই। দিন রাত হয়ে পড়ছে। সব লম্পট মাতাল জেনাখোরে (ব্যভিচারি) দেশ ভরে যাচ্ছে! এমনি সব বকবকানি! হুঁঃ সবাই জাহান্নমে আর উনি চলেছেন বেহেশতে!'...বলে ঋতুর মা হেসে ফেললেন। পরক্ষণে গম্ভীর হয়ে বললেন, 'কী জানি, মাঝে মাঝে ডর লাগে—বুড়ো পাগল-টাগল হয়ে যাবে না তো? মাথার চুল ছিঁড়ে দাপাদাপি করে চেঁচায়—কী ভুল করেছিলুম গা ইসলামের শরীয়ত না মেনে! কেন মেয়ে দুটোকে লেখাপড়া শিখতে দিয়েছিলুম গা বেআব্রু করে! ধিক আমাকে, শত ধিক্! আমি বলি—লেখাপড়া তো আরও কত মেয়ে শিখছে—তারা তো এমন করে না কেউ। না কি আমার জঠরের দোষ?'

কান্নার আভাস টের পেয়ে অশ্রু তাড়াতাড়ি বলল, 'আপনাদের জন্যে চা করি, বসুন। তোমার নাম কি ভাই?

ঋতুর মা হন্তদন্ত হয়ে বলল, 'না মা—থাক। ফের একদিন এসে খাব দেরি হয়ে যাচ্ছে। না জানি কী আছে কপালে—এতক্ষণ দেরি দেখে হয়ত লাফালাফি শুরু করেছে।'

ছেলেটি তার জবাবটা শান্তভাবেই দিল।...'আমার নাম ফারুখ।'

অশ্রু তখনও ভাবছে, ঋতুর খবরটা দেওয়া উচিত কি না। ঋতুর মা উঠে দাঁড়ালেন। তারপর এদিক ওদিক তাকিয়ে ব্যস্তভাবে বললেন, 'ঋতু কোন্ বিছানায় থাকে মা? ওর কাপড়-চোপড় জিনিসপত্রই বা কোন্গুলো?'

বিবির ঘরে তালা দেওয়া। কিন্তু চাবি অশ্রুর কাছে আছে। সে ইশারায় সেদিকটা দেখিয়ে বলল, 'ওই ঘরে।'

অমনি ঋতুর মা ছুটে গিয়ে বন্ধ দরজাটা ফাঁক করার চেষ্টায় মুখটা ঠেসে ধরল কপাটে। সরু একচিলতে ফাটল দিয়ে সে মেয়ের বর্তমান জগৎটা দেখবার চেষ্টা করতে থাকল। ফারুক বলল, 'চাবি বুঝি ঋতুখালার কাছে?'

অশ্রু মাথা দোলাল—তার অর্থ হ্যাঁ বা না দুটোই হতে পারে। সে নার্ভাস হয়ে পড়েছে ততক্ষণে। তার সূক্ষ্ম নার্ভগুলো অজস্র অপরিচিত চাপে যেন থরথর করে কাঁপছে। একটুকরো পাথরের মত চুপচাপ দাঁড়িয়ে সে মহিলাকে দেখছে। উনি এবার মুখ ফিরিয়ে একটু হাসলেন, কিন্তু চোখটা ভিজে। বললেন, 'রোগা মেয়ে—কিন্তু সাধ-আহ্লাদের অন্ত ছিল না। বাজারে যখন যে ফ্যাশানের পোশাক উঠেছে, তাই পরা চাই। তখন ওর বাপও ছিল আলাদা মানুষ, যত বদরাগী হোক, শেষ অব্দি কিনে আনত। বলত, মেয়েটা আমার দুনিয়া গিলে খেতে এসেছে। এত লোভ অত সাধ-আহ্লাদ ভাল না, ভাল না। তা হ্যাঁ গা মেয়ে, মাইনেকড়ি ভাল-টাল পায় তো ঋতু? খুব ফ্যাসান করে সেজেগুজে থাকতে অবশ্যি বড় আর চাইত না। ইদানীং সাদাসিধেই থাকত। উল্টো হচ্ছিল আমার ছোট মেয়ে। কী সাজের ঘটা, কী সাজ। হ্যাঁ গা মেয়ে, শরীর স্বাস্থ্য এখন নিশ্চয় আগের চেয়ে ভাল-টাল হয়েছে—কী বল! খাঁচা থেকে বেরিয়েছে—নিজে স্বাধীন, যা খুশি খাচ্ছে পরছে!'

অশ্রু ভাবছিল, ঋতুর কী কী জিনিসপত্র ওঘরে আছে এখন। আছে তো প্রায় সবই। বিছানা, কাপড়-চোপড় কিছু, বাক্স—কত কী! মনে হচ্ছে, ঋতুর মা দরজাটা খোলা পেলে ঝাঁপিয়ে পড়বেন ওগুলোর ওপর।

ঋতুর মা হঠাৎ মিনতিভরা চোখ তুলে বলে উঠলেন, 'আমার মেয়েরই তো ঘর! কোনকিছু দিয়ে খোলা যায় না মা একবার?'

অশ্রু গম্ভীর হয়ে বলল, 'না।'

'ফারুক, ঘড়ি দ্যাখ না ভাই! খুব দেরি হল না কী! নয়ত আরও একটু অপেক্ষা করতুম। আমার পা দুটো যে এঁটে বসছে রে! এত কষ্ট করে লুকিয়ে এসে মিছিমিছি ফিরে গেলে সারারাত ঘুমোতে পারব না যে!'

অশ্রু আর চুপ করে থাকতে পারল না। এবার সে মরিয়া হয়ে বলল, 'শুনুন—ব্যাপার হচ্ছে, ঋতুর অসুখ। তাই ও কিছুদিন থেকে হাসপাতালে আছে।'

অন্তত এক মিনিটের জন্য পৃথিবীর সবচেয়ে স্তব্ধ একটা সময় ঘরের ভিতর জেগে থাকল। তারপর ঋতুর মা হতাশভাবে দু'পাশে মাথাটা দুলিয়ে বলল, 'জানি—আমি জানতুম! তাই তো চোখে ঘুম নেই—খালি ভেবেছি, মেয়ে আমার কোথায় হয়ত রাস্তায় পড়ে আছে এখন, মরণকালে এক ফোঁটা পানি পায়নি মুখে। হুঁ—যা ভাবতুম, তাই হয়েছে!'

ফারুক বলল, 'কোন্ হাসপাতালে? কী অসুখ হয়েছে খালার?'

অশ্রু জবাব দিল, 'ক্যানসার হাসপাতালে, হাজরার কাছে।'

'ক্যানসার!' ফারুক শিউরে উঠল। 'ঋতুখালার ক্যানসার হয়েছে!'

ঋতুর মা চেরা গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন—তারপর হু-হু করে কেঁদে অশ্রুর খাটের ওপর বসে পড়লেন। অশ্রু এগিয়ে গিয়ে তাঁর পিঠে হাত রাখল।..

*　　　　*　　　　*

সে-রাতে ভাল ঘুম হয়নি অশ্রুর। অজস্র এলোমেলো স্বপ্ন দেখছিল সে, তার মধ্যে একটা বেশ অদ্ভুত। একটা শূন্য প্যারাম্বুলেটার ঠেলে নিয়ে সে এগোচ্ছে। কিন্তু রাস্তাটা এত বিশ্রী যে, এগনো যাচ্ছে না। কখন একবার রেলগাড়ির শব্দে ঘুম ভেঙে যায়। তারপর টের পায়, ঋতুর মায়ের কান্নাটা তার মাথার ভিতর কোথাও ঘুরছে—চাপা আর গভীর। সেই কান্নাটা একটা সুরের মত—এবং যখন সে ঘুমোল ফের, স্বপ্নে দেখল বিশাল গীর্জার হলে কারা প্রার্থনা করছে, কখনও শুনল কোথাও কারা খ্রীস্টমাস ক্যারল গাইছে। আর দেখল ফাদারকে, মাইকেলটা ভিড়ে মিশে গেল। সে চেঁচিয়ে ডাকবে ভাবল। কিন্তু তখনই মনে হল গীর্জার মাথা থেকে বিশাল পেতলের ক্রুশটা ভেঙে পড়ছে, সে চীৎকার করে সবাইকে বলছে—দেখুন, দেখুন, ক্রুশটা পড়ে যাচ্ছে যে! কিন্তু সবাই এত নির্বিকার যে, কেউ তার কথা শুনছে না।

নয়

সেদিন ঋতুকে দেখতে উঁকি মেরে অশ্রু পিছিয়ে আসে। ঋতুর মা, ফারুক, আরও কয়েকজন স্ত্রীলোক ও পুরুষের বড্ড ভিড়।

নিশ্চয় ঋতু মনে বল পেয়েছে। হাজার হোক, নিজের লোক ওরা। বেচারার একটা হিল্লে হল দুঃসময়ে। সেদিন সে ঋতুর কাছে আর গেল না। ফের গেল পরের দিন। সেদিনও একই দৃশ্য। অশ্রু ফিরে এল। বিবিকে চিঠিতে সব জানাল।

বিবির জবাব এল শিগগীর। ভালই হয়েছে এটা। বিবিও নিশ্চিন্ত বোধ করছে। কেন না, কবে নাগাদ কলকাতা ফিরবে, কিছু ঠিক নেই। প্রচুর আমন্ত্রণ পাচ্ছে—দিল্লিতে শুধু নয়, বাইরেও। বোম্বে থেকেও ডাক এসেছে। বোঝা যায়, বিবি এসব চান্স ছাড়বে না।

অশ্রুও ঋতুর ব্যাপারে অনেকটা হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিল এবার। তবে সপ্তায় দু'একদিন ওকে না দেখে আসাটাই বা কেমন দেখায়? ঋতু কী ভাবছে কে জানে! তাই একদিন সকালে ভাবল, আজ বিকেলে একবার যাবে।

সেই সময় হঠাৎ তাকে অবাক করে সৌমেনের স্ত্রী মধুছন্দা হাজির। অশ্রু তার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল কয়েকটা মুহূর্ত। তাকে এখানে দেখার কথা সে স্বপ্নেও ভাবেনি।

মধুছন্দার মধ্যে একটা ব্যস্ততার ভাব ছিল। সে যেন আগের চেয়ে সুন্দর হয়েছে। গাল ভরাট চোখের নিচে একটা ঘুম ঘুম আচ্ছন্নতা—কিন্তু দৃষ্টি উজ্জ্বল। অথচ উল্টোটাই আশা করেছিল অশ্রু। এবং একটা বিশ্রী পারিবারিক ঘটনার পরও কী করে এই উজ্জ্বলা আসতে পারে সে বুঝতে পারছিল না।

অশ্রু চাঞ্চল্য চেপে বলল, 'এস এস। ভাবছিলুম, সময় পেলেই একদিন গিয়ে দেখে আসব—'

মধুছন্দা বলল, 'থামুন! আপনি যা যাবেন, তা ঢের জানা আছে।'

অশ্রু হাসল।....'অবশ্য তোমার ঠিকানাও জানতুম না!'

'সে এমন কিছু শক্ত কাজ নয়। ফোন গাইড খুললেই বাসন্তী ট্রেডার্স দেখতে পেতেন। বাড়ির নিচতলায় দোকান। ডানদিকে গেট।' বলে মধুছন্দা ঘরের ভিতরটা এগিয়ে পিছিয়ে দেখতে থাকল। ডাইনিংটাও উঁকি মেরে দেখল। তারপর ফের বলল, 'আপনি একা আছেন যে? আর সব কোথায়?'

'আর সব কে?'

'আপনার ফ্যামিলির লোকেরা?'

অশ্রুর মনে পড়ল, মধুছন্দাকে তার সর্বশেষ ব্যাপার কিছুই বলেনি কোনদিন। বলার মত সুযোগও

আসেনি। আর বলেই বা কী হত? একটা পরিবারচ্যুত কিংবা একলা স্ত্রীলোক তার মতই কিছু স্ত্রীলোকের সঙ্গে জোট বেঁধে মেসে থাকে, এতে খুব গর্ব করার ব্যাপার কী থাকতে পারে? অশ্রু তার হাত ধরে টেনে বসাল।... 'অত কৌতূহল সব সময় ভাল নয়। বস। তারপর তোমার খবরাখবর বল।'

'বুঝতেই পারছেন, আমি এখনও বাপের বাড়ি আছি।'

'পারছি না।'

অশ্রুর হাসি মধুছন্দাকে হাসাতে পারল না। সে বরং খানিকটা গম্ভীর হল এবার। বলল, 'না বোঝার কী আছে? আমি আর ওখানে যাব না। মা-বাবার অবশ্য অন্য কথা। কিন্তু দাদা আমার পক্ষে। মেয়ে হয়ে জন্মেছি বলেই কারও ইচ্ছে মত নাচতে হবে এর মানে নেই।'

'নিশ্চয় নেই।'

'আপনি লাইটলি নিচ্ছেন, অশ্রুদি।'

অশ্রু মাথা দুলিয়ে বলল, 'মোটেই না! সিরিয়াসলি নিচ্ছি।'

'এখন শুনুন, কেন এলুম। দাদা বলছে, যা হবার হয়েছে—তুমি কোনদিকে মন না দিয়ে পড়াশুনা করে প্রাইভেটে পরীক্ষা দে। এম. এ অব্দি তোকে পড়তেই হবে। আমাদের বংশে কেউ কোনদিন বি. এ-টাও পাস করেনি। দাদা বলছে, আমিও ব্যবসার মধ্যে অল্প বয়সে জড়িয়ে গিয়ে আর পড়াশুনা করতে পারিনি। তুই তো মেয়ে—ব্যবসা করতে যাবিনে। তুই পড়া চালিয়ে যা। অবশ্যি এ নিয়ে ফ্যামিলিতে জোর ফাইট হল। শেষে সবাই দাদার দিকে সায় দিলে।'

অশ্রু চুপচাপ শোনার পর বলল, 'সৌমেনবাবু যাননি একবারও?'

মধুছন্দা জোরে মাথা নাড়ল।... 'ভ্যাট! কে গেল না গেল আমার কী?'

অশ্রু কৌতুকের ভঙ্গিতে বলল, 'বারে! ভদ্রলোককে তুমি এভাবে কষ্ট দেবে?'

অমনি মধুছন্দা বিকৃত মুখে বলে উঠল, 'মাতাল আর ব্যাড ক্যারেক্টাররা কষ্ট পাবে না? ওকথা তুলবেন না অশ্রুদি, প্লিজ! ঘেন্নায় আমার অন্নপ্রাশনের ভাত উঠে আসে।'

অশ্রু অবাক হল। দাম্পত্য জীবনটা কী যেন মারাত্মক রহস্যে ঘেরা মনে হয়। আশ্চর্য, এই কমবয়সী মেয়েটি এক সময় সৌমেনের ঘরে চমৎকার উৎসাহে আনন্দে দিন কাটিয়েছে, যাকে এখন মাতাল বা চরিত্রহীন বলছে, ঘৃণা করছে—তার পাশে সে শুয়ে রাত ভোর করেছে। সোহাগ আদর আর যা যা সব পুরুষ মানুষ স্ত্রীলোককে দিয়ে থাকে যা যা সব স্ত্রীলোক তার ন্যায্য পাওনা ভেবে গভীর সুখে আপ্লুত হয়, তা এখন তার কাছে ঘৃণার বস্তু। কেমন করে এটা সম্ভব হয়? মানুষে মানুষে সম্পর্ক বদলে দেয়, কী সেই সাংঘাতিক জিনিস? কোত্থেকে একদিন হঠাৎ যেন হানা দিয়ে সব ভেঙে-চুরে তছনছ করে ফেলে। তারপর পড়ে থাকে শুধু ঘৃণা, দাহ—তারপর বিষাদ কিংবা বৈরাগ।

তাই তো! ঠিক তাই-ই। পলকে গোমেসের কথা ভেসে এল তার মনে। হাল্কা ধরনের একটা দুঃখ কুয়াশার মত তার মাথার ভিতর দুলতে দুলতে কিছুক্ষণ তার ভাবনা-চিন্তাকে ঢেকে দিল, স্যাঁতসেঁতে করে ফেলল।

'এখন কথা শুনুন। আমি সব ঠিক করে ফেলেছি। তারপর আপনার কাছে এসেছি। আপনাকে আবার পড়াতে হবে। না, না—কোন আপত্তি চলবে না। প্লিজ দিদি, আপনাকে দেখলে আমি মনে কত জোর পাই জানেন?'

অশ্রু তাকাল। হ্যাঁ, তার সেই বৈষয়িক লালসাটা এই মুহূর্তে মাথার ভিতর চনমন করে উঠেছে অনেক টাকা নিশ্চয় দেবে মধুছন্দা। বড়লোক ব্যবসায়ীর মেয়ে। এমন করে বলছে সে, যেন অশ্রু ছাড়া তার কোন উদ্ধারই নেই। তবে এক্ষেত্রে দরাদরি না করলেও চলে এবং তা ভালও দেখায় না।

আর তখনই অশ্রুর মনে হল, টাকা-পয়সার দাম তার জীবন থেকে এখনও ফুরিয়ে যায়নি। অনেক টাকা ব্যাঙ্কে বা পোস্ট অফিসে জমিয়েছে সে—তার সঙ্গিনীরাও খবর রাখে না। আর, যখনই শূন্যতা তাকে তলিয়ে দিতে থাকে, চোখের সামনে পৃথিবীটা অর্থহীনতায় ভরে যায়—তখন ওই টাকাই তাকে চুপিচুপি বলে—অপেক্ষা কর, সুদিন ও সুখ আসছে। সেই সুদিন ও সুখের স্পষ্ট বৃত্তান্ত কিংবা চেহারা

তার জানা নেই। অথচ হঠাৎ হঠাৎ তার মাথায় ভেসে আসে একটা কঠিন ও নির্ভরযোগ্য সত্যের মত একটা কথা—তার টাকা আছে। মধ্যরাতে নির্জন ঘরের দেয়ালগুলো ফিসফিস করে বলে—তোমার টাকা আছে। রাস্তায় হেঁটে যেতে যেতে পায়ের নিচে থেকে মাটি চঞ্চল চাপা স্বরে বলে উঠে—অশ্রু, তোমার টাকা আছে। তার স্নায়ু গরম হয়ে ওঠে। বুক ভরে নিঃশ্বাস আসে। তারপর আবার এক সময় নিজের সেই ব্যস্তবতার দিকে বিষণ্ণ হেসে সে বলতে চায়—তাতে কী? গভীর রাতে ঘুমিয়ে পড়ার মুহূর্তেও সে মনে মনে বলে—ও কিছু নয়, ও কিছু নয়।

মধুছন্দা ঝুঁকে এল তার দিকে। —'অশ্রুদি! বাইরে ট্যাকসি দাঁড় করিয়ে রেখেছি কিন্তু!'

অশ্রু তন্ময়তা ভেঙে বলল, 'বস বস। কতদিন পরে এলে! এখনই যাবে কী? ট্যাকসি ছেড়ে দিয়ে এস।'

মধুছন্দা বলল, 'না। আরেকজন আছে ট্যাক্সিতে।'

'কে? ডেকে নিয়ে এস। থাক, আমি যাচ্ছি—'

মধুছন্দা ব্যাস্ত হল। 'না, না। প্লিজ! আমি উঠি। আপনি তাহলে সন্ধ্যা ছটা—সাড়ে ছটা নাগাদ যাবেন প্রতিদিন। ডিরেকশন বলে দিই। শ্যামবাজার পাঁচ মাথায় নেমে...'

অশ্রু বলল, 'তুমি ঠিকানাটা লিখে দাও, তাহলেই চলবে।' বলে একটা কাগজ আর কলম এনে দিল।

মধুছন্দা ঠিকানা লিখে বেরিয়ে গেল। অশ্রু তাকে এগিয়ে দিতে যাচ্ছিল। মধুছন্দা বলল, 'থাক। আপনাকে আর কষ্ট করে নামতে হবে না।'

সুতরাং অশ্রু থামল। অশ্রু জানে, তাকে সহজেই আদেশ পালন করানো যায়। ছেলেবেলা থেকেই সে খুব একটা অবাধ্য প্রকৃতির মেয়ে নয়।

কিন্তু মানুষের যা নিয়ম। বাড়িতে কেউ আকাঙ্ক্ষিত মানুষ এলে যদি বা তাকে বাইরে অব্দি এগিয়ে না দেওয়াও সম্ভব হয়, জানলা থেকে উঁকি মেরে তার চলে যাওয়া দেখার অভ্যাস আছে। সব মানুষই অনেক ক্ষেত্রে তাই করে। এর দরুন অশ্রু দ্রুত বিবির ঘর খুলে পশ্চিমের জানালাটা খুলে দিল। বাড়ির সামনেটা উত্তর। তাই ট্যাক্সিটা পশ্চিমে এগিয়ে বড় রাস্তায় পড়া না অব্দি কিছু দেখা যাবে না।

হ্যাঁ, ট্যাক্সিটা বেরিয়েছে এবার। অশ্রু মধুছন্দাকে দেখল ভিতরে বসে রয়েছে। তার ওপাশের লোকটিকে দেখবার জন্য, স্বভাবিক কৌতূহলেই সে ঝুঁকল। সূর্য এখন দক্ষিণায়নে চলছে। বাড়ির ছায়া ট্যাকসির গা থেকে সরে যেই সূর্যের আলো খালপোলের ফাঁকা আকাশ থেকে বাঁকানো পথে গিয়ে হানা দিল, মধুছন্দার সঙ্গীকে মোটামুটি স্পষ্ট দেখতে পেল সে। লোকটার বয়স কম—তার মানে যুবকই। বেশ সপ্রতিভ একালীন চেহারা। সুতরাং গোঁফ ও জুলপিও রয়েছে। একটু মড-টাইপ যেন। অশ্রুর কৌতূহলটা বেড়ে গেল। মধুছান্দার প্রেমিক নাকি? আত্মীয় হতেও পারে।

বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সরে এল অশ্রু। জানলাটা ও ঘর বন্ধ করে পুবের ব্যালকোনিতে গেল। গতকাল থেকে সে একা কাটাচ্ছে। রুচি বাইরে কোথায় গেছে। স্বপনবাবুর ছবির আউটডোর শুটিংয়ে। অশ্রুকে সঙ্গে যেতে বলেছিল রুচি—গেলে তো মধুছন্দার সঙ্গে দেখাই হত না। আর মেয়ের যা তাড়া, নির্ঘাৎ অন্য কাকেও জুটিয়ে নিত। কত দিতে পারে মধুছন্দা? হিসেব কষতে চেষ্টা করল সে। একশো—নাকি দেড়শো? আচ্ছা, যদি দু'শোই দেয়?

পরে মনে হল অবশ্য রুচির সঙ্গে গেলে এনজয় করা যেত। যেখানে শুটিং হবে, সে নাকি পাহাড় আর জঙ্গলে ভরতি। বাঘ, ভালুক, হরিণ আছে, ময়ুর আছে, ঝরনা আছে। রুচির কী কপাল! অশ্রুর কী হল, এবার সে গুনগুনিয়ে গান গেয়ে উঠল। তাতেও এই হঠকারী আবেগ প্রশমিত না হলে সে ফের বিবির ঘর খুলে রেকর্ড প্লেয়ার বাজাতে বসল।

'..ইন দা লোনলি সাইলেন্স অফ মাই রুম
আইি থিংক অফ ইউ...'

কী গান! পুরুষের কণ্ঠস্বর। পুরুষ মানুষ কি সত্যি সেই গভীরতম বেদনাটি টের পায়—যা নির্জনতার মধ্যে প্রেমকে খুঁজে খুঁজে দিনের পর দিন অস্তিত্বকে অর্থহীন করে তোলে? খুব হাল্কা মনেই

অশ্রু এসব ভাবে। একটা চপলতা তার দু'চোখে খেলা করছে এখন। ঋতু থাকলে গাইতে শুরু করত গলা মিলিয়ে। আহা ঋতু! কী যে হল তার!

গানটা বাজতে থাকল। অশ্রু হুট করে গিয়ে রুচির খাটের ওপরে রাখা। বেতের চুপড়িতে হাত ভরল। বোতলটা আছে! রুচি সঙ্গে এনেছিল সে রাতে, অশ্রুদির জন্যে। অশ্রু এক চুমুক না খেয়ে পারেনি। কেরলে তৈরি, বেশ চমৎকার পানীয় বলতে হয়—অবশ্য ব্রান্ডি। আউন্স দুই এখনও রয়েছে। গানটার সঙ্গে গলা মিলিয়ে ডাইনিং-এ গিয়ে গেলাসে ঢালল সে। জল মেশাল। তারপর চুমুক দিল। সত্যি, বেশ চমৎকার স্বাদ। সাধারণ মদের মত তেতো নয়। গ্লাসটা হাতে নিয়ে সে বিবির ঘরে গেল ফের। রেকর্ডটা বদলে দিল।

কতক্ষণ পরে টের পেল, বেশ নেশা হয়ে গেছে। ব্রান্ডিটা এত তেজী! হয়ত তলার অংশটা বলেই এরকম হল। অশ্রু শুয়ে পড়ল বিবির খাটেই। বিবি বিছানা একপ্রস্থ নিয়ে গেছে সঙ্গে। তাই তার বিছানাটা-যথারীতি রয়েছে। আচ্ছন্নতার মধ্যে অশ্রু পড়ে রইল চুপচাপ। রেকর্ড প্লেয়ারটা চলতে চলতে এক সময় থেমে গেল। তখন অশ্রু তা জেনেও আর হাত বাড়িয়ে রেকর্ড বদলাতে বা ওটার ঢাকনা বুজিয়ে দিতেচেষ্টা করল না। তার মাথার ভিতর এখন শুধু বলিষ্ঠ ধবধবে শরীর, সপ্রতিভ, উজ্জ্বল এক সৌমেন ঘুরে বেড়াচ্ছে।..

ঠিক সেই দিন নতুন দিল্লির একটা তিনতারা মার্কা হোটেলের লাউঞ্জে বসে বৈজয়ন্তী এক মহিলা-পত্রিকার মহিলা-প্রতিনিধিকে ইন্টারভিউ দিচ্ছে। বিশাল লাউঞ্জ। কোণের দিকে একটা টেলিভিশন রয়েছে। অন্য পাশে রিসেপশন। দেয়াল ভর্তি আর্টসামগ্রী, শো কেস নানান প্রতিষ্ঠানের, খানিকটা ভিড় আছে। দলের মেয়েরা কেউ কেউ বাইরে সুদৃশ্য লনে, কেউ বিবির পিছনে দাঁড়িয়ে, পুরুষের সংখ্যা চার—তারা ব্যাগ-ব্যাগেজ সামলাচ্ছে বাইরে। ট্যাক্সি তৈরি। ট্রেন ছাড়তে একঘণ্টা দেরি আছে। বিবির দল এখন চলেছে জয়পুর।

'আপনার ছেলেবেলার কথা কিছু বলুন!'

'তেমন কিছু বলার মত নয়। নিম্ন-মধ্যবিত্ত রক্ষণশীল পরিবারে জন্ম।'

'নাচ শেখার অসুবিধে ছিল না?'

'ভীষণ ছিল।'

'কার কাছে শিখতেন?'

'কারো কাছে না—নিজে নিজে।'

'হাউ স্ট্রেঞ্জ! তারপর!'

'স্কুলে ফাংশানে নাচতুম। তারপর কলেজ লাইফেও তাই—অভিনয়ও করেছি অল্পস্বল্প।'

'মাই...! কোন তালিম ছাড়া এমন নাচ শিখলেন?'

'না—পরে তালিম নিই। মানে—বিয়ের পর। প্রথমে শ্রীমতী রেবেকার কাছে ওয়েস্টার্ন ড্যান্স, পরে উমাশঙ্করজীর কাছে ইন্ডিয়ানে—স্পেশালি কথক। তবে এখন, এ আমার নিজের সৃষ্টি।'

'তাহলে বোঝা যায়, আপনার স্বামী আপনার সঙ্গে সহযোগিতা করতেন?'

'ও, হ্যাঁ। দ্যাটস রাইট।'

'যদি কিছু মনে না করেন, আপনার স্বামীর সঙ্গে প্লিজ পরিচয় করিয়ে দিন—জাস্ট এ ফিউ টক ওনলি।'

'তিনি সঙ্গে নেই।'

'যদি কিছু মনে না করেন, তাঁর প্রফেশন কী?'

'জানি না।' বলেই সামলে নিল বৈজয়ন্তী। পরক্ষণে বলল, 'তিনি একজন পর্যটক।'

'মাই, মাই...!'

'আর কী জানতে চান বলুন?'

একটু ইতস্তত করে যুবতী প্রতিনিধিটি বলে, 'এক্সকিউজ মি—খুব রিলায়েবল সোর্স থেকে আমরা জেনেছি—'

'কী জেনেছেন বলুন?'

'প্লিজ, প্লিজ! বুঝতেই পারছেন, আজকাল পাঠকরা কী চায়!'

'আমার কোন স্ক্যান্ডাল নেই।'

'ও, প্লিজ মিসেস ব্যানার্জি! অন্যভাবে নেবেন না—জাস্ট ফর সেক অফ সাসপেন্স!'

'আমি উঠব।' ঘড়ি দেখল বৈজয়ন্তী।... 'মিলি, সব রেডি ওখানে?'

একটি মেয়ে পিছন থেকে বলল, 'কতক্ষণ!'

পত্রিকা-প্রতিনিধি বলল, 'জাস্ট ওয়ান মিনিট মোর! আপনার ব্যালেগুলো সম্পর্কে কিছু বলুন। গতরাত্রের প্রথমটা দারুণ ইন্টারেস্টিং ছিল। আচ্ছা, এগুলোর আইডিয়া নিশ্চয় আপনার?'

'আবার কার হবে?'

'আইডিয়াটা কীভাবে আসে, তারপর কী কী করেন, বলুন না?'

'চিন্তা-ভাবনা করি, আবার বই পড়ে কিংবা বিশেষ গান শুনেও আইডিয়া আসে। মনে মনে সাজিয়ে নিই। স্কেচ করি কাগজে।'

'তাহলে আপনি চিত্রশিল্পীও। মাই গুডনেস! একজিবিশন নিশ্চয় করেছেন?'

'না।'

'প্লিজ, দু'একটা স্কেচ দিন না!'

'কাছে নেই। পরে পাঠিয়ে দেব।'

'আচ্ছা মিসেস ব্যানার্জি, এর মধ্যে নিশ্চয় রিয়েল লাইফ ড্রামা থেকেও ইনসপিরেশন পেয়ে কিছু করেন?'

'হয়ত।'

'গত রাত্রির হংসমিথুন ব্যালেটা বড্ড বাস্তব মনে হচ্ছিল। স্ট্রংলি হিউম্যান। আমার এক বন্ধু আছেন—তিনি ওরিনথোলজিস্ট। তিনি বলছিলেন, হাঁস বা ওই প্রজাতির পাখিদের মধ্যে ঠিক এরকম বিচ্ছেদ অসম্ভব। অবশ্য কোন কোন হংসী দলছাড়া হয়ে একা থাকতে ভালবাসে—দ্যাটস কারেক্ট। কিন্তু এ যেন আরোপিত।'

'আমি পক্ষীতত্ত্ব নিয়ে পড়াশোনা করিনি। দ্যাটস এ আইডিয়া ওনলি।'

'মিসেস ব্যানার্জি, আমার ডিডাকশনটা দাঁড়াচ্ছে—দিস ভেরি হিউম্যান অ্যান্ড রিয়েল লাইফ ড্রামার প্রেরণা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ছাড়া অসম্ভব। আপনি কি আজকের ডেইলি হিন্দুস্থান দেখেননি?'

'কেন? কী বেরিয়েছে?'

'আপনার ব্যালের লাস্ট সিকোয়েন্সে আপনি যখন নিঃসঙ্গ হংসী হয়ে পাখা গুটিয়ে নিচ্ছেন—আপনার দু'চোখে—কী বলব, ভীষণ—ভীষণ একটা...'

বিবি গম্ভীর হয়ে বলল, 'ওটাই আমার ব্যালের বক্তব্য বলতে পারেন।'

'বাট ইজ দেয়ার এনি পারসোনাল রেফারেন্স ইন দা থিম?'

বিবি হেসে ফেলল।...'আপনি বড্ড বেশি ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামান।'

'ও নো, নো, মিসেস ব্যানার্জি। আজকাল পাঠকরা—আই মিন পাঠিকারা যে এই রকম।'

হঠাৎ বিবি বলল, 'রিলায়েবল সোর্সে কী জেনেছেন বলছিলেন যেন?'

'এক্সকিউজ মি—শুনলুম, আপনার স্বামীর সঙ্গে নাকি যোগাযোগ নেই—মানে, তিনি নাকি নিরুদ্দিষ্ট। আই মিন, সন্ন্যাসী হয়ে চলে গেছেন। ও হোয়াট এ রিয়েল লাইফ ড্রামা, ইনডিড!'

বিবি হাসতে থাকল। ...'উঠি?'

'প্লিজ—কিছু বললেন না! জাস্ট এ কমেন্ট!'

'কিছুই কমেন্ট করার মত নেই।'

'দেন ইট ইজ এ ফ্যাক্ট!'

'নো, কমেন্ট।'

'আমরা লিখব কিন্তু!'

'লেখা বেরোলে আমার লিগাল অ্যাডভাইসারকে সেটা পড়তে দেব।'

'ও, ও! ইউ আর থ্রেটেনিং মিসেস ব্যানার্জি!'

বিবি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'কই রে মিলি—এগো।'

বাইরে যেতেই বিবি অবাক। কখন একটা ভিড় জমে গেছে লনে। অজস্র ছেলেমেয়ে হাতে অটোগ্রাফের খাতা নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বিবিকে দেখে তারা চেঁচিয়ে উঠল।

হাত ব্যথা করে বিবির। কিন্তু বুক ভরে ওঠে আবেগে। আর শেষ অটোগ্রাফটি দিয়ে পা বাড়নোর মুহূর্তে হঠাৎ ঋতুর কথা তার মনে পড়ে যায়। ঋতু থাকলে কত খুশি যে হত!

দশ

কলকাতায় প্রথম শীতের আমেজ একটু একটু টের পাওয়া যাচ্ছে, সেই সময় একদিন রুচি জানাল, সে এখান থেকে চলে যাচ্ছে। কাঁকুলিয়ার ওদিকে ভাল ফ্ল্যাট পেয়েছে সে।

অশ্রু শুধু শুকনো হাসল। রুচি চাকরিটা ছাড়েনি অবশ্য। কিন্তু অভিনেত্রীর জীবন যাপনে নিশ্চয় অন্য ধরনের পরিবেশ দরকার হয়েছে তার। ওই লাইনের অনেক লোক এখন দু'বেলা তার কাছে আসছে। তাই খানিকটা প্রাইভেসি তো চাই-ই রুচির। এবং রুচি চলে গেল।

বিবি তখনও ফেরেননি তার সফর থেকে। সে এখন বোম্বেতে আছে। কলকাতা ফিরতে আরও কিছুদিন দেরি হবে।

ওদিকে ঋতুর অবস্থা আরও খারাপের দিকে যাচ্ছে। এখন আর সে কথা বলতে পারে না। ফিস ফিস করে অনেক কষ্টে বলতে চেষ্টা করে মাত্র। অশ্রু গেলে তার দুটো হাত আঁকড়ে মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। এইসব সময় অশ্রুর খুব কষ্ট হয়। রুচি চলে গেছে শুনে ঋতু বলেছিল, আমিও চলে গিয়েছি—যাচ্ছি।

হ্যাঁ, পৃথিবীতে সবাই একটা করে জায়গা—স্থায়ী ঠিকানা খুঁজতেই তো আসে। পেয়ে গেলে সে ভিড়ে মিশে যায়, তাকে নিয়ে কোন সমস্যা থাকে না কারো, তার নিজেরও কোন বক্তব্য থাকে না।

অবশ্য ঋতুর ঠিকানা অন্যখানে। সে পৃথিবীতে ডানা মেলবার চেষ্টা করে একদা ক্লান্ত হল, তারপর জানল তার স্থায়ী ঠিকানা এখানে কোথাও নেই। আছে বাইরে কোথাও—ঠিকানাহীনতার অতল শূন্যতায়।

কিন্তু অশ্রু? অশ্রুকে এখনও কতদিন খুঁজে হন্যে হতে হবে। মধুছন্দাকে নিয়মিত পড়িয়ে আসে সে। আর প্রতিদিনই ভাবে, সৌমেনের সঙ্গে দেখা করে ব্যাপারটা জানাবে এবং তাতে ভদ্রলোক কী বলেন, শুনে অশ্রু কৌতুক অনুভব করবে। কিন্তু যেতে পা ওঠে না।

মধুছন্দার সঙ্গে যে ছেলেটিকে দেখেছিল সে, পরে তার সঙ্গে আলাপ হয়েছে অশ্রুর। ঘটনাচক্রেই বলা যায়। পথে আচমকা দেখা এবং মধুছন্দা আলাপ করিয়ে দিয়েছিল। ওর নাম বিদ্যুৎ? বিদ্যুতের মতই ছেলেটি। এয়ারপোর্টে কী একটা ভাল চাকরি করে। মধুছন্দা যদি ডিভোর্স নেয়, তাহলে নির্ঘাৎ বিদ্যুৎকেই আবার বিয়ে করবে। অশ্রুর এই ধারণা। তবে ওরা যা সেকেলে পরিবার, তার জন্যে মধুছন্দাকে পরিবার ছাড়তে হবে, তা বোঝাই যায়।

যাক গে, তাহলে মধুছন্দার একটা হিল্লে হল। আর অশ্রু? তোর কী হল? প্রশ্নটার সামনে অশ্রু কিছুক্ষণ বিব্রত বোধ করে। তারপর মনে মনে বলে, আমি তো কিছু চাইনি! চেয়েছি নাকি?

এক সকাল হঠাৎ সেই কামাল এসে হাজির। ঘরে ঢুকেই সে প্রথমে 'ঋতু-ঋতু' বলে বেশ জোর গলায় ডাক দিল। অশ্রু অবাক।

কামাল হন্তদন্ত হয়ে বলল, 'ঋতু — ঋতু আসেনি এখানে?'

'ঋতু! এখানে?' অশ্রু রুদ্ধশ্বাস বলল। ...'কেন—এখানে আসবে মানে?'

কামাল বলল, 'সর্বনাশ! আজ, সকাল হাসপাতালে গিয়ে শুনি ও বেডে নেই। খুব খোঁজখুঁজি হল—কোন পাত্তা পাওয়া গেল না। দেখুন তো কী কাণ্ড!'

অশ্রু চমকে উঠেছিল। বলল, 'সে কী!' ওই অবস্থায় ও বেরোল কী করে? ও তো এক পা-ও হাঁটতে পারে না মনে হচ্ছিল!'

কামাল রুচির ফেলে যাওয়া শূন্য খাটটায় ধুপ করে বসে পড়ল। বলল, 'সেই তো আশ্চর্য! ওকে না ধরে থাকলে বাথরুম যেতে পারে না! ওই শরীরে কী ভাবে বেরিয়ে গেল, ভাবতে অবাক লাগছে। জানেন—আশেপাশে সবখানে ছোটাছুটি করে খুঁজেছি। পাগল মেয়ে তো—ভীষণ খামখেয়ালী! ঝোঁকের বশে বেরিয়ে হয়ত ফুটপাতেই পড়ে রয়েছে ভেবেছিলুম। কিন্তু কোথাও নেই।'

অশ্রু ধরা গলায় বলল, 'খুব বেশি দূরে তো ও যেতে পারবে বলে মনে হয় না!'

'হ্যাঁ। সেই জন্যেই চারদিকে ছুটোছুটি করেছি আমরা। তক্ষুণি ওর বাড়িতে খবর দেওয়া হয়েছিল।'

'তাহলে বাড়িতেও যায়নি!'

'না। তখন আমরা ভাবলুম, নিশ্চয় ট্যাক্সি বা রিকশা করে মেসে চলে এসেছে। তাই দৌড়ে এলুম।'

অশ্রু হতভম্ব হয়ে পড়ল। ঋতু কেন হাসপাতাল ছেড়ে পালাল? তাহলে কি ওর ফ্যামিলির সান্নিধ্য ও চায় না? এটাই কারণ হয়ত। ঋতু হয়ত ওঁদের উপর প্রচণ্ড অভিমান এখনও পুষে রেখেছিল। কিন্তু আশ্চর্য, এতদিন অশ্রুকে তো তা টের পেতে দেয়নি।

না কি নিজের জীবনের তাগিদেই ও পালিয়েছে? নিজের অভিশপ্ত জীবনের প্রতি অভিমানে? কিন্তু এমন করে পালিয়ে কি মুক্তি পাবে? ওর মুক্তির আবেদনপত্রে নিয়তি কালো কালিতে সই দিয়েছে—আর তো কিছুতেই কিছু হবে না—এটা কেন বুঝল না হতভাগিনী?

শরীরের ওই অবস্থায় বেরিয়েছে—হাঁটতে কষ্ট হয়েছে নিশ্চয়। এই বাড়তি কষ্ট নিজেকে দিয়ে কী আনন্দ পেল সে?

কামাল উঠে দাঁড়াল।... 'তাহলে আসি দিদি! ওদের খবর দিতে হবে। সবাই ভেবেছে, এখানেই নিশ্চয় এসেছে ঋতু। কিন্তু...'

কথা অসমাপ্ত রেখে কামাল বেরিয়ে গেল। অশ্রু চিন্তিত মনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল। একটা দৃশ্য তার মনে স্পষ্ট হয়ে ভাসতে থাকল। একটি রুগ্‌ণ মেয়ে—মৃত্যু তার গলায় থাবা বসিয়েছে, অতি কষ্টে ভোরবেলায় নির্জন ফুটপাতে টলতে টলতে হেঁটে চলেছে উদ্দেশ্যহীনভাবে।...

হাসপাতাল থেকে রোগী পালানোর খবর আজকাল প্রায়ই শোনা যায়। এ এক অদ্ভুত ব্যাপার। তলিয়ে দেখলে মনে হয়, গভীরতর নিরাপত্তার জন্য রুগ্‌ণ মানুষ যেন একটা আশ্রয় খুঁজতে বেরিয়ে পড়ে। ফাদার পিয়ের কতবার জীবন সম্পর্কে দার্শনিক কথাবার্তা তাকে শোনাতেন। তিনি বলতেন, সব মানুষের অবচেতনায় একটা সুন্দর আকাঙ্ক্ষিত ভবিষ্যত কাজ করে যাচ্ছে। কাজ করে যাচ্ছে, তাকে বর্তমানে বাঁচতে সাহায্য করছে। কিন্তু কেউ যদি কোন না কোনভাবে টের পেয়ে যায় কিংবা বিশ্বাস এসে যায় যে, তার সেই ভবিষ্যতটা ভুয়ো, তাহলেই অস্তিত্বে শূন্যতা সৃষ্টি হয়। সে তখন জীবনের অর্থহীনতায় বিপন্ন বোধ করে। হিটলার-জার্মানির কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে বন্দীরা সবাই তাদের কোন একদিন মুক্তি হবে ভাবত। ভাবতে ভাবতে ওই বিশ্বাস জন্মাল। তখন তাদের আকাঙ্ক্ষিত ভবিষ্যত বলতে সেই মুক্তির দিন। একজন বন্দীর বিশ্বাস জন্মাল যে, সে ২৯ অক্টোবর মুক্তি পাবে। কেন ওই তারিখটা বেছে নিল সে, বোঝা যায় না। যাই হোক, ২৮ অক্টোবর রাত্রে হঠাৎ সে অসুস্থ বোধ করতে থাকল। ২৯ তারিখে অবস্থা আরও খারাপ হল। ৩০ তারিখে বেচারা মারা গেল। এর কারণ আর কিছু নয়, অস্তিত্বের শূন্যতাজনিত শক। ভবিষ্যৎ মিথ্যে প্রতিপন্ন হলে মানুষের এরকম হয়। লোগোথেরাপি

নামে একরকম মনোচিকিৎসা-পদ্ধতি আছে, তার অন্যতম প্রবক্তা ডাক্তার ভিক্টর ফ্র্যাংক এই ঘটনাটার প্রত্যক্ষদর্শী।....

তাহলে ঋতু কি 'সুন্দর আকাঙ্ক্ষিত ভবিষ্যৎ বা মুক্তির দিন' কবে ঠিক করেছিল? গতকাল ছিল পঁচিশে নভেম্বর। তাহলে কি ঋতুও সেই বন্দীর মত দিনটাকে মুক্তির প্রতীক ধরে নিয়েছিল? কিন্তু ঋতু তার মত মরে গেল না। সে পালাল।

অশ্রু অস্থির হয়ে উঠল। মানুষের জীবনের গভীরে কী যেন সব সময় কাজ করে যাচ্ছে—যা প্রচণ্ড শক্তিমান—যা মানুষকে দিয়ে নিজের কোন প্রয়োজন মিটিয়ে নেয় যেন। বি টি পড়ার সময় অশ্রু কিছুদিন মন দিয়ে মনস্তত্ত্ব পড়েছিল। পাঠ্য বিষয়ের অতিরিক্ত পড়ে ফেলেছিল সে। এ তার অভ্যাস বরাবর। ফ্রয়েডের একটা কথা মনে পড়ল। ফ্রয়েড রাজকুমারি বোনাপার্টকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন—যে মুহূর্তে কেউ জীবনের অর্থ সম্পর্কে প্রশ্ন তোলে, সেই মুহূর্তেই সে অসুস্থ হয়ে পড়ে। অবশ্য ফ্রয়েডের বিরুদ্ধবাদীরা বলেছেন, তা কেন? ওই প্রশ্নটা যে তোলে, সে তত বেশি হিউম্যান—অর্থাৎ সে প্রচণ্ডভাবে মানবিক গুণের অধিকারী। জীবনের অর্থ খোঁজে বলেই তো মানুষ প্রাণীর চেয়ে সবদিক থেকে শ্রেষ্ঠ।

আমি কি তাহলে 'অসুস্থ' কিংবা তার উল্টো—প্রচণ্ডভাবে মানবিক গুণের অধিকারী? অশ্রু ভাবল। আমিও তো জীবনের মানে খুঁজি সবসময়। কোন্‌টা ঠিক? অসুস্থ; না সুস্থ আমি?

কিছু ঠিক করতে পারল না অশ্রু। একবার মনে হলে, কোন প্রশ্ন তোলা ঠিক নয়—চুপচাপ দিন কাটানোই ভাল। আর সবাই হয়ত এভাবে মুখ বুজেই দিন কাটায়। পরে মনে হল, কিন্তু নিছক দিনকাটানো কি আমার পক্ষে উচিত? একটা ভবিষ্যৎ সবারই সামনে চেতনে বা অচেতনে ধরা থাকে। আমার তো কোন ভবিষ্যৎই নেই। অমনি অশ্রু শিউরে উঠল। ভয় পেয়ে গেল সে। চারদিকে শূন্যতাময় অন্ধকার দেখল। একেই তো বলে একজিস্টেন্সিয়াল ভ্যাকুয়াম। আর সেই শূন্যতার মাঝে মাঝে পায়রার ঝাঁকের মত ভেসে আসছে কিছু খসখসে কাগজী-মুদ্রা—কিছু টাকার নোট, ব্যাংক, ব্যালান্স, তার মাইনের অঙ্ক!

শুধু এই—আর কিছু নয়। ভয়ার্ত চোখে তাকাল অশ্রু। সেই স্বপ্নটা মনে পড়ল। গীর্জার বিশাল ক্রশটা ভেঙে পড়ছে!

দ্রুত সংস্কার বশে সে বুকে ক্রশ আঁকল কম্পিত আঙুলে। অনেক দিন পরে বিছানার তলা থেকে ছোট বাইবেলটা বের করল। খুলতে পারল না, হাত কাঁপছিল। সে বুকে চেপে ধরে বসে থাকল। তার চোখ ফেটে জল এল। ঠোঁটদুটো কাঁপতে থাকল। একটা ব্যাপক আচ্ছন্নতার মধ্যে স্তব্ধ বসে থাকল অশ্রু—কতক্ষণ।

রুচির ফ্ল্যাটটা বেশ জমজমাট হয়ে থাকে সকাল সন্ধে। বলতে গেলে একটা পুরোদস্তুর সংসার, তবে এর পিছনে তার নিজস্ব টাকা-পয়সার অবদান খুবই কম—যা কিছু তাপসের। তাপস চ্যাটার্জি এখন প্রডিউসার মহলে বিগ গাই। বোম্বে থেকে আয়ার বুড়ো কলকাতায় স্থায়ী আস্তানা পেতে বসেছে ততদিনে। তাকে দুইতে চেষ্টা করেছিল সিনহা বোস কোম্পানি। কিন্তু দুধটা পেল অবশেষে তাপস চ্যাটার্জি। তবে সবই হয়ত রুচির কৃতিত্ব। যদিও কৃতিত্বটা সম্পর্কে রুচি নিজে অসচেতন থেকেছে এতদিন, এখন ক্রমশ টের পাচ্ছে আউটডোর সুটিং-এ গিয়ে আয়ার সায়েবকে একটুখানি ঘনিষ্ঠতার আঁচ যা দিয়েছিল, তাতেই আয়ারসায়েবের জীবন ভীষণ গরম হয়ে গিয়েছিল।

তরুণ সিনহা এটা জানে। তার রিসেপশনিস্ট মেয়েটিই যে আয়ারকে পটিয়ে তাপসের ফিল্মে ভিড়িয়েছে, এটা সে বুঝেছে। তাই সে ক্ষুব্ধ। কিন্তু তাতে কী? রুচির তো আজকাল কিছু আসে যায় না। চাকরি এমনিতে যে মেয়ে ছাড়তেই তৈরি ছিল, এখন হুট করে ছেড়ে দিতে আর দেরি করবে না। আসলে আরও বিস্তর আয়ার সায়েব আছে, যাদের জন্যে রুচিকে তরুণ সিনহাদের প্রয়োজন হচ্ছে। তার ওপর তাপসের ছবি রিলিজ হলে রুচির কদর বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। তাই তরুণ সিনহা ক্ষুব্ধ হলেও তা চেপে যায়।

এদিকে রুচির ফ্ল্যাটে তাপসও যে থাকে, তা সবাই জেনেছে। সে রুচিকে বিয়ে করেনি শাস্ত্র বা আইন অনুসারে—অথচ একই ঘর বাস করছে। রুচির ভাই নরুও আছে ওখানে। সেও মেনে নিয়েছে ব্যাপারটা। তাপসকে সে প্রকাশ্যে জামাইবাবু বলে। রুচি এটা কিন্তু এড়িয়ে যায়—উচ্চবাচ্য করে না।

তাপসকে সে স্বামী হিসেবে মেনে নিয়েছে কি না—সে প্রশ্নের জবাব তার নিজেরই জানা নেই। অথচ একই শয্যায় রাত কাটাতে রুচি আর আপত্তি করে না। তাপসকে তার ভাল লাগে। ভালোবাসা তো ভাল লাগারই উল্টো পিঠ— কিংবা অনেক ক্ষেত্রে পরিণতিই।

আর তাপসও বেশ খানিকটা ধীর স্থির গম্ভীর হয়ে উঠেছে। মদের মাত্রা কমিয়ে ফেলেছে। মাতলামি করে না। সংসারী পুরুষের মত ভাবভঙ্গি।

আয়ার সাহেব থাকে চৌরঙ্গী এলাকায়। ধর্মতলার তাদের ফিল্মের অফিস। এখানে এসে গাড়ি কিনেছে সে। মাঝে মাঝে রুচিকে তার গাড়িতে দেখা যায়। কখনও তার ফ্ল্যাটে রুচি যায়—অর্থাৎ যেতে হয়। রুচি এখনও অন্য মেয়ে।

ডিসেম্বরের গোড়ায় আবার ওদের যেতে হল আউটডোর সুটিং-এ। শেষ দফার কাজ। জানুয়ারিতেই ছবি রিলিজ হওয়ার সুযোগ পাওয়া গেছে। খুব দ্রুত কাজ করতে হচ্ছে ওদের।

জায়গাটা বিহারের পাহাড়ি অঞ্চলে। নির্জন একটা সংরক্ষিত বনাঞ্চল। ফরেস্ট অফিসের ডাক-বাংলোয় রুচি তাপস আর আয়ার সায়েব থাকবার ব্যবস্থা করে নিয়েছিল। আর টেকনিসিয়ান এবং আরও লোকজন একটা নদীর ধারে লোকেশানের কাছাকাছি তাঁবুতে। হিরোর থাকবার ব্যবস্থা আরেকটা বাংলোয়—সেটা কোন ধনীর অবসর বিনোদন ভবন। এই বাংলোটা নদীর ধারেই।

কাছাকাছি কয়েকটা ছোট-বড় পাহাড় রয়েছে। আড়াই হাজার ফুট উঁচু একটা পাহাড় ফরেস্ট বাংলোর পিছনেই। সেটার আধাআধি পর্যন্ত ঘন গাছপালা আর বাকিটা শুধু ঘাস, তারপর নিরেট পাথর। ওটার পশ্চিম দিকটা ভীষণ খাড়াই—দেয়ালের মত। পূর্ব-উত্তর-দক্ষিণ তিন দিকই বেশ ঢালু। সুস্থ মানুষের পক্ষে চূড়ায় ওঠা কঠিন নয়। তবে অনেকবার বিশ্রামের দরকার হয়।

সেদিন দুপুরে লাঞ্চের পর তাপস গেছে হিরোর তাঁবুতে। বিকেলে কিছু কাজ হবে। ডাইরেক্টর ভদ্রলোক টেকনিসিয়ানদের ওখানেই থাকেন। তিনিও ওই সময় হিরোর কাছে যাবেন। নরু একটা খাটিয়া পেতে রোদে শুয়েছে। এ এলাকায় শীতের প্রকোপ অসামান্য। রুচি কিছুক্ষণ বারান্দায় রোদে বসে থাকার পর হাই তুলে শুতে গেল। পাশের ঘরে আয়ার সায়েব আছে।

রুচি শুয়ে থাকল কিছুক্ষণ। একা চুপচাপ শুয়ে থাকলে অনেক সময় তার সব পুরনো কথা মনে পড়ে। সে তার মেসের কথা ভাবছিল। বেশ ছিল যেন সময়টা। বিবিদি, অশ্রুদি, ঋতু। ঋতু বেচারার এখন কী অবস্থা কে জানে! অনেকদিন ওর খোঁজ নেওয়া হয়নি। বিবিদি কি ফিরেছেন এতদিনে? একবার গিয়ে খোঁজ নেওয়া উচিত। একসময় ওঁর আশ্রয় না পেলে আজ কোথায় থাকত রুচি?

ভাবতে ভাবতে একটু তন্দ্রা মত এসেছিল। হঠাৎ সে দেখল, আয়ার সায়েব তার খাটে এসে বসল। অমনি রুচি উঠে পড়ল বিছানা থেকে।

আয়ার বুড়োর ফ্ল্যাটে সে গেছে অনেক সময়, সঙ্গেও ঘুরেছে। কিন্তু নিছক কিছু ঘনিষ্ঠতা ছাড়া বেশি প্রশ্রয় দেয়নি—যদিও আয়ার উৎসাহে এগিয়ে এসেছে বার বার।

রুচি হেসে বলল, 'ঘুমোচ্ছিলেন দেখলুম!'

আয়ার আজকাল ভাঙা বাংলা কিছু বলতে পারে। তার মুখটা এখন গম্ভীর দেখাচ্ছিল। রুচির দিকে ঘোলাটে চোখে তাকিয়ে থাকল সে।

রুচি বলল, 'কী হল? কথা বলছেন না যে?'

আয়ার কাশল। তারপর গোমড়ামুখে বলল, 'একঠো বাত পুছ করতে এল।'

রুচি সকৌতুকে বলল, 'জরুর! পুছিয়ে না বড়াসাব!'

হাত তুলল আয়ার।... 'তামাসার বাত না আছে। ফ্রম সামটাইম হামি খালি শোচ করছে কী, পিকচার

রিলিজ তো হোবে—লেকিন ফ্লপ করলে কী হোবে? হামি তো মারা তো মারা যাবে বিলকুল। আড়াই লাখ হামি দিয়েছে। বাট ইফ দা মানি...'

রুচি একটু চমকাল।.... 'হঠাৎ এতদিনে এখন এ কথা কেন আয়ারসাব?'

'হাম শোচ করেছে।'

রুচি তীক্ষ্ণ দৃষ্টে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কেউ নিশ্চয় আপনাকে ভয় দেখাচ্ছে। কে বলুন তো? মিঃ সিনহা?'

'নো। আই অ্যাম জাস্ট স্মেলিং দা থিং।'

'উহু। নিশ্চয় আপনাকে কেউ কিছু বলেছে।'

'ও বাত ছোড়িয়ে। হামি চেকে আর সই করবে না—তাপসবাবুকো বোলবেন। হামি চলল এখন। আই মাস্ট গো ব্যাক টু ক্যালকাটা—আভি!'

'সে কি! কেন? কেন অমন করছেন আপনি?'

আয়ার তার দিকে তাকাল।... 'আরে! হামি তো মুনাফা করতে এতনা রূপেয়া না দিয়েছে! লেকিন...'

'লেকিন?'

'হামি দিয়েছে—ফর ইউ। স্পিকিং ফ্র্যাংকলি! অ্যান্ড ইউ হ্যাভ বিন চিটিং মি!'

'মিঃ আয়ার! কী বলছেন আপনি?'

'ইয়েস! তুমকো দেখ কর রুপেয়া দিয়েছে। লেকিন, তুমি হামার সঙ্গে— আই মিন, ইউ আর নট মেকিং লাভ উইথ মি'। তাপসবাবু বোলেছিল, হি অ্যাসিওরড মি দ্যাট ইউ উড মেক লাভ উইথ মি—ফ্র্যাংকলি টেলিং দা টুথ।'

জ্বলে উঠল রুচি—মনে মনে। তার চোখ দুটো উজ্জ্বল হল মাত্র। কিন্তু সব উত্তেজনা আর রাগ চাপা দিল। মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে। তাপসের স্বপ্ন তো তাকে নিয়েই। তাকেই তাপস একটা নতুন জগতে পৌঁছে দিতে চেয়েছে, সেখানে সে জীবনের মানে খুঁজে পাবে। আর এই অভিনেত্রীর জীবনে এসে রুচি এতটুকু ফাঁকি দেয়নি—গভীর নিষ্ঠায় কাজ করে যাচ্ছে—সে একজন বড় অভিনেত্রী হবেই—তাকে হতেই হবে। এজন্যেই তো সে তাপসকে আজ জীবনের এক দামী অংশ বলে মনে করে এবং তাকে দেহ-মনের সবটুকু দিয়ে মূল্য শোধ করতে চায়।

অথচ এ এক আকস্মিক সর্বনাশের ঘণ্টা বেজে উঠেছে। আয়ার চেকে সই না করলে একা তাপসের সইতে ব্যাংক থেকে টাকাও তোলা যাবে না। তাছাড়া এই নচ্ছার বুড়োর প্রচুর ব্ল্যাক মানিও রয়েছে। দরকার হলে নগদ টাকা নিতে হয় তার কাছে—এবার দেখা যাচ্ছে, তাও আর দেবে না সে। ছবি শেষ হবার মুখে সব পণ্ড হতে চলেছে। এখনও দেড় লাখ টাকা খরচ করার দরকার আছে। অনেক পেমেন্ট বাকি। এত টাকা একজন নতুন প্রযোজককে চট করে কোন ডিসট্রিবিউটার কি সহজে দিতে চাইবে? অনেক পিছিয়ে যাবে সব। জানুয়ারিতে ছবি রিলিজ হবার সুযোগ পাওয়া গেছে—সে সুযোগও নষ্ট হয়ে যাবে এবার। রুচি ঘেমে উঠল। তাপস তার সঙ্গে সবই আলোচনা করে। তাই কিছু অজানা নেই রুচির।

ঠোঁট কামড়ে ধরে সে তাকাল জানলার বাইরে। আয়ার সায়েব টলতে টলতে গরিলার মত নিজের ঘরে চলে গেল।

রুচি ভাবল, এখনই খবর দেওয়া দরকার তাপসের কাছে। নরু চলে যাক। সে হন্তদন্ত হয়ে খাট থেকে নামল। পাশের ঘরে আয়ারের কাপড়চোপড় গোছানোর শব্দ শোনা যাচ্ছিল। বারান্দায় বেরোতে গিয়ে রুচি থামল। একটু ইতস্তত করল। তারপর সোজা আয়ারের ঘরে ঢুকে গেল। দেখল,আয়ার কোট ভাঁজ করছে। রুচি এগিয়ে গিয়ে তার পিঠে হাত রেখে ঝুঁকল তার দিকে। বলল, 'একটা কথা শুনুন তো বড়সাব!'

অভিনেত্রী রুচি হাসতে হাসতেই বলল।... 'জাস্ট এ টক। মিঃ আয়ার! প্লিজ—প্লিজ!'

আয়ার মুখ ফেরাল। ...'বোলো!'

'ডু ইউ লাভ মি?'

'ননসেন্স! ডোন্ট ট্রাই টু চিট মি মোর!'

'ও মিঃ আয়ার! প্লিজ! টেল মি ফ্র্যাংকলি—আপনি আমাকে কি সত্যি ভালবাসেন? বুকে হাত দিয়ে বলুন তো, হ্যাঁ, আমাকে ছুঁয়ে বলুন। টাচ মি, জাস্ট টাচ মি অ্যান্ড স্পিক।'

আয়ার উঠে দাঁড়াল। লাল মুখে ওকে একটু ঠেলে দিয়ে বলল, 'তুমি খানকি আছে—প্রসটিচুড আছে! গেট আউট! আভি গেট আউট!'

আবার একটা উত্তেজনা তীব্র জ্বালা রুচির মধ্যে জেগে উঠল। কিন্তু না—তাকে মাথা ঠাণ্ডা রাখতেই হবে। সে অপরূপ হেসে হেসে দু'হাতে জড়িয়ে ধরল আয়ারকে। তারপর তার গালে ঠোঁট ঘষতে ঘষতে বলল, 'ও মিঃ আয়ার! প্লিজ! আপনি কেন এতদিন খুলে বলেননি বলুন তো? প্লিজ, আমার দিব্যি—শুনুন, কথা শুনুন তো!'

আয়ারের রক্তে নিশ্চয় একটা সাড়া পড়ে যাচ্ছিল, সে স্থির হয়ে দাঁড়াল। রুচির দিকে তাকাল। মাংসাশী জন্তুর লোভ তার দু'চোখ ঠিকরে বেরিয়ে পড়ছিল ক্রমশ।

রুচি এবার সামনাসামনি ওর ঠোঁটে একবার ঠোঁটে রেখে তুলে নিল। তারপর আদুরে ভঙ্গিতে ফিসফিস করে বলল, 'যা চান—সব পাবেন। আমি আপনাকে ভালবাসি মিঃ আয়ার।'

আয়ার এবার আর সংযত থাকল না। ওকে জড়িয়ে ধরে, সশব্দে বিছানায় পড়ে গেল।

বেগতিক দেখে রুচি বলল, 'আঃ, কী হচ্ছে! নট নাউ! দিন-দুপুরে কী? বাইরে ওরা সব আছে—কে এসে পড়বে যে!'

আয়ার কামার্ত স্বরে বলল, 'বাট হাউ ইট উইল বি ইন দা নাইট? দ্যাট বাস্টার্ড তাপসবাবু উইলি বি উইথ ইউ! উও শালা তোমাকে না ছোড়বে!'

রুচি বলল, 'তাহলে আজ সন্ধ্যায় বাইরে কোথাও যাব আমরা!'

'কোথায়?'

'ওই পাহাড়টায়।'

আয়ার জানলা দিয়ে পাহাড়টা দেখে নিয়ে বলল, 'নাইস প্লেস!'

'হ্যাঁ। ওর ওপরে উঠব আমরা। সন্ধ্যার পর তো ফুল মুন পাব! আপনি উঠতে পারবেন না?'

'হাউ ফাইন! হামি পারবে। আরে, হামি তো পাহাড়ি দেশের লোক আছে। ইন দা চাইল্ডহুড, হামি ছিল গাঁওমে। পুনার নজদিকে—বহুৎ আচ্ছা হিলি এরিয়া! পাহাড় তো হামার ফাদার মাদার আছে।' আয়ার মহা আনন্দে আর উত্তেজনায় রুচিকে আবার চুমু খেল।....

রাত তখন আটটা। বিহারের এইসব অঞ্চলে শীতের দাঁত ভীষণ ধারোলো। কনকনে ঠাণ্ডা একটা হাওয়া সন্ধ্যার দিকে নদী থেকে এসে পাহাড়ের গা ঘুরে ঘুরে ওপর দিকে চলে গিয়েছে। বিকেলের রোদে নদীর চড়ায় কিছু ছবি তোলা হয়েছে। সূর্য ডোবার পর আয়ার সায়েবের গাড়িতে রুচির বাংলোয় ফেরার কথা। কিন্তু এতক্ষণে তাপস ফিরে এসে দেখলে রুচি ও আয়ার সায়েব নেই। নরুর কাছে জানা গেল সন্ধ্যার আগে ওদের ওই পাহাড়টার ওপর উঠতে দেখেছে সে। তাপস একটু অস্বস্তিতে পড়ে গেল। পাহাড়ের গায়ে জঙ্গলটায় বুনো জানোয়ার আছে শুনেছিল। বিশেষ করে শীতের সময় দু'একটা রাগী বাঘ ঘুরে বেড়ানোর কথা। আসন্ন মৈথুন ঋতুর গন্ধে তারা আগে থেকেই উত্তেজিত হয়ে থাকে। তাপস ভাবনায় পড়ে গেল।

আরও আধঘণ্টা অপেক্ষা করার পর সে নরুকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। নরু বাংলোর চৌকিদারের কাছে একটা বল্লম আর লণ্ঠন যোগাড় করল। তাপস একটা টর্চও নিল। সঙ্গে আরও কাউকে নিতে চাইছিল নরু, কিন্তু একটা কিছু ভেবে তাপস বারণ করল ওকে।

ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে দু'জনে পাহাড়ের কাছে গেল। জ্যোস্না আছে। গাছপালার মাথায় কুয়াশা থাকায় জ্যোৎস্না বড় ধূসর দেখাচ্ছে। পীচ রাস্তা পাহাড়ের দক্ষিণে বাঁক নিয়েছে যেখানে,

সেখানে ডাইনে কাঁচা রাস্তায় নামল ওরা। একটু পরেই রাস্তাটার ওপর আয়ার সায়েবের গাড়িটা দেখা গেল। তাপস চেঁচিয়ে ডাকল, 'আয়ার সায়েব! আয়ার সায়েব!' কোন সাড়া এল না।

নরু দৌড়ে গাড়িটার কাছে চলে গিয়েছিল ততক্ষণে। সেখান থেকে বলল, 'দাদা, কেউ নেই এখানে!' তাপস পাহাড়টার দিকে তাকাল। আড়াই হাজার ফুট উঁচু পাহাড়টা তার আদিম রহস্যের মধ্যে দাঁড়িয়ে চোখ কটমট করে যেন ভয় দেখাচ্ছে। রুচি আর আয়ারবুড়োকে কি সে গ্রাস করে ফেলল? ক্রমশ ভয়ের তীব্র অনুভূতি তাপসকে আড়ষ্ট করে তুলল। ওদিকে নরু ক্রমাগত চীৎকার করছে, 'দিদি, দিদি! আয়ার সায়েব!' কোন সাড়া নেই।

একটু পরে তাপস নরুকে নিয়ে পাহাড়ে উঠতে শুরু করল। ঢালু এদিকটা। দু'পাশে ঝোপঝাড় রেখে একটা পাকদণ্ডী উঠে গেছে চূড়ার দিকে। দু'জনে হাঁপাচ্ছিল। বিশ্রাম নিচ্ছিল। আর মাঝে মাঝে ওরা ভাঙা গলায় ডাকাডাকি করছিল। একসময় গাছপালা। ঝোপঝাড় শেষ হয়ে এল। এবার পুরোটা ন্যাড়া। কিন্তু ধাপের মত ভাঙাচোরা বড় বড় পাথর থাকায় উঠতে অসুবিধা হল না।

কিছুদূর ওঠার পর সামনে একটা চ্যাটালো সমতল জায়গা দেখা যাচ্ছিল। সেদিকে তাকিয়ে নরু চেঁচিয়ে উঠল, 'দিদি, দিদি!'

তাপস দেখল, হ্যাঁ—রুচি একা দাঁড়িয়ে আছে।

কাছে যেতেই রুচি হঠাৎ তাপসকে জড়িয়ে ধরল। তারপর তাপস দেখল, রুচি অজ্ঞান হয়ে গেছে। শীতের জ্যোৎস্নায় অত উঁচু ন্যাড়া চূড়ায় প্রচণ্ড শীতের মধ্যে রুচিকে শুইয়ে দিয়ে তাপস ভাঙা গলায় বলে উঠল, 'নরু নরু! বাংলোয় চলে যা' ওদের ডেকে নিয়ে আয়। আর জল আনবি। শিগগীর!' নরু তক্ষুণি চলে গেল।

তাপস বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে আয়ার সায়েবকে খুঁজছিল। কেউ নেই। হঠাৎ তার চোখ গেল কয়েক ফুট দূরে—পাহাড়ের পশ্চিম কিনারায় অতল কালো গভীর এক পাতাল থমথম করছে—সেদিকে চাঁদের আলো এখনও পৌঁছয়নি। দেখেই মাথা ঘুরে উঠল তাপসের। তাহলে কি আয়ার সায়েব ওখানেই পড়ে গেছে পা ফসকে?

নরুরা ফিরে আসার আগেই রুচির জ্ঞান ফিরল। সে উঠে বসতে যাচ্ছিল, তাপস তাকে ধরে নাড়া দিল—'রুচি, রুচি!'

রুচি তাপসের দিকে ঘুরে স্থির তাকাল। জ্যোৎস্নায় তার দুটো চোখ জ্বলজ্বল করতে থাকল। তাপস বলল, 'কী হয়েছে রুচি? আয়ার সায়েব কোথায়?'

রুচি ওকে ঠেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। চলতে থাকল।

তাপস সামনে দাঁড়িয়ে বলল, 'রুচি, কি হয়েছে বলবে? তুমি অমন করছ কেন? আয়ার সায়েবই বা কোথায় গেলেন?'

রুচি দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'আয়ারের অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে। সকালে ওদিকের খাদে খুঁজলে ওকে পাবে!

তাপস চাপা গলায় আস্তে বলল, 'হুঁ—ছবিটা পিছিয়ে গেল।'

মধুছন্দার বাড়ি থেকে টিউশনি সেরে অশ্রুর হঠাৎ খেয়াল হল একবার ফাদার পিয়েরের কাছে যাবে। উনি কাছে কাছেই থাকেন।

ফাদারের কাছে যাবার জন্য ক'দিন থেকেই অশ্রু মনে মনে তাগিদ পাচ্ছিল। যেন একটা সান্ত্বনার জায়গা খুঁজছিল সে। ঋতুকে কামালরা ক'দিন পরে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডের ওখানে একটা গাছের নিচে খুঁজে পায়। তার দু'হাতে শুকনো ঘাসের গোছ—শক্ত করে আঁকড়ে ধরে শুয়েছিল সে, একপাশে কাত হয়ে। যেন মৃত্যুর সময় শেষ চেষ্টায় জীবনকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চাইছিল সে। বাঁচেনি। রক্তে ঘাসগুলো ভিজে গিয়েছিল। অনেকটা রক্ত বমন করেছিল সে।

অশ্রু সব শুনেছে—কিন্তু ঋতুর মৃতদেহ দেখার জন্যে যেতে সাহস পায়নি। মৃত্যুকে তার ভীষণ ভয়। ছেলেবেলা থেকেই মৃতদেহের ব্যাপারে এক প্রচণ্ড আতঙ্ক আছে তার।

ফাদার সবে বাইরে থেকে ফিরেছেন। কফির পেয়ালা হাতে বসে একটা বই পড়ছিলেন। অশ্রুকে দেখে উৎসাহে নড়ে উঠলেন—

'এস, এস! বসো এখানে। আমার পাশে বসো। কতদিন তোমার সঙ্গে দেখা হয়নি। কেমন আছ?'

অশ্রু বসল।

'তোমার বন্ধুদের খবর কী? তুমি তো এখনও সেই স্কুলেই আছ! হ্যাঁ, মিসেস হেওয়ার্থ তোমার কথা বলছিলেন। তাঁর স্কুলে তুমি দরখাস্ত করেছিলে, শুনলাম। চান্স নেই। যাক গে। শোন—এসেছ, ভালই হয়েছে। তুমি অস্ট্রেলিয়া যেতে চাও?'

অশ্রু ফ্যালফ্যাল করে তাকাল। 'হ্যাঁ—অস্ট্রেলিয়ার মিশন থেকে মহিলা শিক্ষক চেয়েছে—ওখানকার অনাথ আশ্রমের জন্যে। যাবে তুমি? তাহলে বল।—লিখে দিই!'

অশ্রু বলল, 'যাব।'

'ভাল, খুব ভাল। এখন কফি খাও। তারপর তোমাকে এই বইটা থেকে কিছু পড়ে শোনাব। ডঃ বাল্টম্যানের থিওলজিকাল একজিস্টেনশিয়ালিজম। খাসা বই। তোমার জীবনধারাকে বদলে দেবে। তুমি সুখী হবে।'

অশ্রু ধরা গলায় বলল, 'হ্যাঁ—আমি সুখী হতে চাই, ফাদার।'

ফাদার ডাকলেন, 'বাবা শ্যাম! এক কাপ কফি খাইয়ে দাও আমার মেয়েকে। কী শ্যাম, চিনতে পারছ তো? কে এ বল তো? আমার মেয়ে— তাই না?' ফাদার হা হা করে হেসে উঠলেন।

শ্যাম নামে রোগা কালো ছেলেটি অশ্রুর দিকে তাকাতে তাকাতে কিচেনে চলে গেল—

কতক্ষণ পরে ফাদারের 'সেটেলমেন্ট' থেকে বেরোল অশ্রু। উৎসাহের আতিশয্যে ট্যাকসি করল। বাসায় ফিরে সে অবাক। দরজার সামনে এক ফরসা লম্বা-চওড়া প্রৌঢ় ভদ্রলোক পাশের ফ্ল্যাটের বুড়ো ডাক্তার ও তাঁর গিন্নির সঙ্গে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন। অশ্রুকে দেখেই ডাক্তারবাবু বলে উঠলেন, 'এই তো এসে গেছেন!'

অশ্রু বলল, 'কী ব্যাপার?'

ব্যাপার, ডাক্তার গিন্নি তেড়েমেড়ে বলতে এলেন।... 'এই যে ভদ্রলোককে দেখছ বাছা, ইনিই ও ফ্ল্যাটের আসল মালিক। তোমাদের বড়দির স্বামী। তীর্থ করতে বেরিয়েছিলেন—অ্যাদ্দিনে ঘরে ফিরলেন। তা আমি বলি কী এবার তোমরা সব নিজের নিজের আস্তানা জুটিয়ে নাও। যাঁর ঘর তাঁকে তো ছেড়ে দিতেই হবে। যান বাবা, নিজের ঘরে যাবেন, তো সংকোচ কিসের?'

অশ্রুর দিকে তাকিয়ে ভদ্রলোক করযোড়ে নমস্কার করে বললেন, 'আমার নাম নীতীশ ব্যানার্জি। আমি আপনাদের সব খবর রাখি। ভাববেন না যে, রাগ করে খুব বেশি দূরে ছিলুম।' নীতীশবাবু হাসতে লাগলেন।

ঘরে ঢুকে অশ্রু বিবির ঘরটা খুলে দিল। নীতীশবাবু হন্তদন্ত হয়ে বিবির বিছানায় গিয়ে একবারে বালকের মত গড়াগড়ি খেলেন। তারপর বললেন, 'আঃ! হাজার হলেও নিজের শয্যা! না কী বলুন! আজ দেড় বছর যাবৎ একবারও ঘুমোইনি। বিশ্বাস করবেন?' পরক্ষণে উঠে সব ঘরের জিনিসপত্র হাত বুলিয়ে দেখে বেড়াতে থাকলেন।

অশ্রু কোন জবাব দিল না। এখন তার কী করা উচিত সে জানে না। সে নিঃশব্দে কাপড় ছাড়ার জন্যে বাথরুমে ঢুকল।

নীতীশবাবু সব দেখেশুনে ঠিকঠাক আছে দেখে অবশেষে ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে ছিলেন। অশ্রু বেরোলে বললেন, 'আপনার খুব অসুবিধে হচ্ছে নিশ্চয়! তা শুনুন—ইয়ে, আমি বরং বিবি না ফেরা অব্দি কোন হোটেলে গিয়েই থাকছি। কবে ফিরবে কিছু লেখেনি?'

অশ্রু মৃদুস্বরে বলল, 'এ সপ্তাহেই। উনিশে।'

'ঠিক আছে। ও ফিরুক। ইতিমধ্যে আপনি একটা বাসা দেখে নিন। কেমন?'

অশ্রু ঘাড় নাড়ল।

'তাহলে আমি হোটেলে যাই?'

অশ্রু ফের ঘাড় নাড়ল।

চলে গেলেন ভদ্রলোক। অশ্রু ব্যালকনিতে দাঁড়াল। সেখান থেকে সে একটা পুরনো পৃথিবীকে দেখতে পাচ্ছিল—যেখানে ঘরছাড়া কয়েকটি মেয়ে হন্যে হয়ে ঘুরতে ঘুরতে এক জায়গায় এসে জুটেছিল। তারপর কে কোথায় চলে গেল। পিপাসার্ত কয়েকটি মেয়ে। তাদের নির্জন পিপাসা কি মিটল?

অশ্রু জানে না। রুচি কি তার নতুন জীবনে তৃপ্তি পেল? শুধু ঋতু—হতভাগিনী ঋতু হয়ত কিছুই পেল না। পৃথিবী ওকে বুঝতে চাইল না। ওর রক্ত নিংড়ে ওর বিদ্রোহের শোধ তুলল।

আর বৈজয়ন্তী ফিরে আসছে তার ঘরে। স্বামীকে কি সে গ্রহণ করবে? কে জানে! শুধু এটুকুই বোঝা যাচ্ছে যে, সবাইকে একদিন ঘরে ফিরতেই হয়। তবে যার যেখানে ঘর। হন্যে হওয়ার পর একদা কেউ কেউ তা খুঁজে পায়।

অশ্রু সেই হিম নিঝুম রাতের ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে হয়ত সুখে হয়ত দুঃখে তাদের পিছনের দিকে তাকিয়ে একটু কাঁদল। অশ্রুর মন মায়ের মন, তাই সহজে সে কাঁদতে জানে এবং শক্ত হতেও জানে। আর ঝাপসা চোখের সামনে সেই সময় সে দেখল, সেই উন্নত গীর্জার শীর্ষে হেলেপড়া পিতলের বিশাল ক্রশটা, আর কেউ নয়, সে নিজেই সোজা করে বসাতে চেষ্টা করছে এবং তাকে উৎসাহ দেওয়ার জন্যে কোথাও ঢঙ ঢঙ করে ঘণ্টা বেজে উঠল। জ্বলে উঠল একটা নীল-নক্ষত্র গীর্জার শীর্ষে দূরের আকাশে।

নদীর মতন

সিরাজ-উপন্যাস ১/২৮

সুদীপনকে দোতালার জানালা থেকে দেখতে পেয়ে সরে এসেছিল ধরিত্রী। দেখামাত্র বুকের ভেতর খানিকটা রক্ত ছলকে উঠেছিল। খাটের ওপর পা ঝুলিয়ে বসে একহাতে একটা বাজু আঁকড়ে ধরে এই ক্ষণিক উত্তেজনা চাপা দিতে তার কয়েক মিনিট সময় লেগে গেল। তারপর সেই উত্তেজনাটাই যেন গাঢ় ক্লান্তি হয়ে তার শরীরের ভেতর ছড়িয়ে পড়ল।

কাল রাত থেকেই একটা মূল্যবান জিনিস হারিয়ে ফেলেছে ধরিত্রী, তা হল আত্মবিশ্বাস। একবছর আগে যখন এই ফুলশেখরের পুরনো বাড়িতে চলে আসে, তখন ওটা পূর্ণমাত্রায় ছিল। কাল রাতে ছাদে দাঁড়িয়ে নদীর ওপারে বিপ্রশেখরে ব্রজবন্ধুবাবুর বিজয়োৎসব দেখার সময় অরিত্র এসে অন্ধকারে ফিসফিস করে বলে, 'বড়দি, জানিস? হলাকে পিটিয়ে মেরে ফেলেছে!' আর ধরিত্রী অবাক হয়ে টের পায়, সেই আত্মবিশ্বাস নিপাত্তা হয়ে গেছে। ভীষণ কেঁপে ওঠে সে। আস্তে বলে, 'তুই যা তো এখন।'

হলা মানে হলা দাস। কালো শক্ত চেহারার ছেলেটি। সুদীপনের ছাত্র ছিল কলেজে। মাঝে মাঝে এসে বলত, 'একটা কিছু করে দিন না স্যার! আপনার তো কত জানাশুনা!' সুদীপন চশমার পুরু কাচের ভেতর তাকিয়ে থাকত তার মুখের দিকে। বলত, 'তাই তো!' একদিন হলা এসে বলেছিল, 'আমি হয়ত খারাপ হয়ে যাচ্ছি স্যার! কিছুতেই ঠিক থাকতে পারছি না। দিন না একটা কিছু করে।' সুদীপন সেদিনও চশমার ভেতর থেকে নির্বিকার তাকিয়ে তাকে দেখছিল। কিছু কি করে দিতে পারত না সে? ধরিত্রীর বিশ্বাস, সে পারত। কিন্তু করে নি। সুদীপনের সুপারিশেই পরে দুটো ছেলে মার্কেটিং কো-অপারেটিভে চাকরি পেয়েছিল। তখন হলা দাসকে পুলিশ খুঁজে বেড়াচ্ছে।

হলাকে লোকেরা পিটিয়ে মেরে ফেলেছে। বিপ্রশেখরের নতুন বড়লোক ভাসারাম ভাণ্ডারির বাড়ি ডাকাতি করতে ঢুকেছিল। গ্রামরক্ষীবাহিনী যেন আগে থেকে টের পেয়ে তৈরিই ছিল। ওদিকে ব্রজবন্ধুর বাড়ির সামনের চটানে বাজি পুড়ছে, ভিড় করে লোকেরা দেখছে। মাইক্রোফোনে হিন্দি গান বাজছে। যুবকরা মাতাল হয়ে বেদম নাচছে। সেই সময় ভাণ্ডারিবাড়ির দরজায় বোমার শব্দ। খবর পেয়েই বাজি পোড়ানো বন্ধ, মাইক্রোফোন চুপ, একশ লোক রে রে করে ছুটে গেছে। আজকাল হয়ত ফরমুলা মেনে ডাকাতি করা যায় না।

সকালে অরিত্র বলছিল, 'হলারও খুব বাড় হয়েছিল। মানোয়ার দারোগা বলছে, অন্তত এ থানায় যদ্দিন আছি, আর ডাকাতি হবার চান্স নেই। হলা গেল। ওর দলের চারজন চাঁই হাসপাতালে এখন মরমর। কিন্তু আমার খুব খারাপ লাগছে জানিস বড়দি? হলা আমার বরাবর ক্লাসফ্রেন্ড ছিল! স্বপ্নেও ভাবিনি, ও এমন হবে। খবর পেয়ে রাতে গিয়ে ওকে দেখলাম। পঞ্চায়েত অফিসের সামনে রাস্তায় হলা চিত হয়ে পড়ে আছে—একদলা মাংস! বড়দি, ভাবা যায় না রে। এই হলার সঙ্গে আমি গঙ্গার ধারে কল্কেফুলের জঙ্গলে বসে আড্ডা দিতাম। তোর মনে আছে বড়দি? তোর বিয়ের আগের দিন হলা টেম্পো বোঝাই করে ফুল এনেছিল।'

সব মনে আছে ধরিত্রীর। টেম্পোটা ছিল সদরুল নামে হলার এক বন্ধুর বাবার। সদরুলের সঙ্গে পরে চেনাজানা হয়েছিল ধরিত্রীর। সেও ছিল সুদীপনের ছাত্র। ভাল গান গাইতে পারত। সেই সদরুল এখন টেম্পো চালিয়ে শহর থেকে গ্রামে, গ্রাম থেকে শহরে যাতায়াত করে। ফুলশেখর-বিপ্রশেখরের মাঠে উর্বর মাটিতে ফলানো সবজি আর নদীর মাছ নিয়ে যায়। এও একরকম ব্যর্থতা মনে হয় ধরিত্রীর। অমন সুন্দর গাইত ছেলেটা!

'ফুলগুলো কিন্তু হলার বাবার বাগানের, জানিস্ বড়দি?' অরিত্র বলছিল। 'হলার বাবা শম্ভু দাসের ছোটমত নার্সারি ছিল।'

ধরিত্রী জানে। শম্ভু দাস ছিল পুরুষানুক্রমে মালী। ওড়িশার লোক ওরা। শহরের জমিদারবাড়ির বাগানে ফুল ফোটাত। জমিদারিপ্রথা উচ্ছেদের পর বিঘেটাক জমি পেয়েছিল শম্ভু দাস জমিদারবাবুর দয়ায়। ওঁরা সব কে কোথায় চলে গেলেন। বাড়িটা সরকারের হাতে চলে গেল। শম্ভু দাস তখন তার জমিটাতে গিয়ে বসত করেছিল। ফুলফলের গাছ পুঁতেছিল। কিন্তু সবজিও ফলাত মরশুম অনুসারে। তার ছেলে হলধর স্কুলে পড়তে যেত। তাকে নাকি সবাই মালীর ছেলে বলে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করত। কিন্তু পড়াশুনাই হয়ত কাল হয়েছিল হলার। সে তো বাবার মত মাটি কোপাতে শেখেনি। মাটির ভাষা বোঝেনি। তার একূল ওকূল দুকূলই গিয়েছিল বলতে গেলে। শম্ভু দাসের মৃত্যুর পর সেই সাজানো বাগান শ্মশান হয়ে গিয়েছিল। তারপর কীভাবে আইনের ফাঁকে ঘরটুকু বাদে সব জমিটাই বাস্তুঘুঘুরা নিজেদের বিচরণক্ষেত্র করে ফেলে।

অরিত্র বলেছিল, 'হলার সঙ্গে ওদের বাগানে প্রায়ই ছুটির পর চলে যেতাম। কী সুন্দর জায়গা ছিল! কত ফুল! কত পেয়ারা, লিচু, আম! তোর মনে আছে বড়দি, ফিরতে সন্ধ্যা গড়িয়ে গেলে তুই বাসস্টপে দাঁড়িয়ে থাকতিস। হাতে লণ্ঠন থাকত। দূর থেকেই দেখতে পেয়ে কী আনন্দ না হত, জানিস? বটতলার স্টপটা তো ছিল সাংঘাতিক জায়গা। নদীর ব্রিজ পেরিয়ে আসতে আসতে মনে হত, যাঃ! আজ যদি বড়দি না থাকে, কেমন করে বাড়ি ফিরব? তবে একদিন হল দারুণ ব্যাপার। কাকাবাবু জানতেন না আমি মাঝে মাঝে দেরি করে ফিরি। কাকে যেন বাসে তুলে দিতে গেছেন, আর আমিও নেমেছি। আমায় দেখেই খামচে কলার ধরে সে কী বকুনি!'...

গণমিত্র কিছুক্ষণ আগে প্রাতঃভ্রমণ সেরে ফিরেছেন। আজ ফিরতে আটটা বেজে গেছে। বোধ করি বিপ্রশেখরে গিয়েছিলেন রাতের ঘটনার খবর নিতে। এ সপ্তাহের 'গ্রামবার্তার' চারপাতার তিনটে পাতা জুড়ে এই ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা এবং মন্তব্য থাকবে। মাথায় টুপি, খদ্দরের ঢোলা বুশশার্ট, খদ্দরের প্যান্ট, সাদা কেডস জুতো, কাঁধে ব্যাগ এবং হাতে একটি ছড়ি নিয়ে ঢ্যাঙা ফর্সা মানুষটির প্রেসে যাবার সময় হয়ে গেছে। বিধবা দিদি সংঘমিত্রা ফুলকো লুচি আর আলুভাজা করে দিয়েছেন। বারান্দায় একটা চেয়ারে বসে হাতে থালা রেখে ব্যস্তভাবে চিবুচ্ছেন।

ধরিত্রীকে নামতে দেখে বললেন, 'হলা তাহলে গেল!'

ধরিত্রী আস্তে বলল, 'হুঁ।' তারপর ডাইনে ঘুরে টানা বারান্দার শেষ প্রান্তে বাইরের ঘরের দরজার দিকে তাকাল। পুরনো বাড়ির কড়িকাঠ আর ঘুলঘুলিতে পায়রার আড্ডা। সারাক্ষণ বকবকম শব্দে কান ঝালাপালা হয়। টুসির মা ভোরবেলা এসে বারান্দা ঝেঁটিয়ে জল ঢেলে সব সাফ করেছে। বেলা হতে হতে আবার আবর্জনা জমবে। তাড়ান তো যায় না। ধরিত্রী আন্দাজ করছিল, সুদীপনের খবর বাড়ির ভেতর পৌঁছেছে কি না।

মিতুপিসি (সংঘমিত্রা) এখনও লুচি বেলছেন। পাশের ঘরে গায়ত্রী চাপাগলায় পড়াশুনো করছে। সামনে জুনে ওর বি এ পরীক্ষা। ধরিত্রী আস্তে বলল, 'অরু কোথায় গেল?'

গণমিত্র ঢোক গিলে বললেন, 'কে যেন ডাকছিল ওকে।' তারপর পায়ের কাছ থেকে জলের ঘটি তুলে ঢকঢক করে জল ঢাললেন গলায়। এঁটো থালাটা থামের পাশে রাখতে গেলেন।

ধরিত্রী চওড়া সিঁড়ি বেয়ে উঠোনে নামল। তারপর টিউবেলের পাশ দিয়ে এগিয়ে নোনাধরা ইটের পাঁচিলের কাছে গেল। মাথার ওপর ঝুঁকে থাকা বুগানভিলিয়ার লাল একটা থোকা ছিঁড়ল সে। আবার বাইরের ঘরের দরজাটার দিকে তাকাল। পুরনো পর্দাটা গুটিয়ে আছে। বাইরের বাতাস এসে একটু-একটু দোলাচ্ছে। পায়রাগুলো অবিশ্রান্ত বকবকম করছে। সুদীপন আর অরিত্র কী এত কথা বলছে বুঝতে পারছিল না ধরিত্রী।

সে পাঁচিলের ধারে ধারে এগিয়ে গোয়ালঘরের পাশ দিয়ে ঠাকুরবাড়িতে ঢুকল। তারপর ওপাশের খিড়কির দরজা দিয়ে বাগানে চলে গেল। বাগানের শেষদিকে একটা ছোট্ট পুকুর। বাঁশবন আর কলাগাছের জঙ্গলে ঘেরা। তারপর কিছুদূর খোলামেলা চাষের ক্ষেত। তার নিচে নদী, যে নদী

ফুলশেখর আর বিপ্রশেখরের মাঝখান দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। এখন চৈত্রের শেষে তার জল থাকার কথা নয়। চাষের জন্য মধ্যিখানে বাঁধ দিয়ে জল আটকেছে।

ধরিত্রী হাঁটতে হাঁটতে নদীর দিকে চলল। তার হাতে সেই বুগানভিলিয়ার লাল থোকাটা। নিচু বাঁধের ওপর ঘন গাছপালা ঝোপঝাড়ে কয়েকটি সাঁওতাল ছেলে সম্ভবত কাঠবেড়ালি তাড়া করে বেড়াচ্ছিল। ধরিত্রীকে দেখেই তারা থমকে দাঁড়াল, যে যেখানে ছিল, তাদের কারুর হাতে বাঁশের পাবড়া, কারুর হাতে ঢিল। একজনের হাতে গুলতি আর বাঁটুলও আছে। বড়জোর বার থেকে ছয়ের মধ্যে বয়স, আধন্যাংটা এবং ন্যাংটো ছেলেগুলো পিটপিট করে তাকিয়ে ধরিত্রীকে দেখছিল।

ধরিত্রী কাছে গিয়ে একটু হেসে বলল, 'কী মারছিস রে তোরা?'

ছেলেগুলো তেমনি খড়িতে আঁকা মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল। ধরিত্রীকে তারা হয়ত ভয় পায়নি। সিঙ্গিবাড়ির দিদিমণিকে তারা অসংখ্যবার দেখেছে সাঁওতালডাঙ্গায়। ফুলশেখরের দক্ষিণে নদীর ভাটিতে উঁচু ডাঙাজমির ওপর একসময় ছিল জমিদারি কাছারিবাড়ি। তখনও জন্ম হয়নি ধরিত্রীর। প্রচুর তালগাছ ছিল ডাঙা জুড়ে। জমিদারি উচ্ছেদের পর ভেকু গোমস্তা আট টাকা দরে গাছগুলো বেচে দিয়েছিলেন। মাটি ন্যাড়া করে কেটে নিয়ে যাওয়ার পর শুধু শিমুল গাছটাই টিকে ছিল। ওটাকে বেচে দেওয়ার সুযোগ পাননি ভেকু ভটচায। সে বছরই বর্ষার পর প্রচণ্ড বন্যা হয়। নাবাল এলাকা থেকে গণোসিঙ্গি উদ্ধার করে আনেন সাঁওতাল মানুষগুলোকে। কাছারিডাঙ্গা হয়ে ওঠে সাঁওতালডাঙ্গা। গণমিত্রের তখনও দুর্ধর্ষ যৌবন এবং রাজনৈতিক শক্তি। ভেকু ভটচায মানে-মানে কেটে পড়েন। নইলে এতদিনে ওই ডাঙ্গাজমি চষে সোনা ফলাতেন।

ধরিত্রী আড়চোখে বাঁশবনের ভেতর তাদের বাড়ির দিকটা দেখে নিয়ে ফের বলল, 'কীরে? হল কী তোদের?' তারপর কাছের ন্যাংটো ছেলেটা তার হাতের ফুলের দিকে তাকিয়ে আছে দেখে সে বলল, 'নিবি নাকি? আয়, কাছে আয়। কী নাম তোর?'

কাঁপা-কাঁপা স্বরে ছেলেটা বলল, 'টলু।'

ধরিত্রী হাসল। 'টলু? বেশ নাম তো তোর! বাবার নাম কী?'

'দিরেং।'

ধরিত্রী বুঝতে পারল ধীরেনের ছেলে ও। ধীরেনকে সবাই দিরেং বলে। কিন্তু ধীরেন সোরেং জোর গলায় বলে, তার নাম ধীরেন। ধীরেন এখন ওপারের বিপ্রশেখর গ্রামের ব্রজবন্ধুবাবুর দলের লোক। সাঁওতালডাঙ্গায় আর আগের মত এককাট্টা ভাবটি নেই। থাকলে তার ওখানে টেঁকা দায় হত। ধরিত্রী ফুলের থোকা থেকে ছেলেটাকে একটা ফুল দিল। সে ফুলটা নিয়ে তেমনি গম্ভীর হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ধরিত্রী আরেকজনকে ডাকল। 'এই! তোর কী নাম?'

'পচা।'

'অ্যাঃ!' হেসে ফেলল ধরিত্রী। 'পচা কী নাম রে! এই নে!'

চারটি ছেলেকে একে একে ডেকে ধরিত্রী লাল কাগজের টুকরোর মত খসখসে নির্গন্ধ বুগানভিলিয়ার ফুলগুলো বিলিয়ে দিল। পচার বাবার নাম রঘু। লাটু যার নাম, তার বাবা মোহন। রঘু আর মোহন দুই ভাই। মোহন ভেকুবাবুর বাড়ির মাহিন্দার। রঘু ক্ষেতমজুর। আর রতনের বাবার নাম হারু। হারু এক মজার লোক। কথা শুনে হাসতে হাসতে পেট ব্যথা করে ধরিত্রীর। কতরকম ক্যারিকেচার জানে ও। ভোটবাবু মন্ত্রিবাবুদের 'বক্তিমে' (বক্তৃতা) নকল করা ওর স্বভাব। পথেঘাটে, ক্ষেতখামারে, হাটবাজারে লোকে ওকে ডেকে সেই বক্তিমে শোনে আর হেসে খুন হয়। একবার গণসিঙ্গির বক্তিমে শুনিয়ে গণসিঙ্গিকেও হাসিয়ে অস্থির করেছিল। গণমিত্র নরম ধাতের মানুষ হলেও হাসেন-টাসেন খুব কম।

ছেলেগুলো কেন তার দিকে অমন করে তাকিয়ে রইল, ভাবতে ভাবতে ধরিত্রী বাঁধের পথে হাঁটছিল। মনটা এলোমেলো হয়ে গেছে কাল রাত থেকে। তারপর সকালবেলা ওই আগন্তুক।

কতদিন বৃষ্টি নেই। সারাক্ষণ জোরাল হাওয়া বইছে কদিন থেকে। নীলচে ডোরাকাটা শাড়ি ধরিত্রীর শরীর থেকে উড়ে যাওয়ার তাল করছিল। বাঁদিকে নদীর কাঁপা-কাঁপা জলে রোদ্দুর ঝিলমিল করছিল।

ওপারে পাম্প চালিয়ে কারা জমিতে সেচ দিচ্ছিল—সেই চাপা ধকধক শব্দ নিজের বুকের ভেতর মনে হয়।

'পঞ্চাতদিদি! পঞ্চাতদিদি!'

ধরিত্রী ডাইনে ঘুরে দেখল, শূন্য গমের ক্ষেতে কাঁখে ঝুড়ি নিয়ে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। শুকনো হলুদ গমের বিচুলি খুব কমই ছড়িয়ে আছে ক্ষেতে। সেগুলো একটা-একটা করে কুড়িয়ে ঝুড়ি ভরতে বেলা যাবে। ধরিত্রী একটু হাসল। 'কী গো?'

'অমন করে কোথা যাচ্ছেন, তাই শুধোচ্ছি পঞ্চাতদিদি!'

ধরিত্রী একটু হকচকিয়ে গেল। তাকে এভাবে মাঠঘাটে ঘুরতে দেখাটা খুব স্বাভাবিক—সে তো প্রায় এমন করে মাঠের জমিতে যায়। এপাড়া সে-পাড়ায় ঘোরাঘুরি করে নানা কাজে। গ্রামপঞ্চায়েতের প্রধান হলে যা হয়। বলল, 'তেলিপাড়ায় যাচ্ছি!'

সন্দেহপ্রবণ মেয়েটি চোখে হেসে বলল, 'তা ইবাগে ক্যানে গো দিদি? হৈদরের খালে অ্যাতোটা পাঁক হবে। বরঞ্চ...'

ধরিত্রী শক্ত হয়ে বলল, 'জমিটা দেখে যাব।'

যখন সে হৈদরের খালের কাছে গাবগাছটার তলায় পৌঁছেছে, ঘুরে দেখল তখনও মেয়েটি তার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ধরিত্রী একটু চমকাল। তাহলে কি তার চেহারায় কোন গণ্ডগোল ফুটে বেরিয়েছে? আর সত্যি তো, এমন করে সে কোথায় চলেছে? এ যেন তাড়াখাওয়া প্রাণীর মত নিরাপদ গর্তের খোঁজে হন্যে হয়ে পালান!

নদী থেকে একটা সংকীর্ণ খাল চলে গেছে গ্রামের দিকে। খালটা দিয়ে ফুলশেখরের সব জল এসে নদীতে পড়ে। কোন প্রাচীন সময়ে হৈদর নামে কেউ এই খালটা তৈরি করেছিল। তাই হৈদরের খাল বলে লোকে। খালের মুখ থেকে নদীর জল নেমে গেছে এখন। এখানে একটা স্লুইসগেটের জন্য ধরিত্রী ছোটাছুটি করে বেড়াচ্ছে তিনমাসযাবৎ। ওপারে বিপ্রশেখরের ব্রজবন্ধুবাবুদের সম্ভবত কলকাঠি নাড়া আছে। নদীর দুপারের দুটি গ্রামে বিবাদের একটা ট্রাডিশন রয়ে গেছে। কিছু করা যাচ্ছে না।

গাবতলায় শুকনো মাটিতে বসে পড়ল ধরিত্রী। রাতে ভাল ঘুম হয়নি। যতবার ঘুম এসেছে, অদ্ভুত সব স্বপ্ন। ভয়ঙ্কর ধরনের ঘটনা সে দেখেছে। একবার দেখল, নিজের ছোটভাই অরিত্রকে খুন করে মড়াটা লুকিয়ে ফেলার জন্য হন্যে হচ্ছে। তারপর দেখল, তাকে হলা বলছে, ধরিদি, আমার মাথাটা একটু টিপে দেবে? ধরিত্রী তার মাথা টিপতে থাকল। ঘুম ভেঙে অবাক হল সে। এ কী অদ্ভুত স্বপ্ন! হলার মাথা টিপে দেবার অনুভূতি আঙুলে তখনও জড়িয়ে আছে।

নির্জন ছায়ায় বসে ধরিত্রী টের পেল, তার বুকের ভেতর থেকে কী একটা ঠেলে উঠতে চাইছে। সে ঢোক গিলে একটুকরো ঢিল কুড়িয়ে নিল। নদীর জলে ছুঁড়ল। তারপর ওই খেলা খেলতে থাকল বালিকার মত।...

দুই

হলার ক্ষতবিক্ষত মড়াটা দেখে রাত থেকে অরিত্র মুহ্যমান। ভোরবেলা ছাদে গিয়ে আজ শরীরচর্চাও করেনি। কতক্ষণ ধরে অনর্গল সে হলার কথা বলেছে দিদির কাছে, কাকাবাবুর কাছে। তবু সব কথা যেন ফুরোয়নি। আসলে সে বিশ্বাস করতে পারছিল না হলার এই সাংঘাতিক পরিণতি হবে। যতবার হলার মড়াটা তার মনে পড়ছে, ততবার সে শিউরে উঠছে। গভীর এক আতঙ্ক তাকে কোণঠাসা করে ফেলছে। এই আতঙ্কটা দিদি বা কাকাবাবুর ওপর চাপাতে পারেনি সে। ধরিত্রী বরাবর এইরকম শক্ত আর নির্বিকার। গণমিত্রও কতকটা তাই—সবসময় ঠোঁটের কোনায় ক্ষীণ বাঁকা হাসিতে পৃথিবীর ভীষণ বিপর্যয়কে তুচ্ছ করতে পারেন। অরিত্র পিসিমার কাছে হলার কথা তুলতে গিয়ে ধমক খেয়েছে—পিসিমা বলেছেন, 'সক্কালবেলা দুটো ভাল কথা বলবি, তা নয়। খালি খুনোখুনি নিয়ে মুখটা নষ্ট করা।' অরিত্র ছোটবোন গায়ত্রীর পরীক্ষার কথা ভেবে তার কাছে হলার মড়াটা নিয়ে যায়নি। কিন্তু তার অবাক লেগেছিল, গায়ত্রীর পড়াশুনোর তাল একমুহূর্তের জন্যও কাটল না—রাতে নদীর ওপারের গ্রামে কী ঘটেছে, জানতে চাইল না পর্যন্ত! অরিত্রর পক্ষে এমনটা সম্ভব ছিল না—যত পরীক্ষাই থাক।

মনের এই তোলপাড়ের সময় বাইরে থেকে চাপা গলায় কেউ নাম ধরে ডেকেছিল। অরিত্র বেরিয়ে গিয়ে দেখে, জামাইবাবু। সঙ্গে সঙ্গে তার মুখ খুশিতে ভরে ওঠে। উঁচু খোলামেলা চত্বরের মত চওড়া বারান্দা থেকে লাফ দিয়ে নামে সে। পায়ের ধুলো নিতে ঝুঁকে যায়। সুদীপন তার দুকাঁধ ধরে দাঁড় করিয়ে দেয়। অরিত্র তার ছাত্র ছিল—ধরিত্রীর সঙ্গে বিয়ের আগে এবং পরেও।

অরিত্র সুদীপনের দিকে তাকিয়ে থাকে কয়েক সেকেন্ড। চুলে পাক ধরে গেছে সুদীপনের। মুখের রেখায় যেন বয়সের ছাপ পড়েছে। চোয়াল ঠেলে বেরিয়েছে দুপাশে। খাড়া মোটা নাকের ওপর অবশ্য একই চশমা—পুরু কাচের ভেতর ধারাল উজ্জ্বল দুটি চোখ। হালকা নীল রঙের হাফহাতা হাওয়াই শার্ট আর ছাইরঙা আঁটো প্যান্টের তলায় যেমন তেমন একটা চপ্পল—সুদীপনের পেটেন্ট পোশাক এখনও। অরিত্র গলা নামিয়ে বলে, 'বাসে এলেন বুঝি?'

সুদীপন ছোট্ট করে 'হুঁ' বলে চারপাশে তাকায়। ভাঙাচোরা ফটকের গা ঘেঁষে ফুলন্ত কৃষ্ণচূড়া আর বটগাছটা জড়াজড়ি দাঁড়িয়ে আছে দেখে তার মনে পড়ছিল, ধরিত্রীকে প্রায়ই বলত, 'আমাদের কি ওইরকম অসম মিলন?' ধরিত্রী বলেছিল, 'বিষম মিলন?' এ বাড়ি এলে অনেক কিছু মনে পড়ে যায় সুদীপনের, যদিও বিয়ের পর বড়জোর বার দুতিন এসেছিল। কিন্তু অনেক কিছু ঘটেছিল ওইসব স্বল্প সময়েই। এই বাড়িটা ফুলশেখর গ্রামের একেবারে শেষপ্রান্তে। চারপাশে পোড়ো ভিটেমাটি, দুরন্ত জংলি পরিবেশ, ধ্বংসস্তূপের ভেতর সংকীর্ণ রাস্তা দিয়ে একটু এগোলে বড় রাস্তা—পুবে ঘুরে নদী পেরিয়ে বিপ্রশেখর গ্রামে ঢুকেছে। বেরিয়ে চলে গেছে শহরের দিকে।

তারপর অরিত্র একটু ভাবনায় পড়ে গেছে। দিদি-জামাইবাবুর সম্পর্ক কী অবস্থায় পৌঁছেছে, সে আঁচ করতে পারে। গতবছর মার্চে হঠাৎ চলে আসার পর ধরিত্রী এখানেই থেকে গেছে। এপ্রিলে সুদীপন এসেছিল এবং অরিত্র তার ঘরের জানালা থেকে দেখেছিল, জ্যোৎস্নায় দুটিতে এই চত্বরের নিচে অনেকটা জায়গা জুড়ে পায়চারি করতে করতে নিচু গলায় জোরাল তর্ক করছিল। সকালে সুদীপনকে আর দেখতে পায় নি অরিত্র। আরও মাসতিনেক পরে বর্ষার এক রাতে ঝমঝম করে বৃষ্টি হচ্ছে। পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে গায়ত্রী তার ঘুম ভাঙিয়ে বলেছিল, 'দেখ তো অরু, কে যেন ডাকাডাকি করছে।'

নিচের ঘরে গণমিত্র হেরিকেনের আলোয় বই পড়ছিলেন। সেদিন সন্ধ্যা থেকেই বিদ্যুৎ ছিল না। অরিত্রের সাড়া পেয়ে বলেছিলেন, 'কী রে অরু?'

অরিত্র ঘুম জড়ানো গলায় বিরক্ত হয়ে বলেছিল, 'গরি বলল কে ডাকাডাকি করছে বাইরে।'

'ও কিছু না। বাতাসের শব্দ।'

'গরি বলল যে!'

'গরি অনেককিছুই বলে। তুই শুয়ে পড়গে যা।'

গায়ত্রীর এমন প্রবণতা অবশ্য আছে। সে ভীষণ ভূতবিশ্বাসী। গণমিত্রের মতে, সংঘমিত্রা ওর মাথাটি খেয়ে বসেছেন। ছোটবেলা থেকে আজগুবি গল্প বলে আর রাজ্যের কুসংস্কার ঢুকিয়ে ওকে প্রিমিটিভ করে ফেলেছেন।

অরিত্র ওপরে ফিরে গেলে ধরিত্রীর মুখোমুখি হয়েছিল। ধরিত্রী দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। অরিত্রকে দেখে সে আস্তে বলেছিল, 'কে রে?'

'কেউ না।'

'না কী বলছিস? ওই তো ধাক্কা দিচ্ছে।'

গায়ত্রী ব্যস্ত হয়ে বলেছিল, 'খোলা বারান্দায় ভীষণ ভিজছে কিন্তু—যেই হোক।'...

সুদীপন এসেছিল অত রাতে। রাত এগারোটার বাসে নেমে বৃষ্টির মধ্যে ভিজে কাদা মাখামাখি হয়ে শোচনীয় অবস্থা। শহরের মানুষ। তায় কলেজের মাস্টার।

অরিত্র লক্ষ্য করে জামাইবাবুকে। সুদীপন চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে একটু হাসে। 'তোমাদের বাড়িটা দ্রুত বদলে যাচ্ছে যেন। হয়ত আমারই চোখের ভুল।' তারপর বারান্দার সিঁড়ির দিকে পা বাড়ায়। 'চল, বসা যাক। ছ মাইল বাসে আসার ধাক্কায় ভীষণ কাহিল হয়ে গেছি। গ্রামাঞ্চলে দিনে দিনে

বাসের ভিড়টা বাড়ছে বড্ড। আসলে প্রবলেমটা হল সেই রূপকথার গল্পের। রাক্ষসের প্রাণভোমরায় ছোঁয়া লাগতেই হইচই হুলস্থূল চিৎকার চেঁচামেচি ভিড়।'

সুদীপন ঘুরে অরিত্রকে দেখে নেয়। অরিত্র তার পার্শ কাটিয়ে বারান্দায় উঠে বলে, 'কারেন্ট নেই। বাইরে চেয়ার এনে দিই।' তারপর ঘরে ঢুকে গদিআঁটা সবচেয়ে ভাল চেয়ারটা এনে দেয়। এই চেয়ারে বসে তার বাবা অনমিত্র ডাক্তার রোগী দেখতেন। এমন চওড়া বারান্দা তৈরি হয়েছিল রোগীদের বসার জন্য। ওপরে টালির একচালামত আচ্ছাদনও দেওয়া হয়েছিল। ঝড়ে সেটা ধ্বংস হয়ে যায়। আর বানাবার সুযোগ পাননি অনমিত্র। হঠাৎ থ্রম্বসিসে মারা যান। অরিত্রের বয়স তখন বছর সাতেক হবে।

চেয়ার রেখে ভেতরে খবর দিতে যাচ্ছিল অরিত্র। সুদীপন তার হাত ধরে টানল। 'ব্যস্ত হবার কিছু নেই। আজ আমার ছুটি।' তারপর সে বুকপকেট থেকে আধপোড়া একটু চুরুট বের করে ধরায়। বলে, 'তোমরা কে কেমন আছ বল আগে। কাকামশাইয়ের কাগজ কেমন চলছে?'

'ভাল।' অরিত্র অন্যমনস্কভাবে বলে।

'তুমি? তুমি কি কিছু করছ?'

অরিত্র মাথা নাড়ে। একটু হাসেও। 'কী করব? করার পাচ্ছি না।'

'হুঁ। চাপা শ্বাস ছেড়ে সুদীপন চুরুটের ছাই ফেলার চেষ্টা করে বলে, 'গ্রামে পড়ে থাকলে তো কিছু করা যায় না। তোমাকে বলেছিলাম...'

অরিত্র দ্রুত বলে, 'হলা মারা পড়েছে, জানেন?'

সুদীপন মুখ তোলে। 'হলা? মানে সেই হলা দাস?'

'হ্যাঁ। কাল রাতে বিপ্রশেখরে ডাকাতি করতে ঢুকেছিল। লোকেরা পিটিয়ে ওকে মেরে ফেলেছে।'

'তাই বুঝি?'

অরিত্র সুদীপনকে মুখ নামাতে দেখে এবং আরও কথা শোনার জন্য অপেক্ষা করে। কিন্তু সুদীপন চুপ করে আছে দেখে সে হতাশ হয়। বলে, 'ইদানিং হলা এই এরিয়ায় এসে জুটেছিল। নতুন রিক্রুট করেছিল আশেপাশের গ্রামে। কিছুদিন আগে ওর সঙ্গে দেখা হয়েছিল জানেন জামাইবাবু?'

'আচ্ছা।' সুদীপন আস্তে বলে। তার দৃষ্টি চুরুটের আগুনের দিকে।

অরিত্র গাঢ় স্বরে বলে, 'কাকাবাবু কেয়াতলায় পাঠিয়েছিলেন একটা কাজে। সাইকেলে করে আসছিলাম। তখন রাত সাতটা-সাড়ে সাতটার বেশি নয়। মাঠের মাঝামাঝি আসতে দেখি, কারা সব বসে আছে। চাঁদের আলো ছিল। বোঝেন তো আজকাল কী অবস্থা! ভীষণ ভয় পেয়ে গেলাম। বললাম, কে? তারপর হলার গলা শুনতে পেলাম। জানেন জামাইবাবু? ওর যে কী অবিশ্বাস্য গ্র্যাবিটি ভাবতে পারবেন না। একটু হাসল না পর্যন্ত। আপনার কথা—দিদির কথা, সব জানতে চাইল। বলল, ধরিদিকে দেখা করে আসবে। আপনাকেও। কিন্তু আসল ব্যাপারটা বলি শুনুন। ও যতক্ষণ কথা বলছে, আমি মুখে সায় দিয়ে যাচ্ছি, কিন্তু আমার চোখ পড়ে আছে ওর পায়ের কাছে। কী বলুন তো?'

সুদীপন মুখ তুলে তাকাল।

'চাঁদের আলোয় চকচক করছে একটা রিভলবার!' শ্বাসপ্রশ্বাস জড়ান গলায় অরিত্র বলে, 'ইচ্ছে হল, জিজ্ঞেস করি হলাকে ওটা নিয়ে কী করছিস এখানে। সাহস পেলাম না।'

সুদীপন হাসে একটু। 'যা স্বাভাবিক এ মুহূর্তে—এ দেশে, তাই তুমি দেখেছ অরু।'

'আমি কিন্তু আজও ভেবে পাইনে, হলা কোথায় রিভলবার পেল?'

'তুমি কি চাও একটা?' সুদীপন একটু শব্দ করে হাসে।

অরিত্র শুকনো হেসে বলে, 'নাঃ! আমার কী দরকার?'

'ফায়ারআর্মস আজকাল মুড়িমিছরি। সারা দেশে হাতে হাতে ছড়িয়ে যাচ্ছে।' সুদীপন হাই তোলে। চুরুটের ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে বলে, 'কীই বা করবে সব? কিছু তো করার নেই—আই মিন, ভাল কিছু।'

অরিত্র দুঃখিত কণ্ঠস্বরে বলে, 'জানেন জামাইবাবু? হলার মৃত্যুটা আমার একটা শকিং এক্সপিরিয়েন্স। আশ্চর্য লাগে, যতবার মনে পড়ে হলার সঙ্গে ওদের নার্সারিতে যেতাম। কত ফুল ছিল চারদিকে। হলা ফুলের মধ্যে মানুষ হয়েছিল, তাই না জামাইবাবু? কখনও গেছেন ওদের বাড়িতে?

গঙ্গার ধারে কী সুন্দর জায়গা! তার চেয়ে বড় কথা, হলা কত নিরীহটাইপের ছেলে ছিল। কলেজে তো ওকে দেখেছেন। আপনি কি ভাবতে পেরেছিলেন ও ডাকাত হবে? বলুন আপনি!'

গণমিত্রকে বেরুতে দেখে সে চুপ করে। সুদীপন হেঁট হয়ে চুরুটটা চেয়ারের পায়ার কাছে রেখে উঠে দাঁড়ায়। তারপর এগিয়ে গিয়ে গণমিত্রের দুই কেডসজুতোর মধ্যবর্তী স্থানে আঙুল ছুঁইয়ে মাথায় ঠেকায়। গণমিত্র তাকে দেখে থমকে দাঁড়িয়েছিলেন। ঠোটের কোনায় একটু হাসি এনে বলেন, 'কতক্ষণ?'

'একটু আগে।' সুদীপন খুড়শ্বশুরের মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, 'প্রেসে চললেন নিশ্চয়?'

'আর কোন চুলোয় যাব, বল?' গণমিত্র মুখে ভর্ৎসনা ফুটিয়ে অরিত্রকে বলেন, 'এখানে বসিয়ে রেখেছিস যে? ভেতরে নিয়ে যাস নি কেন?'

সুদীপন দ্রুত বলে, 'যাচ্ছি'খন। এখানে বেশ হাওয়া দিচ্ছে।'

'অগত্যা চা-ফা এনে দে জামাইবাবুকে।' বলে গণমিত্র সুদীপনের দিকে ঘোরেন। 'হ্যাঁ গো, তোমাদের কলেজে কী সব গণ্ডগোল চলছে যেন। কী ব্যাপার?'

'অশিক্ষক কর্মীদের দাবিদাওয়া নিয়ে। মিটে যাবে।'

'প্রিন্সিপ্যালকে নাকি দশ ঘণ্টা ঘেরাও করেছিল। হাসপাতালে যেতে হয়েছে।'

'অতকিছু নয়।'

গণমিত্র ঠোটের কোনায় বাঁকা হাসিটি হেসে বলেন, 'তোমরাও আছ এর পেছনে। হুঁ হুঁ—সব জানি। *পাড়াগাঁয়ে পড়ে থাকলেও কামচাটকার খবর রাখি বাবাজি। ফিরে এসে কথা হবে। কেমন?'*

গণমিত্র ব্যস্তভাবে সিঁড়ি বেয়ে নেমে যান। এবড়োখেবড়ো প্রাঙ্গণ পেরিয়ে ফটকে পৌঁছে একবার কেন এদিকে ঘোরেন। তারপর গাছপালার ভেতর অদৃশ্য হন। অরিত্র বলে, 'এক মিনিট। আসছি।' সুদীপন চুরুটটা তুলে টানবার চেষ্টা করে।

সংঘমিত্রা দাঁড়িয়ে ছিলেন রান্নাঘরের বারান্দায়। অরিত্রকে দেখে বললেন, 'খাবি না আড্ডা দিবি রে? খেতে বসে তো বলবি কুকুরের কান তৈরি করেছি!'

অরিত্র চাপাগলায় বলে, 'বড়দি ওপরে আছে পিসিমা?'

'ধরি? ধরি তো কিছুক্ষণ আগে উঠোনে দাঁড়িয়ে ছিল।' সংঘমিত্রা বিরক্ত মুখে বলেন, 'সেও তো খায়নি! তোদের নিয়ে আমার হয়েছে জ্বালা!'

অরিত্র বলল, 'জামাইবাবু এসেছেন।'

'কে?' সংঘমিত্রা ভুরু কুঁচকে তাকাল।

'জামাইবাবু। বাইরে বসিয়ে রেখেছি।'

সংঘমিত্রা বেঁটে মোটাসোটা মানুষ। ধুপধুপ করে পা ফেলে তক্ষুনি বাইরের ঘরের দিকে ছোটেন। ঝি টুসির মায়ের কান খুব সজাগ। উঠোনে কলতলায় বাসন মাজতে মাজতে থেমে গিয়েছিল। ফিসফিস করে অরিত্রের উদ্দেশে বলে, 'জামাইবাবু এসেছেন বুঝি? ইদিকে পঞ্চাতদিদি তো ঠাকুরবাড়ির খিড়কি দিয়ে বেরুলেন একটু আগে।'

গ্রামে ইদানিং ধরিত্রীর নাম পঞ্চাতদিদি অর্থাৎ পঞ্চায়েতদিদি। অরিত্রের মনে মনে রাগ হয় প্রচণ্ড। একে তো সে ধরিত্রীর পুরুষমানুষের মত গ্রাম রাজনীতিতে জড়িয়ে থাকাটা পছন্দ করে না, তার ওপর এই বিদঘুটে ডাকনাম। এসবের মূলে কিন্তু কাকাবাবুরই যোগসাজশ। নিজের বয়স হয়েছে বলে ভাইঝিকে সামনে ঠেলে দিয়েছেন। দিনের পর দিন ভজিয়েছেন। কিন্তু এও জানে অরিত্র, ধরিত্রীর মনে এই বিষ প্রথমে ঢুকিয়ে দিয়েছিল হয়ত জামাইবাবুই। যখনই শহরে দিদির কাছে গেছে, শুনেছে জামাইবাবু ওকে 'সমাজ-অর্থনীতির কনট্রাডিকশন' বোঝাচ্ছেন। কথাটা অরিত্রের কাছে আজও অস্পষ্ট।

অরিত্র ঠাকুরবাড়ির ভেতর গিয়ে ধরিত্রীকে খুঁজছিল। দেখতে না পেয়ে খিড়কির দরজায় উঁকি মেরে এদিক-ওদিক খুঁজল। ধরিত্রী কোথাও নেই।

ফিরে এসে ওপরের ঘরগুলো দেখল। ধরিত্রী নেই। নিচের বারান্দায় গায়ত্রী এতক্ষণে বেরিয়েছে। অরিত্র বলল, 'বড়দিকে দেখেছিস?'

গায়ত্রী মাথা নাড়ল। পরীক্ষার দিন যত এগিয়ে আসছে, সে তত গম্ভীর কিংবা শীতল হয়ে যাচ্ছে। পৃথিবীর আর কিছু তার নজরে পড়ে না। যন্ত্রের মত খাবারের থালা নিয়ে গায়ত্রী ফের পড়ার ঘরে ঢুকল।

অরিত্রের এতক্ষণে সন্দেহ হয়, ধরিত্রী যেন সুদীপনের আসাটা আঁচ করেই কেটে পড়েছে। তা না হলে খেয়ে বেরুত। মুসলমানপাড়ায় শহিদুলির বাড়ির বাইরের ঘরে গ্রাম পঞ্চায়েতের অফিস। রোজ সকালে ধরিত্রী সেখানে কিছুক্ষণ থাকে। তারপর পঞ্চায়েতি কাজকর্ম যেখানে হচ্ছে, সেখানে একবার যায়। কিংবা সাঁওতালডাঙায় কখনও। কাল বিকেলে নদীর ওপার থেকে অরিত্র দেখেছিল, ধরিত্রী গ্রামের কিছু মাতব্বর লোককে সঙ্গে নিয়ে ভাঙা বাঁধের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। খুব খারাপ লেগেছিল অরিত্রের।

সংঘমিত্রা বাড়ির জামাইকে টেনে আনছিলেন ভেতরে।

সুদীপন ভাল ছেলের মত পিসিশ্বাশুড়ির পেছন পেছন সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেল এবং অরিত্রকে গাঢ় কণ্ঠস্বরে ডেকে গেল। অরিত্র বলল, 'চলুন। যাচ্ছি।'

কিন্তু অরিত্র ওপরে গেল না। তার মন বলছিল, একটা কিছু ঘটতে চলেছে—বিস্ফোরণের মত সাংঘাতিক। জামাইবাবু এমন করে হঠাৎ এসে হয়ত ভুল করেছেন। ধরিত্রী এক বছর ধরে এখানে বাস করছে—তার বিয়ের চারটে বছরকে এই একটা বছর সম্ভবত গ্রাস করে ফেলেছে। তা না হলে কেন ধরিত্রী গ্রামের কদর্য জীবনে এমন করে জড়িয়ে পড়তে গেল?

অরিত্র বেরিয়ে পড়ে বাড়ি থেকে। সাইকেল নিয়েই বেরোয়। শেষ চৈত্রের রোদ নটা বাজতে না বাজতে খর হয়েছে। হু হু করে বাতাস বইছে। বড় রাস্তায় পৌঁছুলে সামনে থেকে জোরাল বাতাস তাকে ধাক্কা দেয় মুহুর্মুহু। বাস স্টপের কাছে হাটতলার চটান আজ খাঁ খাঁ করছে। ছোট্ট বাজারটাতেও তত ভিড় নেই। যেটুকু আছে, সেখানে আজ খালি হলা ডাকাতের গপ্প। হাইস্কুলের দিকটাও জনহীন। স্কুলের মাঠে গরু ঢুকেছে। তাড়িয়ে দেবার লোক নেই। নদীর ব্রিজে পৌঁছুলে কেউ তাকে ডাকে। পাশের বাঁধ থেকে দৌড়ে আসছে সীমন্ত। 'অরু! কোথায় চললি রে?'

'তোদের গাঁয়ে।'

সীমন্ত সাইকেলের রডে চেপে বলে, 'কাল সারারাত যা অবস্থা! তুই আসিস নি হলাকে দেখতে?'

অরিত্র হাওয়ার উজানে প্যাডেলে চাপ দিয়ে শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বলে, 'দেখেছি।'

তিন

এপারে ফুলশেখর, ওপারে বিপ্রশেখর। মাঝখানে যে নদী, তার আসল নাম নিয়ে 'গ্রামবার্তায়' একবার জোরাল বিতর্কের সূত্রপাত করেন গণমিত্র। গ্রামাঞ্চলে ইদানিং শিক্ষিতের সংখ্যা কম নয় এবং তাঁদের প্রচুর শিক্ষাভিমান। প্রাইমারি স্কুলে মাস্টারি করতে করতেও অনেকে প্রাইভেটে বাংলার এম এ। সুতরাং তর্ক জমেছিল। গণমিত্রের মতে, এলাকার চাষাভুষো মানুষের সঙ্গেই এ নদীর নাড়ির সম্পর্ক পুরুষানুক্রমে এবং তাঁরা এ নদীকে বলেন 'দড়কা'। অতএব সেটাই আদত নাম। কিন্তু বাবুজনেরা বলেন 'দ্বারকা', সেটা নেহাত আর্যীকরণ—জাতে ওঠার চেষ্টা। জমিদারি কাগজে, সরকারি নথিতে দ্বারকা লেখা তো হবেই। শ্রেণীসংস্কার তো তাকেই বলে। এঁদের হাতেই নথিপত্র চিরদিন লেখা হয়।

গণমিত্র চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছিলেন, আঞ্চলিক উপভাষায় দড়কা মানে হঠকারি। এ নদী কি হঠকারি নয়?

তবু বাবুসমাজ দড়কা নেয়নি এ পর্যন্ত। আর ফুলশেখর-বিপ্রশেখরে বামুন-কায়েতের ছড়াছড়ি। একসময় বামুনরাই ছিলেন জমিদার এবং কায়েতরা তাঁদের কর্মচারী। আকবর বাদশার আমলে সেনাপতি মানসিংহ বিদ্রোহ দমনে এসে দুই সেনানিকে নাকি জায়গির দিয়ে রেখে যান। যমজ দুই ভাই তাঁরা, ফুলশেখর এবং বিপ্রশেখর, শরীরে নাকি খাঁটি আর্য রক্ত ছিল। তদুপরি বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ। তাঁদের নামে দুই গ্রামের নাম। এখন কথা হচ্ছে, তাঁদের কুলকারিকা গ্রন্থে স্পষ্ট লেখা আছে দ্বারকা নদীর

কথা। গণমিত্র তা মানেন না। লিখেছিলেন, তাতে কী? ওঁরা তো বিদেশি। দড়কাকে দ্বারকা করতেই পারেন।

স্বাধীনতার পর নদীর দুধারে বামুনরা ক্রমশ ফতুর হয়েছেন। কেউ ছেলে ঠেঙিয়ে খান, কেউ পুজোআচ্চা করেন। কায়েতদের আশাতীত উন্নতি হয়েছে। ইনটেলেক্ট এবং কলম দুয়েরই জোর তাঁদের। বামুনরা টিট কালক্রমে। জাতপাত নিয়ে অন্য প্রদেশের মত খেয়োখেয়ি না ঘটলেও ভেতরে ভেতরে ফোঁসেন, ঘটনাচক্রে তা টের পাওয়া যায়। যেমন, বিদ্যুৎ আসার সময় মাঠের ট্রান্সমিটার থেকে লাইন এসেছিল প্রথমে কায়েতপাড়া ঘুরে। অথচ সোজাসুজি ঢুকতে পারত বামুনপাড়ায়। তার আর খুঁটি লাগতও কম।

গোড়ায় এটা ঘটেছিল বিপ্রশেখরে। ফুলশেখরে লাইন এল নদী ডিঙিয়ে এবং এখানেও একই ব্যাপার ঘটল। প্রথমে এলো ডাক্তারের বাড়ি, তারপর ঘোষ-বোস-মিত্র বাড়ি ঘুরে ভেকু ভটচায পেলেন। বামুনপাড়া ঘুরে লাইন গেল মুসলমানপাড়া। মধ্যিখানে তেলিপাড়া, চাষাপাড়া, গোয়ালপাড়া পড়ে। তাদেরও বিদ্যুৎ নেবার ক্ষমতা ছিল। কিন্তু কী এক অদ্ভুত ব্যবস্থায় লাইন পেতে পেতে তিন-চারটে বছর গড়িয়ে যায়। তাও গণমিত্রের ছোটাছুটির ফলে। সুতরাং মুখোমুখি সংঘর্ষ না বাধলেও জাতপাতের অবচেতন লীলাখেলা ছিল।

তারপর দু-দুটো দশক গড়িয়ে গেছে। জাতপাতের অবচেতনা একের পর এক নতুন জটিলতার তলায় প্রায় হেজেমজে গেছে। কিন্তু আরেক সনাতন দ্বন্দ্ব এখনও ঘোচেনি—সে ওই নদী কেন্দ্র করে।

সচরাচর নদীতীরবাসীরা দুর্ধর্ষ প্রকৃতির মানুষ হয় ওঠে। আর এ নদীর নাম যদি হয় দড়কা বা হঠকারী, বোঝাই যায় তাদের রক্তের গতিপ্রকৃতিটা কেমন। দুই গ্রামের মাঝখানে মাঠের জমি নিয়ে কিংবা পশুপালন নিয়ে সংঘর্ষ চিরাচরিত। এখানে চিরদিনের বিবাদ নদী নিয়ে। বিপ্রশেখর নদীর পূর্বপারে একটু নিচু মাটির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। ফুলশেখরের মাটিটা অপেক্ষাকৃত উঁচু। কিন্তু বিপ্রশেখরের সীমানায় বাঁধ থাকার দরুন ফুলশেখরের নিচু জায়গাগুলো বর্ষায় ডুবে যায়। কুনাইপাড়া, তেলিপাড়া, চাষাপাড়ায় জল ঢোকে। গণমিত্র আগে যখন অঞ্চলপ্রধান ছিলেন, ফুট ছয়েক উঁচু বাঁধ মঞ্জুর করিয়েছিলেন টেস্টরিলিফের দৌলতে। এই বাঁধ হওয়ার পর বিপ্রশেখরের বাঁধটা প্রতি বছর ভেঙে যেত। তাই নিয়ে রক্তপাত, মামলা অনেককিছু হয়ে গেছে। এখনও দুই গ্রামে এ নিয়ে মনান্তর সমানে চলেছে।

তারপর নদীর জল নিয়েও, বিবাদ চিরদিন। শীতের শেষে জল যখন ফুরিয়ে আসে, দুই গ্রামের মাতব্বররা আপসে মিটিং ডেকে নদীর বুকে বাঁধটা অবশ্য বেঁধে দেন এবং জল জমে ওঠে। কিন্তু এক পারে পাম্পের সংখ্যা বেশি দেখলেই অন্য পারে হুংকার ওঠে। ধরিত্রী ফুলশেখরের পঞ্চায়েত প্রধান হয়ে একটা ইরিগেশান সেন্টারের জন্য লড়াই করছে। বিপ্রশেখরে গিয়ে দফায় দফায় মিটিং করেছে। ইরিগেশান সেন্টার হলে সেটার ব্যবস্থাপনা সরকারের। প্রয়োজনমত সেন্টার দুপারের জমিজিরেতেই সমানভাবে জল যোগাবে। বিবাদের কারণ থাকবে না আর।

কিন্তু আবার দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয়েছে অন্যদিক থেকে। পঞ্চায়েত নির্বাচনে অঞ্চলপ্রধান হয়েছিল ফুলশেখরের শহিদুল ইসলাম। মনোমোহিনী বিদ্যালয়ের শিক্ষক সে। বিপ্রশেখরের ব্রজবন্ধু রায় হল সহকারি প্রধান। তিনি মামলা ঠুকে দেন সঙ্গে সঙ্গে এবং সেই মামলা হাইকোর্টে চলে যায়। তিন বছর পরে রায় বেরিয়েছে সদ্য গতকাল। ব্রজবন্ধু জিতেছেন। কাল রাতে ঢাকঢোল বাজিয়ে বাজি পুড়িয়ে বিপ্রশেখরে উৎসব হয়েছে। সেই সুযোগে হলা দাসের দল ভাসারাম ভাণ্ডারির বাড়ি ডাকাতি করতে ঢুকেছিল। বিজয়োন্মত্ত জনতার কাণ্ডকারখানা। হলার বোমার শব্দই নাকি আলাদা—যা শুনে রাইফেলধারি পুলিশেরও বুক কেঁপে ওঠে। অথচ বিপ্রশেখরের ছানাপোনারাও ছুটে গিয়েছিল রে রে করে। এরাতে তারা হয়ে উঠেছিল সেরা এক জঙ্গি জাত। সুইসাইড স্কোয়াডের মত। আর তখন ব্রজবন্ধু ফুলের মালায় সেজে বরের মত বসেছিলেন বাড়ির সামনেকার বারান্দায়।

হৈদরের খাল পেরিয়ে ধরিত্রী যখন উঁচু পাড়ের ঝোপঝাড় আঁকড়ে উঠে যায়, তখনও নিজের আচরণের পুরো মানে টের পায়নি। আক্রান্ত জন্তুর মত পালিয়ে যাচ্ছে বলে মনে হয়েছিল ঠিকই, তাই

বলে এতটা বাড়াবাড়ি? স্লিপারও খোলেনি পা থেকে। ওই অবস্থায় উঠে পায়ের দিকে তাকিয়ে সে অবাক হয়েছিল। আর শাড়ি জুড়ে কাদার ছোপ। চুলে ঝোপের মাকড়সার জাল। কাঁধে পোকামাকড়। বাঁশবনের ভেতর শুকনো বাঁশপাতায় জড়িয়ে গেল দুপায়ে। অদ্ভুত এক রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে তেলিপাড়ার ঘাটে নামে। নির্জন ঘাটে পা আর জুতো ধুয়ে সে হনহন করে হাঁটতে থাকে। তেলিপাড়া হয়ে শহিদুলের বাড়ি যাবে ভেবেছিল। এই জলকাদার ছোপ নিয়ে আর যেতে ইচ্ছে করে না।

বেচারা শহিদুল ভীষণ মুষড়ে পড়েছে। কাল সন্ধ্যায় কলকাতা থেকে বাসে ফিরে সোজা ধরিত্রীকে খবর দিতে এসেছিল। শহিদুল বলছিল, 'রিইলেকশানের জন্য আর মামলা করে কী হবে? রেজিগনেশান দেব। ব্রজদা আমাকে টিকতে দেবে না। আর ধরিত্রী, তুমি বলছ ভেতরে থেকে লড়াই করতে? আমার আর দম নেই। ফুরিয়ে গেছে।'

এই শহিদুল এতদিন বলত, 'ধরিত্রী, তুমি আমার ইনসপিরেশান।' তিরিশ বছর বয়েসেই শহিদুল চার ছেলেমেয়ের বাবা। তাদের সংসারটাও খুব বড়। প্রচুর জমিজমা আছে। চাষীবাড়ির ছেলে শহিদুলকে গণমিত্রই পঞ্চায়েতি রাজনীতিতে টেনে এনেছিলেন। প্রথম প্রথম সে ধরিত্রীর চোখে চোখ রেখে কথা বলতেও আড়ষ্ট হয়ে যেত। ধরিত্রীকে পরে সে 'ইন্সপিরেশন' বলতে পেরেছিল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিত্রীর সঙ্গে সে কথা বলতে তর্ক করতে আর আড়ষ্ট হত না। আর মাঝে মাঝে ধরিত্রীর একটু বিরক্তিও এসে যেত। মাঝে মাঝে তার মনে হত, শহিদুলের মধ্যে যেন কী এক সাহস উঁকি দিচ্ছে—শহিদুল তার প্রেমে পড়ে যায়নি তো? মনে মনে হেসে ধরিত্রী আরও শক্ত করে ফেলত নিজেকে। আরও গম্ভীর হয়ে উঠত। বলত, 'ঠিক আছে। এবার একটু জরুরি কাজে বসতে হবে। তুমি এস শহিদুলদা।'

শহিদুলের বউটি দেখতে-শুনতে মন্দ না। বি এ অবধি পড়েছিল। চার-চারটে জন্ম দিয়ে রোগা পাঁকাটি হয়ে গেছে। আড়ালে ধরিত্রীকে বলেছিল, 'বাবা না হঠাৎ মারা গেলে, আমাকে এ চাষাভুষোর বাড়ি হাঁড়ি ঠেলতে আসতে হত না। আমার জীবনটা শেষ হয়ে গেল দিদি! সম্পত্তি দেখে আমার মায়ের মাথার ঠিক ছিল না।'...

ধরিত্রী নদী বাঁয়ে রেখে চষা জমির চাঙড়ে পা ফেলে হাঁটতে থাকে। শুকনো সাদা নরম মাটি গুঁড়ো হয়ে চৈত্রের হাওয়ায় ধুলো ওড়ে। সাঁওতালডাঙ্গার কাছে এসে সে একটু দাঁড়ায়। ডাঙ্গার দক্ষিণে নিচু জমিতে কাঠাপাঁচেক আখ দিয়েছে। মাহিন্দার তিলক বলছিল, 'সাঁওতালপাড়ার গরু-বাছুরের উৎপাতে আখগুলো বাঁচে কি না। বললে শোনে না—চোখ রাঙায়। আজকাল ওরা বেজায় বেড়েছে, বাবুদিদি। বলবেন তো লাটু-ফাটুকে।'

মনে পড়ে গিয়ে ধরিত্রী শিমুলতলার সিঁথির মত পায়ে চলা রাস্তায় হাঁটতে থাকে। মাটি ক্রমশ উঁচু হয়েছে এখানে। দুধারে শেয়াকুলকাঁটার ঝোপঝাড়। কাপড় পায়ের কাছে আটকে যায় চারবার—যা হাওয়া। শেষ কাঁটাটা ছাড়িয়ে মুখ তুলে ধরিত্রী দেখতে পায় শিরিসতলায় চৌপায়ায় বসে সিগারেট টানছে কেউ। সে এদিকে ঘুরলে ধরিত্রী চিনতে পারে। বিপ্রশেখরের বিশ্ববন্ধুই বটে। ব্রজবন্ধুর বৈমাত্রেয় ভাই।

বিশ্ববন্ধু এখানে কী করছে বুঝতে পারে না ধরিত্রী। তাছাড়া ও অনেক বছর ধরে বাইরে ছিল। কলকাতা কিংবা অন্য কোথাও। এতদিন পরে তাকে এখানে দেখে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে ধরিত্রী।

বিশ্ববন্ধুও তাকে দেখছিল। তারপর শিরিসগাছের ছায়ায় তার সাদা দাঁত দেখা যায়। সে হাসে।

ধরিত্রীও একটু হেসে এগিয়ে যায়। সাঁওতালপাড়া এখন প্রায় জনহীন। বুড়োহাড়াম একটা লোক শনের দড়ি তৈরি করছে বিশ্ববন্ধুর পাশে। পেছনে একটা সাদা কুকুর নিজের লেজ কামড়াচ্ছে বার বার। এপাশে-ওপাশে মোরগ-মুরগি চরে বেড়াচ্ছে। একটু তফাতে আটচালায় দাঁড়িয়ে একটা ধাড়ি শুয়োর একদঙ্গল বাচ্চাকে দুধ খাওয়াচ্ছে। বিশ্ববন্ধু ধরিত্রীর মাথা থেকে পা অবধি চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলে, 'কার জমিতে মুনিশ খাটছিলে ধরি?'

ধরিত্রী ছায়ায় দাঁড়িয়ে অকারণ এদিক-ওদিক দেখতে দেখতে বলে, 'নিজের। তুমি কবে এলে?'

'পরশু।' বিশ্ববন্ধু চপ্পলের তলায় সিগারেট ঘষটে নেভায়। খিক খিক করে হাসে। 'দেখেই

ভাবছিলাম, চেঁচিয়ে বলি, কী রে শালা, কেমন আছিস? কিন্তু পারলাম না। বয়েসও একটা ফ্যাক্টর। তাছাড়া দিনকালও বদলে গেছে। কীভাবে কে নেবে, বলা মুশকিল।'

'কোথায় আছ এখন?'

'যেখানে দেখছ।' বিশ্ববন্ধু মিটিমিটি হাসে। 'আসলে কেউ আমাকে নিচ্ছে না। এটাই প্রবলেম! দেখা যাক, শেষ পর্যন্ত কী হয়।'

বুড়ো লোকটি নিঃশব্দে উঠে গিয়ে তার ঘরের বারান্দা থেকে একটা চৌপায়া এনে বলে, 'বোসেন পঞ্চাত দিদি!' তারপর নিজের কাজে মন দেয়।

বিশ্ববন্ধু বলে, 'পঞ্চাতদিদি মানে? মাই গুডনেস। তুমি কি পঞ্চায়েতি পলিটিকস করছ নাকি ছোটসিঙ্গির মত? পৃথিবীটা কী বদলান না বদলেছে। বসো ধরি, বসো! আমাকে এ ব্যাপারে জ্ঞানদান কর।'

ধরিত্রী শান্তভাবে চৌপায়ায় বসে। বলে, 'তুমি এখানে কী করছ?'

বিশ্ববন্ধু চোখ নাচিয়ে গলা চেপে বলে, 'নস্টালজিয়ার ব্যাপার। জামসেদপুরে থাকার সময় কোন কোন রাতে হঠাৎ মনে পড়ে যেত, সাঁওতালডাঙ্গায় দুপুরবেলা লু হাওয়া বইছে আর দিরেঙের সঙ্গে ফেনিল তালরস টানছি, সামনে চালকলাই ভাজার চাট। যথেচ্ছ নুনঝালমাখানো। কিংবা দাদার পুকুর থেকে রাত্তিরবেলা চুরি করে ধরা মাছের টুকরো। দিরেং হারামজাদা মহা ধড়িবাজ। মাঝে মাঝে হাঁড়িয়া করে ডাকাতে যেত। বলত, দুমকা থেকে ওর সম্বন্ধী মহুয়াফল এনেছিল। ঢোক গিলে দেখি, উরে শালা! রেশনের পোকা খাওয়া গমের পচুই। তো...'

'জামসেদপুরে ছিলে চাকরি করতে নিশ্চয়?'

'হুঁউ।'

'ছেড়ে আস নি তো?'

'ছাড়িয়ে দিয়েছে। নাইটশিফটে মাতাল হয়ে ডিউটি করতে গিয়েছিলাম।'

ধরিত্রী আস্তে বলে, 'ফ্যামিলি নিয়ে এসেছ, নাকি একা?'

বিশ্ববন্ধু হাসে। 'তোমাদের এই মগের মুল্লুকে সুন্দরী বউ আনি আর লুঠ হয়ে যাক। বাপস! কাল রাত্তিরে যা দেখলাম।' বলে সে ধরিত্রীর সিঁথির দিকে তাকায়। 'তোমার তো বিয়ে হয়েছে দেখছি। শাঁখা-টাখা পরনি কেন? আর বাপের বাড়ি বসে পঞ্চায়েতি পলিটিকসই বা করছ কীভাবে? ভেরি মিসটিরিয়াস।'

ধরিত্রী হাত বাড়িয়ে একটা কাঠি তুলে নেয়। মট করে ভেঙে বলে, 'তোমার কিছুই বদলায়নি। বাচালতাও।'

'ভ্যাট! বল না ঘরজামাই পুষছ নাকি?'

ধরিত্রী ভুরু কুঁচকে দূরে তাকিয়ে ভাঙা কাঠি দুটো নাড়াচাড়া করে। জবাব দেয় না।

'শালা বলে গাল দেব, ধরিত্রী! মুখ নিসপিস করছে অনেকদিন পরে।'

ধরিত্রী ওর দিকে ঘোরে। মুখে শান্ত হাসি ফোটে। 'দুদিন ধরে বিপ্রশেখরে আছ। কেউ কিছু বলেনি?'

'নাঃ।'

'তোমাদের গাঁয়ে তো এপারের লোকের খুঁজে খুঁজে কেলেঙ্কারি বের করে।'

'তোমাদের ফুলশেখরে বুঝি করে না?' বিশ্ববন্ধু ওর হাত থেকে কাঠি দুটো কেড়ে নিয়ে ফেলে দেয়। ফের বলে, 'তোমার কিছু কেলেঙ্কারি আছে বুঝতে পারছি। যাকগে ওসব কথা। তোমার চেহারার সেই লালিত্য কোথায় গেল বল তো?'

'নেই বুঝি?'

'না। তোমাকে ভীষণ রুক্ষ দেখাচ্ছে।'

'কেলেঙ্কারির তাপে।' ধরিত্রী তার চোখে চোখ রেখে ফের বলে, 'তোমার দাদার সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে কী যেন গণ্ডগোল ছিল শুনেছিলাম। সেটলমেন্ট হয়ে গেছে?'

বিশ্ববন্ধু হাই তুলে বলে, 'হয়েছিল—আবার হয়ওনি। এখন আমি বেকার। ভীষণ টাকার দরকার। তাই ছুটে এসেছি বুঝতে পারছ না? দেখ বাবা, যেন উদ্ধার কর গণ্ডগোল বাধলে। কেমন?'

ধরিত্রী উঠে দাঁড়ায়। 'ব্রজদার তো রাতারাতি পাওয়ার বেড়ে গেছে। এখন থেকে হাতে মাথা কাটবে। আচ্ছা, চলি।'

সে পা বাড়ালে বিশ্ববন্ধুও উঠে সঙ্গ ধরে। 'কোথায় যাচ্ছ এমন করে?'

'আখের জমিটা দেখে আসি।'

'চল, কেমন ফলাতে পারছ দেখি।'

ধরিত্রী এতক্ষণে একটু বিব্রত বোধ করে। নির্জন সাঁওতাল বস্তিতে বিশ্ববন্ধুর পাশে হেঁটে যেতে অস্বস্তি হয় তার। সে এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে দ্রুত পা ফেলে। তকতকে নিকানো কুঁড়েঘরের দাওয়ায় বসে পা ছড়িয়ে পান্তা খাচ্ছে কোন বুড়ি। উঠোনে ছাগল হাঁস মুরগি ঘুর ঘুর করছে। রোগাপটকা একটি মেয়ে শুকনো ডাল কেটে টুকরো করছে। অশথতলায় খেলা করছে কয়েকটি বাচ্চা। খাটিয়ে মেয়ে-মরদ সবাই চলে গেছে রুজিরোজগারে কে কোথায়। বিশ্ববন্ধু বলে, 'ধরিত্রী, তুমি দেখছি, ভীষণ হাঁটতে পার। আমি কিন্তু হাঁটাহাঁটিটা একেবারে ভুলে গেছি। বলবে, তাহলে কি গাড়ি চেপে বেড়াতাম এতকাল? তাও নয়। তবে হাঁটতে আমার ভাল লাগে না। এই যে নদীর বাঁধ পেরিয়ে সাঁওতালডাঙ্গায় এসেছি, সে অনেক কষ্টে। তুমি বলবে, আমি কি রুগ্‌ণ? তাও না। আসলে আজকাল আমার হাতের কাছে সব পেতে ইচ্ছে করে—যা যা আমার কাম্য। ধরিত্রী, তুমি বুঝতে পারছ তো? ধরিত্রী, তুমি কিন্তু কথা বলছ না।'

ধরিত্রী টের পাচ্ছিল এতক্ষণে, বিশ্ববন্ধু মুখে যাই বলুক, সে সম্ভবত ভেতরে ভেতরে রুগ্‌ণ। হাঁটতে পারছে না ঠিকভাবে এবং হাঁটতে হাঁটতে কথা বলার সময় একটু একটু হাঁফাচ্ছে। নেশাভাং করেই শরীরটা ঝাঁঝরা করে ফেলেছে। খুব কমবয়স থেকে সে মদ-গাঁজা-তাড়িতে আসক্ত হয়েছিল। ধরিত্রীদের বাড়িতে কালীপুজোর রাতে এসে একবার খুব মাতলামি করছিল। গণমিত্র তাকে তাড়া করেছিলেন। নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল বিশু। ফিরে এসে হাসতে হাসতে গণমিত্র সেকথা বললে ধরিত্রীর খুব ভয় হয়েছিল, মাতাল বিশু ডুবে মরেনি তো নদীতে? পরদিন বিকেলে দেখল, বিসর্জনের সময় নদীর ওপারে সে ঢাকীদের সঙ্গে নাচছে।

বিপ্রশেখরের বড়লোক রক্ষাকর রায় প্রায় বৃদ্ধ বয়সে দ্বিতীয় বিয়ে করেন। তাই এ পক্ষের সন্তানের আদর ছিল প্রচণ্ডরকমের। বিশ্ববন্ধুর পক্ষে বখে যাওয়া সহজ হয়েছিল।

অথচ ছেলেটির মধ্যে কী একটা ছিল, তাকে কেউ ঘেন্না করতে পারত না। উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, একটু লম্বাটে গড়ন, একমাথা এলোমেলো চুল, মুখে দারুণ একটা হাসি—অন্যান্য সময়ে বিশ্ববন্ধু দুই গাঁয়েরই প্রিয়পাত্র। বাড়ি বাড়ি আপনজনের মত ঘুরত। বাড়িতে বিয়ে থাকলে বিশু না ডাকতেই হাজির। হাতাগুটোনো আদ্দির পাঞ্জাবি আর ফিনফিনে ধুতি পরনে, গলায় সোনার হার, ঝকমকে বিশুকে ধরিত্রীর স্পষ্ট মনে পড়ে। বড়লোকের ছেলে বলে এতটুকু জাঁক নেই। বিয়েবাড়িতে মেয়েদের আড্ডায় ঢুকে সে ক্যারিকেচার করে গান গেয়ে এমন কী নেচেও জমিয়ে তুলত।

কিন্তু নেশা গিললেই অন্য মূর্তি। ধরিত্রীর মনে পড়ে, ভেকু ভটচাযের মেয়ের বিয়েতে মাতাল বিশু বরযাত্রীদের গায়ে কাদা ছুঁড়েছিল—হঠাৎ কোত্থেকে এসে এই উপদ্রব। দেনা-পাওনা নিয়ে বরপক্ষের সঙ্গে কন্যাপক্ষের কী যেন বিবাদ ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিবাদটা ফুলশেখর বনাম বিপ্রশেখরে পরিণত হয়। কেন ওপারের লোক এসে এপারের বরপক্ষকে অপমান করবে—তাদের কী এতে?

ধরিত্রীর বিয়ের সময় বিশ্ববন্ধু ছিল না। তার না থাকার কথাটা মনেও আসেনি ধরিত্রীর। এতদিন পরে সাঁওতালপাড়ায় তার পাশে পাশে হাঁটতে হাঁটতে ধরিত্রীর মনে পড়ল কথাটা। কিন্তু তারপরই মনে হল, ব্যাপারটা এমন কিছু জরুরি নয়। সেই যে হলা টেম্পো বোঝাই ফুল এনে ঘর সাজিয়েছিল, সেই ফুল যথেচ্ছ নিজেও পরেছিল ধরিত্রী, এখন ভাবতে বড় হাস্যকর লাগে। মন বিষিয়ে যায়।

'ধরিত্রী, তুমি কথা বলছ না! তুমি নিশ্চয় চাইছ না আমি তোমার সঙ্গে যাই?'

ধরিত্রী ঘুরে ওর দিকে তাকাল একবার। বিশ্ববন্ধুর চোখের তলায় গভীর কালো ছোপ। নাক ঠেলে

বেরিয়েছে। কিন্তু চোখ দুটো চকচক করছে। ধরিত্রী একটু হাসে। 'ওপারের লোকেরা আমাদের চিরশত্রু, জান না?'

বিশ্ববন্ধু জোরে মাথা দোলায়। 'উহুঁ। আমি মোটেও ওপারের লোক নই।'

'এপারেরও নও।'

'একজ্যাক্টলি।' বিশ্ববন্ধু খিকখিক করে হাসে। সামান্য উঁচু একটা টিবির ওপর ধরিত্রী উঠল দেখে সে থমকে দাঁড়ায়। বলে, 'ওখানে উঠছ কেন? সর্বনাশ!'

ধরিত্রী সামনে বিস্তৃত মাঠের দিকে তাকিয়ে বলে, 'আখের জমি দেখছি।'

বিশ্ববন্ধু নিচে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরায়। এখানে খোলামেলায় হাওয়ার দাপটটা খুব বেশি। রোদের তাপ বেড়েছে। সে ধরিত্রীকে লক্ষ্য করে। ধরিত্রীর নাকের ডগায়. চিবুকে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটেছে। ঈষৎ চ্যাটালো গালের ওপর একগোছা চুল লুটোপুটি খাচ্ছে। সরু নাকে, লম্বাটে চোখে, ঈষৎ চওড়া কপালে রোদ ছলকে বেড়াচ্ছে। ধরিত্রীকে গায়ের রঙ বিশেষ ফর্সা ছিল না, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ বলা চলত ছোটবেলায়। এখন কিছুটা তামাটে, রুক্ষ এবং টানটান দেখাচ্ছে। নীলচে ডোরাকাটা শাড়ি হাওয়ার টানে আঁটো হয়ে জড়িয়ে গেছে শরীরে। ছোটবেলায় রোগা পাঁকাটি ছিল ধরিত্রী। এখন অবিশ্বাস্যভাবে সেই তুলনায় মোটাসোটা দেখাচ্ছে তাকে।

ধরিত্রী নেমে আসার সময় টের পায় বিশ্ববন্ধু তাকে দেখছিল। এক মুহূর্তের জন্য সে চমকে ওঠে। তারপর সামলে নেয়। 'তোমার তাড়ি গেলার কী হল? দিরেংকে খুঁজে পাওনি বুঝি?'

সিগারেটের ধোঁয়ার সঙ্গে বিশ্ববন্ধু বলে, 'আর ইচ্ছে করছে না। তোমার সঙ্গে অনেক বছর পরে দেখা হল। কথা বললাম। এতেই অনেক নেশা হয়ে গেছে।'

ধরিত্রী কোন কথা বলে না। আবার প্রায় নির্জন সাঁওতাল বসতি পেরিয়ে যায়। বিশ্ববন্ধুও চুপচাপ তাকে অনুসরণ করে। শিরিসতলায় পৌঁছে বলে, 'চল, তোমাদের বাড়ি যাই!'

ধরিত্রী একটু শক্ত হয়ে বলে, 'কিন্তু এখন তো আমি বাড়ি ফিরছি না। মুসলমান পাড়ায় যাব। পঞ্চায়েত অফিসে কাজকর্ম আছে।'

বিশ্ববন্ধু পা বাড়ায়। 'ঠিক আছে বাবা, তাই সই! আমিও তোমার পঞ্চায়েত অফিসে যাব, চল না! দেখে আসি তোমার ক্রিয়াকলাপ! উরে শালা! কে ভাবতে পেরেছিল, সেই ধরি নামে দুগ্ধপোষ্য বালিকা হবে ফুলশেখরের লিডার? চল!'

ধরিত্রী আরও শক্ত হয়ে বলে, 'প্লিজ বিশু, জ্বালাতন কর না।'

'আমি যাব না বলছ?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু আমি তো এখন মাতাল নই। স্রেফ ভালমানুষ, সেন্ট পারসেন্ট জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন প্রাণী।'

'প্লিজ!'

বিশ্ববন্ধু শুকনো হেসে বলে, 'যা বাবা! আমাকে এত ভয়! আমি কি তোমার সঙ্গে কখনও ঘুরিনি? ফ্লাডের সময়—তারপর পুজোয়, ফাংশানে, সোশ্যাল ক্যাম্পে? ধরি, গৌরিপুরের স্কুলবাড়ির ডাঙায় সোশ্যাল ক্যাম্পের কথা ভুলে গেলে? অনেক রাতে তোমাকে ডেকে নিয়ে তরমুজ চুরি করতে গেলাম...'

ধরিত্রী হনহন করে হেঁটে যাচ্ছে দেখে সে চুপ করে। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে ওর দিকে। তারপর চেঁচিয়ে এবং হাসতে হাসতে বলে, 'শালা ধরি! এই শালা!' দড়িকাটা বুড়ো হেঁ হেঁ করে হাসছে তার কাণ্ড দেখে। বিপ্রশেখরের বিশুবাবু বড় মজার লোক।...

ধরিত্রী নিমবনের ভেতর হাঁটছিল। হাঁটতে হাঁটতে কবজি তুলে একবার ঘড়িটা দেখে নেয়। সাঁড়ে দশটা বাজে। তবে শহিদুল আজ নিশ্চয় স্কুলে যায়নি।

বিশ্ববন্ধুর পাগলাটে স্বভাব বরাবর ছিল। তবে শালা বলার স্বভাব ছিল ধরিত্রীরই। ছেলেদের সঙ্গে ছেলের স্বভাবে মিশতে পারত। সবাইকে তুইতোকারি করতে একটুও বাধত না তার। কথায় কথায় 'এই শালা' বলে উঠত। স্কুলের মাঠে মেয়েদের খেলার দল ছেড়ে প্রায়ই চলে যেত ছেলেদের দলে।

খেলাধুলোয় অবশ্য দক্ষ ছিল ধরিত্রী। আশ্বিনের ভরা নদীতে সাঁতার-প্রতিযোগিতায় বরাবর ফার্স্ট হত। ওঠার সময় কেউ ধরতে হাত বাড়ালে খাপ্পা হয়ে বলত, 'এই শালা! ছুঁবিনে আমাকে।' একবার স্পোর্টসের স্যার ক্ষীরোদবাবুকেই 'এই শালা' বলে ফেলে লজ্জায় ধরিত্রী আর জল থেকে উঠতেই চায় না। সাঁতার কেটে তখন ভীষণ ক্লান্ত। সেই অবস্থায় অঘাটে চলে গিয়েছিল। তারপর গাছের শেকড় ধরে অনেক কষ্টে উঠে ঝোপের ভেতর ভেজা শেয়ালের মত কেটে পড়েছিল। ঘাটে তখন জেলাশাসক আর গণ্যমান্যদের ভিড়। তাকে সবাই খুঁজছে প্রাইজ দেবে বলে। ধরিত্রীর পাত্তা নেই।

তেলিপাড়ায় ঢোকার মুখে একবার পেছন ফেরে ধরিত্রী। বিশ্ববন্ধুকে দেখতে পায় না। ভেবেছিল পেছন পেছন আসছে নাকি। নাছোড়বান্দা স্বভাব ওর, কিছু বলা যায় না। একবার সিংহবাহিনীর মন্দিরের ভেতর যা কাণ্ড করেছিল! ...ধরিত্রী হঠাৎ চমকে ওঠে।

সামনের বাড়ি থেকে একটি মেয়ে চিলচেঁচানি চেঁচিয়ে বেরিয়ে এল। পেছনে বেরুল এক বুড়ি। হাতে কাস্তে নিয়ে। ধরিত্রীকে দেখেই মেয়েটি বুকফাটা আর্তনাদ করে তার পায়ের সামনে এসে আছড়ে পড়ে। কাস্তেধারিণী ঝটপট বাড়ি ঢুকে যায়। ধরিত্রী তাকে দুহাতে টেনে ওঠায়। তারপর বলে, 'কী হয়েছে গো বউ?'...

চার

বৈষ্ণব পদাবলীর নোট লিখতে লিখতে সুদীপন চুরুট ধরাবার জন্য সোজা হয়ে বসে এবং দেখতে পায়, গায়ত্রী তার দিকে তাকিয়ে আছে। জানালার ধার থেকে আধপোড়া চুরুটটা টেনে নিয়ে সুদীপন বলে, 'কী হল গায়ত্রী?'

গায়ত্রী ঠোঁটের কোনায় হেসে বলে, 'একটা কথা ভাবছিলাম।'

'কী?'

'বড়দি ভীষণ নেমকহারাম।'

সুদীপন অবাক হয়ে যায়। হাসবার চেষ্টা করে বলে, 'হঠাৎ তোমার একথা মনে হল কেন?'

'বড়দি বহরমপুরে থাকলে আমারও থাকা হত।' ছোট্ট একটা শ্বাস ফেলে গায়ত্রী বলে, 'অন্তত ফাইনালের আগে এই তিনচারটে মাস তো থাকতাম। আমার কত ভাল প্রিপারেশন হত।'

সুদীপন বলতে যাচ্ছিল, 'এখনও গিয়ে থাকতে অসুবিধে কোথায়', বলল না। গায়ত্রীর খাতার ওপর কলম নিয়ে ঝুঁকে বসল। লেখার গতি বরাবর তার ধীরস্থির। পরিচ্ছন্ন অক্ষর না হলে কেটে আবার লেখে। তিনটে শর্ট নোট লিখতে প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট লেগে গেছে। লিখতে লিখতে ঘড়ির দিকে আড়চোখে তাকিয়ে নিচ্ছে। প্রায় এগারটা বাজে। এখনও ধরিত্রী ফিরল না। অরিত্র নাকি তার খোঁজেই গেছে সংঘমিত্রা বলছিলেন। ওপরে ধরিত্রীর ঘরটা তালাবন্ধ দেখে চটে গিয়েছিলেন। ইতিমধ্যে গায়ত্রী জানতে পেরেছিল জামাইবাবু এসেছে। সে অরিত্রের ঘর থেকে টানতে টানতে নিচে তার পড়াশোনার ঘরে নিয়ে এসেছে সুদীপনকে। এ ঘরটা পুব-উত্তর কোণের শেষ ঘর। জানালার বাইরে ছায়াঢাকা বাগান একদিকে, অন্যদিকে পোড়ো জঙ্গুলে জায়গা তার ওধারে চাষের ক্ষেত ধাপে ধাপে নেমে গেছে নদীর দিকে। দূরে উঁচু পিচরাস্তা দেখা যায়। একটু ঘুরে পূর্বমুখী হয়ে নদী পেরিয়েছে। ব্রিজের এপাশে বাজারের পেছনদিকটা চোখে পড়ে। সুদীপন এ ঘরে ঢোকার পর বারবার উঁচু রাস্তার দিকটা, বাজার, ব্রিজ পর্যন্ত খুঁটিয়ে দেখছিল, যেন এখানেই কোথাও ধরিত্রী আছে।

এবারও সে কোন হেস্তনেস্ত করতে আসেনি। একান্ত হঠাৎ এসে পড়েছে এবং আগের দুবারের চেয়ে নির্বিকার থেকে ধরিত্রীকে সহ্য করার প্রস্তুতিটা অনেক বেশি। ধরিত্রীকে সে যেতেও বলবে না আর। বরং বলবে, 'বেশ তো! যা নিয়ে আছ, তাই নিয়ে থাক। আমিই মাঝে মাঝে এসে তোমায় দেখে যাব। আসলে এ আমার ভালবাসা—কারণ আমি বোঝাতে চাই, তোমার প্রতি ভালবাসাকে আগাগোড়া যত্ন করে রেখেছি। কিংবা এই আমার মনের ধর্ম। আর ধরিত্রী, তুমি তো জান, তোমার কোনকিছুতে আমি বাধা হয়ে ছিলাম না। এখনও নই, তাও কি দেখতে পাচ্ছ না? শুধু একটা কথাই বলব, তোমার ভীষণ ভুল হচ্ছে। মারাত্মক ভুল। তুমি যেখানে হাঁটছ, সে একটা ডেকাডেন্স। পচাগলা মড়া।

কাকামশাই আগের জেনারেশান, তাই সময়টাকে ঠিক বুঝতে পারেনি। কিন্তু তুমি তো একালের ধরিত্রী! তুমি কেন এ ভুল করছ?... না, আমি বলছি না, তুমি বউঠাকুরানীটি হয়ে আমার সংসার কর। এই সংসার করা ব্যাপারটাও আমার ঠিক আসে না। নেহাত বাবা-মা আছেন, তাঁদের বয়স হয়েছে, তাই। ধরিত্রী, আমি যা বলতে চাইছি, তা হল...'

গায়ত্রী জামাইবাবুর দিকে তেমনি তাকিয়ে। দেখল, কলম থেমে আছে, চুরুট কামড়ে ধরে সাদা কাগজের দিকে তাকিয়ে আছে সুদীপন। গায়ত্রী বলে, 'বইটা দেব?'

সুদীপন মাথা নাড়ে। ফের সোজা হয়ে বসে উত্তরের জানালার ভেতর দিয়ে ব্রিজ দেখতে থাকে। তারপর বলে, 'বাঃ! এতক্ষণ লক্ষ্য করিনি তো? তোমাদের ব্রিজটার রঙ বদলে গেছে!'

'হ্যাঁ। সাদা করেছে ওমাসে। হেলথসেন্টার ওপেন করল যখন, তখন।' তারপর সে প্রায় নেচে ওঠে। 'বাঃ! কারেন্ট এসে গেছে। কতক্ষণ পরে এল জানেন? চোদ্দ ঘণ্টা, কাল রাত ন'টায় গিয়েছিল।' মাথার ওপর ফ্যানটা শব্দ করে ঘুরছে। সে উঠে গিয়ে রেগুলেটরের কাঁটা ঘুরিয়ে ফুল করে দেয়। ঘরে হুলস্থূল বেধে যায়। হাসতে হাসতে খাতাপত্তরের ওপর বই চাপা দেয়। মাথা পেতে দেয় ফ্যানের তলায় এবং চুল সামলাতে দুপাশ থেকে মাথাটা ধরে থাকে। 'এতক্ষণ ব্রেন ক্লিয়ার হয়ে গেল। জানেন জামাইবাবু?' বলে সে মিটিমিটি হাসতে থাকে।

সুদীপন পুরু চশমার কাচের ভেতর থেকে তাকে দেখতে দেখতে বলে, 'তোমার এজ কত হল গায়ত্রী?'

'কী এজ? সার্টিফিকেট, না অ্যাকচুয়াল?'

'নাঃ! সার্টিফিকেট।'

'টোয়েন্টি। কেন বলুন তো?'

'এম এ পড়বে তো?'

গায়ত্রী উৎসাহে কাছে সরে আসে। টেবিল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বলে, 'কিন্তু প্রবলেম আছে যে! কলকাতায় থাকার খরচ কে দেবে? বড়দি? আপনার মাথা খারাপ জামাইবাবু? তাছাড়া কলকাতায় একলা থাকতেই দেবে না। অথচ নিজের বেলা অন্যরকম।'

'কী রকম?'

'নিজে তো একেবারে ইন্দিরা গান্ধী ছোটবেলা থেকে। বুঝতে পারেন না?'

'পারি।' সুদীপন হাসতে থাকে। গায়ত্রীর কথাবার্তাই এরকম।

'আমি যদি কলেজ থেকে একটু দেরি করে ফিরি, ব্যস! কেলেঙ্কারি। আপনার মনে নেই? প্রতিদিন ঠিক ছুটির আগে কলেজের গেটে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত। তারপর আমাকে সোজা বাসে তুলে বাড়ি পাঠিয়ে তবে কথা!'

ঠিক তাই করত ধরিত্রী। সুদীপন শ্যালিকাকে কাছে রেখে পড়াতে চাইত। ধরিত্রী শক্ত গলায় বলত, 'না। মিতু পিসিমার কষ্ট হবে। কাকাবাবু তো থেকেও নেই। ওদিকে অরু একটা ওয়ার্থলেস ছেলে।' সুদীপন বুঝতে পারত, কৈফিয়তগুলো তত মজবুত নয়। সুদীপনের মাও দুএকবার বলেছিলেন। ধরিত্রী বলেছিল, 'কেন? বেশ তো যাতায়াত করছে গরি! ছমাইল কোন ডিসট্যান্সই নয়—সব সময় বাস, রাতদুপুর অব্দি।'

সুদীপন ফের খাতার দিকে ঝুঁকে গেল। লিখতে লিখতে সে বলে, 'বিদ্রোহ কর। আমার সাহায্য পাবে। আর শোন, পলিটিক্যাল সায়েন্স নিও। তোমার সুবিধে হবে তাতে।'

গায়ত্রী কচি মেয়ের গলায় একটু কান্নার ঢঙ করে বলে, 'ও জামাইবাবু, আমার কিন্তু সত্যি বড্ড ভয় করছে যে! আমার প্রেফারেনস একেবারে বাজে হয়ে যাচ্ছে। কী করি বলুন তো?'

'তোমাদের এখানে হেল্পিং হ্যান্ড তেমন কেউ নেই, না?'

'ধুস! সব বাজে। গোমুখ্যু!' গায়ত্রী সুদীপনের কাঁধে আলতোভাবে একটা হাত রেখে একটু ঝুঁকে পড়ে। তারপর ষড়যন্ত্রসঙ্কুল গলায় চাপা স্বরে বলে, 'এক কাণ্ড হয়েছে জানেন? বড়দিরা মামলায় হেরে গেছে। কাল বাইরের ঘরে কথা হচ্ছিল। ওপারের ব্রজবাবুরা অঞ্চল অফিসের দখল নেবে। গণ্ডগোল হতে পারে। পিসিমা বোঝাচ্ছিলেন বড়দিকে।'

সুদীপন খাতা থেকে মুখ তোলে। 'তাই বুঝি?'

'আপনি যেমন করে হোক, আর বড়দিকে এখানে রাখবেন না। নিয়ে যান। ছোটলোকগুলোর সঙ্গে পড়ে বড়দি একেবারে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।'

'হুঁ।'

ওর কাঁধে হালকা একটা থাপ্পড় মেরে গায়ত্রী একটু সরে দাঁড়ায়। তীব্র দৃষ্টে ওর দিকে চেয়ে হিসহিস করে বলে, 'আপনি ওকে আজই নিয়ে যান।'

সুদীপন একটু হাসে। 'কেমন করে নিয়ে যাব?'

'সে আমি জানি না। আপনার বউ, আপনি নিয়ে যেতে পারবেন না?'

'পারিনি তো!'

'আপনি ...' গায়ত্রী থেমে যায়। সংঘমিত্রা দরজার সামনে এসেছেন।

সংঘমিত্রা ভারি গলায় বলেন, 'গরি! জামাইবাবুকে এবার একটু ছুটি দাও। এত বেলা হয়েছে, স্নান-খাওয়া করতে হবে না? শিগগির, দেরি কর না আর। এ বাড়িতে কি মানুষজন বাস করছে? সব ভূতপেরেতের দল।'

সংঘমিত্রা চলে গেলে গায়ত্রী খাতার দিকে তাকিয়ে কতটা লেখা হয়েছে দেখে নেয়। সখিতত্ত্ব এইটুকু লিখলেই হবে? রাধাতত্ত্ব লিখেছেন তো? আর গৌরচন্দ্রিকা? জামাইবাবু, গৌরচন্দ্রিকা কোথায়?'

সুদীপন বলে, 'ডোন্ট ওরি গরি! আই মাস্ট!' সে সহজ করে হাসতে পারে এতক্ষণে। ষড়যন্ত্রসঙ্কুল স্বরে গায়ত্রী তাকে যা সব বলছিল, তার মনে এখনও প্রতিধ্বনি তুলছে। কেন যেন কথাগুলো তাকে সুখীই করতে পেরেছে। সে নিবু-নিবু চুরুটটা জোরে টানতে থাকে।

খাতাপত্তর যত্ন করে গুছিয়ে রেখে গায়ত্রী বলে, 'চলুন না জামাইবাবু নদীতে স্নান করবেন। আমারও করা হবে তাহলে। বড়দি এসে পড়ার আগেই, বুঝলেন তো?'

সুদীপন পা দুটো টেবিলের তলায় লম্বা করে দেয়। বলে, 'তোমাদের নদীতে এখন জল আছে নাকি?'

'প্রচুর জল। বাঁধ দিয়ে রেখেছে না?' গায়ত্রী চঞ্চল হয়ে বলে, 'চলুন না জামাইবাবু? অরু সুন্দর ঘাট করে রেখেছে। ও রোজ দুঘণ্টা করে সাঁতার কাটে। অবিশ্যি বড়দির মত এক্সপার্ট নয় অরু। বড়দি তো জলের কুমীর।'

'তোমার বড়দি এখনও সাঁতার কাটে বুঝি?'

'নাঃ! ওরে বাবা! ওর আজকাল যা গ্র্যাভিটি!'

সুদীপন আস্তে বলে, 'বরাবর।'

'হুঁ! আপনি যেন বরাবর ওকে দেখেছেন। বড়দি যখন সাঁতার কম্পিটিশনে ফার্স্ট হত, তখন আপনি মশাই কোথায়? তারপর ফ্লাডের বছর? বিপ্রশেখরের লোকে বড়দির এখন শত্রুতা করছে। ফ্লাডের বছর বিপ্রশেখর তলিয়ে গিয়েছিল। তখন কী হয়েছিল জানেন? কোন পুরুষমানুষ না একমাত্র বড়দিই দুমাইল জল ভেঙে গিয়ে কেয়াতলা থেকে রিলিফের নৌকো এনেছিল! বড়দিটা যা আছে না? ভাবা যায় না।'

সুদীপন নিজের জামার বোতাম খুঁটতে খুঁটতে বুকের পাকা লোমটার দিকে তাকিয়ে থাকে। সাঁইত্রিশেই ভীষণ পাকতে শুরু করেছে, অভাবিত ব্যাপার। কেন এমন হচ্ছে? তার চুলের অবস্থাও তাই। চুলে তো সে তেল ব্যবহার করে না কোনদিন। নাকি তাকে অকালবার্ধক্য আক্রমণ করেছে?

গায়ত্রী তার হাত ধরে টানল। 'চলুন না জামাইবাবু?'

'কোথায়?'

'নদীতে।'

'তুমি যাবে তো চল। পাহারা দেব, যাতে কেউ তোমায় না লুঠ করতে পারে।'

ধরিত্রী সামনে থাকলে যা করতে পারত না, তাই করে গায়ত্রী। সে সুদীপনের চুলের পেছনটা

খামচে ধরে বলে, 'জামাইবাবু বলে খাতির করব না কিন্তু! খালি আজেবাজে কথা! কার দায় পড়েছে আমাকে লুঠ করার!'

'আঃ! ছাড়।' বলে সুদীপন উঠে দাঁড়ায়। 'চল, কোথায় যাবে।'

একটু পরে ঠাকুরবাড়ির ওদিকে দরজা দিয়ে দুজনে বেরুল। ছায়াঢাকা বাগান পেরিয়ে আলপথ ধরে আগে-আগে হাঁটছিল গায়ত্রী। তার হাতে সুদীপনের জন্য ধোয়া সাদা তোয়ালে এবং সাবানকৌটো, কাঁধে নিজের তোয়ালেটা ঝুলছে। সুদীপন অন্তত একটাদিন থাকবে বলেই এসেছে। তার ব্যাগে লুঙ্গি তোয়ালে সবকিছু আছে—দাড়ি কামানোর সরঞ্জাম পর্যন্ত। কিন্তু নদীতে স্নান সে করবে না। বিয়ের পর এসে নদীতে স্নান করে ঠাণ্ডা বাধিয়েছিল। তাছাড়া জলটারও কেমন গন্ধ।

গায়ত্রী অনর্গল কথা বলছিল। তার কলেজের কথা, অধ্যাপিকাদের কার কী স্বভাব বা মুদ্রাদোষ। মাঝে মাঝে ঘুরে বলছিল, 'বড়দির সময় নাকি মিসেস হালদার নামে এক মহিলা ছিলেন। বাংলা পড়াতেন। পদাবলী পড়াতে পড়াতে ভেউ ভেউ করে কেঁদে ফেলতেন—প্রেমে। সরি জামাইবাবু, কৃষ্ণপ্রেমে।' তারপর মুখ টিপে হেসে, 'ও জামাইবাবু, ঘাটে গিয়ে আবার সেই গল্পটা শুনব কিন্তু।'

'কোন গল্পটা?'

'বড়দির সঙ্গে কেমন করে আপনার ভাব হয়েছিল।'

'যাঃ! ও কিছু না।'

'কিছু না? চালাকি হচ্ছে? আমি বুঝি কিছু জানি না?'

'কী জান?'

'বড়দির শেষে রোজ রাত হয়ে যেত বাড়ি ফিরতে। কেন মশাই?'

ধরিত্রী তখনও জেদি মেয়ে ছিল বটে, কিন্তু চঞ্চলও ছিল এবং তাকে বোঝান যেত। সুদীপন ভাবত, গ্রামের মেয়ে, তাই হয়ত কিছু প্রিমিটিভ কোন-কোন ব্যাপারে। অনেক সময় অকপট এবং হঠাৎ-হঠাৎ আবেগে অস্থির হয়ে উঠত। শহরের বাস-টার্মিনাসের কাছে বটগাছের তলায় অন্ধকারে হঠাৎ শক্ত করে সুদীপনের হাত চেপে ধরে বলেছিল, 'আমার অসহ্য লাগছে। খালি মনে হচ্ছে, দুম করে মরে যাব!' সুদীপন সেদিনই যখন ওকে প্রথম চুমু খেল, টের পাচ্ছিল ধরিত্রীর শরীর যেন গলে যাচ্ছে। ওর শরীর কাঁপছিল। সুদীপন বলেছিল, 'একজামিনেশনটা দিয়ে নাও, তারপর তুমি পাকাপাকিভাবে আমার হয়ে যাবে।' অবাক লাগে এখন, ধরিত্রীরই যেন তর সইছিল না। ফাইনাল পরীক্ষার পরই এসে রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিল। তারপর কাকাবাবুকে জানাল। গণমিত্র কড়াধাতের মানুষ। তবু ক্ষুব্ধ হননি বিশেষ। শুধু বলেছিলেন, 'আমায় বললে কি মহাভারত অশুদ্ধ হত? আমি বাঘ না ভালুক? তাছাড়া আমি তোর গার্জেন না? যাক গে, ভালই করেছিস।'

সুদীপনকে চিনতেন গণমিত্র। সুদীপনও তখন শহরে একটা কাগজ বের করত 'যুগসন্ধি' নামে। একটা ছোট্ট প্রেসও কিনেছিল। কলেজে পড়ানো, টিউশনি এবং তার ফাঁকে কাগজ চালানো। গণমিত্রের তখন নিজের প্রেস ছিল না। শহর থেকে 'গ্রামবার্তা' ছাপিয়ে আনতেন। 'যুগসন্ধি' বিয়ের পর বন্ধ করে দেয় সুদীপন। তার রাজনৈতিক বিশ্বাসের পতন ঘটেছিল। আর তার ট্রেডল মেশিন এবং অন্যান্য সরঞ্জাম টেম্পো বোঝাই করে নিয়ে আসেন গণমিত্র—তখন তার খুড়শ্বশুর উনি। জামাই বাবাজিকে দাম দিতে চেয়েছিলেন, নেয়নি। এখন ফুলশেখরের বাজারে গ্রামবার্তা প্রেস বসেছে টালির ঘরে। গণমিত্র সব ছেড়ে তাই নিয়েই আছেন। পাক্ষিক কাগজ। ইদানিং একজন কম্পোজিটর রেখেছেন। কাগজ বেরুলে নিজেই সাইকেলে বেরিয়ে পড়েন। কেউ কেউ কেনে, চাঁদাও দেয়।

ঘাটটাতে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আছে। ভালই লাগে সুদীপনের। দুধারে উঁচু গাছ আর লতার ঝালর নিয়ে তোরণদ্বারের মত। ঘাট বলতে একটা প্রকাণ্ড গাছের গুঁড়ি খোঁজ মেরে আটকানো আছে। নদীর এদিকটা কিছু খাড়া। কিন্তু এখানটায় বেশ ঢালু মাটি। ক্রমশ তলার দিকে নেমে গেছে। অরিত্র কয়েক হাত জায়গায় বালি আর পাথরকুচি এনে ছড়িয়ে রেখেছে। পায়ে কাদা লাগে না। তারপর ডুব সাঁতার জল।

ব্যক্তিগত ঘাট বলে জনহীন। সোজাসুজি ওপারটা খুবই ঢালু এবং কাঁটার বেড়া দেওয়া

সবজিক্ষেতের মাঝখান দিয়ে বিপ্রশেখরের দুলেপাড়ার ঘাটের পথ। একদঙ্গল মেয়ে হল্লা করে স্নানে নেমেছে। কেউ কাপড় কাচছে। তারা এপারে সুদীপন ও গায়ত্রীকে দেখে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকে।

গায়ত্রী বলে, 'কৈ, জামাকাপড় ছাড়ুন। নামবেন না?'

সুদীপন ছায়ায় ঘাসের ওপর বসে বলে, 'তুমি স্নান কর, আমি পাহারা দিই।'

ঘাটের ওপর ঝুঁকে জল তুলে গায়ত্রী বলে, 'ভিজিয়ে দেব।'

'দাও না!'

গায়ত্রী আঙুলের ফাঁকে জলটুকু গলিয়ে ফেলে একটু গম্ভীর হয়ে যায় হঠাৎ। তারপর আস্তে বলে, 'আপনার মন ভাল নেই, না জামাইবাবু?'

'কেন ভাল থাকবে না?'

সে কাঠের গুঁড়ির ওপর বসে নদীর দিকে ঘুরে বলে, 'দিদি বরাবর বড় বাজে মেয়ে। দেখবেন, ওর কপালে অশেষ দুঃখ আছে—আমি বলছি! কেন যে ওর পাল্লায় পড়েছিলেন আমি ভেবে পাইনে। সত্যি বলছি, জামাইবাবু!'

ঘাসের ওপর বসে সুদীপন প্রকৃতি দেখার চেষ্টা করে। ছোটখাট রোগা গড়নের মানুষ, মাথাটা শরীরের তুলনায় বেশ বড়, গায়ের রঙটাও ময়লা—শুধু তার চশমার পুরু কাচের ভেতর থেকে যেন শক্তি বিচ্ছুরিত হয়। তার চেহারায় ভাবুক জ্ঞানীর শান্ত সৌন্দর্য আছে। সে নিজেও টের পায় এটা।

এই শান্ত গ্রাম্য দুপুরে আদিম ধরনের এক নদীর ধারে বসে থাকতে থাকতে তার এখন অবাক লাগে, ধরিত্রীর মত একটা মেয়েকে বিয়ে করেছিল প্রেমে পড়ে! কী ছিল ধরিত্রীর মধ্যে? নাগরিক সফিস্টেকেশন না, মার্জিত উজ্জ্বলতা না, না কোন ইন্টেলেকচুয়াল স্তর ছিল ওর মনের।

অথচ তত কিছু গ্রাম্যও ছিল না ধরিত্রী। নির্বোধও নয়। ওর জেদ, সাহস আর তুমুল আবেগের তলায় অন্য একটা ইন্টেলেক্টের স্তর অবশ্য টের পেত সুদীপন। কিন্তু তার চেয়ে আকর্ষণীয় ছিল ধরিত্রীর মানবতাবোধ। ধরিত্রীর এ বিষয়ে একটা শক্ত বিবেককে সে দেখেছিল, যা তার ভীষণ ভাল লেগেছিল। ধরিত্রী এই গ্রামের কথা বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে উঠত। সুদীপন তার সঙ্গে সমাজতত্ত্ব নিয়ে কথা বলতে চাইত—ছাত্রীকে জ্ঞান দেওয়ার নেশায়। আর ধরিত্রী বলত, 'ওসব আমি বুঝি না। আমি আমার গ্রামের মানুষগুলোকে চিনি। নিজের চারপাশটা পরিষ্কার দেখতে পাই। কারণ আমার একজোড়া চোখ আছে। ব্যস!'

এই শুনে সুদীপন বিরক্ত হত না। বরং সায় দিয়ে বলত, 'ঠিকই তো। কিন অবজার্ভেশনটাই আসল কথা।' কিন্তু একটা আন্তর্জাতিক ইস্যু নিয়ে সুদীপন কলেজ থেকে মিছিলের আয়োজন করে ধরিত্রীকে ডেকেছিল, আর ধরিত্রী ঝাঁঝাল গলায় বলেছিল, 'খবর পেলাম ফুলশেখর-বিপ্রশেখরে দাঙ্গা হয়ে গেছে। আমার কাছে এখন এটাই জরুরি ইস্যু।'

গায়ত্রী এক বুক জলে নেমে ভয়ে-ভয়ে বলল, 'ও জামাইবাবু, আমি যদি ডুবে যাই! আপনি যে সাঁতারও জানেন না! কী হবে বলুন তো?'

সুদীপন একটু হেসে বলল, 'আর এগিও না। তাহলে ডুববে না।'

'বহরমপুরে তো গঙ্গা আছে। কেন আপনি সাঁতার শেখেননি জামাইবাবু?'

'গঙ্গা খুব বড় নদী গায়ত্রী।'

'নদী ছোট হলে বুঝি সাঁতার শিখতেন?'

'হুঁউ।' সুদীপন ঘাস কাটতে থাকে দাঁতে। ফের বলে, 'অবশ্য সেও বলা কঠিন। কেউ-কেউ হাঁটু জলেও ডুবে মরে।'

সুদীপন ভেবেছিল গায়ত্রী হয়ত কথাটার তাৎপর্য বুঝবে না। কিন্তু গায়ত্রী খিলখিল করে হেসে ওঠে। দুহাতে জল ছড়িয়ে বলে, 'যেমন আপনি।' তারপর ঝুপ করে একটা ডুব দেয় সে। মিছিমিছি হি হি করে কাঁপুনির তাল করে, যেন জলটা ভীষণ ঠাণ্ডা। শাড়ি-জামা তার শরীরে সেঁটে গেলে সে এখানে-ওখানে টেনে ফুলিয়ে তোলে। সুদীপন বুঝতে পারে, আত্মরক্ষার চেষ্টা করছে গায়ত্রী। তারপর জলে হুড়মুড় শব্দ তুলে কাঠের ওপর বসে দুই খোলা বাহু আর ঘাড়ে গলায় সাবান ঘষতে থাকে।

সুদীপন থু থু করে ঘাসের কুটো ফেলে দেয় মুখ থেকে। হঠাৎ তার মন তেতো হয়ে যায়। ঘাসের রসে যে আদিম ধরনের বিস্বাদ, তাই যেন মনকেও কটু করে তোলে। আবার সেই বিস্ময় তাকে ঝাঁকুনি দেয়। কেন সে এখানে বসে আছে এবং ওই ভিজে ছিপছিপে ময়লারঙের মেয়েটি তার শ্যালিকা, সবটাই সপ্নের মত লাগে। একটানা অথচ খাপছাড়া কী এক স্বপ্ন।...

বিপ্রশেখরের বামুনপাড়ায় ঢুকলে অরিত্রের বরাবর এরকম মনে হয়, যেন অসংখ্য চোখ দিয়ে কেউ বা কারা তাকে দেখছে। উচ্ছন্নে যাওয়া খাঁ খাঁ ভিটে, জঙ্গল, পড়-পড় ইটের বাড়ি, খালি মন্দির আর মন্দির। শ্যাওলাধরা পলেস্তারাহীন জীর্ণ দরজায় বসে থাকেন পা ছড়িয়ে কোন বৃদ্ধা—পাতাচাপা ঘাসের রঙ শরীরের এবং দুধের মত সাদা চুল। কোলে এক রুগ্‌ণ নাতি। কোন জানালার মরচেধরা রডে মুখ ঠেকিয়ে কোন এক যুবতী, মাছের মত নিষ্পলক চোখ করে অরিত্রকে দেখে। অরিত্র এ পাড়ার খুব কম লোককে চেনে। শিবমন্দিরের ভাঙা পাঁচিলের ওপাশে দাঁড়িয়ে শ্লেষ্মা জড়ানো গলায় কোন প্রৌঢ় জবাফুল তুলতে তুলতে তার দিকে তাকালে বুক ছাঁৎ করে ওঠে অরিত্রের। এ যেন মৃতদের দেশ। কেউ বেঁচে নেই।

মাঝারি আয়তনের একটা পুকুরের চারপাড়ে অষ্টশিবের মন্দির এবং তার একটেরে সীমন্তদের বাড়ি। সীমন্ত যে ঘরটাতে থাকে, সেটা একেবারে পুকুরের কিনারায়। বাড়ির পেছনদিকে খানিকটা পোড়ো জায়গা। এ ঘরটা তার একটা প্রান্তে। মাটির দেওয়াল, খড়ের চাল এবং কুঁড়েঘরই বলা যায়। ওদের আসল বাড়িটা অবশ্য ইটের একতলা দালান। সম্ভবত আকবর বাদশার আমলে তৈরি। সীমন্তরা দাবি করে, তারাই নাকি বিপ্র ঠাকুরের প্রকৃত বংশধর। প্রধান মন্দিরের চৌকাঠের ওপরে পাথরের ফাটলধরা ফলকে দেবনাগরী হরফে 'বিপ্রশেখর শর্মনঃ' কথাটা নাকি লেখাও আছে।

এই মাটির ঘরটা বানানো হয়েছিল সীমন্তের কুষ্ঠরোগগ্রস্ত জ্যাঠামশায়ের জন্য। তাঁর মৃত্যুর পর দুর্বিনীত ছেলে সীমন্ত ভাল রকম ধোয়াপাখলা করে নিজের হাতে এবড়োখেবড়ো দেওয়ালে যথেচ্ছ চুন বুলিয়ে এবং অসংখ্য রঙিন ছবি এঁকে বাসোপযোগী করে নিয়েছে। একপাশে তক্তাপোষে তার বিছানা। অন্যপাশে নড়বড়ে টেবিল আর দুটো চেয়ার। তাকভর্তি বইপত্তর। ছবি আঁকার জন্য শস্তা সুলভ কিছু রঙের সরঞ্জাম। তত কিছু ভাল আঁকতে পারে না সীমন্ত। একরকমের ক্যারিকেচার করার ইচ্ছে যেন। দেওয়ালে-দেওয়ালে গ্রামের অনেক লোকের মুণ্ডু সে এঁকে রেখেছে। অরিত্র জানে কোন মুণ্ডুটা কার। ব্রজবন্ধু, তাঁর চেলা কানাই মোহান্ত, গণমিত্র, এমন কি চুরুটমুখে প্রকাণ্ড মাথা ও চশমাপরা মুণ্ডু ও আছে—সীমন্ত বলেছিল, 'চিনতে পারছিস?' অরিত্র চিনেছিল। ওটা তার জামাইবাবু।

পশ্চিমের ছোট্ট জানলা, বা সেটা একটা বৃহৎ ঘুলঘুলিই বটে, তার পেছনে একঝাঁক পেত্নিঝোপ। গ্রীষ্মে থরেবিথরে নীলসাদা ফুলে ভরে ওঠে। তার ফাঁক দিয়ে ওদিকের ঘাটটা চোখে পড়ে। সীমন্ত কতদিন অরিত্রকে ডেকে স্নানরতা মেয়েদের নগ্ন বুক দেখতে বলেছে। অরিত্র একবার উঁকি মেরেই সরে এসে বলল, 'যাঃ! তুই একটা ননসেন্স!' সীমন্ত বলেছে, 'জানলা তো বন্ধ করা যায় না তাই বলে। চোখ যদি দেখতে পায়, আমার কী করার আছে?'

আজ সীমন্ত খুব গম্ভীর। অরিত্রের সঙ্গে সেই সকালবেলা ব্রিজের মুখে দেখা হওয়ার পর দুজনে এপাড়া-ওপাড়া ঘোরাঘুরি করে এই ঘরে এসেছে। সাইকেলটা পোড়ো জায়গায় একটা নোনা আতার গাছে ঠেস দিয়ে রাখা আছে। অরিত্রকে বাড়ি থেকে চা এনে দিয়েছে। দুজনে চা খাওয়ার পর সিগারেট টানতে টানতে হলা দাসের কথা বলেছে। হলা সীমন্তেরও ক্লাসফ্রেন্ড ছিল বহরমপুর কলেজে। তারপর সীমন্ত যা বলেছে, তাই শুনে অরিত্র অবাক হয়ে গেছে। অস্বস্তিতে সে আড়ষ্ট।

সীমন্ত বলেছে, 'শুধু তোকেই বলছি অরু বি ভেরি কেয়ারফুল! ঘূণাক্ষরে যেন কাউকে বলবিনে। কাল সন্ধ্যার একটু পরে হলা আমার ঘরে এসে হাজির। আমি তখনও বুঝতে পারিনি কিছু। শেষে বলল ভাণ্ডারির বাড়ি অ্যাকশান আছে। গণ্ডগোল বাধলে তোর এখানে চলে আসব। আমি তো ভয়ে সারা। ওকে বললাম, চা-ফা খাবি? বলল, না। আর বঝলি অরু ওর কাঁধে একটা কিটব্যাগ ছিল। একট পরে একটা ভোজালি বের করে বলল...

'ভোজালি? রিভলবার নয়?'

'না। ভোজালি। তারপর শোন না! বলল, তুই আজ রাতে আর বেরুবিনে। নইলে মুশকিল হবে। তারপর হলা চিত হয়ে শুয়ে পড়ল আমার বিছানায়। বলল, হেরিকেনটা নিবিয়ে দে। নিবিয়ে দিলাম। তখন ডাকল, এখানে আয়। আমার মাথাটা টিপে দে। বড্ড মাথা ধরেছে। বললাম, ট্যাবলেট আছে বাড়িতে। এনে দিই। হলা বলল, ট্যাবলেটে আর কিছু হয় না।'

'তুই মাথা টিপে দিলি?'

'কী করব? ও তো ডেঞ্জারাস এলিমেন্ট। কতক্ষণ পরে টর্চের আলো পড়ল ওখানটাতে। হলা তক্ষুণি উঠে বসল। বেরিয়ে দেখি, অন্ধকারে দুজন দাঁড়িয়ে আছে। বললাম, কে? ইতিমধ্যে হলা শিস দিতে দিতে আমার পাশ কাটিয়ে বেরুল। বলল, বেরুবিনে যেন। তারপর ওরা চলে গেল। কতক্ষণ পরে রিন খিড়কির দরজা থেকে খেতে ডাকছিল। ঝটপট ফের হেরিকেনটা ধরালাম। উঃ, আমার যা গেছে কাল রাত্তিরটা।'

'তারপর আর বেরুসনি তো?'

'আমার ভীষণ রাগ হয়েছিল জানিস? মালীর ছেলে আমাকে মাথা টিপিয়েছে! খাওয়ার পর বাড়ির দরজায় বেরিয়ে ভাবছি কী করব, সেইসময় ভলিন্টিয়াররা এল দলবেঁধে। মণি, শোভন, নান্তু আর কে কে যেন ছিল। ওদিকে তখন বেজোর বাড়ির সামনে তুমুল সেলিব্রেট করছে। মণিকে হলার কথা বলে দিলাম!'

'সর্বনাশ!'

'এখন খারাপ লাগছে খুব। ভেবে দেখ অরু, ভাণ্ডারি বেজায় হারামি লোক। কেমন করে বড়লোক হয়েছে তাও তো জানি! অথচ হলার ওপর ক্ষেপে গিয়ে...নাঃ! আমি ঠিক করিনি অরু! বড্ড ভুল হয়ে গেছে।'

'ভুল হলারও হয়েছিল। কেন তোকে মাথা টেপাল?'

'না রে! এখন ও নিয়ে রাগ নেই আমার। আফটার অল, হলা আমাদের বন্ধু ছিল কিনা বল! একটু মাথা টিপে দিয়েছি না হয়। তাই বলে ওকে...'

অরু বাধা দিয়ে বলল, 'ছেড়ে দে। যা হবার হয়ে গেছে।'

সীমন্তের বোন রিন এসে বলল, 'দাদা, প্রিয়কাকা এসে আবার ঝামেলা বাধিয়েছে দেখ গে! মা বললে তোকে ডেকে দিতে।'

সীমন্ত প্রায় লাফ দিয়ে বেরিয়ে গেল। বাইরে কড়া রোদ। রিন সীমন্তের ঘরে কে আছে দেখার চেষ্টা করছিল। অরিত্র বলে, 'আমি রিন! কী ব্যাপার?'

রিন হাসিমুখে ঘরে ঢুকে চোখ পিটপিট করে বলে, 'অরুদা? কোথায় তুমি?'

'এই তো!'

'তাই ভাবছিলাম ওটা কার সাইকেল!' দৃষ্টি পরিষ্কার হলে রিন তক্তাপোষে ধুপ করে বসে। হালকা রোগা গড়নের মেয়ে, ফ্যাকাসে গায়ের রঙ, ঈষৎ ডিমাল মুখ। পরনে যেমন-তেমন একটা শাড়ি। ব্লাউসের বগলের কাছটা ফর্দাফাঁই। তবু ঘরের ভেতর গাঢ় ছায়ায় উজ্জ্বল দেখায় তাকে। 'অনেকদিন তুমি আসনি অরুদা!'

অরিত্র একটু হাসে। 'ভগ্নদূতের মত কী খবর নিয়ে এসে যে মন্তু অমন করে দৌড়ুল?'

'ওই প্রিয়কাকা! রোজ এসে ঝামেলা করছে। গাঁজার পয়সা ফুরলেই মাথা খারাপ হয়ে যায়!' রিন মুখটা একটু কাত করে অকারণ চুলের বিনুনি খোলে এবং আবার বাঁধতে থাকে। 'কাল রাত্তিরে তুমি ডাকাত দেখতে আসনি?'

'এসেছিলাম।'

'আমাদের বাড়ির সামনে বোরজেতলা আছে দেখেছ? ওই যে বকুলগাছের ওখানে। একটা ডাকাত ওখানে গিয়ে লুকিয়েছিল। তাকে বল্লম মেরে গেঁথে টানতে টানতে বের করল।'

'তুমি দেখছিলে নাকি?'

'দুচোখের দিব্যি।'

'তোমার ভয় করছিল না?'

রিন জোরে মাথা দোলাল। তারপর নিষ্ঠুর হেসে বলে, 'ফ্লাডের বছর কত বড় বড় মাছ ভেসে যাচ্ছিল, জান? অমনি করে গেঁথে তুলত লোকেরা। বেশ করেছে!'

অরিত্র চুপ করে থাকে। রিনের মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকায়। তারপর তার মনে পড়ে, গাজনের মেলার দিন পাঁঠাবলির সময় রিনকে দেখেছিল কেমন চোখে তাকিয়ে আছে মুণ্ডুকাটা প্রাণীগুলোর দিকে। শেষে ওর বাবা ওকে ডাকলে মুণ্ডুগুলো গুনে গুনে ঝুড়িতে রাখছিল রিন। দুহাতে রক্ত মেখে যাচ্ছিল। কপালেও লাল রক্তের ফোঁটা।

অরিত্রকে চুপ করে থাকতে দেখে রিন বলে, 'আগের মত আর আস না কেন গো অরুদা?'

'আসি তো?'

'মিথ্যে বল না। আমি দেখতে পাই নে।'

'এই তো দেখতে পাচ্ছ!'

রিন হঠাৎ সোজা হয়ে বসে। তার মুখে এবার অন্য এক হাসি ফোটে। 'জান অরুদা? এমাসে একটা দারুণ চাকরি পেয়েছি। মাসে-মাসে হান্ড্রেড রুপিজ মাইনে।'

'বাঃ! কী চাকরি?'

'ইউনিসেফ থেকে গাড়ি করে গুঁড়ো দুধ দিয়ে যায়। ড্রামে গুলে মগে করে ডিসট্রিবিউট করি। রোজ সকালে কী বিরাট লাইন পড়ে, তুমি ভাবতে পারবে না! তবে রোজ দুধ নয়—সপ্তায় দুদিন।' রিন আবার বিনুনি খুলে ফেলে। আবার বাঁধতে থাকে। 'বাকি ছদিন মাইলো। মাইলো চেন?'

অরিত্র মাথা নাড়ে।

'একরকম খাবার। জলে সেদ্ধ করে তারপর খিচুড়ির মত হয়। আমি ওসব করি না। আমার শুধু ডিসট্রিবিউট করার ভার।' বিনুনি শেষ হলে মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে সেটা পিঠে ফেলে দিয়ে সে বলে, তোমাদের ফুলশেখরে নিউট্রিশন সেন্টার হয়নি?'

'জানি না। নিশ্চয় হয়েছে।'

'ধরিদিকে জিজ্ঞেস কর। হ্যাঁ গো অরুদা, ধরিদি আর যাবে না শ্বশুরবাড়ি?'

'আমি কেমন করে বলব?'

'এই মা! তুমি রেগে গেছ অরুদা!' রিন খিলখিল করে হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়ায়। তারপর দরজায় উঁকি মেরে সোজা চলে আসে পুকুরের দিকের ঘুলঘুলিতে। এক টুকরো পর্দা ঝুলছে সেখানে। পুরনো রঙিন চাদর কেটে তৈরি। পর্দাটা ফাঁক করে ওদিকটা দেখে নিয়ে ফিসফিস করে বলে, 'দাদা এখানে লুকিয়ে-লুকিয়ে কাকে দেখে জান তো? মজুমদার মশায়ের সেকেন্ড ওয়াইফকে। জানতে পারলে দাদার রক্ষে নেই!'

আবার হাসতে হাসতে সে কুঁজো হয়ে যায়। অরিত্রও হাসে। হাত তুলে বলে, 'থাপ্পড় খাবে। ডেঁপো মেয়ে কোথাকার!'

'তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না? বেশ। তুমি যে-কোন সোমবার ঠিক দুপুরবেলা এখানে এস। দেখবে, রুমা বউদি এই ঝোপঝাড় ভেঙে এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে চলে এসে তারপর কী করবে জান তো? ভাঙা পাঁচিল গলিয়ে সোজা এ ঘরে ঢুকে পড়বে। ব্যস!'

অরিত্র হাত বাড়িয়ে ওর বিনুনিটা ধরে ফেলে। রিন 'আঃ' বলে ঘুরে দাঁড়ায়। অরিত্র তারপরই বিনুনিটা ছেড়ে দেয়। তার শরীর হঠাৎ ভারি মনে হয়। বুকের কাঁপুনিও টের পায়। আস্তে বলে, 'দাদার কেলেঙ্কারি করতে বাধছে না তোমার! ছিঃ!'

'থাম! তুমিও একেবারে ন্যাকা! ভাজা পুঁটিমাছ উল্টে খেতে জান না!' বলে হঠাৎ রিন বেরিয়ে যায়। অরিত্র দেখে, সে দৌড়ে পোড়ো এবং মাটির পাঁচিলঘেরা জায়গা কোনাকুনি পেরিয়ে যাচ্ছে। তারপর পাঁচিলের ভাঙা অংশটা গলিয়ে বাইরে পড়ে। নিপাত্তা হয়ে যায়।

অরিত্র গুম হয়ে বসে থাকে। স্কুলে গায়ত্রীর ক্লাসফ্রেন্ড ছিল রঞ্জিতা। তখনও গার্লস স্কুলটা হয়নি। স্কুল ফাইনালে ফেল করে কম্পার্টমেন্টাল পেয়েছিল। তারপর কী ঘটেছিল জানে না অরিত্র। গায়ত্রী বলত, 'বড্ড বাজে প্রকৃতির মেয়ে। ওর লেখাপড়া হবে কেন? এর-ওর সঙ্গে প্রেম করে বেড়াবে, না পড়াশুনো করবে।'

গায়ত্রী হয়ত ভুল বুঝেছিল। প্রেম করতে হলেও যে একটুখানি গভীরতা থাকা দরকার, রিনির তা কি আছে? অত চঞ্চল, অত বিচারবুদ্ধিহীন, এলোমেলো মেয়ের পক্ষে প্রেম ব্যাপারটা আসেই না। তবে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। হয়ত গেছেও।

কিন্তু সীমন্তের সঙ্গে অবনী মজুমদারের বউয়ের প্রেম শুনে অরিত্র আকাশপাতাল খুঁজে পায় না। সীমন্ত একটু নিরীহ প্রকৃতির ছেলে। বড়জোর লুকিয়ে মেয়েদের নগ্ন শরীর দেখা ওর পক্ষে সম্ভব। অবনীবাবু শহরের সাবরেজিস্ট্রি অফিসের ক্লার্ক। বাসে রোজ যাতায়াত করেন। কিন্তু সোমবার ছাড়া অন্য কোন উইকডেতে প্রেমিকা আসার অসুবিধেটা কী, বুঝতে পারে না অরিত্র। শেষে ভাবে, পুরোটাই রিনির গুলগপ্প। তা নইলে কি সীমন্ত তাকে ব্যাপারটা বলত না? এখন মুশকিল হয়েছে, অরিত্র সীমন্তের কাছে কথাটা তুললে সীমন্ত বলতেই পারে, কে তোকে বলল? অতএব চুপ করে থাকাই ভাল।

অরিত্র বেরুচ্ছিল, বারটা বাজে প্রায়, ক্ষিদেও পেয়েছে। সীমন্ত এসে গেল। 'মাইরি এই এক ঝামেলায় পড়া গেছে হাঁদু মোল্লাকে একটা গাছ বেচেছিলাম। সত্তর টাকা দাম। প্রিয়কাকাকে হাফ দিতে হয়েছে। এখন কে ওঁকে বলেছে, মোল্লা নাকি একশ টাকা দাম দিয়েছে। তাই শুনে বাকি টাকার শেয়ার দাবি করছেন। এবার দেখছি মোহান্তদাকে বলে বেজোর কানে তুলতেই হবে। রামপেঁদানি না খেলে শালা গাঁজাড়ু জব্দ হবে না।'

অরিত্র বলল, 'চলি রে!'

অন্যমনস্ক সীমন্ত বলল, 'আয়। ওবেলা ফুলশেখরে কিন্তু যাচ্ছি। মঘার দোকানের সামনে থাকব।'

বাড়ি ঢুকেই অরিত্র মিতুপিসিমার পাল্লায় পড়ে যায়। কিছুক্ষণ চেঁচামেচির পর সংঘমিত্রা ক্লান্তভাবে বলেন, 'গরিরও কি বুদ্ধিসুদ্ধি আছে একটু? দেখছিস, চোখের সামনে এমন করে চলে যাচ্ছে হঠাৎ। গিয়ে ধরবি তো?'

গায়ত্রী মুখ চুন করে দাঁড়িয়েছিল থামে হেলান দিয়ে। কাঁদো-কাঁদো গলায় বলল, 'ঘাটে বসে আছি, মুখে সাবানের ফেনা। আমি কি দেখতে পাচ্ছিলাম? মুখ ধুয়ে ঘুরে দেখি, জামাইবাবু অনেকটা চলে গেছেন। আমি কি সিনক্রিয়েট করব? চারদিকে লোকেরা দেখবে না?'

সংঘমিত্রা ভিজে চোখ মুছে বলেন, 'ব্যাগটা সঙ্গে করে ঘাটে গেল দেখে ভাবলাম স্নান করে জামাকাপড় বদলাবে। কিন্তু এমন পণ্ডিত ছেলে—এটুকু বুঝলে না যে কতখানি অকল্যাণ করে গেল বাড়ির। এটা তো গেরস্থের সংসার—না কী?'

অরিত্র আস্তে বলল, 'ধরিদি বাড়ি ফেরেনি?'

'ফিরেছে এতক্ষণে।'

গায়ত্রী ঝাঁঝাল স্বরে বলল, 'বড়দির আর কী? পৃথিবী ডুবলেও ওর হাঁটুজল। অবাক কাণ্ড ছোড়দা, এসে দিব্যি খেল-দেল ওই মুখে। না চান করা, না হাতমুখ ধোয়া। তারপর দিব্যি ওপরে গিয়ে শুয়ে পড়ল। আমি বলতে গেলাম তো চড় তুলে মারতে এল।'

সংঘমিত্রা চাপা গলায় বললেন, 'বাইরে ছত্রিশ জাতের ছোঁয়া খেয়ে এলি, কাপড়টাও তো অন্তত বদলাবি। এ কী জাতনাশা স্বভাব হচ্ছে গো মেয়ের!'

'কাকাবাবু ফেরে নি?' অরিত্র জিজ্ঞেস করল।

'দুটোর আগে কবে ফেরে ছোড়দা?' সংঘমিত্রা আঁচলে মুখের ঘাম মুছে বললেন, 'অরু, বেলা হয়েছে। চান-ফান কী করবি, করে আয়। আমার মাথা ঘুরছে। আর দাঁড়াতে পারছিনে।'

অরিত্র এখন নদীতে যাবে। অন্তত একটা ঘণ্টা জলে সাঁতার কেটে বেড়াবে, এপার থেকে ওপার।...

পাঁচ

ধরিত্রী ছাতি নিয়ে বেরিয়েছিল। বাজারের কাছে গিয়ে ছাতিটা বুজিয়ে ফেলল। কাল বিকেলে বছরে প্রথম কালবৈশাখি এসেছিল। তারপর রাত অবধি থেমে-থেমে বৃষ্টি হয়েছে। ভোরের দিকে এত শীত করছিল যে জ্বর বলে ভয় পেয়ে গিয়েছিল ধরিত্রী। তার অসুখবিসুখ কদাচিৎ হয়। কিন্তু আজকাল অসুখ হলেই মুশকিল। কত কাজ তার।

বৃষ্টি খেয়ে মাটি চনমন করছে। গাছপালার রুক্ষতা গেছে ঘুচে। ফুলশেখরকে নতুন মনে হচ্ছিল সকাল থেকে। কিছুদিন থেকে যে জোরাল হাওয়াটা বইছিল, আজ সে কিছু শান্ত হয়েছে। রোদের তাপও কমে গেছে। হাটবার বলে সকাল থেকেই বাজারের দিকে হইচই শোনা যাচ্ছিল। পিচরাস্তার ধারে একটুখানি থেকে ধরিত্রী স্কুলবাড়ির পাশে অঞ্চল অফিসের দিকে তাকায়।

ফুলশেখরের এই উত্তর অংশটা উঁচু মাটির নদীর একটু তফাত থেকে হাতির পিঠের মত ঠেলে উঠেছে শক্ত ঘটির-কাঁকরভরা ডাঙা। ধরিত্রীর ছেলেবেলায় এখানটা প্রায় খাঁ খাঁ করত। স্কুল আর জেলা বোর্ডের দাতব্য চিকিৎসালয়ের দৌলতে দুতিনটে তেলেভাজা বা মিষ্টির দোকান ছিল। নদীতে কোন সাঁকো ছিল না। অসংখ্য গরুমোষের গাড়ি ভিড় করে অপেক্ষা করত পারাপারের জন্য। দিনরাত চেঁচামেচি। এখন ট্রাক বাস টেম্পো রিকশ ব্রিজ পেরিয়ে শহরের দিকে ছুটে যায়। কোন বাধা নেই।

স্কুলের পাশে ইউনিয়ন বোর্ডের অফিসটা ছিল মাটির দেয়াল, করগেট শিটের চাল। এখন একতলা বেশ বড়সড় তিনটে ঘর হয়েছে ইটের। হলুদ ঝকমকে রঙ। দরজা-জানালা সবুজ। বারান্দাটাও বেশ চওড়া। বারান্দায় ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে অঞ্চল সদস্যরা। ধরিত্রী ব্রজবন্ধুকে খুঁজছিল।

দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে গণমিত্র এসে গেলেন। 'কী হল? যাবে না অঞ্চল অফিসে?'

ধরিত্রী একটু হাসে। 'আমাদের কাউকে তো দেখতে পাচ্ছি না।'

'তাতে কী?' গণমিত্র পকেট থেকে নস্যির কৌটো বের করেন। বগলে ছড়িটা গুঁজে উর্ধ্বমুখে এক টিপ নস্যি নিয়ে ফের বলেন, 'আজ অবশ্যি রোববার। পঞ্চায়েত অফিসার আসবেন বলে মনে হয় না। চার্জ বুঝিয়ে দেবে কে বেজাকে? গিয়ে মজাটাই দেখে এস না। বেজার তর সইছে না, মুখের অবস্থাটা দেখে এস একবার।'

'আপনার কি মনে হয় তালা ভেঙে ঢুকবেন ব্রজবাবু?'

গণমিত্র জোর গলায় বলেন, 'সাধ্য কী? মগের মুল্লুক নাকি? কোর্ট চার্জ দিয়েছিল পঞ্চায়েত অফিসারকে। তিনি যতক্ষণ চার্জ বুঝিয়ে না দিচ্ছেন, বেজা পা বাড়াতে পারবে না।'

'কিন্তু আমি কাল শুনলাম পঞ্চায়েত অফিসার নাকি বলেছেন, তাঁর কাছে অফিশিয়ালি ইনস্ট্রাকশন না এলে চার্জ দেবেন না। তাই ব্রজবাবু তালা ভেঙে ঢুকবেন।'

'বেজা মারা পড়বে তাহলে। পুলিশকেস হয়ে যাবে।'

ধরিত্রী বাঁকা হাসে। 'পুলিশ তো ব্রজাবাবুদেরই।'

গণমিত্র পা বাড়িয়ে বলেন, 'ঢুকলেই বা কী? মালকড়ি তো পাচ্ছে না।'

'মিটিং করে রেজলিউশন পাস করিয়ে নেবেন ব্রজবাবু। অথরিটি পেয়ে গেলেই তো হল। এদিকে আদালতের কাগজপত্র রয়েছে হাতে।' ধরিত্রী তাঁর পাশে হাঁটে কথা বলতে বলতে। 'এফ সি আইয়ের গোডাউন থেকে কদিন আগে দু ট্রাক গম আর চা দিয়ে গেছে ফুড ফর ওয়ার্ক স্কিমে। হরিমাটি অব্দি রাস্তায় মাটি ফেলার কাজ শুরু হবে। ব্রজবাবু এর ক্রেডিট নিতে ছাড়বেন না।'

গণমিত্র একটু বিরক্ত হয়ে বলেন, 'যা কিছু করুক বেজা, পঞ্চায়েত অফিসারের কোঅপারেশন ছাড়া ওর চলবে না। মুশকিল হচ্ছে, আইনকানুনের ব্যাপারটা তুমি এখনও ঠিক রপ্ত করতে পারনি, ধরি।'

ধরিত্রী চটে গেল। 'কোথায় আইন? যতদিন কাজ করতে নেমেছি, আইনটাইন কিছু তো দেখতেই পাচ্ছি না! ওসব আপনার আমলে ছিল দেশে।' সে দম নিয়ে ফের বলে, 'আপনি জানেন? রিসেন্টলি একটা নতুন স্কিমে বাইশ হাজার টাকা স্যাংশন হয়েছে। রেজলিউশন করে সে-টাকা ড্র করার অথরিটি পেয়ে যাবেন ব্রজবাবু। তারপর যা হবে, সে তো বোঝাই যায়।'

গণমিত্র শান্তভাবে বলেন, 'তোমরা সজাগ থাকবে যাতে নয়-ছয় না হয়।'

ধরিত্রী বলে, 'কাল বিকেলে ঝড়ের একটু আগে দলবেঁধে লোকেরা এল। গ্রামপঞ্চায়েতের ফান্ডে পয়সাকড়ি নেই। এদিকে ওরা খেতে পাচ্ছে না। ফুড ফর-ওয়ার্কের স্কিমগুলো অচল হয়ে পড়ে আছে। পঞ্চায়েত অফিসারের কাছে গেলেই বলেন, আগে নিজেদের মধ্যে মিটিয়ে ফেলুন, তারপর। বুঝুন অবস্থা!'

'ওদের তো ব্যুরোক্রেটিক ব্যাপার। পাঁকাল মাছের নীতি।' গণমিত্র হা হা করে করে হাসেন। 'আমি কিন্তু সমানে কলমের লড়াই লড়ে যাচ্ছি। লাস্ট ইস্যুর এডিটোরিয়ালটা পড়নি বুঝি?'

'পড়েছি। আজকাল লিখে কিছু হয় না।'

'আলটিমেটেলি হয়। পেন ইজ মাইটার দ্যান সোর্ড। ইউনিভার্সাল ট্রুথ।' গণমিত্র উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন। 'কলমকে চাবুকের মত প্রয়োগ করে যাচ্ছি। একদিন না একদিন লোকের চেতনা জাগবেই। ধরি, তুই লড়ে যা নিজের লাইনে। আমি লড়ি নিজের লাইনে। ব্যস, এই হল কথা।'

লম্বা লম্বা পা ফেলে গণমিত্র ভিড়ে ঢোকেন। এক মুহূর্তের জন্য ধরিত্রীর মনে হয়, তার কাকাবাবু যেন এক ক্লাউন। চিরকাল বাইরে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করেছেন শুধু, ভেতরে ঢোকেননি। কাদামহলা মাখেননি ধরিত্রীর মত। সুদীপন বলেছিল, ওটা জটিলতা নয়, ডেকাডেন্স। মাঝে মাঝে ধরিত্রী বুঝতে পারে, কথাটাতে সত্য আছে। যে মড়াকে বাঁচানোর চেষ্টা করে আসছে, তার নড়াচড়া স্পন্দন হয়ত আসলে পিশাচের।

'এখানে দাঁড়িয়ে যে? যাবে না?'

ধরিত্রী তাকায়। রাস্তা ডিঙিয়ে কেয়াতলার সুমহান এসে পাশে দাঁড়ায়। 'তখন থেকে লক্ষ্য করছি ধরিত্রীদি চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছ। হেজিটেশন কিসের? আরে বাবা, তুমি তো নির্দল আফটার অল!'

সুমহানের হাসিটা অশ্লীল লাগে ধরিত্রীর। আস্তে বলে, 'মিটিং কল করলে কথা ছিল।'

'ব্রজদা খবর দেননি তোমাকে?'

'দিয়েছেন।'

'তবে আর কথা কী? ইনফর্মাল মিটিং। এস ধরিত্রীদি।' সুমহান পারলে তার হাত ধরে টেনে নিয়ে যায়, এমন ভঙ্গি। 'তাছাড়া তোমার গ্রামপঞ্চায়েতের স্বার্থে উপস্থিত থাকা দরকার। তাই না? ব্রজদা বা তার গ্রুপের কী বক্তব্য শোনা দরকার। আমিও তো সেই জন্য এসেছি।'

'তুমি চল, আমি যাচ্ছি।'

সুমহান হাসতে হাসতে শিরিস গাছের গুঁড়িতে বসে পড়ে। সিগারেট ধরায়। ধরিত্রী বুঝতে পারে, সুমহানও তার মত দ্বিধায় পড়েছে। অঞ্চল অফিসের বারান্দায় না গিয়ে আনাচেকানাচে ঘুরে বেড়াচ্ছিল এতক্ষণ।

কেয়াতলার প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক সুমহান। বয়সে অরিত্রের প্রায় সমান—তেইশ-চব্বিশের বেশি নয়। ধরিত্রীর মত সেও কেয়াতলার গ্রামপঞ্চায়েতের প্রধান। রোগা হাড়গিলে চেহারা। খুব গরিব ঘরের ছেলে সে। ইদানিং চেহারায় একটু লালিত্য এসেছে।

আরও অনেকের এসেছে। গতবছর পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর যেন এলাকায় এক নতুন যুগের সূচনা। আগের আমলে যারা ইউনিয়ন বোর্ডের মেম্বার হত, তারা প্রত্যেকেই ছিল টাকার কুমীর বা সম্পত্তিওয়ালা লোক। পরে পঞ্চায়েতি আমলেও তারাই রাজত্ব করেছে। গত নির্বাচনে হিড়িক ফেলে মাথা চাড়া দিয়েছিল নতুন-নতুন মুখ। বেশিরভাগই স্কুলের শিক্ষক, কিছু অর্ধশিক্ষিত সাধারণ চাষী, এমন কী ভূমিহীন পরিবারের ছেলেরাও ভোটে জিতে যায়। ফুলশেখর অঞ্চলে ব্যতিক্রম বলতে শুধু ওই ব্রজবন্ধু রায়। প্রচুর সম্পত্তি আছে, বুদ্ধিও ধারাল। উনি জিতেছেন রাজনৈতিক দলের সমর্থনে। এই এলাকায় দলের পাকাপোক্ত ঘুঁটি বলতে ব্রজবন্ধু রায়। গত ন-দশটা মাস মামলা চালানোর ফাঁকে-ফাঁকে অনেক প্রতিষ্ঠানে ক্ষমতা প্রসারিত করে ফেলেছেন। স্কুল, কো-অপারেটিভ, রুর‍্যাল লাইব্রেরি, কুটিরশিল্পকেন্দ্র সব কিছুতেই।

কাল শহিদুল বলছিল, 'তুমি দেখবে, এবার প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্রজবাবু কলকাঠি নাড়বেন। দুর্নীতি

দুর্নীতি করে চেঁচামেচি করবেন—ভূতের মুখে এবার কত রামনাম শুনবে শুনো, ধরিত্রী! একটা কাজ তুমি করতে পারবে না। বলে দিচ্ছি! আমি তো ঠিকই করে ফেলেছি রিজাইন দেব। আর কোন সাতেপাঁচে থাকবও না। তবে জেনে রেখ ধরিত্রী, ওই হারামজাদা আবদুলকে আমি ছাড়ব না। ও যেমন এগার বাই বারর খেল দেখাল, আমিও ওখানে দেখাব।'

গণ্ডগোলটা আবদুলই বাধিয়েছিল বটে। তেইশজন মেম্বারের মধ্যে বারজন শহিদুলকে ভোট দিয়েছিল। পরে আবদুল পিটিশন ঠুকে দিল, সে নাকি কাউকে ভোট দেয়নি। রিটার্নিং অফিসার ভুল করেছেন। সেই সঙ্গে আইনগত টেকনিক্যাল প্রশ্ন তুলে ব্রজবন্ধু চলে গেলেন আদালতে। জিতেও গেলেন। শহিদুলরা চেয়েছিল, অন্তত রি-ইলেকশনের জন্য হুকুম হোক। হয়নি। এদের পক্ষের ধরণী নামে একজনের নমিনেশন পেপারেই নাকি ভুল ছিল। ব্রজবন্ধু প্রমাণ করেছেন, ধরণী ফুলশেখরের লোক নয়। বাড়ি বীরভূমের গ্রামে। এখানে ওর শ্বশুরবাড়ি। এখানকার ভোটারলিস্টে ওর নামই নেই।

ধরিত্রীর কাছে ব্যাপারটা বড় জটিল। সে আইন-টাইন বুঝতে পারে না। আইনের তোয়াক্কাও করে কম। সে চায় কাজ। আর এ নিয়ে এতদিন ধরে পঞ্চায়েত অফিসার বা বিডিওর সঙ্গে তার অনেক তর্কাতর্কি হয়েছে। স্কিম মঞ্জুর করার আগেই কাজ শুরু করে দিয়েছে ধরিত্রী। অন্য স্কিমের ফান্ড থেকে খরচ করে ফেলেছে। বিডিও নরেন নন্দী আড়ালে বলেছেন, 'মাইয়ালোকের হ্যাবিটই হইল গিয়া এরকম। ডাইভারশন করনের তালে আছে। নেহাৎ স্ত্রীলোক বইল্যাই ওভারলুক করছি! কিন্তু আর পারুম না কইয়া দিলাম।'

শহিদুল মুচকি হেসে বলেছে, 'তুমি মেয়ে হয়ে অনেক সুবিধে, ধরিত্রী। সর্বত্র একটু ওয়েটেজ পাবে।'

হয়ত পায় ধরিত্রী আঁচ করে, মেয়ে হওয়ায় সত্যি তার কিছু সুবিধে আছে। এটুকু সে তত সচেতনভাবে না হোক, অন্তত কাজে লাগাতে ছাড়ে না। হাসতে হাসতে বলেছে, 'মিনিমাম শ্রুডনেস না থাকলে কি কিছু করা যায়?' গণমিত্র বলেছিলেন, 'আসলে আমাদের দেশে এই একটা প্যারাডক্স। মেয়েদের স্বামীর চিতায় বাঁশ দিয়ে ঠেলে জ্যান্ত পুড়িয়ে মেরেছে, কিংবা আজও পণের জন্য কেরোসিন ঢেলে আগুন জ্বেলে দিচ্ছে—এটা একটা সাইড। আবার বন্দে মাতরম বলে দলে দলে পুরুষরা ফাঁসিকাঠে ঝুলতে গেছে। বলবে, এ ভক্তি বিমূর্তের প্রতি। তবু কেমন বিমূর্ত? আইডিয়া একটা আছে এবং সেটা হল নারীর। তার মানে মায়ের আইডিয়া। কৃষিতান্ত্রিক সভ্যতায় মাতৃদেবতারই প্রাধান্য। হয়ত মেয়েদের হাতে কৃষির সূচনা হয়েছিল বলে এবং এ দেশে মাতৃতান্ত্রিক সমাজ হয়ত বেশিদিন টিকেছিল। যাকগে, ও সব হল প্রাগৈতিহাসিক কথা। কিন্তু এটা ঠিক যে আমরা মায়ের ভীষণ বশ। মায়ের কথায় নিজের ছেলেমেয়ের মাকে অবশ্য প্রয়োজনে পুড়িয়ে মারলেও!'

গণমিত্র তত্ত্ব নিয়েই আছেন সারাজীবন। বলেছিলেন, 'তো কথা হল, তোমাকে পঞ্চায়েত ইলেকশনে দাঁড়াতে বলার উদ্দেশ্যই ছিল, যে কাজ করতে পুরুষেরা খেয়োখেয়ি করবে, তুমি তা সহজে করে ফেলবে। তোমাকে কেউ বাধা দিতে চাইবে না মন থেকে। তোমার মধ্যে সেই ইমেজটা আছে—ছোটবেলা থেকে দেখছি। আর এ মাতৃইমেজ তো এমনি এমনি আসে না—শক্তির দরকার হয়। তোমার মধ্যে সেই শক্তিও আছে। লোকেরা দেখেছে সেটা, কতবার তার পরিচয়ও পেয়েছে—বিশেষ করে ফ্লাডের সময়। তবে ওই যে বললে শ্রুডনেসের কথা—' গণমিত্র মুচকি হেসে বলেছিলেন, 'ওটা তোমার রক্তে আছে, ধরি। বুঝেছ? আমি ব্যাচেলার মানুষ। বলবে যে নারীচরিত্রের আমি কী বুঝি। একটু-আধটু বুঝি বইকি। মেয়েরা যা পারে, পুরুষের তা দুঃসাধ্য। একজাম্পল ওই নদী—দড়কা! সম্ভবত অস্ট্রিক ভাষার এই শব্দটা স্ত্রীলিঙ্গ। দড়কো পুরুষ, দড়কা স্ত্রীলোক। হঠকারী। এ জন্যই পুরুষরা শাস্ত্রে লিখেছিল স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী? এটা ঈর্ষাজনিত নিন্দা। কেন? হঠকারী হওয়াটাও তো দরকার। প্রকৃতিতে নিয়ম যেমন আছে, তেমনি হঠকারিতাও কি কম আছে বল? মানুষের সমাজে রেভলিউশন ব্যাপারটাও তো তাই। নয় কি? বল ধরি!'

ওই দড়কা নদীর মতন হঠকারিতা কি তার মধ্যে সত্যি আছে? হঠাৎ সব ভেঙে তছনছ করে, ভাসিয়ে দিয়ে, বুকচাপড়ানো কান্নার রোল তুলে তারপর শান্ত হয় যে নদী, এবং দুকূল জুড়ে ভরে

তোলে পলিমাটির উর্বরতা যে, তারই মতন? এক বছর আগে হঠাৎ সন্ধ্যার বাসে বহরমপুর থেকে চলে এসেছিল। হিসেব করতে বসলে তত কিছু ঘটেনি সত্যি সত্যি। অমন তর্কাতর্কি তো কতবার হয়েছে। পরে মনে হয়েছিল, সে সহ্য করতে পারছে না সুদীপনকে। ও যেন একটা জাত-ক্লাউন। বিরাট বিরাট বৈপ্লবিক বুলির পর ধরিত্রীর শরীরের দিকে ভয়ে ও সাবধানে এগিয়ে এসে ভিক্ষের মত সুখ প্রার্থনা করেছে রাতের পর রাত। কিন্তু ও জানেই না, ধরিত্রীর মত মেয়ের কাছে সুখ পেতে হলে কী কতটা দিতে হয়। বিশাল এক শূন্যতায় ভেসে যাচ্ছিল ধরিত্রী। সেই চারটে বছরের কথা মনে পড়লে তার কষ্ট হয়। তেতো হয়ে যায় মন।...

'আপনারা কি বিক্ষুব্ধ?'

ধরিত্রী বড় একটা শ্বাস ফেলে তাকায়। হারিস আলি সামনে দাঁড়িয়ে পানখাওয়া লাল দাঁতে হাসছে। কৈতোড়ের পঞ্চায়েত প্রধান হারিস আলি। নীল পপলিনের পানজাবি গায়ে, পরনে চেককাটা লুঙ্গি, বগলে ছাতা এবং কাঁধে ব্যাগ। পাম্পসু পিচে ঠুকে ধুলো ঝেড়ে সে বলে, 'ভোরবেলা কানাই মোহান্ত গিয়ে খবর দিলে। দোনামনা করতে করতে চলে এলাম। তারপরে দেখি, বারান্দায় সব বেজোবাবুর লোক।'

সুমহান বলে, 'চাচা, হাওয়ার গতিক কী বুঝছ?'

'বাধবে।' হারিস আলি পিক ফেলে এককথায় বলে দেয়। তারপর ধরিত্রীর উদ্দেশে বলে, 'মাজান কী বুঝছেন গো?'

ধরিত্রী একটু হাসে। 'আমি কিছু বুঝি না। কিন্তু চাচা, বিক্ষুব্ধ বললেন যে?'

হারিস আলি অবশ্য শুদ্ধ করে বিক্ষুব্ধ উচ্চারণ করতে পারে না। বলে, 'বিক্ষুব্ধই বটে। খবরের কাগজ পড়ে শিখেছি কথাটা। মুরুক্ষু মানুষ মাজান! সেই জন্যে তো যেতে দোনামনা হচ্ছে। অথচ না এসেও পারলাম না।'

এই হারিস আলিকে দেখলে গণমিত্র ভীষণ রসিকতা করেন। হারিস আলি নাকি ভেতর-ভেতর মুসলিম লিগ গড়ে তোলার তালে আছে এলাকায়। একদিন ঠাট্টা করে গণমিত্র বলেছিলেন, 'ওহে হরিশ! খবরের কাগজ পড়েছ কি? তোমাদের মুসলিমদের নাকি ভারতে থাকতে দেবে না!' শোনা মাত্র হারিস আলি লাফিয়ে উঠেছিল। চোখ মুখ পাকিয়ে একেবারে দেশজ ভাষায় বলে উঠেছিল, 'তাহলে পরে, বুঝলেন বাবুমশাই? দড়কায় লোহু বহে যাবে—হ্যাঁ। দড়কা লোহুর দরিয়া হয়ে যাবে।' গণমিত্র হেসে অস্থির। যারা শুনছিল, তারাও হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়েছিল। হারিস আলি যখন বুঝল, ব্যাপারটা ঠাট্টা, তখন সেও হাসল। শেষে বলল, 'তবে আমাকে খালি হরিশ হরিশ করেন, ওটা ঠিক লয় মশাই। আমি হারিস আলি। মৌলবিসায়েবের দেওয়া নাম।'

কতরকম মানুষ আছে পৃথিবীতে। ধরিত্রী হারিস আলিকে সেই বৈচিত্রের অন্তর্গত মনে করে। তবে লোকটা বড় সরল। ঘোরপ্যাঁচের মধ্যে থাকে না বলেই তাকে ভাল লাগে। নিজের সামান্য একটু জমি আছে, আরও কিছু জমিতে ভাগচাষ করে। তার মত লোক অঞ্চলের সদস্য এবং গ্রামপ্রধান হওয়াটাই আশ্চর্য। কিন্তু ওই সরলতা এবং আরও একটা জিনিস তার আছে। তা হল সততা। কৈতোড় পঞ্চায়েতে এ পর্যন্ত দুর্নীতির কানাঘুষোও নেই।

আবার একজন আসে। মৌগাঁয়ের ভারু বাউরি। ষাঁড়ের মত কাঁধ, প্রকাণ্ড মানুষ। এক সময় রিকশ চালাত এখান থেকে শহর অব্দি। কিছু খাস জমি পেয়েছে। বড় ছেলে লংরুট সরকারি বাসে কন্ডাক্টরি চাকরি পেয়েছে। ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়েছিল ছেলেটা। ভারু ধরিত্রীকে কপালে হাত ঠেকিয়ে নমস্কার করে বলে, 'আপনাকে দেখেই এলাম বাবুদিদি! মিটিঙের আর কদ্দূর?'

ধরিত্রী বুঝতে পারে, এভাবে এখানে দাঁড়িয়ে থাকাটা ঠিক হয়নি। ব্রজবাবুর বিরোধীরা হয়ত একে-একে এখানে এসে এমনি করে জুটবে। ওরা ভাববে, এরা দল পাকাচ্ছে। সে বলে, 'মিটিং তো অফিসে। ওখানে যাও।'

'আপনি বাবুদিদি?'

'একটু পরে যাচ্ছি। বলে ধরিত্রী রাস্তা ধরে এগিয়ে চলে। একটু পরে ভিড়ের একজন হয়ে যায়।

হাটবারে এলাকা থেকে অসংখ্য মানুষ এসে জুটেছে। হাটতলার দিকে তুমুল কোলাহল শোনা যাচ্ছে। ভিড়ের ভেতর হাঁটতে আজ তার ভাল লাগছে না। চেনামুখগুলো তাকে সেলাম ও নমস্কার জানাচ্ছে। অন্যদিন সে এইসব সম্ভাষণ মন দিয়ে উপভোগ করে। একটা উদ্দেশ্যহীনতা তাকে কাল থেকে যেন পেয়ে বসেছে।

দূর থেকে ধরিত্রী দেখতে পায়, অরিত্র হাটে এসেছে আজ। সাইকেলে থলি ঝুলিয়ে কেনাকাটা করছে। ঠোঁটের কোনায় একটু হেসে ধরিত্রী ব্রিজের পাশ দিয়ে বাঁধে নামে। বাঁদিকে ইটখোলা। প্রকাণ্ড চিমনি থেকে ধোঁয়া উড়ছে। তার ওদিকে কংক্রিট পাইপ তৈরির কারখানা। কাঁটাতারের বেড়ায় ঘেরা পাঁচবিঘে জমি। টালির ঘর একটা, কয়েকটা চৌবাচ্চা, কংক্রিট তৈরির দুটো মেশিন। সাদা পাইপগুলো খোলামেলায় পড়ে আছে। জমিটা গণমিত্র বেচে দিয়েছিলেন। এখন হলে ধরিত্রী বেচতে দিত না। ধান ফলাত।

ডাইনে নদীর ওপারে বিপ্রশেখরের বামুনপাড়া। গাছপালার ভেতর শিবমন্দিরের চূড়া দেখা যাচ্ছে। কিছুটা এগিয়ে ধরিত্রী বাঁধের ওপর বেঁটে বটগাছের তলায় দাঁড়ায়। অর্জুন বাগদি বাঁধের নয়ানজুলি হাতড়ে মাছ ধরছিল। ধরিত্রীকে দেখতে পেয়ে দাঁত বের করে। 'পঞ্চাতদিদি নাকিন গো? ই বাগে কোথা চললেন?'

ধরিত্রী বলে, 'তিলক মুনিশ নিয়ে গেছে। দেখি কী করছে।'

'একটুখানি দাঁড়ান পঞ্চাতদিদি! কথা আছে।'

বুঝতে পেরে ধরিত্রী বলে, 'কাজ হতে একটু দেরি হবে অর্জুন! গণ্ডগোল মিটতে দাও আগে।'

অর্জুন হতাশ হয়ে বলে, 'তদ্দিন যে আর বেঁচে থাকব না পঞ্চাতদিদি! রাতউপোস দিনউপোস অবস্থা। আর দেখুন না দিদি, মা বসুমতীও কি কিপা করছেন? জলতল হাতড়ে যে দুটো ধরব—ধরে পুড়িয়ে খাব, তাও কি মিলছে?'

'মুনিশ খাটছ না কেন?'

আবার দাঁত বের করে অর্জুন। 'আপনি খাটাবেন? বলুন, খাটব! দিদি, খাটাখাটুনিরও যে দিনকাল নাই। একটা মুন্সি ডাকতে বিশটে মুন্সি এসে জড় হচ্ছে। গেরস্থরই পোয়াবার। বলে, তিনটাকায় খাটবি?'

ধরিত্রী বলে, 'কেন? রেট তো আমরা বেঁধে দিয়েছি আটটাকা।'

হা হা করে হাসে অর্জুন। 'মাথাখারাপ পঞ্চাতদিদি? সস্তার তিন অবস্থা যে। তিনটাকায় খাটব বললেও কি জুটছে? এই দেখুন না আমার অবস্থা।'

ধরিত্রী চুপ করে থাকে। গ্রামে একসময় এদের বলা হত ভূমিহীন ক্ষেতমজুর। দেখতে দেখতে এদের সংখ্যা প্রচণ্ড বেড়ে গেছে। আরও কত ছোট চাষী জমি ঘুচিয়ে এদের দলে এসে ঢুকছে। এরা গ্রামের নিরক্ষর বেকার। চাষের মরশুমে এরা দলবেঁধে চলে যেত ক্যানেল এলাকায়। এখন সেখানেও নিরক্ষর বেকারের সংখ্যা বেড়েছে। পুরো একটা জেনারেশন নিঃসম্বল হয়ে জন্ম নিয়েছে। জন্ম নিচ্ছে। এরা কী করবে? চুরি ডাকাতি বাড়ছে গ্রামে গ্রামে। দিনদুপুরে লুঠপাঠ, ছিনতাই চলছে। এরা অনেকেই যোগ্য লিডার খুঁজে নিচ্ছে। হলা যেন টের পেয়েছিল গ্রামাঞ্চলে এইসব হতাশ, রাগী ; দুর্বিনীত যুবকদের মনের কথা। এলাকায় এসে ডাকাতির দল গড়েছিল। আবার গ্রাম্য দলাদলিতে সংঘর্ষ বাধলেও সে ভাড়াটে বাহিনী যোগাত। বোমা, পিস্তল, বন্দুক—কিছুরই অভাব ছিল না হলার। কিন্তু হলা শেষ পর্যন্ত হেরে গেল। তাকে হারতেই হত।

ধরিত্রী বড় একটা শ্বাস ফেলে বলে, 'চলি অর্জুন!'...

নদীর বাঁকের মাথায় ধরিত্রীকে দেখতে পেয়ে তিলক বোরোধানের জমি থেকে দৌড়ে আসে। বলে, 'বারটা বাজতে বাজতে দেড়বিঘে সাফ হয়ে যাবে। এই চটানে খামার করে মেড়ে নেব বাবুদিদি! বউকে বলেছি, নিকিয়ে দিয়ে যাবে খামার। ওই দেখুন, একগাদা গোবরও কুড়িয়ে রেখেছি। আপনি এসে ভালই হল। গরুজোড়া নিয়ে আসি। চরুক ততক্ষণ। ওবেলা মাড়নে লাগাব।'

বাঁধের নিচে পোড়ো খানিকটা জায়গা কোদালে চেঁছে সাফ করে রেখেছে তিলক। মধ্যিখানে বাঁশের খুঁটিও পুঁতে ফেলেছে। ধরিত্রী বলে, 'কালকের ঝড়ে ক্ষতি হয়েছে নাকি?'

তিলক একটু তাকাতে জমির দিকে ঘুরে বলে, 'খুব ক্ষেতি হয়নি। তিনভাগের একভাগ মত ঝরে গেছে। আজ ঝড়জল হলে সমিস্যে তত নেই। তিনখানা তেরপল এনে রেখেছি।'

বাঁধের বিরাট জামগাছের ছায়ায় ধরিত্রী বসে পড়ে। আবার তার মনে হয়, সে এতদিনকার পরিচিত পৃথিবী থেকে এমন করে আসলে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। শরীরেও কী এক গভীরতর ক্লান্তি।...

ছয়

চৌরাস্তার মোড়ের কাছে একটা সিগারেটের দোকানে চুরুট কিনছিল সুদীপন। সেইসময় দেখল অরিত্র শিরিসগাছের ছায়ায় সাইকেল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আনমনে সিগারেট টানছে।

ওকে দেখে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সুদীপন একটু চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। সামলে নিয়ে ঘুরে দাঁড়ায় সে। অরিত্র সিগারেট টানছে বলে লজ্জা পাবে তাকে দেখে—তবে সেজন্য নয়, সুদীপনের মনে হয়, ধরিত্রীর ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলা উচিত হবে না। ফিরে গিয়েই তো বাড়িতে বলবে, জামাইবাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল।

সুদীপন লাল খোয়াঢাকা গলিপথে ঢোকে। কয়েক পা এগোতেই শোনে, অরিত্র 'জামাইবাবু! জামাইবাবু!' বলে ডাকতে ডাকতে পেছনে আসছে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও দাঁড়িয়ে পড়ে সুদীপন।

অরিত্র এসে হাসিমুখে বলে, 'এখনই যেতাম আপনার বাসায়।'

'কখন এসেছ?'

'সাড়ে নটায় প্রায়।' অরিত্র কাঁচুমাচু হাসে। 'এসেই দেখি বিশাল লাইন। আমি এখনও এত বোকা জামাইবাবু, ভেবেছিলাম আমি ছাড়া বুঝি আর একটাও বেকার নেই দেশে। ফর্ম নিতে বারটা বেজে গেল।'

'কিসের ফর্ম?'

'সেরিকালচার ইন্সটিটিউটের। তাও চাকরি নয়, নিছক ট্রেনিং। একবছর ট্রেনিংয়ের পর চাকরি হবে কিনা তার ঠিক নেই কিছু।' অরিত্র রুমাল বের করে মুখের ঘাম মোছে। ফের একটু হেসে বলে, 'হায়ার সেকেন্ডারি চেয়েছে। আমি বি এসসি। হয়ে যেতেও পারে। কী বলেন?

সুদীপন পুরু চশমার ভেতর নির্বিকার মুখে ওকে দেখছিল। একই রক্ত বইছে শরীরে, অথচ ধরিত্রী আর অরিত্রে কত আকাশ-পাতাল তফাত! চুরুটের প্যাকেট থেকে চুরুট বের করে একটু ঠোকে সে। তারপর ধরিয়ে নিয়ে আস্তে বলে, 'এস।'

গলিরাস্তাটা দুপুরের দিকে নির্জন প্রায়। রেডিও বাজছে প্রতিটি ঘরে। যেতে যেতে একই গান পুরোটা শোনা হয়ে যায়। অরিত্র গলির শেষ পর্যন্ত চুপচাপ গেল। সুদীপনের সামনের দিকে ঝুঁকে নিচে তাকিয়ে হাঁটা অভ্যাস। অরিত্র যখন বলে, 'বাসা অব্দি আর যাব না জামাইবাবু, দেখা তো হয়েই গেল,' তখন সুদীপন মুখ তোলে। দাঁতে চুরুটটা কামড়ানো। পুরু খদ্দরের ঢোলা পানজাবির পকেটে একটা হাত।

অরিত্র বলে, 'পিসিমা বলেছিলেন একবার দেখা করে আসিস।'

'নইলে আসতে না?'

অরিত্র মুহূর্তে অপ্রস্তুত হয়ে যায়। বলে, 'না—না! নিজে থেকেও আসতাম। পিসিমার ব্যাপারটা নিছক অজুহাত, জামাইবাবু!'

এটা অপেক্ষাকৃত চওড়া রাস্তা। সোজা চলে গেছে গঙ্গার দিকে। বাঁয়ে শহরের আবর্জনা ফেলার জমিটা জুড়ে বনদফতর বড়রকমের বন রচনা করেছেন। ডাইনে ঠাসাঠাসি দোতলা-একতলা বাড়ি সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। শেষ দিকটায় সুদীপনের বাসা। চলতে চলতে অরিত্র বলে, 'যাই বলুন, সেদিন অমন করে চলে আসা ঠিক হয়নি আপনার। পিসিমা ভীষণ দুঃখ করছিলেন। গরি কান্নাকাটি করছিল। তাছাড়া আমারও...'

কথা কেড়ে সুদীপন শুকনো হেসে বলে, 'হয়ত ইদানিং আমার মধ্যে এক ধরনের ইনস্যানিটি গ্রো করেছে অরু! অনেক সময় নিজের আচরণের জন্য নিজেরই অবাক লাগে। দেখ না, সেদিন হঠাৎ ইচ্ছে

হল, কলেজে গণ্ডগোল চলেছে—অতএব ফ্রেশ এয়ার নিয়ে আসি ফ্রম সামহোয়ার—ফ্রম এনি জ্যামলেস! তারপর কী হল, সটান ফুলশেখরের বাসে চেপে বসলাম। বাস যখন চলছে, তখনও গন্তব্যের ছবিটা স্পষ্ট ছিল না। জাস্ট অ্যাকসিডেন্টালি নেমে গেলাম তোমাদের স্টপে।' একটু চুপচাপ থাকার পর ফের বলে সে, 'আমি ভীষণ—ভীষণ দুঃখিত অরু। তোমরা আমাকে ক্ষমা কর।'

অরিত্র আস্তে বলে, 'খেয়ে এলে ব্যাপারটা স্বাভাবিক থাকত।'

'তা ঠিকই।' সুদীপনও খুব আস্তে নরম গলায় বলে, 'অরু, আমি হয়ত হঠাৎ নিজের ওপর রাগ করে চলে এসেছিলাম। তোমাদের গ্রামটা ভারি সুন্দর। তোমাদের বাড়ির নিচে—বিশেষ করে নদী আর ওই ন্যাচারাল এনভায়রনমেন্ট অসাধারণ! আমি বলছি—অসাধারণ! ঘাটটাও তুমি অপূর্ব করেছ, অরু! অথচ বসে থাকতে থাকতে মনে হল, আমি ট্রেসপাস করেছি। আমি একজন আউটসাইডার।'

তারপর সে উঁচু বারান্দায় উঠে জোরে কড়া নাড়ল। অরিত্র একটু বিব্রতভাবে বলে, 'আমি এক্ষুনি চলে যাব জামাইবাবু!'

কড়া নাড়ার মধ্যেই সুদীপন বলে, 'একটু বসে যাও। ভীষণ রোদে অতটা পথ সাইকেলে যাবে। তাছাড়া তোমাদের সঙ্গে আমার অন্য একটা সম্পর্ক আছে। তুমি আমার ছাত্র ছিলে। অস্বীকার করবে কি?'

দরজা খুলতে দেরি হল। হাতে এঁটো নিয়ে ময়লা ফ্রকপরা উস্কোখুস্কো একমাথা চুল একটি মেয়ে দরজা খুলে দৌড়ে ভেতরে চলে গেল। সুদীপন বলল, 'মাকে বল বুড়ি, ফুলশেখরের অরু এসেছে।' ভেতর থেকে বুড়ি চেঁচিয়ে বলল, 'নেই।'

অরিত্র নিচে সাইকেল রেখে আসছিল, সুদীপনের কথায় বারান্দায় তোলে। সুদীপন ভেতরে চলে যায়। ফ্যানের সুইচ টিপে দিয়ে যায়। অরিত্র সোফায় বসে পড়ে।

সুদীপনের এই ঘরটা সুন্দর সাজানো-গোছানো। বইভর্তি র‍্যাক, কতরকম শিল্পদ্রব্য, একধারে চওড়া ডিভান, দেয়ালে আধুনিক চিত্রকলা। এ ঘরে যখনই ঢুকেছে, অরিত্রের মনে জামাইবাবু সম্পর্কে সম্ভ্রমবোধ গাঢ় হয়েছে। পণ্ডিত মানুষ তার জামাইবাবু। সুদীপন বলত, 'ভেবো না অরু এসব তোমার দিদির হাতে সাজানো। বরং তোমার দিদি এলোমেলো করে দিতে পারলেই খুশি। ও-মাসে যে সুন্দর ফ্লাওয়ার ভাসটা দেখেছ, মনে পড়ছে? ওইখানে ছিল বুকভর্তি রজনীগন্ধা নিয়ে। নেই কেন বল তো? তোমার দিদির আঁচলের ধাক্কায় গুঁড়ো হয়ে গেছে।' অরিত্র চাপা গলায় বলত, 'বড়দিকে কখনও রান্নাঘরে ঢুকতে দেয় না পিসিমা, জানেন তো?'...

টুকরো-টুকরো স্মৃতি ভেসে আসে। অরিত্র ঘরের ভেতরটা খুঁটিয়ে লক্ষ্য করে। কোন পরিবর্তন ঘটেনি একচুল। এমন কী, কারুকার্যময় রঙিন রাজস্থানী পেতলের বিশাল ফুলদানিটা একবুক রজনীগন্ধা নিয়ে তেমনি হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে। ডিভানের একপাশে প্রকাণ্ড সব সুদৃশ্য ইংরেজি বই তেমনি সাজানো। বিয়ের পর আগ্রা গিয়ে জামাইবাবু আর বড়দি যে কার্পেটটা এনেছিল, তাও একইভাবে বিছানো রয়েছে।

এখন বড়দি কী করছে ভাবতে গিয়ে হতাশ বোধ করে অরিত্র। এখন হয়ত সোনাটুকরির মাঠে বিজলগাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে ধরিত্রী ব্লক ওভারশিয়ারের সঙ্গে তর্ক করছে। ঘেমেতেতে তামাটে মুখ কালো হয়ে গেছে। চুলে শুকনো পাতা বা ডালের কুচি আটকে গেছে। টের পাচ্ছে না। হয়ত দু-একটা পোকামাকড় কাঁধের কাছে ঘুরঘুর করছে। চামড়ায় পৌঁছুলে সুড়সুড়ি লাগবে এবং অসচেতন হাতে সরিয়ে দেবে। অরিত্র স্পষ্ট দেখতে পায়, হরিমাটির রাস্তায় মাটি পড়ছে আর ধরিত্রী হেঁট হয়ে একমুঠো মাটি তুলে গুঁড়ো করে ফেলছে। সোনাটুকরির মাটির ঘ্রাণে আবিষ্ট ধরিত্রী তারপর ঝোপের তলায় গুঁড়ি মেরে যেন সাপের গর্ত দেখছে।

আগে মিতুপিসিমা প্রায়ই সাবধান করে দিতেন ওকে, 'মাঠেঘাটে অমন করে ঘুরিস নে ধরি, পোকামাকড় থাকে। কখন কিসে ছুঁয়ে-টুয়ে দেয়।' ধরিত্রী বলত, 'আমার রক্তে বিষ আছে। যে ছোঁবে, সেই মারা পড়বে।' একদিন ধরিত্রীর চোখের সামনে তিলের জমিতে সাপে ছুঁল একটা লোককে। ধরিত্রী নিজের শাড়ির পাড় ছিঁড়ে তার পায়ে বাঁধন দিয়েছিল। তারপর হেলথ সেন্টারে এনে ভর্তি

করেছিল। কিন্তু বাঁচেনি লোকটা। তখন হেলথসেন্টারে সিরাম ইনজেকশনের ব্যবস্থা ছিল না। ধরিত্রী চেষ্টাচরিত্র করে সিরাম ইনজেকশন আনিয়েছে। তবু প্রতি বছর কত লোক মারা পড়ে।...

সুদীপন ফিরে এসে বলে, 'আমি তোমাদের বাড়ি খেয়ে আসিনি। কাজেই তোমাকে খেতে বলতে সঙ্কোচ বোধ করছি। কিন্তু ওই যে একটা কথা আছে। তুমি অধম, তাই বলিয়া আমি উত্তম না হইব কেন?'

সুদীপন হাসে। অরিত্র ব্যস্তভাবে বলে, 'না না। আমি খেয়ে এসেছি।'

'অত সকালে তোমাদের রান্না হয় না। এস অরু!'

'আপনি খেয়ে নিন, আমি উঠি।'

'এত তাড়া কিসের তোমার? এবেলা না হয় থেকেই গেলে গুরুগৃহে। অনেক কথাও আছে তোমার সঙ্গে।'

অরিত্র মুখ তুলে দেখে, সুদীপন তার দিকে তাকিয়ে আছে। অরিত্র কাঁচুমাচু মুখে বলে, 'ব্যাপারটা হল, আজ বিকেলে আমাদের ওখানে প্রচণ্ড ফেস্টিভ্যাল জামাইবাবু! আজ চৈত্র-সংক্রান্তি না? বিপ্রশেখরে মেলা বসবে। আমরা বন্ধুবান্ধব মিলে এদিনটা একটু হইচই করি।'

'বেশ তো! বিকেলেই যথাসময়ে যাবে।'

'যদি ঝড়বৃষ্টি হয়? যাব কীভাবে?'

সুদীপন একটু চুপ করে থেকে বলে, 'সে না হয় বাসেই যেতে। যাক গে। এস, দুমুঠো খেয়ে নিই আমরা।'

সুদীপন ওর কাঁধে হাত রাখলে অরিত্র বশ মেনে ওঠে। ভেবে নেয়, বাড়ি ফিরে এখানে আসার কথাটা গোপন রাখবে বরং।

খেতে খেতে সুদীপন বলে, 'মা গেছেন কাশিমবাজারে। অচিন্ত্য এসে নিয়ে গেছে। আজ ওখানেও সংক্রান্তির ধুমধাম। অষ্টপ্রহর কীর্তন আছে। মায়ের ব্যাপারটা তো জান? তুলনায় তোমার পিসিমাকে অতটা বাতিকগ্রস্ত মনে হয় না।'

'পিসিমা ধর্মকর্মের ধার ধারেন না বিশেষ।'

'হুঁ। গ্রামে সারাজীবন কাটিয়েও মানুষ যুক্তিবাদী হতে পারে। আসলে গ্রামশহর বা শিক্ষাদীক্ষা কোন ফ্যাক্টর নয়। যুক্তিবোধ জিনিসটা কোন-কোন মানুষ সঙ্গে নিয়েই জন্মায়।' ভাতের গ্রাস মুখে করেই সুদীপন ফের বলে, 'তবে যুক্তিবোধের যুগটা বোধ করি শেষ হয়ে যাচ্ছে দ্রুত। সেইসব মানুষরা আজ জন্মাচ্ছে না। চারদিকে যুক্তিবোধশূন্য, পারভার্টেড, অ্যাবসার্ডিটিপ্রবণ মানুষজনের প্রাবল্য বড়। তুমি লক্ষ্য করেছ কি অরু? প্রচণ্ড ধর্মপ্রবণতা দেখা দিয়েছে। অসংখ্য ম্যাজিসিয়ান বাবার আবির্ভাব চতুর্দিকে। অথচ চাঁদে মানুষ গেল সেদিন।'

'ফ্রাস্ট্রেশান।'

'ঠিক। ঠিক।' মাথা নেড়ে এক ঢোক জল খায় সুদীপন। অরিত্রের পাতের দিকে তাকিয়ে বলে, 'বুড়ি রেঁধেছে। বাবা তো শয্যাশায়ী। এই বাচ্চা মেয়েটাকে না পেলে খুব অসুবিধে হত। তুমি ওর দক্ষতা দেখলে অবাক হবে, অরু! আমি তো সকালে বাজারটুকু করার ফুরসৎ পাইনে। টিউশন—তারপর সপ্তায় দুদিন কোচিং করতে যাই সকালবেলাটা। বুড়ি বাজারটা পর্যন্ত করে। সংসারের এভরিথিং! কী রে বুড়ি? শুনে ফেললি তো? লেজ মোটা হয়ে গেল নাকি, ঘোর তো দেখি।'

সুদীপনকে কদাচিৎ রসিকতা করতে দেখেছে অরিত্র। এখন দেখল। তখন থেকে একঘেয়ে শান্ত এবং ভারি গলায় কথা বলার পর সুদীপনের এই হালকা স্বর তার ভাল লাগে।

অরিত্রের বরাবর খিদেটা যেন বেশি। সত্যিসত্যি তার খিদে পেয়েছিল। ভাল করেই খায়। সুদীপন তার হাতে জল ঢেলে দিলে অরিত্রের মনে হয় এও স্নেহধারা। তার মন আরও অনুগত হয়ে ওঠে। সে ভাবে, এত ভদ্র শান্ত আর স্নেহপ্রবণ মানুষকে ফেলে ওর দিদি কেন মাঠেঘাটে গেঁয়ো ছোটলোকদের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে! বাইরের সাজানো-গোছানো ঘরটাতে ফিরে সোফায় হেলান দিয়ে বসে থাকতে থাকতে অরিত্রের মনের প্রচ্ছন্ন অভিমান ঘৃণায় পরিণত হতে থাকে।

সুদীপন তার সামনাসামনি বসে একটু হেসে বলে, 'তুমি তো সিগারেট খাও, অরু? লজ্জা কোর

না। তোমার চেয়ে বয়সে ছোট, আমার কোন-কোন ছাত্র আমার সামনে সিগারেট খায়। আমিই প্ররোচিত করেছিলাম।' সে হাত বাড়িয়ে হোয়াট-নটের মাথা থেকে একটা সিগারেটের প্যাকেট নেয়। বলে, 'কদাচিৎ দু-একটা খাই মুখ বদলানোর জন্য। সঙ্কোচ কর না। নাও।'

অরিত্র অপ্রস্তুত মুখে তাকায়। তারপর একটা সিগারেট টেনে নেয়। সুদীপন দেশলাই জ্বেলে ধরিয়ে দেয় এবং নিজেও একটা সিগারেট ধরায়। দুজনে কিছুক্ষণ চুপচাপ সিগারেট টানতে থাকে। অরিত্র জানালা দিয়ে রাস্তার ওপাশে কৃষ্ণচূড়ার লাল ব্যাপকতা লক্ষ্য করে। একটা গাধাকে চুপচাপ সিসলগাছের তলায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে। কাঁখে ঝুড়ি নিয়ে আবর্জনার ভেতর দামি কিছু খুঁজে বের করার জন্য একটি মুদ্দফরাস মেয়ে ওই জঙ্গলে ঢুকে যায়। অরিত্রের দৃষ্টি লক্ষ্য করে সুদীপন মৃদু স্বরে বলে, 'একসময় এ বাড়িটা কুৎসিত মনে হত, জান? বছর ত্রিশেক আগের কথা বলছি। পুরো এদিকটা ছিল নোংরার পাহাড়। অনেক সময় ভীষণ দুর্গন্ধ ছড়াত। তারপর আস্তে আস্তে সয়ে যাচ্ছিল। তারপর ফরেস্ট ডিপার্ট থেকে গাছপালা পুঁতল। দশটা বছরেই এই অবিশ্বাস্য আচ্ছাদন। তার মানে রঙিন শাড়ি পরান হল। আর ওই যে দেখছ সবুজ বেড়াটা, শেষ পর্যন্ত ওটাই একটা সীমারেখা হয়ে উঠল। কিসের বল তো?'

অরিত্র বোকা-বোকা হাসল, চোখে প্রশ্ন।

সুদীপন বলে, 'শালীনতার। কুকুর বেড়ালগুলো আর নোংরা টেনে নিয়ে আসতে পারে না। ওই বেড়ার মধ্যে ঘন করে কাঁটাতার টানা আছে সারসার। আমি বারান্দায় বসে একসময় গঙ্গা দেখতে পেতাম। এখন পাই না। কিন্তু দেশটার প্রকৃত চেহারা দেখি। দেখছ কত কৃষ্ণচূড়া রাধাচূড়া ফুটে আছে। ওই দেখ, শিরিসের মাথাতেও কত ফুল। ভেতরে ঢুকলে তুমি দু-একটা জন্তুর পচা মড়াও দেখতে পাবে। এমন কী হয়ত কোন মনুষ্যশাবকেরও। তবে ওই যে বললাম, আমার—মানে এই রাস্তার ধারের মধ্যবিত্ত লোকেদের নাকের স্নায়ু অনেকদিন আগে নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছে।'

বর্ণাঢ্য অ্যাশট্রেতে একটু ঝুঁকে সিগারেটের ছাই ফেলে সুদীপন। তারপর সিগারেটের মাথাটা ঘষেঘষে তীক্ষ্ণ করে ফেলে। ওই অবস্থায় বলে, 'সেদিন তুমি বলছিলে 'হলার কথা। হলা ফুলের মধ্যে মানুষ হয়েছিল। তোমার এই বাক্যটা হয়ত তুমি অসচেতনভাবে উচ্চারণ করেছিলে। আমি কিন্তু ভীষণ চমকে গিয়েছিলাম শুনে। কারণ সত্যি বলতে কী, হলাকে আমি এভাবে দেখিনি কখনও।'

'হলার বাবার নার্সারিতে যাননি কোনদিন!'

'একবার গিয়েছিলাম মনে পড়ছে।' সুদীপন সোজা হয়ে বসে। হেলান দেয়। ঘুরন্ত পাখার দিকে চোখ রেখে বলে, 'হলা বছর দুই আগে মাঝে মাঝে আমার কাছে এসে বলত একটা চাকরি খুঁজে দিতে। বলত, শিগগির চাকরি-বাকরি না পেলে নাকি ও খারাপ হয়ে যাবে। একদিন রিকশ করে যাচ্ছি—আমি এবং তোমার দিদি, হঠাৎ রিকশ থামিয়ে দিয়ে বলল, ও নাকি খারাপ হয়ে যাচ্ছে! ভেতর-ভেতর ওর এসব কথায় আমি ভীষণ ক্ষুব্ধ হতাম। সেদিনও হয়েছিলাম। কিন্তু কোন কথা বলিনি। কেন জান? খারাপ হওয়া বলতে কী বোঝায়? চাকরি পাওয়া আর না-পাওয়ার সঙ্গে তার কী সম্পর্ক? আসলে অরু, চাকরি পাওয়াটাই তো ভাল হওয়া অর্থাৎ খারাপ না-হওয়া থেকে বেঁচে যাওয়া নয়। চাকরি পেয়েও তুমি খারাপ হয়ে যেতে পার। দেশে যে লক্ষ লক্ষ লোক চাকরি করছে, তারা বুঝি ভাল হয়ে গেছে, তাহলে দেশটার এই ডেকাডেন্স কেন? চাকরি যারা পেয়েছে, তারাও খারাপ হয়ে গেছে।'

অরিত্র যুক্তিটা বোঝার চেষ্টা করে বলে, 'হলা হয়ত সৎভাবে বেঁচে থাকা যায়, এমন কিছু চাইছিল।'

'সৎভাবে!' সুদীপন একটু হাসে। 'বিমূর্ত তত্ত্ব হিসেবে কিংবা উইদাউট পারসপেকটিভ, কথাটার হয়ত মানে থাকতে পারে। কিন্তু বর্তমান সামাজিক পরিস্থিতিতে ওটা উদ্ভট একটা কথা। কেউ সৎভাবে সারভাইভ করতে পারবে না একালে। সে ফুলের মধ্যে জন্মাক, আর যেখানেই জন্মাক। হলাকে যদি মার্কেটিং কো-অপারেটিভের চাকরিটা পাইয়ে দিতাম, হলা অন্যদের মতই চুরি করত। করতে হত তাকে। কিন্তু আমি চাইছিলাম, হলা আরও সাংঘাতিক কিছু করুক। ওকে আমি তোমার আগে থেকে চিনতাম। ওর মধ্যে একটা বিক্ষোভ ছিল। হীনমন্যতা ছিল। তা থেকে একটা ধ্বংসের আর স্বেচ্ছাচারিতার ক্ষমতা ডেভলপ করেছিল ওর মধ্যে। রাজনৈতিক ব্যক্তিরা তো এইসব ছেলেকেই

মার্সেনারি হিসেবে রিক্রুট করে। হলা যখন বুঝল তার মাথা বাঁচানোর জন্য সমাজের ক্ষমতাবান লোকেরা আছে, তখন সে আরও এক পা এগিয়ে গেল। ডাকাতি শুরু করল। এ শহরে রাজনৈতিক কুলপতিদের কাছে তখন হলা হয়ে উঠল ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের সেই দানব। তারা সভয়ে সরে দাঁড়াল। বেগতিক দেখে হলা পালিয়ে গেল তোমাদের এলাকায়।'

অরিত্র একটু অবাক হয়ে বলে, 'হলার সম্পর্কে আপনি অনেক কথা জানেন দেখছি!'

'জানি।' সুদীপন শক্ত গলায় আস্তে বলে, 'গত বছর মার্চে তোমার দিদি চলে গেল ফুলশেখরে। তার কিছুদিন পরে হলা ওই এলাকায় যায়। তুমি হয়ত জান না অরু, হলার ওখানে যাবার পেছনে তোমার দিদির প্ররোচনা ছিল।'

অরিত্র চমকে উঠেছিল। উত্তেজনায় চঞ্চল হয়ে তাকিয়ে থাকার পর সে বলে, 'আশ্চর্য! বড়দির সঙ্গে...'

সুদীপন শুকনো হাসে। 'হলা তো বেঁচে নেই। কাজেই ওর সম্পর্কে উত্তেজিত হবারও কিছু নেই, অরু।'

'বড়দির সঙ্গে ওর তো কোন যোগাযোগ ছিল না!'

'ছিল।'

'থাকলে আমার চোখে পড়ত।'

'গতবছর এপ্রিলে আমি ফুলশেখরে গেলাম। রাত অব্দি তোমাদের বাড়ির সামনে গেটের ওখানে তোমার দিদি আর আমি পায়চারি করছিলাম।'

'মনে আছে। জ্যোৎস্না ছিল।' অরিত্র গলার ভেতর বলে, 'আমার ঘুম আসছিল না। ওপরে জানালার কাছে বসে সিগারেট খেতে খেতে দেখছিলাম আপনারা তর্ক করছেন।'

'হলা তখন তোমাদের ঠাকুরবাড়িতে লুকিয়ে ছিল।'

'আশ্চর্য! আমরা জানতাম না।'

'রাত এগারোটার বাসের জন্য ব্রিজের কাছে বটতলার স্টপে দাঁড়িয়ে আছি, হঠাৎ হলা আমাকে ডাকল। ভীষণ ভয় পেয়েছিলাম ওকে দেখে। হলা আমাকে ফলো করে এসেছিল ওখানে। যাই হোক, হি ইজ ডেড।'

সুদীপন সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে গুঁজে উঠে যায়। টেবিলের দেরাজ থেকে একটা চুরুট নিয়ে আসে। চুরুটটা ধরিয়ে একটু হাসে। 'সিগারেটে আমি কিছু পাই না আরও কড়া বা ঝাঁঝাল কিছু চাই-ই। হয়ত শেষ পর্যন্ত গলায় ক্যান্সার হয়ে মারা পড়ব। আমার ভয়েস একটু ক্র্যাক করছে মনে হয় না তোমার?'

সেকথার জবাব না দিয়ে অরিত্র বলে, 'কী বলল হলা আপনাকে?'

সুদীপনও কথাটা এড়িয়ে যায়। বলে, 'মাসতিনেক ব্যাপারটা আমাকে ভীষণ ভোগাল—আই মিন, মনের ভেতর। ধরিত্রী এ কী করছে! ওকে সপ্তায় একটা করে চিঠি লিখতাম। জবাব পেতাম না। মাসতিনেক পরে একদিন সন্ধ্যা থেকে টিপটিপ করে বৃষ্টি হচ্ছে, চুপচাপ বসে আছি। রাত দশটা বেজে গেছে, তখনও শুতে পারছি না। হঠাৎ বেরিয়ে পড়লাম। সাড়ে দশটার বাসটা পেয়ে গেলাম। ফুলশেখর পৌঁছুলাম, তখন বৃষ্টির সঙ্গে ঝোড়ো বাতাস বইতে শুরু করেছে। ভিজে তো গেলামই, কাদায় আছাড় খেয়ে অবস্থা করুণ হল। প্রচণ্ড জেদ আমাকে ঠেলে নিয়ে গিয়েছিল সেরাতে। আমি ধরিত্রীকে হলার হাত থেকে বাঁচাতে গিয়েছিলাম।'

অরিত্র মুখ তুলল। কিন্তু কিছু বলল না।

সুদীপন একটা চাপা শ্বাস ছেড়ে বলে, 'সেরাতে তোমার দিদি—ধরিত্রী, আশ্চর্য ভদ্র ব্যবহার করল আমার সঙ্গে। আমার বক্তব্য মন দিয়ে শোনার ভান করল। ওকে বোঝাতে চাইলাম, হলার কাজটাকে আমি খারাপ বলছি না। যারা চাকরি করে, তাদের কেউ কেউ ঠিক এই কাজটাই অন্য প্রক্রিয়ায় করে থাকে। প্রশ্নটা সেখানে নয়, অন্যত্র। ধরিত্রী বলল, একটা লোককে টিট করার জন্য হলাকে সে আশ্রয় দেয় মাঝে মাঝে। ওর ডেভেলপমেন্ট স্কিমগুলো নাকি এই লোকটার জন্য আটকে যাচ্ছে। তাকে সে সমাজের শত্রু মনে করছে।'

'বুঝেছি। বিপ্রশেখরের ব্রজবন্ধুবাবু।'

সুদীপন একটু চুপ করে থাকার পর বলে, 'কিন্তু কথাটা আমি বিশ্বাস করিনি।'

এবার অরিত্র ক্ষুব্ধ হয়ে বলে, 'তাছাড়া আর কী কারণ থাকতে পারত? বড়দি নিশ্চয় দেবীচৌধুরানি হতে চায় নি!'

সুদীপন পুরু চশমার ভেতর দিয়ে অরিত্রের মুখের দিকে তাকায়। তারপর মাথাটা একটু দোলায়। 'না।'

'তাহলে?'

সুদীপন চুপ করে থাকে। খবরের কাগজটা টেনে নিয়ে চোখ রাখে।

মিনিটখানেক পরে অরিত্র শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বলে, 'আপনি কি বড়দির ক্যারেক্টার সম্পর্কে কিছু মিন করছেন?'

সুদীপন তবু চুপ করে থাকে। জ্বলন্ত চুরুট কামড়ে কাগজের পাতা ওল্টায়।

অরিত্র উঠে দাঁড়ায়। 'তাহলে আপনি গুরুজন এবং পণ্ডিত মানুষ হলেও বলব, আপনি মীন, জামাইবাবু! এ আপনার মীননেস! বড়দিকে আপনি চিনতে ভুল করেছেন।'

সে দ্রুত বেরিয়ে সশব্দে সাইকেলটা বারান্দা থেকে নামায়। তখন শোনে সুদীপন তাকে ডাকছে। কিন্তু অরিত্র একলাফে সাইকেলের সিটে বসে প্যাডেলে চাপ দেয়। সোজা এগিয়ে দেখে, সামনে গঙ্গা। ফরাক্কার ফিডারক্যানেলের জল এই এপ্রিলেও কূলেকূলে ভরা। পাড়ের শক্ত সাদা মাটিতে পৌঁছে বুকে বাতাসের চাপ নিয়ে সে সাইকেলের ওপর ঝুঁকে পড়ে। বমি করে উগরে দিতে ইচ্ছে করে যা খেয়েছে। রাগে দুঃখে তার চোখে জল উপচে ওঠে। এতদিন পরে সে বুঝতে পেরেছে, কেন ধরিত্রী চলে গিয়েছিল ফুলশেখরে।

হাসপাতালের কাছে ঘুরে আবার শহরে ঢোকে অরিত্র। ভিড়ের মধ্যে কিছুদূর জোরে এগিয়ে যায়। তারপর গতি কমায়। বাড়ি পৌঁছেই ধরিত্রীর সামনে গিয়ে বলবে, তোর বর একটা ছোটলোক বড়দি। তুই ঠিকই করেছিস।...

বিকেলে অরিত্রকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল সীমন্ত গাজনের মেলায়। তাদের বাড়ির পাশে যে পুকুর, তার দক্ষিণ পাড়ে অষ্টশিবের অষ্টমন্দির। একটা বাদে কোনটাই অটুট নেই। কোনরকমে জঙ্গুলে মাটিতে ভাঙচুর শরীরে টিকে আছে। শুধু বুড়োশিবের মন্দিরটাই আজ একটু চেকনাই দিচ্ছে। শিবচতুর্দশীতে এক পোঁচ চুন পড়েছিল আর এই দিনটা আরেক পোঁচ। তার নিচে একরতিনেক ন্যাড়া রুক্ষু চটান। মাঝখানে একটা নালা। বিপ্রশেখরের ছেলেরা ফুলশেখরের ছেলেদের ওপর রাগ করে এই নালা বুজিয়ে ফুটবল খেলে। কিন্তু বর্ষায় সারা চটান ডুবে যায়। তখন গ্রামপঞ্চায়েত মুনিশ লাগিয়ে নালাটা পরিষ্কার করে দেয়। সেই চটান জুড়ে আজ গাজনের ধুম। শীতের সময় আবার নালাটা বুজিয়ে দিয়েছে ক্লাবের ছেলেরা। মাতাল মানুষ সেখানে টলতে টলতে এসে হা হা করে হাসছে আর গানের সুরে বলছে—

'পা টলে টলে খালে পড়ে
এ তো ভারি মজার পা...

তারপর লাফ দিয়ে ডিঙোতে গিয়ে আছাড় খাচ্ছে। গাজনের মেলায় প্রতি বছর এও এক মজা। বেশির ভাগই নিচুতলার খাটিয়ে মানুষ। এই মজা করবে বলেই সকাল থেকে তৈরি হয়েছে। কতরকম সঙ সেজেছে ওরা। জড়ানো গলায় গান গাইছে। ওদিকে বুড়োশিবের মন্দিরের সামনে পাঁঠা বলি হচ্ছে। ঢাক বাজছে। ভক্ত সন্নেসীরা জয়ধ্বনি দিচ্ছে বারবার; 'শিব নামে পুণ্য করে বল শিবো বো-ও-ও-ল!' তারপর শুকনো ন্যাড়া মাটিতে হাতের বেত মারছে জোরে। জনার্দন কামার হাতে রক্তমাখা খাঁড়া নিয়ে রাঙা চোখে আকাশ দেখতে দেখতে বিড়ি টানছে। সীমন্তের কাকা প্রিয়নাথের পরনে হাঁটু অব্দি লালপেড়ে পট্টবস্ত্র, গলায় রুদ্রাক্ষ এবং পৈতে, কপালে রক্তের ফোঁটা—উঁচু বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন। পাশে সীমন্তের বোন রিন পা ঝুলিয়ে বসে আছে। এখনও সে ছোটবেলার মত পাঁঠার মুণ্ডু গোণে। কপালে রক্তের ফোঁটা পরে।

সীমন্ত উঁকি মেরে সরে আসে। ক্রমশ ভিড় বাড়ছে বিশাল চটান জুড়ে। আজ আকাশ পরিষ্কার। শহর থেকেও ফেরিওলা, চানাচুরওয়ালারা এসে জুটেছে। এলাকার গ্রামগুলো থেকে দলে দলে লোক

আসছে আর আসছে। ফুলশেখরের মানুষজন এবার একটু কম মনে হয় সীমন্তের। পরিচিত দু-একজনকে অরিত্রের কথা জিজ্ঞেস করে সে। তারা অরিত্রকে দেখেনি।

এমন দিনে অরিত্র কেন এল না বুঝতে পারে না সীমন্ত। অরিত্রের বিপ্রশেখরে কোন শত্রু নেই—ওর দিদির থাকতে পারে। ছোটবেলা থেকে এই গাজনের মেলার অনেক আনন্দের স্মৃতি আছে সীমন্ত ও অরিত্রের। সন্ধ্যার দিকে মেলা যখন জমে উঠেছে, দুজনে মধু বাউরির বাড়ি গিয়ে ভাঙের সরবত খেয়েছে। এই গাজনের পরব আসলে গ্রামসমাজের নিচুতলার মানুষের। সীমন্তের মতে, ভাঙ খেয়ে মেয়েদের সঙ্গে ফস্টিনস্টি না হলে জমে না। অরিত্র একটু ভিতু, একটু হিসেবি আর লাজুক ছেলে ছিল। সীমন্তের মত পেকে যায়নি অল্প বয়সে। সেও একটা মজা ছিল সীমন্তের। ওকে ঠাট্টা করে অশ্লীল কথা বলে উত্ত্যক্ত করে ছাড়ত। বড় হয়েও গাজনের দিনটা সীমন্ত ট্রাডিশন বজায় রাখে। অরিত্রের অবশ্য আর সে জড়তা নেই। স্মার্ট হয়ে উঠেছে। তাই মতু বাউরির মাতাল মেয়ে লক্ষ্মীকে তার ওপর লেলিয়ে দিলেও অরিত্র কুঁকড়ে সরে যায় না। লক্ষ্মী যদি জামা খামচে ধরে, অরিত্র বলে, 'আঃ! ছাড়! দিচ্ছি।' অন্তত একটা টাকা লক্ষ্মীকে না দিয়ে উদ্ধার নেই। তারপর রাত আটটার মধ্যে মেলা ভেঙে গেলে দুজনে চলে যায় ব্রিজের ধারে। খোলামেলায় বসে ভাঙের নেশা কাটিয়ে তুলতে চায় অরিত্র। সীমন্তের এ ভাবনা নেই।

বামুনবাড়ি আর কায়েতবাড়ি থেকে বুড়োশিবের ভোগ আসে সন্ধ্যার দিকে। তখন পুজো চরমে উঠেছে। পাঁঠাবলি শেষ। প্রিয়নাথ ঘণ্টা নেড়ে জোরাল গলায় মন্ত্র আওড়াচ্ছেন। একপাশে বাবুবাড়ির মেয়েরা দাঁড়িয়ে আছে, অন্যপাশে একটু তফাতে চাষাভুষো-ক্ষেতমজুরদের বউঝি। পুজো শেষ হলেই সন্ধ্যার অন্ধকারে মেয়েদের ভিড়ে অরিত্রকে টানতে টানতে ঢোকায় সীমন্ত। গ্রামের বাইরে বলে এদিকটায় বিদ্যুৎ নেই। অরিত্র জানে সীমন্ত মেয়েদের শরীরের স্বাদ লুটতে চায় এমনি করে। তার অস্বস্তি হয়। তবু সীমন্তের টানে সে ভেসে যায়। অন্ধকারে কোন-কোন মেয়ে রুষ্ট হয়ে চেঁচিয়ে ওঠে। কেউ বলে, 'ও দিদি! কোন মিনসে আমার গায়ে হাত দিয়েছে!' ভিড়ে মেয়েদের হাসির ঝড় বয়ে যায়। অরিত্র পালিয়ে বাঁচে। কতক্ষণ পরে সীমন্ত তাকে ডাকে। কাছে এসে বলে, 'তোকে নিয়ে মাইরি পারা যায় না! এত ভয় কিসের?'

বছরের পর বছর এইসব ঘটেছে গাজনের দিন দুজনের জীবনে। সীমন্তের মনের মত বন্ধু কেউ নেই বিপ্রশেখরে। ফুলশেখরের অরিত্রই তার সত্যিকার বন্ধু—মনের মত ছেলে। অরিত্র বি এসসি পাশ করতে পেরেছে, আর সে কলেজ ছেড়েছে দুবছরই। এতেও দুজনের কোন মানসিক তারতম্য ঘটেনি—অন্তত সীমন্তের তাই ধারণা। আসলে কার সঙ্গে কার মনের মিল হয়ে যায়।

সীমন্ত মেলার দিকে হতাশ চোখে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর হাঁটতে থাকল ব্রিজের দিকে শর্টকাট রাস্তায়। সূর্য মনোমোহিনী বিদ্যালয়ের পেছনে নেমে গেছে। সে ভাবছিল, নিশ্চয় অরিত্রের অসুখবিসুখ হয়েছে।

ব্রিজ পেরিয়ে ফুলশেখরের বাজার। বাজারে পৌঁছেই মানোয়ার দারোগার মুখোমুখি পড়ে যায় সীমন্ত। একটু বিব্রত বোধ করে। ভাসারাম ভাণ্ডারীর বাড়ি ডাকাতির পর থেকে পুলিশ বারবার তাকে উত্ত্যক্ত করছে। হলার দলের বাকি নামগুলো নাকি এখনও জানতে পারেনি। যে চারজন মার খেয়ে গুরুতর অবস্থায় হাসপাতালে আছে, তাদের মুখে চাবি আঁটা। পুলিশ সীমন্তের কাছে জানতে চাইছে, হলা তার ঘরে এসেছিল কেন সে রাতে? কলেজ জীবনে হলার সঙ্গে তো এখানকার আরও অনেক ছেলের ভাব ছিল। কিন্তু সে সীমন্তের ঘরে এল কেন? সীমন্ত বোঝাবার চেষ্টা করেছে, সে থাকে ওইরকম নিরিবিলি জায়গায়, তাই। পুলিশ তাতে যেন সন্তুষ্ট হয়নি।

গতকাল মানোয়ার দারোগা তাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। যায়নি সীমন্ত। এবার একটু জেদ ধরে রুখে দাঁড়াতে চায় সে। মণি তাকে আশ্বাসও দিয়েছে। কিন্তু এখন মানোয়ার দারোগার সামনে পড়ে সে একটু ভয় পায়। এত সব চেনা লোকের সামনে তাকে কি গালমন্দ করবে পুলিশ?

মানোয়ার সাইকেলের সিটি থেকে একপা নামিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। মিটিমিটি হেসে বলেন, 'এই যে সীমন্তবাবু!'

সীমন্ত হাসবার চেষ্টা করে। 'আপনার কাছেই তো যাচ্ছিলাম। ছিলেন না। এসে শুনেই...'

'চলুন, চা খাই।'

মানোয়ার দারোগা ছিপছিপে রোগা গড়নের মানুষ। বয়স পঁয়ত্রিশের বেশি নয়। পরিষ্কার করে কামানো মুখ। গায়ের রঙ দেখে সীমন্তের ধারণা, বড় ঘরের ছেলে। গলায় অন্তরঙ্গতার সুর শুনে একটু আশ্বস্ত হয় সীমন্ত। রাস্তার ধারে হরিসাধনের চায়ের দোকানের সামনে গিয়ে স্মার্ট হওয়ার চেষ্টা করে। মানোয়ার বলেন, 'হরি, চা দাও বাবুকে। আমাকেও একটা দেবে তো দাও।'

কাপপ্লেটে যত্ন করে চা দেয় হরিসাধন। বিনীতভাবে বলে, 'বসুন স্যার!'

'থাক।' মানোয়ার কয়েকপা সরে গিয়ে চুমুক দেন চায়ে; রাস্তার ওপর ঝুঁকে আসা বকুলগাছের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'এখানে আসুন সীমন্তবাবু! সিগারেট নিন!'

এবেলা বাজারে তত ভিড় নেই। গাজনের মেলায় গেছে লোকেরা। এদিকে-ওদিকে ছড়ানো দোকানপাট প্রায় খাঁ খাঁ করছে। সীমন্ত লক্ষ্য করে, তার দিকে অনেকগুলো চোখ। একটু তাচ্ছিল্য মনে এসে সে সিগারেট নেয় দারোগাসাহেবের কাছে। তারপর একটু হেসে বলে, 'কেন ডেকেছিলেন আলিদা?'

মানোয়ার হোসেন এ থানায় জনপ্রিয়। থিয়েটার, খেলাধুলো, ফাংশান সবেতেই ভদ্রলোকের উৎসাহ। গত পুজোয় থিয়েটারে প্রধান চরিত্র করেছিলেন। এসবের ফলে যুবকেরা তাঁকে আলিদা বলে ডাকে। সীমন্তের সঙ্গে তত একটা পরিচয় ছিল না। তবু সে হঠাৎ আলিদা সম্ভাষণ করে ভাবে, রাগ করল না তো?

মানোয়ার খুক খুক করে হেসে বলেন, 'কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না, আপনি ভয় পাচ্ছেন কেন?'

'কিসের ভয়?'

'আসুন।' বলে মানোয়ার তার সিগারেট ধরিয়ে দেন লাইটার জ্বেলে। অন্য হাতে কাপ-প্লেট। তারপর বলেন, 'আপনার পুলিশ প্রটেকশান চাই? বেশ তো পাবেন। আমি মানুষ চিনি সীমন্তবাবু। আপনি ভদ্রঘরের ছেলে। শিক্ষিত ছেলে। আপনার নামে থানায় কোন রেকর্ড নেই—নাথিং! প্রায় বছর দুয়েক হয়ে গেল এ থানায়। আমি জানি, কে কেমন মাল!'

সীমন্ত আস্তে বলে, 'আমি যা বলেছি, একটুও মিথ্যে নেই ওতে আলিদা। হলাকে হঠাৎ আমার ঘরে ঢুকতে দেখে আমি ভীষণ অবাক হয়েছিলাম। আমাকে...'

তাকে থামিয়ে মানোয়ার বলেন, 'এই এরিয়ায় হলার একটা ডেরা ছিল। জানেন তো?'

'ছিল নাকি?' সীমন্ত অবাক হয়ে বলে। 'আমি তো শুনিনি কিচ্ছু।'

'ছিল।'

'তাহলে সেখানে হানা দিলেই তো হলা ধরা পড়ত।'

মানোয়ার ডাকেন, 'হরি! কাপ নিয়ে যাও!' হরিসাধন দৌড়ে এসে কাপ-প্লেট নিয়ে যায়। সীমন্তের চা শেষ হয় নি। তাকিয়ে আছে দারোগাসাহেবের মুখের দিকে। মানোয়ার ভুরু কুঁচকে বলেন, 'আপনি কেন ওর গ্যাংয়ের বাকি লোকগুলোর নাম বলছেন না সীমন্তবাবু? আর কাকে ভয়?'

আর চা গলায় ঢোকে না সীমন্তের। বিব্রতমুখে বলে, 'আপনি বিশ্বাস করুন! তাছাড়া আমার সঙ্গে যদি হলার সম্পর্ক থাকবে, তাহলে কেন ওর কথা মণিদের কাছে বলে দিয়েছিলাম?'

'অনেক কারণ থাকতে পারে। গ্যাংয়ে দলাদলি থাকতে পারে। বখরা নিয়ে গ্রাজ থাকতে পারে ভেতর-ভেতর। জাস্ট কথার কথা বলছি।'

সীমন্ত নিচের দিকে তাকিয়ে বলে, 'আমার মাথার ওপর কেউ নেই তো—মণিদের মতে। তাই হয়ত এ জুলুম।'

চাপা গলায় মানোয়ার বলেন, 'জুলুম! হোয়াট ডু ইউ মিন? কোথায় জুলুম?'

'তাছাড়া আর কী?' সীমন্ত ঈষৎ ক্ষোভের সঙ্গে বলে, 'পুলিশ বলে, পিপল কো-অপারেট করছে না। অথচ আমি কো-অপারেট করতে গিয়েই দেখছি বিপদ হয়েছে। হলা ভাণ্ডারীর লুটেপুটে নিয়ে যেত—আবার আরেক বাড়ি হামলা করত। সেটাই বুঝি ঠিক হত?'

তার কাঁধে হাত রেখে মানোয়ার হাসতে হাসতে বলেন, 'না না। আপনি যা করেছেন, তাতে গভর্নমেন্টের আপনাকে পুরস্কার দেওয়া উচিত। মুশকিলটা কী জানেন? জব্বার—আপনি হয়ত চেনেন ওকে, কেয়াতলার জব্বার হাসপাতালে ডিলিরিয়ামের মধ্যে বারবার আপনার নাম বলছে।'

সীমন্ত ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকার পর বলে; 'তাহলে হলাকে যে দুজন ডাকতে এসেছিল আমার ঘর থেকে, তাদের একজন জব্বার। অন্ধকারে চিনতে পারিনি।'

পুলিশি ভঙ্গিতে জুতোর শব্দ করে মানোয়ার একটু ঘোরেন। তারপর বলেন, 'এখানে দাঁড়িয়ে কথা হয় না। আরও কথা আছে। চলুন।'

সীমন্ত অসহায় মানুষের মত বলে, 'থানায়?'

'সেখানেই তো যাচ্ছিলেন বললেন।'

সীমন্ত ভাঙা গলায় বলে, 'যাচ্ছিলাম তো।'

'আসুন।' মানোয়ার দারোগা সাইকেল ঠেলতে-ঠেলতে হাঁটেন। সীমন্ত পাশে-পাশে হাঁটে। তার গলার ভেতরটা শুকিয়ে যায়। পা দুটো টলমল করে। তবু সে শক্ত এবং স্মার্ট হয়ে থাকার চেষ্টা করে। যেন মানোয়ার দারোগার সঙ্গে তার এতক্ষণের কথাবার্তা এবং এই হেঁটে যাওয়াটা বন্ধুতামূলক। এমন করে হাসিমুখে কথা বলতে বলতে কত ছেলেই তো মানোয়ার দারোগার সঙ্গে হেঁটে যায়।

অরিত্রদের বাড়ির সামনে গিয়ে সীমন্ত একবার ওদিকটা দেখে নেয়। ভাঙাচোরা ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে আছেন অরিত্রের পিসিমা। একটা লোকের সঙ্গে কথা বলছেন। এক সেকেন্ডের জন্য সীমন্তের মনে হয়, ছুটে গিয়ে ওখানে ঢুকবে। পারে না।...

সামনে রোদ নিয়ে অরিত্র সাইকেল ঠেলে বাড়ি ফিরেছে। ভীষণ ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়েছিল। সংঘমিত্রা খেতে বলেছিলেন। অরিত্র বলেছিল, 'এক বন্ধুর বাড়ি খেয়ে এসেছি।'

গায়ত্রীর ডাকে সে লাল চোখে তাকাল। গায়ত্রী বলল, 'আমি একটু দুপুরে শুলেই যে বলিস শরীর খারাপ করবে, ঘুমোস নে। এখন নিজের বেলা?'

চা রেখে চলে গেল সে। অরিত্র উঠে বসল। সূর্য ডুবে গেছে। ঘরের ভেতর ছাইরঙা আলো। ফ্যান বন্ধ। কারেন্ট নেই। ভীষণ গরম লাগছে। শরীর ঘামে জবজব করছে। চায়ের কাপ নিয়ে সে বেরুল। চিলেকোঠার সিঁড়ি বেয়ে ছাদে চলে গেল। পায়রার বকবকম শোনা যাচ্ছে। ঠাকুরবাড়ির পেছনে তাদের গোয়ালঘরের বাছুরটা ডাকাডাকি করছে। তিলকের ছেলে নদীর ধারে চরাতে নিয়ে গেছে ওর মাকে। বলদজোড়া এখনও হয়ত মাঠে ধান মাড়াই করছে। চারদিক স্তব্ধ আর বিষণ্ন। ছাদের কার্নিশে হেলান দিয়ে চা খায় অরিত্র। পূর্বে নদীর ওপারে বিপ্রশেখরের বুড়োশিবের চটানে ঢাকের শব্দ, মেলার কোলাহল এলোমেলো বাতাসে টুকরো টুকরো হয়ে ভেসে আসছে। এ বছর গাজনের মেলা বাদ গেল অরিত্রের। এখন যাওয়ার মানে হয় না। যেতে যেতে অন্ধকার হয়ে যাবে।

হঠাৎ অরিত্রের মাথায় ভেসে এল সে-রাতের কথা। রাত এগারোটায় বড়দি এখানে একা দাঁড়িয়ে ছিল। ঘর খোলা ছিল এবং ঘরে নেই দেখেই ছাদে এসেছিল অরিত্র। হলার কথা বলেছিল। তারপর বড়দি কথাটা শুনে কেমন গলায় শুধু বলল, 'তুই যা তো এখন!'

কেন বলল? আর একটা কথাও জানতে চাইল না! কেন? তখন অরিত্র কিছুই বুঝতে পারে নি—ব্যাপারটা যে অস্বাভাবিক, তাও ধরা পড়েনি তার কাছে। এখন ভাবতে গিয়ে অবাক লাগছে তার।

পরদিন সকালে ধরিত্রীকে তার মনে হচ্ছিল যেন মৃত এক মানুষ। অরিত্র কতক্ষণ ধরে ঘটনাটা বলল, অথচ যেন শুনেও শুনছিল না ধরিত্রী। ঠাণ্ডা চোখে তাকিয়ে ছিল। আর অত আস্তে তো পা ফেলে না ধরিত্রী, অমন ভাঙা গলায় আস্তে করে কথা বলে না কোনদিন। জোরাল কণ্ঠস্বর ধরিত্রীর, একটুতেই মেজাজ চড়া হয়ে যায়, চঞ্চল হয়ে ঘোরে।

এখন মনে পড়ছে, একটা অদ্ভুত পরিবর্তন দেখেছিল বড়দির মধ্যে। বুঝতে পারেনি বা ধরতে পারেনি। বাড়ির অন্য কেউ কি পেরেছিল? তাহলে জানতে পারত অরিত্র। সবাই হয়ত ভেবেছিল, সুদীপনই তার ভাবান্তরের কারণ।

তারপর থেকে ধরিত্রীর আচরণ, কথাবার্তা—খুঁটিয়ে স্মরণ করার চেষ্টা করে অরিত্র। হ্যাঁ, বড়দি একেবারে বদলে গেছে। গ্রামপঞ্চায়েত আবার কিছু কিছু কাজ শুরু করেছে বটে, বড়দি গিয়ে তদারকও করছে—বেশির ভাগ সময় বাড়ির বাইরেই কাটাচ্ছে আগের মত—সবই ঠিক। কিন্তু আর সেই উদ্দীপনা নেই। কালই তিলক একগাল হেসে মিতুপিসিকে বলছিল, 'বাবুদিদি এবার নিজেদের জমিজমায় মন দিয়েছেন গো পিসিঠাকুরুন! বাঁচা গেল বাবা! একলা এ-মাঠ সে-মাঠ দৌড়াদৌড়ি করে মরছিলাম। এখন ওনাকে একখানে বসিয়ে অন্যখানে গিয়ে সোয়াস্তি পাই। তবে, বাবুদিদির শরীলেও যেন জুত নাই ইদানিং!'

অরিত্র বুঝতে পারে না, হলার সঙ্গে বড়দির সম্পর্ক থাকতে পারে—কীভাবে পারে? জামাইবাবু কি মিথ্যা বদনাম চাপিয়ে কোন মতলব আঁটছেন। ডিভোর্স করলে যে বড়দির জীবনটা নষ্ট হয়ে যাবে! সারাজীবন কি সে মাঠে-ঘাটে কাদা মেখে ঘুরে বেড়াবে চাষাভুষো লোকের সঙ্গে? এটাই কি কোন শিক্ষিত আত্মসচেতন মেয়ের কাম্য হতে পারে?

প্যান্টের পকেটে সিগারেট-দেশলাই নিয়েই শুয়ে পড়েছিল অরিত্র। পোশাক পর্যন্ত বদলায় নি। সিগারেটের প্যাকেট চেপ্টে গেছে। বের করে ধরায় সে। ছাদে সন্ধ্যার জোরাল হাওয়াটা এসেছে নদীর দিক থেকে। কী মিষ্টি একটা গন্ধ ভেসে আসছে। এতক্ষণ গাজনের মেলায় শেষ ধুম লেগেছে। সীমন্ত রাগ করবে।

বিপ্রশেখরে বিদ্যুৎ এল। ফুলশেখর এখনও অন্ধকার। দূরে গাছপালার ভেতর আলোর ফুটকি দুলছে যেন। অরিত্র সিগারেট টানতে টানতে নদীর দিকে তাকিয়ে থাকে। তিলকের ছেলে এতক্ষণে গরু এনেছে। গোয়ালঘরের দিক থেকে চেরা গলায় চেঁচাচ্ছে, 'ঠাকুরুনদি! আলো!' সংঘমিত্রা টর্চ জ্বেলে সাড়া দিলেন, 'যাচ্ছি। গলায় আলো ঢুকিয়ে দেব বাঁদরের। সন্ধেবেলা চ্যাঁচায় দেখ না!' ছেলেটা হি হি করে হাসছে।

হলা ঠাকুরবাড়িতে এসে লুকিয়ে থাকত। অসম্ভব! অরিত্র এ বাড়ির ছেলে হয়ে সেটা টের পাবে না? জামাইবাবু লোকটা সত্যি বড় মীনমাইন্ডেড। মুখে খালি বিরাট বিরাট সব কথাবার্তা!

সিঁড়ির দিক থেকে কেউ ডাকে, 'অরু! অরু!'

'কে?'

'আমি। ইস! কী অন্ধকার রে! শালা লোডশেডিং!' সীমন্ত ছাদে উঠেই যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। 'বাপস! তোর খোঁজে আসতে আসতে পড়েছিলাম মানোয়ার দারোগার পাল্লায়। থানায় নিয়ে গেল। আমি ভাবলাম, দেবে শালা এবার থার্ড ডিগ্রি একচোট।'

অরিত্র একটু হাসে। সীমন্তকে দেখে তার মনটা হালকা হয়েছে। বলে, 'দিলে না?'

'নাঃ! একটা মাথাখারাপ লোক মাইরি! দু-ঘণ্টা ধরে খালি নিজের লাইফহিসট্রি শুনিয়ে ছাড়ল। হ্যাঁ রে অরু, তুই কেয়াতলার জব্বারকে চিনিস?'

'তুই তো চিনিস। সেই পেটমোটা রোগা ছেলেটা। পেন্টুলের দড়ি খুলে যেত বারবার।'

'পরে দেখেছিস তাকে?'

'নাঃ। বেচু মাস্টারের আমলে সেই দেখেছি। তবে নামটা মনে আছে। কারণ ওর কতকগুলো পিকিউলার হ্যাবিট ছিল। স্কুলে...'

তাকে থামিয়ে সীমন্ত বলে, 'হলার গ্যাংয়ের আর যে-চারজন রামপ্যাঁদানি খেয়েছিল, জব্বার তার একজন। ব্যাটাচ্ছেলে নাকি আমার নাম ধরে ভুল বকছে। তাই আমি ঝামেলায় পড়ে গেছি।'

অরিত্রের এসব ব্যাপার এ-মুহূর্তে ভাল লাগে না। বলে, 'ও কিছু না। কাকাবাবুকে ধরিস। মিটে যাবে।'

'গণোকাকা এখনও ফেরেননি মনে হল।'

'ফিরবেন। বলে দেব—তুই তো আছিস।' অরিত্র তার কাঁধে হাত রেখে চাপা গলায় বলে, 'গাজনের মেলায় যাস নি? আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। বহরমপুর থেকে ফিরে ভীষণ টায়ার্ড। বল না, কেমন জমল?'

সীমন্ত হাসতে হাসতে বলে, 'তুমি শালা রুমাবউদির কথা জানতে চাইছ তো?'

অরিত্র ওর কাঁধে থাপ্পড় মারে।... 'ঠাকুরঘরে কে রে, আমি তো কলা খাইনি!' সে জোরে হেসে ওঠে। হাসতে পেরে তার মনের সবটুকু গ্লানি কেটে যায়। ফের বলে এসে ভাল করেছিস।'...

সাত

হইচই শুনে ধরিত্রী বেরিয়ে গিয়ে দেখল, ঝুড়িকোদাল নিয়ে একদঙ্গল লোক দাঁড়িয়ে আছে। গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য অখিল সামনে এসে বলল, 'মাটি কোপাতে দিল না ধরিদি! দিরেং কাঁড় বের করে শাসাল। ওর জমির মাটি নিতে দেবে না।'

সাঁওতালপাড়ার সঙ্গে সংযোগ ঘটাবার জন্য কুনাইপাড়ার চওড়া আলরাস্তায় মাটি ফেলার কথা ছিল। রাস্তার স্কিম গতমাসে স্যাংশান হয়েছে। ব্রজবন্ধু অঞ্চলপ্রধানের গদিতে বসেই উদার হয়ে উঠেছেন। ভেকু ভটচাযের ছেলে নন্দনও গ্রাম সভার সদস্য। তাদের বাড়ি বস্তাদশেক চাল আর গম মজুত। বিকেলবেলা মুনিশেরা একে একে এককিলো চাল আর দুকিলো গম নিয়ে যাবে।

ধরিত্রী একটু বিরক্ত হয়ে বলল, 'কেন দিরেং বাধা দিচ্ছে? ওর জমির মাটি নিলে ওরই তো উপকার হবে। ডাঙা জমি। মাটি তুলে নিলে বর্ষায় জল দাঁড়াবে। চাষের পক্ষে সুবিধে হবে। বুঝিয়ে বললে না ওকে?'

মুনিশগুলো চুপচাপ তাকিয়ে আছে ধরিত্রীর মুখের দিকে। প্রতিটি মুখে প্রত্যাশা জ্বলজ্বল করছে। অখিল বলল, 'কথা কানে নিলে তো? তাছাড়া রাস্তাটা হলে সাঁওতালডাঙারই লাভ। গাঁয়ের ভেতর দিয়ে চলাচলের কত সুবিধে। দিরেংয়ের এক কথা—আমাদের কী লাভ? আমাদের কি গাড়ি আছে? যত লাভ বাবুদের। মাঠে ধান আনতে যাবে এই রাস্তা দিয়ে। শুনুন কথা।'

অখিল দুঃখিত মুখে হাসতে লাগল। ধরিত্রী বলল, 'তাহলে আশেপাশে অন্যের জমি থেকে মাটি নিলেই তো হয়। কাজ বন্ধ করে চলে এলে কেন সব?'

মুনিশদের একজন বলল, 'আপনচোখে না দেখলে কিছু বুঝতে পারবেন না পঞ্চাতদিদি! বাঁদিকে খাল-জমি, ডাইনে দিরেংয়ের ডাঙাজমি। জমিটা লম্বালম্বি বলেই অসুবিধে। মাটি আনতে হলে অনেকটা দূর হয়ে যাবে।'

ধরিত্রী চটে গেল। 'দূর হল তো কী হল? বুঝেছি। কুঁড়েমি করে হাতের কাছে মাটি কোপানোর মতলব তোমাদের। একটু কষ্ট করতে চাও না সব।'

লোকটা চোখ নাচিয়ে হেসে অখিলকে বলল, 'পঞ্চাতদিদি বুঝতেই পারলেন না। বাবুদাদা, আপনি ওনাকে বুঝিয়ে দিন সমিস্যেটি।'

অখিল বলল, 'ব্যাপারটা হল, যা চাল-গম দিয়েছে, দূর থেকে মাটি আনলে তা দিয়ে রাস্তাটা কমপ্লিট হবে না ধরিদি! টাইম লস হবে। পাশে মাটি পেলে যে কাজ দুঘণ্টায় হত, তা চারঘণ্টা লেগে যাবে। রাস্তা ইনকমপ্লিট থেকে যাবে।'

ধরিত্রী গুম হয়ে শুনছিল। শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বলল, 'থাকে তো থাকবে। রাস্তার চেয়ে বড় কথা এখন ওদের কাজ দেওয়া।'

অখিল দোনামনা করে বলল, 'তা নিশ্চয় ঠিক। কিন্তু রাস্তাটা...'

কথা কেড়ে ধরিত্রী ঝাঁঝাল স্বরে বলল, 'যেটুকু ইনকমপ্লিট থকবে, সেটুকু নিজেদের স্বার্থে করে নেবে—যাদের ওমাঠে জমি আছে এবং ফসল আনতে গাড়ি যায়, তারাই।'

মুনিশেরা খুশিতে নেচে উঠল। তারপর অখিলকে একরকম তাড়া দিয়েই টানতে টানতে নিয়ে গেল। ধরিত্রী ভাঙা ফটকের কাছে এগিয়ে দেখল, ভিড়ের ভেতর অখিল রাগী পা ফেলে হাঁটছে। অখিল প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক। ওদের জোতজমা মোটামুটি ভালই। সাঁওতালডাঙার ওদিকে বেশির ভাগ জমি ওদের। তাই আজ স্কুল কামাই করে ওই রাস্তার কাজ তদারকের দায়িত্ব নিয়েছে কালকের মিটিঙে।

কিন্তু ধীরেন দিরেং সাঁওতালের আপত্তিটা সত্যি উদ্ভট। সবখানে লোকেরা নিজের জমির মাটি দিতে

আগ্রহ প্রকাশ করে। জমি যত খাল হবে, তত জল দাঁড়াবে এবং চাষবাসের সুবিধে হবে। দিরেং জমিটা পেয়েছিল সরকারের কাছে। সংস্কার করার ক্ষমতা ওর নেই। ফসল ততকিছু ফলাতে পারে না সে। এবার এই সুযোগে জমিটা চাষোপযোগী হত। অথচ সে বেঁকে বসেছে।

সাঁওতালডাঙার লোকের অবশ্য রাস্তা হওয়া নিয়ে মাথাব্যথা থাকার কথা না। ওদের জীবনে রাস্তা বলে আলাদা কিছু নেই। মাটিতে পা ফেলতে পারাই যথেষ্ট। তবু একবার মোহন সাঁওতালকে বলে দেখলে হত। মোহন সাঁওতালডাঙার মাতব্বর লোক। ভেকু ভটচাযের মাহিন্দার সে।

তারপরই ধরিত্রী অবাক হয়ে গেল, মুনিশগুলোর মধ্যে একজনও সাঁওতাল ছিল না! বাড়ির পাশে কাজ—অথচ ওরা ঝুড়িকোদাল নিয়ে বেরোয় নি, এটা খুব আশ্চর্য ব্যাপার। চণ্ডীতলার দিকের রাস্তায় মাটি ফেলার কাজে কদিন আগে ধরিত্রী সাঁওতালপাড়ার মেয়েমরদ সবাইকে দেখেছে।

তাহলে কি দিরেংয়ের এই আপত্তির পেছনে কারুর কোন চক্রান্ত আছে? মোহনকে হয়ত কি বুঝিয়েছে দিরেং। কিংবা মোহনেরই পেছনে অন্য কেউ আছে। সেই লোকটা ভেকুবাবু ছাড়া আর কে হতে পারে? ভেকুবাবু বরাবর ভেতরে-ভেতরে বিপ্রশেখরের ব্রজবন্ধুর সমর্থক।

এই একটা বছরে পঞ্চায়েত রাজনীতিতে ঢুকে ধরিত্রীর ভালবাসার গ্রাম বহুবার ঘৃণায় কালো হয়ে যায় কিছুক্ষণের জন্য। অস্থির হয়ে পড়ে সে। কোথাও চলে যেতে পারলে বেঁচে যেত মনে হয়। কিন্তু তারপর যখন নদীর ধারে অথবা মাঠে, কোন গাছের ছায়ায় গিয়ে দাঁড়ায়, সেই ঘৃণাটা আস্তে আস্তে মুছে যায় মন থেকে। এই বিশাল আকাশ, গাছপালা, শস্যের বিস্তীর্ণ মাঠ আর ওই নদীকে আগের মত বড় আপন মনে হয়। আবার আপন হয়ে ওঠে চারপাশের মানুষজন—চেনা সব মুখ, কত সুখদুঃখের স্মৃতির প্রতীক ওইসব মুখ। মাঠকুড়োনি ছেঁড়া নোংরা কাপড়পরা মেয়েটি যখন মাটির দিকে ঝুঁকে ক্ষেতের ফাটল থেকে যত্নে ও স্নেহে একটুকরো ফসলের শীষ কুড়িয়ে নেয় এবং ধরিত্রীকে দেখেই শান্ত হাসিতে তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, সে বলে—'বাবুদিদি, কোথা চললেন গো ইদিকবাগে', ধরিত্রীর বুক কী এক দুর্বোধ্য আবেগে ফুলে ওঠে। সে এদের মধ্যে জন্মেছে। এদের ভেতর বড় হয়েছে। এদের না দেখতে পেলে তার মন মানে না। চারটে বছর শহরে থাকার সময় ভেতর-ভেতর কী অস্থির হয়ে না সে কাটিয়েছিল। হুট করে চলে আসত ফুলশেখরে। যেমন-তেমন করে শাড়ি পরে ঘুরে বেড়াত যেখানে-সেখানে। নদীতে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে কতক্ষণ সাঁতার কাটত। এ নদীর জলের গন্ধ, তার স্বাদ কোথায় পাবে গঙ্গায়—হোক না গঙ্গা ত্রিলোকউদ্ধারকারিণী পাপবিনাশিনী।...

তিলক হন্তদন্ত আসছিল। সামনে এসে হাঁফাতে হাঁফাতে বলে, 'মেসিং বিগড়েছে বাবুদিদি! লবীনবাবুর মেশিনের স্বভাবই ওরকম। বললাম না কাল? ভাড়ার বেলায় তো ঘণ্টাগুনে পাইপয়সা মিলিয়ে নেবে।'

সাঁওতালডাঙার ওদিকে সেই আখের জমিতে সেচ দিচ্ছে তিলক। নবীনবাবুর পাম্পিং মেশিন ভাড়া করা হয়েছে। নবীনবাবুর 'কৃষিভাণ্ডারে' শুধু পাম্প নয়, পাওয়ারটিলার, হার্ভেস্টার কম্বাইন, স্প্রে সব কৃষিযন্ত্রপাতি ভাড়ায় পাওয়া যায়। ধরিত্রী বলে, 'মিস্তিরি পাঠিয়ে দিক—বল গে না নবীনদাকে।'

'বলেই তো আসছি গো!' তিলক একগাল হাসে। 'ভানুকে সঙ্গে করে নিয়ে যাব। কিন্তুক খানিক মোবিল কিনতে হবে। তাই দৌড়ে এলাম।'

'পিসিমা এখন ঠাকুরঘরে।' ধরিত্রী হ্যান্ডব্যাগ খুলে বলে, 'কত লাগবে, আমি দিচ্ছি। পরে পিসিমার কাছে চেয়ে নিয়ে আমাকে ফেরত দিবি কিন্তু!'...

তিলক চলে গেলে ধরিত্রী ছাতি খুলে আস্তে আস্তে হাঁটে। শহিদুল বা আরও অনেকের মত পাম্পিং মেশিন, পাওয়ারটিলার এসব কিনতে সাধ যায়। একজোড়া বলদ পোষার খরচ প্রচুর। কিন্তু পনের বিঘেয় ঠেকেছে চাষের জমিজমা। ধরিত্রী না এসে পড়লে গণমিত্র নির্বিচারে আরও জমি বেচে ফেলতেন। ডাক্তার অনমিত্র সিংহের আমলেও দুভাইয়ের মধ্যে সম্পত্তি বণ্টনের প্রশ্ন ওঠেনি। পরেও ওঠেনি। সংঘমিত্রা নতুন আইনে পৈতৃক সম্পত্তির এক শরিক। কিন্তু এসব ব্যাপারে বোঝেন না বিশেষ। গণমিত্র জমি বিক্রির দলিলে বোনের সই নিয়েছেন। ধরিত্রী পাঁচ বছর আগেও এত কিছু বুঝত না। নাবালক ভাইবোনদের গার্জেন হয়ে সেও কাকাবাবুর কথায় সই করে দিত। তারপর সতর্ক হয়ে ওঠে।

গণমিত্রও বেগতিক দেখে সংযত হন। তবে তাই নিয়ে সংসারে এ পর্যন্ত কোন মনোমালিন্য ঘটেনি। সংসার খরচের টাকাকড়ির দায়িত্ব সংঘমিত্রার হাতে। হিসেব করে খরচ করেন। ফুরিয়ে গেলে গণমিত্রকে বলেন। গণমিত্র হাসতে হাসতে বলেন, 'এই মরেছে! আমি কি তোমাদের কোষাগার নাকি? ওই যে দেখছ, মূর্তিমতি কোষাগার। ও ধরি, মিতু কী বলছে শুনে যা।'

সংসারের টাকাকড়ি আসে ধান বেচে। কখনও পাট, কখনও রবিখন্দ বা আখের গুড়। ফুলশেখরের মাটি বড় উর্বর। তাছাড়া আজকাল নতুন পদ্ধতিতে ফসল ফলছে প্রায় দ্বিগুণ। আগের আমল হলে সংসারটা উচ্ছন্নে যেত।

অঞ্চল অফিসে যাবে বলে ধরিত্রী বাজারের রাস্তা ধরেছিল। ব্রজবন্ধু মামলা জিতে গদিতে বসার পর অবিশ্বাস্য নরম হয়েছেন। মুখে মধুর হাসি লেগেই আছে। আগের মত বাঁকা কথাবার্তা নেই। ধরিত্রী দোনামনা করে শেষপর্যন্ত ব্রজবন্ধুর মুখোমুখি হয়েছিল। ব্রজবন্ধু একশ মা ডাক ডেকে ধরিত্রীকে নুইয়ে দিয়েছিলেন। তবু ধরিত্রীর মনে হয়েছে, সবটাই ওঁর অভিনয়। ফুলশেখর গ্রামপঞ্চায়েতে নিজের দলের লোক ঢুকিয়ে কুক্ষিগত করার সুযোগ এলে ছাড়বেন না ব্রজবন্ধু।

অঞ্চল অফিসের সামনে জিপ দাঁড়িয়ে আছে। প্রাঙ্গণে ভিড় জমিয়েছে এলাকার অনেক লোক। বি ডি ও এসেছেন হয়ত। ধরিত্রী ওদিকে যায় না। সোজা হাঁটতে থাকে। আঞ্চলিক পাঠাগারের বারান্দায় গণমিত্রকে ঘিরে একদল যুবক হইচই করছে। গণমিত্রের কাঁধের ব্যাগে সদ্যপ্রকাশিত 'গ্রামবার্তা'।

বাজার ছাড়িয়ে ব্রিজের কাছে বটতলায় একটু দাঁড়ায় ধরিত্রী। কোথায় যাবে ভেবে পায় না। অথচ তাকে কোথাও না কোথাও যেতেই হবে—যেতে হয় প্রতিদিন। বাড়িতে বসে থাকতে ইচ্ছে করে না। নদীর ধারে পাটের জমিটা দেখে আসবে নাকি?

অরিত্র সাইকেলে বেরিয়েছিল। বটতলায় ধরিত্রীকে দেখে থামল। ধরিত্রী চোখ পাকিয়ে বলে, 'আবার বিপ্রশেখরে আড্ডা দিতে শুরু করেছিস নাকি রে?'

অরিত্র হাসে। 'কেন? আমাকে ওরা মারবে নাকি?'

ধরিত্রী তাই শুনে হেসে ফেলে। 'বাঁদর বলি কি সাধে? কাজ নেই, শুধু দুপুর অব্দি আড্ডা। ওখানে কোথায় যাস শুনি?'

'সে আছে। তোর শুনে কাজ নেই।'

'নিশ্চয় সীমন্তদের বাড়ি। সীমন্তের আনাগোনা দেখেই বুঝেছি।'

অরিত্র সাইকেলের চেনের দিকে ঝুঁকে তাকিয়ে বলে, 'সীমন্ত খারাপ ছেলে নয়।'

ধরিত্রী হঠাৎ গলার স্বর বদলে আস্তে বলে, 'ও ডেঞ্জারাস। শুনেছি, ভাণ্ডারীর বাড়ি ডাকাতির ব্যাপারে পুলিশ ওকেও সন্দেহ করেছে। তুই ওর সঙ্গে মিশিস নে।'

অরিত্র গ্রাহ্য করে না। আগের মত হেসে বলে, 'বড়দি, আমাকে একটা স্কুটার কিনে দিবি?'

'চাকরি করে কিনিস।'

'চাকরি দেখাচ্ছিস? চাকরি না করে কেউ স্কুটার চাপে না বুঝি?' বলে অরিত্র প্যাডেলে জোর চাপ দিয়ে এগিয়ে যায়। তার পাশ দিয়ে প্রচণ্ড বেগে একটা খালি ট্রাক এসে বাঁকের মুখে অকারণ হর্ন বাজাতে বাজাতে চলে যায়। ধরিত্রী আঁতকে উঠেছিল। তারপর দেখে, অরিত্র ওপারে ব্রিজের ঢালুতে দুহাত হ্যান্ডেল থেকে তুলে তীব্রবেগে নেমে যাচ্ছে। অরিত্রর জন্য আজকাল কেমন ভয় হয় ধরিত্রীর।

পাটক্ষেতেও যায় না সে। ডাইনে বাঁধে নামে এবং বাঁধের ওপর দিয়ে সোজা হাঁটতে থাকে। অরিত্রের তৈরি ঘাটের কাছে একবার দাঁড়ায়। তারপর হাঁটতে হাঁটতে হৈদরের খালের ধারে পৌঁছয়। কদিন আগে খালের ওপর একটা গাছের গুঁড়ি ফেলার ব্যবস্থা করেছে। তার ওপর ব্যালান্স রেখে খাল পেরোয় সে। তারপর সোজা সাঁওতালডাঙায়।

বাঁশবনের আড়ালে হল্লা করে মুনিশরা মাটি ফেলছে। ধরিত্রী সাঁওতালডাঙায় ঢুকে দিরেংয়ের বাড়ির সামনে যায়। উঠোনে দিরেংয়ের মা শুকুতে দেওয়া ধান নেড়ে দিচ্ছিল। ধরিত্রীকে দেখে মাছের চোখে তাকায়। ধরিত্রী বলে, 'দিরেং কোথায়?'

বুড়ি হাতের তালু চিতিয়ে একটা ভঙ্গি করে। জানে না।

ধরিত্রী তাদের আখের জমির দিকে চলতে থাকে। নিচু টিবিতে উঠে দেখে, তিলক দাঁড়িয়ে আছে মেশিনের পাশে। ভানুমিস্তিরি মেশিন সারাচ্ছে। খালের হলুদ জলে পাইপ ডুবে রয়েছে। টিবি থেকে নেমে নদীর পাড়ে ঘাসেঢাকা একটুকরো জমির ওপর অশত্থতলায় দাঁড়ায় ধরিত্রী। তারপর দেখতে পায়, নদীর মাঝখানে যে বাঁধ দিয়ে জল আটকানো হয়েছে, সেই বাঁধের ওপর দাঁড়িয়ে জলে ঢিল ছুঁড়ছে বিশ্ববন্ধু। আজ তার পরনে মোটামুটি পরিষ্কার প্যান্ট আর নীলরঙের গেঞ্জি।

কিন্তু ওই বাঁধের ওপর দিয়ে হাঁটাচলা বারণ। দুই মাথায় কাঁটার বেড়া দেওয়া হয়েছে। পায়ের চাপে বাঁধ ধসে যাবে বলে দুইপারের লোক এই নিষেধাজ্ঞা মেনে চলে। ধরিত্রী দেখল ওপারের কাঁটার বেড়াটা সরিয়ে বিশ্ববন্ধু বাঁধে এসেছে। ইচ্ছে করলে নিচের প্রায় শুকনো নদীর বালির চড়া দিয়ে এপারে আসতে পারত। সবাই এভাবেই যাতায়াত করে। নদীগর্ভে বালির চড়ার ওপর সুন্দর একটা পায়ে চলা পথ ফুটে উঠেছে।

বিশ্ববন্ধু এদিকে ঘুরে তাকে দেখতে পায় এবং চেঁচিয়ে ওঠে, 'এই শালা!' তারপর হো হো করে হাসে।

ধরিত্রী একটু নিচে নেমে গিয়ে বাঁধের কাঁটাবেড়ার এপার থেকে বলে, 'তুমি কিন্তু লোকের হাতে মার খাবে, বিশুদা! কেউ লক্ষ্য করে নি তাই।'

বিশ্ববন্ধু এগিয়ে আসছিল। তার পায়ের চাপে বাঁধের ঝুরঝুরে মাটি গড়িয়ে পড়ে জলে। সে বলে, 'কেন? মারবে কেন খামকা?'

'তোমাকে কেউ বলেনি এ বাঁধে ওঠা মানা?' ধরিত্রী কড়া মুখে বলে। 'যাও! ওদিকের কাঁটাটা আটকে দিয়ে ওপাশে নেমে এদিকে এস। শিগগির!'

'কেন বল তো?'

'ন্যাকামি কর না! বাঁধ ধসে যাবে।'

পায়ের কাছে বাঁধে লাথি মেরে জোর পরখ করে বিশ্ববন্ধু। ধরিত্রী আঁতকে উঠে বলে, 'এই! করছ কী? ধসে গেলে সর্বনাশ হবে। যাও বলছি!'

বিশ্ববন্ধু হাসতে হাসতে বলে, 'এত কাছে এসে আবার দূরে সরে যাব? শালা ধরিটা বড্ড জ্বালায়!'

সেইসময় একটু দূরে নদীর পাড়ে তরমুজের ক্ষেত থেকে একটা লোক বাজখাঁই চেঁচিয়ে ওঠে, 'হেই বাবুমশাই! উ কী হচ্ছে? নেমে যান শিগগির!'

'এই রে!' বলে বিশ্ববন্ধু হন্তদন্ত ওপারে চলে যায়। কাঁটার ঝুপড়িটা সাবধানে টেনে আগের মত আটকে দেয়। তারপর নদীর শুকনো দিকে বালির ওপর হেঁটে এপারে আসে।

ধরিত্রী বলে, 'হঠাৎ নিপাত্তা হয়েছ দেখে ভাবলাম টাকাকড়ি আদায় করে ফিরে গেছ নিজের জায়গায়।'

'কোথায় আমার জায়গা ধরি? তুমি মাইরি আমাকে বিশ্বাস করতে পার না কোনদিন।'

'আহা! তোমার সুন্দরী বউকে যেখানে রেখেছ—বলছিলে না? সেখানে।'

বিশ্ববন্ধু পা বাড়িয়ে বলে, 'তুমি এখনও নাবালিকা, ধরি! চল, কোথাও বসি।'

'আমার কাজ আছে না?'

'ও। সেই আখের জমি?'

'হ্যাঁ। সেচ দিচ্ছি।'

'উঁ?' চোখ নাচিয়ে বিশ্ববন্ধু বলে, 'কী স্বার্থপর হয়েছ তুমি ধরি! আখের রস খুব মিষ্টি—অতএব সেচ দিচ্ছ আখের জমিতে। আমাদের মত শুকনো জমিতে কে সেচ দেয়—আখের মত মিষ্টি নই। তেঁতো—কালকাসুন্দে!'

'সকালেই তাড়ি গিলেছ দেখছি।'

'পাচ্ছি কোথায়? মুখ শুঁকে দেখ।'

বিশ্ববন্ধু মুখ নিয়ে এগিয়ে এলে ধরিত্রী দ্রুত সরে বলে, 'অসভ্যতা কর না। যেখানে যাবে যাও।'

'যাব কোন চুলোয় আর? মোল্লার দৌড় মসজিদ। আমার দৌড় সাঁওতালপাড়ার দিরেং অব্দি।'

'তাই যাও।'

বিশ্ববন্ধু অশ্বত্থের ছায়ায় ঘাসে বসে পড়ে। 'যাব'খন। হোল ডে পড়ে আছে। ওপারে বাউরিপাড়ায় মতুশালার বাড়ি গেলাম। ও নেই। ওর বউ পর্যন্ত নেই। ওর সেই নচ্ছার মেয়েটা বসে চুলে চিরুনি টানছে। আমাকে দেখে কেমন হাসল—তোমার দিব্যি! আমি কি ছোটলোক, না লম্পট? বলে, দুটো টাকা দাও না ছোটবাবু। আমি বললাম, আমায় দে না দুটো টাকা। না হয় একটাই দে।'

খিকখিক করে হেসে পা টানটান করে প্যান্টের পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বার করে বিশ্ববন্ধু। ফের বলে, 'বস না ধরি। আমার পাশে বসলে তোমার বদনাম হবে না। আমাকে সবাই জানে 'মাতাল—কিন্তু ব্যাড ক্যারেক্টার নয়। নেভার! তুমি শান্তিতে বস—স্বচ্ছন্দে। কারণ তুমিও ব্যাড ক্যারেক্টার নও।'

ধরিত্রী ভাবছিল, সে কি বিশ্ববন্ধুর পাল্লায় পড়বে বলেই অত ঘোরাঘুরি করে বেড়াল—শেষপর্যন্ত এইটাই যেন নিয়তি?

বিশ্ববন্ধু ঘাসে থাপ্পড় মেরে স্থাননির্দেশ করে। 'এইখানে বস। খুব পরিষ্কার জায়গা। কাল সন্ধ্যাবলা তোমার কথা হচ্ছিল দাদার সঙ্গে। দাদা বলল, ধরি দারুণ ইনটেলিজেন্ট মেয়ে। ওর মত অর্গানাইজার দেশে একটাও নেই। শুধু মুসলমানপাড়ার ওই ছোকরা ওর মধ্যে কূটবুদ্ধি ইনজেক্ট করে...' বিশ্ববন্ধু হঠাৎ থেমে ধরিত্রীর দিকে মুখ তোলে। 'ছোকরাটি কে?'

ধরিত্রী কান করে শুনছিল। শক্ত হয়ে বলে, 'তোমার দাদাকে বোলো, শহিদুলের ইনজেক্ট করার দরকার হয়নি। ধরিত্রী কূটবুদ্ধি সঙ্গে নিয়েই জন্মেছে।'

'উরি বাস! মহিলাচাণক্য!' বিশ্ববন্ধু ফের ঘাসে চাপড় মারে। 'এই! বস না!'

'আর কী বললেন তোমার দাদা?'

জিভ কেটে নিজের দুকানের ডগা ধরে বিশ্ববন্ধু মাথা দোলায়। 'উঁহু! কথা পাচার করার অভ্যাস নেই। তবে দাদা তোমার নিন্দা করেনি। প্রশংসাই করছিল।'

আড়ালে কে কী বলছে গ্রাহ্য করা স্বভাব নয় ধরিত্রীর। কিন্তু কিছুদিন থেকে তার যেন মনে হচ্ছে, আড়ালে তার বিরুদ্ধে সারাক্ষণ চক্রান্ত চলেছে। তার চলাফেরার দিকে যেন কেউ বা কারা লক্ষ্য রেখেছে। আর ধরিত্রীর এও এক স্বভাব, যে বনে বাঘ আছে বলে সন্দেহ, সেই বনে সে না ঢুকে ছাড়বে না—তদন্ত করে দেখতে চাইবে তার সত্যমিথ্যা।

'প্রশংসা করার মত কিছু কি আছে আমার?' ধরিত্রী একটু হেসে বলে, 'আশা করি একদিনে তুমি আমার সম্পর্কে অনেককিছু শুনেছ।'

ধরিত্রী এবার ঘাসের ওপর বসে পড়ে। বিশ্ববন্ধু বলে, 'হুঁউ। শুনেছি। আচ্ছা, তুমি ভাষণ দিতে পার তো?'

'তার মানে?'

'আহা! ভাষণ—মানে স্পিচ। জনসভায় বক্তৃতা।'

'নাঃ! একেবারে পারি নে।'

'তাহলে সোজা বহরমপুরে সেই অধ্যাপক ভদ্রলোকের ঘরকন্না কর গে! কিস্যু হবে না।'

ধরিত্রী রুষ্ট হয়ে বলে, 'মাতলামি কর না তো বিশুদা।'

বিশ্ববন্ধু দুহাত পেছনে ঘাসে রেখে মুখ চিতিয়ে বলে, 'মাতলামি নয়। ঠিক কথাই বলছি। বক্তৃতা দিতে পার না বলছ, আবার দেশসেবা করছ, এ যে সোনার পাথরবাটি বাবা! তাই তুমি নিদেনপক্ষে এম এল এ হতেও পারবে না। কিস্যু হবে না আখেরে। ধরি, পথে এস।'

ধরিত্রী ঘাস ছিঁড়ে নিয়ে দাঁতে কাটতে কাটতে বলে, 'তোমার দাদার মত আমার কোন অ্যাম্‌বিশন নেই।'

বিশ্ববন্ধু সোজা হয়ে বসে। 'নেই, তাহলে এসব করে বেড়াচ্ছ কেন?'

'তুমিই বা এসব করে বেড়াচ্ছ কেন সারাজীবন?'

বিশ্ববন্ধু একটু হেসে মাথায় আঙুল ঠুকে বলে, 'ভেতরে একটা কী আছে সম্ভবত।'

'আমারও।'

'তোমার সঙ্গে তক্ক করে কোনদিন পারিনি। এ বয়সে কি আর পারব।' বিশ্ববন্ধু হাসতে হাসতে সিগারেটটা চোঁ চোঁ টানে পুড়িয়ে নদীর দিকে ছুঁড়ে ফেলে। 'তবে কী,জান ধরি, সেটাই হয়েছে তোমার প্রব্লেম। হুঁ, আমারও। কারণ, তুমি আটকে গেছ তোমার গ্রামে, আমি আটকে গেছি মাদকদ্রব্যে। এর বাইরে আমরা কিছু দেখতে পাচ্ছিনে—না তুমি, না আমি। একটা লিমিটেশানের মধ্যে বাঁই বাঁই করে পাক খাচ্ছি। তোমারও কিস্যু হবে না, আমারও কিস্যু হবে না।' বিশ্ববন্ধু বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ফের বলে, 'ঘণ্টাটি হবে শেষ পর্যন্ত।'

বিশ্ববন্ধু গুম হয়ে বসে থাকে কথাগুলো বলার পর। ধরিত্রীও কথা বলে না। এতক্ষণে দক্ষিণের মাঠে নিচের দিকে পাম্পিং মেশিনের আওয়াজ ওঠে। ভানুমিস্তিরি মেশিন চালু করে দিয়েছে।

কতক্ষণ পরে বিশ্ববন্ধু বলে, 'ধরি!'

'উঁ?'

'তুমি তো ভীষণ ইনটেলিজেন্ট। বিষয়ীও বলা যায়। কারণ তুমি জমিতে আখচাষ করেছ। তুমি...'

ওর কথার ভঙ্গিতে ধরিত্রী হেসে ফেলে। 'আসল কথাটা বল!'

'দাদা বলছে তুমি বিজনেস কর। সার বীজ-ফিজ এসব জিনিসের ডিলারশিপ পাইয়ে দিচ্ছি। হুঁ—বুঝলে তো? দাদার বাপ আমার বাপ যেহেতু একই ব্যক্তি ছিল বা ছিলেন। রাজি হয়ে যাই, কী বল?'

'ভালই তো।'

'কিন্তু দাদার শর্ত যে ভারি অদ্ভুত। মদ-টদ ছাড়তে হবে।'

'ছাড়বে।'

'ভ্যাট! যারা বিজনেস করে, তারা বুঝি কেউ মদ-টদ খায় না? ইমপসিবল!'

'বিজনেস আগে শুরু কর, তারপর খাবে।'

বিশ্ববন্ধু চোখ নাচিয়ে চাপাগলায় বলে, 'ঠিক বলেছ। দিনকতক একদম কিস্যু খাব না। দাদা ভাববে পথে এসেছি। তখন কারবার ফেঁদে আমাকে বসিয়ে দেবে। অমনি মালপত্তর রাতারাতি বেচে দে শালা হাওয়া! সোজা আঙুলে তো ঘি ওঠে না!'

ষড়যন্ত্রের ভঙ্গিতে বিশ্ববন্ধু কথাগুলো বলে ফিকফিক করে হাসল। ধরিত্রী বাঁকামুখে বলে, 'জমিজমার তুমিও তো শরিক। নিজের শেয়ার বেচে তাড়িমদের নদী বইয়ে দিতে পার!'

'পারি। ভেতর-ভেতর সে চেষ্টাও কি করছি না? ভাণ্ডারীকে বললাম তো ব্যাটা ঘোঁত ঘোঁত করে বলে কী, এজমালি সম্পত্তি। আগে বণ্টন করিয়ে নিতে হবে। সেজন্য নাকি মামলা করতে হবে।'

'মামলা করতে হবে কেন?'

'জে এল আর ও আপিসের রেকর্ডে দাদা নিজের নাম লিখিয়ে রেখেছে যে। আমি ছিলাম না তখন।' বিশ্ববন্ধু দুঃখিত মুখে বলে, 'সেটলমেন্ট রিচেকিং না কী হয়েছিল—কে জানে ছাই? ওসব আমি কি বুঝি? ভাণ্ডারী সব বুঝিয়ে দিল। আমি মাইরি হতবাক হয়ে গেছি শুনে। শালা বেজাটা নাকি আমার দাদা? একই বাপের ব্লাড। উঃ ধরি, তুমি যে গ্রাম-গ্রাম কর, গ্রামে কী সাংঘাতিক [illegible] রাজত্ব ভাবা যায় না!'

ধরিত্রী অবাক হয়ে শুনছিল। বলে, 'শহরেও কেউ ধোয়া তুলসীপাতা নয়। প্রসেস হয়ত আলাদা। আচ্ছা বিশুদা, রাখুজ্যাঠা কোন উইল-টুইল করে যাননি খোঁজ নিয়েছ?'

'আমার বাবা ছিল একটি বানচো...' জিভ কেটে বিশ্ববন্ধু বলে, 'মা স্বর্গের দোরে দাঁড়িয়ে এখুনি বিশে বলে চেঁচিয়ে উঠবে। অতএব থাক গে। তুমি আমায় বুদ্ধি দাও।'

'তুমি জে এল আর ওর সঙ্গে গিয়ে দেখা কর।'

'ধুস! আমি কিছু চিনি-টিনি না।' হতাশ মুখ করে বিশ্ববন্ধু বলে, 'তাছাড়া দাদা টের পেলে আমার এখানে থাকাই কঠিন হবে। গ্রামসুদ্ধু ওর সাপোর্টার। তার ওপর দাদার পার্টি—ওরে বাবা। সে এক সাংঘাতিক জিনিস!'

ধরিত্রী ক্ষুব্ধস্বরে বলে, 'কিন্তু এ তো ভীষণ অন্যায়! একই বাবার ছেলে হয়ে তুমি প্রপার্টি থেকে বঞ্চিত হবে এ কেমন কথা?'

'কী করব, সেই তো জিজ্ঞেস করছি।'

'বলছি তো জে এল আর ও-কে সব বুঝিয়ে বল।'

'ধুস! আমার সঙ্গে চেনাজানা নেই। তাছাড়া অফিসার সার্কেলে দাদার প্রচণ্ড ইনফ্লুয়েন্স না?'

'আমি তোমাকে অভিজ্ঞ লোক দেব। এসব আইনকানুনে সে এক্সপার্ট।'

'দাদা টের পাবেই এবং আমার অবস্থা শোচনীয় হবে।'

ধরিত্রী ঝোঁকের বশে ওর হাত ধরে টানে। 'তুমি এখুনি এস আমার সঙ্গে। আহা, এসই না। তোমাকে ভাল পরামর্শ দেবার মত লোক আছে। কক্ষনো এ অন্যায় তুমি মেনে নিও না বিশুদা। সূর্য এখনও পশ্চিমে উঠছে না। মগের মুলুক নাকি?'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও বিশ্ববন্ধু উঠে দাঁড়ায়। ধরিত্রী শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বলে ফের, 'যদি তুমি সম্পত্তি ফিরে পাও, হয়ত নেশাভাং করেই উড়িয়ে দেবে—জানি। তবুও তো অন্যায়। দেখ বিশুদা, আমি সব সইতে পারি—অন্যায় দেখলে আমার মাথায় আগুন ধরে যায়।'

বিশ্ববন্ধুর সকালের নেশাটা কেটে গেছে। তবু একটু টলতে টলতে ধরিত্রীর পাশে হেঁটে যায়। মুখটা নিচু। ধরিত্রী বলতে থাকে, 'টের পেয়ে দাদা যদি তোমাকে তাড়িয়ে দেয়, সোজা ফুলশেখরে চলে আসবে। তোমার থাকার জায়গার অভাব হবে না। তবে শুধু একটা রিকোয়েস্ট বিশুদা, বাড়িতে মাতলামি চলবে না। বাইরে খেয়ে বাইরে যা খুশি কর। আর আমি তোমাকে জায়গা দিয়েছি বলে যদি কেলেঙ্কারি ওঠে, উঠবে। এসব ভয় আমার নেই। সাধারণ মানুষ আমাকে চেনে—তারা আমাকে ফেলে দেবে না কোনদিন।'

একটু পরে সে টের পায়, হারানো আত্মবিশ্বাসকে আবার যেন খুব কাছে দেখতে পাচ্ছে সে। মুখ উঁচু করে জোরে শ্বাস নেয় ধরিত্রী।

আলপথের ওপর মাটি পড়ছে। গাছের ডাল কেটে খালজমির দিকটায় বেড়ামত করেছে মুনিশরা। অখিল কাঁড়ুলে গাছে হেলান দিয়ে সিগারেট টানছে। ঘামেভেজা শরীর, শীর্ণ ক্লান্ত একদল মানুষ কুঁজো হয়ে দূরের জমি থেকে ঝুড়িবোঝাই করে মাটি আনছে। কিন্তু মেয়েও আছে তাদের দলে। ধরিত্রীকে দেখে সেই দীর্ঘ মনুষ্যরেখা চঞ্চল হয়ে ওঠে। অখিল হাসিমুখে বলে, 'এবেলা থ্রিফোর্থ হয়ে যাবে মনে হচ্ছে ধরিদি!' তারপর বিশ্ববন্ধুর দিকে তাকিয়ে একটু অবাক হয়। 'আরে বিশুদা যে! কেমন আছেন?' বিশ্ববন্ধু শুধু মাথাটা দোলায়।

পাশে উঁচু ডাঙা জমির শেষপ্রান্তে একটা প্রকাণ্ড শ্যাওড়াগাছ। ধরিত্রী দেখল, ছায়ায় পা ছড়িয়ে বসে আছে ধীরেন—দিরেং সাঁওতাল। মুখ নিচু করে কী একটা করছে। একটু তফাতে বসে চুটি টানছে মোহন, আরও কজন।

বিশ্ববন্ধু দিরেংকে দেখে চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিল, ধরিত্রীর চোখে চোখ পড়ায় কাঁচুমাচু হাসে। আস্তে বলে, 'হুঁ—এখন সিরিয়াস সিচুয়েশান।'

ধরিত্রী ভাবছিল, দিরেংকে ডাকবে নাকি। ডাকল না। বেশ তো মাটি আনছে ওপাশের জমি থেকে। মুসলমানপাড়ার এরাদত নিমগাছের ডাল কেটে গোঁজ বানাচ্ছিল, বলল, 'মা জননী! জনসাধারণের কাজ। তাই এই দেখুন, আমি একখানা নিমগাছ দিলাম। কী গো অখিলবাবু, সেটা তো বলছ না মা জননীকে!'

অখিল হাসতে হাসতে বলে, 'বুড়ো! তোমার ও সাত বিঘে জমি। ভারি তো একটা গাছ দিয়েছ। আর কেউ বুঝি দেবে না?'

জনাকতক মুনিশ গোঁজগুলো দুরমুসে ঠুকে পুঁতে দিচ্ছিল। কেউ পাতাসুদ্ধু ডালপালা আটকে দিচ্ছিল গোঁজের ভেতর। ঝুড়ি থেকে মাটি পড়ে আটকে যাচ্ছে। ধরিত্রী বলে, 'বাঃ! অখিল, তোমার বুদ্ধি তো চমৎকার! আমার কিন্তু এটা মাথায় আসেনি!'

অখিল কাছে এসে চাপা গলায় বলে, 'কিন্তু এ কাজের জন্যে কীভাবে লেখাব বলুন তো ধরিদি?

মাটি কাটার মাপ অনুযায়ী লিখতে গেলে তো হিসেব মিলবে না। বাড়তি মজুরিবাবদ গমচাল খরচ হবে। স্কিমে তো গাছের ডাল কাটা বা পোঁতার ব্যাপারটা নেই?'

ধরিত্রী একটু ভেবে বলে, 'যেভাবে হোক, ম্যানেজ করে নিও।'

অখিল শুকনো হাসি হাসে। 'ম্যানেজ করলেই তো বলবে করাপশান! মনে নেই ধরিদি, পশ্চিম মাঠের রাস্তায় সেই কালভার্টে ঘাসের চাবড়া বসাতে এক্সট্রা মজুরি লেগেছিল আর তাই নিয়ে কী হইচই! প্র্যাকটিক্যাল কাজ সম্পর্কে কারুর আইডিয়াই নেই। একটুতেই করাপশান বলে চেঁচায়।'

'দেখব'খন।' বলে ধরিত্রী পা বাড়ায়। ফের ঘুরে বিশ্ববন্ধুকে ডাকে, 'এস বিশুদা!'

একটু চলার পর দিরেংয়ের ডাক ভেসে আসে। 'হঁই গে ছোটবাবুঁ! ছোটবাবুঁঃ!'

বিশ্ববন্ধু খিকখিক করে হেসে বলে, 'ডাকুক ব্যাটা! দুপুরে বরং আসা যাবে।'

ধরিত্রী শক্ত গলায় বলে, 'না।'...

আট

বিকেলে কলেজ থেকে ফিরে গায়ত্রীকে দেখে একটু অবাক হয় সুদীপন। ভেতরের বারান্দায় দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে গায়ত্রী তার মা রুচিরার সঙ্গে হাসিমুখে কথা বলছে। রুচিরা মোড়ায় বসে আছেন। বুড়ি নামে মেয়েটা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে দেখছে গায়ত্রীকে।

রুচিরা বলেন, 'এই নাও তোমার কুটুম্বকে। তুমি নেই শুনে চলে যাচ্ছিল। আটকে রেখেছি।'

গায়ত্রী চঞ্চল হয়ে বলে, 'সাড়ে পাঁচটার বাস ফেল করলে বাড়িতে ভাববে যে!'

সুদীপন একটু হাসে। 'তারপর বুঝি আর বাস নেই? কতক্ষণ এসেচ তুমি?'

'একঘণ্টা তো বটেই। তাই না মা?'

রুচিরা উঠে দাঁড়ান। 'বুড়ি, কেটলি চাপা। আমরা এইমাত্র চা খেলাম।'

সুদীপন বলে, 'শুধু চা?'

গায়ত্রী চোখ পাকিয়ে বলে, 'থাক্। আপনাকে আর কুটুম্বিতে ফলাতে হবে না। সেদিন...' বলেই সুদীপনের ইশারায় থেমে যায় সে।

সুদীপন বলে, 'নিশ্চয় আমার কাছে আসনি!'

'আপনি বড্ড নেমকহারাম কিন্তু!' গায়ত্রী চটে যাওয়ার ভান করে। 'কখনো আসিনি বুঝি? পুজোর সময় অষ্টমীর দিন আসিনি?'

'সে তো পুজো দেখতে।'

'বেশ তাহলে তাই। মা, আসছি।'

রুচিরা একটু হেসে বলেন, 'অনেকদিন পরে তোমাদের এই ঝগড়াঝাঁটিটা বেশ ভালই লাগছে। দীপু, আমি বেরুচ্ছি এবার। উনি একটু আগে বেরিয়ে গেলেন। একবার বেণুদের বাড়ি যাব। মেয়েটা এল, ওকে রেখে বেরব কী করে?'

রুচিরা ঘরে ঢুকলেন। সুদীপন তার শোবার ঘরের দিকে পা বাড়িয়ে বলল, 'এস গরি, আমরা জমিয়ে ঝগড়াঝাঁটি করি তাহলে।'

কতকাল পরে এই ঘরটাতে ঢুকল গায়ত্রী। ঢুকে অবাক হয়ে গেল। কয়েকমুহূর্ত বিশ্বাস করতে বাধল যে তার দিদি আর ও-ঘরে নেই। আগের মতই সাজানো গোছানো। এমন কী খাটের পাশে ফুলদানিতে ফুল পর্যন্ত! আর সেইরকম কী একটা সুন্দর গন্ধ মউমউ করছে।

সে ঘুরে-ঘুরে দেখছিল। সুদীপন আলনা থেকে পাজামা টেনে নিয়ে বলল, 'কী দেখছ গরি?'

'কিছু না।'

'বস! জামাকাপড় বদলে নিই।' সুদীপন শার্ট ছেড়ে প্যান্টপরা অবস্থায় পাজামা নিয়ে বেরিয়ে যায়।

গায়ত্রীর এতক্ষণে মাথায় এল, কী যেন নেই এ ঘরে এবং আবিষ্কার করতে পারল, দিদির কোন চিহ্ন চোখে পড়ছে না। আলনায় তার শাড়ি জামা সায়া—কিছুই নেই। ড্রেসিং টেবিলে সেই সুন্দর সিঁদুর কৌটোটাও নেই। ধরিত্রী বড় একটা সাজত না। তবু সুদীপন তার জন্য প্রচুর প্রসাধনসামগ্রী কিনে সাজিয়ে রাখত। এখন শুধু একটা ছোট্ট পাউডারকৌটো আর একটা চিরুনি মাত্র।

কিন্তু তার সবচেয়ে অবাক লাগল দেখে, ঘরে কোথাও ধরিত্রীর কোন ছবি নেই। একসময় ঘরের ভেতর কত ছবি ছিল ধরিত্রীর—সুন্দর করে বাঁধানো। কোনটা একা, কোনটা সুদীপনের সঙ্গে। গায়ত্রী যে আনন্দ নিয়ে ঢুকেছিল, তা মুছে গেল দ্রুত। তার মনে হল অনাত্মীয় অচেনা একটা মানুষের ঘরে সে ঢুকে পড়েছে এবং সে একজন নিছক পুরুষমানুষ।

সুদীপন পাজামা পরে তোয়ালেতে মুখ মুছতে মুছতে ঘরে ঢুকে বলে, 'একী! এখনও দাঁড়িয়ে আছ কেন গরি? বসো।' সে ফ্যানের সুইচ টিপে দিয়ে হাসে। 'সরি। আজ যা গরম পড়েছে, কহতব্য নয়। লাস্ট ক্লাসটা নেওয়ার সময় হঠাৎ লোডশেডিং হয়ে গেল। টেরিফিক অবস্থা! ও কী? বসছ না কেন?'

গায়ত্রী ঘড়ি দেখে হাসবার চেষ্টা করে বলল, 'পাঁচটা বেজে গেছে।'

সুদীপন পাঞ্জাবি পরে আয়নায় চুল আঁচড়ায়। বলে, 'আর কোথায়-কোথায় গিয়েছিলে বল?'

'প্রিন্সিপ্যালের সঙ্গে দেখা করে এলাম। কয়েকজন বন্ধুর বাড়ি গেলাম। তারপর এখানে।'

সুদীপন ওর কাঁধে আলতো ঠেলে সুদৃশ্য মোড়ায় বসিয়ে দেয়। বুড়ি ট্রেতে চায়ের পট আর কাপ এনে নিচু টেবিলে রেখে বলে, 'দাদাবাবু, ছানা খাবেন না এখন?'

'ভাগ্!' সুদীপন হাসতে হাসতে থাপ্পড় তোলে। বুড়ি গায়ত্রীকে দেখতে দেখতে বেরিয়ে যায়।

গায়ত্রী বলে, 'আমি এইমাত্র মাঐমার সঙ্গে চা খেলাম। আর খাব না কিন্তু?'

'আমার খাতিরে।'

'বাঃ! সেদিন আপনি অমন করে আমাকে ফেলে পালিয়ে এলেন। আবার কোন্ মুখে বলছেন শুনি? আর কেউ হলে বুঝি আসত?'

সেদিন অরিত্রকে যেভাবে বলেছিল, সেভাবেই সুদীপন বলে, 'তুমি অধম, তাই বলিয়া আমি উত্তম না হইব কেন? মানে—এটা তোমারই কথা হওয়া উচিত। আমি অধম, গরি! আর তুমি খুবই উত্তম।'

গায়ত্রী একটু ইতস্তত করছিল। ভাবছিল, এখন যদি বিজ্ঞ অধ্যাপককে তার হাতে লেখা অসমাপ্ত নোটের খাতাটা দেয়, উনি কি খারাপ ভাববেন? অনিচ্ছাসত্ত্বেও চায়ের কাপ আবার তাকে নিতে হল। মুখ নামিয়ে আস্তে বলে, 'মাঐমা আম আর সন্দেশ-টন্দেশ খাইয়েছেন। আর আপনি শুধু চা?'

'বল, কী খাবে?'

'কী খাওয়াবেন, বলুন আগে?'

'যা চাও।'

'পারবেন না। শুধু মুখেই। যান্ আপনাকে জানা আছে!'

সুদীপন হাসির মধ্যে বলে, 'খাওয়ানো বা খাওয়ার জিনিস পৃথিবীতে প্রচুর গরি! কিন্তু বল তো এমন কোন জিনিস আছে, যা একইসঙ্গে অপরকে খাওয়াতে নিজেরও খাওয়া হয়ে যায়?'

'আপনার শুধু হেঁয়ালি!'

'বলতে পারলে না তো? একটু হিন্ট দিই?' সুদীপন চাপা স্বরে সকৌতুকে বলে, 'সবচেয়ে মিষ্টি লোভনীয় সুস্বাদু। মুখ দিয়েই খেতে হয়। বলে ফেল এবার!'

'আমি জানি না।' গায়ত্রী মুখ নামায়। তারপর তার মুখটা লাল হয়ে যায়। কপট রাগের সঙ্গে চাপা হাসি মিলিয়ে বলে, 'আপনি আজকাল বড্ড অসভ্য হয়েছেন! বড়দি নেই কিনা!'

সুদীপন একটা জোরাল হাসি হাসতে গিয়ে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে ওঠে। উঠে গিয়ে চুরুটের বাক্স থেকে চুরুট আনে। দেশলাই জ্বেলে ধরাতে ধরাতে বলে, 'মানুষের জীবন আজকাল বড় নিরানন্দ গরি! মাঝে মাঝে সুযোগ পেলে একটু আনন্দ ছিনতাই করতে ইচ্ছে করে। তোমার সেই নোটের খাতাটা কি এনেছ? না না। সঙ্কোচের কারণ নেই। সেদিন অরিত্র এসেছিল। ভাবলাম, ওকে বলব। তো...'

'দাদা এসেছিল নাকি?'

'হ্যাঁ। মানে, জাস্ট দেখা হয়েছিল আর কী!' সুদীপন বুঝতে পেরেছে, অরিত্র কিছু বলেনি বাড়িতে 'যাই হোক, তিনটে দিন আমি সময় নেব। ভীষণ স্লো আমার হাত। তুমি...সামনে শনিবার বিকেলেই এস বরং। অসুবিধে হবে?'

গায়ত্রী ছোট করে মাথাটা নাড়ে। যন্ত্রের হাতে ব্যাগ থেকে নোটের খাতাটা বের করে দেয়। তারপর

অপ্রস্তুত হেসে বলে, 'আমি কিন্তু এ জন্যে আসিনি জামাইবাবু! আমার এক বন্ধুর কাছে কয়েকটা জিনিস কপি করে নেব বলে এসেছিলাম। তার সঙ্গে দেখা হল না।'

হাত তুলে সুদীপন বলে, 'ঠিক আছে!'

গায়ত্রী কুণ্ঠিত মুখে বলে, 'সওয়া পাঁচটা হয়ে গেল। আমি উঠি জামাইবাবু!'

পুরু কাচের ভেতর দিয়ে তার দিকে তাকিয়ে সুদীপন বলে, 'উঠবে? চল বরং তোমাকে বাসে তুলে দিয়ে আসি। গঙ্গার ধারে সন্ধ্যা অব্দি রোজ একটু বেড়াই। চল!'

সুদীপন বেরিয়ে ডাকল, 'বুড়ি! শক্ত করে দরজা এঁটে দিবি। কাউকে খুলবিনে কিন্তু।'...

বড় রাস্তায় পৌঁছে গায়ত্রী বলে, 'আপনি আর ফুলশেখরে যাবেন না জামাইবাবু?'

'কেন হঠাৎ এ প্রশ্ন গরি?'

'এমনি।' একটু চুপচাপ হাঁটার পর গায়ত্রী ফের বলে, 'দিদি আজকাল আরও ফেরোশাস হয়ে উঠেছে। বিপ্রশেখরের ব্রজবাবু বলে একজন আছে—খুব ইনফ্লুয়েন্সিয়াল লোক। তার বিরুদ্ধে লেগেছে। কাকাবাবুকে তো জানেন? দিদি যদি ওঁকে বোঝায় জল উঁচু, কাকাবাবু বললেন, হ্যাঁ, জল উঁচু। মিতুপিসিমা কত করে বোঝালেন। দিদি কানে নেয় না। কিন্তু আমার খুব অবাক লাগছে জামাইবাবু, দিদি পরের জন্যে ওর পেছনে লাগতে গেল।'

বাঁকা হেসে সুদীপন বলে, 'তোমার দিদি বরাবরই ভীষণ পরোপকারী।'

'কিন্তু যার জন্যে করছে এত, সে তো মাতাল! একেবারে বাজে লোক!'

'কে সে?'

'বিশুবাবু বলে একজন আছে। তাকে আপনি কখনও দেখেননি। ব্রজবাবুর সৎ ভাই। অ্যাদ্দিন বাইরে কোথায় ছিল। এখন এসে দাদার সঙ্গে টাকার জন্যে ঝামেলা করছে। মদের টাকা চাই! আর আমার পরোপকারী দিদি তার হয়ে লড়ে যাচ্ছে। মামলা-টামলা কীসব করেছে যেন।' গায়ত্রী দুঃখিত মুখে একটু হাসে। 'আমি ওসব ব্যাপারে থাকিনে। কিন্তু আমার পড়ার ঘরের পাশেই তো রান্নাঘর। মিতুপিসিমার সঙ্গে দিদির তর্কাতর্কি শুনতে পাই। তারপর দিদির কী বুদ্ধি দেখুন! বিশুমাতালকে নেমন্তন্ন করে খাওয়াল পর্যন্ত।'

সুদীপন একটু ইতস্তত করে বলে, 'তোমাকে বলাটা হয়ত ঠিক হচ্ছে না গরি—তবু সত্যের খাতিরে বলছি। তাছাড়া ধরিত্রীর সঙ্গে আইনত আমার সম্পর্ক ছিন্ন হয়নি এখনও। সুতরাং বলতে দোষ নেই।'

ওকে থামতে দেখে গায়ত্রী বলে, 'কী?'

'বরাবর দেখেছি, তোমার দিদির এই একটা স্বভাব। অস্বাভাবিক চরিত্রের লোকেদের প্রতি ভীষণ প্যাসনেট হয়ে ওঠে। কারুর-কারুর নিষিদ্ধ জিনিসের প্রতি একটা সাবকনসাস প্রবণতা থাকে অবশ্য। আমার ধারণা, ধরিত্রীর মধ্যেই একটা অ্যাবনরম্যালিটি আছে—খুব প্রিমিটিভ ধরনের উন্মাদনা। আর সে নিজেও জানে না, সে কী করছে!'

বড়রাস্তা থেকে অপেক্ষাকৃত নির্জন ছোট রাস্তায় শর্টকাট করে বাস-টার্মিনাসের দিকে যেতে যেতে গায়ত্রী বলে, 'বাস ছেড়ে গেলে কিন্তু বিপদ! নেক্সট ট্রিপ ছটার পর—কততে যেন। কেলেঙ্কারি হবে!'

সুদীপন সে কথায় কান করে না। 'ধরিত্রী যখন এখানে ছিল, হলা দাস মাঝে মাঝে আসত। হলার সঙ্গে তার দু-একজন বন্ধুও আসত। দেখেই বুঝতে পারতাম তারা কে বা কী। হলা অবশ্য আমার ছাত্র ছিল।'

গায়ত্রী চমকে উঠেছিল হলার নাম শুনে। হলাকে সে ছোটবেলা থেকে চেনে। অরিত্রের সঙ্গে খুব ভাব ছিল। তাই কখনও-সখনও অরিত্রের সঙ্গে ফুলশেখরে বেড়াতে আসত। হলা গায়ত্রীকে তার বাবার নার্সারিতে যেতে বলত। গায়ত্রী যায়নি। সুদীপনের কথা শুনে গায়ত্রী আস্তে বলে, 'জানি।'

'হলা যখন গাঢাকা দিয়ে বেড়াচ্ছিল, তখনও তোমাদের বাড়িতে যেত শুনেছি।'

গায়ত্রী চাপা গলায় বড়-বড় চোখ করে বলে, 'অনেক রাতে যেত। আমি কিন্তু টের পেতাম, জানেন?'

'আচ্ছা!'

'আমাদের ঠাকুরবাড়িতে একটা ঘর আছে ছোট মত। বাবার আমলে ওখানে ছকু পাণ্ডা থাকত। ও পুজো করত ঠাকুরের। ছকুদা মারা গেলে তার ভাই নকুল এসে পুজো করে যায় রোজ সকালে। নকুলের বউ-ছেলেমেয়ে আছে। নিজেদের বাড়িতে থাকে। ছকুদা বিয়ে করেনি তো! ক্ষ্যাপাপাগলা মানুষ ছিল।'

'হলা বুঝি সেই ঘরে থাকত?'

'হ্যাঁ।'

'তোমার পিসিমা জানতেন না!'

'জানলে কী করবেন? কাকাবাবু জানতেন কি না জানি না অবশ্য।'

'অরিত্র কিছু জানত না।'

'ছোড়দার কথা ছেড়ে দিন। ও শুধু খায়, আর আড্ডা দিতে যায় বিপ্রশেখরে। তারপর নদীতে সাঁতার কাটে। পৃথিবীর কোন খবর রাখে না।'

গায়ত্রী হঠাৎ গতি দ্রুত করে। টার্মিনাসে একটা বাস হর্ন দিচ্ছে। শেষবেলায় আগাপাছতলা ঠাসা লোক। সুদীপন শ্যালিকার সঙ্গ ধরতে নাকাল হয়। পেছন ফিরে গায়ত্রী বলে, 'শনিবার চারটের বাসে আসছি কিন্তু! এসে যেন রেডি পাই জামাইবাবু! আর একমাস পরে আমার শমনভবনে যাত্রা!'

হাসতে হাসতে ভিড় ঠেলে বাসের ভেতর ঢুকে যায় গায়ত্রী। বাসটা ছেড়ে না যাওয়া অব্দি সুদীপন চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। চুরুট কামড়ে ধরে বাসটাকে দেখে। তারপর ডানদিকে ঘুরে বাঁধে ওঠে। আজ ব্রিজে দাঁড়িয়ে সূর্যাস্ত দেখতে ইচ্ছে করছে সুদীপনের।...

ব্রজবন্ধুর মেজাজ এমনিতে বেশ ভাল। কিন্তু রেগে গেলে মুখের চেহারা একেবারে বদলে যায়। বয়স পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে। চুল কালো রাখার জন্য কলপ ব্যবহার করেন। তাঁর গায়ের রঙ সৎভাইয়ের মত উজ্জ্বল ছিল না ছেলেবেলায়। কিন্তু স্বাস্থ্য এবং প্রতিপত্তির গুণে তাঁকে যথেষ্ট ফর্সা দেখায়। লম্বা চওড়া মানুষ। প্রতিদিন যত্ন করে গোঁফদাড়ি কামান। কিন্তু পোশাক পরেন অতি সাধারণ—তাঁতের ধুতি আর যেমন তেমন একটা পাঞ্জাবি।

সদ্য একটা পুরনো জিপগাড়ি কিনেছেন। যন্ত্রপাতি অদলবদল করে ভোল ফিরিয়ে উজ্জ্বল করে ফেলেছেন গাড়িকে। ইচ্ছা আছে, পার্টি নমিনেশন দিলে সামনের ইলেকশানে একবার চান্স নেবেন বিধানসভায়।

এদিন দুপুর থেকে ভেতর-ভেতর চটে লাল হয়ে ছিলেন ব্রজবন্ধু সৎভায়ের ওপর। কানাই মোহান্ত এসে বলেছে, 'ছোটবাবুকে গণাসিঙ্গির ছাপাখানায় দেখে এলাম রায়মশাই। ডাকলাম আপনার নাম করে। এলেন না।'

ব্রজবন্ধু বলেছেন, 'আমি কি তোমাকে ডাকতে বলেছিলাম কানাই?' তারপর কিছুক্ষণ গুম হয়ে থেকে ফের বলেছেন, 'গণোসিঙ্গি তার কাগজে আমাকে নিয়ে ঠাট্টাতামাশা করেছে। পরের সংখ্যায় নিশ্চয় কিছু কেচ্ছা-খেউড় করবার তালে আছে। ছোটকুর কাছে মেটিরিয়াল সংগ্রহ করছে। বুঝেছ কানাই?'

'তা আর বুঝিনি? সেজন্যেই তো আপনার নাম করে ডাকলাম।'

'ঠিক আছে, দেখছি।'

বিশ্ববন্ধুকে দেখা গেল বিকেলবেলা বাড়ির সামনে ঠাকরুনতলায়। মাতাল অবস্থা। গোল করে গোড়াবাঁধানো অশ্বত্থতলায় তখন বিপ্রশেখরের প্রবীণদের আড্ডা বসেছে। বিশ্ববন্ধুকে নিয়ে সবাই কৌতুকে মত্ত। হঠাৎ কোত্থেকে ব্রজবন্ধুর জিপটা এসে থামল সেখানে। ব্রজবন্ধু জিপ থেকে নেমেছেন, বিশ্ববন্ধু চেঁচিয়ে উঠল, 'রায়মশাই! রায়মশাই! শোন, তোমার সঙ্গে মাইরি ভেরি আর্জেন্ট টক আছে।'

ব্রজবন্ধু খাপ্পা হয়েই ছিলেন। চাপা গর্জালেন, 'কানাই! ছোটকুকে ধরে বাড়ি নিয়ে এস।' তারপর বাড়ি ঢুকে গেলেন। মোহান্ত শক্তিমান লোক। কিন্তু সে প্রথমে বিশ্ববন্ধুকে নরম গলায় বলল, 'রায়মশাই ডেকে গেলেন ছোটবাবু! আসুন।'

মাতাল বিশ্ববন্ধু চোখ পাকিয়ে বলল, 'এই চাকরের ব্যাটা চাকর! রায়মশাই ডাকল না ডাকল, সে আমি বুঝব। তোর তাতে কী? ভাগ্ এখান থেকে।'

সে নিজে থেকেই হয়ত যেত, কিন্তু কানাই মোহান্ত ইদানিং বিপ্রশেখরে এক মাতব্বর লোক। তাছাড়া তাকে এমন ভাষায় বিশ্ববন্ধু তুচ্ছতাচ্ছিল্য করবে এবং এত লোকের সামনে—সে ভাবতেও পারেনি। সে দুহাতে বিশ্ববন্ধুকে শূন্যে তুলে ধরে বলল, 'একটা কথা বললে ঠাকরুনপুকুরে ছুঁড়ে ফেলব!' বিশ্ববন্ধু হাত-পা ছুঁড়ছিল। গাল দিচ্ছিল বাপ-মা তুলে। ওই অবস্থায় কানাই মোহান্ত তাকে নিয়ে গেটের ভেতর ঢুকে গেল। এদিকটা রাধাবল্লভের মন্দিরের উঠোন। সামনে দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলেন ব্রজবন্ধুর স্ত্রী বাসন্তী। অনেকক্ষণ থেকে ঠাকরুনতলায় দেওরের মাতলামি দেখছিলেন। মুখ টিপে হাসছিলেন। এবার বললেন, 'ছিঃ কানাই! এ কী হচ্ছে?'

বিশ্ববন্ধু চেঁচিয়ে বলল, 'ছোটলোকটার সাহস দেখছ বউদি? জুতো ছুঁড়ে মার—শিগগির!' তারপর সে কানাইয়ের একটা কান খামচে ধরল। কানাই হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, 'মেরে ফেলব—এক্কেবারে মেরে ফেলব।'

ধস্তাধস্তি বেধে গেল। গেটে ভিড় করে লোকেরা মজা দেখছে। ব্রজবন্ধু নিচের বারান্দায় বেরিয়ে বললেন, 'ঘনশ্যাম! গেটটা বন্ধ করে দে। কানাই, ওকে নিয়ে এস ভেতরে।'

বিশ্ববন্ধুকে নিয়ে এমন কাণ্ড কিছু নতুন নয়। রক্ষাকর রায় বেঁচে থাকতেও এমনটা হয়েছে। কিন্তু তখন বিশ্ববন্ধুর বয়স কম ছিল। এখন সে পূর্ণ যুবক। তার চুলেও পাক ধরেছে। তাই ব্যাপারটা বাইরের লোকের কাছে অদ্ভুত লাগার কথা। ঘনশ্যাম বিশাল কপাটদুটো বন্ধ করে দিলে লোকগুলো কান পেতে দাঁড়িয়ে রইল।

ব্রজবন্ধুকে দেখে বিশ্ববন্ধু কানাইয়ের কান ছেড়ে দিয়েছিল। কানাই তাকে যখন ভেতরে নিয়ে গেল, তখন সে চৌকাঠে ঠোক্কর খাবার ভয়ে মাথা নিচু করে কানাইয়ের কাঁধ আঁকড়ে ধরে রইল বাঁদরের ভঙ্গিতে। বসবার ঘরে কানাই তাকে নামিয়ে দিলে ব্রজবন্ধু আচমকা একটা চড় মারলেন বিশ্ববন্ধুর গালে।

বিশ্ববন্ধু চড় খেয়ে পড়ে গেল। ভাঙা গলায় চেঁচিয়ে সে 'শালা বেজা' বললে ব্রজবন্ধু পা থেকে স্যান্ডেল খুলে চাপা গর্জালেন, 'মুখ ভেঙে দেব ছোটলোকের!' তারপর কানাইয়ের দিকে ঘুরে বললেন, 'ঠিক আছে। তুমি এস কানাই। দরজাটা বাইরে থেকে ভেজিয়ে দাও।'

কানাই আদেশ পালন করলে ব্রজবন্ধু সুইচ টিপে আলো জ্বেলে দিলেন ঘরে। ফ্যানটাও চালিয়ে দিলেন। তারপর সৎভাইয়ের একটা বাহু ধরে তাকে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে সোফায় বসিয়ে নিজে মুখোমুখি বসলেন।

বিশ্ববন্ধু লালচোখে তাকিয়ে দেখছিল ব্রজবন্ধুকে। একটু পরে ব্রজবন্ধু পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে আস্তে বললেন, 'নে, সিগারেট খা!'

নেশার মধ্যেও বিশ্ববন্ধু অবাক হল। বয়স হলেও দাদার সামনে সে সিগারেট খায় না।

ব্রজবন্ধু গলার ভেতর বললেন, 'আমার সামনে মাতলামি করতে লজ্জা হয় না, সামান্য স্মোক করতে লজ্জা!'

বিশ্ববন্ধু কাঁপা-কাঁপা হাতে একটা সিগারেট বের করে নিলে ব্রজবন্ধু লাইটার জ্বেলে ধরিয়ে দিলেন। বিশ্ববন্ধু বলল, 'তুমি খাচ্ছ না যে?'

গম্ভীরমুখে ব্রজবন্ধু সিগারেট ধরিয়ে বললেন, 'নেশা কেটেছে?'

'কিসের নেশা? আমার নেশাফেশা হয় না।'

ব্রজবন্ধু চুপচাপ সিগারেট টানলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন, 'কোথায় ছিলি ক'দিন ধরে? কানাই খুঁজতে গিয়েছিল। সিঙ্গিবাড়িতে ছিলি নাকি?'

'নাঃ!'

'তাহলে?'

'সে তোমার শুনে কী হবে? তুমি তো আমাকে উৎখাত করে দিয়েছ ফ্যামিলি থেকে!'

'বুদ্ধু কোথাকার!' ব্রজবন্ধু কণ্ঠস্বরে ক্ষোভ প্রকাশ করে বললেন, 'তুই না লেখাপড়া জানা ছেলে ছোটকু! কোয়ালিফায়েড ছেলে! তুই কী করে ভাবলি আমি তোকে...'

বিশ্ববন্ধু কথা কেড়ে বলল, 'জমিজমা প্রপার্টির গভমেন্ট রেকর্ডে আমার নাম পর্যন্ত নেই!'

'কে বলল তোকে? গণাসিঙ্গির ভাইঝি?'

'আমি খোঁজ নিয়েছি।' বিশ্ববন্ধু চঞ্চল হল। 'বেশ, যা করবার করেছ। আমি লড়ব। কারণ আমি বাবার ছেলে বটি কিনা? রক্ষাকর রায়ের ঔরসে মৃণালিনী দেব্যার গর্ভে...উরে শালা! মুখ দিয়ে কী ওজনদার সেন্টেন্স বেরুচ্ছে দেখ রায়মশাই!'

'আবার মাতলামি করলে থাপ্পড় খাবি ছোটকু!'

'তা তো খাবই। তোমার মত জোর নেই গায়ে। আর কী যেন—কানাই, শালা লম্পট মোহান্ত কানাই...ছোটলোক...ওর মত গুণ্ডা আমার নেই।' তারপর হাসে বিশ্ববন্ধু। 'তবে যোগাড় করতে অসুবিধে নেই। তোমার অপজিট পার্টিতে ঢুকলেই ব্যস!' উরুতে থাপ্পড় মেরে শব্দ করল সে।

ব্রজবন্ধু শান্তভাবে বলেন, 'তুই তো অলরেডি ঢুকে গেছিস? তোকে দিয়ে দেওয়ানী কোর্টে মামলা করিয়েছে!'

'বাঃ! কী বলছ রায়মশাই! ওকে মামলা বলে না। সাকসেশন সার্টিফিকেটের জন্য পিটিশান!'

'এসব আইনকানুনের টার্ম তোকে কে শেখাল?'

নিজের বুকে টোকা মেরে বিশ্ববন্ধু বলে, 'অ্যাম আই ফুল? ইলিটারেট? ড্রিংক-ট্রিংক করি না হয়।'

প্রপার্টি তো তোরই আছে। তোকে কি আমি বলেছি...'

হাত তুলে বাধা দিয়ে বিশ্ববন্ধু হাসতে হাসতে বলে, 'বলনি। বলবে। কারণ কোন রেকর্ড-পরচায় আমার নাম নেই। তদুপরি তুমি কোর্টের নোটিশ পেয়ে কী করেছ দেখ রায়মশাই! হুঁ হুঁ বাবা, আমি এত কাঁচা ছেলে নই!'

ব্রজবন্ধু ভুরু কুঁচকে ওর চোখে চোখ রেখে বলেন, 'কী করেছি?'

বিশ্ববন্ধু হঠাৎ ভাঙা গলায় চেঁচিয়ে ওঠে, 'বলেছ আমার মা ছিল রক্ষাকর রায়ের কেপ্ট! আমি শালা কেপ্টের ছেলে! আমার মা বিয়েকরা বউ ছিল না?'

'ছোটকু!'

বিশ্ববন্ধু টলতে টলতে উঠে দাঁড়ায়। 'ওপ্‌ন্ দা ডোর! আমি বেরুব।'

ব্রজবন্ধু তার জামার কলার ধরে টেনে বসিয়ে দেন। 'মাতলামি করিসনে ছোটকু! শান্তভাবে কথা শোন।'

বিশ্ববন্ধু গুম হয়ে বলে, 'বল ঝটপট! বন্ধঘরে আমার দম আটকে যাচ্ছে। আমি ব্রিজে গিয়ে বসে থাকব।'

'তুই পিটিশান উইথড্র করে নে। আমিও নেব। আপসে নিষ্পত্তি হয়ে গেছে বললেই চলবে।'

বিশ্ববন্ধু একটু হাসে। 'হাতের ঢিল ছুঁড়ে দিলে ফেরত আসে? যা হয়েছে, হয়েছে। ব্যস!'

'ছোটকু! মাতলামি করিসনে!'

'মাতলামি কোথায় দেখলে? এতদিন আইনকানুন জানতাম না। এখন জেনেছি। আর মিটমাটের কথা বলছ, মিটমাট জজকোর্টেই করে দিক। আমিও তো পিতার ঔরসজাত পুত্র—বিবাহিতা পত্নীর সন্তান! হুঁ হুঁ বাবা!'

ব্রজবন্ধু তার দিকে তাকিয়ে থাকেন কিছুক্ষণ নিষ্পলক চোখে। তারপর বলেন, 'আয়! তোর বউদি তোকে খুঁজছে কদিন থেকে। ওঠ্!'

'বউদি ভাল লোক না হলে আর কি আমি বিপ্রশেখরে ঢুকতাম?'

ব্রজবন্ধু তার ঘাড়ে হাত রেখে ভেতরে নিয়ে যান।...

অরিত্র সীমন্তের ঘরে সামনে নোনাপাতার গাছে সাইকেল ঠেস দিয়ে রেখে ডাকছিল, 'মন্তু! মন্তু!'

ভেতর থেকে রিন বেরিয়ে এসে অরিত্রকে দেখে হাসল। 'তুমি? আমি ভাবি, কে যেন। আজকাল তোমার গলার স্বর অচেনা লাগে কেন গো অরুদা?'

অরিত্র বলে, 'মন্তু নেই?'

'না। তোমাকে বলেনি? দাদা গেছে মাঠপুকুরে মাকে নিয়ে।'

'মাঠপুকুরে? সে কোথায়?'

'আমার মামার বাড়ি। নিমতিতার ওদিকে।'

'কবে ফিরবে?'

'বলে গেছে নাকি?'

অরিত্র চলে যাবার জন্য সাইকেলের দিকে ঘোরে। বিকেল পড়ে এসেছে। অষ্টশিবের মন্দির এলাকায় ঘন গাছপালার ছায়া পরিবেশকে কেমন থমথমে করে ফেলেছে। পেছনের পুকুরে হাঁস ডাকছিল। গাঢ় ছায়ার ভেতর স্তব্ধতা একটু করে চেপে বসছে আর কী এক উদ্দেশ্যহীনতা চারপাশের ভাঙাচোরা ইটের জীর্ণ দালানে, উজাড় ভিটের ঝোপেঝাড়ে, ধ্বংসস্তূপে ধীরে প্রকট হয়ে উঠছে। অরিত্র আস্তে বলে, 'আচ্ছা চলি তাহলে রিন!'

রিন বলে, 'আমি যেন কেউ নই। এসেই চলে যাওয়ার কথা! এ শাড়িটা কেমন হয়েছে বল তো অরুদা?'

অরিত্র এতক্ষণে তার নতুন শাড়িটা লক্ষ্য করে। 'তাই তো! দারুণ হয়েছে। তোমাকে অসাধারণ দেখাচ্ছে কিন্তু!'

রিন শান্তভাবে শাড়ির ওপর হাত বুলিয়ে বলে, 'নিজের টাকায় কিনেছি। মাকে বলেছিলাম—এ মাসের টাকাটা দেব না। তাও কুড়ি টাকা ধার থেকে গেল, জান?'

'সামনে মাসে দিয়ে দেবে।'

রিন মুখ টিপে হাসে। 'আচ্ছা অরুদা, আমাকে দেখলেই তুমি অমন কর কেন বল তো?'

'কী করি?'

'বোঝ না? যেন আমি রাক্ষুসী—গিলে খেয়ে ফেলব।'

অরিত্রের শরীর একটু কেঁপে ওঠে। সে বলে, 'কিচ্ছু বলা যায় না। পাঁঠাবলির সময় তোমার যা চেহারা দেখেছি, রক্তটক্ত মেখে—ওরে বাবা!'

রিন হঠাৎ একটু বিমর্ষ হয়ে বলে, 'আগে আমার ওইরকম হত—ঠিক বোঝাতে পারব না। কিন্তু আজকাল আমার কেমন যেন গা ছমছম করে। এস না অরুদা, গল্প করি আমরা।'

'না, যাই!'

'এখানে কেউ আসে না—আসবে না—দাদার বন্ধুরা জানে দাদা নেই। বাবা তো এখন আরতি করতে গেছেন বুড়োশিবের ঘরে। এক্ষুনি আরতির ঘণ্টা শুনতে পাবে। এস না অরুদা! তোমার সঙ্গে একটা জরুরি কথা আছে।'

নিঃসঙ্কোচ আর স্বাভাবিক স্বরে রিন কথাগুলো বলে। অরিত্র একটু হাসে। 'মন্তুর ঘরে তুমি কিন্তু ট্রেসপাস করেছ।'

'যাঃ! দাদা আমাকে চাবি দিয়ে গেছে। ওর তো আবার ভীষণ ক্লিননেসের বাতিক। বলে গেছে, দুবেলা ধুলো ঝাড়বি—ধূপধুনো দিবি।'

অরিত্র ইতস্তত করছিল। এই নির্জন ঘরে সীমন্তের বোন তাকে ডাকতে পারছে—কোন কুণ্ঠা নেই, এই ব্যাপারটা কীভাবে নেবে ভেবে পাচ্ছিল না সে। রিন তার দিকে কেমন চোখে তাকিয়ে আছে দেখে সে কাঁপাকাঁপা হাতে সাইকেলটা আবার ঠেস দিয়ে রাখে। তারপর ঝোঁকের বশে বারান্দায় উঠে যায়।

রিন বলে, 'এক মিনিট। হেরিকেনটা জ্বালি। এতক্ষণ বসে কাচ পরিষ্কার করছিলাম।' ভেতরে ঢুকে সে আনাড়িহাতে দেশলাই জ্বালবার চেষ্টা করে। পারে না।

অরিত্র গিয়ে নিজের দেশলাই জ্বেলে হেরিকেন ধরিয়ে দেয়। রিনের শরীর থেকে সেন্টের গন্ধ পায় এবার। সে প্রেমিকের কণ্ঠস্বরে কিছু বলবে ভাবে। কিন্তু রিন সীমন্তের বিছানার তলা থেকে একটা ভাঁজ করা কাগজ বের করে বলে, 'দেখ তো অরুদা এটা কী!'

অরিত্র নিজেকে তখনই সামলে নিয়েছে। বুঝতে পারে, একটা সাংঘাতিক হঠকারিতা করতে যাচ্ছিল সে। আসলে মেয়েদের সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতা বলতে কিছু নেই-ই। কাগজটা হাতে নিয়ে সে বলে, 'তুমি তো ভীষণ মেয়ে রিন! দাদা নেই—আর তার গোপন কাগজপত্র খুঁজে একাকার করছ!'

রিন শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বলে, 'মজুমদারবউ দাদার সর্বনাশ করবে!'

'বুঝলাম। এটা কি তার প্রেমপত্র নাকি?'

'বোঝা যাচ্ছে না। এমন জড়ানো লেখা, পড়তেই পারলাম না। দেখ না খুলে।'

কাগজটা খুলে অরিত্র একটু অবাক হয়। নোটবইয়ের পাতা ছিঁড়ে দ্রুত লেখা কয়েকটা লাইন। ওপরে বা নিচে কোন নাম নেই। অরিত্র হেরিকেনের দম বাড়িয়ে আলোর সামনে কাগজটা রাখে।

রিন ফিসফিস করে বলে, 'পড়তে পারছ? পড় তো শুনি, কী লেখা আছে।'

অরিত্র পড়ে। ...'কাল রাত্রে গিয়ে দেখলাম তালাবন্ধ। বিরক্ত করলাম না। আগামীকাল তালা খুলে রেখ। অনেক কথা আছে। মাথার অসুখটা সাংঘাতিক বেড়েছে। ক্যান্সার হতেও পারে। ভাবছি, কলকাতায় গিয়ে দেখাব। টাকাকড়িও দরকার। একটা কথা, আমার ওপর রাগ কোরো না। যাবার আগে একবার চান্স নেব। লোকটা খুব চালাক, কিংবা ভগবান ওকে রক্ষা করছে। দেখা যাক। পত্রবাহককে কুড়িটা টাকা দিও। আমার কাছে এখন কিছু নেই। তোমার সঙ্গে দেখা হলে শোধ করব। ইতি।'

নামের আদ্যাক্ষর লিখেছিল। ঘষে অস্পষ্ট করে দিয়েছে। অরিত্র মুখ তুলে রিনের দিকে তাকায়. রিন উত্তেজিতভাবে বলে, 'বুঝতে পারছ কিছু?'

অরিত্র গুম হয়ে মাথা নাড়ে। তারপর বলে, 'এটা আমার কাছে থাক। সীমন্ত সম্ভবত ভুলে গেছে।'

রিন ব্যস্ত হয়ে বলে, 'না না অরুদা! দাদা টের পেলে কেলেঙ্কারি করবে।'

'আহা! আমি ওকে কিছু বলব না। তোমাকে জিজ্ঞেস করলে তুমি বলবে আমি জানি না।'

'কিন্তু তুমি কী করবে ওটা নিয়ে?'

'এর রহস্য খুঁজে বের করব।'

রিনের ঠোঁটের ওপর ঘাম জমেছে। আঁচলে মুছে বলে, 'দেখ বাবা, যেন আমি বিপদে পড়ি না!'

অরিত্র সিগারেট বের করে ধরায়। রিন টেবিল থেকে ছাইদানিটা এনে বিছানায় তার সামনে রেখে টেবিলে হেলান দিয়ে দাঁড়ায়। মন্দিরের দিকে এতক্ষণে আরতির ঘণ্টা বাজছে। রিন ডাকে, 'অরুদা!'

'তোমাকে অমন দেখাচ্ছে কেন গো?'

'কেমন দেখাচ্ছে?' অরিত্র হাসবার চেষ্টা করে। 'বরং তোমাকেই...'

'কী আমাকে?'

'কী সেন্ট মেখেছ রিন? দরুণ গন্ধ কিন্তু!'

রিন বুকের কাছে শাড়ি তুলে শুঁকে বলে, 'কমলাবউদি মাখিয়ে দিয়েছে। আমি কোথায় পাব সেন্ট!'

'রিন, আমি উঠি।'

'অরুদা, তুমি সিনেমা দেখ না?'

'খুব কম। কেন হঠাৎ একথা?'

'কাল বিকেলে চল না বহরমপুরে। দারুণ একটা বই চলছে। ইভনিং শোয়ে দেখে চলে আসব।'

অরিত্র শুকনো হাসে। 'তুমি দেখালে যেতে পারি।'

'দেখাবই তো বলছি। কিন্তু তুমি যাবে আগের বাসে, আমি পরেরটাতে। মোহন টকিজের সামনে ফোয়ারার পাশে ওয়েট করবে।'

'চেনা লোকের চোখে পড়লে কী ভাববে বুঝতে পারছ?'

'তখন দেখা যাবে।' রিন একটু হাসে। 'দাদা নেই, মা নেই। ঠাকমা কিছু বোঝে না। আর বাবাকে বলব ফুডসেন্টারের কাজে যাচ্ছি। তবে বাবাকে তো জান! কোন সাতেপাঁচে নেই। কথা রইল কিন্তু!'

অরিত্র উঠে দাঁড়ায়। একবার ভাবে, রিনকে একবার চুমু খাবে—তারপর ভাবে, কে জানে কীভাবে নেবে ও। সীমন্তকে যদি জানিয়ে দেয়, খুব লজ্জার ব্যাপার হবে। কিন্তু ঘর থেকে বেরিয়েই অরিত্র বুঝতে পারে, এখন তার চুমু খাওয়া বা ভালবাসার সময় নয়। চিঠিটা হঠাৎ তাকে আবার খুব ভেতর থেকে আঘাত করেছে।...

বাড়ি ফিরেই সে বড়দির খোঁজ করে। সংঘমিত্রা বলেন, 'কী জানি কী হয়েছে ধরির—জিজ্ঞেস করলে বলে, কিছু হয়নি। অথচ সারা বিকেল শুয়ে কাটাচ্ছে।'

অরিত্র ওপরে গিয়ে দেখে, ধরিত্রীর ঘরের দরজা ভেজানো। একটু ঠেলে ডাকে, 'বড়দি!'

'কী রে?'

ঘরে ঢুকে অরিত্র বলে, 'আলোফালো জ্বালিসনি। অন্ধকারে কী করছিস? কারেন্ট তো আছে।' সে সুইচ টিপে আলো জ্বেলে দেয়।

ধরিত্রী বিছানা থেকে উঠে দু হাতে চোখ ঢেকে বলে, 'আঃ! কী জ্বালাতন করিস অরু? নিবিয়ে দে।'

'এক মিনিট। তোর একটা চিঠি আছে। পড়ে দেখ।'

ধরিত্রী হাত বাড়িয়ে চিঠিটা নিয়ে বলে, 'কার চিঠি? কে দিল তোকে?'

অরিত্র আস্তে বলে, 'হলার চিঠি। হলা সীমন্তকে দিয়েছিল তোকে পৌঁছে দেবার জন্য। সীমন্ত দেয়নি।'

ধরিত্রী দ্রুত চিঠিটা পড়ে নিয়ে শক্ত মুখে বলে, 'তোকে সীমন্ত দিল?'

'না। সীমন্ত নেই। ওর বোন রঞ্জিতা ঘর পরিষ্কার করতে গিয়ে পেয়েছে। বিছানার তলায় ছিল।'

'সে তোকে দিল?'

'হ্যাঁ।' ...একটু পরে অরিত্র ফের বলে, 'রঞ্জিতা কিছু বুঝতে পারেনি। কিন্তু সীমন্তের ব্যাপারটা আমার অবাক লাগছে জানিস? সে আমাকে সব বলল, অথচ চিঠিটার কথা চেপে গেল। ভাগ্যিস ওটা...'

ধরিত্রী দ্রুত বলে, 'তুই এখন যা।'

অরিত্র আগের মত চলে যায় না কথা মেনে। ধরিত্রীর দিকে তাকিয়ে বলে, 'তোকে আমি এতদিন কিছু বলিনি বড়দি! কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না, কেন তুই হলাকে গোপনে প্রশ্রয় দিয়েছিলি এতদিন? কথাটা যদি রটে যায়, তোর যা হবার হবে—আমাদের ফ্যামিলির মানসম্মানটুকু আর থাকবে? জামাইবাবু পর্যন্ত জানত যে হলা আমাদের ঠাকুরবাড়িতে এসে লুকিয়ে থাকে!'

ধরিত্রী মুখ নামিয়ে বলে, 'তুই যাবি?'

অরিত্র প্রায় চেঁচিয়ে উঠল। 'হলার সঙ্গে তোর কিসের সম্পর্ক ছিল?'

ধরিত্রী ভাঙা গলায় বলে, 'তোর লজ্জা করে না এমন প্রশ্ন করতে? এত ইতর হয়ে গেছিস অরু?'

সংঘমিত্রা বাইরে দাঁড়িয়ে শুনছিলেন। ভেতরে ঢুকে অরিত্রের ঘাড় ধরে নিঃশব্দে টেনে বাইরে নিয়ে যান। বারান্দায় চাপা গলায় কাকুতিমিনতি করে বলেন, 'দোহাই অরু, চুপ কর বাবা, চুপ কর। কেলেঙ্কারির টিটি পড়েছে চতুর্দিকে। আর বাড়তে দিস নে বাবা! আয়, আমার সঙ্গে আয়।'...

ধরিত্রী চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলে। উঠে এসে ফ্যানের সুইচ অন করে আলোর সুইচ অফ করে দেয়। কাগজের কুচিগুলো নাচতে নাচতে এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে যায় অন্ধকারে। সে আবার শুয়ে পড়ে। সকাল থেকে একটু জ্বরভাব হয়েছে। বাইরে ঘুরে আসার পর ভাল করে খেতেও পারেনি। মনে হচ্ছিল, জ্বরটা বাড়বে।

এখন তার জ্বরটা হয়ত চলে গেল। ভীষণ গরম লাগছে।

কতক্ষণ পরে চটির শব্দ তুলে গণমিত্র এলেন। 'ধরি, কী হয়েছে মা? অন্ধকারে কেন?'

'কিছু না। আলো জ্বেলে দিন না!'

'থাক। জামাকাপড় ছাড়ি গে!' গণমিত্র কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে ফের বলেন, 'খবর পেলাম বিশুকে বাড়িতে আটকে রেখেছে বেজা। বেরুতে দিচ্ছে না। নেক্সট ইসুতে মুখোশ ফাঁস করে দিচ্ছি। যাবে কদ্দূর?'

গণমিত্র চলে গেলে ধরিত্রী গিয়ে ফ্যানটা বন্ধ করে দেয়। আবার শীত করছে খুব।...

নয়

বিপ্রশেখরে গাজনতলার চটানে ছেলেরা ফুটবল খেলছিল। অরিত্র সাইকেলে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে খেলা দেখছিল। সেইসময় বছরের প্রথম কালবোশেখী হইহই করে এসে পড়ল। অনেকদিন বৃষ্টি হয়নি। প্রচণ্ড ধুলো জমেছিল মাটির বুকের ওপর। ঝড়টা এল মুঠো মুঠো ধুলো ছড়িয়ে। ধূসর ধুলো কুয়াশার মত ছড়িয়ে যাচ্ছিল আর তার ভেতর খেলোয়াড়রা ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছিল। ফুটবলটা কিক খেয়ে আকাশে উঠতেই ঝড় তাকে লুফে নিল। খেলোয়াড়দের চেঁচামেচি শোনা গেল। অরিত্র ব্যাপারটা উপভোগ করতে আরও একটু দাঁড়াবে ভাবল। খেলোয়াড়রা বলটা খুঁজে পাচ্ছিল না। ধূসর

পর্দার ভেতর আবছা কয়েকটা মূর্তির ছুটোছুটি, ঝড়ের শনশন শব্দ, সমস্ত ব্যাপারটা অরিত্রের কাছে অবাস্তব এক স্বপ্নদৃশ্যের মত—তারপর প্রচণ্ড শব্দে বাজ পড়ল। একটা তালগাছের মাথা দাউদাউ করে জ্বলে উঠল। তখন অরিত্র সাইকেলে ওঠার চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। সামনে ঝড়। সে সাইকেল ঠেলতে ঠেলতে বুড়োশিবের মন্দিরের কাছে পৌঁছুতেই আবার কোথাও বাজ পড়ল। সে আঁতকে উঠে আকাশ দেখার চেষ্টা করল মুখ তুলে। ধুলোবালি খড়কুটো উড়ছে চারপাশে। চোখ তুলে তাকানো কঠিন। মাথার ওপর ভীষণ কালো মেঘ চিরে চোখ ধাঁধানো বিদ্যুৎ মুহুর্মুহু, তারপর কানফাটানো গর্জন। অরিত্র বুড়োশিবের পাশ দিয়ে পুকুরপাড়ে উঠল। [illegible] জঙ্গল আর ধ্বংসস্তূপ জুড়ে কী এক আলোড়ন চলছে। এ পাড়ায় এলে বরাবর যেমন মনে হয় অরিত্রের, খুব পুরনো এবং মৃতদের বাসস্থান, এখন মনে হল পৃথিবীর জংধরা একটা ভারি দরজা টেনে খোলা হচ্ছে এবং কারা বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছে। মুখ নিচু করে ঘাস আগাছার ঝোপের ওপর দিয়ে অরিত্র সাইকেল ঠেলে নিয়ে সীমন্তের ঘরের কাছে পৌঁছে থমকে দাঁড়াল।

ঘরের পেছনে একফালি পায়ে চলা পথ পুকুরে নেমেছে যেখানে, সেখানে একটা কাঠের গুঁড়ির ওপর রিন দাঁড়িয়ে আছে। আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে সে। খোঁপা ভেঙে চুল উড়ছে। তার শাড়ির আঁচল উড়ছে। তার পায়ের নিচে শ্যাওলাকালো জল নাচছে। রিনের চোখের চাউনি দেখে গা ছমছম করে অরিত্রের। ডাকতে গিয়ে চুপ করে থাকে।

তারপর বৃষ্টির ফোঁটা এসে ঠোঁটে পড়ে। প্রথমে ছোট ফোঁটা, তারপর বড় বড় ফোঁটা। ইটের স্তূপে বুনোকচুর পাতায় বৃষ্টির ফোঁটা শব্দ করে। রিনের মুখে কেমন একটা হাসি ফুটে উঠেছে দেখতে পায় অরিত্র। রিন ঠোঁট চাটে। তারপর হাঁ করে বৃষ্টি খেতে থাকে। তখন অরিত্র ডাকে, 'রিন! রিন!'

ঝমঝমিয়ে বৃষ্টিটা এসে গেল এবার। ঝড়ের টানে বৃষ্টিধারা বেঁকে যেতে থাকল। গর্জন করে উঠল মেঘ। আবছা গাছপালা, জীর্ণ ঘরবাড়ি হঠাৎ সাদা আলোয় ঝলসে গিয়ে আবার কালো হয়ে গেল। অরিত্র চেঁচিয়ে ওঠে, 'রিন! রিন! ওখানে কী করছ?'

রিন চমকে ওঠে। তারপর ঘুরে অরিত্রকে দেখতে পায়। কিন্তু কথা বলে না! সে ছুটে গিয়ে পাঁচিলের ভাঙা অংশটা গলিয়ে ভেতরে চলে যায়। অরিত্র একটু ইতস্তত করে। ভাবে, এই রাস্তা দিয়ে সোজা চলে যাবে বারোয়ারিতলার দিকে। ক্লাবঘরে গিয়ে ঢুকবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যেন রিনই তাকে টেনে নেয়। ভিজতে ভিজতে পাঁচিলের ভাঙা জায়গাটা দিয়ে সাইকেল ওপাশে ঠেলে দেয়। তারপর নিজে ঢুকে যায়। সাইকেলটা সীমন্তের ঘরের ছোট্ট বারান্দায় ওঠানোর সময় সে রিনকে খোঁজে না।

বারান্দাটা মাটির। এদিকে বৃষ্টির ছাঁট আসছে না, তাই শুকনো হয়ে আছে। অরিত্র রুমাল বের করে মুখ আর মাথায় ঘষে নেয়। তারপর ঘুরে দেখে রিন চৌকাঠে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সারা মুখে বৃষ্টির ফোঁটা নিয়ে ভিজে শাড়ির আঁচল নিঙড়ানোর চেষ্টা করছে।

অরিত্র একটু হাসে। ...'তুমি রাগ করে আছ বলেই তোমার রাগ ভাঙাতে আসছিলাম, রিন। হঠাৎ ঝড়বৃষ্টিটা এসে গেল।' সে প্যান্টের পকেট থেকে সিগারেট বের করে ফের বলে, 'দেশলাই নিতে ভুলে গেছি। দেশলাইটা দাও।'

রিন ঠোঁটের ডগায় বলে, 'নেই।' তার দৃষ্টি বারান্দার নিচে নোনাপাতার ঝোপটার দিকে।

অরিত্র বলে, 'মিথ্যে বল না। মস্তুর ঘরে দেশলাই না থেকে পারে না।'

'দাদা এখনও ফেরেনি।'

'ফেরেনি তা তো জানিই।' অরিত্র সিগারেটটা ঠোঁটে ধরে বলে, 'পরে কথা হবে রিন। সিগারেট না টানলে মাথা পরিষ্কার হবে না। প্লিজ!'

রিন ওর দিকে একবার তাকায়। তারপর ভেতর থেকে দেশলাইটা এনে ওর বুকের কাছে ছুঁড়ে দেয়। অরিত্র দেশলাইটা লুফে নিয়ে বলে, 'রাগ তুমি করতেই পার। কিন্তু বিশ্বাস কর, আমার যাওয়ার কোন উপায় ছিল না সেদিন। বড়দির প্রচণ্ড অসুখ। তার ওপর ঠিক সেই সময় মানোয়ার দারোগা এসে বলে, ডেকে দিন। সে এক ঝামেলা গেছে।' সে দেশলাই জ্বেলে সিগারেট ধরায়।

রিন আস্তে বলে, 'মানোয়ার দারোগা কেন ধরিদির কাছে গিয়েছিল?'

'কীসব পঞ্চায়েতি গণ্ডগোল। বড়দিটা কী যে সব করে!'

'তুমি ঠিক জান?'

অরিত্র একটু হকচকিয়ে যায়। 'কেন ওকথা বলছ?'

রিন গলার স্বর নামিয়ে বলে, 'বাবা ভাণ্ডারীবাড়ি শুনে এসেছে। হলাডাকাতের সঙ্গে ধরিদির কানেকশান ছিল। পুলিশ ধরিদিকেও অ্যারেস্ট করবে। আমি ধরিদিকে বলতে যেতাম, কিন্তু কী ভাববে বলে যাইনি।'

অরিত্র তাকিয়ে ছিল ওর মুখের দিকে। শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বলে, 'তুমি বিশ্বাস কর একথা?'

রিন মাথা দোলায়। তারপর বাঁকা হাসে। 'ওসব কথা ছাড়। এ তোমার মিথ্যে ওজর দেখানো। ধরিদির জ্বর! মানোয়ার দারোগা! হুঃ, যেন তুমিই সব উদ্ধার করে দেবে। সিঙ্গি জেঠু থাকতে তোমার যেন কত ইয়ে—যাও!'

'কিন্তু বাড়িতে আমি ছাড়া কে তখন ঝামেলা সামলাত বল? গরি পরীক্ষার পড়াশুনো নিয়ে মেতে আছে। কাকাবাবুর তো প্রেস-প্রেস করে মাথা খারাপ হয়ে গেছে। আমাকে তিলকের সঙ্গে মাঠে-ঘাটে...'

রিন ওকে থামিয়ে দিয়ে বলে, 'পরদিন এসে বলতে পারতে।'

অরিত্র হাসবার চেষ্টা করে। 'তোমাকে আমার সত্যি বড় ভয় করে রিন।'

'ইশ্! যেন আমি বাঘ না ভালুক। খেয়ে ফেলব।'

'অলরেডি খেয়ে ফেলেছ!'

রিন রাঙা হয়ে বলে, 'যাঃ! খালি অসভ্যতা তোমার!' সে ফের আঁচলটা নিঙড়ে মুখ মোছার চেষ্টা করে। ভেজা চুলগুলো সামনে এনে ঝাড়তে থাকে। তারপর আস্তে বলে, 'তুমি যখন-তখন হুট করে চলে আসছ। কেউ দেখলে কী ভাববে বল তো?'

'হঠাৎ ঝড় বৃষ্টি এল। তাই এলাম। চলে যাচ্ছি তাহলে!'

রিন বলে, 'তুমি ভেতরে গিয়ে বস বরং। বৃষ্টিটা থামুক। আমি আসছি।'

সে দৌড়ে চলে গেল বৃষ্টির ভেতর। খিড়কির দরজা দিয়ে বাড়ি ঢুকলে অরিত্র দোনামনায় পড়ে গেল। বামুনপাড়ার একপ্রান্তে এদিকটা বড্ড নিরিবিলি। তাকে ও রিনকে কেউ দেখে ফেলার চান্স কম। তাছাড়া এই ঝড়বৃষ্টি। রিন না গেলেও পারত তাকে একা রেখে।

চুপচাপ সিগারেট টানতে টানতে অরিত্র অন্যমনস্ক হয়ে যায়। একটু পরে রিনের কথাটা আবার ভেসে ওঠে তার মনে। আবার সে নড়ে ওঠে। ধরিত্রীর সঙ্গে হলার যোগাযোগের কথা বাইরে রটল কীভাবে সে বুঝতে পারছে না। নাকি সেই জব্বার নামে ডাকাতছোকরা কিছু বলে ফেলেছে পুলিশের কাছে? সীমন্ত জব্বারের কথা বলেছিল মনে পড়ছে অরিত্রের। কিংবা নাকি বহরমপুর থেকে সুদীপন বিপ্রশেখরের কাউকে কিছু জানিয়েছে? ধরিত্রীর ওপর ভীষণ রাগ—সেটা অরিত্র সেদিন ভীষণভাবে টের পেয়েছিল। তা না হলে স্ত্রীর ভাইকে কেউ ওসব কথা বলে?

একটা স্বস্তির কথা, হলা বেঁচে নেই। আর ধরিত্রীও খুব সহজ মেয়ে নয়। অরিত্র তার বড়দিকে কাছে থেকে চেনে। সিগারেটটা পুড়ে এলে অরিত্র আবার একটা ধরিয়ে নিল।

আবছা আঁধার ঘনিয়ে এসেছে। বৃষ্টিটা একটু ধরেছে, এমন সময় ফিরে এল রিন। ছাতির আড়ালে তাকে আসতে দেখে অরিত্র একটু বিব্রত বোধ করছিল অন্য কেউ ভেবে।

রিনের হাতে এক গেলাস চা আর একটা বেঁটে হেরিকেন। শাড়িটা বদলেছে। কিন্তু চুলগুলো বাঁধেনি। বলল, 'ভাবছিলাম রাগ করে চলে গেছ নাকি। যেতে যেতেই ভিজে অসুখ হত। নাও, ধর গেলাসটা। আর দেশলাইটা ফেরত দাও। হেরিকেন জ্বালব।'

অরিত্র চায়ের গেলাস নিয়েই চুমুক দেয়। বলে, 'কেউ জিজ্ঞেস করল না কার চা?'

'জিজ্ঞেস করবে কেন? আমার চা—আমি খাব।'

'এই রে! তাহলে আমি যে এঁটো করে ফেললাম!'

হেরিকেন ধরাতে ধরাতে রিন মুখ টিপে হাসে। 'ঠাকমা টের পায়নি। ঠাকমাকে চা করে দিয়ে রান্নাঘরে বসে আমারটা খেয়ে বাকিটুকু নিয়ে এলাম।'

'বাবা নেই বুঝি?'

'বাবা বেজার বাড়িতে এখন মোসাহেবি করছে দেখ গে। ফিরবে সেই রাত নটা-দশটায়।'

'রিন, তাহলে আজ এক দারুণ সুসময়!'

রিন হেরিকেনটা ঘরে নিয়ে যেতে যেতে বলল, 'কিসের সুসময়?'

'ভালবাসা-টাসার আর কী!'

অরিত্র হাসছিল। ভেতরে রিন থমকে দাঁড়িয়েছে। একটু পরে অস্ফুট স্বরে বলল, 'হুঁ, বাসাচ্ছি!' তারপর চেঁচিয়ে উঠল প্রায়। 'এমা! দেখছ? এই জানলাটা দিয়ে জলের ছাঁট ঢুকে কী কাণ্ড করেছে! ইশ!'

ভেতর থেকে আবছা শব্দ শুনতে পাচ্ছিল অরিত্র। সীমন্তের বিছানা বইপত্তর দুপদাপ শব্দে সরাচ্ছে রিন। অরিত্র ভেতরে ঢুকে বলে, 'মন্তু ফিরে এসে তোমার লাস ফেলে দেবে কিন্তু!'

জিনিসপত্তর সরিয়ে টেবিলের কাছে ফিরে রিন হেলান দিয়ে দাঁড়াল। 'এবার বল, কী বলছিলে?'

'মন্তু তোমাকে মারবে।'

'না। তার আগে কী বলছিলে?'

'যাঃ! জাস্ট এ জোক!'

রিন অরিত্রের দিকে তাকিয়ে মুখ নামায়। আস্তে বলে, 'তোমাকে আমার বড্ড ভয় করছে কিন্তু। চা খেয়ে কেটে পড়। তুমি...'

'কী আমি?'

'হঠাৎ এসে খালি ঝামেলা কর কেন বল তো?'

অরিত্র চায়ের গ্লাস টেবিলে রেখে বলে, 'আশ্চর্য! কী ঝামেলা করি? কখন ঝামেলা করলুম?'

'একটু আগে তুমি কী বললে মনে করে দেখ।'

অরিত্র হাসল। 'ও! ভালবাসা-টাসা!'

ভেংচি কাটে রিন। 'তোমার মুণ্ডু! খালি যতসব অসভ্য কথাবার্তা—আমাকে একলা পেলেই।'

'একলা থাক কেন তুমি?'

'ইচ্ছে করে কেউ থাকে না একলা। আমি কি সবসময় হাজারটা লোক সঙ্গে নিয়ে ঘুরে বেড়াব?'

'তোমাকে দারুণ সুন্দর দেখাচ্ছে রিন!'

'দেখাবে। সন্ধেবেলা বৃষ্টির মধ্যে এমন নিরিবিলি ঘরে যেকোন মেয়েকে দারুণ সুন্দর দেখাবে।' বলে রিন চুলগুলো সামনের দিকে এনে ঝাড়বার চেষ্টা করে। তারপর চোখ বড় করে অরিত্রের দিকে তাকায়।

অরিত্র মুখে একটু ক্ষোভ ফুটিয়ে বলে, 'তুমি কি আমাকে তাই ভাব?'

রিন শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বলে, 'না।'তুমি ধোয়া তুলসীপাতা।'

অরিত্র উঠে দাঁড়ায়। পা বাড়িয়ে বলে, 'ঠিক আছে। চলি। আর কখনও আসব না তোমাদের বাড়ি।'

রিন ডাকে, 'শোন!'

অরিত্র ঘোরে না। দাঁড়িয়ে বলে, 'বল!'

'অত যদি, তুমি...তুমি আমাকে নিয়ে পালিয়ে যেতে পার?'

অরিত্রের মনে হয়, রিনের গরম শ্বাসপ্রশ্বাসে মাখা কথাগুলো তার ওপর আছড়ে পড়ল। সে দ্রুত ঘোরে। দেখে, রিনের চোখে বরাবর দেখা সেই অপার্থিব ক্রূর চাউনি, ঠোঁটের কোনায় অদ্ভুত বাঁকা হাসি, আর তার নাসারন্ধ্র স্ফীত। ভুরু কুঁচকে রয়েছে, কপালে সূক্ষ্ম গভীর এক রেখা। অরিত্র বলে, 'পালিয়ে যেতে চাও?'

মাথাটা একটু দোলায় রিন। হিসহিস করে বলে, 'বল, পার আমাকে নিয়ে পালাতে?'

'কোথায় পালাতে চাও? কেন?'

রিন মুখ নামায়। আবার ক্রূর ভাবটা ফিরে আসে তার মুখে। 'এই নোংরা পরিবেশে আমার একটুও থাকতে ইচ্ছে করে না। চারপাশে ছোললোক...ঝগড়াঝাটি...মারদাঙ্গা...আমার দম আটকে যায়।' একটু চুপ করে থাকার পর সে ফের বলে, 'বাবা তো বলেই দিয়েছে, বিয়ে-টিয়ে দিতে পারব না—নিজেই

কাউকে পছন্দ করে নিতে পারিস নিবি, নইলে যা খুশি করবি। মা বলেছে, মাসে-মাসে টাকা জমা। সেই টাকায় তোর বিয়ে দেব। ভারি তো একশটা টাকা!'

রিনের চোখ থেকে জলের ফোঁটা গড়িয়ে পড়ে। অরিত্র বলে, 'কিন্তু আশ্চর্য! বিয়ের জন্য তোমার এখনই মাথাব্যথা শুরু হয়ে গেছে!'

ঝাঁঝাল স্বরে রিন বলে ওঠে, 'না। এ তুমি বুঝবে না।'

'বুঝিয়ে বল!'

আবার একটু চুপ করে থাকার পর রিন বলে, 'আমার গাঁয়ে পচে মরতে ভাল লাগে না। যতটা লেখাপড়া শিখেছি, কোথাও কি এর চেয়ে ভাল একটা কাজ জুটবে না? আমি টাইপ শিখব। আমি...'

সে হঠাৎ থামলে অরিত্র একটু হাসে। 'তুমি এখনও নাবালিকা হয়ে আছ, রিন!'

'আছি তো আছি। কিন্তু তোমাকে চিনে নিয়েছি। ব্যস!'

'কেন পালিয়ে যাবার কথা ভাবছ? টাইপিস্টের কাজ করবে বলছ—বেশ তো! রোজ যাতায়াত করে বহরমপুরে টাইপ শিখে নাও। তারপর বাবাকে বল, ব্রজবাবুকে ধরে একটা টাইপিস্টের চাকরি জুটিয়ে দেবেন।'

রিন খাপ্পা হয়ে বলল, 'তোমার মাথায় এসব ঢুকবে না! যাও, তুমি কেটে পড়!'

অরিত্র হাসে। 'তাহলে পালিয়ে তুমি যাবেই—এই তো?'

রিন এগিয়ে এসে ওকে একটু ধাক্কা দিয়ে বলে, 'আমার খুশি। তুমি বেরও! আর কখনও এস না আমার সামনে!'

অরিত্র দুহাতে ওর দুটো বাহু ধরে ফেলে। তারপর জোরাল এক টানে ওকে নিজের শরীরের সঙ্গে মিশিয়ে দেবার চেষ্টা করে এবং দ্রুত ওর গালে একটা চুমু খেয়ে ফেলে। রিন হঠাৎ অবশ হয়ে পড়েছিল। নিজেকে ছাড়ানোর জন্য ধস্তাধস্তি করতে থাকে। অরিত্র আবিষ্ট কণ্ঠস্বরে বলে, 'কেন পালিয়ে যেতে হবে, রিন? পালিয়ে কোথায় যাবে? যেখানে যাবে, সেখানেই এরকম। তুমি কিছুদিন অপেক্ষা কর—আমি কথা দিচ্ছি তোমাকে। আমিই তোমাকে বিয়ে করব।'

'আঃ! ছাড় বলছি! আমি যেন যেন বিয়ের কথা বলেছি!'

'তবে কী?'

'এক কথা বার বার বলতে ভাল লাগে না!' ...বলে সে মুখটা নামায়। হঠাৎ ভেঙে পড়ে। অরিত্রের বুকে মাথা গুঁজে হু হু করে কেঁদে বলে, 'আমি এখানে থাকলে মরে যাব। বিশ্বাস কর! আমার এখানে থাকতে একটুও ইচ্ছে করে না!'

অরিত্র কী বলবে বুঝতে পারে না। বাইরে বৃষ্টি কমে গেছে। ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরছে। বাতাস থেমে গেছে। গাছের পাতা থেকে জল ঝরার ধারাবাহিক টুপ টুপ শব্দ শোনা যাচ্ছে। ভিটেমাটি, আগাছার বন, ধ্বংসস্তূপ আর অষ্টশিবের মন্দির ঘিরে ভিজে অন্ধকার থমথম করছে। দুহাতে রিনের মুখটা তুলে ভিজে ঠোঁটে ঠোঁট রাখে সে। রিন শান্তভাবে চুমুটা গ্রহণ করে। তারপরই ছিটকে পিছিয়ে গিয়ে ভাঙা গলায় বলে, 'আর না। ছেলেদের স্বভাব আমার জানা আছে।'

কয়েক সেকেন্ড তার দিকে তাকিয়ে থাকার পর অরিত্র বলে, 'আমার ইচ্ছে করছে না যেতে।'

'জানি। তুমি ভীষণ হ্যাংলা যে!'

বাড়ির দিক থেকে এইসময় কাঁপা-কাঁপা গলায় কার ডাক ভেসে আসে, 'রিনি রে! অ রিনা! রিনু!'

রিন হেরিকেন আর চায়ের গেলাসটা ঝটপট নিয়ে বলে, ঠাকমা ডাকছে! ইশ! একা আছে বেচারি। আর আমি এখানে আড্ডা দিচ্ছি!'

অরিত্র নিচে সাইকেল নামিয়ে বলে, 'কাদায় কেলেঙ্কারি হবে এবার। পিচরাস্তায় পৌঁছুতে জ্যাম হয়ে যাবে চাকা।'

রিন দরজায় তালা এঁটে বারান্দা থেকে বলে, 'ছাতিটা তোমার জন্য এনেছিলাম। নাও।'

'দরকার নেই। বৃষ্টি ততকিছু পড়ছে না।'

অরিত্র আগাছার জঙ্গল ভেঙে সাইকেল ঠেলতে ঠেলতে রাস্তায় নিয়ে যায়। তারপর একটু চমকে ওঠে। রিনের চুলের গন্ধটা তাকে এখনও জড়িয়ে ধরে আছে। এক আশ্চর্য ভিজে গন্ধ।

বৃষ্টি ছাড়লে গণমিত্র ফিরে এলেন বাইরে থেকে। বাড়ি নিঝুম অন্ধকার। 'ট্রান্সফর্মারে বাজ পড়ে জ্বলে গেছে, শুনলাম। থাক এখন কয়েক সপ্তা হাপিত্যেশ করে।' বোনকে শুনিয়ে ওপরে উঠে গেলেন টর্চের আলো ফেলতে ফেলতে। অভ্যাসমত 'অরু! অরিত্র!' বলে চড়া গলায় ডেকে ধরিত্রীর ঘরের সামনে গেলেন।

ভেতরে লণ্ঠন জ্বলছিল। ময়লা কাচের, এপাশ-ওপাশ থেকে হলদে রঙের খাপচা-খাপচা যেটুকু আলো ছড়াচ্ছিল, তাতে স্পষ্ট কিছু নজর হয় না। গণমিত্র ভুরু কুঁচকে দেখার চেষ্টা করেন ধরিত্রীকে। 'কই গো? কোথায় সব? এটা কে?'

গণমিত্র থমকে দাঁড়িয়ে ছেলেটিকে চেনবার চেষ্টা করেন। ছেলেটি অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। ধরিত্রী বলে, 'বসুন কাকাবাবু!'

সকাল থেকে জ্বরটা আর আসেনি ধরিত্রীর। শরীর ভীষণ দুর্বল। সে খাটে কয়েকটা বালিশে হেলান দিয়ে বসে আছে। শক্ত গড়নের ছেলেটি অরিত্রের বয়সী হবে। মাথায় খুঁটিয়ে কাটা চুল। পরনে প্যান্টশার্ট, খালি পা—জুতো বাইরে খুলে রেখে এসেছে। জানালার ধারে একটা চেয়ারে বসে আছে সে। গণমিত্র বলেন, 'একে তো চিনলাম না।'

ধরিত্রী বলে, 'আঃ! আপনি বসুন না।'

গণমিত্র খাটেই বসে পড়েন। কাঁধের ব্যাগে একগুচ্ছের 'গ্রামবার্তা'। ছড়িটা দুপায়ের ফাঁকে রেখে সন্দিগ্ধ দৃষ্টে ছেলেটির দিকে তাকিয়ে থাকেন।

ধরিত্রী বলে, 'এরই নাম জব্বার।' বলেই সে গণমিত্রের দিকে তাকিয়ে তাঁর মুখের ভাব লক্ষ্য করে। গণমিত্র চমকে উঠেছেন। তারপর ভুরু কুঁচকে কড়ে আঙুলের পাথর বসান আংটিটা খুঁটতে থাকেন। একটু পরে ধরিত্রী বলে, 'আজই জামিন পেয়েছে জজকোর্টে। তিলককে দিয়ে কেয়াতলায় খবর পাঠিয়েছিলাম। ঝড়বৃষ্টিতে আটকে গিয়েছিল। আধঘণ্টা আগে এসেছে।'

গণমিত্র হাসবার চেষ্টা করে বলেন, 'খানিকটা বাড়াবাড়ি হয়ে গেল বোধ করি।'

ধরিত্রী রুগ্‌ণ মুখে হাসল। 'হ্যাঁ। অরু বলে, আমি ডাকাতদের দল খুলেছিলাম।'

গণমিত্র জব্বারের দিকে তাকান। 'হ্যাঁ গো, তুমি নাকি পুলিসকে বলেছ, আমরা ছিলাম তোমাদের শেল্টার। এসব কী কথা বাপু? খামোখা ভদ্রলোকের ফ্যামিলিকে জড়িয়ে কী ডেঞ্জারাস সিচুয়েশান বাধিয়েছ বল তো!'

ধরিত্রী কিছু বলার আগে জব্বার মুখ নিচু করে বলে, 'জ্ঞানত কিছুই বলিনি। পুলিশ কীসব লিখে আমার সই করিয়ে নিয়েছে। মামলা কোর্টে উঠলে বলব, ওসব আমি বলিনি।'

'তাই যেন বল বাপু।' গণমিত্র একটু ইতস্তত করে ধরিত্রীকে বলেন, 'আর ওকে বসিয়ে রেখেছ কেন? রাত দশটা বাজতে চলল। কেয়াতলা ফিরবে কেমন করে?'

জব্বার একটু হাসে। 'সে ভাববেন না স্যার! আমরা হলাম রাতচরা জীব।'

'তা তো বটে, বাপু!' গণমিত্র একটু বিরক্ত হন। 'কিন্তু সদর দরজা দিয়ে বেরিও না। খিড়কি হয়ে নদীর বাঁধ ধরে যেও। ব্রিজের কাছে আজকাল পুলিশ রোঁদে ঘোরে। ব্রিজের তলা দিয়ে যেও।'

ধরিত্রী বলে, 'যাচ্ছে। কথা শেষ হয়নি। আপনিও বসুন একটু।'

গণমিত্র গুম হয়ে বলেন, 'কথাটা কী?'

'এদের গাঁয়ের আরেকজন ধরা পড়েছিল, সেই ছেলেটাকে দিয়ে ব্রজবাবুরা আমাকে জড়াতে চাইছে। শহিদুল বলে গেছে, ছেলেটাকে ব্রজবাবুর বাড়িতে দেখা গেছে কাল। আমি জব্বারকে বলছিলাম,...'

জব্বার ঝটপট বলে, 'ভাববেন না দিদি। সাবির আমার চাচাতো ভাই। আমার বাইরে যাবে না সে। তবু যদি যায়, নদীতে লাস ভাসিয়ে দেব।'

গণমিত্র আঁতকে ওঠেন। 'না না! অতকিছু করার দরকার নেই, বাবা জব্বার আলি! হিতে বিপরীত হবে। আসলে ভুলটা গোড়াতেই হয়ে গেছে। ধরিকে যে দোষ দেব, তার উপায় নেই। দোষ শেষ পর্যন্ত আমারই। হলা ছিল ইন্টারেস্টিং ক্যারেক্টার। ছোটবেলা থেকে অরুর সঙ্গে বন্ধুতা। মাঝে মাঝে আসত-টাসত এবাড়ি। সেইজন্য যখন অ্যাবস্কন্ড করে বেড়াচ্ছে, তখন দয়াপরবশ হয়ে ওকে কখনও-সখনও শেল্টার দিয়েছি। জাস্ট মানবিক কর্তব্যবোধ। ধর, অরুই যদি অমন হত, কী করতাম?'

জব্বার বলে, 'হলাদার শেল্টারের কথা শুধু আমিই জানতাম। সাবির কীভাবে জানল, বুঝতে পারছি না।'

গণমিত্র জিজ্ঞেস করেন, 'ওই ছোকরাও তো ধরা পড়েছিল ভাণ্ডারীর বাড়িতে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। সাবির, আমি, কেশেডাঙার মাধু আর রাধাঘাট কলোনির সতু।'

'মারধর নাকি প্রচণ্ড হয়েছিল!'

জব্বার হাসে। 'আজ্ঞে, প্রচুর। মারের মা-বাপ ছিল না।'

'হ্যাঁ গো, শরীর-টরীর এখন ঠিকঠাক হয়েছে তো? চলাফেরায় অসুবিধে হচ্ছে না তো?'

ধরিত্রী চুপচাপ কী ভাবছিল। শ্বাস ছেড়ে বলে, 'জব্বার, সাবিরকে তুমি আমার কাছে নিয়ে আসতে পার না?'

জব্বার একটু ভেবে নিয়ে বলে, 'চেষ্টা করব। কিন্তু ওর মতিগতি কেমন হয়ে আছে, বুঝতে পারছি না। তবে আগে কিছু বলব না। কেন জানেন দিদি? যদি বলি, ফুলশেখরের ধরিদি ডেকেছে, ও পুলিশকে জানিয়ে দিতেও তো পারে। তাই ওকে একটা কাজে যাচ্ছি বলে ডেকে আনব। রাত বেশি হতে পারে। এই জানলার নিচে থেকে ডাকব আপনাকে। একটু সজাগ থাকবেন কয়েকটা রাত্তির।'

'আচ্ছা। তুমি এস।'

'শুধু একটা কথা ছিল, দিদি!'

'বল।'

জব্বার উঠে দাঁড়ায়। একটু ইতস্তত করে বলে, 'মামলায় যা হবার হবে, ভাবি-টাবি না। যশবাবু মোক্তার বলেছেন, তোমরা বেজোবাবুর বাজি পোড়ানো দেখতে গিয়েছিলে। গণ্ডগোলের মধ্যে খামকা তোমাদের ডাকাত বলে মারধর করে কেসে জড়িয়েছে। এই পয়েন্টে আমাদের লড়তে হবে। কিন্তু...'

'বল না, কী বলবে?'

'পুলিশকে কিছু খাওয়াতে হবে, দিদি। পারেন যদি, কিছু সাহায্য করবেন।'

ধরিত্রী শুকনো হাসে। 'আমরা তো বড়লোক নই। তবু বলছ যখন, দেখব।...'

সাবধানী গণমিত্র জব্বারকে খিড়কির দরজা দিয়ে বের করে একটু দাঁড়িয়ে থাকলেন অন্ধকারে। কান খাড়া করে রইলেন। কোন সন্দেহজনক শব্দ না শুনতে পেয়ে আশ্বস্ত হয়ে ফিরলেন। 'দেখলে তো, এ তোমার আবার সাপ নিয়ে খেলা, ধরি! কী ডেঞ্জারাস এলিমেন্ট এরা, এবার আশা করি টের পেলে। তোমাকে এবার ব্ল্যাকমেল করতে থাকবে, সেই সুযোগ যেচে তুমি দিলে!'

ধরিত্রী গম্ভীর মুখে বলে, 'ব্রজবাবু আমাকে যখন জড়িয়েছে, তখন কিছু খেসারত দিতেই হবে।'

গণমিত্র দমে গিয়ে বলেন, 'তা না হয় মানছি। কিন্তু যে বিশুর জন্য খামোকা বেজার শত্রু হলে, সেই বিশুমাতালের কাণ্ড জান? তুমি তো এদিকে শয্যাশায়ী, আর আমি হারামজাদাকে উদ্ধারের জন্য দুবেলা বিপ্রশেখরে লোক পাঠাচ্ছি। কিছুক্ষণ আগে শুনলাম, আজ জজকোর্টে মিটমাট করে নিয়েছে। তার মানেটা কী দাঁড়িয়েছে বুঝতে পারছ? কার্যত সে নিজেকে রক্ষাকর রায়ের রক্ষিতার ছেলে বলে মেনে নিল। মাত্র হাজার সাতেক টাকায় নাকি রফা। তাও মাসিক কিস্তিতে চারশ কত টাকা করে যেন!'

'মিটমাট করে নিল বিশুদা' ধরিত্রী ফ্যাকাসে চোখে তাকায়।

গণমিত্র ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বরে বলেন, 'ওই মাতাল শুওরের বাচ্চাকে নিয়ে আবার আরেক দফা কেলেঙ্কারি রটল তোমার। আমি বুঝতে পারি না ধরি, কিছুতেই আমার মাথায় ঢোকে না, কেন পাঁক মাখতে তোমার এত আনন্দ?'

ধরিত্রী একটু উষ্ণ হয়ে বলে, 'নিজের কথা নিজেই ভুলে যাওয়া আপনার স্বভাব, কাকাবাবু! আমাকে পঞ্চায়েত ইলেকশানে দাঁড় করানোর সময় বলেছিলেন, এবার নোংরা পাঁক মাখবার জন্য তৈরি হও।'

'বলেছিলাম।' গণমিত্র সংযত হন। 'কিন্তু তার মানে এই নয় যে পাঁক দেখলেই সোজা নেমে যাবে।'

বাইরে থেকে সংঘমিত্রার ডাক শোনা গেল। 'তোমাদের মিটিং শেষ হল, ছোড়দা? আর কতক্ষণ আমি রান্নাঘর পাহারা দেব?'

গণমিত্র বেরিয়ে গেলেন। যাবার আগে জিজ্ঞেস করে গেলেন ধরিত্রী খেয়েছে নাকি, ধরিত্রী মাথা নাড়ল।...

বাড়িটা ক্রমশ গভীর নৈঃশব্দ্যে আর অন্ধকারে তলিয়ে যেতে থাকে। হেরিকেনের আলো নিভিয়ে ধরিত্রী চুপচাপ কিছুক্ষণ বালিশে হেলান দিয়ে বসে থাকে। যে কদিন জ্বর ছিল, সংঘমিত্রা এ ঘরে থেকেছেন। আজ ধরিত্রী বলে দিয়েছে, সে একা থাকতে পারবে। গায়ত্রী নিচের ঘরে এখনও পড়ছে। সংঘমিত্রা থাকেন ওঘরে। পরীক্ষার দিন যত এগিয়ে আসছে, গায়ত্রী তত বাইরের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করছে। বড়দির এত জ্বর গেল, বড়জোর দিনে একবার ওপরে এসে খোঁজ নিয়ে গেছে।

পাশের ঘরে অরিত্রের সাড়াশব্দ নেই। তিলক জব্বারকে পৌঁছে দিয়ে বাড়ি চলে গিয়েছিল। অরিত্রের এসব টের পাওয়ার কথা। কিন্তু সে এ ঘরে উঁকি মারতেও আসেনি। ধরিত্রী ভাবছিল, অরিত্রেরও জ্বর-জ্বালা নয়ত?

এই কয়েকটা দিন আর রাত বড় অস্থিরতায় কাটিয়েছে ধরিত্রী। বাইরের সঙ্গে সম্পর্কহীন হয়ে গিয়ে সে ক্ষোভে দুঃখে ছটফট করেছে। তিলককে বারবার ডেকেছে। তাকে মাঠে থাকতে হয়। তার কত কাজ। সন্ধ্যায় ফিরে বাবুদিদিকে খবর দিয়েছে মাঠঘাটের। খুঁটিয়ে কতকথা জিজ্ঞেস করেছে ধরিত্রী। সংঘমিত্রা বলেছেন, 'মাথা ধরবে আবার, অত কথা বলে না মা।' ধরিত্রী গ্রাহ্য করেনি। শহিদুল এসেছে দুবেলা। মামলায় হেরে প্রথমদিকে দমে গিয়েছিল খুব। আবার চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। সাঁওতালডাঙার রাস্তা একটু বাকি থেকে গেছে। এদিকে চাল-গমের স্টক শেষ। হরিমাটির রাস্তায় কালভার্ট তৈরির ঠিকে নিয়েছে তাহের ঠিকাদার। ভেকু ভটচাযের লোক সে। শহিদুল স্কুল কামাই করে ছাতিমাথায় দাঁড়িয়ে থাকে কালভার্টের কাছে। তাহেরের লোকেরা কতটা সিমেন্টে কতখানি বালি মেশাচ্ছে, কড়া নজর রাখে। ফিশারিজ প্রজেক্টটা স্যাংশান হয়েছে শুনে ধরিত্রী খুশি। বাগদিপাড়ার লোকগুলো দুমুঠো খেতে পাবে এবার। তবে এবছর মাটি তোলার কাজ শুরু করা যাবে কিনা সন্দেহ আছে। জেলাপরিষদের হাতে নাকি আরও কয়েকটা নতুন স্কিম এসেছে। শহিদুল শহরে যাবে কাল।...

দিনশেষে যে ঝড়টা এসেছিল, সেইরকম একটা ঝড় অন্ধকারে কিছুক্ষণ মাঠঘাট, পঞ্চায়েত, প্রজেক্ট এবং স্কিম, অসংখ্য মানুষজন নিয়ে ধরিত্রীর মনের ভেতর ঘুরপাক খায়। তারপর আস্তেআস্তে মিলিয়ে যায়। বাইরে বৃষ্টির স্বাদ পেয়ে অন্ধকার প্রকৃতি হৃদয় খুলে দিয়েছে যেন। গরমটা চলে গেছে। গাছপালা থেকে জল ঝরে পড়ার টুপটাপ শব্দটা আর শোনা যাচ্ছে না। ধরিত্রীর কানে আসে, লক্ষকোটি পোকা-মাকড়ের ডাক, মাঝে মাঝে ব্রিজের দিকে মোটর গাড়ির শব্দ। তারপর সে টের পায়, গভীরতর অন্য এক অন্ধকার থেকে তার দিকে কেউ হেঁটে আসছে। ধরিত্রী মন দিয়ে তাকে চেনার চেষ্টা করে। প্রচণ্ড জ্বরের ঘোরে সে একটা লোককে দেখতে পেত। লোকটা তাকে তাড়া করে বেড়াত অচেনা মাঠঘাট, জঙ্গল, ঘরবাড়ির ভেতর। বিশাল বন্যার জলের মধ্যে আঁকুপাকু করে সাঁতার কেটে পালাত ধরিত্রী। সেই লোকটাই।

সে কে হতে পারে, বোঝে না ধরিত্রী। অন্ধকারে তার পায়ের শব্দ শোনা যায়। ধরিত্রী অসহায় বোধ করে। পা ছড়িয়ে দিয়ে চিত হয়ে থাকে। তারপর মনে হয়, লোকটা তার বুকের ওপর বসে পড়েছে। দম আটকে যায় ধরিত্রীর। তখন নড়ে ওঠে।

তন্দ্রার ঘোর এসেছিল। কেটে গিয়ে পাশ ফিরে শোয় সে। চিত হয়ে ঘুমুনো অভ্যাস বরাবর। কিন্তু ভয়ে চিত হতে পারে না। বালিশে গাল রেখে সে ঘুমোবার চেষ্টা করে ফের।...

সকালে ধরিত্রী আস্তে আস্তে নিচে নামল। শরীর বেশ দুর্বল। বুনো পায়রার ঝাঁককে কয়েকমুঠো ধান ছড়িয়ে দিল। বাইরের ঘরে গেল। সেখান থেকে ভাঙা ফটকের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বৃষ্টির রসে রাতারাতি পৃথিবীর চেহারা বদলে রুক্ষ ক্ষয়াটে ভাবটা ঘুচে গেছে। সামনে একটু দূরে বড়রাস্তার ধারে কৃষ্ণচূড়ার লাল ফুল সকালের রোদে ঝকমক করছে। দলে দলে লোকেরা চলেছে হাতে শিশিবোতল আর টিন নিয়ে। অম্বুবাবুর দোকানে অনেকদিন পরে কেরোসিন এসেছে তাহলে।

একটু দাঁড়িয়ে থেকে বাড়ির পেছন ঘুরে ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে পুকুরের ধারে যায় ধরিত্রী। কালকের বৃষ্টিতে কিছু জল বেড়েছে। শ্যাওলা আর ঘাসের ভেতর একপাল হাঁস ভেসে বেড়াচ্ছে।

ঢিল কুড়িয়ে ছোঁড়ে ধরিত্রী। ছোটবেলার মত খেলতে ইচ্ছে করে। কিন্তু গায়ে জোর নেই, ঢিল হাঁসগুলোর কাছে পৌঁছয় না দেখে সে হাত ঝেড়ে ফেলে। তারপর বাঁশবনের পাশ দিয়ে হেঁটে শ্যাওড়াতলায় যায়। রাঙচিতা বেড়ায় ঘেরা কুমড়োখেতের কাছে দাঁড়িয়ে সে নদীর দিকে তাকায়। ঢালু হয়ে ধাপে-ধাপে নেমে গেছে কয়েক একর জমি। তারপর আবার একটু গা তুলেছে। তার শেষে নিচু বাঁধ। বাঁদিকে তাদের ঘাটের পাশে প্রকাণ্ড হিজল গাছের তলায় বিশ্ববন্ধু দাঁড়িয়ে আছে দেখে ধরিত্রীর মাথার ভেতরটা দপ করে জ্বলে ওঠে। ফুলশেখরের সীমানায় নির্লজ্জের মত চলে এসেছে কী সাহসে?

বিশ্ববন্ধু তাকে দেখতে পেয়েছে। হাত নেড়ে ডাকছে। ধরিত্রী ঘুরে দাঁড়াল। তারপর আস্তে আস্তে হেঁটে ভাঁটফুলের ঝোপ দিয়ে সোজা তাদের বাগানে ঢুকল। এতক্ষণে মাথা টলমল করছিল তার—নেশাগ্রস্তের মত। ঠাকুরবাড়ির খিড়কির দরজার সামনে গিয়ে মাথা ঘুরে উঠল। দেয়াল আঁকড়ে ধরে সে সামলে নিল। কপাটে ধাক্কা দিতে থাকল। সংঘমিত্রা একটু করে দরজা খুলে তাকে দেখে রাগ করে বললেন, 'জ্বর ছাড়তে না ছাড়তেই আবার বেরুনো হয়েছে? এ কী অদ্ভুত স্বভাব বাবা মেয়ের! এক্ষুনি দেখলাম ফটকের কাছে, আবার এক্ষুনি খিড়কিতে। চর্কির মতন।'

ধরিত্রী তাঁর পাশ কাটিয়ে বাড়ির ভেতর চলে যায়।

উঠোনে পায়রাগুলো তখনও ধান খুঁটে খাচ্ছে। মাথায় ঘোমটা টেনে তাঁদের খাওয়া দেখছে অনুকূল বাগদির বউ উমা। গণমিত্রই তার ঘোমটার কারণ। তিনি ধরিত্রীর দিকে হাসিমুখে একবার তাকিয়ে বেরিয়ে যান। ধরিত্রী বলে, 'কী গো?'

উমার শাড়িতে জলকাদার ছোপ। কাঁখে একটা মাটির হাঁড়ি। মিষ্টি হেসে বলে, 'পঞ্চাতদিদি পথ্যি করবে শুনলাম। তাই কয়েকটা কইমাছ নিয়ে এলাম। তো ঠাকরুন বলেন কী, টুকির মা আসুক, দাঁড়াও। আমি দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছি পঞ্চাতদিদি!'

'টুকির মা গেল কোথায়?'

সংঘমিত্রা পেছন থেকে বলেন, 'অরু বাজার যাবে না বলল। বহরমপুর চলে গেল। কী করব? টুকির মাকেই পাঠালাম। হাটতলায় কিছু পায়-টায় তো আনবে।'

ধরিত্রী বলে, 'অনুকূলদাকে একবার পাঠিয়ে দিও তো ওবেলা। বল, পুঁটিমারির জলা স্যাংশান হয়েছে। বললেই বুঝতে পারবে।'

আহ্লাদে নেচে ওঠে বাগদিবউ। 'অ্যাদ্দিনে ছেংছেন হ'ল তাইলে? শৈদুল মাস্টার তাই যেন মিটিং ডাকতে গিয়েছিল।'

ধরিত্রী দু হাঁটুতে দুই হাত রেখে ঝুঁকে বলে, 'দেখি তোমার কইমাছগুলো কত বড়?'...

দশ

কালবোশেখির স্বভাবই এই। কোনদিন বিকেলে, কোনদিন সন্ধ্যায়, আবার কখনও মাঝরাতে হঠাৎ-হঠাৎ এসে পড়ে। কখনও শুকনো তর্জন-গর্জন, কখনও ঝমঝম করে তুমুল বৃষ্টি। আউশ আর পাটের চারা হু হু করে বেড়ে উঠেছে। সবুজের গাঢ় ছোপ নদীর দুধারে ঝলমল করছে উজ্জ্বল রোদে। কয়েকটি দিনেই ধরিত্রী শরীরে জোর ফিরে পেয়েছে। আবার সে বাইরে ঘোরাঘুরি করে বেড়াচ্ছে—হরিমাটির মাঠে, সাঁওতালডাঙায়, নদীর ধারে বাঁধের পথে কতদূর। কখনও কাজে, কখনও উদ্দেশ্যহীন তার এই চলাফেরা। তার মধ্যে কয়েকবার তার চোখে পড়েছে, দূরে বিশ্ববন্ধু কোথাও-না-কোথাও দাঁড়িয়ে আছে। তার কাছে আসতে সাহস করছে না সে। দুদিন বাড়িতে এসেছিল রাতের দিকে। ধরিত্রী দেখা করেনি। একদিন সন্ধ্যায় তাকে বাজারের কাছে রাস্তায় মাতাল হয়ে পড়ে থাকতে দেখে থমকে দাঁড়িয়েছিল ধরিত্রী। হাতে টাকা পেয়ে প্রচণ্ড মদ খাচ্ছে বিশ্ববন্ধু। একবারের জন্য ধরিত্রীর ইচ্ছে করেছিল, ফুলশেখরের ছেলেগুলোকে হুকুম দেয় ওকে ব্রিজ পার করে বিপ্রশেখরের সীমানায় ফেলে দিয়ে আসতে। কিন্তু সামলে নিয়েছিল শেষ পর্যন্ত।

এদিন বিকেলে আকাশ পরিষ্কার। আবার ভ্যাপসা গরম পড়েছে দিনমান। শহিদুলের বাড়িতে গ্রাম পঞ্চায়েতের মিটিং বসবে সন্ধ্যার দিকে। ধরিত্রী তার আগে দক্ষিণমাঠে বীজধানের জমিটা দেখতে

গেল। জমিটা কুনাইপাড়ার গা ঘেঁষে। হাঁস-মুর্গির অত্যাচারে চারা গজাতে পায় না। তাই তিলক কষ্ট করে শেয়াকুলকাঁটার বেড়া দিয়েছে। মধ্যিখানে একটা কাকতাড়ুয়া দাঁড় করিয়ে রেখেছে। ধরিত্রী গিয়েই ঝামেলায় পড়েছে। তিলক তার বউকে সবসময় তক্কেতক্কে থাকতে বলেছিল। কাঁটা গলিয়ে মুর্গি ঢোকে জমিতে। চারা গজিয়ে গেছে। ধান-টান আর পায় না। কিন্তু ঠোঁট দিয়ে ঠুকরে কচি ডগাগুলো খেয়ে শেষ করে। তারপর মুর্গির যা স্বভাব! নখের আঁচড় কেটে ডানার ঝাপটানিতে গুঁড়ো মাটি উড়িয়ে দিয়ে গর্ত করে এবং ডিম পাড়ার ভঙ্গিতে বসে থাকে। অনেকটা জায়গায় চারা বলতে কিছু নেই। তিলকের বউ পাড়া মাথায় করে গাল দিচ্ছে আর শাপমন্যি করছে। অন্যপক্ষও থেমে নেই। হাঁসমুর্গির গায়ে তো কারুর নাম লেখা নেই। সেই ছুতো পেয়ে সুদামসখী পাল্টা চেঁচাচ্ছে। ধরিত্রীর কানে এল। ...'দিনদুপুরে তারা দেখেছে কিনা! বস্তা-বস্তা চালগম সাবাড় কচ্ছে আর ফুলে ঢোল হচ্ছে। জোর হবে না তো হবে কার? কিন্তুক তুই কার জোরে জোর কচ্ছিস লো? লজ্জা করে না? গলায় দড়ি জোটে না? আমি হলে কবে থুথু করে ছেড়ে আসতাম!'

ধরিত্রী থমকে দাঁড়ায় অশত্থগাছের আড়ালে। সুদামসখীর ননদ সরলা বলে, 'পিতিদিন খামকা এরকম গালমন্দ কি সহ্য হয় গো? ভেকুবাবুর কাছে পাড়ার সবাই মিলে কথাটা তোল—কবে থেকে বলছি! কারুর জ্বালায় দুটো হাঁসমুর্গি পোষা যাবে না, ই কী অত্যেচার বল দিকিনি? বেংকের নোল শুধতে হবে না? আমার অত বড় মোরগটাকে পাবড়া ছুঁড়ে খোঁড়া করে দিলে—তার বিচের হবে না?'

ধরিত্রী স্তম্ভিত হয়ে যায়। হাঁসমুর্গি আর ছাগল পোষার জন্য ব্যাঙ্ক থেকে টাকা পাইয়ে দিয়েছে সে। আর তাকেই উদ্দেশ করে এরা কী সব বলছে! সে পা বাড়াতে গিয়ে আবার দাঁড়িয়ে যায়। নড়বড় করে লাঠি হাতে এক বুড়ি বেরিয়ে চিলচেঁচানি চেঁচিয়ে বলে, 'বাবুরা সব একরা! নইলে অমন ভাতার-ছাড়া মেয়েকে মাথায় করে নাচে কেউ? বড় ঘরের বড় কথা। আমাদের ঘরের হলে অ্যাদ্দিনে চুলের ঝুঁটি ধরে বেন্দাবন পাঠিয়ে দিত!'

তিলকের বউ মঙ্গলা আকাশ ফাটিয়ে গর্জন করে। 'ওরে! ওরে থাম্ মাগীরা! এক্ষুনি যাচ্ছি বাবুদিদির কাছে। তারপর তোদের মাথার চুল একটা-একটা করে ছেঁড়াচ্ছি!'

তারপর সে হাতের ককিটা নাড়তে-নাড়তে পাশের চষা ক্ষেতের চাঙর থেকে ধুলোয় ধূসর বাচ্চাটাকে কোলে তুলে নেয়। বাচ্চাটা হাত পা ছোঁড়ে। খেলা ভাঙার দুঃখে কাঁদতে থাকে। মঙ্গলা ঠাস করে চড় মেরে কয়েক পা এগিয়েই দেখতে পায় ধরিত্রীকে। অমনি কেঁদে ওঠে। 'শুনলেন বাবুদি? শুনলেন ছোটলোকের মাগীদের কথা?'

ধরিত্রী আস্তে বলে, 'তুই বাড়ি যা তো বউ।'

ওখানে মেয়েগুলো ধরিত্রীকে দেখতে পেয়েছে। কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। ধরিত্রী শান্তভাবে এগিয়ে যায় তাদের দিকে। এবার কান্নার পালা সুদামসখীর। 'এই তো পঞ্চাতদিদি এসে পড়েছেন! বিচের করুন! আমার তিন-তিনটে ধাড়ী মুর্গিকে কঞ্চি মেরে মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে তেলকের বউ। বেংকের নোল ইবারে কী করে শুধব, তার বিচের করুন।'

লাঠিহাতে বুড়িটা ঘোলাটে চোখে তাকিয়ে দেখছিল ধরিত্রীকে। তাকে পুজোর আগে বার্ধক্যভাতা পাইয়ে দিয়েছে ধরিত্রী। সে হাঁ করে আছে। জিভটা কাঁপছে।

ধরিত্রী কী বলবে ভেবে পাচ্ছিল না। ক্ষয়াটে বাঁকাচোরা মাটির দেয়ালের ওপর কোনরকমে একটা ছাউনি। রুক্ষ শ্রীহীন আর জীর্ণ সংসারকে ভয়ঙ্কর চেহারা দিয়েছে জীর্ণ বাড়িগুলো। তার ভেতর থেকে একদঙ্গল নানাবয়সের মানুষ বেরিয়ে আসছে একটা করে।

কোন কথা না বলে সে সোজা হাঁটতে থাকে। শেষ বাড়িটার পাশ দিয়ে যাবার সময় কেউ তাকে ডেকে বলে, 'পেনাম গো পঞ্চাতদিদি'—তাড়ির নেশায় আচ্ছন্ন কোন মাতাল কণ্ঠস্বর। পিছু ফেলে না ধরিত্রী।

পুবের মাঠ ঘুরে নদীর বাঁধে গিয়ে দাঁড়ায় সে। তারপর সাঁওতালডাঙার দিকে ঘোরে। পড়ন্ত বিকেলে শিরিসতলায় মাদল বাজছে। ধরিত্রী কাকেও নাচতে দেখছিল না। দল বেঁধে বসে আছে ওরা। এক বুড়ো চার পায়ায় বসে ঘুমঘুম দুটো হাতে ক্লান্তভাবে চাঁটি মারছে মাদলটাতে। ধরিত্রীকে ওরা দেখেও দেখে না।

ভারি মন নিয়ে বাড়ি ফিরছিল ধরিত্রী। হৈদরের খালে গাছের গুঁড়ির ওপর দিয়ে ব্যালান্স রেখে হেঁটে গাবগাছটার তলায় পৌঁছে সে থমকে দাঁড়ায়। বিশ্ববন্ধু চুপচাপ বসে আছে বাঁধের ঘাসে। নিচে পা দুটো ছড়ানো। নদীর দিকে দৃষ্টি।

হঠাৎ ঘুরে ধরিত্রীকে দেখেই সে কাঁচুমাচু মুখে হাসে। 'মারবে না তো ধরি? ইচ্ছে হলে দুচার ঘা মারতেও পার, তবে বেশি মারলে মরে যাব। আমার শালা গায়ে একফোঁটা জোর নেই। কী যে হয়েছে!'

ধরিত্রী গম্ভীরমুখে পাশ কাটিয়ে যেতে যেতে বলে, 'রক্ষিতার ছেলের সঙ্গে আমি কথা বলি না!'

বিশ্ববন্ধু উঠে দাঁড়ায়। 'এ কি একটা হল, ধরি? রক্ষিতার ছেলেটা বুঝি মানুষ নয়? শোন, তোমার সঙ্গে ভেরি প্রাইভেট অ্যান্ড কনফিডেনশিয়াল কথাবার্তা আছে। অ্যাদ্দিন ধরে তোমার নাগাল পাবার চেষ্টা করছি, আর তুমি পাখির মত ফুড়ুৎ করে এগাছ থেকে ওগাছে পালাচ্ছ!'

ধরিত্রী জোরে হাঁটছিল। পায়ের শব্দে টের পায়, বিশ্ববন্ধু তার পেছন-পেছন আসছে। সে বলে, 'মাতলামি করলে নদীতে ছুঁড়ে ফেলব।'

'তার আগে কথাটা তো শুনবে, না কী?'

'শুনব না।'

'যা বাবা! তোমার ভালর জন্যই বলছি, আর বলে কী, শুনব না! বিস্তর স্ত্রীলোক দেখেছি বাবা, এ শালার মত একটাও দেখিনি!' বিশ্ববন্ধু টলতে টলতে হাঁটে ধরিত্রীর পেছনে। 'আমার মা রক্ষিতা ছিল তো ছিল—কার বাবার কী? বেশ করেছি। আমার মা আমার মা। স্বর্গে যাক, আর নরকে যাক্—আমার মা আমার মা। তো কথাটা হচ্ছে। তোমার ভীষণ বিপদ ধরি। তুমি শালা শিগগির কেটে পড় এখান থেকে। বুঝলে? অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল! কারণ ওরা তোমাকে...' নিজের গলায় ছুরি চালানোর ভঙ্গি করে বিশ্ববন্ধু 'হিস্' শব্দ তোলে।

ধরিত্রী দ্রুত ঘুরে দাঁড়ায়।

বিশ্ববন্ধু বলে, 'ভাগ্যিস তুমি আমাকে মামলা করতে বলেছিলে। তাই বেজাশালা আমাকে আটকে রেখেছিল বটে, মুণ্ডুটা কাটতে পারে নি। কাটলে ধরা পড়ে যেত। কিন্তু তোমাকে ছাড়বে বলে মনে হয় না।' সে হেসে ওঠে। 'ধুস্ শালা, কাকে কী বলছি!'

ধরিত্রী শক্ত মুখে বলে, 'তোমার ব্রজদাকে গিয়ে বোলো, ধরিত্রী গলা বাড়িয়েই আছে।'

'আরে বেজাশালাকে বলব কী? বেজা না। ওই যে কী নাম ব্যাটার—ভাসারাম! ভাসারাম ভাণ্ডারী!'

'কী বলছে সে?'

'ভাণ্ডারীর বাড়ি তুমিই নাকি ডাকাতের দলকে লেলিয়ে দিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ। দিয়েছিলাম।'

'ভাণ্ডারী বলেছে দিরেংকে। দিরেং বলেছে আমাকে।'

'কী বলেছে?'

'ধুস্ শালা! অত মনে নেই। তুমি এমন করে একা দোকা ঘুরো না বলে দিচ্ছি। ব্যস!'

ধরিত্রী ভারি একটা শ্বাস ফেলে আবার হাঁটতে থাকে। বিশ্ববন্ধু আসতে ছাড়ে না। ঘাটে পৌঁছে ধরিত্রী স্লিপার খুলে কাঠে দাঁড়িয়ে পা দুটো জলে ধুয়ে নেয়। বিশ্ববন্ধু বাঁধে দাঁড়িয়ে বলে, 'তোমার মাথার ভেতর কী যেন আছে মাইরি! আমি শালার না হয় যাবার জায়গা নেই কোথাও। কোথায়-কোথায় চক্কর মেরে ঘা-খেয়ে সেই ডোবায় পচতে এলাম। করবটা কী? কিন্তু ধরি, তোমার তো জায়গা আছে।'

ধরিত্রী তার পাশ কাটিয়ে বাড়ির দিকে হাঁটে। সূর্য ডুবে গেছে। ধূসর আলোয় কালো হয়ে আছে তাদের বাড়িটা গাছপালার ভেতর। এই মুহূর্তে বাড়িটা তাকে টানে। দিনশেষের পাখি যেমন করে গাছের দিকে উড়ে যায়, তেমনি করে এগিয়ে চলে ধরিত্রী। বিশ্ববন্ধু তার পেছন ছাড়ে না। 'অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল, ধরি! তুমি বহরমপুরে চলে যাও। খামকা যার-তার হাতে মারা পড়ে কী লাভ? মরে যাওয়া বড্ড বাজে ব্যাপার। দেখছ না? আমি মরে যাবার ভয়েই রক্ষিতার ছেলে হয়ে গেলাম। চাচা আপন প্রাণ বাঁচা! তাই না?'

ধরিত্রী রুষ্ট স্বরে বলে, 'কোথায় যাবে তুমি?'

'ধরি! ছোটলোক—কতকগুলো ইতর বদমাশের হাতে মরে যাবার জন্য আমারও জন্ম হয়নি, তোমারও জন্ম হয়নি। তুমি তোমার হাজব্যান্ডের কাছে ফিরে যাও। আজ সন্ধ্যাবেলাতেই বাস ধরে...'

ধরিত্রী আচমকা ঘুরে বিশ্ববন্ধুর গালে থাপ্পড় মারে। বিশ্ববন্ধু হাতটা ধরে ফেলে। হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ধরিত্রী হাঁফাতে হাঁফাতে বলে, 'গেলে এখনও? মাতালের মাতলামি ছাড়িয়ে দেব একেবারে! নাই পেতে পেতে একেবারে মাথায় উঠে বসেছে!'

বিশ্ববন্ধু ভাঙা গলায় বলে, 'তোর বরাবর এইরকম স্বভাব, শালা ধরি! একবার সিংহবাহিনীর বাড়িতে আমাকে লাথি মেরেছিলি। মনে পড়ছে? ঠিক আছে। মেরেছিস কলসির কানা তাই বলে কি প্রেম দেব না? আমি শালা তোকে চিরকাল প্রেম দিয়েছি, দেব।'

ধরিত্রী চড় তুলে বলে, 'আবার মাতলামি?'

বিশ্ববন্ধু হাসবার চেষ্টা করে। 'মনে করে দেখ্ ধরি, তুই আগেও আমাকে মেরে হাতের সুখ মিটিয়েছিস, এখনও মেটাচ্ছিস। কিন্তু আমি জিতে আছি কি না? কারণ—আমিই তোর লাইফে প্রথম পুরুষ। সে তুই জানিস আর আমি জানি! তখনও তোর ফ্রকপরা বয়স—ইটখোলার জঙ্গলের ভেতর দুপুরবেলা...'

ধরিত্রী তার পেটে একটা লাথি মারে। বিশ্ববন্ধু ঘাসের ওপর আছাড় খায়। তখন উন্মত্ত ধরিত্রী তাকে বারবার লাথি মারতে থাকে। বিশ্ববন্ধু হাত পা ছোড়ে আর ঘাসের ওপর গড়াগড়ি খেতে খেতে 'এই! এই!' করে চেঁচায়।

পড়ার ঘরে জানালা থেকে এই বিদঘুটে ব্যাপারটা চোখে পড়েছিল গায়ত্রীর। সে একটু হতভম্ব হয়ে থাকার পর পিসিমাকে ডাকে। সংঘমিত্রা দেখতে পেয়েই হন্তদন্ত ঠাকুরবাড়ি ঘুরে খিড়কি দিয়ে বেরিয়েছেন।

ধরিত্রী হাঁফাতে হাঁফাতে তাঁর পাশ দিয়ে ঢোকে। সংঘমিত্রা অবাক হয়ে দেখেন, বিপ্রশেখরের বিশু ঘাড় গোঁজ করে বসে আছে। মুখ বাঁকা করে চলে আসেন সংঘমিত্রা। নেমকহারাম মাতালকে মেরেছে, বেশ করেছে। তাঁরও ইচ্ছে করে, দুটো লাথি মেরে আসেন। নিজের মাকে রক্ষিতা বলে মেনে নিতে বাধেনি যার—মদ খাবার জন্য সামান্য কিছু টাকার লোভে, সে কি মানুষ?

উঠোনে গিয়ে সংঘমিত্রা দেখলেন, ধরিত্রী কলতলায় হাত-মুখ ধুচ্ছে। টুসির মা তফাতে দাঁড়িয়ে সভয়ে বারবার বলছে, 'আমি টিপে দিই বাবুদিদি'। ধরিত্রী কথা বলে না।

পা দুটো রগড়ে ধুয়ে স্লিপারে শব্দ করতে করতে ধরিত্রী ওপরে চলে যায়। সংঘমিত্রা ভাবছিলেন, জিজ্ঞেস করবেন কী হয়েছিল—পারেন না। গুম হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। একটু পরে ভাঙা গলায় বলেন, 'আলোগুলো জ্বেলে-টেলে দেবে না কী? হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছ যে সঙের মত?'

টুকির মা নড়ে ওঠে। বারান্দায় চারটে ছোটবড় হেরিকেন আর কেরোসিনের বোতল। সে কাচ পরিষ্কার করছিল এতক্ষণ।

সংঘমিত্রা পিদিম আনতে যান কুলুঙ্গি থেকে। উঠোনে ইটের মঞ্চের ওপর ঝাঁকড়া তুলসীগাছটা মানুষের চোখে তাকিয়ে উসখুস করছে। পড়ার ঘর থেকে বেরিয়ে আলো নিতে আসে গায়ত্রী। তার হাতে একটা শাঁখ। বারান্দার সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে সে শাঁখে ফুঁ দেয়। বাড়িতে সন্ধ্যার ছায়া ঘনিয়ে আসে নিঃশব্দে।...

ধরিত্রী খাটে পা দুটো ছড়িয়ে বালিশে হেলান দিয়ে বসে ছিল। টেবিলের ওপর লণ্ঠনের দম কমানো আছে। চায়ের কাপ রেখে গেছে টুকির মা। রাখাই আছে। কতক্ষণ পরে অরিত্র বাইরে থেকে ডাকে, 'বড়দি, শহিদুলদা এসেছে।'

'বলে দে, শরীর খারাপ।'

অরিত্র পর্দা তুলে উঁকি মারে। 'ঘোরাঘুরি, আবার জ্বর বাধালি নাকি?'

ধরিত্রী আস্তে বলে, 'তুই কোথায় ছিলি রে সারাদিন?'

'কেন? বহরমপুরে।'

'রোজই ওখানে কী কাজ থাকে তোর?'

'থাকে।' বলে অরিত্র চলে যায়।

সন্ধ্যার জরুরি মিটিঙে যায়নি বলে শহিদুল বুঝি উদ্বিগ্ন হয়ে ছুটে এসেছে। ভুরু কুঁচকে ঠোঁট বাঁকা করে ধরিত্রী তাকিয়ে থাকে দেয়ালের দিকে। শুধু আজ কুনাইপাড়ায় গিয়ে নয়, এতদিন ধরে এমনি করে তার কতবার না মোহভঙ্গ হয়েছে মানুষের ওপর। সে জানে, যে মানুষগুলোর জন্য সে নিজেকে লড়িয়ে দিতে চায়, আড়ালে তারাই তার নামে কতকিছু বলে। দূর থেকে তাকে দেখে কত কানাকানি করে এবং মুখ টিপে হাসে। ওরা ভাবে স্বামীকে ছেড়ে এসে কেমন স্বৈরিণীর মত সে ঘুরছে! পুরুষমানুষের কোঁদলে জড়িয়ে পড়েছে! তার ছাতি মাথায় দিয়ে মাটি কোপানো কাজ দেখতে এখানে-সেখানে টো টো করে ঘোরা, কখনও মাঠে গাছের তলায় বসে হাতে একমুঠো মাটি নিয়ে গন্ধ শোঁকা, নির্জনে নদীর বাঁধে দাঁড়িয়ে থাকা—সবই এদের কাছে ভারি অদ্ভুত ঠেকে। অথচ সে যদি পুরুষ হত! তাহলেই সাতখুন মাফ হয়ে যেত।

কিন্তু এরা তো জানে, সে ছোটবেলা থেকেই এরকম। তবু কেন তাকে নিয়ে মাথা ঘামায়? কতবার কত বন্যা এসেছে দড়কানদী ছাপিয়ে। রিলিফের নৌকোয় কাকাবাবুর সঙ্গে সে ঘুরেছে ত্রাণের কাজে। স্কুলবাড়ির মাঠে কোমরে আঁচল বেঁধে লঙ্গরখানার উনুনে কাঠ ঠেলেছে। খাদ্য বিলিয়েছে ক্ষুধার্তদের পাতে। সেবার বন্যায় কতদূর সাঁতার কেটে খবর পৌঁছে দিতে গিয়েছিল শহরে। নইলে আরও কত মানুষ ভেসে যেত। কত সংসার যেত ধুয়েমুছে। অথচ কেউ মনে রাখে না এসব কথা। স্বামীর ঘর থেকে চলে আসাটাই এদের কাছে বড় হয়ে উঠেছে।

চোখ ফেটে জল আসে ধরিত্রীর। হলার জন্য তাকে ভাণ্ডারি নাকি খুন করবে বলে চক্রান্ত করছে। ধরিত্রী কি জানত যে হলা ভাণ্ডারির বাড়ি ডাকাতি করবে? হলাকে সে কোনদিন ডাকাতির প্ররোচনা তো দেয় নি, বরং বলেছে, 'এভাবে বাঁচা যায় না হলা। তুই কলকাতা চলে যা। ফুটপাতে গেঞ্জি বেচে পয়সা রোজগার কর।' হলা রাগ করে বলত, 'তুমি ধরিদি মাইরি বড্ড ন্যাকামি কর মাঝে মাঝে। দুনিয়াসুদ্ধু শালারা দুহাতে লুঠপাঠ করে খাচ্ছে, আর আমার বেলায় তুমি ফুটপাত দেখাচ্ছ।' বহরমপুরে থাকার সময় হলা যখন-তখন লুকিয়ে তার কাছে চলে আসত। ধরিত্রী বলত, 'কী রে? আবার এলি কোনমুখে? বলেছি না? মস্তানি না ছাড়লে তোর মুখ দেখব না?' হলা হাসত। 'তোমার কাছে আসি কেন জান ধরিদি? ইন্সপিরেশন পাই। বিশ্বাস কর। যতবার তোমার কাছে আসি, খানিকটা করে পাওয়ার নিয়ে যাই চার্জ করে। তুমি আমার পাওয়ারসেন্টার।' কেন বলত একথা সে?

ধরিত্রী ফুলশেখরে আসার পর এক বৃষ্টির সন্ধ্যায় হঠাৎ কোত্থেকে হলা হাজির। একটু ভয় পেয়েছিল ধরিত্রী। সদ্য বিন্ধ্যপুরে ডাকাতিতে ওর নাম রটেছে। দিনদুপুরে ডাকাতি করেছে বাজারের একটা আড়তে। ধরিত্রী গুম হয়ে ভাবছিল, কখন চলে যাবে। যাবার নাম করল না সে। খাওয়া-দাওয়ার পর বলল, 'রাত্তিটা থাকব ধরিদি। বৃষ্টিতে ভিজলে মাথা ধরাটা বেড়ে যাবে।' গণমিত্র অদ্ভুত প্রকৃতির মানুষ। হলার ওপর তাঁর কেমন যেন একটা বীরপূজার ভাব ছিল—কথাবার্তায় টের পেত ধরিত্রী। গণমিত্র পরামর্শ দিয়েছিলেন, ঠাকুরবাড়ির ওই ঘরটা খালি পড়ে আছে। নিরিবিলি জায়গা। ওঘরেই হলার শোবার ব্যবস্থা হয়েছিল। তারপর হলা সেটাকেই তার রাতের আস্তানা করে ফেলেছিল। গণমিত্র বলতেন, 'আজকাল তো আর আগের মত লেঠেল পোষা যায় না। নইলে পুষতাম। যখন ইউনিয়নবোর্ডের প্রেসিডেন্ট ছিলাম, বাছাই করা লোক পুষেছিলাম। পাবলিকের কাজে নামতে হলে এসব জিনিস দরকার। হলাকে কখন দরকার হবে, বলা যায় না। এ যুগের গ্রামে টিকে থাকতে হলে হলা অ্যান্ড কোং হচ্ছে মাস্ট!'

অথচ গণমিত্র মোটেও ধুরন্ধর প্রকৃতির মানুষ নন। মামলাবাজ নন। কস্মিনকালে সরাসরি কারও সঙ্গে সংঘর্ষে নামেন নি। সুদীপন হয়ত ঠিকই বলেছিল, 'কাকামশাই বস্তুত এক ডনকুইকজোট!' ধরিত্রী চটে গিয়েছিল। কিন্তু এতদিনে মনে হয়, ঠিকই বলেছিল সুদীপন।

হলা ইদানিং এসে বলত, 'আমার মাথায় কী যেন হয়েছে ধরিদি। যখন তখন ভীষণ মাথা ধরে কেন বল তো? ভাবছি, টাকাকড়ি যোগাড় করে কলকাতা গিয়ে দেখাব।'

ধরিত্রী বলত, 'ডাকাতি করে অত টাকা পাস্। কী কারস সেগুলো?'

হলা একটু হেসে বলত, 'ধুস! তত বড় কেস কোথায় পেলাম? আদ্ধেক চলে যায় মুরুব্বিদের পকেটে। দলে একগাদা লোক। ডিসট্রিবিউট করে তেমন কিছু হাতে থাকে না। বলবে, তাহলে কেন এপথে নেমেছ? এ এক নেশা মাইরি ধরিদি। হাত নিস্‌পিস করে। শালারা খুনের সংসার জাঁকিয়ে তুলেছে। লোকের হরেহদ্দে খেয়ে আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়েছে। দাও শালা গোড়ায় ড্যাগার চালিয়ে। আমার এতেই সুখ। তারপর বিরক্ত মুখে বলত, 'পাড়াগাঁয়ে পোষাচ্ছে না। কেটে পড়তে হবে শিগগির। নৈহাটিতে আমার এক চেনাজানা লোক আছে। ডেকেছিল, যাইনি। এবার ভাবছি যেতেই হবে।'

হলা শেষবার এল মাসখানেক আগে। জ্যোৎস্না ছিল সে-রাতে বারটা অবধি ঠাকুরবাড়ির ঘরে ধরিত্রী তার সঙ্গে কথা বলেছিল। কোন বাতি ছিল না ঘরে। জানালা দিয়ে জ্যোৎস্না এসে পড়েছিল। হলা সুদীপনের কথা বলতে চাইছিল। ধরিত্রী অন্য কথা তুলে চাপা দিচ্ছিল। একটু পরে হলা বলল, 'আমার সত্যি আর এসব ভাল লাগছে না ধরিদি! হঠাৎ ইচ্ছে করে, ধরা দিই পুলিশের কাছে।'

ধরিত্রী বলেছিল, 'কেন রে? দম ফুরিয়ে গেল বুঝি?'

'হয়ত। আর দেখ ধরিদি, আজকাল খালি আমার ভাবনা হয়, দলের লোকেই আমাকে ধরিয়ে দেবে। কাউকে বিশ্বাস করতে পারি না। তার ওপর শালা এই মাথায় অসুখ।'

'তুই কলকাতা চলে যা। ভাল ডাক্তার-টাক্তার দেখা!'

'তুমি ডাক্তারের মেয়ে হয়েও কেন ডাক্তারি পড়নি ধরিদি।'

'বাজে কথা রাখ। যা বলছি শোন্।' ধরিত্রী একটু ভেবে বলেছিল, 'আমার টাকা থাকলে তোকে দিতাম।'

'পঞ্চায়েতে ঢুকে কত ইঁদুর মোষের মত মোটা হয়ে গেল। তুমি কী করলে বল তো মাইরি?'

'বাঁদরামি করিস নে! আমি কি তোর মত চোরডাকাত?'

'তুমি আমাকে চোরডাকাত বললে কষ্ট হয়, ধরিদি। তুমি কি জান না, আমি চুরি-ডাকাতি করতে চাইনি? একটা চাকরি পেয়ে গেলেই আমি হয়ত এপথে আসতাম না।'

'বাজে কথা বলিস নে তো! অসংখ্য ছেলে চাকরি না পেয়েও তোর মত ডাকাতি করে বেড়ায় না।'

হলা হাসল। 'বেড়ায়। বেড়াচ্ছে। তুমি সব খবর রাখ না, ধরিদি। আর ডাকাতি করতে কি তুমি ভাব সবাই পারে? সাহস আর ক্ষমতাও থাকা চাই। তাই সবাই পারছে না। কিন্তু একদিন না একদিন পারবে। যখন মরিয়া হয়ে উঠবে, তখন পারবে। ভেবে দেখ, আমি কী ছিলাম? আমার শরীরে কত জোর আছে ভাবছ তুমি? আসল জোর আর্মসে।'

তারপর হলা শার্টের ভেতর থেকে যে জিনিসটা বের করেছিল, জানালা দিয়ে এসে পড়া জ্যোৎস্নায় তা দেখে ধরিত্রী চমকে উঠেছিল। 'পিস্তল! এ তুই কোথায় পেলি রে?'

'ইচ্ছে করলেই পাওয়া যায়।' হলা অস্ত্রটা বালিশের পাশে রেখে বলেছিল, 'এটা পিস্তল নয়, রিভলবার। আর ওই কিটব্যাগটা দেখছ, ওতে গোটাপাঁচেক পেটো আছে। পেটো বোঝ? বোমা।'

'সর্বনাশ! ওই নিয়ে তুই ঘুরিস? হঠাৎ যদি ফেটে যায়?'

'নাঃ। ফাটবে না। সময় হলে তবে ফাটবে—আমার ইচ্ছে হলে, তবে তো?'

'হলা! তুই ওগুলো নদীতে ফেলে দিয়ে আয়, ভাই! লক্ষ্মীটি, কথা শোন!'

'হুঁউ। বেশ বলছ। তারপর হঠাৎ পুলিশ আসুক আর আমি...যাও! শোও গে। আমার ঘুম পাচ্ছে।'

ধরিত্রী একটু চুপ করে থাকার পর বলেছিল, 'তুই এখনও সেই ছেলেমানুষ হয়ে রইলি হলা! তোর জন্য সত্যি আমার দুঃখ হয়, জানিস? যেহাতে তুই একসময় আমার জন্য তোর বাবার বাগান থেকে ফুল এনেছিস, সেই হাতে তুই রিভলবার দেখাচ্ছিস! ছিঃ! হলা, তুই এমন হয়ে গেলি কেন রে?'

হলা শুয়ে পড়েছিল। চোখ বুজে বলেছিল, 'মাথাটা আবার ধরে গেল। খামকা বকবক করা!'

ধরিত্রীর একবার ইচ্ছে করেছিল মাথাটা টিপে দেবে। কিন্তু ইচ্ছেটা দমন করেছিল। কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থাকার পর চাপা নিঃশ্বাস ফেলে সে উঠে দাঁড়িয়েছিল। দরজাটা বাইরে থেকে আস্তে করে ভেজিয়ে চলে এসেছিল। সেরাতে ভাল ঘুম হয়নি ধরিত্রীর। বারবার তার মনে হচ্ছিল, হলা

বিপন্ন। মাথাধরার যন্ত্রণায় হয়ত ছটফট করছে। তাকে এই ঘরে নিয়ে এসে এই খাটে শুইয়ে দিলে যেন অস্বস্তি আর কষ্টটা চলে যেত ধরিত্রীর।

সেরাতে হলাকে ভারি অসহায় মনে হয়েছিল কেন, আজও বুঝতে পারে না ধরিত্রী। এতদিন পরে তার চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ে। খালি মনে হয়, হলা বেঁচে থাকলে তার কোন কাজে লাগত। যতদিন হলা বেঁচে ছিল, ততদিন ধরিত্রী কত উদ্যমে ছোটাছুটি করে বেড়িয়েছে। সে কি হলা ডাকাত-গুণ্ডা ছিল বলেই? বহরমপুরে কলেজের ছাত্র হলা যখন তার বাবার বাগান থেকে একরাশ ফুল নিয়ে এসে হাসিমুখে উপহার দিত, তখনও কি ধরিত্রী চঞ্চল হয়ে উঠত না খুশিতে? গঙ্গার ধারে হলার সঙ্গে সন্ধ্যায় বেড়াতে বেরিয়ে আনমনে তার কাঁধে হাত রাখত, তারপর একটু বিব্রত বোধ করত বটে, কিন্তু ধরিত্রীর কি মনে হত না এই কালো ছিপছিপে গড়নের ছেলেটি—সুন্দর চোখ তুলে যখন তার দিকে তাকিয়ে বলেছে, আপনার মত মেয়ে খুব কম দেখেছি—তখন সে সরলভাবেই বলেছে? সেদিন অরিত্র তাকে চার্জ করছিল, 'হলার সঙ্গে তোর কিসের সম্পর্ক ছিল?' সম্পর্ক ছিল বিশ্বাসের। পারস্পরিক গভীর এক বিশ্বাসের। ধরিত্রী যে ফুলশেখরে চলে আসবে চিরদিনের মত, সে শুধু হলাই জানত।...

সংঘমিত্রা এসে ঘরে ঢুকলে ধরিত্রী দ্রুত চোখ মুছে সোজা হয়ে বসে। সংঘমিত্রার চোখে পড়েছে, ধরিত্রী চোখের জল মুছল। একটু ইতস্তত করে টেবিলের কাছে এগিয়ে যান। দম তুলে দেন লণ্ঠনের। তারপর বলেন, 'চা খাস নি দেখছি?'

'নাঃ। ভাল লাগে না।' ধরিত্রী একটু হাসবার চেষ্টা করে। রাতে কী রাঁধলে পিসিমা? আমার অবশ্য কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না।'

সংঘমিত্রা একটু তফাতে খাটে পা ঝুলিয়ে বসেন। 'বিশুকে মারছিলি কেন রে?'

'ছেড়ে দাও ওর কথা! যখন-তখন মাতলামি করতে আসে।'

'শইদুল এতক্ষণ নিচে আমার সঙ্গে গল্প করছিল। বললাম, শরীর ভাল না। ও সকালে আসবে বলে চলে গেল।'

'কী বলছিল শহিদুল?'

'মিটিঙে যাসনি। সবাই ভেবেছে, ব্রজবাবুর সঙ্গে ভেতর-ভেতর মিটমাট করে নিয়েছে কাকা-ভাইঝি।'

'তাই বলল নাকি?'

সংঘমিত্রা একটু চুপ করে থাকার পর বলেন, 'তোকে একটা কথা বলি, ধরি! তুই একা তো এ গাঁয়ের মেয়ে নোস, আমিও এই গাঁয়ে জন্মেছিলাম। স্বামীর সংসার করেছি মোটে সাতটা বছর। মনেও পড়ে না কিছু। এই সংসারের ঝড়ঝাপটার মধ্যেই টিকে আছি। কিন্তু এই যে তুই এত বাইরে ঘুরিস, লোকজনের সঙ্গে মিশিস—তবু বলব, তুই এদের চিনতে পারিস নি, মা। ঘরে থেকেই আমি যতটা চিনি, তুই তার সিকিও চিনিসনে।'

'হঠাৎ আবার পুরনো ধুয়ো গাইতে এলে কেন গো?'

'তুই আমাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করতে পারিস। আমি তোর মত লেখাপড়া শিখিনি। তখন তেমন সুযোগও ছিল না। তাছাড়া ভদ্রলোকের বাড়ির মেয়েরা এমন বাইরে বেরুত না। কিন্তু এতে কোন শান্তি নেই, ধরি। কোন শান্তি নেই!'

'কিসে আছে বল তো শুনি?'

'তুই হাসিসনে ধরি, গা জ্বলে যাচ্ছে।' সংঘমিত্রা শক্ত মুখে বলেন, 'তুই তো পাষাণ মেয়ে। আমার রক্তমাংসের শরীর। টুকির মায়ের মুখে কত কথা শুনতে পাই, আর লজ্জাঘেন্নায় রাগে ছটফট করে মরি। কেন আমাকে এসব শুনতে হবে? আমি তোদের সংসারে আর থাকব না। কেন থাকব?'

'আহা, হয়েছে কী বলবে তো?'

'তুই বুঝতে পারিস নে? কচি মেয়ে তুই? তোর বয়সে ভদ্রলোকের মেয়েরা কী ভাবে আছে, আর তুই কীভাবে আছিস ভেবে দেখ তো?'

ধরিত্রী মুখ নামিয়ে বলে, 'বেশ। বল কী করব?'

সংঘমিত্রা শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বলেন, 'আগের মত বয়স আর গায়ের জোর থাকলে তোর চুলের

ঝুঁটি ধরে মারতে মারতে বহরমপুরে রেখে আসতাম। এত কেলেঙ্কারি—মিথ্যে হোক সত্যি হোক, রটেছে তো বটে। কোন মুখে অস্বীকার করবি তুই? অথচ তার পরও ভালমানুষের ছেলেটা এসে মাথা ভেঙে যাচ্ছে! ধিক তোকে ধরি!'

ধরিত্রী শান্তভাবে বলে, 'জ্বালিও না তো পিসিমা! আমার শরীর ভাল না।'

'পরশু গরির সঙ্গে জামাইবাবুর দেখা হয়েছে কত দুঃখ করে বলেছে...'

'পিসিমা!'

সংঘমিত্রা চটে বলেন, 'গলা শোন! মারবি নাকি? তোদের সংসারে পড়ে-পড়ে এমনিতেই মার খাচ্ছি, হাতের ঘা মারতে বাকি ছিল। তাও মার! তাই বলে উচিত কথা বলতে ছাড়ব ভেবেছিস?'

অরিত্র ঘরে ঢুকে বলে, 'সত্যি, তোমার বুদ্ধিসুদ্ধি আর নেই পিসিমা। চলে এস! আমার খিদে পেয়েছে!'

সংঘমিত্রা হাত নেড়ে বলেন, 'নিজের হাতে বেড়ে নাও গে সব। আর আমি তোমাদের সাতেপাঁচে নেই।'

অরিত্র ওঁকে টানাটানি করে নিয়ে যায়। বাইরে কতক্ষণ গজগজ করেন সংঘমিত্রা। তারপর বাড়িটা আবার অন্ধকারে ঝিম ধরে থাকে।

ধরিত্রী ঘরে থেকে বেরিয়ে চিলেকোঠার সিঁড়ি বেয়ে ছাদে যায়। আলিসায় হেলান দিয়ে নক্ষত্র দেখতে থাকে। জ্বরের ঘোরে দেখা একটা বিশাল কালো মানুষ—যে তাকে তাড়া করে বেড়াচ্ছিল, তাকেই খোঁজার মিথ্যা চেষ্টা করে রাতের নক্ষত্রপুঞ্জে। দূরে নদীর ব্রিজে আলো ছুড়তে ছুড়তে একটা মোটর গাড়ি আসছিল। ফুলশেখরে ঢুকে নিঃশব্দ হয়ে গেলে ধরিত্রীর বুকটা একবার ছ্যাঁৎ করে ওঠে। সে নিচের অন্ধকার ফটকের দিকে ঘুরে দাঁড়ায়। ওৎ পেতে থাকা নিষ্ঠুর শত্রুর মত দম বন্ধ করে কারুর প্রতীক্ষা করে ধরিত্রী।...

সীমন্ত যে পুলিশের ভয়ে মামাবাড়ি গিয়ে বসে আছে, অরিত্রের তা জানতে বেশ দেরি হয়েছিল। রোজ একবার করে বিপ্রশেখরে সীমন্তের খোঁজে গিয়ে রিনের সঙ্গে কিছুক্ষণ এলোমেলো কথাবার্তা, এবং সুযোগ পেলে একটু-আধটু চুমু খাওয়া—কিংবা কোনদিন বহরমপুরে একে-একে গিয়ে সিনেমা দেখার আনন্দ। অরিত্র এসব ব্যাপার নিষিদ্ধ ধরনের একটা খেলা বলেই ধরে নিয়েছিল। রিন বউ হিসেবে তার কতটা পছন্দসই, তাও ভাবেনি। তারপর রিনের কাছে যেদিন সীমন্তের পালিয়ে থাকার কথা জেনেছে, সেদিন থেকে ওদের বাড়ি যেতে তার বড় অস্বস্তি। এদিকে গতকাল রিনের মা ফিরে এসেছেন। আগের মত বাড়ির পেছন দিকে সীমন্তের সেই নিরিবিলি ঘরে রিনের সঙ্গে আড্ডা দেওয়া বন্ধ। একটু দাঁড়িয়ে সীমন্তের মিথ্যা খোঁজখবর নিয়ে চলে এসেছে অরিত্র।

সিনেমা দেখার ছলে রিনেরও দুদিন অন্তর বহরমপুরে ছুটে যেতে বাধা এখন। তার মায়ের ততকিছু কড়াকড়ি নেই। তবু সন্দেহ জাগতেও তো পারে। বাবাকে বা ঠাকমাকে রিন গ্রাহ্যের মধ্যে আনে না। কিন্তু মায়ের প্রতি সীমন্তের মতই রিনের খানিকটা ভয়-ভক্তি আছে।

ব্রিজের রেলিঙে একপা ঠেকিয়ে অরিত্র সাইকেলের সিটে বসে নদী দেখছিল। অনেকটা দূরে দক্ষিণের ভাঁটিতে সেই বাঁধটা জলের চাপে ভেঙে গেছে। প্রতি বছর পরপর বৃষ্টি হলে গাঢ় ঘোলাটে জল দূর থেকে ছুটে এসে প্রথমে বাঁধ উপচে জলপ্রপাতের মত পড়তে থাকে। তারপর আস্তে আস্তে বাঁধটা গলে যায়। ডালপালা, কাঠের খুঁটি প্রচণ্ড স্রোতের ধাক্কায় ভেসে যায়। ভিড় করে দুপারে দাঁড়িয়ে লোকেরা এই সুন্দর ধ্বংস তরিয়ে তরিয়ে দেখে।

এখন নদীর তলায় ঘোলাটে জলের স্রোত বয়ে যাচ্ছে। অরিত্রের ঘাটের নিচে থকথকে কাদা। বর্ষা যতদিন না আসবে, তার ঘাটে জল উঠবে না। ভরা বর্ষায় তার ঘাটটাও তলিয়ে যাবে। সেই প্রকাণ্ড গুঁড়িটাও যাবে ভেসে। তারপর শীতের মাঝামাঝি আবার একটা গাছের গুঁড়ি যোগাড় করবে অরিত্র। সাঁওতালডাঙার কাছে আবার বাঁধ দেবে দুপারের লোকেরা। আবার নদীর বুকভরা জলের হলুদ রঙ বদলাতে থাকবে। নীলচে হয়ে যাবে আকাশের মত। বছরের পর বছর এরকম।

বিপ্রশেখরে যাবে বলে ঝোঁকের মাথায় বেরিয়ে অরিত্র ব্রিজে এসে সাইকেল থামিয়েছে। শূন্য দৃষ্টে নদীর তলায় হলুদ জলস্রোতের দিকে তাকিয়ে ভাবছিল সীমন্তদের বাড়ি আর কোন অজুহাতে যাওয়া

চলে। নটা বেজে গেছে প্রায়। এতক্ষণ ফুডসেন্টারে রিনের কাজ শেষ। ক্লান্ত রিন হয়ত এখন কোমরে জড়ানো আঁচল খুলে আস্তে আস্তে হেঁটে আসছে বাড়ির দিকে। বকুলগাছটার তলায় এসে তাকে একদিন মুঠোভরে বকুলফুল কুড়োতে দেখেছিল অরিত্র। আপন মনে রাস্তায় ছড়াতে ছড়াতে হাঁটছিল। হঠাৎ সামনে অরিত্র সাইকেলের ব্রেক কষতেই সে চমকে কাঠপুতুল। তারপর ভুরু কুঁচকে বলেছিল, 'যাঃ। মিছিমিছি...'

অরিত্রের মনটা খারাপ হয়ে যায়। রিনের ভিজে চুলের সেই গন্ধটা যখন-তখন তাকে পেয়ে বসে। সিনেমা হলের অন্ধকারে কতবার সে লুকিয়ে রিনের চুলের গন্ধ শুঁকেছে। সেই ভিজে-ভিজে আশ্চর্য গন্ধটা কিন্তু পায়নি। হয়ত ওই গন্ধটা অন্য এক রিনের। যে রিন ঝড়ের মুখোমুখি আকাশে মুখ তুলে দাঁড়িয়ে ছিল, বিদ্যুৎ ঝলসে দিচ্ছিল তার হালকা নরম শরীর, ঠোঁটে বৃষ্টির ফোঁটা ছিল—সে রিন হয়ত পৃথিবীর মেয়ে নয়। গাজনের দিন বুড়োশিবের মন্দিরতলায় বলির রক্ত তুলে কপালে ফোঁটা দিতে দেখেছে যে-রিনকে, তাকে যেদিন প্রথম চুমু খেল—সেদিন থেকেই অরিত্রের মনে হয়েছে, এক নিষিদ্ধ খেলার মাঠে নিজের অজান্তে ঢুকে পড়েছে সে।

একটু পরে অরিত্র মুখ তোলে। বিপ্রশেখরের আকাশে গনগন সূর্য। নদীর ওপার থেকে ওই রোদ-ঝলমলে গ্রাম তাকে হাতছানি দিচ্ছে যেন। সে প্যাডেলে চাপ দেয়। সামনে থেকে পুবের হাওয়া ঝাঁপিয়ে আসে। ঢালু রাস্তায় সামনে ঝুঁকে সাইকেল চালায় অরিত্র। বিপ্রশেখরের মাটিতে পৌঁছুলে কেউ তার নাম ধরে ডাকে। সাইকেল থামিয়ে ঘুরে দেখে। কয়েকটা চেনা ছেলে চায়ের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

বিপ্রশেখর গ্রামের এদিকটায় ব্রিজের ঢালুতে ওপারের ফুলশেখর গ্রামের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে একটা বাজার গজিয়ে ওঠার চেষ্টা করছে। কিন্তু জমে উঠতে পারেনি এখনও। সত্যিকার বাজার, ভিড়, হইচই যা কিছু, সবই ফুলশেখরে। এখানটা প্রায় খাঁ খাঁ করে সাবাটা দিন। একটা হাট বসানোরও চেষ্টা হয়েছিল। চলেনি।

কানাই মোহান্তের ছেলে সেন্টু তাকে ডাকছিল। অরিত্র বলে, 'কিছু বলছ সেন্টু?'

সেন্টু এসে রাস্তায় তার পাশেই দাঁড়ায়। বাকি ছেলেগুলোও এসে যায়। সেন্টু চোখ নাচিয়ে বলে, 'কী অরু? রোজ দুবেলা বিপ্রশেখরে না এলে যে ভাত হজম হয় না তোমার! ব্যাপারটা কী?'

অরিত্র হাসে। 'কেন? আপত্তি আছে নাকি তোমাদের?'

'থাকারই কথা। বিপ্রশেখরের কটা ছেলে তোমাদের গাঁয়ে মাগীবাজি করতে যায়?'

অরিত্র ফুঁসে ওঠে। 'কী যাতা বলছ সেন্টু? থাম, মণিকে বলছি গিয়ে—এমন অসভ্য হয়েছ তুমি?'

মনো নামে একটা ছেলে ভেংচি কেটে বলে, 'আরে যাও যাও। মণিকে বলবে। মণি মাথা কেটে নেবে। এদিকে তুমি বাঞ্চোত বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা করবে, আর আমরা তাই বসে-বসে দেখব।'

এদের বয়স অরিত্রের চেয়ে কম। কেউ-কেউ স্কুল থেকেই পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছে, কেউ কলেজে কিছুদিন যাতায়াত করেছিল। অরিত্র স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে থাকে মুখগুলোর দিকে। তারপর তার অস্বস্তি হয়। এরা যেন ওত পেতে তারই অপেক্ষা করছিল। সেন্টু সাইকেলের হ্যান্ডেলে হাত রাখলে অরিত্র বলে, 'যেতে দাও!'

সেন্টুর মুখের চেহারা আরও বদলে যায়। 'তোমার বাপের গাঁ পেয়েছ। বলে কী, যেতে দাও! ঢ্যামনাগিরির জায়গা পেয়েছ বিপ্রশেখরে' বলে সে হ্যান্ডেলটা ঘুরিয়ে দেবার চেষ্টা করে।

অরিত্র সাইকেল থেকে নেমে দাঁড়ায়। শান্ত ভঙ্গিতে বলে, 'সেন্টু, তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি!'

সেন্টু হিসহিস করে বলে, 'সাইকেল কেড়ে নেব, অরু! একমিনিট সময় দিচ্ছি।'

অরিত্রের ব্যায়ামকরা শরীর শক্ত হয়ে ওঠে। জেদ চড়ে যায় তার। বাঁ হাতে সেন্টুকে ঠেলে দিয়ে সে সাইকেলে ওঠে ফের। এদের সবকটাকে সে এক-এক ঘুষিতে মাটিতে ফেলে দিতে পারে। রোগা পটকা কতকগুলো ছেলে! সে এদের গ্রাহ্য করার কথা ভাবে না।

সেন্টু টাল খেয়েছিল। সামলে নিয়ে সে চেঁচিয়ে ওঠে, 'তবে রে শালা খানকিবাজ!' তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ে অরিত্রের ওপর। তার সঙ্গীরাও ঝাঁপিয়ে পড়ে। সাইকেল থেকে পড়ে যায় অরিত্র। পাঁচটা মারমুখী ছেলেকে যত সহজে কাবু করবে ভেবেছিল, পারে না। চারদিক থেকে ওরা লাথি, কিল,

ঘুষি মারতে থাকে। এখানে-ওখানে দাঁড়িয়ে বিপ্রশেখরের লোকেরা হাসিমুখে দৃশ্যটা উপভোগ করে। ফুলশেখরের একটা ছেলেকে তাদের গাঁয়ের ছেলেরা পেঁদাচ্ছে, এর চেয়ে আনন্দ আর কিসে? অনেকদিন পরে উপভোগ্য একটা ঘটনা ঘটছে বটে।

অরিত্র বেকায়দায় পড়েছিল। তার জামা ছিঁড়ে ফর্দাফাঁই হয়ে যায়। নাক আর ঠোঁটের কোনায় রক্ত ঝরে। জীবনে সে মারামারি করেনি কারুর সঙ্গে। অভিজ্ঞতার অভাবে সে কমবয়সী ছেলেগুলোর মার খায়। ক্রমশ নার্ভাস হয়ে পড়ে সে। তারপর দেখে, একজন তার সাইকেলটা নিয়ে চলে যাচ্ছে। বাধা দেবার চেষ্টা করতে গিয়ে সে পিঠে ঘুষি খায়। তখন টলতে টলতে পা বাড়ায় উল্টো দিকে। ব্রিজের মুখে চড়াই রাস্তায় হাঁটতে থাকে।

সেন্টু পেছন থেকে চেঁচায়, 'যা শালা! এবার ফুলশেখরওয়ালাদের ডেকে নিয়ে আয়?'

অরিত্র একবার ঘোরে। সেন্টুরা রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে তার হেরে চলে যাওয়া দেখছে। নিজেকে বড় অসহায় লাগে অরিত্রের।

ব্রিজে পৌঁছে সে বাঁদিকে নেমে বাঁধে পৌঁছায়। ঝোপঝাড় গাছপালার ভেতর হেঁটে তার ঘাটের কাছে ছাতিম গাছটার তলায় বসে পড়ে। কোন মুখে বড়দিকে গিয়ে বলবে, সে বিপ্রশেখরের ছেলেদের কাছে মার খেয়েছে? তার সাইকেল কেড়ে নেওয়ার কথাও সে বলতে পারবে না।...

কিন্তু অরিত্রের মারখাওয়ার খবর ফুলশেখরে পৌঁছুতে দেরি হয়নি। ফুলশেখরে এমনিতে যত দলাদলি থাক, তাদের কাউকে ওপারের লোকেরা মেরেছে—এটা ফুলশেখরেরই অপমান। প্রথমে ভিড়টা হল গণমিত্রের গ্রামবার্তা প্রেসের সামনে। গণমিত্র সব শুনে বললেন, 'অরু বেঁচে আছে তো?'

তা কেউ জানে না। নেতাজি ক্লাবের অরুণ বলল, 'অরুকে গুম করেছে সাইকেল সুদ্ধু।'

গণমিত্র গম্ভীর মুখে বললেন, 'তাহলে আগে লিগ্যাল স্টেপ নেওয়া দরকার। আমি থানায় যাচ্ছি। তোমরা ঝোঁকের মাথায় এখনই কিছু কর না। চুপচাপ থাক। পরে দেখা যাবে।'

ছেলেগুলোকে বয়স্করা তাতিয়েছে। তারা হল্লা করে ধরিত্রীর কাছে দৌড়ুল। ইতিমধ্যে বাজারে বিপ্রশেখরের যেসব লোক ছিল, ঝটপট কেটে পড়েছে। আজ হাটবার হলে মারামারি বাধতে দেরি হত না। বুদ্ধিমান কিছু দোকানদার ঝাঁপ ফেলার জন্য তৈরি হয়ে আছে। বিপ্রশেখরের লোকের কিছু দোকানপাট আছে, তারা কখন বন্ধ করে গ্রামে ফিরে গেছে। ব্রজবন্ধুবাবুর বাড়ির সামনেও তখন ভিড় জমছিল।

ধরিত্রী আজ বেরয়নি। বাড়িতেই ছিল। হল্লা শুনে বেরিয়ে এল। অরিত্রকে সাইকেল সুদ্ধু গুম করেছে বিপ্রশেখরের লোকেরা—বিশ্বাস করতে পারছিল না ধরিত্রী। কেন তা করবে ওরা? অরিত্র তো কোন ব্যাপারে থাকে না।

অরুণ বলল, 'অনেকে দেখেছে অরুকে মারছিল কয়েকটা ছেলে। খবর শুনে আমরা দৌড়ে ব্রিজের ওধার অব্দি গেলাম। গিয়ে তাকে দেখতে পেলাম না।'

ধরিত্রী বলল, 'আমি দেখছি, তোমরা যাও।'

ছেলেগুলো নিরাশ হয়ে ফিরে গেল। ধরিত্রী বাড়ির ভেতর ঢুকলে সংঘমিত্রা ধরা গলায় বললেন, 'অরু নদীর ঘাটে বসেছিল। গরি দেখতে পেয়ে ডেকে নিয়ে এসেছে। কিছু বলছে না—নাকে মুখে রক্ত।'

'কই সে?'

'ওপরে গেল।'

ধরিত্রী হন্তদন্ত ওপরে গিয়ে ডাকল, 'অরু! অরু'!

অরিত্র তার ঘরে চুপচাপ বসে আছে। গায়ত্রীর হাতে তুলো, অ্যান্টিসেপটিক লোশন। একটু তফাতে দাঁড়িয়ে আছে সে। ধরিত্রীকে দেখে বলল, 'এই দ্যাখ তোর গুণধর ভাইটির অবস্থা! কোথায় ঠ্যাঙানি খেয়ে এসেছে। বলছি রক্তগুলো মুছে দি। মুছবে না।'

ধরিত্রী অরিত্রের দিকে তাকিয়ে আস্তে বলে, 'কেন মারল তোকে? কী করেছিলি?'

অরিত্র মখ নামিয়ে বসে থাকে।

ধরিত্রী গলা একটু চড়িয়ে বলে, 'তোর সাইকেল কোথায়?'

অরিত্র চুপ।

'কেড়ে নিয়েছে, না ফেলে পালিয়ে এসেছিস?'

অরিত্র তবু চুপ।

ধরিত্রী চেঁচিয়ে ওঠে, 'কেন তোকে মারল? আমার জন্য?'

অরিত্র মাথাটা একটু দোলায়।

'তাহলে কেন তোকে মারল।'

জবাব না পেয়ে ধরিত্রী ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। সংঘমিত্রা সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ধরিত্রীকে দেখে চাপা গলায় বলে ওঠেন, 'টুকির মা সব জানে। নিজের কানে শোনো গিয়ে, বিশ্বাস যদি না হয়।'

ধরিত্রী বলে, 'কী বলছে টুকির মা?'

সংঘমিত্রা আরও চাপা কণ্ঠস্বরে বলেন, 'ওপারের একটা মেয়েকে জড়িয়ে অরুর নামে কেলেঙ্কারি রটেছে। টুকির মা শুনে এসেছে।'

টুকির মা সিঁড়ির নিচে দাঁড়িয়ে কথাটা বলার জন্য ছটফট করছিল। এক ধাপ উঠে সে ফিসফিস করে বলে, 'কাল ভাগ্নেবাড়ি গিয়েছিলাম—গিয়ে শুনলাম বুঝলেন বাবুদিদি? ভয়ে আপনাদের কানে তুলতে সাহস পাইনি। বাবুদাদার কাছে ওপারের যে ছেলেটা আসত—ওই যে গো, হৃদেবাবুর ছেলে—তারই বোনের সঙ্গে নাকি বাবুদাদার সম্পক্ক ছিল। বিশ্বেস করিনি বাবুদিদি, তাই কি হয়?'

ধরিত্রী গম্ভীরমুখে চুপচাপ তার পাশ কাটিয়ে নেমে যায়।...

বিকেলে শহিদুল এল ব্যস্ত হয়ে। 'ধরি, আবার হয়ত আগুন জ্বলল। কাকামশাই আর আমি অত করে বোঝালাম ছেলেগুলোকে। পুলিশকে বলা হয়েছে অরুর সাইকেল উদ্ধার করে দেবে। ব্রজবাবুর সঙ্গেও অঞ্চল অফিসে বসে আমাদের কথাবার্তা হল। হঠাৎ গোলমাল বাধিয়ে দিলে গোঁয়ার ছোঁড়াগুলো।'

ধরিত্রী উদ্বিগ্ন হয়ে বলে, 'কী হয়েছে শহিদুল?'

শহিদুল বিরক্ত মুখে বলে, 'ওপারের অজা নাপিতের ছেলে রামকে চেন? সে বেচারা এসেছিল কেরোসিন নিতে। নিরীহ ছেলে। তাকে পেয়েই দে মার! সেই খবর পেয়ে ওপারওয়ালারা সেজেগুজে ব্রিজের মুখে হাজির। আমাদের এরাও ব্রিজের এমুখে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। পুলিশ গেছে অবশ্যি। তুমি একবার এস, ধরি।'

ধরিত্রী একটু চুপ করে থাকার পর বলে, 'আমি গিয়ে কী করব?'

'তোমার কথা এরা শুনবে। খামকা হাঙ্গামা করে লাভ কী? তুমি শিগগির এস।'

'পুলিশ তো গেছে বলছ!'

'পুলিশের রকমসকম আমার ভাল মনে হচ্ছে না। মানোয়ার দারোগা বাইরে কোথায় গেছে। সেকেন্ড অফিসার অবন্তীবাবু আর চারজন মোটে কনস্টেবল। মাত্র দুটো রাইফেল তাদের। এদিকে ব্রিজের দুধারে কয়েকশ করে লোক দুপক্ষে। তুমি এস, ধরি!'

'ব্রজবাবু নেই ওখানে?'

'দেখলাম না। থাকলেও কি এখন মবের মুখে এপারে আসবে সে?' শহিদুল কান পেতে শোনার চেষ্টা করে বলে, 'গণ্ডগোল শুনতে পাচ্ছ না? তুমি দেরি কর না আর। কাকামশাই তোমাকে ডাকতে বললেন।'

ধরিত্রী একটু ইতস্তত করে তারপর পা বাড়িয়ে বলে, 'কতক্ষণ ধরে কানে আসছিল গণ্ডগোল। ভাবছিলাম হাটবার নাকি। কিন্তু সামান্য একটা ব্যাপারে মানুষ এক ক্ষেপে যায় কেন, বল তো শহিদুল?'

পেছন থেকে সংঘমিত্রা ডেকে বলেন, 'ধরি, যেও না ওখানে। ছাদ থেকে দেখলাম অনেক লোক জড় হয়েছে। তুমি গিয়ে কী করবে?' সংঘমিত্রা কাকুতিমিনতি করেন ভাঙাগলায়। 'ধরি, তুই যাস নে মা! তুই মেয়ে, ওরা পুরুষ মানুষ। ও ধরি, ফিরে আয় মা?'

তাহলে সংঘমিত্রা তার আগেই টের পেয়েছেন! বলেন নি ধরিত্রীকে। ধরিত্রী উঠোনে দাঁড়িয়ে পায়রাদের ধান খাওয়া দেখছিল, কিন্তু বুঝতে পারেনি। ছাদের ওপর অরিত্র দাঁড়িয়ে আছে। যেতে যেতে ধরিত্রী দেখল, গায়ত্রীও ছাদে গিয়ে দাঁড়াল।

রাস্তায় পৌঁছে ধরিত্রী চমকে ওঠে। বাজারের শেষপ্রান্তে সমুদ্রের ঢেউয়ের মত অসংখ্য লোক তুমুল গর্জনে ফেটে পড়ছে। সে বুঝতে পারে না, তুচ্ছ একটা ঘটনা কেন্দ্র করে কেন এই বিশাল ক্রোধ জেগে উঠেছে?

পরমুহূর্তে তার মনে পড়ে যায়, এ কিছু নতুন দেখছে না। চিরদিন নদীর দুধারে এই এক অদ্ভুত রহস্যময় ক্রোধ জমা হয়ে থাকে—কতবার ফেটে পড়ে প্রচণ্ড নির্ঘোষে। মাঝখানে নদী নির্বিকার শুয়ে থাকে। তার বুকে রক্তের দাগ পড়ে। আবার ধুয়ে যায়। নদীর বুঝি এটাই নিয়ম চিরদিন।

ধরিত্রী যত এগিয়ে যায়, তত এক আবেগ তাকে পেয়ে বসে। এইসব মানুষকে আজীবন সে আপনজন ভেবে আসছে। এদের মধ্যে বেঁচে থেকেই তার যত সুখ আর স্বস্তি। এদের সুখে দুঃখে আপদে বিপদে সে শিয়রে দাঁড়িয়ে থেকেছে মায়ের মত। এরা কেন তার কথা শুনবে না?

ব্রিজের মাঝখানে পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে। দুপারের কিছু লোক পুলিশকে কিছু বোঝানোর চেষ্টা করছে। ধরিত্রীকে দেখেই এপারের জনতা আকাশ ফাটিয়ে চিৎকার করে। ধরিত্রী দুহাত তুলে তাঁদের শান্ত করতে করতে ব্রিজের মাঝামাঝি গিয়ে দাঁড়ায়। গণমিত্র আর ব্রজবাবু কথা বলছেন পুলিশ অফিসারের সঙ্গে। তারপর ধরিত্রী কয়েক পা এগিয়েছে তাঁদের দিকে, হঠাৎ তার বুকের ডানদিকটা চিড়িক করে ওঠে। তীক্ষ্ণ, ঠাণ্ডাহিম কী একটা সূক্ষ্ম জিনিস—হাত দিয়ে ছুঁয়েই সে মুখ নিচু করে। একটা পালক লাগানো তীর দেখতে পায়। খুব অবাক হয় সে। পড়ে যাবার মুহূর্তে তার মনে হয়, গভীর এক অন্ধকারে স্বপ্নের সেই বিশাল কালো মানুষটা তাকে দুহাত বাড়িয়ে ধরে ফেলেছে আর তার চারদিকের অন্ধকার একটা উজ্জ্বল লাল বিস্ফোরণে ছড়িয়ে পড়তে পড়তে তুমুল কোলাহল হয়ে উঠছে। ধরিত্রী চোখ বুজে থাকে।

এগার

কিছুদিন পরে অরিত্র নদীর ধারে তার ঘাটের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। ঘাটের নিচে থকথকে কাদাটা কিছুদিনের মধ্যে জোরাল রোদ পেয়ে শুকিয়ে এসেছে। হলুদরঙের জলটাও ফুরিয়ে এসেছে ক্রমশ। প্রতি বছর এ সময়টা নদীর এরকম খাঁ খাঁ অবস্থা। এখন দিন শেষের ছাইরঙা আলোয় সব কিছু ম্রিয়মান লাগে। ওপারে বিপ্রশেখরের গাছপালা আর ঘরবাড়ির মাথায় এখনও খানিকটা রোদের আভা ঝকমক করছে। এপারে ফুলশেখরে ছায়া জমে উঠেছে। চারদিকে শুধু পাখির ডাক। রোজই এরকম।

অরিত্র চমকে ওঠে হঠাৎ। ওপারের খাড়া পাড়ের মাথায় আকন্দঝোপ ঠেলে বেরিয়ে এল রিন। তারপর প্রায় খাড়া ঢাল বেয়ে দৌড়ে নিচে নামল। হাঁটুজল ভেঙে সে এগিয়ে আসে। দুহাতে কাপড় তুলে সে হাসিমুখে নদী পেরোতে থাকে। তার সাদা নগ্ন পা ধূসর আলোয় ঝলমল করে। শুকনো ঘাটের নিচে পৌঁছে সে একটা হাত বাড়িয়ে বলে, 'কই ধর। কত কষ্ট করে এলাম দেখছ না?'

অরিত্র সতর্কভাবে এদিক-ওদিক তাকিয়ে গাছের গুঁড়িটার ওপর নামে। হাত বাড়িয়ে দেয়।

ঘাটের মাথায় বনগোলাপের ঝাড়টার পাশে ঘন দূর্বাঘাসের ওপর বসে রিন বলে, 'তোমার কি ভয় করছে? অমন করে তাকাচ্ছ যে?'

অরিত্র একটু হাসে। 'বড়দি বলছিল তুমি ওকে দেখতে গিয়েছিলে।'

'আজও তো গিয়েছিলাম।' রিন পা ছড়িয়ে দিয়ে একটা ঘাস ছিড়ে দাঁতে কাটতে থাকে। 'ধরিদি বলল, সামনের উইকেই ছাড়া পাবে। তুমি যাও নি আজ?'

'আমি তো রোজই যাই—সকালের দিকে। এবেলা মিতুপিসিমাকে নিয়ে গেছে গায়ত্রী।'

রিন হাসে। 'তাহলে বাড়ি তো ফাঁকা!'

অরিত্র একটু ভেবে নিয়ে বলে, 'চল, বরং বাড়িতেই গিয়ে বসি। এখানে এভাবে বসে থাকলে কার চোখে পড়বে। আবার ঝামেলা বাধবে। ওঠ।'

যেতে যেতে রিন চাপা গলায় বলে, 'রোজ আসবার প্ল্যান করি। কিন্তু ভয় করে, যদি তোমাদের গাঁয়ের লোক দেখে ফেলে, মেরে শেষ করে দেবে।'

অরিত্র হাসে। 'যাঃ! তোমাকে মারবে কেন?'

'আমাদের জন্যই এত কাণ্ড না? ভয়ে তো আমাদের গাঁয়ের কত লোক হাটে আসাই ছেড়ে দিয়েছে। যা অবস্থা হয়েছিল না কিছুদিন!'

'এখন সব মিটে গেছে। এসব কি নতুন হচ্ছে নাকি? সেবারে তো তিনটে লোক মারা পড়েছিল। যেবার বাঁধ-কাটা নিয়ে হাঙ্গামা হল। মনে নেই তোমার?'

রিন হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে নদীর দিকে কিল তোলে। মিটিমিটি হেসে বলে, 'আসলে এই নদীটাই যত বজ্জাত!'

ঠাকুরবাড়ির পেছনের দরজা ভেজানো ছিল। অরিত্র ফিসফিস করে বলে, 'তুমি একমিনিট এখানে দাঁড়াও। টুকির মাটা বড্ড বাজে মেয়ে। রটিয়ে-টটিয়ে একাকার করবে। ওকে সিগারেট আনতে পাঠাই। তারপর তোমাকে ডেকে নেব।'

রিন ঠাকুরবাড়ির ভেতর দাঁড়িয়ে থাকে। অরিত্র বাড়ি ঢুকে টুকির মাকে সিগারেট আনতে পাঠিয়ে তাকে ডেকে নিয়ে যায়। দোতলায় গিয়ে বলে 'জানলার কাছে বসছি আমি। গেটে লক্ষ্য রাখতে হবে।'

রিন অরিত্রের ঘর দেখছিল। 'এঘরে থাক তুমি?' বলে সে ঘরের ভেতর এদিক থেকে ওদিক চঞ্চলভাবে পায়চারি করে। তারপর অরিত্রের বিছানায় পা ঝুলিয়ে বসে।

অরিত্র বলে, 'বড়দি কী বলল তোমাকে?'

'গায়ে হাত বুলিয়ে কত আদর করল জান?'

'সত্যি?'

'তোমার দিব্যি।' রিন দুঃখিত স্বরে বলে। প্রথম যেদিন দেখতে গেলাম, খুব ভয় করছিল। বুকে এতখানি ব্যান্ডেজ। ইশ! কী বাঁচা না বেঁচে গেছে বল? শক্ত মেয়ে বলেই সহ্য করতে পেরেছিল।'

অবিত্র অন্যমনস্কভাবে বলে, 'তীরটা যে অ্যাঙ্গল থেকে ছুঁড়েছিল, বড়দি সে সময় পাশ ফিরে না দাঁড়িয়ে থাকলে ডিরেক্ট হার্টে গিয়ে ঢুকত। কাত হয়ে ঢুকেছিল। তার ফলে রাইট ব্রেস্টের ভেতর প্যারালাল হয়ে আটকে গিয়েছিল।'

'তাই বুঝি?'

'হ্যাঁ। হেলথ সেন্টারে কেটে বের করতে সাহস করেনি। তখন বহরমপুরে নিয়ে গেল।'

'তুমি সঙ্গে যাও নি?'

'আমি তো ছাদে দাঁড়িয়ে ছিলাম। কিচ্ছু বুঝতেই পারিনি। তিলক এসে খবর দিল। তারপর...'

'এই শোন!' রিন ফিসফিস করে বলে, 'তোমার সাইকেলটা আমি দেখেছি।'

অরিত্র নড়ে ওঠে। 'কোথায় দেখলে?'

'নরুদের বাড়িতে। ওদের ভেতরের ঘরে একপলক যেন দেখলাম।'

'যাঃ! তুমি কী করে বুঝলে আমার সাইকেল?'

'কী আশ্চর্য! আমি চিনব না তোমার সাইকেল?'

অরিত্র শুকনো হাসে। 'ঠিক আছে। মানোয়ারদাকে বলতে হবে।'

রিন মুখ নামিয়ে শাড়ির পাড় খুঁটতে থাকে। ঘরে শান্ত অন্ধকার এসেছে চুপিসাড়ে। এ ঘরে ফ্যান নেই। সুইচ টিপে অরিত্র আলো জ্বালতে গেলে রিন দ্রুত বারণ করে। নিচে ফটকের দিকে টুকির মায়ের গলা শোনা যায়। রাখাল ছেলেটার সঙ্গে বকবক করতে করতে আসছে। অরিত্র বেরিয়ে যায়।

একটু পরে ফিরে এসে সে নিঃশব্দে দরজা বন্ধ করে। রিন চমক খাওয়া গলায় বলে, 'এই! ও কী হচ্ছে?'

অরিত্র ঠোঁটে আঙুল রেখে বলে, 'চুপ। আস্তে!'

সে রিনের একটু তফাতে বসে সিগারেট ধরায়। তারপর মিটিমিটি হেসে বলে, 'টুকির মাকে বলে এলাম বহরমপুর থেকে একটা ছেলে এসেছে। কাজেই আমি চড়া গলায় কথা বলব। তুমি বলবে ভীষণ আস্তে।'

'কিন্তু দরজা বন্ধ করলে কেন? আমার ভয় করছে।'

'ঘরে পেয়ে তোমার সঙ্গে অভদ্রতা করব ভাবছ কেন রিন? বড়জোর...'

'কী? থামলে যে?'

'একটা চুমু খেতে পারি।' অরিত্র হাসতে হাসতে বলে, 'ওটা কি আমার পাওনা নয়? তোমার জন্য

কতকগুলো বাঁদরের খামচি খেলাম—শেষে কত বিরাট হাঙ্গামা পর্যন্ত গড়াল। এরপর যদি একটা চুমু খেতে না দাও, জানব—তুমি ভীষণ নিষ্ঠুর মেয়ে। হার্টলেস!'

রিন মুখ বাড়িয়ে শান্তভাবে বলে, 'তাহলে নাও। কিন্তু তার বেশি কিছু নয়।'

সার্জিক্যাল ওয়ার্ডে কেবিন নেই। দুদিন জেনারেল ওয়ার্ডের এই কেবিনে আসার পর ধরিত্রী ভীষণ অবাক হয়ে দেখেছে, কত উদ্বিগ্ন মুখ তার দিকে তাকিয়ে আছে। গণমিত্র প্রায় সারাদিন তার কাছে থাকেন। কাকে আসতে দেওয়া হবে ধরিত্রীর কাছে, তিনিই সেটা ঠিক করেন। শুধু ফুলশেখর থেকে দলে দলে লোক আসছে না, সারা এলাকা থেকে কত চেনা-অচেনা লোকের ভিড় জমে উঠছে প্রাঙ্গণের কদমগাছটার তলায়। মেয়েরাও আসে। জানালার ওধারে দাঁড়িয়ে কাকুতি-মিনতি করে, 'এট্টুখানি দেখি বাবুদিদিকে। চোখের দেখাটা দেখেই চলে যাব। কষ্ট করে এলাম কদ্দূর থেকে।' গণমিত্র হাসতে হাসতে বলেন, 'ও ধরি! একবার উঁকি মার জানালায়।' ধরিত্রীকে দেখে ওরা চোখের জল মোছে। অভিশাপ দেয় দিরেংকে। দিরেং এখন জামিনে আছে। কবুল করেছে সে, ভাসারাম ভাণ্ডারির কাছে পঁচিশ কিলো ধান পেয়েছিল। ভাণ্ডারি এবার দিরেংয়ের বিপ্রশেখর যাওয়া বন্ধ করে দেবে। নদীর ওপারে না গেলে দিরেং খাবে কী? ফুলশেখরে তাকে কেউ মুনিশ নেবে না। ফুলশেখরের মেয়ের বুকে সে তীর মেরেছে।

চুপিচুপি বিপ্রশেখরেরও কেউ-কেউ এসে দেখে যায়। বেশিক্ষণ বসে না। দু একটা কথা বলেই চলে যায়। শহরে ওই এলাকা থেকে অসংখ্য মানুষ নানান কাজে আসে। কত মাতব্বর মানুষ, কত খাটিয়ে মানুষ—কেউ লেখাপড়া জানে, কেউ আকাট নিরক্ষর। তারা সবাই বলে যায়, 'ভাল হয়ে উঠুন মা!' তারা ঈশ্বরের কথা বলে যায়। ঈশ্বর তাদের ভালর জন্যই ধরিত্রীকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন। ধরিত্রী অনন্ত পরমায়ু নিয়ে বেঁচে থাক।

দুপুরে শহিদুল এসে একটা আশ্চর্য কথা বলে গেছে। কাল ছিল শুক্রবার। মুসলমানপাড়ার মসজিদে নমাজের পর খোদাতালার কাছে ধরিত্রীর আয়ু কামনা করা হয়েছে। ধরিত্রীর চোখে জল এসে গিয়েছিল। মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে সে নতুন করে জেনেছে, তার নামে মুখে যতই কেলেঙ্কারি বা নিন্দামন্দ রটাক, গ্রামের মানুষ তাকে ভালবাসে। তাদের দুঃখের দিনে সে তত কিছু করতে পারে নি হয়ত, তবু পাশে গিয়ে তো দাঁড়িয়েছে।

দুপুর থেকে ছটফটানি চলেছে মনের ভিতর। কবে সে ফিরে যাবে ফুলশেখরে? সে তো একটু করে চলাফেরা করতে পারছে। শরীরটা একটু দুর্বল এখনও। কিন্তু ফুলশেখরের সেই ছোট্ট নদীটির ধারে দাঁড়ালেই সে সব শক্তি ফিরে পাবে। স্তনের ক্ষত শুকিয়ে এসেছে প্রায়। নিঃসাড় হয়ে গেছে ওখানটা। কাল রাতে সিস্টার হাসতে হাসতে বলছিলেন, 'শুধু একটাই অসুবিধে হবে মিসেস সিনহা! যখন মা হবেন, তখন এই স্তনটায় দুধ আসবে না। এটা পার্মানেন্টলি ড্যামেজড। অবশ্য আজকাল বাচ্চাদের ব্যাপারে এটা কোন প্রবলেমই নয়।'

একি কোন গভীরতর অবচেতনার সংস্কার? সারারাত যতবার ঘুম ভেঙেছে, ধরিত্রীর মনে অস্বস্তি জেগে উঠেছে। কেন দিরেংয়ের তীর তার হার্টে না ঢুকে শুধু একটা স্তনের মৃত্যু ঘটাল? সে কি মা হতে চায়নি বলে এই শাস্তি? ধরিত্রী ঈশ্বর ঠাকুর-দেবতা নিয়ে কোনদিন মাথা ঘামায় নি। গ্রাহ্য করেনি কিছু। কিন্তু সে টের পেয়েছে নদী, বৃক্ষ, শস্য, রোদ, বৃষ্টি, ঋতুচক্র নিয়ে যে পৃথিবী, যেখানে প্রাণ নামে একটা প্রচণ্ড কিছু ছড়িয়ে রয়েছে—আর তাই এতসব মানুষের জন্ম, পাখি প্রজাপতি কীটপতঙ্গের এত চিৎকার—এসবের ভেতর প্রচ্ছন্ন কেউ যেন আছে। কতবার নির্জন মাঠে গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে চারপাশে বিস্তৃত শস্যক্ষেত্র জুড়ে পোকামাকড়ের ডাকে, উজ্জ্বল রৌদ্রে, হঠাৎ উড়ে যাওয়া কোন পাখির কণ্ঠস্বরে, তার হঠাৎ মনে হয়েছে, কী যেন আছে। কেউ যেন আছে। সে সারাক্ষণ তার দিকেই তাকিয়ে আছে। সে প্রকৃতির ভাষায় তাকে হয়ত কিছু বলতে চাইছে। ধরিত্রী বুঝতে পারছে না। চৈত্রের মাঠে ঘূর্ণিহাওয়ার মাথায় সেই বুঝি কৌতুকে পরিয়ে দেয় খড়কুটোর মুকুট আর গলায় পরিয়ে দেয় শুকনো পাতার অলঙ্কার—বজ্রাহত বৃক্ষকোটরে সাপের খোলস তার জয় পতাকা হয়ে ওঠে, নদীর

হলুদ জলে তার দুরন্ত ক্রোধ ছড়িয়ে যায়। ধরিত্রী আজীবন তার কাছাকাছি থেকেছে। সেই কি চেয়েছিল সে ছেলেপুলের জন্ম দিক? অনেক রাতে ব্যান্ডেজের ওপর হাত রেখে ধরিত্রী কতক্ষণ দুর্জ্ঞেয় এক অস্বস্তিতে কাঠ হয়ে শুয়ে ভাবছিল, এ কি তার শাস্তির সূচনা?

তবু আজ সারাদিন তার মন সুখে ভরে আছে। সামনের সপ্তাহের মাঝামাঝি সে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবে। বিকেলে মিতুপিসি গায়ত্রীর সঙ্গে এসেছিলেন। সন্ধ্যার শেষ বাসে তাঁদের তুলে দিতে গেছেন গণমিত্র। নার্স ইঞ্জেকশন দিয়ে বেরিয়ে গেলে ধরিত্রী বিছানার পাশ থেকে একটা বই টেনে নিল। বই পড়ার অভ্যাস তার বরাবরই নেই। তবু সময় কাটাবার জন্য পড়ার চেষ্টা। গণমিত্র একগাদা বই এনে দিয়েছেন। কী সব পণ্ডিতি বই! এই বইটা তাকে রিন দিয়ে গেছে। বেশ জমাটি উপন্যাস। কিন্তু মাঝে মাঝে ভারি হাস্যকর লাগে। বুজিয়ে রেখে ধরিত্রী হাসিমুখে দেয়ালের দিকে তাকিয়ে থাকে। একটু পরে আবার খোলে।

কার পায়ের শব্দ হল। ধরিত্রী ভাবল গণমিত্র। বইয়ের পাতায় চোখ রেখে সে বলে, 'বাস পেল ওরা?'

কেউ এসে তার বিছানার পাশে ভারি গলায় ডাকে, 'রিতি!' ধরিত্রীর বুকটা ধড়াস করে ওঠে। সে দ্রুত বইটা নামিয়ে রেখে মুখ ফেরায় এপাশে। দেখে, সুদীপন পুরু চশমার কাচের ভিতর তার দিকে তাকিয়ে আছে।

সুদীপন বলে, 'প্রতিদিনই এসে ফিরে যাই। সব সময় লোকের ভিড়। এখন কেমন আছ?'

ধরিত্রী আস্তে বলে, 'ভাল।'

'কাকামশাই কোথায় গেলেন?'

'গরি এসেছিল। বাসে তুলে দিতে গেছেন।'

'কাকামশাই আমাকে আসতে বলেছিলেন।'

'এক্ষুণি এসে যাবেন।'

'তুমি আমার দিকে তাকাচ্ছ না কেন রিতি? আমি কি এতই ঘৃণ্য প্রাণী?'

ধরিত্রী এবার তাকায় তার দিকে। শান্ত ভাবে বলে, 'বাবা-মা ভাল আছেন?'

'হ্যাঁ'। সুদীপন চুরুট বের করে ধরায়। তারপর বলে, 'ওঁরা এখন নেই এখানে। দুর্গাপুরে আছেন। নয়ত আসতেন। ...তোমাকে...' একটু থেমে সে বলে, 'তোমাকে সন্ধ্যায় হাসপাতালে এনে কাকামশাই খবর পাঠিয়েছিলেন একটা ছেলেকে দিয়ে। এসে দেখি, তখনও তুমি অজ্ঞান অবস্থায় আছ, যা অব্যবস্থা হাসপাতালে! ভাগ্যিস ডাঃ মৈত্রকে পেয়ে গেলাম। তারপর...'

ধরিত্রী বলে, 'তুমি হয়ত আমার জন্য অনেক কিছু করেছ। ধন্যবাদ।'

সুদীপন মুখ নামিয়ে বলে, 'আমাকে কেন তুমি এত ঘৃণা কর রিতি? কী করেছি আমি?'

ধরিত্রী চুপ করে থাকে কয়েক সেকেন্ড। তারপর বলে, 'তোমার কলেজ চলছে?'

'হ্যাঁ। কেন?'

'গরি বলছিল তোমার কলেজে ওর সিট পড়েছে। নেক্সট উইকে পরীক্ষা শুরু।'

'জানি। গরি আমার কাছে প্রায়ই আসে। শুধু অরুটা কেন যেন চটে গেছে। কিন্তু বিশ্বাস কর, হলার ব্যাপারটা আমি ওভাবে বলিনি। জাস্ট বলেছিলাম, কেন ওকে ইনডালজেন্স দিতে? ওকে...'

'গরিকে বলব, পরীক্ষার সময় তোমার কাছে থাকবে। ওকে একটু হেল্প কর!'

সুদীপন একটু হাসে। 'তুমি?'

'কী আমি?'

'তোমাকে ফুলশেখরে যেতে দেব না। কাকামশাইকে বলেছি।'

'পাগল! আমার কত কাজ বাকি সেখানে।'

সুদীপন শক্ত হয়ে বলে, 'আমি আর ওইসব জঘন্য লোকদের মধ্যে আমার স্ত্রীকে যেতে দেব না।'

'গায়ের জোরে আটকাবে বুঝি?'

'আমার সে অধিকার আছে।' সুদীপন আবার নরম কণ্ঠস্বরে বলে। তারপর শুকনো হাসে। 'এরপরও তুমি গ্রামে ফিরতে চাও, রিতি? আর এদিকে আমার অবস্থাটা তুমি বুঝছ না?

'কেন? তুমি তো বেশ আছ।'

'তুই বুঝি? আমাকে দেখে তোমার তাই মনে হচ্ছে?'

ধরিত্রী একটু হাসে এতক্ষণে। 'চুরুট টানছ। কলেজ করছ। ছেলেদের মাথা খাচ্ছ। তেমনি আছ।'

'এটা কোন থাকা নয়, রিতি!' সুদীপন ফের মুখ নামায়। 'তুমি কি ভেবেছিলে, আমি সন্ন্যাসী হয়ে থাকব?'

ধরিত্রী আস্তে এদিকে পাশ ফেরে। বলে, 'আজ আমার মন খুব ভাল আছে।' তারপর সে হাত বাড়িয়ে সুদীপনের একটা হাত টেনে নেয়। 'তুমি আমার ওপর রাগ কর না। আমি ফুলশেখর ছেড়ে কোথাও গিয়ে থাকতে পারব না। তোমাকে একদিন বলেছিলাম, মনে আছে? জীবনে যত দুঃখ থাক, যে যত নিন্দে রটাক, একবার বাড়ির নিচে নদীটার ধারে গিয়ে দাঁড়ালেই আমি সব ভুলে যাই। পৃথিবী একদিকে, আমি আর একদিকে তখন।' তার চোখ ছাপিয়ে জল আসে। ফের বলে, 'মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে খালি আমার মনে কী হয়, জান? বেঁচে থাকার আনন্দগুলো চারপাশে এত ছড়ানো ছিল, কিন্তু নিতে জানিনি। এবার আমার দুহাত ভরে আনন্দ কুড়োবার দিন এল।'

সুদীপন তার দুর্বল হাতটায় আঙুল বোলায়। তারপর বলে, 'কিন্তু আমি কী করব?'

'তুমি?' হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে চোখ মুছে আস্তে চিত হয় আবার। কতক্ষণ পরে একটা চাপা নিঃশ্বাস ফেলে বলে, 'বেশি দূরে তো নয়। তুমি মাঝে মাঝে ইচ্ছে হলেই চলে যাবে।'

সুদীপন হাসে। 'যাব—আর তুমি মাঠে পালিয়ে যাবে।'

'আর পালাব না।' ধরিত্রী শান্ত কণ্ঠস্বরে বলে, 'আমাদের বাড়ির নিচে নদীর ধারে একটা গাছ আছে দেখেছ?'

'হয়ত দেখেছি। কেন?'

'ওখানকার কোন লোকেই বলতে পারে না, ওটা কী গাছ। আমার জন্মের আগে নাকি ফ্লাডের সময় ভেসে এসেছিল—এসে...হয়ত নিছক গল্প। কিন্তু গাছটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেই আমার মনে হয়, গাছ নয়—একটা মানুষ। ছোটবেলায় ওর কাছে গিয়ে একটু দাঁড়ালেই কী যে ভয় হত! এখনও সেইরকম।'

'হঠাৎ কেন গাছের কথা, রিতি?'

'হাসপাতালে আসার পর থেকে যখনই চোখ বুজি, গাছটাকে দেখতে পাই।' ধরিত্রী একটু হাসে। 'ওমাসে খুব জ্বর হয়েছিল। তখন জ্বরের ঘোরে একটা বিরাট কালো রঙের লোককে দেখতাম তাড়া করে বেড়াচ্ছে। ব্রিজের ওপর যখন বুকে তীরটা এসে ঢুকে গেল, পড়ে যাচ্ছি—তারপর টের পেলাম, লোকটা আমাকে তুলে নিচ্ছে।'

সুদীপন ওর ঠোঁটে হাত চাপা দিয়ে বলে, 'চুপ কর তো। আবার সেইসব অদ্ভুত কথাবার্তা! মনে পড়ছে? বাসরের রাতটা বারটা বাজিয়ে দিয়েছিলে এসব ভুতুড়ে কথাবার্তায়?'

ধরিত্রী ওর হাতটা সরিয়ে দেয়। 'আঃ! শোন না!'

গণমিত্র ঘরে ঢুকেই থমকে দাঁড়ান একটু। তারপর সুদীপনের দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বলেন, 'এই যে! আরে এদিকে এক কাণ্ড। সে জন্যই দেরি হল। আমার গ্রামবার্তার এডিটোরিয়ালটায় হুলস্থূল পড়ে গেছে। রাইটার্সের টনক নড়ে গেছে পর্যন্ত। মদন আচায্যির সঙ্গে দেখা হল বাসস্ট্যান্ডে। বলল, অ্যাসেম্বলিতে কথা তুলবে। বেজা, কানাই আর ভাণ্ডারীর অবস্থা কী হয় দ্যাখো না এবারে!' তারপর ধরিত্রীকে কাছে এসে চাপাগলায় বলেন, 'বিশুকে আমরা গুম করেছি বলে পাল্টা কেস করেছে বেজা। এদিকে বিশু কলকাতায় গিয়ে বসে আছে। হতচ্ছাড়ার মরণ আছে? যাক গে, ওসব কথা পরে হবে। বস বাবাজী, দেখি চা যোগাড় করতে পারি নাকি।' গণমিত্র জুতোর শব্দ তুলে হন্তদন্ত বেরিয়ে যান।

ধরি ী চোখ বুজে বলে, 'অসময়ে আমার কেন ঘুম আসছে বল তো?'

সুদীপন ওর কপালে হাত রেখে, 'বেশ তো। ঘুমোও।'

ধরিত্রী অনেক দূরের কণ্ঠস্বরে বলে, 'দেখ, দেখ—সেই গাছটাকে দেখতে পাচ্ছি। মানুষটাকেও!'

'চুপ। ঘুমোও।'

ধরিত্রী চুপ করে শুয়ে থাকে।